ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ১০, সংখ্যা ২২, জানুয়ারি, ২০২৩

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.309
Vol. 10th Issue 22nd, Jan, 2023

সম্পাদক
সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.309
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya,
Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 10th Issue 22nd, 23rd Jan, 2023, Rs. 800/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
১০ম বর্ষ ও ২২ তম সংখ্যা
২৩ জানুয়ারি, ২০২৩

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২
সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮০০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. মোনালিসা দাস, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মাখন চন্দ্র রায় (বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (আর্য মহিলা পি. জি. কলেজ, বারাণসী)
ড. শান্তনু দলাই (এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। অনধিক ৪০০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।
২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডিএফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।
৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।
৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।
৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২
ফোন : ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address
Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 9804923182
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস
ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর,
কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান
দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা /
এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প : আঞ্চলিক পটভূমির বহুমাত্রিক বর্ণালি
কালীশঙ্কর রায় ১৫
উত্তর-উপনিবেশবাদ ও বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যভাষা
ফণিভূষণ মণ্ডল ২৬
অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে অজ্ঞানের সর্বজ্ঞাশ্রিতত্ত্ব নিরূপণ
সোমনাথ কর ৩৭
"মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বাইরে গড়ে ওঠা ধর্মগোষ্ঠী :
খুশিবিশ্বাসী ধর্ম-সম্প্রদায়"
অসীম বিশ্বাস ৪৩
একক মাতৃত্ব ও মহাকাব্যের নারীরা : একটি সমীক্ষা
ভক্তিলতা দাস ৫৩
চিঠিপত্র 'একাদশ খণ্ড'-এ রবীন্দ্রনাথের দুঃখভাবনা
শর্মিষ্ঠা ধারা ৫৯
মিত্রভেদ তন্ত্রে কূটনীতি ও রাজনৈতিক আচরণ
ঐশী সিনহা ৬৮
ভারতীয় সমাজে নারীবাদী আন্দোলনের প্রসার ও প্রাসঙ্গিকতা :
একটি তাত্ত্বিক আলোচনা
জ্যোতি মিত্র ৭৫
গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় নারীত্বের রূপায়ণ
সুব্রত দাস ৮৭
অমিয়ভূষণ মজুমদারের সাহিত্য ভাবনা
উর্বী মুখোপাধ্যায় ৯৭
ত্রিপুরায় হজাগিরি নৃত্য উৎসবের ইতিকথা
জীবনকৃষ্ণ পাত্র ১০৪
সাহিত্যের কোনও শর্ত নেই
অনুনয় চট্টোপাধ্যায় ১১৪
গল্পকার নজরুল
সারমিন রহমান ১২০
দিনলিপির প্রেক্ষিতে হার্ডি ও জীবনানন্দ : প্রভাব ও প্রেরণা
ঐন্দ্রিলা তেওয়ারী ১৩৩

মনসামঙ্গল কাব্যে হাসান -হুসেন পালা: বিভেদ অতিক্রামী
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দলিল
মিজানুর মণ্ডল ১৪৪
মনুস্মৃতির প্রেক্ষাপটে দুর্গের তাৎপর্যালোচনা
শান্তিগোপাল হুদাতী ১৫৪
ঔপনিবেশিক আমলে মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি
ডাকাত দলের অতীত কথা
নূরমহম্মদ সেখ ১৬৩
নারীর অন্তরের স্বাধীনতায় নারীত্বের উত্তরণ :
কবিতা সিংহ (১৯৩১-১৯৯৮) ও সুচিত্রা ভট্টাচার্য
(১৯৫০-২০১৫)-এর ছোটগল্প
সুরভি সাহা ১৭২
ঔপনিবেশিক সময়কালে কলকাতা বন্দরের মধ্য দিয়ে বাংলার
নাবিক শ্রমিকদের আত্মপ্রকাশের ইতিহাস (১৮৭০-১৯৪৭)
আজহারুল মিদ্দা ১৮৩
বিশ শতকে বাংলার লোকধর্মে নারীদের অবস্থা
প্রদীপ মন্ডল ১৯০
সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার
হরিপদ মহাপাত্র ১৯৭
কবিতার ভাষা: সমর সেন
খোকন বর্মন ২০২
পুরুষার্থ রূপে মোক্ষ : একটি আলোচনা
সত্যম রায় ২১৪
এক ব্যতিক্রমী নারীভাবনার কবি শামশের আনোয়ার
মোসাম্মত সামশুন নেহার ২২৩
বাংলা সাহিত্যে গাজি কাহিনি উদ্ভবে সামাজিক,
সংস্কৃতির মানস প্রয়োজন, সুফি ও সমন্বয়ী ভাবধারা
উমা বেরা ২৩১
সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ‘নতুন ফসল’ ট্রিলজি :
প্রসঙ্গ রাঢ়বঙ্গের আঞ্চলিকতা ও সংস্কৃতি
সুজিত মণ্ডল ২৪০
দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি : উৎপত্তি, বিস্তার ও অবসান
সুমন মুখার্জী ২৪৯

অনিতা অগ্নিহোত্রীর কথাসাহিত্যে প্রান্তিক জনজাতি
আনন্দ সাইনি ২৬১
বিশ শতকের সাতের দশকের বেকারত্ব ও *জন-অরণ্য* উপন্যাস
মৌমিতা দাস ২৬৯
লোকসাহিত্য বনাম শিশু সাহিত্যের ইতিকথা
শম্পা লাহা ২৭৮
কালকূটের কোথায় পাবো তারে উপন্যাসে মলুটীর ইতিবৃত্ত
সামিমা নাসরিন ২৮৯
গীতা অনুসারে, শান্তি লাভের উপায় অন্বেষণ
মানস মন্ডল ২৯৬
গুণময় মান্নার উপন্যাসে (নির্বাচিত) শ্রমজীবী জীবন ভাবনা
সুদীপ্ত মণ্ডল ৩০৩
‘গহিন গাঙ’ উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্বেষণ
স্বরূপ হালদার ৩১৪
চলচ্চিত্র ও বাঙালির সত্ত্বা নির্মাণ
সুপর্ণা কুণ্ডু চ্যাটার্জী ৩১৯
যন্ত্ররূপে জগত : একটি হাইডেগেরিয় অনুসন্ধান
সৌভিক ঘোষ ৩২৮
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘ডমরু-চরিত’: নিছক আড্ডা ও
উদ্ভট-ব্যঙ্গ-কৌতুক কাহিনি
দেবাশিস মণ্ডল ৩৩৬
ধর্ম ও সমাজ ভাবনায় আবুল বাশারের *ফুলবউ*
নন্দিতা পণ্ডিত ৩৫০
প্রমথ চৌধুরীর গল্পে ইউরোপীয় প্রসঙ্গ
স্বপন বর্মন ৩৫৬
প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ দেশভাগ ও মানুষের
বহুমাত্রিক বেদনার স্বর
বিদ্যুৎ সরকার ৩৬৬
ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রেক্ষাপটে সমাসপ্রকরণে
বৃত্তির তাৎপর্যালোচনা
সৌমিক পাল ৩৭৪
অন্তরমহল অন্বেষণে : রাসসুন্দরী দাসীর ‘আমার জীবন’
বনি দে ৩৮৪

ভূত নির্ভর বাংলা কথা সাহিত্যের ধারাপ্রবাহ
ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য ৩৯০
প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্বের সংকট ও যন্ত্রণাদগ্ধ
জীবনের বহুমাত্রিক পাঠ : প্রসঙ্গ 'মদনভেরি' উপন্যাস
যাদব মুরারী ৩৯৯
বৈষ্ণব পদাবলীর এক ভিন্ন স্বর : লোচনদাসের গৌরনাগরীভাবের পদাবলী
দেবাঙ্গনা দাস ৪০৬
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'শশাঙ্ক':
জাতীয়তাবোধের এক উজ্জ্বল নির্মাণ
তপন ঘোষ ৪১৫
রবীন্দ্র বীক্ষণে শেকসপিয়র
রাজদীপ দত্ত ৪২৪
শতবর্ষের নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস : মুসলমান সাহিত্যিকদের সৃজনে
কাজী মুজিবর রহমান ৪৩১
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের *দহন* : প্রতিবাদী নারী কণ্ঠ
তমা পাত্র ৪৩৮
সুন্দরবনের কাজের ভাষা, মেয়েদের ভাষা
প্রিয়াঙ্কা মিস্ত্রী ৪৪৯
সুফিবাদ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ
সেখ নূর আপসার ৪৬০
প্রান্তজনের জীবিকার টানাপোড়েন ও বিপন্ন জীবনের রোজনামচা :
প্রসঙ্গ 'সমুদ্র দুয়ার' উপন্যাস
রীতা মুরারী ৪৭০
হংসোপনিষদে প্রতিপাদিত হংসোপাসনা : ব্রহ্মবিদ্যালাভের
এক অনন্য উপায়
ব্রততী চক্রবর্তী ৪৭৮
রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ : অন্বিত সত্ত্বার সন্ধানে
কৌশিক চক্রবর্ত্তী ৪৮৬
আধুনিক সংবাদপত্রের প্রারম্ভিক পর্ব ও রামমোহন
ফিরোজ আলম ৫০২
স্বদেশী সঙ্গীত ও ঠাকুর পরিবারের প্রভাব : একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন
দেবলীনা ভট্টাচার্য্য ৫০৮

পাশ্চাত্য সাহিত্যচর্চায় বীতশোক ভট্টাচার্য
চম্পা মণ্ডল ৫১৭
রাজর্ষি থেকে বিসর্জন : সংরূপের একটি ভিন্ন পাঠ
ছোটন মণ্ডল ৫২৬
মধ্যযুগের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে নৌকা প্রসঙ্গ : পাঠভিত্তিক অন্বেষণ
রবিন রক্ষিত ৫৩২
হুগলী জেলার মগরা অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
সুকৃতি চক্রবর্তী ৫৪০
সমাজ বাস্তবতার আলোকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প
মাধুরী বিশ্বাস ৫৪৮
জীবন ও নৈতিকতার কৃষ্ণরূপ : প্রসঙ্গ শম্ভু মিত্রের ‘অতুলনীয় সম্বাদ’
অঙ্কিতা মুখার্জী ৫৫৮
অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাদর্শ : একটি পর্যালোচনা
বাসুদেব হালদার ৫৬৫
অরুণেশ ঘোষের কবিতায় পতিতা-প্রসঙ্গ: নারী স্বাধীনতার বিকল্প পাঠ
সৌরভ মজুমদার ৫৭৫
নারীর আত্মপরিচয়-সংকট ও উত্তরণ : প্রসঙ্গ তিলোত্তমা
মজুমদারের ‘আজও কন্যা’
সাধনকুমার সাহা
পূজা রায় ৫৮৭
উত্তরবঙ্গের কৃষক জীবনের দলিল : দেবেশ রায়ের ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’
তারকনাথ সাহা ৫৯৭
পশ্চিমবঙ্গে প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষা প্রসারে
রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা
রাজেশ বিশ্বাস ৬০৬
সৈয়দ সুলতানের ‘নবী বংশ’ : বাঙালীর মুসলমান
হয়ে ওঠার প্রথম প্রকল্প
যীশু দেবনাথ ৬১৪
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে রামমোহন রায়ের
কর্মজীবন এবং প্রসঙ্গ কোচবিহার ও ভুটান ভ্রমণ
অমিতেশ রায় ৬২৩

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর শিশুসাহিত্য : শিশুর জগৎ ও
সামাজিক ভাবনার নানা অনুষঙ্গ
অসীম আদক ৬৩৪
স্বাধীনতা পরবর্তী নির্বাচিত ছোটোগল্প ও কবিতায় দেশভাগ প্রসঙ্গ
অর্পিতা বোস ৬৪৬
নাট্যকার মনোজ বসু : প্লাবন
দেবজ্যোতি শীট ৬৫৪
ঊনবিংশ-বিংশ শতকে বাংলার আয়ুর্বেদ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ
অমৃতা চক্রবর্তী ৬৬৩
ব্রাহ্মনিজম ও অস্পৃশ্যতা : উৎস, বিকাশ ও বিবর্তন– ভারতীয়
সমাজ ও সাহিত্যের প্রেক্ষিতে
অজয় কুমার দাস ৬৭১
সময়ের দাবী পূরণে নাটক, প্রসঙ্গ: নীলদর্পণ
মো. তানবীর হাসান ৬৯৬
বাংলার গাজন উৎসব ও লোকধর্ম: পূর্বমেদিনীপুরের চাঁদিবেণীয়া
উৎকলিকা সাহু ৭০৬
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক
রূপা মণ্ডল ৭১৯
শ্রেনি চেতনা, শ্রেনি ঐক্য এবং বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) একটি
ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯০৫-১৯১১)
দীপ শঙ্কর নাইয়া ৭২৬
নিমাই ও নারী
সমীর মণ্ডল ৭৩৪
প্রয়োগভাবনায় বাংলা শ্রুতিনাটক
সঞ্চিতা মান্না ৭৩৯
“প্রকৃতিপাহাড় এবং সমতলের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা
যেন টেনে দিয়েছে”: বর্ষাবন বক্স্রাবন-এর কবি সুদীপ্ত মাজি
শর্মিষ্ঠা সিন্হা ৭৫৩
Rabindranath Tagore’s Concept of Nation State and
Nationalism: An Analysis
Rudra Prasad Roy ৭৬০

Camus *Myth of Sisyphus*: Follow or Revolt in
Syed Waliullah's *'Uzanne Mrityu'*
Fahmida Sultana Tanjee ৭৭২
Health Practices In Jungle Mahal: Nayagram area
Uttam Das ৭৭৯
Symbols and Images in *Sons and Lovers*
Arnab Mukherjee ৭৮৬
Violence and trauma in Toni Morrison's Beloved and Home
Madhulina Bauri
Amzed Hossain ৭৯২
Spread of Education in Poundra Society
of Bengal (1911-2011)
Krishna Kumar Sarkar ৭৯৯
Relevance of Yoga and its possible mechanism in human life
Swadhin Mondal ৮০৭
Effects of specific Yogic practices on
Selected Physical Fitness Components of college
girls having different levels of Anxiety
Mamata Malik
Kunal Sardar ৮১৭
An Investigation into the Attitude of Students of a
Secondary School towards the Study of Life Science and
their Achievement in it
Nabanita Majhi ৮২৬
India-Bangladesh Maritime Boundary and the
Problem of Dwellers of the Indian Sundarbans
Arabindu Sardar ৮৩২
Locating Contours of the Post-Partition
Resettlement and Identity Formation: Food Movement of
Coochbehar and Jalpaiguri
Prajna Paromita Podder ৮৪০

The Indian Self against the Colonial Mercantile Establishment: A Study of the Truant Boys Represented in Khagendranath Mitra's *Bhombol Sardar* and Rabindranath Tagore's "Atithi"
Ashis Biswas ৮৫০

PERCEPTION OF LEAENERS TOWARDS ROLE OF SOCIAL NETWORKING SITES IN PANDEMIC SITUATION
Ankur Nandi
Tapash Das
Tarini Halder ৮৫৬

Translation & the Nation-formation
Sougata Goswami ৮৭৫

"Jal, Jungle, Zameen": Birsa Munda's *Ulgulan* and Its Relevance in Contemporary India
Amrita Mondal ৮৮৪

সম্পাদকীয়

গন্তব্যই শেষ কথা। উপায় একাধিক। পছন্দ-অপছন্দের বেড়াজাল টপকাতে হয় অনেক সময়। একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আপনার সিদ্ধান্তই আপনার পথের বার্তাবহ। হাজার অলিগলি পেরিয়ে আপনি সিদ্ধান্তে উপনীত। আপনার চিন্তাভাবনার সঙ্গে অন্যরা তাদের মত মিলিয়ে নেওয়ার একটি সুযোগ খোঁজেন। সেই সুযোগের সন্ধান দেয় 'এবং প্রান্তিক'।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প : আঞ্চলিক পটভূমির বহুমাত্রিক বর্ণালি

কালীশঙ্কর রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ময়নাগুড়ি কলেজ

সারসংক্ষেপ : আধুনিক কথাসাহিত্য তথা ছোটগল্পে পটভূমি ঘটনা ও চরিত্রের নেপথ্যে স্থান-কাল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দর্পণ স্বরূপ। ছোটগল্পে ঘটনা চরিত্রকে বাস্তব রূপ দিতে নেপথ্য পটভূমির গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। ছোটগল্পে পটভূমি সাধারণত দু'প্রকারের যথা- ক) বাহ্যিক পটভূমি খ) মানসিক পটভূমি। নরেন্দ্রনাথ মিত্রও(১৯১৬-৭৫) তাঁর ছোটগল্পের পটভূমি হিসেবে যেমন বেছে নিয়েছেন নর-নারীর সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙ্গন; তেমনি উদ্বাস্তু জীবনের কঠিন লড়াই ভূমিতে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ জনিত অবক্ষয়, চাকরি নির্ভরতা, পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং চারপাশের নানা বৃত্তিজীবী মানুষ তাঁর ছোটগল্পের পটভূমি রূপে গৃহীত। তাঁর ছোটগল্পে পটভূমি দু'ভাগে বিন্যস্ত যেমন (১) পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক প্রতিবেশ (২) এপার বাংলার নাগরিক সমাজ। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আঞ্চলিক পটভূমি স্থাপিত 'পালঙ্ক' গল্পে দেশভাগ মানুষের মনোলোকে কী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা তিনি নান্দনিক সুষমায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এমনিভাবে 'পতাকা' গল্পে আঞ্চলিক পটভূমিতে পতাকা উত্তোলন ঘিরে প্রতিফলিত হয়েছে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত ও পিতা-কন্যার মতভেদ, 'আবরণ'-এ ফুটে উঠেছে বস্ত্র-সংকটের ভয়াল রূপ, 'সোহাগিনী'তে পরিস্ফুট হয়েছে তুফানীর প্রতি মতি মিঞার রোমান্টিক প্রেম এবং 'রস' গল্পে ব্যক্ত হয়েছে ফুলবানুর রূপ অপেক্ষা গুণের শিল্পী মাজুর কাছে মোতালেফের শোচনীয় পরাজয়ের কাহিনী।

সূচক শব্দ : বাহ্যিক পটভূমি, মানসিক পটভূমি, পূর্ব-বাংলার আঞ্চলিক প্রতিবেশ, এপার বাংলার নাগরিক সমাজ, শিল্প বাস্তব।

মূল আলোচনা :

আধুনিক কথা-সাহিত্যের অন্যতম শিল্পশাখা হল ছোটগল্প। আর কথাশিল্পের এই শিল্পরূপের অন্যান্য প্রকরণগত উপাদানের মধ্যে পটভূমি হল ঘটনা ও চরিত্রের নেপথ্যে স্থান-কাল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দর্পণ-স্বরূপ। ছোটগল্পে বিস্তৃত পটভূমি সৃষ্টির অবকাশ না থাকলেও ঘটনা, চরিত্রকে জীবনাশ্রয়ী ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পটভূমির তাৎপর্য অপরিসীম। বস্তুত, 'চরিত্র এবং ঘটনাকে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরে নিজে অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার মধ্যে পটভূমির সার্থকতা।'[১]

ছোটগল্পে ঘটনা যেমন উপস্থাপন নৈপুণ্যে জীবনমুখী, আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে; তেমনি চরিত্রগুলিও তাদের প্রাণবন্ত সংলাপ ও সক্রিয়তায় বাস্তবের প্রতিমূর্তি রূপে

শিল্পের দাবি পূর্ণ করে। আর এই ঘটনা ও চরিত্রের নেপথ্যে পটভূমির ভূমিকা প্রশ্নাতীত। ছোটগল্পে ঘটনার উৎসে চরিত্রগুলির অবস্থানই পটভূমি(Setting)-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কোন এক নির্দিষ্ট সময়-কাঠামোয় প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কাহিনি ও চরিত্র বিকশিত হয়ে ওঠে। ছোটগল্পের লেখক বর্ণনাশৈলী, লক্ষ্যমুখী চিন্তা-বিস্তার ও কল্পনাশক্তির মাধ্যমে নির্মাণ করেন পটভূমি ও প্রতিবেশ। তাই সমালোচকের এ-প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য হল,'পরিবেশের সূক্ষ্ম প্রভাব চরিত্রের উপর ক্রিয়াশীল। পাহাড়-পর্বত, সমতল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, শহর বা গ্রাম চরিত্রের আঞ্চলিক গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।'[২]

যে-কোনও ছোটগল্পে পটভূমি সাধারণত দু'ভাবে সক্রিয় থাকে। যথা :

ক) বাহ্যিক পটভূমি,

খ) মানসিক পটভূমি।

বাহ্যিক পটভূমির উপকরণ হল চরিত্রের পোষাক-আসাক, দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইত্যাদি বিষয় পরিস্ফুটনে প্রকৃতি-পরিবেশের উপাদান যেমন ব্যবহৃত হয়ে থাকে; তেমনি মানসিক পটভূমি, পরিবেশ বর্ণনার সংহত রূপ চরিত্রের মনোভঙ্গির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বর্তমানে চরিত্রের দ্বন্দ্বময়তা, বিকাশ ও বিন্যাসে মানসিক পটভূমির তাৎপর্য সাধারণত পরিস্ফুট হয়।

বাংলা কথাসাহিত্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র(১৯১৬-৭৫) তাঁর প্রায় পাঁচশো ছোটগল্পে বহু বিচিত্র বিষয় ও নান্দনিক বিন্যাস কলায় নিজস্বতার চিহ্ন মহাকালের রসিকের সামনে তুলে ধরেছেন। ফরিদপুর জেলার কুমার নদী ঘেঁষা সবুজ শান্তশ্রী সদরদি গ্রামে জীবনের আঠারটি বৎসর কাটিয়ে ১৯৩৫ সালে তিনি পাকাপাকিভাবে কলকাতায় আসেন। উপনিবেশ-উত্তর কলকাতার রূপ তখন নানা দিক থেকে উত্তাল এবং মৌন-মুখর। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী রুদ্ধশ্বাস আবহ, '৪৩-এর দুর্ভিক্ষে গ্রামবাংলা থেকে নগরবাংলার পথঘাট জুড়ে মৃত্যুমিছিল; অন্যদিকে, '৪৬-এ ধর্মের জাঁতাকলে বাঙালির বিভাজন, নতুন করে হিন্দু-মুসলমানের পরিচয় উপস্থাপনের চেষ্টা, সেই সুযোগে বিভেদকামী কায়েমি শক্তির প্ররোচনায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, অগণিত মানুষের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে দেশ-ত্যাগ, শরণার্থীর হয়ে ওঠা...এই সব মর্মবিদারক দেশ-কাল জারিত সাদা-কালো ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন কথাকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ছোটগল্প শিল্পী নরেন্দ্রনাথ, তাঁর মরমী লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই উত্তাল বিপন্ন সময়ের অভিঘাত, ভিত নড়ে যাওয়া হতভাগ্য নর-নারীর সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, বিচিত্র হৃদয়ানুভূতি, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন এবং স্মৃতি-কাতরতা। তাই, তাঁর ছোটগল্পের পটভূমিতে উদ্বাস্তু জীবনের বিবর্ণতা, ছিন্নমূল সত্তার যন্ত্রণা, মানুষের কঠিন লড়াই-সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধজনিত অবক্ষয়, চাকরি-নির্ভরতা, পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার জেদ ও মানসদ্বন্দ্বও

পরিস্ফুট হয়েছে। পারিপার্শ্বিক চেনা জগতের কবি, দালাল, যৌনকর্মী, গরিব চাষি, তাঁতি, ছুতোর, ডাক্তার, মাস্টার, নুলিয়া, মালাকার প্রভৃতি সমাজের নানা স্তরের বৃত্তিজীবী মানুষ তাঁর ছোটগল্পে উপস্থাপিত হয়েছে নিজস্ব প্রতিবেশের সম্পৃক্ততায়, যার ফলে এই জাতীয় ছোটগল্পের ভাববস্তু কিংবা চরিত্রের আত্মপরিচয়ের রহস্য বহুস্তর ও বহু বর্ণিল দ্যোতনা ছড়িয়েছে রসিকের মনে। এ-বিষয়ে তাঁর সচেতন মন্তব্য :'গ্রামের যারা নানা মাধ্যমের শিল্পী...তাদের কাউকে কাউকে আমি লেখার মধ্যে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি।'[৩]

তাঁর ছোটগল্পের পটভূমি দু'ভাবে বিন্যস্ত। যথা: এক. পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক প্রতিবেশ, দুই. এপার বাংলার নাগরিক পটভূমি, স্পষ্ট অর্থে কলকাতার নাগরিক সমাজ-পরিবেশ। কলকাতা শহরতলির ছিন্নমূল মানুষের জীবনের লড়াই-এ নরেন্দ্রনাথ পূর্ববাংলার প্রেক্ষিতকে গুরুত্বের সঙ্গে এঁকেছেন। তাই শ্রমিক, নর-নারী নির্বিশেষে করণিকের হৃদয়ালোকের টানাপোড়েনে স্মৃতির পিছুটানের সঙ্গে ঘটেছে নাগরিক অভিযোজন :'...আভরণে নাগরিকতার ঢাকনা সরলেই সে-দেশের ভূগোল, নদ-নদী সমেত ঢুকে পড়ে পাঠকের অন্তর্মহলে।'[৪] নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পমালার বিভিন্ন পটভূমি কখনো গল্পের ভাবসত্যকে নিটোল রূপে প্রকাশে সহায়তা করেছে, কখনো ঘটনা ও চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্বরূপ উন্মোচনে শিল্প বাস্তবের সজীব প্রেরণা-সূত্র হয়ে উঠেছে।

'পালঙ্ক'(১৯৫২), কথ্য ভাষায় পালঙ হল ধনী, সম্ভ্রান্ত মানুষের ব্যবহারযোগ্য মূল্যবান আসবাব। পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক পটভূমিতে অবতারণা করা এই গল্পের মুখ্য চরিত্র রাজমোহনের মাধ্যমে লেখক দেখাতে চেয়েছেন স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশ ভাগ মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি মানসিক ক্ষেত্রে কী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ভাগাভাগির ফলে অন্যান্য হিন্দুদের মতো রাজমোহনের ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনী দেশ ছাড়লেও, জমি গাছপালা ভিটেমাটির টানে তিনি গ্রামেই পড়ে থাকেন। তাঁর শিকড়ের টানের এই আসক্তি ধরা পড়ে নিজ হাতে পোঁতা দেবদারু গাছের দিকে তাকিয়ে করা আক্ষেপে : 'তুই আমার অনেক আপন দেবদারু। তোর হিন্দুস্থান-পাকিস্তান নাই। লেখাপড়া শিখা তুই পর হইয়া যাইস নাই।'[৫]

মানসিক এই বিষাদ নিয়ে একাকী দিনগুজরান করতে করতে পুত্রবধূ অসীমা, তার বিয়ের যৌতুক হিসেবে পাওয়া পালঙ্ক বিক্রি করে টাকা চাইলে দেশ-মাটি-পৈত্রিক সম্পত্তির প্রতি স্মৃতি-আসক্ত রাজমোহন অভিমানে যা বলেন, তার মধ্যে ব্যক্ত হয়ে আছে দেশভাগের সুপ্ত যন্ত্রণা, হতাশা, একবুক আক্ষেপ। এই উচ্চারণে স্পষ্ট হয়েছে দেশের সামাজিক পট, ভেদাভেদে রক্তাক্ত মন :'থাকবার মধ্যে আছে ওই পালং। ও জিনিস আর রাখব না।'[৬] নিজের দেশকে কে না ভালোবাসে ? মাটি ছেড়ে যেতে যেতেও দুঃখে অভিমানে গ্রামের গরিব মুসলমান মকবুলের কাছে সেই পালঙ্ক বিক্রির প্রস্তাব দেয়, কারণ পালঙ্কের মালিকানার বদল হলেও পটভূমি বা দেশ বদল হবে না : 'এর আগে হিন্দুরা কত খাট, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, বাসন বিক্রি করে গেছে।

জলের দামে মুন্সিরা কিনেছে...। এ সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না।'[৭] বস্তুত ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিশেষ প্রেক্ষাপটে গড়ে তোলা রাজমোহনের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার এক ভয়াবহ রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংবেদনে ফুটিয়ে তুললেন। যা, রাজনৈতিক বাস্তবতার সমান্তরাল সামাজিক-মনস্তত্ত্বের পটভূমিকে উচ্চকিত করেছে গাল্পিক পরিসরে।

পটভূমি চরিত্রের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক সমস্যার নানা রূপ ও ভঙ্গি কখনও তুলে ধরে, কখনও নেপথ্য ভূমিকা পালনে সক্রিয় থাকে। শেষপর্যন্ত পালঙ্কে শায়িত মকবুলের সন্তানদের মধ্যে রাধা-গোবিন্দ খুঁজে পাওয়ার ঘটনায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির একটা স্নিগ্ধ ছবি বিশেষ পটভূমিতে উপলব্ধি করে বিভাজিত রিক্ত আত্মার বেদনা জুড়াতে চেয়েছেন রাজমোহন। আঞ্চলিক পটভূমির বিশ্বস্ত রূপ চিত্রণে কথক সূচনাপর্বে গল্পের প্রধান চরিত্র রাজমোহনের প্রশস্ত উঠোনে বাঁশের আড়ে বাড়ির চাকর সহ কাঁচা পাট মেলে দেওয়ার ছবি তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে ছোট ডিঙ্গি নৌকো বেয়ে দুধের যোগান দিয়ে আসা মকবুলের হাতে ভিজে চিঠি দেখে রাজমোহনের উক্তি : 'দুধে জল মিশাইস বইলা চিঠিতেও জল মিশাইছিস? তোর সবেতেই জল...।'[৮] আঞ্চলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। লেখক নরেন্দ্রনাথ, রাজমোহনের পালঙ্কপ্রীতির প্রেক্ষিতে অবিভক্ত দেশের পটভূমির স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে, রোজ রোজ উই-ইঁদুরের উপদ্রব থেকে পালঙ্ক রক্ষা করা, গামছা দিয়ে পালঙ্কের ধুলো মোছার প্রসঙ্গ যেমন বিবৃত করেছেন, তেমনি অসীমার পালঙ্ক বিক্রির কথায় চরম অভিমানে চাকর কাউলাকে উদ্দেশ্য করে তার পালঙ্ক আদাড়ে ফেলে দেওয়ার ক্ষোভ, ও জিনিস ঘরে না রাখা এবং মকবুলকে তা নিয়ে যাবার কথায় স্পষ্ট হয়েছে তাঁর ঐতিহ্য-প্রীতির পটভূমি। পালঙ্কের ক্রেতা মকবুলের বাড়ির বর্ণনায় সমান্তরাল মাত্রায় আঞ্চলিক পটভূমির রূপ নিখুঁতভাবে পরিস্ফুট, যা নিরিবিলি গ্রামবাংলার চিত্রকে বিশ্বস্ত মাত্রায় পাঠকের সামনে বর্ণনা করেছেন গল্পকার নরেন্দ্রনাথ : 'রাজমোহনদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে ছোট একটা জংলা পোড়ো ভিটে, তার দক্ষিণে সরু একটা খাল...সেই খালের ওপাড়ে মকবুলদের বাড়ি।'[৯]

মকবুলের করোগেটেড টিনের চালে মরচে ধরা রং, বাঁশের বাখারির বেড়া, স্যাঁতস্যাঁতে উঠোন, খালের জল বাড়িতে ঢোকার আশঙ্কা ইত্যাদি খণ্ড খণ্ড দৃশ্যে তার দারিদ্র্যের করুণ রূপ স্পষ্ট, গল্প উপাদানের বিশ্বাসযোগ্য স্থানিক পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রাণময়তা। আবার আতাজদ্দির কাছে পালঙ্ক বিক্রির কথা শুনে রাজমোহনের মকবুলের বাড়ি যাওয়া এবং পালঙ্কের উপর রাধাগোবিন্দের মূর্তি দর্শনে তার সামন্ততান্ত্রিক দম্ভ থেকে মানবিক মূল্যবোধে উত্তরণে মানস-পটভূমি উন্মোচিত হয়েছে। বস্তুত, রাজমোহনের পালঙ্ক প্রীতিতে দেশভাগ পরবর্তী মানুষের রিক্ততা, শেষ সম্বল দু'হাতে আঁকড়ে ধরার মনোবৃত্তিওএই সব ঘটনাবলীর সূত্রে পাঠককে নিয়ে যায় ইতিহাসের বিগত বিপন্ন পরিবেশে ; তেমনি মকবুলের সঙ্গে রাজমোহনের মেলবন্ধনে

হিংসার উন্মত্ত আবহে মিলনের নতুন সম্ভাবনার দ্বারও খুলে রাখেন মানবিকতা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী গল্পকার নরেন্দ্রনাথ। তাই 'পালঙ্ক' গল্পের পটভূমি সূত্রে সমান্তরাল ভাবে ধরা চরিত্রমানসের বহু মাত্রিক অবস্থা ও অবস্থানের সঙ্গে লেখক নরেন্দ্রনাথের নিরাসক্ত বিবেকের অব্যক্ত গতি-প্রকৃতি।

'পতাকা'(১৯৪৬) গল্পে আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক মতাদর্শের ভেদাভেদ ও হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সংঘটিত সংঘাতচিত্র এবং পরিণামে সম্প্রীতি ভঙ্গের অনুরণন প্রতিফলিত হয়েছে। অখণ্ড বঙ্গে আবহমান কাল ধরে একসঙ্গে বসবাস করছে বাঙালি, তার ছিল না কোন ধর্মীয় পরিচয়। হঠাৎ রাজনীতির বোড়ে হয়ে উঠল বাঙালি, বিভাজিত হল তার পরিচয়, ধর্মে দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমান, সকলেই সকলকে 'আড়চোখে' দেখতে লাগল। ক্ষয়ে গেল সম্প্রীতি, সাম্প্রদায়িক জাতি-দাঙ্গা, হিংসার আবহে মানুষে-মানুষে চলল দিনে-রাতে 'বোঝাবুঝি'র পালা। গল্পে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শচীবিলাসের গ্রামের বাড়িতে স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে কংগ্রেস কর্মীরা সমবেত হয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি এই দিনটি উদযাপন করতে পারেননি, কারণ--'কখনো জেলে, কখনো বা অন্য কোন জেলায় এদিনটি তাকে কাটাতে হয়েছে।'[১০] কিন্তু এবার প্রতিবেশী মকবুল-মনসুরেরা তার এই উদ্যোগে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানপন্থী বলে তাদের সাফ কথা : 'ও নিশান আমাদের নয়, আমাদের নিশান চাঁদমার্কা লীগের নিশান।'[১১]

গল্পে শেষপর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান বিরোধের থেকে মুখ্য হয়ে উঠেছে পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক। শচীবিলাসের মেয়ে বামপন্থী। সে রাজনৈতিক মতভেদের জন্যই প্রেমিক নিরূপমকে প্রত্যাখ্যান করেছে।অন্যদিকে শচীবিলাসের রাজনীতি মানেই দেশসেবা। মেয়ের দৃঢ়চেতা মনোভাবে তার উপলব্ধি : 'এ যুগের রাজনীতি সর্বগ্রাসী।'[১২] শেষপর্যন্ত শচীবিলাস মেয়ের মধ্যস্থতায় স্বজনবাৎসল্যের দুর্বলতায় মুসলমানদের চটানে পতাকা উত্তোলন করেন নি। দলীয় মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে পিতা-কন্যার সম্পর্কের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক আবহে একই সঙ্গে পরিস্ফুট হল হিন্দু-মুসলমানের মূর্খ আত্মঘাতী প্রবণতার সঙ্গে বাঙালির মানসভূমির সহনশীলতা, উর্বরতা।

গল্পে আঞ্চলিক পটভূমির রূপ ফুটিয়ে তুলতে লেখক- পতাকা উত্তোলনের জন্য ঝাড় থেকে তলতা বাঁশ কাটা, দা দিয়ে ছোট ছোট গিঁটগুলি চাছা, পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে শচীবিলাসবাবুর বন্ধুদের গ্রামে আমন্ত্রণ, সর্বস্তরের গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে স্বাধীনতার অনুষ্ঠানে মেতে ওঠার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি ঘটনা ধারায় আঞ্চলিক পটভূমির সঙ্গে সক্রিয় চরিত্র-- শচীবিলাসবাবুর মনস্তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়েছে। শচীবিলাসের বন্ধুদের সঙ্গে তার মেয়ে ইন্দিরার রাজনৈতিক বিতর্ক, বামপন্থী ইন্দিরার সঙ্গে কংগ্রেস মতাদর্শে বিশ্বাসী পিতার রাজনৈতিক মতভেদ, সামান্য মতপার্থক্যের কারণে ইন্দিরার বামপন্থী প্রেমিক নিরূপমকে প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি ঘটনায় ইন্দিরার রাজনৈতিক দৃঢ়চেতা মনোবৃত্তির স্বরূপ পটভূমির মাধ্যমে সুচারুভাবে ব্যক্ত হয়েছে। পতাকা উত্তোলনের স্থান হিসেবে সেখেদের চটানের উল্লেখ, সংকল্পবাক্য পাঠের পরিকল্পনা, অনেক রাতে চিৎকারে

শচীবিলাসের ঘুম ভাঙা, পতাকা উত্তোলনে মকবুল-মনসুরদের বাধা প্রদান, উত্তেজিত জনতাকে শচীবিলাস ও ইন্দিরার যৌথভাবে শান্ত করার চেষ্টা, ইন্দিরার মধ্যস্থতায় শান্তির বাতাবরণ ফেরা প্রভৃতি ঘটনায় সম্প্রীতিভঙ্গের আতঙ্কিত রূপ উন্মোচনে 'পটভূমি' হয়ে উঠেছে বিশেষ অনুঘটক। সেই সঙ্গে পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক স্থাপনেও পটভূমি সাবলীল ভূমিকা পালন করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী দুর্ভিক্ষ ও বস্ত্র সংকট গ্রামবাংলার মানুষের জীবনে চরম অভিশাপ ডেকে এনেছিল। সেই সন্ধিক্ষণে নরেন্দ্রনাথ মিত্র বংশী ও চাঁপার পরিবারের বস্ত্র সংকটকে আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে 'আবরণ'(১৯৪৫)-এ শিল্পীর মরমী দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। যাতে তৎকালীন সামাজিক বৃহত্তর সমস্যার রূপ গল্পের মূল চরিত্র বংশী ও চাঁপার মাধ্যমে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় আভাসিত। বস্ত্র সংকটের কবলে পড়া চাঁপার লজ্জা নিবারণের কাপড় সংগ্রহের চেষ্টায় বংশীর পতিতা পল্লীতে ঢুকে শাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টায় সুখদা তাকে জাপটে ধরে এবং তার সিফিলিস আক্রান্ত নগ্ন শরীরে দগদগে ঘা দেখে বংশীর কাপড় ছুঁড়ে দিয়ে পালানোর মধ্যে উন্মোচিত হয়েছে অবক্ষয়িত মনুষ্যত্বের রূপ ও বিপন্ন মানুষের অস্তিত্বের সংকট। ঘোর দারিদ্র্য যে সব সময় মানুষের মঙ্গলবোধ, সুস্থ চেতনাকে বিনষ্ট করতে পারে না, সেই ভাবনা আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে 'আবরণ'-এ ফুটে উঠেছে। গল্পে দুর্ভিক্ষ ও বস্ত্র সংকটের ভয়াল রূপ-চিত্রণে আঞ্চলিক পটভূমির উপকরণ হিসেবে কথক কৃষিজীবী বংশীর দুপুরবেলা পাটের ক্ষেত নিড়ানোর কথা সূচনায় উল্লেখ করেছেন :'পাটের ক্ষেত নিড়িয়ে দুপুর রোদে বাড়ি ফিরে এসে বংশী দেখল ঘরের ঝাঁপ ভেতর থেকে বন্ধ।'[১৩] তেমনি চাঁপা বস্ত্রাভাবে ঘরে নেংটা হয়ে ছেঁড়া ময়লা কাপড় গায়ে দিয়ে বন্ধ ঘরে থাকে। বাংলা দেশে চল্লিশের মন্বন্তর-পরবর্তী বস্ত্রাভাবের পটভূমি সকরুণ অথচ সজীব মাত্রা পেয়েছে চাঁপার অভিমানী স্বরাঘাতে : '...সোয়ামীর আমার কেরামতি কতখানি। ভাত-কাপড়ের কেউ নয়, কেবল পীরিতের গোঁসাই।'[১৪]

স্বামীর উদ্দেশ্যে এই ব্যঙ্গ, গলায় দড়ি দিয়ে মরার কথা উচ্চারণ...বস্তুত সমকালীন বাংলা দেশের অনিশ্চিত আর্থ-সামাজিক পটভূমির ঘোর সংকট(crisis)-কে একদিকে কঠিন বাস্তবতায় তুলে ধরে, অন্যদিকে শিল্প-বাস্তবে তা রূপায়ণের স্বতঃস্ফূর্ত উপাদান হয়ে ওঠে। বংশী নিজে ন্যাকড়া-ট্যাকরা পরে থাকলেও চাপার জন্য ভাবনা, কলসী ভরে জল আনতে গিয়ে চাঁপার কাপড় রঞ্জে-রঞ্জে খসে পড়া এবং ঘুমন্ত অবস্থায় তার ময়লা কাঁথা পায়ের কাছে লুটোনো ইত্যাদির চিত্রে বস্ত্রাভাবের লজ্জাকর পটভূমি, শোচনীয় পরিস্থিতি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে করুণ বাস্তবতার ভর ও বেগ; জাগিয়ে রাখে একবুক হতাশা— ধরা পড়ে নর-নারীর বিপন্ন অস্তিত্বের স্বরূপ, নিখাদ অসহায়তা। যেমন :'পলকের জন্য সেই নিরাবরণ নারীদেহের দিকে তাকিয়ে বংশী চোখ ফিরিয়ে নিল।'[১৫]

কাপড়ের সন্ধানে বংশীর গুপীগঞ্জের হাটে পৌঁছনো এবং পাড়া-গাঁ-ঘেষা সেই হাটে দোকানীদের কাছে কাপড়ের আবদার, পরিণামে জোটে রকমারি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ--- 'আমি গড়িয়ে দেবো, না? কাপড় কিনতে হয় গরমেনটের কাছে যা, থানায় যা, জজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যা।'[১৬] স্ত্রীর কথা ভেবে বংশীর কুণ্ঠিত দশা, হাঁটতে-হাঁটতে গঞ্জের উত্তর প্রান্তে কলাবাগানের পাশে পতিতা সুখদার সাথে সাক্ষাতে তার শাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত সিফিলিস আক্রান্ত শরীরে দগ-দগে ঘা দেখে কাপড় ছুঁড়ে দেওয়ার মতো বিচিত্র ঘটনার প্রেক্ষাপটে বংশীর পরিবারের বস্ত্র সংকটের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার বাস্তবতা, তন্ময় সত্যে উত্তীর্ণ হয়েছে গল্পকার নরেন্দ্রনাথের দেশ-কাল তথা প্রেক্ষিত সচেতন শিল্পিত মনের প্রক্ষেপে।

মানুষের সুন্দর হৃদয় আছে বলেই পৃথিবীতে অনুভূত হয় প্রেম, ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার রূপ, আবেগ, মূল্য--- জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে। এই ধারার ছোটগল্প হল 'সোহাগিনী'(১৯৫৭)। যুগে-যুগে ভালোবাসার সন্ধানে ফেরা মানুষ, প্রিয়জনকে ভালোবেসে কখনও কখনও আঘাত পায়, তবু একে অপরকে ভালোবাসে মানুষ। মানসভূমিতে জায়মান চিরন্তন ভালোবাসার এই রূপ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, একটু ভিন্ন আঙ্গিকে চণ্ডীপুর গ্রামের আঞ্চলিক পটভূমিকায় প্রান্তিক কৃষক মতি মিঞার দৃষ্টিকোণে উপস্থাপিত করেছেন। গল্পে মতি মিঞা, মবদুল ও বিহারী মন্ডলের লক্ষ্মীদীঘা ধান কাটার সময় স্ত্রীর প্রসব ব্যথায় মকবুলের মন বিষণ্ন হয়ে ওঠে এবং তা নিয়ে বিহারী করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ : 'আইজ আর ওয়ারে চাঙ্গা করতে পারবা না। আইজ ওয়ার বিবির ব্যথা ওঠছে।'[১৭] মতি মিঞা নিজের জীবনের কাহিনি গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করার সূত্রে এই গল্পের আঙ্গিকে উৎসারিত হয়েছে সুন্দরী যুবতী তুফানীর প্রতি তার একনিষ্ঠ ভালোবাসা, আবেগ ও স্বপ্ন। মিস্ত্রি বনমালী ভক্তের সঙ্গে ভালোবাসার মানুষের বিয়ে হলেও তাকে নিয়ে সে স্বপ্নের ইমারত গড়েছে। স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হয়ে জীবনসঙ্গিনী করতে চেয়েছে তুফানীকে। তাই মুখ নয়, তার চুলের বর্ণনায় ফুটেছে উথাল-পাতাল মনোভূমির আকাশ :'চুল তো না আষাঢ় মাইসা আকাশ ছাওয়া মেঘ। দেইখা চোউখ জুড়াইয়া যায়।'[১৮] শেষপর্যন্ত বনমালীর সন্দেহ ও নির্মম আঘাতে তুফানীর অকাল মৃত্যুতে মতির হাহাকার, শূন্যতা আঞ্চলিক পটে অনন্য মাত্রা পেয়েছে। গল্পে তুফানীর প্রতি মতি মিঞার রূপজ আসক্তি ফুটিয়ে তুলতে কথক, নারীর বাহ্যিকরূপের উপাদান ব্যবহার করেছেন-- 'শিরায়-শিরায় রক্তের তুফান ছুটানো' মন অবুঝ হয়ে ওঠা, তুফানীর টুকটুকে রঙ, টানা-টানা চোখ, পাতলা ঠোঁট, সাদা ফুলের মতো দাঁতের সারি, তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে :'তার হাসি দেখতে, মুখ দেখতে বড় ভালো লাগে মতি মিঞার।'[১৯] বীরপুর গ্রামের মিস্ত্রী বনমালী ভক্তের পরিচয় প্রসঙ্গে তার চাষের জমির উল্লেখ, তুফানীর সঙ্গে তার বিয়ের পর দাম্পত্য অশান্তির চিত্র পরিস্ফুটনে তার বেশি বয়সের বর্ণনা, নেশাভাঙ করা এবং রাঁড় রাখার ছবি তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তাদের এই দাম্পত্য-কলহে মতির আনন্দ, তুফানীর তাকে দূরে ঠেলে দেওয়া

এই বিশেষ পটভূমিতে অম্ল-মধুর মাত্রা লাভ করেছে : 'আইস না, আইস না। ভালো বাইস না, বাইস না। জাইত মান নিয়া আমারে শান্তিতে থাকতে দাও।'[২০]

মতির বাবা তাকে বিয়ে করতে বললে তার 'সবুর বাজান', 'দুইটা পয়সার মুখ দেইখা' নেওয়ার কথায় মতির বিরহ-কাতর মনস্তত্ত্বের অন্তর্লীন রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তুফানীর প্রতি তার আকর্ষণ প্রসঙ্গে কথক চৈত্রের মাঠের মতো তার বুক খাঁ-খাঁ করা, জোয়ারের গাঙের মতো উছলে ওঠা ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপমা ব্যবহার করেছেন, যা পটভূমির উপকরণ হিসেবে তার প্রেমোচ্ছল মনের সাবলীল আবহ পরিস্ফুট করেছে। নিজের খ্যাতি তুফানীর শ্বশুরবাড়ি এবং তুফানীর কানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মতির বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, পুরস্কার প্রাপ্তি এবং আহত মতিকে তুফানীর দেখতে আসা, ওর মুখের পাকা ধানের রং দু'চোখ ভরে দেখা, 'সব পেয়েছি'র অনুভুতি এবং কাছে টেনে নেওয়ায় ধরা পড়ে নর-নারীর বিরহ-বিধুর চিরন্তন হৃদয়ের আলেখ্য :'এতদিন আমি কেবল দূর থিকাই দেইখা আইছি। ধরি নাই, ছুঁই নাই, সোয়াদ পাই নাই। আমি যেন পাকা বেলের কাছে কাউয়া হইয়া রইছি।'[২১]

বস্তুত প্রাকৃতিক ও মানসিক পটভূমি সাযুজ্যে এই গল্পে মতি মিঞার দুর্নিবার প্রেম চিত্র সজীব মাত্রা পেয়েছে। সেই প্রেমকথা, বনমালীর কানে যাওয়ায় তুফানীকে গর্ভাবস্থায় লাথি মারে সে, তুফানীর ঘটে অকাল মৃত্যু এবং শ্মশানঘাটে শোকে কাতর বনমালী ও মতির দেখা হয় :'তুফানীর চিতা নেবল কিন্তু আমরা দুইজন জ্বলতে লাগলাম।' তুফানীর প্রতি কৃষক মতি মিঞার হার্দিক ভালোবাসা স্থান-কালের ঊর্ধ্বে উঠে প্রতিবিম্বিত করেছে তার চিরন্তন প্রেমিক হৃদয়ের বিধুরতা। যা শ্মশানের পটভূমিতে গাঢ় মাত্রা পেয়েছে রসিকের কৌতূহলী অন্তরে।

'রস'(১৯৪৭)-এ 'গাছি' (গ্রামবাংলায় যারা মরশুম অনুযায়ী তাল, খেজুর ইত্যাদি গাছ কেটে রস সংগ্রহ করে) পেশার অ আ ক খ তথা গেছুরেদের জীবন-বাস্তবতা পরিস্ফুট করেছেন ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র গ্রামীণ প্রেক্ষিতে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'গাছি' বৃত্তিজীবী মোতালেফ, ফুলবানুর প্রতি রূপাসক্তি অপেক্ষা পরিণামে গুড়-বিক্রেতা হিসাবে সমাজে সম্মান ও সুখ্যাতি নিয়ে বাঁচার তাগিদে তার তালাক দেওয়া একদা বিবি মাজুর সুস্বাদু গুড়তৈরি গুণের কদর করে শেষপর্যন্ত। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে মোতালেফের গেছুড়ে সত্তার স্বরূপ উদ্ভাসিত করেছেন গল্পকার নরেন্দ্রনাথ, গ্রামীণ পটভূমির যথাযথ সংস্থানে(Setting)।এ-প্রসঙ্গে স্বয়ং লেখকের স্বীকারোক্তি :'এ গল্পের যে পটভূমি তা আমার খুবই পরিচিত...আমার চিরচেনা এই পরিবেশ থেকে রস গল্পটি বেরিয়ে এসেছে।'[২২] 'গাছি' মোতালেফের পেশার স্বরূপ সামগ্রিক ভাবে উন্মোচনে লেখক নরেন্দ্রনাথ এই পেশা সম্পৃক্ত খেজুর বাগান, গাছ কাটার জন্য ছ্যানের প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন গল্পের শৈলীতে: 'হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুর গাছের ভিতর থেকে মিষ্টি রস চুঁইয়ে পড়ে।'[২৩] 'গাছি' পেশার বিশ্বস্ত

পটভূমি নির্মাণে লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার বিরল ঝাঁপি মেলে ধরেছেন সহৃদয় সামাজিকের সামনে-- খেজুর গাছ কেটে রস ধরার হাঁড়ি বাঁধা, বাঁশের বাখারিতে বয়ে আনা, উনান কেটে জ্বালানি সংগ্রহ এবং রস জ্বাল দিয়ে পাটালি গুড় তৈরি ইত্যাদি ঘটনা-চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন ‘গাছি’ বৃত্তিজীবী মোতালেফের নিজস্ব পেশার স্বরূপ।

মোতালেফের দাম্পত্য-সম্পর্কে আছে নানা রঙের ছোঁয়া। তার জীবনে এসেছে— রস থেকে গুড় তৈরিতে দক্ষ মাজুখাতুন ও নজরকাড়া রূপসী যুবতী ফুলবানু। তার জীবন-নদীতে এই দুই নারী জোয়ার-ভাটার মতো আন্দোলিত হয়েছে, আবেগে ও বিষণ্নতায়। প্রেমিক মোতালেফের সেই অব্যক্ত প্রেম-মনস্তত্ত্বের নানা মাত্রা নরেন্দ্রনাথ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে উপযুক্ত সাহিত্যিক প্রকরণ ব্যবহার করে বাস্তবতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে হরফ-শিল্পে প্রকাশ করেছেন : ‘তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি আর নাস্তার কালে গুড়, তোমার সঙ্গে তাগো তুলনা?’[২৪] শীতের মরসুমে মাজুখাতুনের উঠান হাঁড়িতে ভরে ওঠা, পাটালি গুড় তৈরির পর মোতালেফের হাটে-হাটে বিক্রির পটভূমি, শিল্প-বাস্তবের মাটি স্পর্শ করেছে। সেই সঙ্গে সকালে রসের হাঁড়ি নামিয়ে চোঙ্গা বেঁধে দেওয়া, বিকেলে গাছ চেঁছে হাঁড়ি পাতা এবং চোঙার ময়লা রস দিয়ে চিটেগুড় তৈরির ঘটনা বিন্যাস আঞ্চলিক পটভূমিতে ‘গাছি’ মোতালেফের পেশা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গল্পে অক্লান্ত পরিশ্রমী মোতালেফের গাছি-সত্তার মৌলিকতা ধরা পড়েছে প্রাকৃতিক পটভূমিতে : ‘পৌষের শীতেও... রোমশ বুকের মধ্যে ঘামের ফোঁটা চিক্-চিক্ করে।’[২৫] মোতালেফ, মাজুকে তালাক দিলে মাজুর খেদোক্তিতেও পেশাশ্রয়ী উপমা ব্যবহারে তার বেদনাহত মনস্তত্ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার নরেন্দ্রনাথ :‘গুড়ের সময় পিঁপড়ার মত লাইগা ছিলা, আর গুড় যাই ফুরাইল অমনি দূর-দূর।’[২৬]

ফুলবানু প্রসঙ্গেও মোতালেফের জবানীতে প্রাকৃতিক পটভূমি ব্যবহারে ফুলজানের অনিঃশেষ যৌবন ঢল-ঢল রূপ নান্দনিক মাত্রায় উত্তীর্ণ :‘গাছির কাছেও যে গাছের রস দুই-চাইর মাসেই ফুরায় ফুলজান, কেবল তোমার রসই বছরে বারোমাস চোঁয়াইয়া-চোঁয়াইয়া পড়ে।’[২৭] বিশেষ আঞ্চলিক পেশাশ্রিত পটভূমিতে স্থাপিত মোতালেফ, মাজু ও ফুলবানু যতটা জীবনরস সমৃদ্ধ, সাবলীল, সেই চরিত্রগুলি ভিন্ন পটভূমিতে ততটা প্রাণময় হোত না। ফুলবানুর রূপজ মোহ থেকে বাঁচার রসদ সংগ্রহে মোতালেফের শেষপর্যন্ত মাজুর গুণের কাছে নতিস্বীকারে আঞ্চলিক পটভূমি শিল্প-বাস্তবে গল্পরস ও চরিত্রের অন্তর্লীন রহস্যকে আবিষ্কার করেছেন নরনারীর হৃদয়-রসের সন্ধানী রূপদক্ষ শিল্পী নরেন্দ্রনাথ।

বস্তুত, নরেন্দ্রনাথকে যতই নাগরিক মধ্যবিত্তের গল্পকার হিসাবে চিহ্নিত করা হোক না কেন, নিবিড় পাঠে কখনও কখনও ঠিকরে বেরিয়ে আসে গ্রাম-বাংলার প্রেক্ষিত, চরিত্র, ঘটনা, রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কারের মাধ্যমে একদিকে বহির্বাস্তবের বৈচিত্র্য; অন্যদিকে অচেনা জীবন-রহস্যের রকমারি অনুরণন। নানা স্তরের ও ভঙ্গির

উঁচু-নিচু স্বরাঘাত। সেই সূত্রে তিনি হয়ে উঠেন কালান্তরিত ছক-ভাঙা ছোটগল্পের এক অনন্য স্রস্টা।

তথ্যসূত্র :

১. অলোক রায়, সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, সাহিত্যলোক, ২০১৫, পৃ. ১০৫
২. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, পৃ. ৬২
৩. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আত্মকথা, গল্পমালা(২য় খণ্ড), আনন্দ, ২০১১, পৃ. ১৩
৪. মনন কুমার মন্ডল, স্মৃতির পিছুটান, নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংখ্যা, উজাগর, ২০১২, পৃ. ৬২
৫. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা(১ম খণ্ড), আনন্দ, ১৯৯৯, পৃ. ২৪৩
৬. তদেব, পৃ. ২৪৫
৭. তদেব, পৃ. ২৪৭
৮. তদেব, পৃ. ২৪৪
৯. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা(৩য় খণ্ড), আনন্দ, ২০১৫, পৃ. ৪২
১০. তদেব, পৃ. ৪৬
১১. তদেব, পৃ. ৪৩
১২. তদেব, পৃ. ৩০
১৩. তদেব, পৃ. ৩০
১৪. তদেব, পৃ. ৩১
১৫. তদেব, পৃ. ৩২
১৬. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা(১ম খণ্ড), আনন্দ, ১৯৯৯, পৃ. ৩৯০
১৭. তদেব, পৃ. ৩৯৯
১৮. তদেব, পৃ. ৩৯২
১৯. তদেব, পৃ. ৩৯৩
২০. তদেব, পৃ. ৩৯৮
২১. তদেব, পৃ. ৪০০
২২. তদেব, পৃ. ১০
২৩. তদেব, পৃ. ৬৭
২৪. তদেব, পৃ. ৬৯
২৫. তদেব, পৃ. ৭০
২৬. তদেব, পৃ. ৭১
২৭. তদেব, পৃ. ৭১

সহায়কগ্রন্থ:

১) চক্রবর্তী জয়া - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কথা সাহিত্য, এবং মুশায়েরা, ২০১৫।

২) চক্রবর্তী সাবিত্রী নন্দ - আধুনিক বাংলা ছোটগল্প মূল্যবোধের সংকট, পুস্তকবিপণি,২০০৪।

৩) দত্ত বীরেন্দ্র - বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, কলকাতা, ১৯৮৫।

৪) বসু সমীর (সম্পাদিত) - প্রসঙ্গ : নরেন্দ্রনাথ মিত্র, কলকাতা, ২০০১।

৫) ভট্টাচার্য অঞ্জুশ্রী - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবন ও সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৪।

৬) সরকার মঞ্জু - নারী উপন্যাসের শৈলী বিচার, কমলিনী পাবলিশার্স, ২০১৪।

সাময়িক পত্রিকা :

পুরকাইত উত্তম (সম্পাদিত), নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংখ্যা, উলুবেড়িয়া হাওড়া, ১৪১৯।

উত্তর-উপনিবেশবাদ ও বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যভাষা

ফণিভূষণ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সেন্ট জোসেফ'স কলেজ, দার্জিলিং

সারসংক্ষেপ (Abstract) : উত্তর-উপনিবেশবাদের (Post-colonialism) উদ্ভব হয়েছিল উপনিবেশবাদের (Colonialism) ভেতর দিয়েই এবং তার বিস্তার ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরবর্তী একটা বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। কিন্তু উপনিবেশবাদ হঠাৎই গড়ে ওঠেনি, সাম্রাজ্যবাদের (Imperialism) হাত ধরে বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ (Coloni) গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই উপনিবেশবাদের জন্ম হয়েছিল। আমরা প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভে প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই কীভাবে আমাদের ভারতীয় পরিসরে উপনিবেশবাদের ভেতর দিয়েই উত্তর-উপনিবেশবাদ গড়ে উঠেছিল এবং তার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্বরূপ কেমন ছিল ? চারের দশকের গোড়ায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের হাত ধরে বাংলা থিয়েটার যখন নতুন অভিমুখে বাঁক নিচ্ছে, ঠিক সেই সন্ধিলগ্নে নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্যের (১৯১৫ - '৭৮) আবির্ভাব। তিনি কোনো প্রচলিত নাট্যরীতির অনুসরণে নাটক রচনা করেননি, বরং 'সাংস্কৃতিক বামপন্থা'-র মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উপনিবেশকদের ফলে গড়ে ওঠা ভঙ্গুর নাগরিক জীবন থেকে সরে এসে রাজনীতি-সর্বস্ব শিল্পকর্মের মধ্যে নাটককে সীমাবদ্ধ না রেখে উত্তর-উপনিবেশবাদের প্রেক্ষিতে লোকায়ত মানুষ ও তাদের সংস্কৃতিকে (বিষয় ও আঙ্গিক উভয় ক্ষেত্রেই) নাটকের কেন্দ্রে এনে এক বিকল্প নাট্যভাষা নির্মাণ করেছিলেন। আমাদের অভিসন্দর্ভে আমরা দেখে নিতে চাই ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রচলিত নাট্যরীতির বাইরে 'in my own way'-তে নাটকের মধ্যে উত্তর-উপনিবেশবাদের বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে লোকায়ত জনসাধারণকে 'how to express myself'-এর তাগিদে তিনি কীভাবে নিজস্ব এবং নতুন এক নাট্যভাষা নির্মাণ করেছিলেন ?

সূচক শব্দ (Key Word) : উত্তর-উপনিবেশবাদ, বিজন ভট্টাচার্য, লোকায়ত সংস্কৃতি, বিকল্প নাট্যভাষা, সাংস্কৃতিক বামপন্থা

মূল আলোচনা (Discussion) :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে উত্তর-উপনিবেশবাদ (Post-colonialism) শব্দবন্ধের মধ্যে নিহিত ছিল কালসূচক ইঙ্গিত, মূলত উপনিবেশ এবং ঔপনিবেশিক শাসকের শোষণ ও শাসনের হাত থেকে মুক্তির অভিজ্ঞতাকে চিহ্নিত করতে তা ব্যবহার করা হত। যদিও

এই কালসূচক অর্থে শব্দবন্ধটির ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং দীর্ঘ ঔপনিবেশিক সময় পর্বে যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে উপনিবেশিত মানুষের দিনাতিপাত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে নিজেদের পরিচয় স্থাপনের লড়াই বোঝাতেও তার ব্যবহার, সাতের দশকে এসে নানান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তাত্ত্বিক ও সমালোচক তা বোঝাতে চাইলেন। বিশেষত ঔপনিবেশিকতার রাজনীতির বিরুদ্ধ রাজনীতিই যে উত্তর-উপনিবেশবাদ সে-কথা প্রথম আমাদের ধরিয়ে দেন রবার্ট ইয়ং : "Postcolonialism names a politics and philosophy of activism that contests the disparity, and so continues in a new way the anti-colonial struggles of the past."[১] ব্যাপক অর্থেই ইয়ং কথাটি ব্যবহার করতে চেয়েছেন, কেননা উত্তর-উপনিবেশবাদকে তিনি উপনিবেশভাবনা বিরোধী একটা বৈপ্লবিক কার্য-প্রণালীর প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। তাই উত্তর-উপনিবেশবাদ একটি সক্রিয় রাজনীতি ও দর্শন। বর্তমানে ঔপনিবেশিক শাসন সরাসরি না থাকলেও তার মানসিকতা আজও ক্ষমতার নানান স্তরে প্রচ্ছন্নভাবে সক্রিয়। তাই ইয়ং মনে করিয়ে দেন : "Postcolonialism is about a changing world, a world that has been changed by struggle and which it's practitioners intended to change further."[২]

পনেরো শতক থেকেই ইউরোপের দেশগুলি নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের তাগিদে একেরপর এক উপনিবেশ নিজেদের দখলে অধিগ্রহণ করতে শুরু করে। তারা অধীনস্থ দেশগুলির অর্থনীতি শুষে নিতে থাকে এবং নিজেদের সংস্কৃতিকে জোর করে চাপিয়ে দিতে শুরু করে। এডওয়ার্ড সাইদ তাঁর *Culture and Imperialism* গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জানিয়েছেন : "As I shall be using the term, 'imperialism' means the practice, the theory and the attitudes of a dominating metropolitan center ruling a distant territory; 'colonialism', which is almost always a consequence of imperialism, is the implanting of settlements on distant territory... In our time, direct colonialism has largely ended, imperialism ... lingers where it has always been, in a kind of general cultural sphere as well as in specific political, ideological, economic and social practices."[৩] সাইদের উপরি-উক্ত বয়ান থেকে স্পষ্ট যে, সাম্রাজ্যবাদের ফলস্বরূপ উপনিবেশবাদ দূরবর্তী দেশে উপনিবেশ (Coloni) স্থাপনের মধ্য দিয়েই তার আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উপনিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও পরোক্ষে তার শিকড়-বাকড় ছড়িয়ে রয়েছে নানাভাবে। এই উপনিবেশবাদের মধ্য দিয়েই উত্তর-উপনিবেশবাদ গড়ে উঠেছে।

উত্তর-উপনিবেশবাদ বলতে আমরা চিন্তা ও বিশ্লেষণের এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গীকে বোঝার চেষ্টা করবো যে, যার গভীরে রয়েছে এমন একটা বিশ্বাস যেখানে ঔপনিবেশিকতার প্রভাব বাদ দিয়ে বর্তমান সময়ের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা সম্ভব নয়। পনেরো শতক থেকে শুরু হলেও আঠারো শতক থেকে বিশের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বিশ্বের বহু দেশ ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণে পরাধীন জাতি হিসাবে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময় ধরে পরাধীনতার যন্ত্রণা ও ঔপনিবেশিক শাসকের শাসন-শোষণ উপনিবেশিত মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি, শিক্ষা, চিন্তন ও মননশীলতায় ভীষণভাবে ছাপ রেখে গেছে এবং উপনিবেশের অবসানেও সেই ছাপ কোনো না কোনোভাবে থেকে গেছে আজও। কিন্তু সেই ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও রাজনীতির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে উত্তর-উপনিবেশবাদের হাত ধরে নানান বিকল্প পথও খোঁজার চেষ্টা নিরন্তর চলেছে আমাদের সংস্কৃতিতে। এই ভাবনাসূত্রকে মাথায় রেখে আমরা যদি বাংলা থিয়েটারে বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যভাবনার দিকে চোখ ফেরাই তাহলে দেখতে পাবো যে, কীভাবে তিনি থিয়েটারের একটা অলটারনেটিভ ডিসকোর্স তৈরি করেছিলেন নিজের দেশের লোকায়ত মানুষ এবং তাদের সংস্কৃতিকে সামনে রেখে।

এক

বিজন ভট্টাচার্যের জীবনের প্রায় অর্ধেকটা (১৯১৫ - '৪৭) কেটেছে পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ও উপনিবেশবাদের প্রেক্ষাপটে, আর বাকি জীবন (১৯৪৮ - '৭৮) অতিবাহিত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর সময়পর্বের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও উত্তর-উপনিবেশবাদের মধ্য দিয়ে। আবার তাঁর ছেলেবেলা (১৯১৫ - '২৯) কেটেছে পদ্মাপারের বৃহত্তর লোকায়ত গ্রামীণ সমাজ ও লোকসংস্কৃতির পটভূমিতে। এই বিচিত্র ও বহুমুখী জীবনাভিজ্ঞতাকে বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাটকগুলিতে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন, তাঁর নিজের জবানীতেও আমরা তেমনই ইঙ্গিত পাই — "খানিকটা জীবনবোধ থেকে আসে শিল্পবোধ, আর শিল্পবোধ থেকেই আসেই নাট্যবোধ।"[৪] বিজন ভট্টাচার্য 'জীবনবোধ'-এর মধ্যেই অনুভব করেছিলেন 'জীবন-যন্ত্রণা', যা তাঁকে নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমাদের অভিসন্দর্ভে আমরা দেখে নিতে চাই তিনি কীভাবে তাঁর নাট্যদর্শনে 'জীবনবোধ' থেকে 'শিল্পবোধ'-এ এবং 'শিল্পবোধ' থেকে 'নাট্যবোধ'-এ উপনীত হয়েছিলেন এবং উত্তর-উপনিবেশবাদের প্রেক্ষিতে একটা বিকল্প নাট্যভাষা নির্মাণ করেছিলেন ? তিনি নিজেই জানিয়েছেন : "নাটক বলতে আমি তো বুঝি direct clash with the people, direct contact with the people."[৫] বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাটকে 'people' বলতে কাদের বুঝিয়েছেন ? তিনি কেন 'Bhaddorloks people'[৬]-কে বাদ দিয়ে 'চাষাভুষো people'[৭]-কে, 'ইতর আপামর জনসাধারণ'-কে তাঁর নাটকে প্রাধান্য দিয়েছেন ? তাঁর 'জীবনবোধ', 'শিল্পবোধ' এবং 'নাট্যবোধ'-এর মধ্যে জনসাধারণ এমন কি প্রভাব

ফেলেছিল, যে-কারণে তিনি নিজেকে ‘জনসাধারণের শিল্পী’ বলে দাবি করেছেন এবং তিনি কেনই বা ‘জনসাধারণের চৈতন্য’-এ নিজের ‘নাট্যশিল্প’-র মুক্তি চেয়েছিলেন ?

বিজন ভট্টাচার্যের মননে ও জীবনাভিজ্ঞতায় ছেলেবেলা থেকেই লোকায়ত মানুষ এবং তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও সংস্কার গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। আর এই লোকায়ত শব্দের সঙ্গেই তো জড়িয়ে আছে জনসাধারণের দর্শন — যা প্রকারান্তরে বস্তুবাদী দর্শনকেও চিহ্নিত করে। আসলে লোকায়ত বলতে বোঝায় সাধারণ লোকের দর্শন — ‘লোকেষু আয়তো লোকায়তঃ’।[৮] লোকায়ত মানে ইহলোক দর্শন, কেননা লোকায়তিকদের কাছে এই মাটির পৃথিবীটাই সত্য। তাদের কাছে চাষবাসের চেয়ে বড়ো বিদ্যা আর কিছুই ছিল না। তাই তাদের চেতনায় এই মূর্ত মাটির পৃথিবীই সবচেয়ে বড়ো সত্য। অন্যদিকে লোকায়ত শব্দবন্ধটির মধ্যেই রয়েছে দুটি শব্দ — ‘লোক’ ও ‘আয়ত’। ‘আয়ত’ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় — ‘আ+যৎ+অ’। এই ‘আ’ উপসর্গের অর্থ হল ‘সম্যকভাবে’ এবং ‘যৎ’ ধাতুর অর্থ ‘চেষ্টা করা’। তাই ‘আয়ত’ শব্দের অর্থ হল — ‘সম্যকভাবে চেষ্টা করা’। অন্যদিকে ‘লোক’ শব্দের অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে মনিয়ার উইলিয়ামস্ ‘লোক’ শব্দটির সঙ্গে লাতিন শব্দ ‘lucus’ এবং লিথুনিয়ান শব্দ ‘laucus’ শব্দের তুলনা করেছেন। লাতিন ‘lucus’ শব্দের অর্থ ‘a clearing of forest’ অর্থাৎ চাষের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করার জায়গা, অন্যদিকে লিথুনিয়ান শব্দ ‘laucus’-র অর্থও চাষের জমি। আবার সংস্কৃত ভাষায় ‘লোক’ শব্দের অর্থের সঙ্গেও চাষের জমির সম্পর্ক ছিল। কেননা ‘লোক’ শব্দের শুরুতেই একটা ‘উ’ থাকতো অর্থাৎ ‘উ-লোক’, মানে উরুলোক — তার অর্থও কিন্তু জমি বা মাঠ।[৯] তাই ‘লোকায়ত’ শব্দবন্ধের গভীরে কৃষকদের সংস্কার, সংস্কৃতি ও চেতনার কথা অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত।

এর পাশাপাশি আমরা যদি গণনাট্য সংঘের দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য ও ভূমিকা কি ছিল তা তাদেরই প্রকাশিত ঘোষণাপত্র থেকে উদ্ধৃত করি তাহলে দেখা যাবে : “সার্থক শিল্পসৃষ্টির জন্য আমাদের শিল্পকর্ম তাই জনগণের জীবন ও সংগ্রাম অর্থাৎ শ্রেণি সংগ্রামকেই উপস্থিত করবে এবং শ্রেণিহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষক ও অন্যান্য সকল স্তরের মেহনতী মানুষের সংগ্রামী মোর্চার সাংস্কৃতিক কাহিনিরূপে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।”[১০] গণনাট্যের ঘোষণাপত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি — শিল্পকর্ম যেমন জনগণের জীবন ও সংগ্রামকে প্রকাশ করবে, তেমনি শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার একটা মিলিত সংগ্রামও থাকবে। এই মেহনতী কৃষক ও শ্রমিকেরাই তো লোকায়তের অন্তর্ভুক্ত, যারা সম্যকভাবে চেষ্টা করে, উৎপাদনের জন্য শ্রম বিনিয়োগ করে, কৃষিকাজ করে। এই ‘চাষাভুষো people’-কেই বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাটক তথা নাট্যদর্শন ও প্রকরণে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সে কারণেই কি শহুরে নাগরিক সংস্কৃতিকে প্রকাশ না করে নিজের ‘শিল্পবোধ’ ও ‘নাট্যবোধ’-এর মধ্যে গ্রামীণ লোকায়ত সংস্কৃতিকে অভিব্যক্ত করলেন ?

তাই কি কলকাতার ফুটপাতে মরতে মরতে পরাণ মণ্ডল গ্রামে ফেরার নির্দেশ দেয় ? শুধু গ্রামে ফেরা নয়, পরাণ স্বপ্ন দেখে সোনা ধানের, নতুন করে ধান ফলানোর : "ঘরে ফিরে যা রমজান — তোরা সব ঘরে ফিরে যা। আমার সেই মরচে পড়া নাঙ্গল ক'খানা আবার শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতি। ... সোনা, বেন্দা, সোনা ফলবে। ফিরে যা। ফিরে যা।"[১১] এই সোনা ফলানোর স্বপ্ন ও গ্রামে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা — যা মূলত শিকড়ে ফিরতে চাওয়ার ইঙ্গিত। আসলে দেশের সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়ায় বিশ্বাস হারায়নি। এই খেটে খাওয়া লোকায়ত মানুষদের ছিল নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতি — যা বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে এক অভিনব নাট্য-প্রকরণের জন্ম দেয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দর্শনের সুচিন্তিত সমন্বয়ে।

বিজন ভট্টাচার্য যখন গণনাট্য আন্দোলনে নিজেকে সংযুক্ত করছেন তখন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে নানা উত্থান-পতন, নানা সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও নিজেকে অংশীভূত করছেন। যেমন একদিকে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদ বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেমনি অন্যদিকে এদেশে বিয়াল্লিশের অগাস্ট আন্দোলন, মেদিনীপুরের ভয়ংকর বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর — সব মিলিয়ে সাধারণ জনজীবন অবিন্যস্ত। এই ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রকাশ ঘটেছিল একদল তরুণ শিল্পীদের হাত ধরে। এ-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অশোক মিত্রের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা যাক : "বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশক থেকে প্রধানত বামপন্থী চিন্তার নির্ভরে যে আশ্চর্য নতুন এক সাংস্কৃতিক উজ্জীবন বাঙালিদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল তার কেন্দ্রবিন্দুতে কিন্তু শোষিত, অবসানিত মানুষজনের প্রসঙ্গ।"[১২] শ্রী মিত্র যে 'নতুন এক সাংস্কৃতিক উজ্জীবন'-র প্রসঙ্গ আমাদের ধরিয়ে দেন, তা কিন্তু কোনও বায়বীয় কল্পনা প্রসূত নয়, অনেক বেশি মানব-প্রত্যয়-ভূমি সঞ্জাত কিছু মানুষের চেতনা-বিশ্বাস সমন্বিত ভাবাদর্শ — যা বামপন্থী চিন্তার প্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া, গড়ে ওঠা। বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে যে 'সাংস্কৃতিক উজ্জীবন' ঘটেছিল তার কেন্দ্রে ছিল শোষিত মানুষের প্রসঙ্গ, তাদের নিয়ে চিন্তা-চর্চা ও বিশ্লেষণের বহুস্তরিক বিন্যাস ধরে পড়েছে শিল্পকলার নানান মাধ্যমে ও সংরূপে। ওই একই প্রবন্ধে শ্রী মিত্র অন্য আর একটি চিন্তাসূত্রের সংযোগ করে দেখাতে চেয়েছেন যে, চারের দশকে 'বাঙালি উজ্জীবন'-র কেন্দ্রে ছিল শোষিত মানুষের প্রসঙ্গ এবং তাদের সাংস্কৃতিক চেতনার প্রেরণা, যাকে তিনি লোকসংস্কৃতি না বলে 'নিখাঁজ দীনসংস্কৃতি' বলে চিহ্নিত করেছেন।[১৩] সংস্কৃতির মাত্রা দেশ কালের ভিন্নতায় বদলে বদলে যায়। সে প্রসঙ্গেও তিনি আমাদের সতর্ক করে দেন — ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যে যে এক বিশেষ ধরনের 'সাংস্কৃতিক উজ্জীবন' হয়েছিল, তা মূলত ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ও চিন্তা-চেতনার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সেই উজ্জীবনে 'দীনসংস্কৃতি'-র কোনো উল্লেখ ছিল না — 'পুরো কাঠামোয়

গরিব-গুর্বোদের কোনো স্থান নেই'[১৪] ; বরং সেই উজ্জীবনে ছিল 'হীন সংস্কৃতি'[১৫] বা 'কদর্য সংস্কৃতি' সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস।

'শতবর্ষে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র' নামক অন্য আর একটি প্রবন্ধে শ্রী মিত্র বিশ শতকের মাঝামাঝি বামপন্থী আদর্শের প্রেক্ষিতে 'সাংস্কৃতিক উজ্জীবন'-কে 'মস্ত দ্বিতীয় উজ্জীবন'[১৬] বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কেননা, এই উজ্জীবনের মূলে শুধু বামপন্থী-চেতনা নয়, দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তিনি সম্পর্কান্বিত করার চেষ্টা করেছেন। চারের দশকে বাঙালি সমাজ ও চেতনায় 'একটা নতুন প্রাণশক্তির বিকাশ'[১৭]-এর মধ্য দিয়ে যে 'মস্ত দ্বিতীয় উজ্জীবন' তথা 'সাংস্কৃতিক উজ্জীবন' ঘটেছিল বলে শ্রী মিত্র মনে করেন, সেই ভাবনাকে শ্রদ্ধেয় শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য একটি স্তরে — জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে 'সাংস্কৃতিক বামপন্থা' বা 'কালচারাল লেফ্ট'[১৮] অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। কেননা, যে-কোনো সংস্কৃতি বা 'সাংস্কৃতিক উৎপাদন' একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠে। আসলে এই সংস্কৃতি কোনো বায়বীয় পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠা নয়, সেখানে আছে কিছু মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শকে বাস্তবায়িত করার আ-প্রাণ প্রচেষ্টা — এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃতিকে দেখতে চেয়েছেন এভাবে : "সংস্কৃতিকে যদি এইভাবে দেখি, স্বভাবতই তা রাজনীতির আবর্তের মধ্যেই প্রোথিত। রাজনীতির ধারা বা প্রবণতাই সংস্কৃতির মূল আবহটি যেমন তৈরি করে, তেমনই আবার রাজনীতির সবচেয়ে শক্তিমান পক্ষের শাসন-প্রভাবে-নিয়ন্ত্রণে 'নির্মিত' সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বঞ্চিত, অবদমিত পক্ষ আর এক প্রতিবাদী সংস্কৃতি চিহ্নিত করে এক প্রতিবাদী রাজনীতির 'জমি' তৈরি করে।"[১৯]

পাশাপাশি রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে যে 'নির্মিত' সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে — যেখানে 'রাজনৈতিক বামপন্থা'-র প্রভাব এবং 'দল'-এর নিয়ম-নীতি-নির্দেশিকার শাসন থাকে, সেখানে 'প্রতিবাদী সংস্কৃতি'-র বি-নির্মাণ হয় — 'রাজনৈতিক বামপন্থা'-র বাইরে বেরিয়ে 'সাংস্কৃতিক বামপন্থা' নির্মাণের মধ্যে। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাক : "দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে যুদ্ধের ছায়ার বিস্তারেই আন্তর্জাতিক বামপন্থী সংস্কৃতির একটা ভাবাদর্শ তৈরি হচ্ছিল। বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে এই বামপন্থী সংস্কৃতির ভাবাদর্শগত ঘনিষ্ঠতা থাকলেও সাংস্কৃতিক সৃষ্টি কর্ম তথা সাংস্কৃতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মসূচির সীমা লঙ্ঘন করে একটা বামপন্থী সাংস্কৃতিক বাতাবরণ রচনার দিকেই এই বামপন্থী সংস্কৃতি তার লক্ষ্য স্থির করেছিল।"[২০] বামপন্থী রাজনীতি ও বামপন্থী সংস্কৃতির মধ্যে ভাবাদর্শগত বোঝাপড়া থাকলেও সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকর্ম বা সাংস্কৃতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রটি বামপন্থী রাজনীতির মতাদর্শের মধ্যেই পার্টি বা দলের বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা ও কর্মসূচির বাতাবরণে সীমিত ছিল না। এই 'সাংস্কৃতিক বামপন্থা'-র আদর্শকে, স্বপ্নকে

বাস্তবায়িত করতে বিজন ভট্টাচার্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 'মানুষের মুক্তিতেই নাট্যশিল্পের মুক্তি'-র[২১] সত্যান্বেষণে অবিচল ছিলেন।

দুই

আলোচনার গোড়াতেই আমরা দেখিয়েছি যে, শ্রী মিত্র কথিত বিশ শতকের সাংস্কৃতিক উজ্জীবন কিভাবে 'দীনসংস্কৃতি' থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করেছিল — তার প্রতিফলন, বিন্যাস ও বিচার-বিশ্লেষণ বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যদর্শনে ও প্রকরণে গভীরভাবে ধরা পড়ে। আসলে 'দীনসংস্কৃতি'-র যে একটা 'নিজস্ব সম্ভ্রান্ত সংস্কৃতি' আছে তার পাঠ বিজন ভট্টাচার্য কলকাতা আসার আগে (১৯১৫ - ১৯৩২) বিস্তৃত গ্রামজীবনের নানা অভিজ্ঞতা থেকে গ্রহণ করেছিলেন। পিতার বদলি চাকরির সূত্রে তিনি খুলনা, যশোর, বসিরহাট, সাতক্ষীরার নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ফকির-আউল-বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশেছেন, গান শুনেছেন, আখড়ায় গেছেন, থেকেছেন, গান শিখেছেন। সেই সঙ্গে টুনে, মালো, কুমোর, বেদে, জেলে প্রমুখ নানান সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি খুব সহজে মিশতে পারতেন, তাদের জীবন-যাপন, সংস্কার-সংস্কৃতি, মুখের ভাষা, নাচ, গান সবই খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং আত্মীকরণ করেছেন। তাঁর এই বৃহত্তর গ্রাম জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তাঁরই এক সাক্ষাৎকার থেকে শোনা যাক :

> "আমার ভীষণ ভালোলাগত ওদের সঙ্গে থাকতে এবং মিশতে এবং জানতে। Most of my days I spent with them in the villages, with the people. কাজেই ওদের reaction কী হয়, ওরা কেমন করে কথা বলে, অসুখে কি করে কষ্ট পায়, কী কী ভাবে কষ্ট পায়, what are the sources of their trouble, সেগুলো জানা ছিল। আমি এদের ভালো চিনতাম, বুঝতে পারতাম। এই মাটিটাকে খুব চিনতাম এবং ভাষাটাও জানতাম, ... আমি যেটা দেখেছি, আমাদের সমস্ত ধ্যান-ধারণা, art forms, কালচার-ফালচার, whatever it is, একেবারে pure and simple কৃষিভিত্তিক।"[২২]

বিজন ভট্টাচার্য তাঁর জীবনচর্যায় যেমন, নাট্যচর্চায়ও তেমন গ্রামীণ সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে প্রকাশ করেছেন — যা সম্পূর্ণত 'pure and simple কৃষিভিত্তিক'। তাদের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে — যাকে শ্রী মিত্র 'নিজস্ব সম্ভ্রান্ত সংস্কৃতি' তথা 'দীনসংস্কৃতি' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। আর দীনসংস্কৃতির গভীরে লোকায়ত মানুষের সংস্কার ও সংস্কৃতি জড়িয়ে আছে ওতোপ্রোতভাবে। বিজন ভট্টাচার্যের *আগুন* থেকে *হাঁসখালির হাঁস* পর্যন্ত প্রায় সমস্ত নাটকে এই 'দীনসংস্কৃতি' তথা লোকায়ত সংস্কৃতির নানা স্তর, নানা মাত্রা দেখা যায়। বিশেষ করে 'জীয়নকন্যা', *দেবীগর্জন*, *গর্ভবতী জননী* প্রভৃতি নাটকে বিভিন্ন জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ ও সমস্তটা মিলিয়ে তাদের সংস্কার ও সংস্কৃতিকে উত্তর-উপনিবেশবাদের প্রেক্ষিতে বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাট্যভাষায় ধরতে চেয়েছেন।

বিজন ভট্টাচার্যের জীবনাভিজ্ঞতায় ছিল বৃহত্তর বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক মহাদেশ — বিশেষ করে ভারতের গ্রামীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি, নানা জাতি-উপজাতির মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি। *জীয়নকন্যা* নাটকে আমাদের পরিচয় হয় উলুপীর সঙ্গে, সে বেদে সর্দারের তরুণী কন্যা, সর্পদংশনে তার মৃত্যু হয়। তার প্রাণ ফেরানোর জন্য নাট্যকার হাজির করান নানান গুণীন সম্প্রদায়কে, কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, একক মন্ত্রোচ্চারণ কোনো কাজে আসে না — সম্মিলিত প্রয়াসে শেষ পর্যন্ত উলুপী প্রাণ ফিরে পায়। এই বেদে সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতিকে একটা সাংস্কৃতিক সমন্বয় হিসেবে কি বিজন ভট্টাচার্য দেখাতে চেয়েছেন ? একই সঙ্গে এই প্রশ্নও তোলা যেতে পারে — বেদে সংস্কৃতির সঙ্গে লোকায়ত সংস্কৃতির সংযোগ কোথায় ? অন্যদিকে তাঁর সঙ্গে সাপ, সাপুড়ে ও তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে কীভাবে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ? এক সাক্ষাৎকারে তিনি সে অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন : "আমাদের দেশে সাপ প্রচুর, ওস্তাদ সাপুড়েও অনেক। যখন ক্ষেতের কাজ থাকে না, তখনই সাপুড়েরা সাপের খোঁজে বেরোয়। এই 'রিসেস'-এর সময়েই যতো গান, বাজনা, নাচ, ঝুমুর সবই। কৃষিভিত্তিক জীবনের লাভালাভের খতিয়ান ঐ তিন মাসের যাবতীয় সাংস্কৃতিক প্রকাশে ধরা পড়ে।"[২৩] এই কথা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিজন ভট্টাচার্যের লোকায়ত জীবন সম্পর্কে আগ্রহ এবং অভিজ্ঞতার শিকড় কতটা গভীরে প্রোথিত !

বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাটকের মধ্যে 'cultural cell'-টিকে খুঁজেছেন, প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন জীবন-সংগ্রামের প্রবাহমান ধারাটিকে। সে-কথা তিনি দেবীগর্জন নাটকের ভূমিকায় এভাবে জানিয়েছেন : "কৃষিভিত্তিক বাংলার সাংস্কৃতিক রূপরেখায় শ্রেণি সংগ্রামের অনিবার্যতা স্বীকার করে নিয়েই নিগূঢ় সেই cultural cell-টিকে আমাদের খুঁজে পেতে হবে এবং প্রাণ-চৈতন্যের বহতা অক্ষুণ্ন রেখে বর্তমান জীবন সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষণিকতায় তার নিরাকরণ করতে হবে।"[২৪] কেননা বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যভাবনার কেন্দ্রে নিহিত ছিল বাংলার বিস্তৃত গ্রামীণ জীবন এবং সেই জীবনের গভীরে থাকা লোকায়ত জীবন-দর্শনকে তুলে ধরা, প্রকাশ করা। সে-কথা আরো স্পষ্টভাবে তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানান : "আমাদের যেতে হবে গ্রামের অবজেক্টিভ রিয়্যালিটি-তে। উই হ্যাভ্ টু রিমডেল দেয়ার কালচারাল ফর্মজ্ অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার ওন আন্ডারস্ট্যানডিং।"[২৫]

দেবীগর্জন নাটকে তিনি 'গ্রামের অবজেক্টিভ রিয়্যালিটি'-কে তুলে ধরলেন লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান ও আঙ্গিকের নিরিখে। সেই ভাবনা থেকেই তিনি পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে এই নাটকে 'স্মল পার্লামেন্ট'[২৬] হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। যদিও এই ধারণাটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন তর্জার ফর্ম থেকে, যা তাঁর গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতায় ধরা ছিল। কবির লড়াই কিংবা তরজার আঙ্গিককে পঞ্চায়েত সভার মধ্যে

ব্যবহার করে একটি বিশেষ সমাজ, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর নানা সমস্যাকে তুলে আনলেন নাটকে। এ-প্রসঙ্গে তিনি নিজেই জানিয়েছেন : “তরজার form-টা debate-এর, fighting cultural reaction and prejudice. তার সঙ্গে সঙ্গে চাই new things, new models.”[২৭] পাশাপাশি এই নাটকে বাংলা লোকনাট্য, লোকগীতি, লোকনৃত্য, লোকক্রিড়া ও লোকভাষার সমন্বয় ঘটিয়ে নাট্যকার একটা Plural Society-কে হাজির করেছেন। অন্যদিকে বিজন ভট্টাচার্য একাধিক দেব-দেবীর মিশ্রণের (দুর্গা কালী মনসা ধর্মঠাকুর) মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে (মংলা বাউরি সম্প্রদায় ও সঞ্চারিয়া সাঁওতাল সম্প্রদায়) ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছেন এবং তাদের লোকায়ত ধর্ম-বিশ্বাস-সংস্কার ও সংস্কৃতিকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে “Form জন্ম নেয় content-এর pressure-এ।”[২৮] এই ‘content-এর pressure’-টাই ছিল তাঁর কাছে ‘যুগসত্য’ ও ‘যুগযন্ত্রণা’। সে কারণেই তিনি ‘জীবনবোধ’ দিয়ে ‘এক দুঃসহ জীবন যন্ত্রণা’ ও ‘যুগযন্ত্রণা’-কে ‘যুগসত্য’-র নিরিখে উপলব্ধি করে শুধুমাত্র ‘photographic reality’[২৯]-কে নয়, নাটকে ধরতে চেয়েছিলেন (লোকায়ত মানুষের) ‘how to reach these agony’[৩০]-কে। পাশাপাশি তিনি মনে প্রাণে এটাও বিশ্বাস করতেন : “Theatre is not bound with in any laws, any sacred spells, any predetermined routes.”[৩১] যে কারণেই তিনি তাঁর নাটকে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নির্দিষ্ট কাঠামোতে গড়ে ওঠা নিয়মবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রচলিত নাট্যরীতিকে অনুসরণ না করে গণনাট্য পর্বে এবং গণনাট্য পরবর্তী সময়ে পর্বের উত্তর-উপনিবেশবাদের ‘যুগসত্য’ (ঐতিহাসিক ঘটনা) এবং ‘যুগযন্ত্রণা’-র (জীবনাভিজ্ঞতা ও সমকালীন সমস্যা) নিরিখে ‘সাংস্কৃতিক বামপন্থা’-র মতাদর্শে জারিত নিজস্ব একটা নাট্যভাষা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি তাঁর নাট্য-প্রকরণ নির্মাণের ব্যাপারে যে বিষয়ে সচেতন ছিল তা হল : “My themes have never allowed me the luxury of the Aristotelian discipline.”[৩২] বিজন ভট্টাচার্য যেমন তাঁর নাট্যরীতিতে ‘Aristotelian discipline’-কে গ্রহণ করেননি, তেমনই ব্রেখ্‌টের মতো ‘illusion break’[৩৩]-ও করতে চাননি। তাই তিনি বৃহত্তর জনসাধারণের কথা মাথায় রেখে ‘how to utilise these myths to create new models beyond the myth’[৩৪]-এর মধ্য দিয়ে বিকল্প একটা নাট্যভাষা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কেননা তিনি জানতেন ‘if we break the myths, their hearts will be broken’, তাই তিনি ‘traditional literary forms’-কে গ্রহণ না করে ‘folk ritualistic or musical forms’[৩৫]-কে তাঁর নাট্যভাষায় প্রয়োগ করেছিলেন।

বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাটক রচনায় উপনিবেশবাদের প্রচলিত নাট্যরীতিকে গ্রহণ করেননি। কেননা তিনি জীবনাভিজ্ঞতা থেকে লোকায়ত মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস, সংস্কার-

সংস্কৃতি, লোক-ঐতিহ্য, লোকায়ত দর্শন, পুরাণ ও আর্কেটাইপের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন-যন্ত্রণা, সমস্যা এবং সংগ্রামকে নাটকের মধ্যে দেখিয়েছেন। অন্যদিকে বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শে ('রাজনৈতিক বামপন্থা') গড়ে ওঠা নিজস্ব সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া বা দর্শনের ('সাংস্কৃতিক বামপন্থা') মধ্যে তিনি প্রেরণা সঞ্চয় করেছিলেন লোকজীবন তথা লোকসংস্কৃতির ('দীনসংস্কৃতি') শিকড় থেকে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক তথা সমকালীন ঘটনাকে সামনে রেখে বৃহত্তর লোকায়ত পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লোকায়ত মানুষের যেমন সংগ্রামকে দেখাতে চেয়েছেন তেমনই তাদের উত্তরণের একটা সম্ভাব্য পথ চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাই বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাটকগুলিতে লোকায়ত মানুষের উত্তরণে পৌঁছতে গিয়ে বাস্তব (realism) থেকে ভাবকল্প-বাস্তব (abstraction) পৌঁছতে চেয়েছিলেন এবং বিকল্প নাট্যভাষার মধ্যে 'new historinics'-র আদল নির্মাণ করেছিলেন।

তথ্যসূত্র

১) Young, Robert J. C., *Postcolonialism : A very Short Introduction,* New Delhi, OUP, 2001, pg - 6

২) ibid, pg - 7

৩) Said, Edward, *Culture and Imperialism,* Vintage, 1993, pg - 37

৪) বিজন ভট্টাচার্য, 'ক্রাইসিসে এ-ই হয় এবং এ-ই হচ্ছে', *বিশিষ্ট বিজন,* শিবাদিত্য দাশগুপ্ত সম্পা., প্রথম মনফকিরা সংস্করণ, কলকাতা, মনফকিরা, ২০০৫, পৃ. ৮৫

৫) ঐ, 'নাটক ও নাট্যপ্রবাহ ১৯৭০ : সম্ভাব্য গতিপ্রকৃতি', *বিশিষ্ট বিজন,* পৃ. ১০১

৬) ঐ, 'জনসাধারণের আমি', "বিশিষ্ট বিজন", পৃ. ৫৭

৭) পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

৮) দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন,* প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, নিউ এজ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৯

৯) পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯ - ৬৩

১০) 'গণনাট্য সংঘের ঘোষণাপত্র', *গ্রুপ থিয়েটার,* বর্ষ ৪, সংখ্যা ১, শারদীয় ১৯৮৮, পৃ. ৮৪

১১) বিজন ভট্টাচার্য, 'জবানবন্দী' (৪র্থ দৃশ্য), *বহুরূপী ৩৪* (নবান্ন-স্মারক সংখ্যা, দ্বিতীয় সংকলন), জুন ১৯৭০, পৃ. ৩১

১২) অশোক মিত্র, 'অমিত্রাক্ষর', *আরেক রকম,* কালীকৃষ্ণ গুহ সম্পা., তৃতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ১ - ১৫ এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ২১

১৩) পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

১৪) পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

১৫) পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
১৬) অশোক মিত্র, ‘শতবর্ষে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র’, *শতবর্ষীয়ান জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র,* শিবাদিত্য দাশগুপ্ত ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, থীমা, ২০১৫, পৃ. ১
১৭) পূর্বোক্ত, পৃ. ১
১৮) শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘মুখবন্ধ’, *শতবর্ষীয়ান জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র,* শিবাদিত্য দাশগুপ্ত ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, থীমা, ২০১৫, পৃ. সাত
১৯) ঐ, ‘সাংস্কৃতিক বামপন্থার পরিপ্রেক্ষিতে গণনাট্য চিন্তা : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য ও প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে’, *গণনাট্য ৭০,* বাবলু দাশগুপ্ত সম্পা., ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, প্রথম প্রকাশ, ২৫ মে ২০১৫, পৃ. ৮২
২০) পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩
২১) বিজন ভট্টাচার্য, ‘বাজারের সত্যি একটা ভয়ানক সত্যিই’, *বিশিষ্ট বিজন,* পৃ. ৯০
২২) ঐ, ‘জনসাধারণের আমি’, *বিশিষ্ট বিজন,* পৃ. ৫০ - ৫১
২৩) ঐ, ‘অভিজ্ঞতার থিয়েটার’, *গন্ধর্ব,* নৃপেন্দ্র সাহা সম্পা., আশ্বিন ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩
২৪) ঐ, ‘ভূমিকা’, *দেবীগর্জন,* চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, দে’জ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৩৮
২৫) ঐ, ‘জনসাধারণের আমি’, *বিশিষ্ট বিজন,* পৃ. ৬৭
২৬) পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
২৭) পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
২৮) পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
২৯) বিজন ভট্টাচার্য, ‘নাটক ও নাট্যপ্রবাহ ১৯৭০ : সম্ভাব্য গতিপ্রকৃতি’, *বিশিষ্ট বিজন,* পৃ. ৯৯
৩০) ঐ, ‘জনসাধারণের আমি’, *বিশিষ্ট বিজন,* পৃ. ৬৪
৩১) ঐ, ‘Theatre and Social Realism’, *বিশিষ্ট বিজন,* পৃ. ১১১
৩২) ঐ, ‘The Crisis of the Artist’, *বিশিষ্ট বিজন,* পৃ. ১১৫
৩৩) ঐ, ‘নাটক ও নাট্যপ্রবাহ ১৯৭০ : সম্ভাব্য গতিপ্রকৃতি’, *বিশিষ্ট বিজন,* পৃ. ৯৯
৩৪) ঐ, ‘বাজারের সত্যি একটা ভয়ানক সত্যি’, *বিশিষ্ট বিজন,* পৃ. ৮৯
৩৫) ঐ, ‘The Crisis of the Artist’, *বিশিষ্ট বিজন,* পৃ. ১১৫

অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে অজ্ঞানের সর্বজ্ঞাশ্রিতত্ত্ব নিরূপণ

সোমনাথ কর
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
রানাঘাট কলেজ, রানাঘাট, নদীয়া

সারসংক্ষেপ : অদ্বৈতমত অনুসারে মিথ্যা সদসদ্বিলক্ষণ ভাবরূপ অজ্ঞানের আশ্রয় নিরূপণই এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্ত্ব এবং চিন্মাত্রাশ্রিতত্ব খন্ডনপূর্বক সর্বজ্ঞাশ্রিতত্ত্বই অবিদ্যার আশ্রয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিরণাচার্য ও সংক্ষেপ শারীরককার অবিদ্যার চিন্মাত্রাশ্রিতত্বপক্ষ অবলম্বনপূর্বক স্বীকার করেন যে, সবিশেষত্ব বা সগুণত্ব অবিদ্যাধীন হওয়ায় সগুন বা সবিশেষ চৈতন্যকে অবিদ্যার আশ্রয় না বলিয়া শুদ্ধচৈতন্যকে অবিদ্যার আশ্রয় বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এরূপে অবিদ্যার শুদ্ধচিন্মাত্রাশ্রিতত্ব স্বীকৃত হইলে কীরূপে সর্বজ্ঞত্বের বিরোধ হয় এবং মণ্ডন মিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্রকে অবলম্বন করিয়া অজ্ঞানের জীবাশ্রিতত্ব উপপাদন করিলে কী রূপে অনোন্যাশ্রয় দোষ উপপন্ন হইবে তাহা নিদর্শনপূর্বক বলিয়াছেন যে, অবিদ্যা যদি জীবাশ্রিত হয় এবং অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে জীব বলা হইলে অনোন্যাশ্রয়দোষ উপপন্ন হইবে। কারণ যে অবিদ্যা জীবে আশ্রিত সেই অবিদ্যাই জীবভাবের প্রযোজক। অর্থাৎ জীবে আশ্রিতরূপে অবিদ্যা জীবের অধীন, আবার জীবভাব অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত বলিয়া জীব অবিদ্যার অধীন হওয়ায় অনোন্যাশ্রয়দোষ অনিবার্য হইবে। এইরূপে অবিদ্যার চিন্মাত্রাশ্রিতত্ব এবং জীবাশ্রিতত্ব পক্ষে দোষ প্রদর্শন পূর্বক সর্বজ্ঞাশ্রয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বর্তমান নিবন্ধে।

মূলশব্দ : ১) জীবাশ্রিতত্ব ২) চিন্মাত্রাশ্রিতত্ব ৩) সর্বজ্ঞাশ্রয়ত্ব ৪) সগুণত্ব ৫) অবিদ্যা

মূল আলোচনা :

বিবরণ এবং সংক্ষেপশারীরকমত অবলম্বনপূর্বক অনাদি অবিদ্যার শুদ্ধচৈতন্যাশ্রিতত্বপক্ষ অদ্বৈতসিদ্ধিকার উপপাদন করিয়াছেন। শুদ্ধচৈতন্যকে অবিদ্যার আশ্রয় বলিবার প্রধান কারণ এই যে, তাহা হইলে কোনও সগুণ চৈতন্য বা সবিশেষ ব্রহ্মচৈতন্যকে অবিদ্যার আশ্রয় বলা হইল না। কিন্তু সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মকে অবিদ্যার আশ্রয় বলা না হইলে কী সুবিধা হয় বা সেই পক্ষের উৎকর্ষই বা কী? অবিদ্যার শুদ্ধচিদাশ্রিতত্বপক্ষে উৎকর্ষ কী?

এই প্রশ্নের উত্তরে বিবরণাচার্য ও সংক্ষেপশারীরককারকে অনুসরণ করিয়া যাঁহারা অবিদ্যার চিন্মাত্রাশ্রিতত্বপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা বলিতে পারেন যে, অবিদ্যার সম্বন্ধবশতঃই শুদ্ধব্রহ্মের সবিশেষত্ব বা সগুণত্ব উপপন্ন হয়। এই কারণে সবিশেষত্ব বা সগুণত্ব অবিদ্যাধীন হওয়ায় সগুণ বা সবিশেষ চৈতন্যকে অবিদ্যার আশ্রয়

না বলিয়া শুদ্ধচৈতন্যকে অবিদ্যার আশ্রয় বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

এইরূপ বিবরণ এবং সংক্ষেপশারীরকমতের বিরুদ্ধে অন্যান্য অদ্বৈতাচার্যগণ বলিতে পারেন যে, অবিদ্যা যদি শুদ্ধচৈতন্যে আশ্রিত হয় তাহা হইলে সর্বজ্ঞত্বের বিরোধ হয়। কারণ, অবিদ্যাবিশিষ্ট চৈতন্যকেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বলা হইয়াছে। এরপর যদি শুদ্ধচৈতন্যই অবিদ্যার আশ্রয় হন তাহা হইলে বিশিষ্টচৈতন্যকে সর্বজ্ঞ না বলিয়া অজ্ঞানের আশ্রয়ীভূত শুদ্ধচৈতন্যকেই ঈশ্বর বা সর্বজ্ঞ বলা উচিত। কিন্তু শুদ্ধচৈতন্যকে কুত্রাপি ঈশ্বররূপে স্বীকার করা হয় না। অবিদ্যার দ্বারা উপহিত চৈতন্যকেই ঈশ্বররূপে স্বীকার করা হয় । যদি শুদ্ধচৈতন্যই অজ্ঞানের আশ্রয় হন, হইলে তো তিনিই সর্বজ্ঞ হইবেন বা তিনিই ঈশ্বর হইবেন। ফলে ঈশ্বর এবং সর্বজ্ঞ বিষয়ে শ্রুতিস্মৃতিতে যা কিছু উক্ত হইয়াছে তাহা বাধিত হইবে। যাঁহারা এইরূপ আপত্তি করিয়াছেন তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে, বিশিষ্টচৈতন্যকেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বলা যায়, শুদ্ধচৈতন্যকে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বলা যায় না। তাঁহারা বিশিষ্টচৈতন্যেরই সর্বজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন, শুদ্ধচৈতন্যের সর্বজ্ঞতা বা ঈশ্বররূপতা স্বীকার করেন নাই। এইরূপ মত অনুসরণ করিয়া আপত্তি করা হইয়াছে যে, অচৈতন্যকে অবিদ্যার আশ্রয় বলা হইলে শুদ্ধচৈতন্যই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হইয়া যাইবেন এবং ফলে অজশ্র শ্রুতিস্মৃতি ইতিহাসের সঙ্গে সেই পক্ষের বিরোধ উপস্থিত হইবে। [১]

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, বিশিষ্টকেই যে সর্বদা সর্বজ্ঞ বা ঈশ্বরস্বরূপ বলা হইয়াছে তাহা নহে, শুদ্ধকেও অনেকসময় সর্বজ্ঞ বলা হইয়াছে। শ্রুতিতেও "তুরীয়ম্ সর্বদৃক্ সদা"[২] এইভাবে শুদ্ধচৈতন্যেরও সর্বজ্ঞত্বেরউক্তি উপলব্ধ হয়। কিন্তু এই যে শুদ্ধচৈতন্য তাহা জ্ঞানস্বরূপ, তাহাকে জ্ঞাতৃরূপ বা প্রকাশক বলা উচিত নহে। তিনি প্রকাশস্বরূপ এবং তিনি যদি জ্ঞাতৃরূপ বা প্রকাশক রূপ না হন, তাহা হইলে তাহার সর্বজ্ঞত্বও স্বীকার করা যায় না। ফলতঃ শুদ্ধব্রহ্মকে কীরূপে সর্বজ্ঞ বলা হইবে, সেই প্রশ্নের উত্তর উপলব্ধ হয় না।

যে "তুরীয়ম্ সর্বদৃক সদা" শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধেরও সর্বজ্ঞত্ব উপপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে, সেই 'সর্বদৃক' পদের দ্বারা সমস্ত দ্রষ্টাই দৃক্স্বরূপ বা চৈতন্যস্বরূপ, ইহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু যিনি সর্বজ্ঞ তিনি তুরীয় হইতে পারেন না। এইকারণে বিশিষ্ট চৈতন্যেরই সর্বজ্ঞত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে অবিদ্যা বিনা বিশিষ্ট চৈতন্যের বৈশিষ্ট্যই না থাকায় নির্গুণ ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব সম্ভব নয় । এইরূপে নির্গুণ ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব সম্ভব না হওয়ায় সর্বজ্ঞত্ব প্রমাণতঃ বা স্বরূপতঃ অর্থাৎ নিজের স্বরূপের উপপত্তির জন্য ইহা কিন্তু অবিদ্যার সম্বন্ধ বিনা সিদ্ধ হয় না। অবিদ্যার সম্বন্ধবশতঃই চৈতন্যের সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এইরূপ পক্ষ উপস্থিত হইলে অর্থাৎ এইরূপ পক্ষে যে সমস্ত অনুপপত্তি উপস্থিত হয় সেই সকল অনুপপত্তি সমাধানের নিমিত্ত অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে, শুদ্ধব্রহ্ম সর্বজ্ঞ নহে, কিন্তু বিম্বভূত বিশিষ্টচৈতন্যই সর্বজ্ঞ। শ্রুতিতে তুরীয়ের যে সর্বজ্ঞত্ব উক্ত

হইয়াছে, তাহার দ্বারা কিন্তু শুদ্ধচৈতন্যে সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধি হয় না। ঐ শ্রুতির তাৎপর্য কিন্তু এই নয় যে, শুদ্ধচৈতন্যই সর্বজ্ঞ। 'সর্বদৃক' পদের অর্থ হইল সর্বভাসকচৈতন্য। শুদ্ধচৈতন্য অসঙ্গ হওয়ায় অর্থাৎ তাহার সাথে অবিদ্যার সম্বন্ধ না থাকায় এবং অবিদ্যার সম্বন্ধ বিনা সে বিষয়াবচ্ছিন্ন হয় না বলিয়া উহা সর্বাবভাসক হইতে পারে না। সে জ্ঞানস্বরূপ বা দৃশিস্বরূপ হইলেও জ্ঞাতা হইতে পারে না। শুদ্ধচৈতন্যকে জ্ঞাতা বলা যায় না। সে প্রকাশস্বরূপ হইলেও প্রকাশক নহে, দৃশিস্বরূপ হইলেও দ্রষ্টা নহে ।

উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য এই যে, অবিদ্যাসম্বন্ধবশতঃ বিষয়ের কল্পনা হইয়া থাকে। অর্থাৎ অবিদ্যার সম্বন্ধবশতঃই দৃশিস্বরূপ চৈতন্য সর্বাভাসক বা দ্রষ্টা হইয়া থাকেন। সর্বজ্ঞ ঈশ্বরচৈতন্য শুদ্ধচৈতন্যের সহিত অভিন্ন। কিন্তু শুদ্ধচৈতন্যই সর্বজ্ঞ ইহা বলা হয় নাই। ঈশ্বরস্বরূপ সর্বজ্ঞচৈতন্য স্বরূপতঃ শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ ইহা প্রতিপাদন করাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য। শুদ্ধচৈতন্য কোনও প্রকারেই সর্বজ্ঞ হইতে পারে না। শুদ্ধচৈতন্য অবিদ্যার সম্বন্ধবশতঃই সর্বজ্ঞ হইয়া থাকেন। [৩]

অদ্বৈতসিদ্ধিতে বা অন্যান্য অদ্বৈত আকর গ্রন্থে ঈশ্বরের যে সর্বজ্ঞত্ব উক্ত হইয়াছে তাহা কিন্তু ঈশ্বরের উপাধিভূত মায়াবৃত্তির দ্বারা উপহিত হইয়াই বুঝিতে হইবে, অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ প্রমাণবৃত্তির দ্বারা ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব উপপন্ন হয় না। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব দুই প্রকারে উপপন্ন হইতে পারে, স্বরূপচৈতন্যরূপ জ্ঞপ্তির দ্বারা অথবা মায়াবৃত্তির দ্বারা। প্রমাণজন্য অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা উপরের সর্বজ্ঞত্ব উপপন্ন হইতেই পারে না। কিন্তু স্বরূপচৈতন্যরূপ জ্ঞপ্তির দ্বারা অথবা মায়াবৃত্তির দ্বারা যেভাবেই ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব উপপন্ন করা হউক না কেন, ঈশ্বরের এই দুই প্রকার সর্বজ্ঞত্বই অবিদ্যার সাপেক্ষেই হইবে। অবিদ্যার দ্বারা যদি ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব উপপাদন করা হয়, তাহা হইলে অবিদ্যাবৃত্তি অবিদ্যারই পরিণাম হওয়ায় সর্বজ্ঞত্বের অবিদ্যাসাপেক্ষত্ব স্পষ্টই। অপরপক্ষে, স্বরূপজ্ঞপ্তির দ্বারা যদি সর্বজ্ঞত্ব উপপাদন করা হয় তাহা হইলে স্বরূপচৈতন্য স্বয়ং অসঙ্গ হওয়ায় তাহার কোনো বিষয়সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। বিষয়সম্বন্ধ অবিদ্যার অধ্যাস এবং অবিদ্যার কার্যসমূহের অধ্যাসকে অপেক্ষা করে। সুতরাং স্বরূপচৈতন্য বা স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা তাহার বা ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব উপপাদনের জন্য অবিদ্যার সাপেক্ষত্ব স্বীকার করিতে হইবে। [৪]

মায়াবৃত্তি বা স্বরূপচৈতন্য যে ভাবেই ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদন করা হউক না কেন, উভয় প্রকারেই কিন্তু অবিদ্যার সাপেক্ষত্ব অনিবার্য। কারণ, স্বরূপচৈতন্য অসঙ্গ হওয়ায় তাহার কোনও বিষয়সম্বন্ধ থাকে না। [৫] এবং বিষয়সম্বন্ধের জন্য চৈতন্যকে অবিদ্যার অপেক্ষা করিতে হয়। সেইকারণেই চৈতন্যের সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য বা উপপাদন করিবার জন্য অবিদ্যা অপেক্ষিতই হয়। আর মায়াবৃত্তি মায়ারই উপাদান হওয়ায় মায়াবৃত্তির দ্বারা যদি ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব উৎপাদন করা হয় বা চৈতন্যের সর্বজ্ঞত্ব উপপাদন করা হয় তাহা হইলেও কিন্তু অবিদ্যার সাপেক্ষত্ব অনিবার্য হয়। কারণ, মায়াবৃত্তি অবিদ্যা ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং অবিদ্যার সাপেক্ষরূপেই

ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব উপপাদন করিতে হয়। সুতরাং সর্বজ্ঞত্বের অবিদ্যাশ্রয়ত্ব বা অবিদ্যার আশ্রয় হওয়ার মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। যেমন, চৈতন্য স্বসম্বন্ধ বিষয়কে প্রকাশ করে। এইরূপে চৈতন্য অবিদ্যা বিনা কোনও বিষয়ের সহিত সম্বন্ধই হয় না। এবং সর্বজ্ঞ চৈতন্য অবিদ্যার আশ্রয় হওয়ায় উহা অবিদ্যার দ্বারাই বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় এবং তাহা বিষয়ের প্রকাশকও হয়ে থাকে। অবিদ্যা যেন চৈতন্যকে আবৃত করিতে গিয়া চৈতন্যের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া যায় এবং অবিদ্যা যে সকল বিষয়কে চৈতন্যের উপর নিক্ষেপ বা বিক্ষেপ করে তাহারাও চৈতন্যের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া যায়। যেমন মেঘমণ্ডল সূর্যকে আবৃত করিতে গিয়া সূর্যের দ্বারাই প্রকাশিত হয়, সেইরূপ অবিদ্যা চৈতন্যে অধ্যস্ত হইয়া চৈতন্যের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া যায়। সেইহেতু অবিদ্যার সর্বজ্ঞাশ্রয়ত্বপক্ষের মধ্যে বিরোধ কিছু নাই। যে অবিদ্যা চৈতন্যে আশ্রিত সেই অবিদ্যাসম্বলিত চৈতন্যই সর্বজ্ঞ। এবং সেই অবিদ্যার দ্বারাই চৈতন্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় এবং এরূপ সম্বন্ধবশতঃ তাহার সর্বজ্ঞত্বের উপপাদন হয়। তাৎপর্য এই, অনাদি কাল হইতে চৈতন্যে অবিদ্যা অধ্যস্ত হইয়া আছে। এই অবিদ্যার অধ্যাসবশতঃই নির্গুণ চৈতন্য সগুণরূপে বা সর্বজ্ঞরূপে বা ঈশ্বররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। এবং এই অবিদ্যার সম্বন্ধবশতঃই ঈশ্বরের বা চৈতন্যের যেমন সর্বজ্ঞাশ্রয়ত্ব উপপাদন হয় সেইরকম অবিদ্যাশ্রয়ত্বও উপপন্ন হয়। তিনি অবিদ্যার অধিষ্ঠানরূপেই আশ্রয়। তাই তাহার যেরূপ সর্বজ্ঞাশ্রয়ত্ব উপপন্ন হয়, সেরূপ সর্বজ্ঞেরও অবিদ্যাশ্রয়ত্ব উপপন্ন হয়।[৬]

প্রশ্ন হইতে পারে যে, চৈতন্য স্বরূপতঃ অসঙ্গ হওয়ায় তাহার সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ কীরূপে স্বীকৃত হইবে? এবং অবিদ্যার সম্বন্ধকে যদি পুনরায় আবিদ্যক বলা হয় তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হইবে। এই সকল আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে, যিনি অসঙ্গ সেই চৈতন্যেরই সর্বসম্বন্ধিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, ফলে ইহাতে কোনও বিরোধ হয় নাই। সর্বসম্বন্ধিত্ব এবং অসঙ্গত্ব পরস্পরবিরুদ্ধ নয়। অসঙ্গ চৈতন্যই সর্বসম্বন্ধি। কারণ, বিষয়সম্বন্ধবশতঃই চৈতন্য সর্বসম্বন্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়সম্বন্ধের দ্বারা চৈতন্য লিপ্ত হয় না। এই লেপাভাবই বা এই ধরনের সম্বন্ধাভাবই অসঙ্গ শ্রুতির যারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেমন জীব বিষয়সম্বন্ধবশতঃ লিপ্ত হয় বা কলুষিত হয়, চৈতন্য কিন্ত লিপ্ত বা কলুষিত হয় না। এই নির্লিপ্ততাই অসঙ্গ শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অবিদ্যার ন্যায় অবিদ্যাসম্বন্ধ বা বিষয়সমন্ধ চৈতন্যে অকল্পিত, এটি অদ্বৈতী স্বীকার করিতে পারেন না। এই উক্তিই অসঙ্গত। কারণ, অবিদ্যার ন্যায় অবিদ্যাসম্বন্ধ বা বিষয়সম্বন্ধ চৈতন্যকল্পিতই। অবিদ্যা জড় বলিয়া চিদ্‌ভাস্য, চৈতন্যের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধও কিন্তু আধ্যাসিক। অবিদ্যার সম্বন্ধ চৈতন্যে কল্পিত। দৃক্‌দৃশ্যসম্বন্ধ অকল্পিত হইলে তাহা পারমার্থিক হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা অদ্বৈতী স্বীকার করেন না। দৃক্‌দৃশ্যসম্বন্ধ বা চৈতন্যের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ বা অবিদ্যার সম্বন্ধ, সমস্ত সম্বন্ধই চৈতন্যে কল্পিত,

অকল্পিত পারমার্থিক কোনও সম্বন্ধই স্বীকার করা হয় না।

এখন পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, কালাদির সহিত সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া চৈতন্যের সর্বজ্ঞত্ব উপপাদন করা যায় না, তাহা হইলে চৈতন্যের সহিত অবিদ্যার অন্যকোনও সম্বন্ধ বক্তব্য, ইহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। কারণ, অবিদ্যাসম্বন্ধ, বিষয়সম্বন্ধ সবই চৈতন্যকল্পিত। কোনও সম্বন্ধই চৈতন্যে স্বীকার করা হয় না। বস্তুতঃপক্ষে কালে সম্বন্ধের অভাব থাকিলেও চৈতন্যের কোনও অসত্তার হয় না। কারণ, কালসম্বন্ধিত্বই সত্তা। এইরূপ সত্তার লক্ষণ অদ্বৈতী স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অবাধিতত্বই সত্তার লক্ষণ। সেইহেতু চৈতন্যে কালসম্বন্ধ আছে বলিয়া চৈতন্য সৎ, এই সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতান্তই সিদ্ধান্তীর অনভিপ্রেত। সুতরাং সর্বদেশের সম্বন্ধী হওয়ায় চৈতন্য বিভু বা সর্বকালসম্বন্ধ হওয়ায় চৈতন্য বিভূ; এই সমস্ত সিদ্ধান্ত অদ্বৈতী স্বীকার করেন না। চৈতন্য অদ্বৈতমতে বিষয়সম্বন্ধস্বরূপ নহে। কারণ চৈতন্যে যে বিষয়সম্বন্ধ তা কল্পিত, তাহা প্রদর্শিত হইলে অবিদ্যারূপ উপাধিপ্রযুক্ত চৈতন্যে বিষয়সম্বন্ধ হয়। কেবলচৈতন্যে কোনও বিষয়সম্বন্ধ থাকে না। ফলে কেবলচৈতন্য বিষয়সংবেদনও নহে এবং সেই চৈতন্য বিষয়সংবেদনশীলও নহে। সর্বজ্ঞচৈতন্যকেও অবিদ্যার আশ্রয় বলিতে কোনও অনুপপত্তি নাই, কিন্তু অবিদ্যা শেষপর্যন্ত শুদ্ধচৈতন্যেই অধিষ্ঠিত।[৭] অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্যই হইল অবিদ্যার অধিষ্ঠান এবং এই অধিষ্ঠান যদি স্বীকার না করা হয় তাহা হইলে সর্বজ্ঞত্ব বা জীবেশ্বর ভেদ উপপাদন করা যাইবে না। এই কারণেই বিবরণাচার্য অবিদ্যাকে চিন্মাত্রাশ্রিত বলিয়াছেন।

তথ্যসূত্র:

১. মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, দ্বিতীয় খণ্ড, সিতাংশুশেখর বাগচী, বারাণসী, তারা পাবলিকেশন্স, ১৯৭১, পৃঃ ১৩৩৭, "ননু শুদ্ধব্রহ্মণঃ চিন্মাত্রস্য অজ্ঞানাশ্রয়ত্বে সার্বজ্ঞ্যবিরোধঃ। ন চ বিশিষ্ট এব সার্বজ্ঞ্যং তুরীয়ং সর্বদৃক্ সদেতি শুদ্ধস্যৈব সর্বজ্ঞত্বোক্তেঃ ইতি চেৎ।"

২. মুণ্ডকোপনিষদ্, ১/১/৯

৩ . মুণ্ডকোপনিষদ্, ১/১/৯, "য সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ"

৪. মধুসূদন সরস্বতী, ১৯৭১, পৃঃ ১৩৩৭-১৩৩৮, "ন সর্বদৃকপদেন সর্বেষাং দৃগ্ভূতং চৈতন্যমিত্যুচ্যতে; ন তু সর্বজ্ঞং তুরীয়ম্; তস্মাদ্বিশিষ্ট এব সার্বজ্ঞ্যম্। তচ্চাবিদ্যাং বিনা ন সংভবতীতিত্যবিদ্যাসিদ্ধিঃ। তথা হি সর্বজ্ঞো হি প্রমাণতঃ, স্বরূপজ্ঞপ্ত্যা বা? তত্র প্রমাণস্য ভ্রান্তেশ্চাবিদ্যামূলত্বাৎ, অসঙ্গসরূপজ্ঞপ্তেশ্চাবিদ্যাং বিনা বিষয়াসঙ্গতেঃ।"

৫. বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৪/৭

৬. মধুসূদন সরস্বতী, ১৯৭১, পৃঃ ১৩৩৮, "স্বরূপতঃ প্রমাণৈর্বা সর্বজ্ঞত্বং দ্বিধা স্থিতম্।। তচ্চোভয়ং বিনাহবিদ্যা সংবন্ধং নৈব সিধ্যতি । ইতি।'

৭. মধুসূদন সরস্বতী, ১৯৭১, পৃঃ ১৩৪২-১৩৪৩, "অবিদ্যাসম্বন্ধস্য আবিদ্যকত্বেন অবিদ্যয়েবেতি দৃষ্টান্তানুপপত্তেঃ। স্বতঃ পরতো বা কালাদিসম্বন্ধেন সর্বসম্বন্ধেন চ অসদ্‌বৈলক্ষণ্যসর্বগতত্বয়োরুপপত্তেঃ ন তয়োরর্থে স্বতঃ কাল সম্বন্ধসর্বসম্বন্ধাপেক্ষা। অসংগতশ্রুতিরপি স্বতঃ সংগাভাববিষয়ত্বেনোপপদ্যতে। অত এব 'অজ্ঞাতাখিলসংবেত্তুর্ঘটতে ন কুতশ্চনে' তি-নিরস্তম্ । তস্মাচ্চিন্মাত্রাশ্রিতৈবাবিদ্যা।"

গ্রন্থপঞ্জি:

১। আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী প্রণীত অদ্বৈতসিদ্ধি, আচার্য ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীকৃত লঘুচন্দ্রিকা টীকা, বিষ্ঠলেশী ব্যাখ্যা ও বলভদ্র প্রনীত সিদ্ধিব্যাখ্যা সহ, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, পরিমল পাব্লিকেশন্স, দিল্লী, ১৯৮২।

২। আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী প্রণীত অদ্বৈতসিদ্ধি, যোগেন্দ্রনাথ বাগতীকৃত বালবোধিনী টীকাসহ, সিতাংশুশেখর বাগচী কর্তৃক সম্পাদিত, তারা পাবলিকেশন্স, বারানসী, ১৯৭১।

৩। আচার্য ব্যাসতীর্থ ও আচার্য্য মধুসূদন স্বরস্বতী বিরচিত ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধী, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত, ষড়দর্শন প্রকাশন প্রতিষ্ঠানম্, বারানসী, ১৯৮৪।

৪। উদয়নাচার্য বিরচিত, ন্যায়সুমাঞ্জলী, শ্রীমোহন ভট্টাচর্য কর্তৃক সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯৫।

৫। চিৎসুখাচার্য বিরচিত প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা, শ্রীমৎ প্রত্যকস্বরূপভগবৎ প্রনীত মানসনয়নপ্রসাদিনী ব্যাখ্যা সহিত, যোগীন্দ্রানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত, ষড়দর্শনপ্রকাশনপ্রতিষ্ঠানম, উদাসীন সংস্কৃত বিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৮৫।

৬। জ্ঞানঘন বিরচিত তত্ত্বশুদ্ধিঃ, এস. এস. সূর্যনারায়ন শাস্ত্রী ও ই.পি. রাধাকৃষ্ণান্ কর্তৃক সম্পাদিত, ইউনিভার্সিটি অব্ ম্যাড্রাস, মাদ্রাজ, ১৯৪১ ।

৭। ধর্মরাজাধবরীন্দ্র প্রণীত বেদান্ত পরিভাষা, রামকৃষ্ণাধবরিকৃত শিখামনি টীকা, অমরদাসকৃত মণিপ্রভা টাকা, স্বামী গোবিন্দসইহেসাধু কর্তৃক সম্পাদিত, খেমরাক শ্রীকৃষ্ণ দাস কর্তৃক প্রকাশিত, মুম্বই, ১৯৮৫।

৮। ধর্মরাজাধবরীন্দ্র প্রণীত বেদান্তপরিভাষা, পঞ্চান্ন শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, সতীনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮৮৩ শকাব্দ ।

৯। পদ্মপাদাচারকৃত পঞ্চপাদিকা, প্রকাশাত্মতিকৃত বিবরণ, অখণ্ডানন্দমুনিকৃত তত্ত্বদীপন, শ্রীবিষ্ণু ভট্টোপাধ্যায়কৃত ঋজুবিবরণ, এস. সয়ব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, মহেশ অনুসন্ধান, বারাণসী, ১৯৯২।

“মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বাইরে গড়ে ওঠা ধর্মগোষ্ঠী : খুশিবিশ্বাসী ধর্ম-সম্প্রদায়”

অসীম বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ: উনিশ শতকীয় বাংলার ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিপরীতে গড়ে ওঠা ধর্মসম্প্রদায়গুলি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বাংলার জনসমাজের এক বৃহত্তর অংশ এই সময় উদ্ভূত লোকায়ত গৌণ-ধর্মসম্প্রদায়গুলির ছত্রছায়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই সমস্ত লোকায়ত গৌণধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব, ধর্মাচার, জীবনদর্শন ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনেব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্তরালে; সমান্তরালভাবে যেমন বিভিন্ন অনুসারী ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি আড়াআড়িভাবে বিভাজনের সূত্রেসরাসরি যুক্ত অসংখ্য সাধারণ মানুষ ও ধর্মপ্রচারকগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মব্যতিরেকে অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মীয় দল, উপদল, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন।তারা পৃথক সত্ত্বার অধিকারী হয়েও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আদর্শকে পুরোপুরি বিসর্জন দিতে পারেনি। তবে তাদের পৃথক সত্তা হিসেবেস্বাধীকার স্বীকৃত হয়েছিল।নবগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর তাঁরঅনুগামী পরিকর-শিষ্য-ভক্ত-সাধকেরা নানাভাগেবিভক্ত হয়ে স্বতন্ত্রভাবে ধর্মাচরণ ও সাধন-ভজন পদ্ধতি অবলম্বনে নিজেদের নামে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। শ্রীচৈতন্য অনুসারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সমাজের পাশাপাশি অন্যান্য যেসকল ধর্মীয় উপাসক সম্প্রদায়গুলো গড়ে ওঠে তার প্রায় সবকটিরই উৎসস্থল নদিয়া। যার মধ্যে উদ্ভূত খুশি বিশ্বাসী ধর্মসম্প্রদায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। শ্রীচৈতন্যকে প্রতীক বা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে এই সম্প্রদায়গুলি খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত প্রায় তিনশো বছরের ব্যবধানে গুরুত্বের সঙ্গে বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আমি আমার গবেষণাপত্রে উনিশ শতকে উদ্ভূত নদিয়ারঅন্যতম ধর্মগোষ্ঠী মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বাইরে গড়ে ওঠাঅন্যান্য ধর্ম-গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য খুশি বিশ্বাসী নামক লোকায়তধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

সূচকশব্দ: গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, শ্রীচৈতন্য, অন্যান্য শাখা, খুশি বিশ্বাসী সম্প্রদায়, মুসলমান সমাজ, কর্তাভজা, সাহেবধনী, জটিসার, লাললশাহী, ভাগাগ্রাম, দেবকগ্রাম, আস্থাগাঁ।

মূল আলোচনা:
বঙ্গসংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মানচিত্রে নদিয়ার গৌরবময় অবস্থান প্রবহমান ধারায় অবিস্মরণীয়। বাংলার সুপ্রাচীন জনপদ নদিয়া বহুমুখী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ এক বিশেষ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। নদিয়ার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতি শুধুমাত্র আঞ্চলিক ইতিবৃত্তের দিক থেকেই নয়,বাংলার জাতীয় আঞ্চলিক জীবনধারার পরিচয় বহনের দিক থেকেও এক মূল্যবান সম্পদ। এই জনপদ যুগ যুগ ধরে শিক্ষা,সাহিত্য,সংস্কৃতি, বিদ্যাচর্চা ও ধর্মচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে স্বীকৃত। ১৫৩৩ সালে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের পর তাঁর অনুগামী ভক্ত-সাধকেরানানাভাগে বিভক্ত হয়ে স্বতন্ত্রভাবে ধর্মাচরণ ও সাধন-ভজন পদ্ধতি অবলম্বনে নিজেদের নামে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। এই সময়ে গড়ে ওঠা ধর্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাহেবধনী সম্প্রদায়, কর্তাভজা সম্প্রদায়, খুশি বিশ্বাসী সম্প্রদায়, সহজিয়া সম্প্রদায়, কিশোরী ভজনী সম্প্রদায়, বলাহাড়ি সম্প্রদায়, বাউল সম্প্রদায়, জাতবৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রভৃতি। এরমধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি ধর্ম সম্প্রদায় হলো খুশি বিশ্বাসী সম্প্রদায়। চৈতন্যোত্তর কালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এই সময়ে গড়ে ওঠা প্রতিবাদী ধর্মগুলো শুধুমাত্র প্রতীক বা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাঁর আধ্যাত্মদর্শনকে ততটা তারা গুরুত্ব দেননি। মূলত: মূলধারার বাইরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীগুলি স্বতন্ত্রভাবে তাদের ধর্মাচরণ, সাধনতত্ত্ব এবং ধর্মসাধনা করতে থাকে। যেহেতু মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিপরীতে এই সম্প্রদায়েরগুলি গড়ে ওঠে তাই তারা চৈতন্য দর্শনকে অস্বীকার করে নিজস্ব দর্শন অনুসারে ধর্ম পরিচালিত করতে থাকেন।আঠারো-উনিশ শতকে গড়ে ওঠা ধর্ম-সম্প্রদায়গুলি তাদের নিজেদের মধ্যে যে সুসম্পর্কের বাতাবরণ তৈরি করে বৈষ্ণব ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করতো তা কিন্তু নয়।যারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অভ্যন্তরে সম্মান ও স্থান পায়নি, সেই অব্রাহ্মণ ও অন্ত্যজশ্রেণির মানুষরা এই ধর্মগুলির প্রতিনিধিত্ব করেন। এই ধর্মগুলিতে নারী স্বাধীনতা ছিল অবাধ।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় কাল পর্যন্ত শুধু নদিয়া জেলারই বিভিন্ন অংশে বহুসংখ্যক লোকায়ত গৌণধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল। এগুলির প্রবর্তক বা প্রধান গুরু হয় একজন ব্রাত্য অন্ত্যজ, নাহলে হয় একজন নিম্নবর্ণের মানুষ। কর্তাভজাদের রামশরণ পাল সদগোপ, সাহেবধনীদের চরণ পাল গোয়ালা জাতির লোক ছিলেন। বলরাম ভজাদের বলরাম যাতে হাড়ি সম্প্রদায়ের ছিলেন। খুশি বিশ্বাস ছিলেন যাতে অকুলিন দরিদ্র মুসলমান আর লালন শাহ ছিলেন একজন ফকির। তার মানে, উনিশ শতকে উদ্ভূতধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যারা নেতৃত্বে ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন অব্রাহ্মণ এবং নিম্ন বংশজাতসন্তান। তাই স্বাভাবিকভাবে অনুমেয় যে, এই সকল ধর্ম নিম্নবর্গের এবং নিম্নবর্ণের মানুষদেরই

প্রতিনিধিত্ব করেছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিবাদী ধর্ম হিসাবে এই সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিপরীতে এই ধর্মগুলি গড়ে ওঠে। যাদের মধ্যে একজন মুসলমান ফকির, যিনি সহায় সম্বলহীন, তিনি খুশি বিশ্বাস। আর অনুগত হিন্দু মুসলমান দরিদ্র সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষকে নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক বিশেষ বিশ্বাসই ধর্ম সম্প্রদায়। যারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উর্ধ্বে উঠে মানবতাবাদের জয়গান করেছিলেন।

একটি জেলায় এতগুলি লোকধর্মের আকর্ষিক উত্থান বিস্ময়কর ঘটনা। নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্নেরলেখা 'বৈষ্ণব ব্রতদিন নির্ণয়' গ্রন্থ থেকে জানা যায় আঠারো-উনিশ শতকে নদিয়া সহ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ১০০ টি উপধর্মের উত্থান ঘটেছিল।[১]এর মধ্যে প্রভাবশালী ছিল নদিয়ায় উদ্ভূত বিভিন্ন লোকায়ত গৌণধর্মীয়সম্প্রদায়গুলি।তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল খুশি বিশ্বাসী ধর্ম সম্প্রদায়।পলাশির যুদ্ধের আগে প্রায় পঞ্চাশ বছরের বৃত্তে বাংলার রাজনীতি, সমাজ, ভূমি ব্যবস্থা, অর্থনীতি,রাজনীতি ও ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভাঙ্গনের পালাবদল লেগেছিল। গ্রামকেন্দ্রিক বাংলার সাধারণ মানুষেরা এরই মধ্যে নানা দোলাচলে পড়ে মানসিক ভারসাম্য হারাচ্ছিলেন। পাশাপাশি ইংরেজ শাসন, শোষণ,উৎপীড়ন-অত্যাচার, নির্যাতনের সীমালঙ্ঘিত হয়। পাশাপাশি খ্রীষ্টধর্মের প্রসার, ব্রাহ্ম আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা বাংলার মানুষকে তখন নতুন পথের দিশা দেখায়। ইতিপূর্বে দীর্ঘদিন ধরে চলা সুদীর্ঘ ব্রাহ্মণ্য শাসনেরঅভিঘাত এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজপতিদের একচেটিয়ে অগ্রাধিকার শূদ্র ও অন্যান্য নিচ জাতীয়দের শোষণের চরম স্তরে নিয়ে এসেছিল। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানেরএকশো বছরের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের অন্তর্গত সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ মননশীল শাস্ত্রপ্রাধান্য মূল জনগোষ্ঠীর চেয়ে উচ্চমার্গে উঠে গিয়েছিল। আর বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্গত সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশের মধ্যে এসে গিয়েছিল বিকৃতিও বৌদ্ধ তন্ত্রধর্মের প্রভাব। সেই রকমই প্রেক্ষাপটে নদিয়া জেলা সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিশেষ করে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ ও যশোর জেলায় শুরু হয়ে যায় সুফি সাধকদের আনাগোনা। এদের উদার ধর্ম প্রচারের পাশে কোরাণ ও নামাজ সম্পর্কে মোল্লাতন্ত্রের বাড়াবাড়ি খুব কট্টর হয়ে ওঠে। এই সময় মরমিয়াবাদ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে আকৃষ্ট করে। সাধারণ মুসলমান এবং শূদ্ররা আকর্ষণ বোধ করেন সুফি ধর্মের আহবানকে। এই সময় ওই স্থলে যেসব সুফি প্রচারক তৎপর ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান নামগুলি হল-হেরাজতুল্লাহ, খন্দকার হোসেন শাহ, কিনুশাহ ফকির, মামুদ জাহির, বোরখান গাজী, চাহার আউলিয়া প্রমুখ।[২] এইসব সুফি ফকিরদের কেউ চিশতিয়া, কেউ কাদেরিয়া গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের উদার স্বভাব, সরল জীবন যাপন এবং ধর্মের ব্যাখ্যা খুব সহজেই আকৃষ্ট করছিল বিভ্রান্ত ও দিকভ্রষ্ট সাধারণ অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের। কর্তাভজাদের আউলচাঁদ বা সাহেবধনীদের প্রবর্তক ধনী নামে এক উদাসীন ব্যক্তিগণআসলে এক একজন সুফি প্রচারক ছিলেন। এসব ধর্মের উদা চিন্তাভাবনা ও সমন্বয়বাদ তারই ইঙ্গিত বহন করে।

আর এমনই উর্বর ভূমিনদিয়ানগরে তাই প্রতিবাদী ধর্মসম্প্রদায় হিসাবে অসংখ্য লোকায়ত ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে; যা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিপরীতে প্রবহমান থেকেছে বরাবর। তবে সবক্ষেত্রে তারা বৈষ্ণবীয় আদর্শ সম্পূর্ণ রূপে বিসর্জন দেয়নি। তারা বৈষ্ণবীয় আধ্যাত্মদর্শন সেভাবে গ্রহণ না করলেও শ্রীচৈতন্যকে মোটামুটিভাবে প্রতীক বা মাধ্যম হিসেবে তাদের ধর্মে প্রয়োগ করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন নামেমাত্র।

নদিয়া জেলাতেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এবং এই জেলাতেই অসংখ্য ক্ষুদ্র-মাঝারি ও তথাকথিত বৃহত্তর ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল সেটা বলাই বাহুল্য। আর এই ধর্মগুলির সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সম্পর্ক কি ছিল? কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে শ্রীচৈতন্য এই ধর্মগুলিকে কতখানি প্রভাবিত করেছিলবা চৈতন্য আধ্যাত্মদর্শন এদের ধর্মে কতটা গ্রহণযোগ্য ছিল, সে বিষয়ে সম্মুখ ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। এই ধর্মগুলির উদ্ভবের মূলে প্রেক্ষিতটি কি ছিল? শ্রীচৈতন্যের পূর্বে ধর্মাচরণের ব্যাপারে শেষ কথা বলার অধিকারী ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সমাজপতিরা। বলাবাহুল্য, ব্রাহ্মণ্য পুরোহিতরা অধিকাংশইসচেতনভাবে এই অধিকারের অপব্যবহার করেছিলেন। তারা তাদের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা,ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করতে মানুষদের ধর্মের নামে অহেতুক ভয় ধরিয়ে নানা অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে বাধ্য করতেন। অসহায়, দুস্থ মানুষগুলি ভয়ে এসব মেনে নিত, মেনে নিতে বাধ্য করতেন ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের সমাজপতিরা। অবশ্যই ইচ্ছা ও সামর্থ্যের বিরুদ্ধে। শ্রীচৈতন্য সরাসরি ভগবান এবং ভক্তের যোগসূত্রের ওপর গুরুত্ব দিতেন। অনুঘটকরূপী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্রয়োজন তিনি অস্বীকার করছিলেন। মানুষের কামনা-বাসনা চরিতার্থতার জন্য মানুষই ঈশ্বরের কাছে দরবার করার অধিকারী, তার হয়ে অন্যের ওকালতি করা অনাবশ্যক বলে চৈতন্যআধ্যাত্মবাদ আত্মপরিচয়লাভে সক্ষম হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত। সর্বোপরি তিনি ছিলেন রূপে গৌরবর্ণ বিশিষ্ট। সবদিক থেকে তিনি আদর্শ গুরুরূপে গৃহীত হয়েছিলেন আপামর জনসাধারণের কাছে।ফলে সমাজে দীর্ঘদিন অর্থহীন ধর্মাচারের অনুশাসনে পৃষ্ট মানুষজন মুক্তির দিশা পেল।অন্ত্যজশ্রেণির মানুষ কি কখনো সরাসরি ঈশ্বরের পূজার্চনার অধিকারী? এই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে বারবার। এতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সাহস যোগালেন। অনেক নিপীড়িত মানুষ ভেবে এসেছিলেন যে, তাদের সকল দুঃখ সব কিছুর মূলে দায়ী তাদের ভাগ্য, তাদের গত জন্মের পাপকার্যের কর্মফল। শ্রীচৈতন্যের কারণে মানুষের মন থেকে এসব অহেতুক চিন্তা ভাবনা দূরীভূত হল। ফলেসমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা বিশেষ করে শ্রীচৈতন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের মতো করে নিজেদের ধর্ম তৈরি করে নিল।এখানে চৈতন্যদেবের আধ্যাত্ম্যদর্শন কিছু অংশে গৃহীত হয়েছিল।তবে মূলত চৈতন্যকে প্রতীক বা মাধ্যম হিসেবেই তারা সর্বাধিক গ্রহণ করেছিল। চৈতন্যদেব নাম

মাহাত্ম্যের উপরে সবিশেষগুরুত্ব দিয়েছিলেন। সবকটি গৌণধর্মেই শ্রীচৈতন্যের সেই নাম মাহাত্ম্যের জয় জয়কারসূচিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেব মূর্তি পূজার কথা বলেননি। কোনো গৌণধর্মেই মূর্তিপূজা স্বীকৃত হয়নি। এখানে চৈতন্য দর্শন স্বীকৃত। তাছাড়া চৈতন্যদেব জাতিভেদ প্রথাও মানেননি, মানেননি তার প্রমাণ শ্রীচৈতন্যের পরামর্শে অদ্বৈতআচার্য কর্তৃক যবন হরিদাসকে উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান। যে নামসংকীর্তনের প্রচলন হলো শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে, সেখানে সমবেত কীর্তন অনুষ্ঠানও সকল শ্রেণির মানুষেরই অংশগ্রহণ ছিল স্বীকৃত। তাছাড়া এইভাবেও বিভিন্ন জাতপাতেরমানুষের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য গড়ে ওঠে। কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলাহাড়ি, লালনশাহী, গৌরবাদী,সহজিয়া- কমবেশি সব লোকধর্মই চৈতন্য আদর্শকে আত্মসাৎ করেছেন বিশেষত একটি জিনিস লক্ষ্য করার-এসব লোকধর্মই প্রবক্তাদের হয় শ্রীচৈতনের পরবর্তী অবতার বলে ঘোষণা করেছেন, অথবা শ্রীচৈতন্যদেবের সাথে তাদের প্রবক্তাদের অভিন্নতা ঘোষণা করেছে। সমাজের দীর্ঘদিনের লাঞ্ছিত,নিষ্পেষিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষগুলি চৈতন্যদেবের কারণে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অধিকার অর্জন করল। আত্মমর্যাদাবোধে উজ্জীবিত হলো, তাদের সেই পরিবর্তিত চেতনার প্রতিফলন ঘটল আঠারো-উনিশশতকের উদ্ভূত গৌণধর্ম সম্প্রদায়গুলির ক্ষেত্রে। লোকধর্মে ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকার অস্বীকৃত, মূর্তিপূজা অস্বীকৃত,মূলত: নাম মাহাত্ম্য আর বিশ্বাস স্বীকৃত হলো।[৩]

খুশি বিশ্বাসী ধর্সম্প্রদায় একটি লোকধর্ম। যার অভ্যুদয় হয়েছিল নদিয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের নিকটবর্তী ভাগা নামে একটি গ্রামে। এই ধর্মের প্রবর্তকখুশি বিশ্বাস নামক এক মুসলমান ব্যক্তি ভাগা গ্রামেরইবাসিন্দা। এই তথ্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করার- প্রথমত: লালন ফকিরকে বাদ দিলে এই দ্বিতীয় একটি লোকধর্ম, যার প্রবর্তক ছিলেন একজন মুসলমান। দ্বিতীয়তঃ খুশি বিশ্বাস লোকধর্মের আত্মপ্রকাশ চৈতন্য প্রভাবিত নদিয়া জেলাতেই। খুশি বিশ্বাসীদের সম্পর্কে খুব বেশি তত্ত্বগত বিষয় জানা যায় না। এই ধর্ম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আজ প্রায় বিলুপ্ত।এর অন্যতম কারণ হলো- অন্যন্য লোকধর্মের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই লোকধর্মটি টিকতে পারেনি।[৪] খুশি বিশ্বাসী সম্প্রদায়েরমতো একটি লোকধর্মের প্রতিষ্ঠা ও তার নেতৃত্ব দানের মতো যোগ্যতা পরবর্তীকালে কারো ছিল না। এই ধর্মে বিশ্বাসী মানুষগুলিকে সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে পরবর্তীকালের এই ধর্মাশ্রয়ী মানুষেরা এবং নেতারা। খুশি বিশ্বাসের সম্প্রদায়ীদের কোনো গানও তেমন পাওয়া যায় নি। যেমনটি পাওয়াগিয়েছে কর্তাভজা ও সাহেবধনীদের ক্ষেত্রে। যদিও, তা যদি সমবেত হয়, তবে সেই সুবাদে অনেক মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সেই সুযোগও ছিল অনুপস্থিত। খুব বেশি দূর পর্যন্ত এই ধর্মমত প্রসারলাভকরেনি ও প্রচারিতও হয়নি।৪ তা সত্ত্বেও বলতে হয় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিপরীতে গড়ে ওঠা নদিয়া জনপদের এই ধর্মসম্প্রদায়টি উনিশ শতকীয় ধর্মীয়প্রেক্ষাপটে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বহু মানুষ তাঁরএই ধর্মমত

গ্রহণ করেছিলেন। বিখ্যাত পন্ডিত ও মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর রচিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে খুশি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ীদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন-

> 'ইহারা ভোজনাদির সময়ে স্বম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণ-ভেদ স্বীকার করে না। সকল জাতিতে মিলিত হইয়া একত্র আহার করে এবং সে সময়ে পরস্পর পরস্পরের মুখে অন্নাদি অর্পণ করিয়া থাকে। এইরূপ আচরণকে "বিশ্বাস" কহে'।[৫]

নদিয়ার কৃষ্ণনগর মহকুমার অন্তর্গত নাকাশিপাড়া ব্লকের অন্তর্ভুক্ত দেবগ্রামের নিকটে ভাগা নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের খুশি বিশ্বাস নামে এক মুসলমান সাধক ও ধর্ম প্রচারক খুশি বিশ্বাসী ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্প্রদায় লোকেরা খুশি বিশ্বাসকে শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার স্বরূপ মনে করে থাকেন। কিন্তু এই সম্প্রদায়ীরা ঈশ্বরের সাকারত্ব স্বীকার করে না। অর্থাৎ এরা পরমেশ্বরের মূর্তি বা বিগ্রহ পুজো বিশ্বাস করে না। নিরাকারঈশ্বর সাধনাই এদের একমাত্র সাধন এবং প্রধান লক্ষ্য। খুশি বিশ্বাস তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের বলতেন-

> "তোরা আমাকে ডাকিস্। আমার কেউ থাকে, আমি তাকে ডাকবো"।[৬]

এরা ভোজনের সময় নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনরূপবর্ণভেদ-জাতিভেদ করেন না। সকল জাতির মানুষ একসঙ্গে বসে আহার করেন এবং একে অপরের মুখে অন্ন তুলে দেয়। এইরকম আচরণকে এরা "বিশ্বাস' বলে থাকেন। এই সম্প্রদায়ীরা কর্তাভজাদের মতো রোগগ্রস্তদের বিভিন্ন ভেষজ ঔষধ দেয়। নিঃসন্তানদের সন্তান উৎপাদন ও অন্যান্য নানা মনবাঞ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে কাগজে বা বৃক্ষ পত্রে আরবি অক্ষরে "জটিসার" নাম লিখে তাবিজ-কবচ দিয়ে থাকেন। এই কবচ তামা,রুপো বা সোনার কবচের মধ্যে রেখে ব্যবহার করতে হয়।[৭]তবে এরা কিন্তু সহজিয়া নন। মুসলমান উদাসীন খুশি বিশ্বাসে ধর্মমত ছিল অনেকটাই ফকিরিতন্ত্র ঘেঁষা। ফকির লালন সাঁই যখন ছেঁউড়িয়া আখড়া বাড়িতে থাকতেন, তার বেশ আগেই দেহ রাখেন খুশি বিশ্বাস। খুশি বিশ্বাস ছিলের আদ্যপান্ত মুসলমান ফকির। তিনিও লালন সাঁইয়ের মতোই গাছ-গাছালি চিনতেন এবং ভেষজ ঔষধ দিতেন।

বাংলার সিংহভাগ ফকির-ফ্যাকড়াদের সমাজে তখন চিকিৎসা বিদ্যার চল ছিল। এরা সকলেই ওষুধ দিতে পারতেন। গুল্মলতা চিনতেন। রক্তপিত্ত, কফ-বায়ু-হিক্কা, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, অরুচি, সর্দি-কাশি, জ্বর- এসব নানা রোগের ঔষধিবিদ্যা এরা শিখতেন। গুরু-পরম্পরায় এগুলো তাদের সহজাত বিদ্যায় ছিল। কর্তাভাজা ঘরের গুরুরাও এই বিদ্যাটা ভালো জানতেন। ফকিরিতন্ত্র আর ভেষজ বিদ্যার ক্ষেত্রে কর্তাভজাদের সঙ্গে খুশি বিশ্বাসীদের অভূতপূর্ব মিল লক্ষ্য করা যায়। গাছ-গাছড়ার মূল-রস-পাতা দিয়ে রোগের চিকিৎসা ফকিরি বিদ্যারই অন্তর্গত। ফকিরেরা সবাই কবিরাজি চিকিৎসা জানতেন। লালন সাঁইও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। লালনশাহী পন্থার উদগাতা

লালন ফকিরও ভেষজ বিদ্যা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ছেঁউড়িয়া আখড়াবাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি আশেপাশের গ্রাম ঘুরতেন ঘোড়ায় চড়ে কবিরাজি চিকিৎসা করার জন্য। লালন সাঁইও খুশি বিশ্বাসী সম্প্রদায় এবং কর্তাভজাদের ন্যায় ভেষজ বিদ্যার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর আখড়া বাড়িতে গুল্মলতার চাষ হতো। পথে-ঘাটে অযত্নে পড়ে থাকা বিভিন্ন গাছ-গাছালির স্থান হতো ছেঁউড়িয়ায় লালন ফকিরের আখড়াবাড়িতে।[৮]

ভাগাগ্রামেও মানুষের চিকিৎসা করতেন ফকির খুশি বিশ্বাস। তিনি সন্তান না আসা নারীদের ঔষধ দিতেন। লালন শাহ খুশি বিশ্বাসের সমসাময়িক ছিলেন। খুশি বিশ্বাসের কথা সাঁইজি জানতেন। লালন ফকির ঘোষপাড়াকে বেশি করে চিনতেন। ঘোষপাড়ার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে অনেকে মনে করে থাকেন। তিনি নাকি একবার সতীমায়ের দোলমেলার অনুষ্ঠানে ঘোষপাড়া এসেছিলেন। কেননা ঘোষপাড়ার সতীমা ছিলেন আরোঅধিক পরিমাণে অলৌকিক শক্তিধারী গুরুমা। তাঁর ভক্ত-শিষ্য নদিয়াসহ বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। লালন সাঁইয়ের ঘরের ভাবকে মান্যতা দিতেন তাঁর সাধন তরিকায়। সেজন্যই লালনশাহী ঘরে আখড়া বাড়িতে সতীমাকে এখনো ভক্তি দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে।ভাগা গ্রামে খুশি বিশ্বাসের কবরখানা আছে ঝোপঝাড়ের ভেতরে। ইটের গাঁথনি বিশিষ্ট কবরখানাটি এখনো আছে। খুশি বিশ্বাসের সম্প্রদায়িকদের কেউ আর এখানে তেমন বাস করেন না। খুশি বিশ্বাসের ভিটেখানাও এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। খুশি বিশ্বাস ফকিরি ধারার সাধক বলেই তাঁর সন্তান ছিল না। তাঁর সাধনসঙ্গিনীর নামও জানা যায় না।একসময়ে খুশিবিশ্বাসের বোনের বংশ এই কবর বাড়ি দেখাশোনা করতেন। সে বংশেরও এখন আর কেউ নেই। খুশি বিশ্বাস কবে দেহ রেখেছেন কেউই ভালো করে বলতে পারেন না। তবে জায়গাটিকে এখন লোকে “আস্তাগা”বলে থাকেন।[৯] ভাগা নামটি আর সেভাবেব্যবহৃত হয়না। আর এখানে যে একজন বহু পুরনো সিদ্ধাই ফকির থাকতেন একথা গ্রামের লোকজন জানে। খুশি বিশ্বাস তাঁর নাম। এর বেশি কেউ কিছু তেমনটি জানে না। তবে খুশি বিশ্বাসের কিছু ভক্তশিষ্য উনিশ শতকের শেষদিকেও বর্তমান ছিল। কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া আখড়াবাড়ির সমসাময়িক ছিল কর্তাভজা, সাহেবধনী,বলাহাড়ি,খুশি বিশ্বাসী ধর্সম্প্রদায়। সতীমা মারা যান উনিশ শতকের প্রথম ভাগে, ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে। ইতিপূর্বে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে রামশরণ পাল ও সতীমার পুত্র দুলালচাঁদ মারা যান। বলা বাহুল্য এখনো পর্যন্ত উনিশ শতকে উদ্ভূত বাংলার সবচেয়ে বড় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিপরীতে গড়ে ওঠা ধর্মসম্প্রদায় হলো কর্তাভজা ধর্মসম্প্রদায়। লালন ফকির খুশি বিশ্বাসের সমসাময়িক হলেও তাঁদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না। দূরত্বের কারণে ভাগা গ্রাম আর ছেঁউড়িয়ার মধ্যে কোনো যোগাযোগ স্থাপিত হতে পারেনি। আর খুশি বিশ্বাস পরলোকগমন করার পর তার আন্দোলনের স্রোতধারা লালন শাহের আখড়াবাড়ি অবধি পৌঁছায়নি। খুশি বিশ্বাস কবে দেহ রাখেন এ তথ্য জানা না

গেলেও ১৮৭০ সাল নাগাদ খুশি বিশ্বাসীরা ভাগা গ্রামে ধর্মচর্চা করতেন।[১০] তারপর বিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে এরা হারিয়ে যেতে থাকে। যদিও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা এখনো ভাগা গ্রামের মানুষের আছে। বর্তমানে হরিপদ মন্ডল একজন সিদ্ধাই ফকির। তার কাছে খুশি বিশ্বাসের কবরখানা পবিত্র স্থান। এক সময় এখানে এই সম্প্রদায়ীরা ফুল ও "চেরাগ" বা বাতি দিতেন। এখন মানুষের চোখের রশ্মিই আসল চেরাগ। খুশি বিশ্বাসের দেহ গেলেও সেখানে তাঁর চোখ জ্বাজল্যমান। তিনি সব দেখতে পান।তাঁর ভক্তরা কে কখন তাঁকে ভক্তি সহকারে শ্রদ্ধা করেন।এ ধারণা তাঁরশিষ্যদের মধ্যেপ্রচলিতরয়েছে। ধর্ম সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা বিলীয়মান-বিশেষত ধর্ম সংশ্লিষ্ট অতি লৌকিকতায় শিক্ষিত মানুষের আস্থা নেই। মহত্ত্বর মানবধর্মই ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে দিকে দিকে। ফলত: অন্যান্য লোকধর্মগুলি যেমন ক্রমেই স্থিমিত হচ্ছে, খুশি বিশ্বাসী সম্প্রদায় হয়তো তাদের তুলনায় একটু বেশি হারিয়ে গেছে।[১১] এটি কালের নিয়মেই ঘটেছে। তবে খুশি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আজও মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে ইতিহাসের পাতায় তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এই সম্প্রদায়ের বিশেষ কতগুলি দিক লক্ষ্য করা যায়।উনিশ শতকে উদ্ভূত চৈতন্যধর্মের উত্তরাধিকারী হিসাবে এই গোষ্ঠী নদিয়ারএকটি অন্যতমগৌণ লোকধর্ম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করায়, তার নানাবিদ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।[১২] বাংলার ধর্ম ও সামাজিক ইতিহাসে খুশি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সেই বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখের দাবি রাখে। এগুলি হল-প্রথমত,এই ধর্ম সম্প্রদায় চৈতন্য পরবর্তী বাংলার একটি লোকধর্ম, যার অভ্যুত্থান হয়েছিল চৈতন্য লীলাভূমি নদিয়াতে। এখানেই অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মতো "খুশিপন্থা" মতবাদের উদ্ভব ঘটে।দ্বিতীয়ত,এই গোষ্ঠীটি গ্রামকেন্দ্রিক বৃহত্তর মুসলিম সমাজের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে কিছু নিম্নবর্ণের হিন্দু এই সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধর্মাচরণ পালন করতেন।তৃতীয়ত,লালনশাহী সম্প্রদায়ের অনুকরণে হিন্দু-মুসলিম রীতি অনুযায়ী হেয়ালিপূর্ণ বচন ও গানের মাধ্যমে এই সম্প্রদায়ীগণ খুশি বিশ্বাসকে চৈতন্যের অবতার বলে মনে করে ধর্ম প্রচার করতেন।চতুর্থত,এর ফলে সমাজে দীর্ঘদিনেরলাঞ্ছিত-নির্যাতিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত, শোষিত শ্রেণির মানুষেরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অধিকার অর্জন করে। এক্ষেত্রে চৈতন্যের দর্শনকে প্রতীক রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।পঞ্চমত,এদের স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে যেহেতু বর্ণভেদ অস্বীকৃত, তাই একে অন্যের মুখে অন্ন তুলে দিয়ে এই সম্প্রদায়গত ঐক্যে বিশ্বাস স্থাপন করে এরা। অর্থাৎ এরা বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করেন না।ষষ্ঠত,খুশি বিশ্বাসকে যারা নিজেদের আরাধ্য বলে মনে করেন, তারা তাঁর নির্দেশে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব, এটা বিশ্বাস করে, আর সেই নির্দেশেরই অঙ্গস্বরূপ একত্রে ভোজন পর্বের সমাধা সম্পন্ন করে। এই সম্প্রদায়ীরা সম্প্রীতি রক্ষার্থে একত্রে পুংক্তিভোজনের

আয়োজন করে থাকেন।সপ্তমত,খুশি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ে আশ্রিত মানুষদের একটি পরিচয় তারা খুশি বিশ্বাসী। সেই পরিচয়টি প্রকাশ করতে এমনআচার অনুষ্ঠান, এই বিশ্বাসে যে তাহলেই তাদের পরিচয় অন্যের কাছে স্পষ্টতর হবে। অর্থাৎ অন্যের থেকে পৃথক বোঝানোর জন্যই উক্ত অনুষ্ঠানগুলি তারা করে থাকেন।অষ্টমত,এদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল-এরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকার অস্বীকার করে।নবমত,এরা মূর্তি পূজার বিরোধিতা করেন। অর্থাৎ এরা নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনাতেই বিশ্বাসী।দশমত,এই সম্প্রদায় খুশি বিশ্বাস'সাকাররূপ'পরমেশ্বর হিসাবে বন্দিত হয়।একাদশত,লালন শাহের সমসাময়িক প্রথম মুসলিম ধর্ম-প্রবর্তক যিনি চৈতন্য পরবর্তী কালে ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। প্রখর ও কেন্দ্রীয় মূলধারারপ্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিপরীতে সমকালীন সময়ে একটি পৃথক ধর্মগোষ্ঠী গঠন করা বড্ড সাহসের পরিচয় বহন করে।দ্বাদশত,নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান শ্রেণির মানুষেরা এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। কেউ কেউ হিন্দু হয়েও খুশি বিশ্বাসের ধর্ম পালনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন।ত্রয়োদশত,এই সম্প্রদায়ীরা অলৌকিকত্ব বিশ্বাস করেন। বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা অবলম্বন করে তাকে ধর্মেরঅনুসঙ্গহিসেবেযুক্ত করার চেষ্টা করেন। এটা তাদের বিশ্বাস।এবং চতুর্দশত,এই ধর্মে নিজের প্রতি এবং খুশি বিশ্বাসের প্রতি চরম বিশ্বাস রাখার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই সম্প্রদায়ের কাছে বিশ্বাসই হলো আসল সাধনতত্ত্ব। বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের সক্ষম হবে বলে মনে করে থাকেন।

সুতরাং, এদের এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাই প্রমাণ করে যে, খুশি বিশ্বাসী সম্প্রদায় উনিশ শতকের টালমাটাল সময়ে সমন্বয়বাদী চিন্তাধারার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলার ধর্ম ও সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা তাই কোনো ভাবে ছোট করে ভাবা যায় না। ষোড়শ শতক থেকে শুরু হয়ে উনিশ শতক অতিক্রম করে বিশ শতকের বাংলা তথা ভারতীয় ধর্ম ও সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে খুশি বিশ্বাসী ধর্মসম্প্রদায় গুরুত্বের সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে ধর্মীয় পরিমণ্ডলের ইতিহাসে।

তথ্যসূত্র:

১. গোস্বামী, নবদ্বীপচন্দ্র,বৈষ্ণব ব্রতদিন নির্ণয়,নবদ্বীপ,নদিয়া,১৮৯১, পৃ.৫১-৫২।

২. চক্রবর্তী, সুধীর,লোকধর্ম,নদিয়া জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ,লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,১ম প্রকাশ, ২০০৩, পৃ.৩৩-৪৬।

৩. ঐ,বাংলার গৌণধর্ম সাহেবধনী ও বলাহাড়ি,পুস্তক বিপণি, কলকাতা,১মপরিবর্ধিত পরিমার্জিত ও সম্মিলিত সং,মে,২০০৩,পৃ.৩১।

৪. প্রামানিক,প্রবীর, নদিয়া জেলার লোকধর্ম, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট, ২০১০, পৃ.১৪১-১৪৭।

৫. দত্ত,অক্ষয়কুমার,ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১মভাগ,বারিদবরণ ঘোষ(সম্পা.), করুণা প্রকাশনী,কলকাতা, ১মপ্রকাশ, ১৮৭০, ৪র্থকরুণা সং মুদ্রণ,১৪২২, পৃ.২৩৯।

৬. ঐ, ১ম খন্ড, সাযযাদ কাদির (অনু.ও ভূমিকা), ১মদিব্য প্রকাশ সং, ঢাকা, জানুয়ারি, ২০১৭, পৃ.২০১।

৭. রুন্নু,মফিজুর রহমান,বাঙালির লৌকিক ধর্ম,কথা প্রকাশ,ঢাকা, ১মপ্রকাশ,২০১২, ২য় মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ.২৯-৩১।

৮. প্রামানিক,প্রবীর,পূর্বোক্ত।

৯. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত।

১০. সরকার, সোমব্রত, স্বাদ-সাধনার আখড়া, ৯ ঋকালবুকস্, কলকাতা, ১মপ্রকাশ, ১৪২৪, পৃ.১২৫-১২৮।

১১. দত্ত, অক্ষয়কুমার, প্রাগুক্ত।

১২. ভট্টাচার্য, তরুণ ও অন্যান্য (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ নদিয়া জেলা সংখ্যা ১৪০৪, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, বর্ষ ৩১, সংখ্যা ১৭-২১, ২৬ সেপ্টেম্বর, ৩, ২৪, ৩১ অক্টোবর, ৭ নভেম্বর, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ.৮১-৮৮।

একক মাতৃত্ব ও মহাকাব্যের নারীরা : একটি সমীক্ষা

ভক্তিলতা দাস
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, সংস্কৃত বিভাগ,
গৌর মোহন শচীন মণ্ডল মহাবিদ্যালয়,
বীরেশ্বরপুর, দঃ ২৪ পরগনা

সারসংক্ষেপ : 'একক মাতৃত্ব' এখনকার যুগে বহুচর্চিত একটি বিষয়। একক মাতৃত্বের ধারণা বহুপূর্বে প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্য থেকেও আমরা পেতে পারি। আলোচ্য প্রবন্ধে ভারতবর্ষের প্রাণ-স্বরূপ দুই মহাকাব্যের তিন মহীয়সী নারীচরিত্রের পর্যালোচনা করা হবে, অবশ্যই একক মাতৃত্বের ছায়ায়। প্রবন্ধে উঠে আসবে নারী চরিত্রগুলির সংগ্রাম যা তাঁদের মনের হদিশ দেবে। এই যুদ্ধ অবশ্যই ঢাল-তলোয়ারহীন; মান-অভিমান, অপমান মনের গভীরে পুঁতে রেখে সন্তানকে বড়ো করে তোলার নিরলস প্রয়াস প্রবন্ধটি লেখায় অনুপ্রেরণা ও উপজীব্য। প্রবন্ধে স্থান পাবে বর্তমান কালের নিরিখে তৎকালীন সময়ের পরিবেশ পরিস্থিতি।
সূচক শব্দ : একক মাতৃত্ব, মহাভারত, রামায়ণ, সীতা, কুন্তী, শকুন্তলা, মহাকাব্য।

মূল আলোচনা:

মন্ত্রদ্রষ্টা আম্ভৃণীর দ্বারা সেই কবে উদ্ঘোষিত হয়েছিল— "ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি..."। সেই মন্ত্রে ছিল সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তা, আত্মতত্ত্বের হদিশ। "অহং রাষ্ট্রী সংগমনী" আম্ভৃণীর মন্ত্রে লুকিয়েছিল মাতৃকাশক্তির বীজও। সেই মাতৃকাশক্তির জয়গানে ছিল একক মাতৃত্বের স্ফুরণ। অথচ এখনও একক মাতৃত্বের ধারণা বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষেও স্বাভাবিক বিষয়ে পর্যবসিত হয়নি। বৈদিকসাহিত্য থেকে ধ্রুপদীসাহিত্য প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় একক মাতৃত্বের ধারণার অঙ্কুর তন্মধ্যেই পল্লবিত হয়েছে ধীরে ধীরে। ভারতবর্ষের স্তম্ভস্বরূপ দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের অবস্থান। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মহাকাব্যিক তিন নারী চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে চলেছি যাঁরা এক একজন একক মাতৃত্বের অধিকারিণী।

"দেবী বিবরং দাতুমর্হতি"[১]

'শ্রদ্ধা', 'যশস্বিনী' সন্তানসম্ভবা সীতাকে শুধুমাত্র লোকাপবাদের কারণে পরম পুরুষোত্তম রাজা রাম ত্যাগ করেছিলেন। কেন না—

"অকীর্তির্যস্য গীয়েত লোকে ভূতস্য কস্যচিৎ।
পতত্যেবাধমাঁল্লোকান্ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্যতে।।"[২]

অপবাদের ফলে অধোগতি প্রাপ্তির ভয় ও তার থেকে রক্ষা পাওয়ার ইচ্ছা পুরুষোত্তমের কাছে ছিল রাষ্ট্রনীতিই। যদিও বিবাহপূর্বে দোষাবিষ্কারে সম্বন্ধ বিনষ্ট হলেও

বিবাহপরবর্তী গার্হস্থ্যধর্মে ধর্মপত্নীত্যাগ কখনই প্রশংসনীয় নয়।[৩] রাঘব তাঁর ধর্মপত্নী সীতাকে ত্যাগের বিষয়ে সিদ্ধান্তপ্রকাশপূর্বক পরমপ্রিয় লক্ষ্মণকে বাল্মীকি-আশ্রমে সীতাকে রেখে আসার আদেশ করলেন। বনান্তে পৌঁছে সীতা বুঝলেন তিনি ভ্রমণে আসেননি। প্রতারিতা হয়েছেন বুঝেও শাসকের ইচ্ছাকেই এক্ষেত্রে সীতা শিরে ধারণ করেছিলেন কারণ তিনি সহধর্মিণী, ভার্যা—

"সা ভার্যা যা পতিব্রতা"।[৪]

এক্ষেত্রে সীতার প্রতি সহমর্মিতা থাকলেও লক্ষ্মণ ও অন্যান্য ভ্রাতারা রাজরোষ, ভ্রাতৃপ্রীতি ও রাজকর্তব্যের মধ্যেই সীমায়িত থেকে গেলেন।[৫] সীতা মহাকাব্যের প্রথম একক অভিভাবকত্বের পথিকৃৎ অথবা উদাহরণ বললে অত্যুক্তি হবে না। অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভে লব-কুশের যুদ্ধে শত্রুঘ্ন, ভরত, লক্ষ্মণ ও শেষে রামের পরাজয়, রাম-দরবারে লব-কুশ কর্তৃক রামায়ণগানের পরিবেশন ও রাম সহ সকল সভাসদের তা শ্রবণ প্রভৃতি ঘটনাপারম্পর্যে সীতার এক জীবনে লব-কুশের বেড়ে ওঠা ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। তারা ক্ষত্রিয়জ তেজে বলীয়ান্ আবার 'তাললয়োপপন্ন' হয়ে রামায়ণ গানেও পটু। বাল্মীকির তত্ত্ববধানে লব-কুশ পরিবেশিত রামায়ণ গান বাল্মীকির আর্শীবাদেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।—

"ঋষিবাটেষু পুণ্যেষু ব্রাহ্মণাবসথেষু চ।
রথ্যাসু রাজমার্গেষু পার্থিবানাং গৃহেষু চ।।"[৬]

উত্তরকাণ্ডের সিংহভাগ বা সমগ্র উত্তরকাণ্ডই প্রক্ষিপ্ত। এটি গবেষকদের মত, যদিও এই কাণ্ডটি জনপ্রিয় ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে মিশে গেছে। তৈরী হয়েছে নানা কিংবদন্তী। এই কাণ্ডে সীতা যেন একক মাতৃত্বের মাতৃকা।

"ত্বামৃতেঽপি হি পুত্রো মে পালয়িস্যতি"[৭]

মহাভারতের বীজ দুষ্যন্ত-শকুন্তলা উপাখ্যান। সর্বজনবিদিত উপাখ্যানটিতে রাজা দুষ্যন্ত কর্তৃক শকুন্তলাকে রাজ-দরবারে অপমানিত হতে হয়েছিল সর্বসম্মুখে—

"মেনকা কেমন নারী কেবা নাহি জানে।
মায়ের প্রকৃতি তোর খন্ডিবে কেমনে।।
নিশ্চয় মায়ের মত তোমার প্রকৃতি।
এই পুত্র সেই মত, নয় মোর মতি।।
মিথ্যা প্রবঞ্চনা করি প্রতার আমারে।
যাহ কিম্ব থাক, কেহ না জিজ্ঞাসে তারে।।"[৮]

যে রাজা মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ক্ষণকাল স্থির থাকতে পারেননি, তিনি রাজদরবারে শকুন্তলাকে চিনতেও পারলেন না। স্পষ্ট ঘোষণা করলেন, "নাহং ত্বামভিজানামি যথেষ্টং গম্যতাং ত্বয়া।"[৯] ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশু ভরতকে কণ্বাশ্রমে শকুন্তলা বড় করে দুষ্যন্তের প্রাসাদমুখী হলেন। ভরতের (সর্বদমন) 'ছয় বর্ষ পূর্ণ হৈল

রাজা নাহি জানে'।[১০] রাজপ্রাসাদে সভাসদ্‌দের মাঝে যখন শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাতা, তখন রাজার 'জানিয়া না জানি আমি' ভাব।[১১] 'পূর্বকথা স্মরণ হলেও'।[১২] প্রত্যুত্তরে শকুন্তলাও সর্বসম্মুখে প্রতিজ্ঞা করলেন— "দুষ্মন্ত[১৩], তোমার সাহায্য না পেলেও আমার পুত্র হিমালয়-ভূষিত চতুঃসাগরবেষ্টিত এই পৃথিবীতে রাজত্ব করবে।"[১৪]

ভবিতব্য হলেও নির্দোষ নারীর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এক একক অভিভাবিকার প্রতিস্পর্দ্ধাই এই উক্তির মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে বলা যায়। দেববাণী যদিও রাজাকে পুত্রসহ স্ত্রীকে মেনে নিতে বাধ্য করেছিল। ফলতঃ বহুপত্নীযুক্ত (হয়তো বা বহুসংগ্রহণ অর্থাৎ বহুসম্পর্কে লিপ্ত) রাজা সম্ভাব্য অপবাদে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

"তে ভাগধেয়ানি পৃচ্ছ"[১৫]

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এ ভরত অর্থাৎ সর্বদমনের শৈশবের চারণক্ষেত্র আবার মারীচাশ্রম, যেখানে মাতা শকুন্তলার সাথে মাতৃস্নেহদায়িনী আশ্রমবাসিনী তাপসীদেরও পেয়েছে শিশু সর্বদমন। মহাভারত আশ্রিত এই নাটকটি ধ্রুপদীসাহিত্যে নাম লিখিয়েছে তার জনপ্রিয়তার জন্যই। মহাভারতের দুষ্যন্ত-শকুন্তলা উপাখ্যানের পর এই নাটকের নির্যাস সকল পাঠকহৃদয়কে সিক্ত করেছে। ফলতঃ নাটকটির প্রসঙ্গ এসেই পড়ে। সুতরাং বৃত্তসম্পূর্ণকরণে নাটকটি আলোচিতব্য। নাটকটিতে কালিদাস রাজ-দরবারে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার সাক্ষাতে উপাখ্যানের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে সন্তুষ্ট হননি। দুষ্যন্তচরিত্রের শুদ্ধিকরণের জন্য নাটকের গতি এগিয়ে নিয়ে গেছেন মারীচ আশ্রম পর্যন্ত। দেবলোকে রাক্ষসদমন ক'রে মর্ত্যে আগমনকালে বিশ্রামের ইচ্ছায় মারীচ আশ্রমে দুষ্যন্তের পদার্পণ। আড়াল থেকে আশ্রমের সাথে অসমঞ্জস এক দুর্দমনীয় শিশুকে দেখে শিশুটির মধ্যে রাজা আশ্রমোচিত সাত্ত্বিকভাবের অভাব লক্ষ্য করেন ('কৃষ্ণসর্পশিশুনেব চন্দনম্'[১৬])। যতই রাক্ষসকুলের আবহে বেড়ে উঠুন না কেন প্রহ্লাদ পরম বৈষ্ণব ছিলেন, কারণ ছিল তাঁর পিতার তিন প্রজন্মের মূলে জয়-বিজয় বৃত্তান্ত। তেমনই আশ্রমবাসী এই শিশু অর্থাৎ ভবিষ্যৎ-এর ভরত তার স্বভাবগুণেই চঞ্চল। রজঃগুণের অধিকারী বংশধারার সৌজন্যে। পাঠককুল তথা রাজা এই শিশুটির পিতৃপরিচয়ের আভাস পেতে শুরু করেছেন আশ্রমস্থ তাপসীর "ন খলু অয়ং ঋষিকুমারঃ"[১৭] উক্তিটির মাধ্যমে। আশঙ্কায় শিলমোহর পড়ল যখন তাপসী বলছেন, "অপ্সরঃ সংবন্ধেন অস্য জননী অত্র দেবগুরোঃ তপোবনে প্রসূতা।"[১৮] 'ধর্মদারপরিত্যাগী' রাজা দুষ্যন্তের নাম উচ্চারণ করতেও আগ্রহী নন তাপসী। রাজা পঞ্চম অঙ্কে 'স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বম্' বিশেষণে বিশেষায়িত ক'রে গান্ধর্বমতে বিবাহ করা ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে অস্বীকার করেছিলেন। রাজা সেই শকুন্তলাকেই এবার ব্রতাদি পালনে শীর্ণবদনা, দৈহিক সংস্কারে উদাসীনা রূপে দেখবেন।[১৯] শকুন্তলা পতিব্রতাই নন, তিনি অভিমানিনী একক মাতা। সীতার মতই সন্তানকে পিতৃপরিচয় জানাতে অস্বস্তিতে পড়েননি শকুন্তলা। কেননা একদা দুষ্যন্তপ্রদত্ত 'সুনিকৃষ্টা', 'পুংশ্চলীব' বিশেষণগুলি

কদাপি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি, তিনি অপাপবিদ্ধা হওয়ায়। তাই এখন তিনি শিশুকে বড় ক'রে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন। শকুন্তলা মানসিকভাবে যতটা দৃঢ় ও পরিণত হয়ে উঠেছেন অন্তিম তথা এই সপ্তম অঙ্কে, ততটা পঞ্চমাঙ্কে ছিলেন না। 'পশ্চাত্তাপবিবর্ণ' স্বামীকে দেখে ক্ষণিকের জন্য চিনতে পারেননি শকুন্তলা। তাঁর হৃদয়ে তখনও বাস করছেন অতীতের 'অনার্য' রাজা দুষ্যন্ত।

"বর্তিতব্যং স্বপুত্রবৎ"[২০]

বর্তমানে অনেকক্ষেত্রেই নারী একক মাতৃত্বের স্বাদ পেতে চান স্বাধীনভাবে জীবন অতিবাহন করার জন্য, সেখানে থাকবে না কোনো ঝঞ্ঝাট। উল্টে বহু ক্ষেত্রে নিগৃহীতা হয়ে বেঁচে থাকার রসদ হিসাবে সন্তানকে আঁকরে ধরেছেন অনেক নারী। সমাজে শেষতঃ বহু নারীই একক মাতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণা হচ্ছেন নিছকই পরিস্থিতিবশে এবং এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন পঞ্চকন্যার অন্যতমা কুন্তী। কর্ণকে কুন্তী লোকলজ্জায় ত্যাগ করলেও ব্যুষিতাশ্ব রাজার দৃষ্টান্ত পাণ্ডুর সমীপে বর্ণন করে তিনি উত্তম পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে চাননি।—

"কুন্তী বলে, রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
কি কারণে কহ তুমি বচন কুৎসিত।।"[২১]

এরপরেও পাণ্ডুর অত্যন্ত অনুরোধে তাঁর অনুমতিক্রমেই কুন্তী রাজি হন—

"অদ্যৈব ত্বং বরারোহে প্রযতস্ব যথাবিধি।
ধর্ম্মমাবাহয় শুভে স হি লোকেষু পুণ্যভাক্।।"[২২]

শুরু হল কুন্তীর জীবনযুদ্ধ। পাণ্ডুর সঙ্গে সহমৃতা হওয়ার সিদ্ধান্ত অবশ্যই মাদ্রীকে পতিব্রতা ও সাহসী হওয়ার তকমা দিয়েছে কিন্তু মরণের পূর্বে মাদ্রী যা স্পষ্টতঃ বলেছেন তা অনুবাদকের লেখনীতে এইরূপ—

"তোমার তিন পুত্রকে আমি নিজ পুত্রের ন্যায় দেখতে পারব না, তুমিই আমার দুই পুত্রকে নিজপুত্রবৎ পালন কর।"[২৩] বলা বাহুল্য, কোনো মা নিজ দায়িত্বে যখন সন্তানদের বড় করছেন তখন ঝড়-ঝঞ্ঝাও সামলাতে হয়। পাণ্ডু-মাদ্রীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সমাপ্ত হতে না হতেই দুর্যোধন ভীমের খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। সন্তানের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার সেই শুরু। নিজ ভাগ্য জুড়েছেন পুত্রদের সঙ্গে এবং তাঁর জীবনযুদ্ধও থেমেছে পুত্রদের জীবনসংঘর্ষের সঙ্গেই।

বর্তমানে আইনব্যবস্থাও শিশুকে মায়ের রক্ষণাবেক্ষণে প্রেরণ করার পক্ষপাতী। যদিও 'Sole Custody' মায়ের আর্থিক সচ্ছলতা দেখে নির্ধারণ করা হয়। সীতা উপাখ্যান হয়ত এই যুগে অন্য মোড় নিতে পারত। বস্তুতঃ প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়দের জন্য গান্ধর্ববিবাহ শাস্ত্রসম্মত ছিল। লিভ-ইন না হলেও বর্তমান আইনব্যবস্থায় এমন বিবাহ Voidable Marriage এর অন্তর্ভুক্ত Nullity Marriage হিসাবে বিবেচিত। বর্তমান আইনের নিরিখে তদ্‌সত্ত্বেও দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বিবাহ সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না শিশু

বর্তমান থাকায়। সেক্ষেত্রে অনেক সম্ভাবনা তৈরী হয় এ যুগে উপাখ্যানটির পুনর্নির্মাণ সংঘটিত হলে। গান্ধর্ববিবাহের প্রায় নয় বছর পরে (মহাপুরুষরা গর্ভে দীর্ঘদিন থাকেন। গান্ধর্ববিবাহের তিনবছর পর ভরতের জন্ম হয় ও ছয় বছর পর্যন্ত পিতার মুখ দেখেননি তিনি)[২৪] প্রমাণ সাপেক্ষে রাজার স্ত্রী ও পুত্রকে অস্বীকার করার সুযোগ তৈরী হতে পারত এবং সেটি বৈধ হিসাবে বিবেচিত হত আইনসাপেক্ষেই! তৈরী হতে পারত উলট্‌পুরাণ। অসহায় পাণ্ডুও কুন্তীর কাছে উপায়হীনভাবে সমর্পণ করেছিলেন। পাণ্ডুর মৃত্যুভয় কুন্তীর 'একক মাতৃত্বে'র পথকে প্রশস্ত করেছিল। মহাকাব্যিক এই তিন নারী নিজ ব্যক্তিত্বে সদা সমুজ্জ্বল ও স্বয়ংসিদ্ধা। তাই যুগে যুগে তাঁর বহুলচর্চিতও। তবে আরও অনেক মহাকাব্যিক চরিত্র খুঁজলে একক মাতৃত্বের আভাস পাওয়া যাবে যা আলোচনাসাপেক্ষ। ক্ষুদ্র পরিসরে তা স্থগিত রইল।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রীবাল্মীকীয় রামায়ণ (দ্বিতীয় খণ্ড), ৭/৯৭/১৬, পৃ. ৮৯৯
২. তদেব, ৭/৪৫/১২, পৃ. ৭৯৭
৩. নারদস্মৃতি, ১২/৩১, ৩৪, ৩৭, পৃ. ৪৭-৪৮
৪. হিতোপদেশ, ১.২০৯, আন্তরজাল
৫. শ্রীবাল্মীকীয় রামায়ণ (দ্বিতীয় খণ্ড), ৭/৪৫/২০, ২১, পৃ. ৭৯৮
৬. তদেব, ৭/৯৩/৬, পৃ. ৮৯১
৭. মহাভারতম্ (প্রথম খণ্ড), ১/৭৪/১০৮, পৃ. ২৭২
৮. কাশীদাসী মহাভারত, ১ম পর্ব/দুষ্যন্ত রাজার সহিত শকুন্তলার বিবাহ, পৃ. ৭৬
৯. মহাভারতম্ (প্রথম খণ্ড), ১/৭৪/৮১, পৃ. ২৭০
১০. কাশীদাসী মহাভারত, ১ম পর্ব/দুষ্যন্ত রাজার সহিত শকুন্তলার বিবাহ, পৃ. ৭৪
১১. তদেব, পৃ. ৭৬
১২. রাজশেখর বসু অনূদিত মহাভারত, ১/৫/১৪, পৃ. ৩৭
১৩. পণ্ডিত কাশীদাস ও অনুবাদক রাজশেখর বসু 'দুষ্মন্ত' বানানটি ব্যবহার করেছেন।
১৪. রাজশেখর বসু অনূদিত মহাভারত, ১/৫/১৪, পৃ. ৩৭
১৫. অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫২৩
১৬. তদেব, ৭/১৮, পৃ. ৫০৬
১৭. তদেব, পৃ. ৫০৭
১৮. তদেব, পৃ. ৫১১
১৯. তদেব, ৭/২১, পৃ. ৫১৮
২০. মহাভারতম্ (প্রথম খণ্ড), ১/১২৪/২৮, পৃ. ৪৩৫
২১. কাশীদাসী মহাভারত, ১ম পর্ব/ পুত্রোৎপাদনে কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর অনুমতি, পৃ. ১১৮

২২. মহাভারতম্ (প্রথম খণ্ড), ১/১২১/১৭, পৃ. ৪২০
২৩. রাজশেখর বসু অনূদিত মহাভারত, ১/৫/২০, পৃ. ৫১

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. কালিদাস, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পা.), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৮ (প্র. সংস্করণ ১৯৮৮)।
২. কাশীদাস, মহাভারত, বেণীমাধব শীল (সম্পা.), অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা, মুদ্রণকাল ১৩৯৪ (বঙ্গা.)।
৩. নারদস্মৃতি, নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (সম্পা. ও অনু.), সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, মুদ্রণকাল অজ্ঞাত।
৪. বাল্মীকি-রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য (অনু.), ভারবি, কলকাতা, তৃঃ মুদ্রণ ১৯৯৭ (প্রথম অখণ্ড সংস্করণ ১৯৭৮)।
৫. মহাভারত, রাজশেখর বসু (অনু.), এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, চতুর্দশ মুদ্রণ ১৪২০ (বঙ্গা.) (প্র. মুদ্রণ ১৩৫৬)।
৬. শ্রীবাল্মীকীয় রামায়ণ (দ্বিতীয় খণ্ড), গীতাপ্রেস, গোরখপুর, ত্রিচত্বাবিংশ পুনর্মুদ্রণ।
৭. শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস, মহাভারত (প্রথম খণ্ড), রামনারায়ণ শাস্ত্রী (অনু.), গীতাপ্রেস, গোরখপুর, অষ্টাদশ পুনর্মুদ্রণ।
৮. The First Book of the Hitopades’a. Friedrich Max müller. London, 1864.

e-references

https://youtu.be/vH8pT-D_DEQ
Wikipedia
www.archive.org
www.Legalserviceindia

চিঠিপত্র ‘একাদশ খণ্ড’-এ রবীন্দ্রনাথের দুঃখভাবনা

শর্মিষ্ঠা ধারা
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু মানবজীবনের দুঃখের কারণ এই দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায়ের জন্য গৌতম বুদ্ধ কিছু মার্গ বা পথের উল্লেখ করেছিলেন। ‘দুঃখ’ ও ‘মৃত্যু’ বৌদ্ধ দর্শনে যেমন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তেমনই রবীন্দ্র দর্শনেও ‘দুঃখ’ ও ‘মৃত্যু’র ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিজ জীবনে এত বহুল মৃত্যু ও বিচ্ছেদ বেদনা তিনি ভোগ করেছেন এবং সেই দুঃসহ বেদনা থেকে নিষ্কৃতির যে পথ তিনি অনুসরণ করেছেন অন্যকেও সেই পদ্ধতি অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছেন। চিঠিপত্র ‘একাদশ খণ্ড’ গ্রন্থটি কবি অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী ও তার মা অনিন্দিতা দেবীকে লিখিত পত্রগুচ্ছের দলিল। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনব্যাপী জীবন ও মৃত্যুকে যে দার্শনিক দৃষ্টিতে সম্যক রূপে দেখতে পেয়েছেন এবং সারা জীবনব্যাপী মৃত্যুকে জীবনের মতো করেই ভালোবাসতে পেরেছেন তাই কবি অমিয়চন্দ্রকে ও অসংখ্য পত্রের মধ্যে দিয়ে সেইরূপ পরিত্রাণের পরামর্শ দিয়েছেন। চিঠিপত্রের এই বিশিষ্ট আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে কবির ‘জীবন’, ‘মৃত্যু’ ও ‘দুঃখ’ সম্পর্কে যে সম্যক ধারণা তা দেশ-কাল-সাহিত্য ভাবনায় বিশিষ্ট দলিল এবং রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ]

সূচক শব্দ : মৃত্যু, বৌদ্ধদর্শন, দুঃখ, নির্বাণ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, খণ্ড-অখণ্ড দৃষ্টি

মূল আলোচনা :

রবীন্দ্রনাথ বরাবরই ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জয়গান করেছেন। তাই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস সূচিত হয় যে ধর্মের আলোকে সেই বৌদ্ধধর্ম এবং মহামানব গৌতমবুদ্ধ দ্বারা তিনি যেমন প্রভাবিত ছিলেন, তেমনি তাঁকে বা তাঁর ‘ধম্ম’কে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর সাহিত্য সুধাভাণ্ডকে পুষ্ট করেছেন। দুঃখ ও মৃত্যু বৌদ্ধ দর্শনে যেমন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, তেমনি রবীন্দ্র দর্শনেও দুঃখ ও মৃত্যুর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে যত্রতত্র বিভিন্নভাবে বিচিত্ররূপে তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও কর্ম বিচিত্র উন্মাদনায় এবং সাহিত্যের নব নব রস সৃষ্টির মধ্যে কাটলেও নিদারুণ শোকাঘাতে তা বারেবারেই খণ্ডিত ও নিষ্পেষিত হয়েছে। প্রথম যৌবনে নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী ও ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু এবং

১৯০২ থেকে একে একে কবির জীবনে মৃত্যু শোকের ছায়া কবিকে জীবনব্যাপী মানবাত্মার আকুল আত্মজিজ্ঞাসায় ধ্বনিত করেছে। আর এই আত্মজিজ্ঞাসাই তাঁর ধর্মচিন্তাকে আলোড়িত করেছে। বুদ্ধের বাণী, তাঁর জীবনী, তাঁর নীতিকথা এই সবকিছুই রবীন্দ্রমানস ক্ষেত্রকে কোথাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। মানুষের বিভিন্ন পর্যায় জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি মানব জীবনের দুঃখের কারণ। ভগবান বুদ্ধের মতানুযায়ী এই বিশ্বে দুঃখ অগাধ, অপর্যাপ্ত ---

'সব্বং অনিচ্চং
সব্বং দুক্‌খং
সব্বং অনত্তং'[১]

রবীন্দ্রনাথ দুঃখের এই পরিণামকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে গিয়ে বলেছেন ---

'দুঃখ যেন জাল পেতেছে চারিদিকে;
চেয়ে দেখি যার দিকে
সবাই যেন দুর্‌গ্রহদের মন্ত্রণায়
গুমরে কাঁদে যন্ত্রণায়।'[২]

বুদ্ধদেব দুঃখ নিরোধের উপায় অনুসন্ধান করতে গিয়ে একেবারে মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তাঁর মতে অবিদ্যাই দুঃখের মূল কারণ। অবিদ্যা ক্ষয় না হলে দুঃখের ক্ষয় সম্ভব নয়। বাসনা বিলোপের মধ্যে দিয়েই দুঃখের ক্ষয় সম্ভব। রবীন্দ্রনাথও বাসনাসহ সর্বদুঃখের বীজকে কঠোর দুঃখের অভিঘাতে সমূলে বিধ্বংস করতে চেয়েছেন। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু আদি দুঃখ বৌদ্ধ দর্শন ও রবীন্দ্র দর্শন উভয় ক্ষেত্রেই স্বীকৃত। বৌদ্ধ দর্শনে এই দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি দানের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা আছে, আর রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে ভালোবেসে মৃত্যুর চেতনাকে বিভীষিকা-সংস্কার বিমুক্ত করেছেন; দুঃখের আগুনে দগ্ধ করেই দুঃখকে নির্বাপিত করতে চেয়েছেন। জীবন ও মৃত্যুকে দার্শনিকের দৃষ্টিতে সম্যকরূপে দেখতে পেয়েছেন বলেই রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনব্যাপী মৃত্যুকে জীবনের মতোই ভালোবাসতে পেরেছেন। দুঃখ যদি জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হয় তবে দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি চাওয়া নয়, দুঃখকে আহ্বান জানিয়ে তার তীব্র দহন জ্বালায় নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। ---

'আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দ্বীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।'[৩]

জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই দুঃখ সম্বন্ধে নিজ নিজ মত পোষণ করেছেন, কিন্তু আঘাতের মধ্যে দিয়ে আত্মবিকাশের পূর্ণতার পথের অনুসন্ধান

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ এমনভাবে কামনা করেননি। দুঃখকে অস্বীকার করার সাধ্য কারোর নেই; তাই দুঃখকে সহ্য করার অপরিসীম শক্তিলাভ করাই শ্রেয়।

রবীন্দ্রনাথকে একই সঙ্গে আনন্দবাদী এবং আশাবাদী কবি হিসাবে আমরা চিহ্নিত করে থাকি। কিন্তু নিজ জীবনে একটানা যে দুঃখের অভিঘাতকে তিনি বহন করে চলেছিলেন তা কেবল মৃত্যু যন্ত্রণা নয়; কত পরাজয়, বিরোধ, ব্যর্থতা, গ্লানি, ক্ষত ইত্যাদিকে অতিক্রম করে আনন্দমার্গের অনুসন্ধান করেছেন।

> "রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে বুদ্ধদেবের মতোই জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম রূপে দেখতে পেয়েছেন। দুঃখের অভিঘাতে জীবন যন্ত্রণাকে বিপর্যস্ত করে দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের স্বরূপকে পেয়েছেন।"[৪]

তিনি দুঃখ নিরোধের পথকে যেভাবে নিজ জীবনে গ্রহণ করেছিলেন, অন্যকেও একই রকমভাবে দুঃখের করালগ্রাস থেকে মুক্তি পথের দিশা অনুসন্ধানে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

সে যুগে ভাব বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম ছিল চিঠিপত্র। আর এই পত্রগুলির মধ্যে তাঁর জীবনদর্শনের মূলমন্ত্রটি কোথাও যেন তিনি সরাসরি ফুটিয়ে তুলেছেন। 'দুঃখ' সম্বন্ধে বিচিত্র মতবাদ কমবেশি তাঁর সকল সাহিত্য ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু চিঠিপত্রে 'যে শোনে এবং যে বলে এই দুজনে মিলে তবে রচনা হয়।'[৫] এই প্রসঙ্গে কবি কীট্‌সের কথা মনে হতে পারে, যে-কীট্‌স আক্ষেপ করেন এই বলে :

> "One can not yerk ye in the ribs, or lay hold of your button in writing'। এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াই তো চিঠির সবচেয়ে বড়ো সৌন্দর্য, চিঠিতে তো দিতে পারা চাই লেখকের সবটুকু সেই প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব ---'a wink, or a nod, or a grin, or a purse of the lips, or a smile"।[৬]

বাস্তবের মা যেমন করে কাঁদে, সাহিত্যের মা তেমন করে কাঁদে না। সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই অভিমত প্রণিধানযোগ্য। সাহিত্য রচনায় বাস্তবের পাশাপাশি সেখানে কাল্পনিকতার স্থানও যথেষ্ট, কিন্তু চিঠিপত্রের মধ্যে ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব মনোভাব এবং দৈনন্দিন জীবনের নানান অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থাকে প্রশস্ত। 'যে-কোনো কবির নেপথ্যচারী ব্যক্তিটিকে জানতে আমাদের অসীম কৌতূহল।'[৭] কবি রচিত আত্মজীবনী, দিনলিপি বা পত্রাবলির প্রতি তাই আমাদের একান্ত আগ্রহ; কেন-না আমরা ভাবি যে সব উপাদান থেকে আবিষ্কৃত হবে এমন সব তথ্য যা ব্যক্তি মানুষটির অনুভূতি-অভিজ্ঞতা পাঠক সমক্ষে উঠে আসবে। 'লেখক এবং প্রাপকের যুগল উপস্থিতিই চিঠির প্রধানতম রস।'[৮]

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় চিঠির সূত্রেই। অমিয়বাবু তখন হেয়ার স্কুলের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরেবাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসটি পড়ে অমিয়চন্দ্রের মনে যে প্রশ্ন ওঠে তার উত্তরের আশায় তিনি

রবীন্দ্রনাথকে সোজাসুজি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠির প্রশ্নের গভীরতা কবিকে বিস্মৃত ও আকৃষ্ট করেছিল। অসমবয়সী দুটি মানুষের হৃদ্যতার সূচনা হয় এইভাবেই। 'রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রথম দেখেন ১৯১৭ সালে প্রমথ চৌধুরীর বালিগঞ্জের মে-ফেয়ার বাড়িতে।'[৯] অতঃপর প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গী হয়ে শান্তিনিকেতন যাত্রা এবং এরপরই কবির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই সময় দাদার আত্মহত্যায় ও বড়ো মামার মৃত্যুতে অমিয়চন্দ্র শোক বিহ্বল হয়ে পড়েন, তাঁর জীবনের ভিত যেন কেঁপে ওঠে। জীবনের এই দুর্দিনে তিনি সান্ত্বনা লাভের আশায় কবির নিকট শরণাপন্ন হন। মৃত্যুর আঘাতে দিশেহারা অমিয়চন্দ্রকে চিঠির পর চিঠি লিখে তাঁকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ---

> "যখন আমার বয়স তোমারই মত ছিল তখন আমি যে শোক পেয়েছিলুম সে ঠিক তোমারই মত। আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি। ... কিন্তু তার পরে প্রচণ্ড বেদনা থেকে আমার জীবন মুক্তির ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ লাভ করলে। আমি ক্রমে বুঝতে পারলুম জীবনকে মৃত্যুর জানালার ভিতর থেকে না দেখলে তাকে সত্য রূপে দেখা যায় না।"[১০]

রবীন্দ্র সাহিত্যে মৃত্যু সম্পর্কে দু-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয় ---

> "খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং অখণ্ড বা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। খণ্ড দৃষ্টিতে কবির কাছে জীবন ও মৃত্যু পরস্পর বিরোধী দুটি প্রক্রিয়া বলে মনে হয়েছে। অখণ্ড দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে অদ্বয় সম্পর্ক ধরা পড়েছে।"[১১]

রবীন্দ্রনাথ দুঃখ-অবসাদ-গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত করার যে পন্থা অমিয়চন্দ্রকে সে সময় বারে বারে বলছেন তা হল ক্ষুদ্র আমি এবং বড়ো আমির মধ্যে লড়াই,

> "বিধাতা আমাদের মনের মধ্যে ধারালো যা কিছু অস্ত্র দিয়েছেন সে কেবল আমাদের জাল কাটবার জন্যে --- নিজেকে কেটেকুটে টুকরো টুকরো করার জন্যে নয়।"[১২]

নিজেকে ব্যক্তিগত অবসাদের গ্লানি থেকে বার হয়ে বিশ্বের মধ্যে প্রসারিত করার মধ্যে দিয়েই সঠিক আনন্দ নিকেতন-এর সন্ধান পাওয়া সম্ভব। ১৯২০, রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে ব্যস্ত, সেখানকার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা পত্র মাধ্যমে অমিয়চন্দ্রকে তিনি জানিয়ে লিখছেন ---

> "সেখানকার মনীষীরা বিশ্ব মানবের সমস্যা নিয়ে বড়ই চিন্তিত; সংকীর্ণ বর্তমান সমস্ত চেষ্টাকেই ব্যর্থ করে মনুষ্য পীড়নে অংশগ্রহণ করছে।"[১৩]

কেবল নিজের জন্য বাঁচা নয়, নিজেকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে না রেখে ত্যাগের দ্বারা আত্মবিসর্জনের কথা বারে বারে বলেছেন।

"পশ্চিমের দেশ বড় হয়ে উঠেচে, অর্থ সংগ্রহের দ্বারা নয়, আত্মবিসর্জনের দ্বারা। ... জগতে যা কিছু উন্নতি ঘটেছে মানুষের সেই আত্মদানের দ্বারা --- ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা নৈব নৈব চ। কোনো রিফর্ম বিল্ আমাদের দুঃখ সমুদ্র পার করাতে পারবে না---আত্মার বন্ধন কখনই বাইরে থেকে ঘুচবে না --- ভারতবর্ষ এই আত্মার বন্ধনের দ্বারাই জর্জর --- মন্টেগু্য সাহেব তাকে বাঁচাবে কী করে?

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ---
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পরপর কিছু চিঠিতে সান্ত্বনা লাভের পর অমিয়চন্দ্রের মনে শান্তিনিকেতনে আশ্রয় লাভ করাই শ্রেয় বলে বিবেচিত হল। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। সে বছরই অমিয়চন্দ্র বি. এ পাশ করেন। সাংসারিক অশান্তি এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করে তিনি শান্তিনিকেতনে যোগ দেন অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা দু-এর কাজেই। ১৯২৬-এ পাটনা থেকে এম. এ পাশ করে পুরোপুরি বিশ্বভারতীর কর্মী হন তিনি। 'সাহিত্য সহকারী' হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বিদেশি চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া, কবিতা কপি করা, বইয়ের প্রুফ দেখা, বিদেশিদের দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল তাঁর উপরে। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন অভিভাবক হিসাবে তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরসূরীকে পেয়ে।

"তুমি এখানে অতিথিশালার দ্বারে বাস করতে --- দূর দেশ থেকে আগন্তুকরা আসত --- তুমি ছিলে সেই প্রবাসীদের বন্ধু --- তুমি তাদের যত্নের ত্রুটি করনি, তারা সকলে তোমাকে ভালোবেসেচে। ... তুমি জান আমরা বেদ থেকে যে বাক্যটি মন্ত্র রূপে গ্রহণ করেচি : 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং' --- শান্তিনিকেতনের সেই বিশ্বনীড়ে তুমিই অভ্যর্থনার ভার নিয়েছিলে।"[১৫]

কর্মই যে মানুষের সকল অনতিক্রম্য পথকে মুক্ত করে দেয়, আনন্দ, তৃপ্তি ও আলোর দিশারী হয়ে ওঠে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল অমিয়চন্দ্রর জীবনে।

"আপিসের ঘর ছিল কিন্তু কোনদিনই মনে হয়নি আপিসে আছি। বাড়ির আত্মীয় রূপেই থাকতাম।"[১৬]

অমিয়চন্দ্রকে সংসার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন রবীন্দ্রনাথ-ই। কবির সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে ১৯২৬-এ ডেনমার্ক থেকে এক বিদুষী তরুণী হিয়র্‌ডিগস সিগর (জন্ম ১৯০৫) এসেছিলেন। প্রতিমা দেবী যখন প্যারিসে তখন তাঁর কাছ থেকে বিশ্বভারতীর কথা শুনে তিনি এখানে আসার সংকল্প গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-ই তাঁর নাম রাখেন 'হৈমন্তী', এবং পরবর্তীকালে ১৯২৭, ১৬ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে অমিয়চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। তাদের এই পরিণয়কে আশীর্বাদ জানিয়ে কবি

'পরিণয় মঙ্গল' কবিতাটি লেখেন। অমিয়চন্দ্র-হৈমন্তী দেবীর দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয় শান্তিনিকেতন-এর উত্তরায়ণের 'মৃন্ময়ী' বাড়িতে। পরবর্তীকালে এই হৈমন্তী দেবী বিশ্বভারতীর নানা কাজে কবিকে সাহায্য করেছেন, এবং মাঝে মধ্যে 'শ্রীভবন'-এর দায়িত্বও নিয়েছেন। ১৯৩৫ সালে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল শিল্পসদনের বাটিক সম্বন্ধে ইংরাজিতে প্রথম বই --- 'বাটিক --- হাউ ইট ইজ মেড'।[১৭]

সাহিত্য সহকারী হিসাবে অমিয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন বহুবার। ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরে রাশিয়া, জার্মানি, আমেরিকা, প্যারিস, মধ্যপ্রাচ্য বহু জায়গায়ই তিনি কবির সঙ্গে ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯৩৩-এ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি অক্সফোর্ড-এ গবেষণা করতে যান। একান্ত আপনজনের বিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ সেদিন অমিয়চন্দ্রকে লিখেছেন---

> "এতদিন পরে আজ তোমরা চলে গেলে কীরকম খারাপ লাগচে বলতে পারি নে। এ যেন মৃত্যুর বিচ্ছেদের মতোই কেবলি মনকে বৃথা আঘাত করচে।"[১৮]

অমিয়বাবুর সঙ্গে কবির মনের যোগাযোগ এতটাই দৃঢ় ছিল যে তিনি তাঁর জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলোর বর্ণনায় ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে অমিয়বাবুকে জানিয়েছেন। কবি যখন শোচনীয় অর্থনৈতিক অচলাবস্থার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন "আমাদের সাংসারিক ও বিশ্ব সাংসারিক খরচপত্র আয়ের তলানি এবং ঋণ দিয়ে চালাতে হচ্ছে।"[১৯] তখন একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে বিষয়গুলি তাঁকে জানিয়েছেন। কখনও বা স্বীকার করেছেন ---

> "তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে আমার মাথার ঠিক নেই।"[২০]

কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য তিনি কখনোই অমিয়চন্দ্রকে ধরে রাখতে চাননি। কবি বারেবারেই কামনা করেছেন অমিয়চন্দ্র স্বাধীনতার মুক্ত আলোকে মনের পূর্ণ বিকাশ লাভ করুন। কর্মসূত্রে সেভাবে তার যোগাযোগ না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অমিয়চন্দ্রের যোগাযোগ আমৃত্যু অটুট ছিল। জীবদ্দশায় যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই কবির কাছে তিনি ছুটে এসেছেন। দুজনের মধ্যে পত্র বিনিময় ঘটেছে অপার। বিদেশে থাকাকালীন কিংবা পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে কবির সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা ছিল অক্ষুণ্ণ। চিঠিপত্র একাদশ খণ্ডে প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরব্যাপী যে দীর্ঘকালীন বিচিত্র বিষয়ের আলাপচারিতা তা যেন দুই অসমবয়সী মানুষকে একটি বন্ধনে বেঁধে রেখেছিল; রবীন্দ্রনাথের মানসসঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন, ভাবিয়েছেন।

"১৯৯৫ সালে কবি-অধ্যাপক নরেশ গুহ'র সম্পাদনায় অমিয়বাবুর চিঠিগুলিও 'কবির চিঠি কবিকে' (১৯১৬-১৯৪১) প্যাপিরাস কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।"[২১]

চিঠিপত্র একাদশ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথ-এর অমিয়চন্দ্রকে লেখা চিঠির সংখ্যা ১৩৭। এই চিঠিগুলির মধ্যে এমন চিঠিও আছে যা প্রবন্ধরূপে সুপরিচিত। কত বিচিত্র চিন্তার

উৎস ও মেলবন্ধন ঘটেছে এই পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে --- জীবন ও মৃত্যু, বিশ্বমানবতা, রবীন্দ্রবিরোধী সমালোচনা, মহাত্মা গান্ধী, স্বরচিত কাব্য-নাটক-গান-প্রবন্ধ-অভিনয়, ভ্রমণ বৃত্তান্ত। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়, আশ্রম সম্মিলনী ও বিশ্বভারতী, দুঃখ চেতনা, নিছক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, স্বদেশের রূপ, স্বদেশ প্রীতি, কংগ্রেস, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, গান ও ছবি, দেশি-বিদেশী সাহিত্য, পল্লী সংস্কার, সাহিত্য থেকে রাজনীতি। রবীন্দ্রনাথের কাছে অমিয় চক্রবর্তী যথার্থই 'পশ্চিমের জানালা'।

অমিয়চন্দ্রের মাতৃবিয়োগের দুঃসংবাদটি রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে পেয়ে একটি চিঠিতে তাঁর সমবেদনা জানিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

> "খবরের কাগজে তোমার মায়ের অকস্মাৎ মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মনে আঘাত পেলুম। তিনি দীর্ঘকাল দুঃসহ রোগযন্ত্রণায় পুরীতে একরকম বন্দী হয়েছিলেন, এতকাল পরে নিষ্কৃতি পেলেন। তবু মৃত্যুর অভিঘাত সর্বদাই অপ্রত্যাশিত।"[২২]

রবীন্দ্রনাথের কাছে অমিয় চক্রবর্তীর সাহচর্যের যেমন প্রয়োজন ছিল তেমনি অমিয়চন্দ্রের জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা। কবির সান্নিধ্যের ফলেই অমিয়চন্দ্র হতে পেরেছেন 'বিশ্বপথিক' ও 'মানবসন্ধানী'। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই উত্তরসাধক ও মানস সন্তান। ১৯৩২ সালে পারস্য ভ্রমণকালে সঙ্গী অমিয়চন্দ্রের উদ্দেশে একটি রচনায় তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতি কাব্যরূপ লাভ করেছে ---

> "বাহিরে তোমার যা পেয়েছি সেবা
> অন্তরে তাহা রাখি
> কর্মে তাহার শেষ নাহি হয়
> প্রেমে তাহা থাকে বাকি।
> আমার আলোর ক্লান্তি ঘুচাতে
> দীপে তেল ভরি দিলে।
> তোমার হৃদয়ে আমার হৃদয়ে
> সে আলোকে যায় মিলে।"[২৩]

তথ্যসূত্র :

১. রাধারমণ জানা, 'পালিভাষা-সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ', "দুক্খমিদং অনপ্পকম", প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, এপ্রিল ১৯৮৫, পৃ ২৫২

২. 'শেষ সপ্তক', সংযোজন রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৮৩ সং, পৃ ২২৬

৩. 'গীতাঞ্জলি-৯১', রবীন্দ্র রচনাবলী-ষষ্ঠ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ ১৪২১, পৃ ৬২

৪. রাধারমণ জানা, 'পালিভাষা-সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ', ''দুক্খমিদং অনপ্পকম'', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, এপ্রিল ১৯৮৫, পৃ ২৫৩
৫. পুলিন বিহারী সেন, ''রবীন্দ্রায়ন'', শ্রী শঙ্খ ঘোষ, 'রবীন্দ্রনাথের পত্রধারা', পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, বাক্-সাহিত্য প্রা. লি.,পৌষ ১৪১৪, পৃ ১৮০
৬. তদেব, পৃ ১৮০
৭. তদেব, পৃ ১৭৯
৮. তদেব, পৃ ১৭৯
৯. পুর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ', ''অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী'', তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, জুন ২০১৩, পৃ ৬০১
১০. ররীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র-একাদশ খণ্ড', ''পত্রসংখ্যা ২, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ ১৪১৭, পৃ ৮
১১. ধীরেন্দ্র দেবনাথ, 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু', ''খণ্ড দৃষ্টিতে মৃত্যুর স্বরূপ'', তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, মে ২০০০, পৃ ৮৩
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র একাদশ খণ্ড', ''পত্রসংখ্যা-৭'', পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ ১৪১৭, পৃ ১৪
১৩. তদেব, ''পত্রসংখ্যা-১৪'', পৃ ২৪
১৪. তদেব, ''পত্রসংখ্যা-২৯'', পৃ ৪০
১৫. পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ', ''অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী'', তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স,জুন ২০১৩, পৃ ৬০২
১৬. তদেব
১৭. তদেব, ''পত্রসংখ্যা-৬৩'', পৃ ১০৩
১৮. তদেব, ''পত্রসংখ্যা-৬৭'', পৃ ১১১
১৯. তদেব, ''পত্রসংখ্যা-১৩৬'', পৃ ৩৪৪
২০. তদেব, ''পত্রসংখ্যা-৬৯'', পৃ ১১৫
২১. পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ', ''অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী'', তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, জুন ২০১৩, পৃ ৬০৩
২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র-একাদশ খণ্ড', পত্রসংখ্যা-১৩৬, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ ১৪১৭, পৃ ৩৪৪
২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র-একাদশ খণ্ড', ''পরিশিষ্ট ২'', পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ ১৪১৭, পৃ ৩৭৬

গ্রন্থপঞ্জি :

আকর গ্রন্থ

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'চিঠিপত্র একাদশ খণ্ড'। পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। মাঘ ১৪১৭।
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'রবীন্দ্র রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড'। পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। মাঘ ১৪২১।
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'রবীন্দ্র রচনাবলী সংযোজন'। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। ১৮৮৩।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. জানা, রাধারমণ। 'পালিভাষা-সাহিত্য বৌদ্ধ দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। পুস্তক বিপণি। এপ্রিল ১৯৮৫।
২. সেন, পুলিন বিহারী। 'রবীন্দ্রায়ণ'। পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা। বাক্-সাহিত্য প্রা. লি.। পৌষ ১৪১৪।
৩. চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণানন্দ। 'রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ'। তৃতীয় মুদ্রণ। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। জুন ২০১৩।
৪. দেবনাথ, ধীরেন্দ্র। 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু'। তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। মে ২০০০।
৫. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার। 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক'। চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা। বিশ্বভারতীগ্রন্থন বিভাগ। জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭।
৬. মজুমদার, পম্পা। 'রবীন্দ্র সংস্কৃতি ভারতীয় রূপ ও উৎস'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। দে'জ পাবলিকেশন।ডিসেম্বর ২০০৭।
৭. দাশ, আশা। বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ। তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা মহাবোধি বুক এজেন্সি। ২০১৩।

মিত্রভেদ তন্ত্রে কূটনীতি ও রাজনৈতিক আচরণ

ঐশী সিনহা
স্নাকতোত্তর, ইতিহাস বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : পঞ্চতন্ত্রের প্রথম তন্ত্র 'মিত্রভেদ'-এ রাজনীতির যে বিচক্ষণতা, কুটিলতার আভাস আমরা পেয়ে থাকি, তারই একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হয়েছে। একজন রাজাকে তথা সমাজের একজন সাধারণ মানুষকে কোন সময়ে সন্ধি স্থাপন বা মিত্রতা করতে হবে, কোন পরিস্থিতিতে তাকে যুদ্ধ বা শত্রু নাশ করতে কুটিলতার সাহায্য নিতে হবে, কখন তাকে কোন ধরনের নীতির প্রয়োগ ঘটাতে হবে, তা যদি আমরা এই গ্রন্থটিকে পর্যালোচনা করি তাহলে অবশ্যই লক্ষ্য করতে পারব। সমাজের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সমাজের তথা রাষ্ট্রের মাথা- রাজার প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে যাবতীয় নীতির পাশাপাশিই সঠিক বুদ্ধির প্রয়োগে সফলতার বিষয়টিও পরিষ্কার।
মূল শব্দ : পঞ্চতন্ত্র, মিত্রভেদ, বুদ্ধি, কূটনীতি, শত্রু, রাজনীতি।

মূল আলোচনা :

সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল রত্নভাণ্ডারে গল্প সাহিত্যের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর এই গৌরবময় গল্প সাহিত্যের মধ্যে বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র বিশেষ মাহাত্ম্য রাখে। পাঁচটি তন্ত্রে রচিত এই পঞ্চতন্ত্রের প্রথম তন্ত্রটি হল মিত্রভেদ, যেটি ২২ টি মনোজ্ঞ গল্প নিয়ে সংকলিত। দ্বিতীয় তন্ত্রটি হল মিত্রপ্রাপ্তি। এটি ৬ টি গল্পের সমাহারে রচিত। কাকোলূকীয় নামক তৃতীয় তন্ত্রটি চারটি গল্প নিয়ে সমৃদ্ধ এবং যথাক্রমে ১৬ ও ১৫ টি গল্পের সমাহারে তৈরি হয়েছে। পরবর্তী তন্ত্র দুটি,- লব্ধপ্রণাশ ও অপরীক্ষিতকারক। মূল রচনাটি গদ্য ও শ্লোকে নিবদ্ধ। গ্রন্থের প্রস্তাবনার বর্ণনা অনুযায়ী দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির তিনজন জড়বুদ্ধি সম্পন্ন পুত্রদের নীতিশিক্ষা ও বাস্তব জ্ঞান উন্মেষের জন্য মন্ত্রীসভার পরামর্শ ও রাজার অনুরোধে বিষ্ণুশর্মা একাজে নিযুক্ত হয়েছে। আর সেই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের রচনা। প্রতিটি তন্ত্রে একটি মূল গল্পের সাথে যুক্ত হয়েছে অনেকগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ সহজ সরল ভাষায় রচিত ছোট ছোট গল্প। প্রতিটি গল্পই রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বাণিজ্য তথা অর্থনীতি সম্পর্কিত কোনো না কোনো বিষয় অতি সহজে কোথাও বা সংক্ষেপে আবার কোথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের রচনাকাল আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ৩০০-৪০০ শতাব্দী[1]। পরবর্তীসময়ে এই গ্রন্থ পহ্লবী, পারসিক, আরবি, গ্রিক, ইংরেজি, জার্মানি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ চরিত্রই রূপকধর্মী। এখানে রাজা, কৃষক, বণিক, শিকারী, ধোপা ইত্যাদি পেশার সাথে নিযুক্ত মানুষদের বর্ণনা থাকলেও বেশিরভাগক্ষেত্রেই

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের ব্যবহার , কার্যকলাপ প্রভৃতি বিভিন্ন পরিস্থিতির বিচারে কখনো পশুপাখিদের চরিত্রের উপর আরোপিত হয়েছে। পশুপাখির রূপকে মানুষের শঠতা, ভণ্ডামি, বুদ্ধিহীনতা, নিষ্ঠুরতা, মহত্ব প্রভৃতি গুনের দ্বারা পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন- সিংহ বলবান ও অহংকারী অথচ নির্বোধ, শেয়াল ধূর্ত, বেড়াল কুটিল, উট বাস্তব জ্ঞান শূন্য ইত্যাদি।

পঞ্চতন্ত্রের আদর্শ সমাজ ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একজন সাধারণ মানুষ যেভাবে সমাজের কাছে দায়বদ্ধ, সেই একইভাবে একজন রাজাও তার নিজের রাজ্যের প্রতি দায়বদ্ধ। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একটি দেশের ক্ষমতাই তার সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে; যেভাবে একজন মানুষের ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করে সমাজে তার প্রতিপত্তি কতখানি, তার উপর। কাজেই ক্ষমতা বিস্তার এবং নিজের আধিপত্য কায়েম করার তাগিদ সকলেরই। আবার একটা দেশের মতো একজন সাধারণ মানুষের জীবনের বুদ্ধি ও বলের দ্বারা শত্রুর থেকে নিজেকে বাঁচানোর প্রয়োজন রয়েছে। এই ক্ষমতার বিস্তার ও তা অক্ষুণ্ণ রাখার বিশেষ পন্থাই হল আলোচ্যমান গ্রন্থের তন্ত্রগুলির অনুসরণ। যেমন- মিত্রভেদ তন্ত্রে দেখানো হয়েছে কীভাবে দুই বন্ধুর মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা যায়। একইভাবে মিত্রপ্রাপ্তি অর্থাৎ বন্ধু লাভের মাধ্যমে কীভাবে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও একসাথে মিলিত হয়ে শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবিলা করা যায়, তা আমরা দেখতে পাই। পরর্বতী তন্ত্র কাকোলূকীয়তে কাক ও উলূকের চিরশত্রুতার ঘটনাকে নিয়ে বলা হয়েছে পূর্ব থেকে বৈরী হয়ে আসা ব্যক্তিকে বন্ধু বানানো বিপজ্জনক। বলা যেতে পারে, এই প্রথম তিনটি তন্ত্রের মূল কথাই হল ক্ষমতার লড়াই। ক্ষমতা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে কেউই নিজেকে শত্রুর থেকে বাঁচাতে পারে না। তাই তার উচিত শত্রুকে নিজের (শত্রুর) বন্ধুর থেকে পৃথক করা করা নয়তো বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের নিজের সুহৃদ বন্ধু বানানো এবং পুরোনো কোনো শত্রুকে কখোনোই নিজের বন্ধু বানানো উচিত নয়। বলা বাহুল্য যে, এখানে শারীরিক বল অপেক্ষা বুদ্ধির বলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একজন বিচক্ষণ শত্রুকেও নির্বোধ বন্ধু অপেক্ষা শ্রেয় মনে করা হয়েছে (১.২১)।[2] পরর্বতী তন্ত্র দুটি রচিত হয়েছে কীভাবে শারীরিকভাবে বলবান না হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত কৌশল ও বুদ্ধির জোরে শত্রুকে কুপকাত করা সম্ভব, তা নিয়ে। সাবধানতার সাথে ব্যবহারের মাধ্যমে শত্রুর মনোবল ভেঙ্গে বা রাজনীতির চতুষ্টয় পদ্ধতি (সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ) বা ছয় গুণ নীতির (সন্ধি, বিগ্রহ, আসন, যান, সংশ্রয়, দ্বৈধীভাব) সঠিক প্রয়োগে শত্রুকে পরাস্ত কয়রে একজন বিচক্ষণ মানুষ সফলতা পেতে পারে। সবমিলিয়ে বলা যায়, প্রতিটি তন্ত্রই পরিশ্রম, বুদ্ধির সঠিক প্রয়োগ ও চপলতার ভিত্তিতে উন্নত জীবনের পক্ষপাতী। কিন্তু এই উন্নত জীবনের পথের প্রধান অন্তরায় শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই শত্রুনাশ ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত না করা পর্যন্ত জীবনে উন্নতি আসা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন যথাযথভাবে কূটনীতির প্রয়োগ। পঞ্চতন্ত্র রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থার একটি জটিল

কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত হয়েছে। যেখানে সবকিছুর বিধান নৈতিকতার দৃষ্টিতেই আঁকা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরের ব্যবস্থার সুহৃদের পরামর্শ এবং বর্হিদেশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদূতদের কূটনীতি- এই দুইয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে মিত্রভেদ তন্ত্রে যে কূটনীতির আভাস, তা নিয়ে বলতে হলে প্রথমেই উঠে আসে এই তন্ত্রের প্রতিটি গল্পের ভাববস্তু এবং তার বিচারে এর মূল উপজীব্য বিষয় হল কূটনীতি এবং কূটনৈতিক প্রয়োগে শত্রুনাশ, শত্রুনাশ না করা পর্যন্ত অনন্তর প্রয়াস চালানো।

রাজনীতির প্রসঙ্গে কূটনীতি বলতে বোঝায় কোনো দেশ বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিজের দেশের যাবতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও অক্ষুণ্ণ রাখতে উভয় দেশের হিত সাধনে কোনো সিদ্ধান্ত বা চুক্তি স্থাপন। তাই দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে মধ্যস্থতাকারী দূতের প্রয়োজন। যেভাবে রামায়ণে রাম, রাবণের রাজসভায় প্রথমে হনুমানকে এবং পরে যুদ্ধের নিশ্চিত ঘোষণার জন্য অঙ্গদকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন এবং মহাভারতে পাণ্ডবদের প্রতিনিধি হয়ে কৃষ্ণ দুর্যোধনের সভায় দূত হয়ে এসেছিল; সে একইভাবে মিত্রভেদ তন্ত্রে ভাসুরক নামে সিংহের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে বনের অন্যান্য পশুদের কল্যাণের জন্য এক বুড়ো খরগোশ উপস্থিত হয়েছিল তার খাদ্য হিসেবে এবং নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে অত্যাচারী ভাসুরককে মৃত্যু দিয়েছিল। এপ্রসঙ্গে বলা যায় বৃদ্ধ খরগোশটি এখানে বনের সকল পশুদের প্রতিনিধিত্ব করেছে। আবার অন্য একটি গল্পে দেখা যায় দমনক নামের একটি শেয়াল মন্ত্রীপদ লাভ করতে সেই বনের রাজা পিঙ্গলক নামের এক সিংহ ও বাইরে থেকে আগত এক সঞ্জীবক নামের ষাঁড়ের মাঝে মধ্যস্থা করেছে আবার প্রয়োজনে উভয়ের মাঝে যুদ্ধও বাঁধিয়েছে। অর্থাৎ দুই দেশ বা দুই ব্যক্তির মাঝে মধ্যস্থতাকারীর উপর নির্ভর করে তদের ভবিষ্যৎ।

আবার এই তন্ত্রে ভেদ নীতির যে প্রয়োগ সেক্ষেত্রেও কূটনীতি লক্ষ্য করা যায়। এখানে ভেদ নীতি প্রয়োগের পিছনে নিজ স্বার্থ লুকিয়ে আছে। কিছু সময়ে রাজসভায় উচ্চপদ লাভের আকাঙ্ক্ষা; যেমন- দমনক নিজের প্রয়োজনে পিঙ্গলক এবং সঞ্জীবকের মধ্যে বন্ধুত্ব ঘটিয়েছিল। কিন্তু পরে সঞ্জীবক ক্রমশ রাজার কাছের হয়ে উঠে এবং সভায় দমনকের কর্তৃত্ব কমতে শুরু হয়। আবার তৃণভোজী সঞ্জীবকের সাথে বেশি মেলামেষার জন্য পিঙ্গলক একসময়ে শিকারে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। যার ফলে তার অনুচরদের অভুক্ত অবস্থায় দিন যাপন করতে হচ্ছিল। তাই বিচক্ষণতার সাথে দমনক তাদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে ইন্ধন জোগাতে শুরু কয়রে এবং শেষ পর্যন্ত সঞ্জীবক পিঙ্গলকের হাতে মৃত্যু বরণ করে। এই গল্পের শেষে তাই দমনকের উক্তি, “এতে আমার বৈরসাধন, সাচিব্যপ্রাপ্তি আর আত্মতৃপ্তি এই তিনটেই ঘটবে”।[3] আবার কিছুসময়ে ভেদনীতির প্রয়োগ করা হয়েছে আহার্যের জন্য তো কখনো আবার নিজের অনিষ্টকারীকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে। যেমন- বজ্রদংষ্ট্র নামক এক সিংহ ও তার দুই ভৃত্য চতুরক নামের শেয়াল ও ক্রব্যমুখ নামের নেকড়ে বাঘ এর গল্পে দেখা যায় শঙ্কুকর্ণ

নামের এক উট বজ্রদংষ্ট্রের আশ্রয়ে বড় হয়ে ওঠে। একদিন বনের কোনো হাতির সাথে লড়াইয়ে রীতিমতো আহত হয়ে বজ্রদংষ্ট্র তার ভৃত্যদের খাবারের বন্দোবস্ত করতে বললে সারাদিন খুঁজেও তারা আহারের সন্ধান পায়না। অন্যদিকে প্রভুর জীবন রক্ষা করতে চতুরক অত্যন্ত চতুরতার সাথে শঙ্কুকর্ণকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলে এবং বজ্রদংষ্ট্র প্রথমে অস্বীকার করলে পরে চতুরকের কাছে শাস্ত্রবিহিত ন্যায়নীতির কথা শুনে রাজি হয়ে যায়। পরে প্রভুর অন্তরালে ক্রব্যমুখ সেই মাংস খেতে উত্তেজিত করে এবং প্রভুর সামনে তাকে দোষী সাব্যস্ত করলে প্রাণের ভয়ে ক্রব্যমুখ পালাতে বাধ্য হয়। আবার অন্যদিকে আশ্রিতকে হত্যার অপরাধে বজ্রদংষ্ট্রকে যম নিতে এসেছে, এমন ভয় দেখিয়ে বিতাড়িত করে সমস্ত মাংস পরামানন্দে ভক্ষণ করে চতুরক। এখানে ভেদনীতির প্রয়োগ করতে শত্রুর মনে ভয়ের সঞ্চার ঘটানো হয়েছে(১.১৬)।[4] এই একই ধরনের পটভূমি আমরা সঞ্জীবক ও পিঙ্গলকের কাহিনীতেও লক্ষ্য করতে পারি। সেখানে অন্য দেশ থেকে আগত সঞ্জীবককে তৃণভোজী জানা সত্ত্বেও তাকে অতিথি হিসেবে গ্রহণের কারণে রয়েছে ভয়, কেননা দমনক তাকে জানিয়েছে সঞ্জীবক হল মহাদেব প্রেরিত বৃষভ।[5] ভেদনীতি প্রয়োগে শত্রুনাশের আরো একটি গল্প জানতে পারি। একদা কোনো এক কেউটে বকের সদ্যজাত সন্তানদের ভক্ষণ করতে বক দম্পতি এক বন্ধু কাঁকাড়ার কথা মতো নেউলের গর্ত থেকে মাংস এনে সাপের কোটরের সামনে রেখে দেয়। যথারীতি নেউলের হাতে মারা পড়ে সেই কেউটে এবং একইসাথে সেই বক দম্পতিকেও নেউলটি ভক্ষণ করে(১.২০)।[6] কাজেই কীভাবে কাঁকড়াটী নিজের চিরশত্রুকে চরিতার্থ করতে বক দম্পতির সুহৃদ সেজে নেউলের সাহায্যে তাদের বিনষ্ট করতে সক্ষম হল, সেকথা এখানে সুস্পষ্ট। এইভাবে কূটনীতিকে কখনো শত্রু ও শত্রুর বন্ধুর মধ্যে ভেদ ঘটিয়ে, কখনো আবার দুই বন্ধুর মধ্যে ভেদ ঘটিয়ে তো কখনো বা নিজে ভেদী হয়ে শত্রুনাশের দরকার পড়ে।

উক্ত গ্রন্থে পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে শত্রুতার কারণও বিভিন্ন। যেমন- কোথাও চিরশত্রুতা তো কোথাও ব্যক্তিগত স্বার্থ হানিতে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও অনিষ্টকারী শত্রু হয়েছে আবার কোথাও প্রভুর কাছে অপমানিত হয়ে ভৃত্য শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় পঞ্চতন্ত্রের প্রায় সমসাময়িক নাটক মুদ্রারাক্ষসে কূটনীতিগত দিক দিয়ে মিত্রভেদ তন্ত্রের বেশ কিছু গল্পের সাথে মিল রয়েছে। যেমন- মগধ রাজ্যের রাজা মহাপদ্মনন্দের দুইজন প্রধানমন্ত্রী; যথাক্রমে শকটার ও রাক্ষস। উভয়েই বুদ্ধিমান, যাবতীয় কর্মে নিপুণ, রাজনীতিতে দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও শকটার উদ্ধত স্বভাবের জন্য সে রাজার বিরাগভাজন হয়ে সপরিবারে কারারুদ্ধ হয়। কারাগারে থাকাকালীন স্ত্রী ও সন্তানাদির মৃত্যুর কারণে শকটা নন্দ বংশ নাশ করতে বদ্ধ পরিকর হয়। পরে কারাদণ্ড থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের ইচ্ছা পূরণের তাগিদে বেরিয়ে পড়েন। পরর্বতীকালে চাণক্যের সাথে পরিচয়ের মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজের কাজে চাণক্যকে ব্যবহার করেছিলেন। চাণক্যের সাহায্যে উৎখাত

করা হয় নন্দ বংশের।[7] এই একইভাবে মিত্রভেদ তন্ত্রের তৃতীয় গল্পে দন্তিল নামের এক রাজকার্য ও পুরাকার্যে পারদর্শী ব্যক্তির কথা জানতে পারি। কিন্তু একদিন ভুলবশত গোরম্ভ নামের এক রাজকর্মচারীকে অপমান করলে সে দন্তিলের শত্রুতে রূপান্তরিত হয় এবং অপমানের শোধ নিতে রাজাকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা শুরু করে(১.৩)।[8] উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে পূর্বে ভালো সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অপমানের কারণে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে।

মিত্রভেদ তন্ত্রে রাজনৈতিক আচরণগুলিকে বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমে ছয় গুণ নীতির ব্যাখ্যার প্রয়োজন। একজন বিজিগীষু রাজাকে নিজের কর্মের বৃদ্ধি বা উন্নতিসাধন করতে হলে সন্ধি, বিগ্রহ, আসন, যান, সংশ্রয়, দ্বৈধীভাব –এই ছয় গুণ নীতিকে অবলম্বন কয়রে চলতে হবে। নিজেকে শত্রু অপেক্ষা হীনবল মনে করলে সেই রাজা বলশালী রাজার সাথে সন্ধি করবে এবং শত্রুর সাথে সন্ধি কয়রে তার সাহায্যেই তাকে দুর্বল করবে কিংবা কতকগুলি দুর্বল রাজার সাথে সন্ধি করে তাদের সাহায্যে শক্তিশালী রাজাকে পরাজিত করবে। আবার কোনো রাজা যদি নিজেকে শক্তিশালী বলে মনে করে থাকে তবে সে অবশ্যই যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। অন্যদিকে শত্রু যদি সমান শক্তির অধিকারী হয় তবে আসন নীতিই শ্রেয়। সবদিক দিয়েই যদি রাজা নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে কয়রে থাকে তাহলে যান নীতি নিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে। বলবান রাজাকে আশ্রয় কয়রে নিজের ক্ষয় রোধ করতে হলে সংশ্রয় নীতি অবলম্বন করতে হবে। আর দুই বলবান শত্রুর মাঝে কেবল বাক্য দ্বারা নিজেকে সমর্পন করা কিংবা একজনের সাথে সন্ধি ও অন্যজনের সাথে বিগ্রহ করে উন্নতি সাধনের জন্য যে নীতির প্রয়োগ করা হয় , তা হল দ্বৈধীভাব নীতি (অর্থশাস্ত্র ৭.১)।[9]

উপরোক্ত নীতিগুলির বিচারে বলা যায় মিত্রভেদ তন্ত্রের মূল কাহিনীতে দমনক প্রথমে সংশ্রয়(যখন দমনক নিজের চেয়ে নিজের চেয়ে বলবান পিঙ্গলকের মন্ত্রী হবার আশায় নিজেকে একান্তই পিঙ্গলকের অনুরক্ত হিসেবে দেখানোর চেষ্টা কয়রে ও তার ভয়ের কারণ অনুসন্ধানএ উদ্যোগী হয়) এবং পরে সন্ধির মাধ্যমে (যখন রাজার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কয়রে রাজার সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বী সঞ্জীবকের বিনাশসাধন করে) সফলতা অর্জন করেছিল। আবার এই তন্ত্রের দ্বাদশতম তন্ত্রে এক তিতির দম্পতির কথা উঠে আসে। যেখানে তাদের ডিম সাগরের জলে ভেসে যায় এবং তার জন্য তারা সাগরকে দোষারোপ অরতে থাকে ও একে একে বক, সারস, ময়ূর এমনকি গড়ুরকেও নিজের পক্ষে নিয়ে আসে সাগরের জল শোকানোর জন্য (১.১২)[10]। দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে সন্ধি করে শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে সফলতা পেয়েছে। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন সাম ও দাম নীতি অয়াভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এবং দণ্ড ও ভেদ নীতি বহিরাগত সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত (অর্থশাস্ত্র ৯.৫)[11]। রাজনৈতিক দিক থেকে মিত্রভেদ তন্ত্রে সমস্যা সমাধানে্র জন্য সাম, দাম, দণ্ড নীতিরই অধিক

প্রয়োগ দেখা গেছে এবং সেক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতা বিস্তারের জন্য সাম ও ভেদ নীতি এবং শত্রুকে নাশ করতে দণ্ড নীতি ব্যবহৃত হয়েছে।

বীরত্ব, শিক্ষা এবং সেবা- এই তিনটির সাহায্যে একজন নিজের জীবনে সমৃদ্ধি পেয়ে থাকে[12]। দমনকও সেই একই পদ্ধতির অনুসরণ করেছে এবং করটককে পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেছে জীবন সুখকর করতে গেলে রাজার সাহচর্য একান্ত প্রয়োজন। ক্রোধের সময় শান্ত আচরণ করে রাজার প্রিয়জনদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করে এবং রাজার শত্রুদের নিজের শত্রু জ্ঞানে রাজাকে পরামর্শ দেবার মাধ্যমে তাকে নিজের ইচ্ছা মতো পরিচালনা করা সম্ভব। দমনকের এই পরামর্শ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে রাজা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রাধীন[13]।

পক্ষান্তরে এই তন্ত্রে আমরা আবার একটি কেন্দ্রীভূত রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উল্লেখ পাই। রাজাকেই এখানে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বলে গণ্য করা হয়েছে। যেকোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে রাজার অনুমতি নিয়ে। যেমন- রাজা মদোৎকট (সিংহ)_ এর অনুমতি নিয়ে রাজার অনুগ্রহ প্রাপ্ত উটকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার কথা জানা যায়। আবার বলা হয়েছে যে কোনো পরিস্থিতিতেই রাজার জীবনরক্ষা করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ(১.১১)[14]। এই মিত্রভেদ তন্ত্রের যে মূল গল্প সেখানেও এই ঘটনাটি চোখে পড়ে। বলা হয়েছে, প্রজাদের কাছে রাজার জীবিত থাকাটাই অধিক প্রয়োজনীয়। দমনক ও করটকের কথোপকথন থেকে জানা যায়, দমনক শত্রু ও ব্যাধিকে একই চোখে দেখে। কারণ তার বক্তব্য- শত্রু ও ব্যাধি উৎপন্ন হওয়া মাত্রই তাকে প্রশমন না কয়রে বরং তো তার বিনাশ সাধন করা উচিত। পিঙ্গলকের ক্ষেত্রেও তার একই বক্তব্য। যেহেতু সঞ্জীবক রাজার শত্রু হয়ে উঠেছে সেই জন্য তাকে বিনাশ করাও রাজার একান্ত কর্তব্য। অবশ্য এখানে কিন্তু রাজাকে স্বৈরাচারী হিসেবে দেখানো হয়নি। কেননা গল্পগুলিতে রাজাকে অনেকসময়ই তার মন্ত্রীদের কাছে পরামর্শ নিতে দেখা গেছে। যেভাবে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে রাজা মন্ত্রীপরিষদের সাথে আলাপ আলোচনায় বসে, সেই একইভাবে পিঙ্গলকও সঞ্জীবকের প্রসঙ্গে দমনকের সাথে আলোচনায় বসেছে। কিন্তু অনেকসময়ই রাজার দুর্বলতা হিসেবে তার নিজের সেবার কাজে কোনো নির্বোধ অনুচরের নিয়োগ কিংবা বিজাতীয়দের সাথে মিত্রতা স্থাপন করাকে বোঝনো হয়েছে। রাজার ক্ষমতা এবং তার কার্যকলাপকে শাস্ত্রের ভিত্তিতে বৈধ বা অবৈধ হিসাবে বিচার করা হয়েছে, যা অনেকক্ষেত্রেই রাজপদের গুরুতর ও মহিমাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে[15]।

মিত্রভেদ তন্ত্রে রাজনীতির যে আদর্শ সেখানে সমজাতির মধ্যে সৌহার্দ্যকে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আবার বিজাতীয়দের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ককেই দেখানো হয়েছে। যেমন- মদোৎকট নামক সিংহ তার অনুচর নেকড়েবাঘের মাংস খেতে নাকচ করেছে। কেননা তারা সমজাতীয়। আবার অন্যদিকে মাংসাশী পিঙ্গলক এবং তৃণভোজী সঞ্জীবক প্রথমে বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও সে সঞ্জীবককে হত্যা করেছে। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য

অংশ হল এই তন্ত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কূটনীতির প্রয়োগ; যেখানে বারবার শত্রুর থেকে আত্মরক্ষা এবং তারপরে শত্রুকে নাশ করার বিষয়টি চোখে পড়ে।

তথ্যসূত্র :

1. Upinder Singh, Political Violence in Ancient India, Cambridge, Harvard University Press, 2017, p.12
2. তারাকান্ত ভট্টাচার্য্য, পঞ্চতন্ত্র(১ম তন্ত্র), কলকাতা, ১৯০৫খ্রিঃ, পৃঃ ১৪৫
3. তদেব, পৃঃ ১৩৪
4. তদেব, পৃঃ ১২৭-১৩০
5. তদেব, পৃঃ ৩৩
6. তদেব, পৃঃ ১৪১-১৪২
7. হরিনাথ ন্যায়রত্ন, মুদ্রারাক্ষস, কলকাতা, ১৮৬৭ খ্রিঃ, পৃঃ ১-২১
8. পূর্বোক্ত, ভট্টাচার্য্য, ১৯০৫ খ্রিঃ, পৃঃ ৩৫-৪০
9. রাধাগোবিন্দ বসাক, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র(২য় খণ্ড), কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রিঃ, পৃঃ ৮৬-৮৭
10. পূর্বোক্ত, ভট্টাচার্য্য, ১৯০৫ খ্রিঃ, পৃঃ ১০৭-১০৮
11. পূর্বোক্ত, বসাক, ১৯৬৫ খ্রিঃ, পৃঃ ২১৮-২১৯
12. Kumkum Roy, Kingship Learning and Politics in the Panchatantra- Towards Understanding Perceptions from 'below', Kolkata, 2020, p.10
13. Idib, p.11
14. পূর্বোক্ত, ভট্টাচার্য্য, ১৯০৫ খ্রিঃ, পৃঃ ১০৫-১০৬
15. Op.cit, Roy, 2020, p.25

ভারতীয় সমাজে নারীবাদী আন্দোলনের প্রসার ও প্রাসঙ্গিকতা : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

জ্যোতি মিত্র
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ : পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে। ভারত এর ব্যতিক্রম নয়। লক্ষ্যণীয় যে, একটি সমাজ যথার্থ পূর্ণাঙ্গ লাভ করে পুরুষ ও নারীর সমন্বয়ের মাধ্যমে। কেননা, নারীরা হল সমাজের অর্ধাংশ। তা সত্ত্বেও বিশ্ব তথা ভারতবর্ষের দীর্ঘদিন ধরে নারীরা নানা অজুহাতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কেননা, ভারতীয় সমাজ হল মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। এই ধরণের সমাজে নারীর মর্যাদা ও ভূমিকাকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এরই ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী আন্দোলন বারে বারে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পূর্বে যেমন নারী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, তেমনি স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বারে বারে নারী জাগরণ ঘটেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজসংস্কারকদের প্রচেষ্টা নারী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। আবার, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে, আইন অমান্য আন্দোলনে ও কৃষক আন্দোলনে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নারীরা বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে তাদের আন্দোলনকে প্রসারিত করেছিল। ফলস্বরূপ আধুনিককালে তাদের জীবনধারাগত ক্ষেত্রটি কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয়েছে।

শব্দসূচক : সমন্বয়, অর্ধাংশ, সক্রিয়ভাবে, ফলশ্রুতি, জীবনধারাগত।

মূল বিষয়:

বিশ্ব তথা ভারতবর্ষে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি চর্চিত,পর্যালোচিত, আলোচিত চলছে সেটি হল নারীর অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রটি নিয়ে। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সনাতনকাল ধরে নারী আন্দোলন প্রসারিত হয়ে উঠেছে এবং উঠছে। এই নারী আন্দোলনগুলির প্রকৃতি মূলত বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন প্রকারের এবং বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। কেননা, বিশ্বের প্রতিটি দেশের সমাজব্যবস্থায় নারীর মর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীনতার বিষয়টি সমানভাবে গুরুত্ব পায়নি। বেশিরভাগ দেশেই নারীরা নানা ধরণের অবিচার, নিপীড়ন, বৈষম্য ও অত্যাচারের শিকার হয়েছে বা হচ্ছে। আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেখতে পাই যে, পাশ্চাত্যে নবজাগরণের আলোকেই প্রথম

নারীদের জন্য আইনগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আন্দোলনগুলি হল- নারীদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন, নারীদের ভোটাধিকারের আন্দোলন, নারী শিক্ষা ও কাজের অধিকারের আন্দোলন ইত্যাদি।[১] ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভারতবর্ষে পুরুষ ও নারী ভেদাভেদকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। কেননা, ভারতীয় সমাজ মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। সুতরাং প্রচলিত সমাজব্যবস্থাতে নারীদের স্বার্থের জন্য এবং তাদের অধিকারগুলি আদায় করবার জন্যই নারী আন্দোলন গড়ে ওঠে। সুতরাং ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পূর্বে এবং স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নারী আন্দোলনের প্রসার কতখানি ঘটেছে এবং তার প্রাসঙ্গিকতা কতটা তা গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করাই হল আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গিয়ে যে বিষয়টি প্রথমেই ধরা পড়ে তা হল, ভারতে বৈদিক যুগে নারীদের মর্যাদা ছিল অনেক বেশি। তাদের সামাজিক অবস্থান খুব একটা খারাপ ছিল না। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি কোনরকম বঞ্চনা ছিল না। বিভিন্ন ধর্মীয় আচরণ-অনুষ্ঠানে তারা ভূমিকা পালন করত। পারিবারিক জীবন, সামাজিক এবং প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটেও তারা ভূমিকা পালন করত। আবার, তারা কখনও কখনও কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হত। অর্থনৈতিক দিক থেকেও এ যুগে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিল। এছাড়া, মহিলারা পিতার সম্পত্তির অধিকারী এই যুগেই উঠেছিল। ঋকবেদে গীতিকার হিসেবে তারা প্রাধান্য লাভ করেছিল।[২] পরবর্তীকালে অর্থাৎ স্মৃতিযুগে তাদের সামাজিক অবস্থানের অনেকখানি পরিবর্তন ঘটে। মনুস্মৃতিতে পুরুষদের ওপর নারীদের নির্ভরশীলতার কথা বলা হয়। মনুর ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী “নারীর পক্ষে বিবাহ হল উপনয়ন, পতিসেবা বেদাধ্যয়ন, আর পতিগৃহে বাস করা হল গুরুগৃহে বাস”।[৩] আবার, এই যুগেই মূলত বাল্যবিবাহ চালু হয়, পণপ্রথার সৃষ্টি হয়, মহিলারা পিতার সম্পত্তির ওপর তাদের অধিকার হারায়। তাছাড়া, এই যুগে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ গড়ে ওঠার ফলস্বরূপ নারীরা শিক্ষা, স্বাধীন জীবিকা প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং এই যুগে সংসারধর্ম পালন করা নারীদের একমাত্র কর্তব্য বলে গণ্য হয়। কিন্তু মুঘল যুগ শুরু হওয়ার পরই মহিলারা শিক্ষালাভের অধিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেপ্রশাসনিক কাজেও তাদের লিপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী আন্দোলনের প্রসার ও প্রেক্ষাপট:- সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকেই ভারতীয় সমাজে নারীরা বিভিন্ন কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে নারী জীবনের পট-পরিবর্তন ঘটে। মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু মানুষ ভারতীয় নারীদের এই হীন অবস্থা থেকে বিচলিত হয়েছিলেন। নারীশিক্ষার প্রসার এবং সামাজিক সংস্কার প্রভৃতির মাধ্যমে নারীদের মুক্তিদান যে সম্ভব তা তাঁরা

অনুভব করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে যথার্থ ভূমিকা পালন করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি ছিলেন এই আন্দোলনের পথিকৃৎ। তিনি বর্বর সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য আন্দোলন করেছিলেন এবং তার ফলস্বরূপ ১৮২৯ সালের 'সতীদাহ নিবারক আইন' এবং ১৮৫৬ সালের 'বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত আইন' পাশ হয়।[৪] সুতরাং বলা যায় যে, আঠারো এবং উনিশ শতকে ভারতে যে সব সমাজসংস্কার আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে দিয়ে ভারতে নারী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে এই সতীদাহ প্রথা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার পরই ভারতীয় হিন্দু সমাজে বিধবা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ সরকার হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহকে কখনই সমর্থন করেনি। উনিশ শতকেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়। শুধু তাই নয়, তিনি নারীশিক্ষার প্রসারও ঘটিয়েছিলেন এবং এই লক্ষ্যে তিনি নারীশিক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাতও করেছিলেন। এছাড়া, তিনি বাল্যবিবাহ রোধ ও বহুবিবাহ রোধ করেছিলেন। তারই প্রচেষ্টায় ১৯২৯ সালে 'শিশু বিবাহ নিয়ন্ত্রণ আইন' তৈরি হয়।[৫] এই আইনে মহিলাদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৪ বছর করা হয়। আবার, দয়ানন্দ সরস্বতী ও শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ নারীর অবস্থার উন্নতি করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। এছাড়া, কেশবচন্দ্র সেনের আমলে ব্রাহ্মসমাজ অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার, সমাজসেবা, পর্দাপ্রথা বর্জন, বাল্যবিবাহ প্রথা বর্জন প্রভৃতি কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অপরদিকে, স্বামী বিবেকানন্দের কাছেও নারী সমাজের উন্নতি ছিল সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। তিনি নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য 'স্ত্রীমঠ' স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর ভাবনায় গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে শিক্ষাকেন্দ্র খুলে দেশের নারী সমাজের ভিতর শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। আবার, পন্ডিতা রামাবাঈ নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বিধবাদের অবস্থা ও তাদের স্বাধীনতা, অসবর্ণবিবাহ ও বিবাহে নারীদের অনুমতি প্রভৃতি বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেন। সুতরাং উনিশ শতকে নারীশিক্ষার প্রসার ও তাদের সামাজিক এবং আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যে আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছিল, তার মূল লক্ষ্য হল নারী মুক্তির প্রসার।

বিংশ শতাব্দীতে নারী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট:- বিংশ শতকে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন গড়ে ওঠে তাতে বহু সংখ্যক নারী অংশগ্রহণ করে। ভারতী রায় তাঁর 'স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গ নারী জাগরণ' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে প্রথম রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়।[৬] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে নারীরা বয়কটের স্বপক্ষে পিকেটিং এবং স্বদেশী কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে। সেই সময় ভগিনী নিবেদিতা, সরলা দেবী ও নির্মলা সরকার প্রমুখরা নারী মুক্তির জন্য এগিয়ে এসে নেতৃত্ব দেন। বলা যায় যে, নারীরা গৃহকোণ থেকে বেরিয়ে স্বদেশের মুক্তির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

এছাড়া, ১৯১৭ সালে সারা ভারতে ভোটাধিকারের জন্য নারী আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই বছরেই সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মাতৃকালীন সুযোগ-সুবিধা, ভোটাধিকার ইত্যাদির দাবিতে মন্টেগু- চেমসফোর্ড মিশনের কাছে নারী প্রতিনিধিরা যায়। ১৯১৭ সালের শেষের দিকে মার্গারেট কুইন্সির নেতৃত্বে "women's Indian Association" গঠিত হয়। ১৯১৯ সালে সাউথ বরো কমিশনের কাছে মহিলাদের ভোটাধিকার চেয়ে একদল প্রতিনিধি পাঠানো হয়। বিষয়টি ভারতীয় আইনসভার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯২৯ সালের মধ্যে ভারতের সব প্রাদেশিক আইনসভাতে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভ করে।[৭]

বিংশ শতাব্দীতে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে বহু নারীকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। ১৯২০-১৯৪০-এর দশকের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ধর্ম, বর্ণ, জাতি, শ্রেণি নির্বিশেষে অসংখ্য নারীর রাজনৈতিক জাগরণ ঘটে। এই সময় সমস্ত স্তরের মহিলারা পর্দাপ্রথাকে পিছনে ফেলে দিয়ে মিটিং- মিছিল, বিদেশি দ্রব্য ও মদের দোকানে পিকেটিং-এ অংশগ্রহণ করে। আবার, ১৯২১ সালে বাসন্তী দেবী কলকাতায় 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' ও 'কর্ম মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যে সকল নারীরা যোগদান করেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হল সরোজিনী নাইডু, কমলা দেবী ও বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত প্রমুখরা।[৮] লক্ষ্যণীয় যে, উর্মিলা দেবীও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি 'স্বরাজ' আন্দোলনের আদর্শ প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এছাড়া, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে 'নারী কর্ম মন্দির' পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছিলেন হেমপ্রভা মজুমদার। ১৯২২ সালে তিনি গড়ে তোলেন 'কর্মী সংসদ'। যার মূল কর্মসূচি ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক। স্বাধীনতা আন্দোলনে আরও একজন নারী সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যার নাম জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী। তারই পদক্ষেপের ভিত্তিতে ১৯২০ সালে গড়ে ওঠে 'নারী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী'। এছাড়া, লীলা রায় নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য ঢাকায় 'দিপালী সংঘ' গড়ে তোলেন। এই সংঘ গড়ে তোলার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী আদর্শে দেশের মহিলাদের অনুপ্রাণিত করা। আবার আশালতা সেনও ঢাকায় 'গান্ডারিয়া মহিলা সমিতি' তৈরি করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দেন।[৯]

বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন নারী সংগঠন:- আবার, ১৯২০- ১৯৩০-এর দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত 'কিষাণ সভা' চাষীদের নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তাতেও নারীরা সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিল। এছাড়া, ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সাড়া দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও কৃষক পরিবারের নারীরাও অংশগ্রহণ করেছিল। এই বছরেই ১২ই মার্চ লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য গান্ধীজী বন্দী হলে সারা দেশজুড়ে যে হরতালের ডাক

দেওয়া হয় তাতে সমস্ত স্তরের মহিলারা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে জাতীয় আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করে তোলে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে এই সময় বেশ কিছু নারী সেচ্ছাসেবী বাহিনীও আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন এবং কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। এই স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীগুলির মধ্যে অন্যতম হল বাংলার 'নারী সত্যাগ্রহ সংঘ', 'বম্বের দেশ সেবিকা', কেরালার 'স্বয়ংসেবিকা সংঘ', গুজরাটের 'স্ত্রী স্বরাজ্য সংঘ', এলাহাবাদের 'সেবিকা সংঘ' প্রভৃতি।[১০] এছাড়া, বিংশ শতাব্দীতে আরও কতগুলি মহিলা সমিতি গড়ে ওঠে। এই সমিতি মহিলাদের মধ্যে আন্দোলনের জন্য প্রেরণার সঞ্চার ঘটায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ১৯২৫ সালে গঠিত 'National Council of Women in India' এবং ১৯২৭ সালে গঠিত 'All India Women's Conference'. প্রভৃতি।[১১]

ওয়ারলি বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা:- পরবর্তীক্ষেত্রে অর্থাৎ ১৯৪৫- ৪৭ সালে জমিদার ও জোতদারদের শারীরিক অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের ওয়ারলি বিদ্রোহে বহু সংখ্যক আদিবাসী নারী সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিল। এই অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির 'কিষানসভার' নেতৃত্বে নারীরা আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। আবার, ১৯৪৬-১৯৫০ সালের তেভাগা আন্দোলনে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও মুসলিম মহিলারা যে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিল তার গুরুত্বও কম ছিল না। এই আন্দোলনে কমিউনিস্ট দলভুক্ত মহিলারা গ্রামীণ মহিলাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রেণিগত অত্যাচার ও জাতপাতভিত্তিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তারা অর্থ ও সম্পত্তির ওপর নারীদের আইনগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার দাবি তুলেছিল। এছাড়া, শস্যের তিনভাগের দুইভাগ চাষীর, আর একভাগ জোতদারদের, এই মূল দাবিতে সেই সময়ে বাংলার যশোর, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুরসহ আরও ১৯ টি জেলায় কৃষক ও জোতদারদের বিরুদ্ধে চাষী পরিবারের মহিলারা সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছিল। এক্ষেত্রে নারীদের মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল 'ঝাঁটা বাহিনী', 'বাঁট বাহিনী', 'প্রতিরোধ বাহিনী' এবং 'নারী রক্ষা বাহিনী' প্রভৃতি। পরবর্তীকালে নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনে সাঁওতাল মহিলারা পুরুষের সঙ্গে সমান মজুরি দাবি ও বিভিন্ন ভাতার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। [১২]

তেলেঙ্গানা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা:- অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা আন্দোলন ছিল, গ্রামীণ জমিদারদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই আন্দোলনেও পুরুষের সঙ্গে নারীরাও গেরিলা যুদ্ধে যোগদান করেছিল। এই আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল, হায়দ্রাবাদের নিজামের সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা, প্রজাস্বত্ত্বহীন বর্গাদারদের জোর করে উৎখাত, বে-আইনি খাজনা আদায় ও বাধ্যতামূলক বেগার পরিশ্রম করানোর বিরুদ্ধে কিষানসভা ও অন্ধ্রমহাসভার নেতৃত্বে তেলেঙ্গানায় কৃষকদের যে বিদ্রোহ হয়, সেক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অংশগ্রহণের মাত্রা ছিল খুবই বেশি। এছাড়া, গেরিলা যুদ্ধে বেশিরভাগ নারী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং পুলিশ

বাহিনীর বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সরকারি দমন-পীড়নমূলক নীতি তাদেরকে এ আন্দোলন থেকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে।[১৩]

নারীদের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা:- ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গান্ধীজি ও কংগ্রেস দল নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। ভারতীয় সংবিধানের ১৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র কেবলমাত্র ধর্ম, বর্ণ, জাতি, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নাগরিকদের প্রতি কোনরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। আবার, এই কারণের জন্য ভারতীয় সংবিধানের ১৬(২) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নাগরিকের প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। এছাড়া, সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়-এ বর্ণিত সকল মৌলিক অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য দূর করার কথা বলা হয়েছে।[১৪] আবার, ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়-এ নির্দেশমূলক নীতির ৩৮(২) নং ধারায় বলা হয়েছে পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের সুযোগের কথা এবং এবং সমান কাজের জন্য সমান মজুরি দেওয়ার বিষয়। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের ৫১ (ক) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, নারীর মর্যাদা হানিকর সকল প্রথাসমূহের বিলোপ সাধন করার কথা।[১৫] কিন্তু এই রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও এখনও মজুরি নিয়ে নারীদের প্রতি বৈষম্য করা হচ্ছে। এছাডা, বিভিন্ন নারীর মর্যাদা হানিকর প্রথার অস্তিত্ব এখনও বর্তমান রয়েছে। যার ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে নারী আন্দোলন বারে বারে সংঘটিত হয়েছে। এছাড়া, মহিলাদের সুরক্ষার স্বার্থে কতগুলি আইন ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছে, যেমন- ১৯৫৪ সালে 'বিশেষ বিবাহ আইন', ১৯৫৫ সালে 'হিন্দু বিবাহ আইন', ১৯৫৬ সালে 'হিন্দু উত্তরাধিকার আইন' ইত্যাদি। এই আইনের কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন থেকে গিয়েছে।

মূলত পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে নারী আন্দোলন তেমনভাবে ঘটেনি। তবে এই পঞ্চাশের দশকেই বিভিন্ন নারী সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। শ্রীমতি বন্দনা চ্যাটার্জী তাঁর 'Women and Politics' প্রবন্ধে ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা কম হওয়ার জন্য এক ধরণের বিশ্বাসকে দায়ী করেছেন। এই সময়ে ভারতীয় মহিলা ও মহিলা সংগঠনগুলি ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি পুরোপুরি আস্থা রেখেছিলেন। কারণ, এই রাষ্ট্রটি লিঙ্গ- বৈষম্যভিত্তিক সমাজের পরিবর্তন ঘটাবে এবং নারীকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবে এই বিশ্বাস তাদের ছিল। কিন্তু তা হয়নি। ফলস্বরূপ ১৯৭০-এর দশকে নারী আন্দোলন গড়ে ওঠে, যার মুল লক্ষ্য হল প্রচলিত লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে নারী সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠা।[১৬]

১৯৭০-এর দশকে নারী আন্দোলনের বিকাশ:- বিংশ শতাব্দীর ১৯৭০-এর দশকে মূলত নারী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের

অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা ও অংশগ্রহণের মাত্রা বাড়ানো। এই সময় স্থানীয় ও জাতীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের অংশ হিসেবে বহু আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। এই বিংশ শতাব্দীতে বহু স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গড়ে ওঠে, যেমন-সহেলি, সমতা মঞ্চ, স্ত্রী সংঘর্ষ সমিতি, স্বনির্ভর মহিলাদের সংগঠন, Working Women Forum, Muslim Women's Forum প্রভৃতি।[১৭] মূলত এই শতাব্দীর প্রথম দশকেই অর্থাৎ ১৯৭০ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণ সর্বাত্মক বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। যার মূল উদ্দেশ্য হল সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটানো। এই আন্দোলনে বহু নারী সমর্থন দিয়েছিল এবং অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৭৩-৭৫ সালে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন বড় বড় শহরে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী মহিলারা মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন গুজরাটে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় স্বনিযুক্ত মহিলাদের সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠনের আন্দোলন দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, ভোপাল প্রভৃতি শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৫-এর দশকে জাতীয় জরুরি অবস্থার পরিস্থিতিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে তাতে বহু মহিলা সক্রিয়ভাবে যোগদান করে। আবার, এই ১৯৭৫-৮৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক নারী দশকরূপে'ই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্বীকৃতি দিয়েছে।[১৮] ১৯৭৫ সালে ৮ই মার্চ তারিখটিকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে পালনও করা হয়।[১৯]

চিপকো আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ:- ১৯৭৪ সালে উত্তরপ্রদেশের উত্তরাখন্ডে চিপকো আন্দোলনেও নারীরা যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। মূলত এই দশকেই গাড়োয়ালে অরণ্য সংরক্ষণের জন্য পার্বত্য মহিলারা চিপকো আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। হিমালয় হল ভারতের অরণ্য সম্পদের মূল উৎস। এই অঞ্চলে কাঠ ব্যবসায়ীরা নির্বিচারে গাছ কেটে বনাঞ্চল ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হয়। ১৯৭৮ সালে বননিগমের অনুমতিতে কয়েক মাস ধরে বৃক্ষছেদনের কাজ চলতে থাকে। ফলে আন্দোলনের পরিধি ক্রমশ বেড়ে যায়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন দুই নেতা সুন্দরলাল ও চণ্ডীপ্রসাদ। তাঁরা এলাকার মহিলাদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ২৫/১২/১৯৭৮ সালে এই আন্দোলন শুরু হয় এবং ৯/১/১৯৭৯ সাল থেকে এই আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। প্রায়ই প্রায় ৩০০০ নরনারী এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এক একজন নারী এক একটি গাছকে জড়িয়ে ধরে। এই আন্দোলনের ফলে সরকার নতজানু হয়ে পড়ে।[২০]

বুদ্ধগয়া আন্দোলনে নারীর ভূমিকা:- বুদ্ধগয়া আন্দোলন হল বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধ মঠের সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই অঞ্চলে দরিদ্র চাষীরা জমির ওপর পুরুষ ও নারী চাষীদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন তৈরি করেছিল। ১৯৭৯ সালে জয়প্রকাশের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে 'ছাত্র যুব সংঘর্ষ বাহিনী' বিহারের বুদ্ধগয়ায় মন্দিরের পুরোহিতদের বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুরদের নিয়ে এক আন্দোলন গড়ে

তোলে। পুলিশের দমন-পীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও তারা এই আন্দোলন চালিয়ে যায়। বলা যায় যে, এই বুদ্ধগয়া আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ মহিলারা নতুন জীবনের একটা আশ্বাদ পেয়েছিল।[২১]

নারীবাদী আন্দোলনে বিভিন্ন সংগঠন:- আবার, ১৯৭৭ সালে মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড় শ্রমিক সংগঠন ভিলাই ইস্পাত কারখানার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যে হিংসাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তাতে নারীরা সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিল। নারী শ্রমিকদের ছাঁটাই-এর প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল। এছাড়া, নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে এ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। উপজাতি নারী শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য 'মহিলা মুক্তি মোর্চা' গঠিত হয়েছিল। ৮০-এর দশকে মহারাষ্ট্রের কৃষক আন্দোলনে সমগ্র মহিলা 'অগাধি' নামক নারী সংগঠন কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে আন্দোলনকে সংগঠিত করেছিল। এছাড়া 'মথুরা ধর্ষণ মামলা' (১৯৭৮) 'মায়া ত্যাগী মামলা' (১৯৮০) কে কেন্দ্র করে পুলিশ লকআপে নারী ধর্ষণের প্রতিবাদে নারী সংগঠনগুলি দেশজুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ১৯৮০-এর দশকেই কলকাতায় সচেতনতা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ, নারী গবেষণা কেন্দ্র, প্রতিবিধান, লহরী প্রভৃতি সংগঠন গড়ে ওঠে।[২২] এই সব সংগঠনগুলি নারী আন্দোলনকে প্রসারিত করতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, যেমন-পণপ্রথা ও বধু হত্যার বিরুদ্ধে প্রচার, নারীদের আইনি দিক থেকে সাহায্য করা, নারী বন্দীর জন্য মুক্তি আন্দোলন, কন্যা ভ্রণ হত্যার বিরুদ্ধে প্রচার, ধর্ষণ সংক্রান্ত আইনি সংস্কার, নারীদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো প্রভৃতি। পরবর্তীকালে গুজরাটে নারীরা পারিবারিকভাবে যে অত্যাচারিত হয়েছিল সেক্ষেত্রে কয়েকটি সংগঠন তার ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়া, আমেদাবাদের জ্যোতি সংঘ, জামনগরের 'কস্তরবা স্ত্রী বিকাশ গ্রহ' পরিবারের নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার রুখতে বহু পদক্ষেপ নিয়েছিল।[২৩]

পণপ্রথা বিরোধী নারী আন্দোলন:- বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে পণপ্রথা ও পণজনিত কারণে মৃত্যুর ক্ষেত্রে নারীরা ব্যাপক আন্দোলন চালাচ্ছে। ১৯৭৯ সাল থেকে নারীর প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। জনতা পার্টির 'মহিলা দক্ষতা সমিতি' পণবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। ভারতের সমগ্র অঞ্চলে মিটিং-মিছিল নাটক, পথসভা করে পণবিরোধী নারী আন্দোলনকে সক্রিয় করা হয়। এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৬১ সালে 'পণপ্রথা বিরোধী আইন' সংশোধনের জন্য এটি পার্লামেন্ট পেশ করা হয়। কিন্তু আইন করেও পণজনিত অত্যাচার ও পণজনিত কারণে মৃত্যু বর্তমান দিনেও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা:- ভারতে নারী আন্দোলনে নারীদের স্বাধীন ভূমিকা শুরু হয় মূলত ১৯৮০-এর দশকে। এই দশকেই ভারতীয় নারীদের রাজনৈতিক

ও সাংগঠনিক কাজকর্ম বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, সমান মজুরির দাবিতে, সামাজিক মর্যাদা সমতা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অসংখ্য নারী সংগঠন নারী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সময় ভারতে নারী আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে নানা ধারা লক্ষ্য করা যায়, যেমন- উদারপন্থী নারীবাদী ধারা, বামপন্থী নারীবাদী ধারা ও প্রগতিবাদী নারীবাদী ধারা প্রভৃতি। মূলত উদারপন্থীরা আইনি সংস্কারের উপর গুরুত্ব দেন। বামপন্থী নারীবাদীরা লিঙ্গবৈষম্যের অবসানে সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটানোর পর গুরুত্ব দেন। আর প্রগতিবাদী নারীবাদীরা নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষমতার সম্পর্কের পরিবর্তনের উপর নজর দেন।[২৪]

১৯৭০-৮০-এর দশকে গড়ে ওঠা নারী আন্দোলনের সক্রিয়তা ও নারী সংগঠনগুলির সক্রিয় হওয়ার ফলে রাজীব গান্ধীর নারী উন্নয়নের জন্য কতগুলি জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৯০ সালে 'জাতীয় কমিশন আইন' তৈরি হয় এবং ১৯৯২ সালে এই কমিশন কতগুলি লক্ষ্য গ্রহণ করে, যেমন- মহিলাদের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থার যথাযথ রূপায়ণ, তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য আইনগুলির সংশোধনের জন্য সুপারিশ, নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া, এক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া ইত্যাদি।[২৫] আবার ১৯৯২ এবং ১৯৯৩ সালে ভারতীয় সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪ তম সংশোধনী আইনে মহিলাদের জন্য পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলিতে ১/৩ অংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।[২৬] ২০১০ সালে এই আসনসংখ্যা বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা হয়। এছাড়া, সরকার নারীদের কল্যাণের স্বার্থে DWARCA ও ICDS-এর মত কর্মসূচি নিয়েছে। বর্তমানে নারীদের মধ্যে আর্থিক স্বয়ম্ভরতা বৃদ্ধির জন্য SELF-HELP GROUP গড়ে তোলা হয়েছে। সমবায় ব্যাংক এই গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ দান করছে।

এছাড়া, বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে মহিলাদের সর্বাঙ্গিন বিকাশ সাধনের কথা বলা হয়েছে। তাদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারকে সুনিশ্চিত করার জন্য ১৯৯০ সালে 'জাতীয় মহিলা কমিশন' গঠন করা হয়েছে। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের সামাজিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে মোট আর্থিক বরাদ্দের ৩০ শতাংশ মহিলা সংক্রান্ত প্রকল্পে ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে মহিলা সমৃদ্ধি যোজনার জন্য অর্থ ব্যয় করা হয়।[২৭] এছাড়া, 'নারীর ক্ষমতায়নের বর্ষে' (২০০১) নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একাধিক নীতিও ঘোষিত হয়।[২৮] এই নীতিগুলি হল- তাদের সামাজিক নিরাপত্তা, সরকারি ক্ষেত্রে সমান অধিকার, সমান হারে মজুরি সুনিশ্চিতকরণ, লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া, স্বাস্থ্য, পরিষেবা, কর্মসংস্থান ও জাতীয় জীবনে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি। আবার, ২০০৪ সালে জাতীয় স্তরে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য মহিলা সংগঠনগুলি কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেমন- মহিলা সংরক্ষণ বিল, কৃষি জমির উপর মহিলাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা

করা, গরীব গ্রাম্য মহিলাদের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং পারিবারিক জীবনে হিংসাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা ইত্যাদি।[২৯]

মূল্যায়ন:- উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে যতগুলি নারী আন্দোলন ঘটেছে, সে আন্দোলনগুলি কার্যকরি করার ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বে উচ্চবিত্ত মহিলারাই আন্দোলনগুলি পরিচালনা করার ফলে নিম্নবিত্ত শ্রেণির মহিলাদের তেমন একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাদের শিক্ষার অভাব। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নারী আন্দোলনের কিছুটা প্রসার ঘটেছিল তা বলা যায়। কারণ, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধানে সাম্যের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া, ১৯৭০-১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত নারীজাতির স্বার্থের স্বপক্ষে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি, সম্পদের বন্টন, আইনি ব্যবস্থা ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়গুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফলস্বরূপ মহিলাদের সামাজিক অবস্থান, ভূমিকা ও মর্যাদার তেমন কোন অর্থপূর্ণ বিকাশ হয়নি। এর পিছনে মূল কারণ হল, নারী আন্দোলন মূলত শহরে শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত মহিলাদের মধ্যে আবদ্ধ থেকে গিয়েছে। দরিদ্র ও অশিক্ষিত মহিলাদের অনেক ক্ষেত্রেই এই আন্দোলন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ভারতবর্ষের মত দেশে জাতপাতব্যবস্থা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও কুপ্রথা বজায় থাকায় নারীবাদী আন্দোলন ততটা সক্রিয় হতে পারেনি। আবার, রাজনৈতিক দলের মহিলা সংগঠনগুলি দলের নির্দেশে বারে বারে পরিচালিত হয়েছে তাও লক্ষ্য করা যায়। তার ফলে স্বাধীনভাবে আন্দোলনগুলি পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পূর্বে নারী সমস্যাকে কেন্দ্র করে নারীদের মধ্যে তেমন কোন উদ্যোগ চোখে পড়েনি। স্বাধীনতা সংগ্রামে বহু নারী গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে এসে লড়াই করলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোন সক্রিয় পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করেনি। ২০০১ সালে 'নারী ক্ষমতায়নের বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করলেও কার্যক্ষেত্রে পুরুষশাসিত সমাজের জন্য তা বাস্তবায়নের অভাব ঘটেছে। তার মূল কারণ হল, নারীরা নিজেদের বিষয়ে আলাদা করে ভাবে না। তাদের ভাবনা-চিন্তা তৈরি হয় মূলত পরিবারকে ঘিরেই। ফলে ভারতবর্ষে নারী আন্দোলন সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠেনি। লক্ষ্যণীয়, একবিংশ শতাব্দীতে নারী শিক্ষার বিস্তার এবং অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা তাদের বাইরে জগতটাকে চিনতে সাহায্য করেছে। সুতরাং নারী আন্দোলনকে সার্থকভাবে গড়ে তুলতে হলে যে বিষয়টির সর্বোপরি প্রয়োজন, তা হল সর্বপ্রকার কর্মসূচির সমন্বয়সাধন করে সুপরিকল্পিতভাবে কাজগুলিকে সংগঠিত করা। এর সঙ্গে এই কথা বলা শ্রেয় যে, একজন পুরুষ কর্মীর পক্ষে বাইরের আন্দোলন ও সংগঠনের কাজ করা যতটা সহজতর, একজন নারীর পক্ষে সেই কাজ করাটা ততটাই কঠিন। পরিবারের দায়-দায়িত্ব সামলে তবেই তারা বাইরের কাজ করতে পারে। সুতরাং বহু সমস্যা থাকা

সত্ত্বেও আমাদের নারী কর্মীরা এত বড় বড় আন্দোলন সংগঠিত করেছে। তবে এক্ষেত্রে বলা যায় যে, পুরুষরা যদি সহযোগিতা না করে, তাহলে নারীদের একক প্রচেষ্টায় আন্দোলনের কাজ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধের যথার্থ সার্থকতা তখনই লাভ করবে, যখন সমাজে নারীদের ক্ষেত্রে যে যে সমস্যাগুলি রয়েছে তার সমাধান ঘটবে। তবে, আমরা আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে মহিলারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে এবং সমাজকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

তথ্যসূত্র:-

১. মুখোপাধ্যায়, কনক, নারী আন্দোলন ও আমাদের কাজ, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, পঞ্চম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৬।

২. ব্যানার্জী, ড. মলয়, ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা, বিজয়া পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, জুলাই, ২০০৯, পৃ. ১৭৯।

৩. পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ১৭৯।

৪. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, ভারতীয় রাজনীতির কাঠামো ও প্রক্রিয়া, বি.বি কুন্ডু গ্র্যান্ডসন্স, নবম সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০২২, পৃ. ৩৫৫।

৫. সরকার, কল্যাণকুমার, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, জুলাই, ২০০৯, পৃ. ১৯১।

৬. পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ১৯১।

৭. ঘোষ, অরুণাভ, ভারতীয় রাজনীতির বিতর্কিত বিষয়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা- ৯, জানুয়ারি, ২০১০, পৃ. ১৩২।

৮. ব্যানার্জী, ড. মলয়, ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা, বিজয়া পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, জুলাই, ২০০৯, পৃ. ১৭৯।

৯. মহাপাত্র, আনাদিকুমার, ভারতীয় রাজনীতির কাঠামো ও প্রক্রিয়া, বি.বি. কুন্ডু গ্র্যান্ডসন্স, নবম সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০২২, পৃ. ৩৫৪-৩৬০।

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, রাজনীতি ও নারী শক্তি ক্ষমতায়নের নব দিগন্ত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, জুন, ২০০৯, পৃ. ২৭-২৮।

১১. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, সুহৃদ পাবলিকেশন, সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা, মার্চ, ২০০৯, পৃ. ১১৬৭।

১২, দাশ, অমল, ভারত ইতিহাসে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক: এদের সংকট ও সংগ্রাম- উনিশ শতক থেকে বিশ শতক, প্রগতিশীল প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা- ৭৩, এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ৪৬- ৫১।

১৩. পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ৫১- ৫৩।

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, নারীরা আজ যেখানে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে আলোর দিশা, গ্রন্থমিত্র প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা- ৯, আগস্ট, ২০১২, পৃ. ৮-৯।
১৫. ঘোষ, বিপত্তারণ, রায়, সুধীর, ভারতের সংবিধান এবং এর ক্রমবিবর্তন, প্রগতিশীল প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা-৯, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১০১-১০২।
১৬. দালাল, প্রণবকুমার, ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০২০, পৃ. ৩৭৬।
১৭. ব্যানার্জী, ড. মলয়, ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা, বিজয়া পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, জুলাই, ২০০৯, পৃ. ১৮২।
১৮. ঘোষ, অরুণাভ, ভারতীয় রাজনীতির বিতর্কিত বিষয়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা- ৯, জানুয়ারি, ২০১০, পৃ. ১২৫।
১৯. পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ১২৫।
২০. মন্ডল, বাসুদেব, আজকে যোধন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের অনুমোদিত তালিকাভুক্ত দ্বি মাসিক পত্রিকা, কলকাতা- ৯, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ৭৬।
২১. দাশ, অমল, ভারত ইতিহাসে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক: এদের সংকট ও সংগ্রাম- উনিশ শতক থেকে বিশ শতক, প্রগতিশীল প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা- ৭, এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ৫৯- ৬০।
২২. মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী, মুখোপাধ্যায়, শক্তি, ভারতের সংবিধান ও শাসনব্যবস্থা, ওয়ার্ল্ড প্রেস, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, এপ্রিল, ২০০৬, পৃ. ৩৫০- ৩৫১।
২৩. পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ৩৫১।
২৪. দালাল, প্রণবকুমার, ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০২০, পৃ. ৩৭৬- ৩৭৭।
২৫. ব্যানার্জী, ড. মলয়, ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা, বিজয়া পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, জুলাই, ২০০৯, পৃ. ১৮৪।
২৬. চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার রূপরেখা, প্রগতিশীল প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা-৭৩, এপ্রিল, ২০১৮, ২৩২-২৩৩।
২৭. হোসেন, তুজামমেল, ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গাইডেন্স প্রকাশন, নবম সংস্করণ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০১১, পৃ. ২০৫।
২৮. মৈত্র, শেফালী, নৈতিকতা ও নারীবাদ: দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানামাত্রা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, জুন, ২০০৭, পৃ. ১৫৩।
২৯. ব্যানার্জী, ড. মলয়, ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা, বিজয়া পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, জুলাই, ২০০৯, পৃ. ১৮৪- ১৮৫।

গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় নারীত্বের রূপায়ণ

সুব্রত দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর উইমেন,
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ: পুরুষতন্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান আবহমানকাল থেকেই ঊনমানবের মতো; তাঁকে অবমানবও বলা যায়। যাবতীয় নেতিবাচক অভিধা দিয়ে নারীকে চিহ্নিত করার একটা মৌল প্রবণতা আমাদের সমাজে রয়েছে।পুরুষতন্ত্রের শাসনজনিত নিগড়ের চাপে নারীর মানবিক অস্তিত্ব কী ক'রে বারবার বিপন্ন হয়েছে তা সংবেদনশীল অনুভূতিঋদ্ধ মানুষের ভাবনায় আমরা রূপায়িত হতে দেখেছি। গীতা চট্টোপাধ্যায়েরকবিতায় আমাদের সমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে নারীর বিভিন্ন অবস্থানের সঙ্গে তাঁর ন্যুব্জ অবমানবের রূপটিও ধরা পড়েছে। সন্দেহপ্রবণ এই সমাজ মেয়েদের কী নিষ্করুণভাবে প্রশ্নার্ত ক'রে তোলে, ক'রে তোলে নানানতর অসংগত অভিযোগে অভিযুক্ত— তার একটা রূপচিত্র গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় আমরা দেখেছি। এই নিবন্ধে এই বিষয়ে খানিকটা বলবার অবকাশ পেয়েছি।
মূলশব্দ : নারী, পুরুষতন্ত্র, শাসন, নারীবাদ, যৌনতা।

গীতা চট্টোপাধ্যায়কে (১৯৪১-২০১৯) দ্বিধাহীনভাবে 'মহাকবি' আখ্যায় আখ্যায়িত করা যায়। কারণ, একজন কবিকে মহাকবি আখ্যায় আখ্যায়িত করার জন্য যে-সমস্ত লক্ষণের প্রয়োজন হয় তার সবটাই বোধহয় তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। একদা কবি শিদলফস্কি তাঁর বন্ধু দস্তয়েভস্কিকে লিখেছিলেন : "মহাকবির লক্ষণ কী জানো ? তাঁকে ধুলোয় ফেলে দিয়ে টানো, তাঁকে কাদায় ফেলে দিয়ে মাড়াও, তাঁকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দাও, তাঁর আত্মা কখনও আত্মসমর্পণ করবে না। তিনি সর্বদা সত্যসন্ধী, নিত্য ন্যায়পরায়ণ।"[১] গীতা চট্টোপাধ্যায় আমৃত্যু শিদলফস্কি কথিত মহাকবি হয়ে ওঠার লক্ষণগুলিকে মেনে চলেছিলেন। কবিতায় দৃঢ়ভাষ্যে লিখেছিলেন : "আমি বরং শিরও দেব,/ স্বধর্মকে কখনো না।"[২] অন্য একটি কবিতায় প্রতিবাদ-দীপিত-বাচনে লিখেছিলেন : "প্রতিমার সামনে আর চড় মারবে সাধ্য আছে কারো/ নির্বিবেক বাঙলাদেশে গাল বাড়িয়েছি, কই মারো ?"[৩] এই দার্ঢ্য ব্যক্তিত্বই তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাকে অবলম্বন করেই তিনি একান্ত আপন স্বাতন্ত্র্যে অননুকরণীয় নৈপুণ্যে কবিজীবন কাটিয়েছিলেন। তাঁর কবিতায় নারীদের কথা বিভিন্ন মাত্রায় চিহ্নিত হয়ে ফিরে ফিরে এসেছে। সেই সব নারীদের বিভিন্ন রূপাবয়বের চালচিত্র তিনি যে-ভাবে এঁকেছিলেন, সেই বিষয়টিকেসংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

এ-কথা ঠিক যে গীতা চট্টোপাধ্যায়ের যে-সব কবিতায় মেয়েদের কথা উঠে এসেছে এবং তিনি তাঁর কবিতায় অত্যন্ত সচেতনভাবে যেভাবে মেয়েদের অবস্থানকে তুলে ধরেছেন তাতে ক'রে তাঁকে প্রচলিত অর্থে নারীবাদী কবি বলা যায় না। তত্ত্বগত দিক থেকে মেরি উলস্টোনক্রাফট(Mary Wollstonecraft) বা সিমন দ্য বোভয়া(Simon de Beauvoir) এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের অবস্থান নিয়ে যেভাবে ভেবেছেন বা বলেছেন, সেই প্রথাগত ভাবনাজারিত কোনো অভিঘাত গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রকটভাবে লক্ষিত হয় না। সতাতনপন্থীদের মতো রক্ষণশীল অনুভূতি থেকে নয় বা প্রথাবাদীদের মতো গৃহাভ্যন্তরে মেয়েদের আটকে রেখে নয় বরং কোথাও যেনতিনি মেয়েদের নিকটতরজন হয়ে বহুতররূপে নিজের প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন মেধার আততি দিয়ে।

গীতা চট্টোপাধ্যায়ের 'ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ' কবিতাটি পড়লে স্পষ্টতই মনে হয় এখানে রয়েছে মা ও মেয়ের কথোপকথন। রোঁলা বার্ত তাঁর 'The Text of pleasure' নামক বইতে বলেছিলেন "the text that contents, fills, grants euphoria; the text that comes from culture and does not break with it, is linked to a comfortable practice of reading."[৪] অর্থাৎ পরিচিত সংস্কৃতির সঙ্গে জুড়ে থাকা কোনো বিশেষ রচনা যখন পাঠক পাঠ করে তখন সে ওই রচনাটির সঙ্গে একপ্রকার নৈকট্যবোধ করে। এ-ক্ষেত্রে উক্ত কবিতায় মা তাঁর মেয়েকে প্রশ্ন করেন : "তরাসে কাঁপিস কেন মেয়ে, কোনো পরপুরুষকে দেখে' ?[৫] বলাবাহুল্য এই 'তরাস' শব্দটি 'ত্রাস' শব্দের অর্ধতৎসম রূপ। 'তরাস' শব্দটি প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে এক দিয়ে যেমন গ্রামীণ অনুষঙ্গের ছোঁয়াচ লক্ষ করা যায়, অন্যদিকে মেয়েটির শিহরিত অবস্থার রূপকল্প আমাদের সামনে আভাসিত হয়ে ওঠে। এই শিহরণ কী ভয়জনিত ? নাকি কোনো গভীর গোপনকে মায়ের কাছ থেকে আড়ালের চেষ্টাজাত শরীরী প্রকাশ, তা ক্রমেই প্রকাশিত হবে। এই শিহরণ এবং ভয়— এই যুগ্মানুভূতি যেন একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার ফল পরিণাম। 'পরপুরুষ' শব্দটির প্রয়োগ দেখে মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, মেয়েটি বিবাহিত এবং মেয়েটি সদ্য যুবতী নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে, কিশোরীও হতে পারে। অন্তত মেয়েটি কবিতায় যে-ভাবে নিজের স্বরূপকে মেলে ধরছে তাতে ক'রে তাই মনে হয়।

উক্ত কবিতায় কিশোরী বিবাহিতা মেয়েটি যেভাবে শিহরিত এবং ভীত হয়েছে তাতে মনে হয় এই বিশেষ অবস্থাটির অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। মেয়েটি যেন নিজেকে আড়াল করার জন্য, প্রকৃত সত্যকে এড়ানোর জন্য মাকে বলে : '—না মা, মেঘ বিজুলছে।'[৬]'বজ্র' থেকে 'বিজলি', বিজলি মানে আবার আলোও হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে মেঘ ডাকা ও বজ্রপাতের দিকেই মেয়েটি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে মা জিজ্ঞেস করেন : "আকখুটে, কোথায় রাখিস বেলাশেষ ভরন্ত কলস ?"[৭] এই 'আকখুটে' শব্দটির মধ্যে

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের প্রভাব অনুভূত হয়। 'আখেটিক' শব্দের অর্থ ব্যাধ বা শিকারি 'আক্ষটি' বা 'আখেটক' মানেও শিকারি বা শিকারজীবী সম্প্রদায়কে বোঝায়। মালাধর বসু লিখেছিলেন : "দেখিল ছাওয়াল বন্দি আক্ষটির স্থানে।"[৮] আবার মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লিখেছিলেন : "প্রথমে কলির অংশে জন্মাবে আক্ষটি বংশে।"[৯] অন্যদিকে, 'আক্খুটে শব্দটিকে 'আখুট', 'আখুটি', 'আখুটে' বা 'আখুট্টি' — এই শব্দগুচ্ছের সমবায়েও ভাবা যেতে পারে। এই 'আখুট' ও 'আখুটি' শব্দ দু'টি 'জেদ' প্রকাশক। শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'অখট্টিকা' থেকে। আবদার বা বায়না অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন : "একটু বেশি আহ্লাদি হয়েছে মেয়েটা— বড্ড আখুট।"[১০] ষোড়শ শতাব্দীতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছিলেন : "যে আখুটি করে তা ঈশান সমারয়।"[১১] শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন : "বন্যার আখুটেবালি সভ্যতা গঠনে লাগে কাজে।"[১২]

অর্থাৎ কিনা বক্ষ্যমাণ কবিতায় মেয়েটির মা মেয়েটিকে 'জেদি' বা 'আবদারে' ব'লে সম্বোধন ক'রে বলছে যে, এই সায়াহ্নে যখন সে ঘরে ফিরছে তখন 'ভরন্ত কলস'-টি কোথায় রেখেছে ? অবশ্য 'বেলাশেষ' ও 'ভরন্ত কলস'-এর ব্যবহার এখানে অন্যতর অর্থেও বিশেষ তাৎপর্যবাহী। 'বেলাশেষ' শুধুমাত্র দিন শেষ বা সায়াহ্ন অর্থে নয়। আপাত অর্থে হয়তো মনে হতে পারে যে, মা কন্যাকে জিজ্ঞেস করছেন— সে যে জল আনতে গিয়েছিল এবং বেলা শেষ ক'রে ফিরেছে তাহলে তাঁর জলপূর্ণ কলসিটি কোথায়। এর উত্তরে মেয়ে জানায় : "পিছল পইঠায় পড়ে ঘট ভেঙে গেছে।"[১৩]'পইঠা' শব্দটি অনেকার্থ নির্দেশক। তার মধ্যে একটি অর্থ হল সিঁড়ি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন : "শৈলের পইঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ।"[১৪] অর্থাৎ পিছল সিঁড়িতে পরে 'ঘট' ভেঙে গেছে। এখানে লক্ষণীয় মেয়েটি কিন্তু 'কলসি' বলছে না, বলছে 'ঘট'।

গীতা চট্টোপাধ্যায়ের ভাবনাগত মনোদর্শন অপরাপর কবিদের মতো নয়। তাঁর কবিতাকে চিরাচরিত নিয়মে ঠিক নারীর লেখা ভাষ্য বলেও মূল্যায়ন করা চলে না। মায়ের জিজ্ঞাসার মধ্যে অবশ্য পিতৃতন্ত্রের সুর স্পষ্ট। আসলে নারীর নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই। "নারী কখনোই স্বায়ত্তশাসিত নয়; সে বিয়ের আগে বাপের বাড়িতে আশ্রিত থাকে, বিয়ের ফলে ঘটে তার প্রভুবদল; পিতার বদলে স্বামীটি হয় তার নতুন প্রভু। এক প্রভু ধর্মীয় বা সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে তাকে হস্তান্তরিত করে আরেক প্রভুর কাছে; এ-হস্তান্তরণ চুক্তি সাধারণত সম্পন্ন হয় দু-প্রভু, শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে।"[১৫] আসলে পুরুষতন্ত্রে সবসময় মেয়েদের আগলে-আগলে রাখতে চায়। মে ওয়েস্ট পরিহাস করে বলেছিলেন যে, "কী মজার, যে-পুরুষেরই সাথে দেখা হয় সে-ই আমাকে রক্ষা করতে চায়; আমি বুঝতে পারি না কী থেকে।"[১৬] আলোচ্য কবিতাটিতে কোনো পুরুষের উপস্থিতি নেই সত্য, কিন্তু মেয়েটির মা-ই যেন হয়ে উঠছে পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধিজন।

গীতা চট্টোপাধ্যায়কে প্রচলিত অর্থে নারীবাদের ধ্বজাবাহী কবি হিসেবে ধরে নিয়ে তাঁর কবিতাকে বিচার করা বোধহয় সমীচীন নয়। তাঁকে বরং শনাক্ত করা উচিত এমন একটি ভাষাচেতনার দিক থেকে, এমন একটি সংকেতবাহী ঐতিহ্যের দিক থেকে এবং মেয়েদের যাপনের যে ক্রমিক পরম্পরা যা এমন একটি সহজাততত্ব বোধের দ্বারা অন্বিত— যেখানে অবস্থান ক'রে তিনি মেয়েদের অস্তিত্বকে আপাত অর্থে অধস্তন মনে করছেন না। বরং Luce Irigaray-র *This sex which is not one*[১৭]এর মতো ক'রে তিনিও একটু অন্যতরভাবে ভাবতে চাইছেন যে, তিনি এই আবহমান বিশ্বে একক কোনো সত্তা নন, অপূর্ণ নন। 'ভরন্ত' শব্দে মেয়েটির পূর্ণ যৌবনকে ইঙ্গিত করে, আর 'ভরন্ত কলস' শব্দে-তো রূপ পায় যৌবনবতী নারীর সামগ্রিক শরীরময় অস্তিত্বের কথা। 'বেলাশেষ' শব্দটি সময় ফুরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতবাহী বা 'ভরন্ত' শব্দের সঙ্গে যেন-বা তীব্র বিপ্রতীপতার দ্যোতনাবাহী। 'পিছল পইঠা' শব্দবন্ধের 'পিছল' শব্দটি পুরুষের চরিত্রহীনতার, পুরুষের লাম্পট্যের কথা আমাদের মনে আসে। এখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধার একটা আর্কেটাইপ ফুটে ওঠে। নারীর অনুভূতিতে পুরুষের যে চেহারা— যা নারীকে পুরুষের কাছে *object of desire* ক'রে রাখে, তার একটা ধারণাও এখানে যেন প্রকাশিত হচ্ছে। হুমায়ুন আজাদ পুরুষের এই বিশেষ প্রবণতা বিষয়ে লিখেছিলেন : "পুরুষ চায় শয্যায় তার স্ত্রীটি হবে সমস্ত যৌনাবেদনময়ী অভিনেত্রীর সমষ্টি! তারা নারীকে চায় সব সময় সতী, কিন্তু শয্যায় বারাঙ্গনা।... আজকের প্রতিক্রিয়াশীল তরুণেরা তাদের পিতামহদের মতো আবার উন্মাদ হয়ে উঠেছে কিশোরীসম্ভোগের জন্যে; তারা চিকিৎসক প্রকৌশলী আমলা হয়ে ব্যগ্রতা বোধ করছে দশম শ্রেণীর বালিকার দেহ ভোগের জন্য।"[১৮] তাই পুরুষ নামক এই 'পিছিল পইঠায়' আবহমানকাল ধরে ঘটে গেছে অনেক মেয়ের সমূহ সর্বনাশ।

'ঘট ভেঙে' যাওয়ার কারণ আসলে 'পিছল পইঠা'। এই 'ঘট' আসলে প্রত্যাখ্যাত নারীর যৌনতার সহজাত একটি বিশেষ আর্কেটাইপ। এই পূর্ণকলস বা পূর্ণঘট মঙ্গলচিহ্নের ধারণা বহন করে। এই ঘটের কথা আমরা পেয়েছি কবির 'অপত্য' কবিতায়, যেখানে — "পেতলের ঘড়া উলটে পড়ে যায় সিঁড়ির ওপরে/ উপুড় গৈরিকজল ঘাটের চাতাল মুছে নিক"[১৯]— এই রকমের চিত্রকল্প ব্যবহার করছেন তিনি। অর্থাৎ নারীর প্রসবের সঙ্গে, নারীর যৌনতার সঙ্গে, নারীর গর্ভের সঙ্গে, তার জরায়ুর সঙ্গে এই ঘটের একটা বিশেষ যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে। যেখানে 'ঘট' ভেঙে যাচ্ছে বলা হচ্ছে, তখন বোঝাই যাচ্ছে — নারীপুরুষের সংযোগস্থলে আলাদা ক'রে নারীর দিক থেকে এই মুদ্রাগুলি আসছে।

"খুব কি লেগেছে বাছা, ওষ্ঠাধর রক্তাক্ত এমন !"[২০] মা-এর জিজ্ঞাসার মধ্যে খানিক মমতা যেমন আছে, তেমনি শঙ্কাও আছে। মেয়েটি কিন্তু আদৌ এখানে oppressed বা অত্যাচারিত নয়। জুলিয়া ক্রিস্তেভা(Julia Kristeva) যাকে *powers*

of horror[২১] বলেছেন, মেয়েটির অবস্থা তেমনও নয়। মেয়েটি কিন্তু কোথাও পরপুরুষটি দ্বারা শোষিত, অত্যাচারিত, ধর্ষিত— এমনটা বলা যাবে না। মেয়েটি যেন সমানভাবে তাঁর উপভোগের সঙ্গে সমীকৃত হয়ে আছে। সে সমানভাবে তার উপভোগের বস্তুর সঙ্গে নিজের একটি বিশেষ অস্তিত্বকে খুঁজে পাচ্ছে। মেয়েটির নিজের অস্তিত্বের ভাষাবাহী হয়ে উঠছে কবিতা। যেখানে সে প্রত্যেকটি অনুশাসনকে নিজের মতো প্রত্যাখ্যান ক'রে নিজের মতকে নিজের তরাসের ভেতর দিয়ে pleasure element-কে আলাদা ক'রে প্রকাশ করতে পারছে এবং সেখানে কিন্তু তাঁর কোনোরকম সঙ্কোচ, কোনো কুণ্ঠা ভয় বা ব্রীড়া কিছুই নেই।

মা-এর প্রশ্নের উত্তরে মেয়ে জবাব দিয়েছে : "কই কিছু জানি না তো, ঘরে ফেরা পথ অন্ধকার!"[২২] অর্থাৎ মেয়ে স্পষ্টতই চাইছে মাকে আড়াল করতে। এখানে একটা বিষয় প্রতীয়মান হয়ে উঠছে যে, মেয়েটি তাঁর গোপন অভিসারের কথা কিংবা নিভৃত মিলনের কথা একান্তভাবে মায়ের কাছ থেকেও সংগুপ্ত রাখতে চাইছে। আসলে নারীর আছে সমাজ নামক একটি প্রতিষ্ঠানের ভয়। সমাজ তাঁকে প্রতিনিয়ত ভয় দেখিয়ে চুপ ক'রে রাখতে চেয়েছে। তাঁর নিজের সত্তাকে উপলব্ধির কোনো জায়গা তথাকথিত এই সমাজ রাখেনি। নারী জানে তাঁকে কেবল শাসিত হতে হবে। "শাসনের উপযুক্ত হয়ে থাকি,/ মেধা, তৃষ্ণা, প্রেম ও অপ্রেম/ না দেখা ধুলোর মতো সামনে পড়ে থাকে।"[২৩] তাই মা সংশয়ান্বিত হয়ে সপ্রশ্ন আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে মেয়েকে জিজ্ঞেস করে : "একী, কালশিরা-চিহ্ন গোপন রাখিস দেখি নীল শাড়ি বুকের আঁচলে ?"[২৪] তখন মেয়ে উত্তর দেয় : "এ আমার আজন্মের অহংকার প্রিয়তম দাগ।"[২৫] এই বিশেষ অভিজ্ঞান-চিহ্ন বা এই 'প্রিয়তম দাগ'-এর এই আর্কেটাইপ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুরঙ্গ উপন্যাসে দামিনীর একটি উক্তিকে। দামিনী বলেছিল : "এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি।"[২৬] আসলে নারী সবসময় চেয়েছে প্রিয়তর পুরুষের সবিশেষ কোনো স্মারককে দেহে ধারণ করতে। বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় প্রেমিকা নারী প্রিয় পুরুষকে 'ভীরু দ্বার' ভেঙে দিয়ে তাঁর অঙ্গে ভালোবাসার অঙ্গীকার স্থাপনের জন্য অপ্রগলভ আহ্বান জানিয়েছে। সেই সুস্পষ্ট নির্ঘোষবার্তা শুনে নেওয়া যেতে পারে : "হে প্রিয় আমার প্রিয়তম মোর,/ আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর।/ কোথায় পুরুষকার ?/ অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?"[২৭]

নারী চিরায়ত কাল ধরেই প্রিয় পুরুষের সারাৎসারকে তাঁর অস্তিত্বের মূলে ধারণ করতে চেয়েছে যাবতীয় সামাজিক বিধিনিষেধের তাড়নকে আগ্রাহ্য করে। যে-কারণে কর্ণাটদেশের সন্ন্যাসিনী কবি আক্কা মহাদেবী কিংবা মীরাবাঈ-এর নিষ্ঠহৃদয়ের কথা ধ্বনিত হয়েছে এ-কালের কবির কবিতায়— "...ভগবান চেন্নামল্লিকার্জুন/ছিলেন আমার প্রেমিক। কিংবা হয়তো আমার রক্তমাংসের প্রেমিককেই লুকিয়ে রেখেছিলাম পাথরের মূর্তির পেছনে.../ আমিই ছিলাম মীরাবাঈ, কৃষ্ণপ্রেমের জন্য কত যে পীড়ন সহ্য করেছি, সে তোমরা জানো।"[২৮] এরপর কবিতায় পটচিত্রের পালাবদল ঘটে। কবি

নিজেই যেন সমীকৃত হয়ে যান এই কবিতার মেয়েটির সঙ্গে, কিংবা শুধু মেয়েটির সঙ্গেই নয়, তিনি যেন উনিশ শতক বা তারও আগে কয়েক শতক জুড়ে মেয়েদের ঘেরাটোপময় যাপনের যে-বেদনা, যে-উনমানবময় জীবন তাকে যেন উপলব্ধি করতে পারেন। কবি তাই লেখেন— "অন্ধকারে সেই ভয়ে আবার পিছল ঘাটে চলে যাবে নদীর উদ্দেশ/পুরোনো বাংলার মেয়ে, ছিল যার একদিন ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ!"[২৯]

'নরকের দ্বারী, নারী' কবিতায় কবি-মনস্বিনী গীতা চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবাদভাস্বর মননের একটি রূপরেখা প্রকাশিত হয়েছে। তথাকথিত হিন্দুশাস্ত্র সমূহে নারীকে নরকের দ্বার বলা হয়েছে এবং এই বয়ান যে একমাত্রিক, তা পুরুষতন্ত্রের রচিত বয়ান, তাতে যে সত্যের সারভাগ নেই— এই বিষয়টিকেই কবি আলোচ্য কবিতায় উপস্থাপিত করেছেন। কবি লিখেছেন —

দুঃখে মাথা দিয়ে আছে, ঠিক জানো নারী, মায়া নয়
অন্তত শঙ্করাচার্য চেনেন না বিকেলের পরে।
নিজস্ব শ্লোকার্ধে তাঁর তখন জগৎ মিথ্যে হয়[৩০]

দুঃখকে প্রতিদিন সহ্য ক'রে মাথা নিচু ক'রে আছে যে নারী, মেরুদণ্ডকে যে উন্নত করতে পারেনি, দুঃখের বোঝায় অপমানের বোঝায় যে নিয়ত নত— সে কিন্তু কোনো মায়া নয়, বাস্তব অস্তিত্বশীল মানবজাতির প্রতিনিধি সে নারী। বেদের যুগ থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত নারীর ওপর কেবল অপমান অসম্মান আর যাবতীয় বিধিনিষেধের পালা জুটেছে। বেদে বলা হয়েছে, "ভুক্ত্বা উচ্ছিষ্টং বধ্বৈ দদ্যাৎ"[৩১] অর্থাৎ খাওয়ার পরে এঁটোটা স্ত্রীকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মোটামুটিভাবে ঋগ্বেদের যুগের পরবর্তীকাল থেকেই নারীর অবনমনের সূত্রপাত। এই সময়পর্বে বলা হয়েছে "ন স্ত্রী জুহুয়াৎ"[৩২] অর্থাৎ নারী হোম করবে না। বেদেই আবার রয়েছে, "যে নারীর বিদ্যা বা সম্পত্তি আছে সে চেহারায় মেয়েমানুষ হলেও আসলে পুরুষই'।"[৩৩] এই মন্তব্যটিতে মেয়েদের ব্যক্তি-অস্তিত্বকে অস্বীকার করার দুর্মর প্রয়াস রয়েছে। মেয়েদের প্রতি নঞর্থক কথায় ভ'রে রয়েছে সেকশুভোদয়া গ্রন্থে। এখানে বলা হয়েছে, "অসত্য, দুঃসাহস, ছলনা, মাৎসর্য, অতিলোভ, নির্গুণত্ব, অশুচিতা এসব তাদের স্বাভাবিক দোষ।"[৩৪] আরও বলা হয়েছে, "দূর্বাকীর্ণ ভূমিশয্যায় পরপুরুষ সঙ্গম নাকি তাদের একান্ত প্রীতিকর(যথাহি দূর্বাদিবিকীর্ণভূমৌ প্রয়াতি সৌখ্যং পরকান্তসঙ্গাৎ)!"[৩৫] অর্থাৎ সেই সময়কার সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের মর্যাদা কতখানি প্রতিকূল ছিল তা এইসমস্ত অশালীন বাচন থেকে অনুভূত হয়। গীতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর যাপিত জীবনে মৌনের আবেগ, নিষ্ঠার কাঠিন্য আর বৈরাগ্যের গাম্ভীর্য নিয়ে মেয়েদের অবস্থানের স্বরূপটিকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন।

এই অবনমিত নারীর অস্তিত্ব শঙ্করাচার্যের মতো তথাকথিত পুরুষোত্তম পুরুষের কাছে মিথ্যা হয়ে যায়, হয়ে যায় মায়া। "অন্তত শঙ্করাচার্য চেনেন না বিকেলের

পরে"[৩৬]— অর্থাৎ রাত্রিবেলা যোগীরা যখন তপস্যা করেন, তখন নারীসঙ্গ ত্যাগ করেন তাঁরা, তাই বলা হচ্ছে বিকেলের পরে চেনেন না। "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা"[৩৭]— এই হলো শ্লোকার্ধ। কবিতায় রয়েছে : "নিজস্ব শ্লোকার্ধে তাঁর তখন জগৎ মিথ্যে হয়।"[৩৮] পুরো শ্লোকটি হলো : "শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।/ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ"[৩৯] অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। তাঁর মতে, এই ব্রহ্ম নিরুপাধিক, সর্বপ্রকার ভেদরহিত, নির্গুণ ও নির্বিশেষ এবং নির্বিকার নিষ্ক্রিয়। জগতের পৃথক অস্তিত্ব নেই। এরপর কবি লিখেছেন : "আমি ব্রহ্ম টানটান আশ্চর্য জ্যামুক্ত চরাচরে।/ অবিদ্যা সে, বসে আছে রোজকার কড়ায় রেখে হাত"[৪০] এখানে 'টানটান' শব্দ দ্বারা প্রতীতি হচ্ছে যে, পুরুষজাতির কথা বলা হচ্ছে। অন্যদিকে, 'অবিদ্যা' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। এই স্ত্রীলিঙ্গ হেতু 'অবিদ্যা'-তে নারীর ব্যবহারের আরোপ করেছেন কবি। এর আরেক কারণ হলো সাংখ্য দর্শনে আত্মাকে 'পুরুষ' বলা হয়। ভাগবদগীতাতেও 'পুরুষ' শব্দে আত্মা বোঝানো হয়েছে। আত্মা সদ্-চিদ্-আনন্দস্বরূপ। অর্থাৎ আত্মা চেতন, অন্যদিকে 'মায়া' বা 'অবিদ্যা' হলো অ-চিদ্— তাহলে কবির ধারণা শাস্ত্রে যেহেতু পুরুষকে সদ্-চিদ্-আনন্দস্বরূপ বলেছে, আর মায়াকে বলেছে অবিদ্যা, অর্থাৎ অ-চিদ্ অ-চেতনা — চৈতন্যের বিপরীত স্বভাব।

অন্যদিকে 'অবিদ্যা' বলতে নারীজাতিকেও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বোঝানো হয়ে থাকে। সমগ্র নারীজাতিকে 'অবিদ্যা' হিসেবে অভিহিত করা একটি পুরুষতান্ত্রিক ছক। যদিও যেখানে পরিষ্কারভাবে মেয়েদেরকে হেয় ক'রে দ্যাখার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আবার কবিতায় উল্লেখিত "অবিদ্যা সে, বসে আছে রোজকার কড়ায় রেখে হাত"[৪১]— এই অংশে 'অবিদ্যা' শব্দে বারবনিতা বা বারাঙ্গনা নারীদের মূর্ত প্রতিচ্ছবি আভাসিত হয়। সমাজ এই নারীদের অপাঙক্তেয় ব্রাত্য ক'রে রাখে। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই শ্রেণির নারীদের বিষয়ে একটি কবিতায় লিখেছিলেন : "এখনো বেশ্যার পায়ে মাথা রাখলে মানবজীবন/লাভ করতে পারি।/ যে বেশ্যা ক্ষুধার্ত শিশুদের মুখে অন্ন তুলে দিতে/ নিজের কান্নার স্রোতে রোজ দেয় সতীত্ব ভাসিয়ে"[৪২] — সংবেদনশীল কবিহৃদয় কোথায় গিয়ে যেন তথাকথিত বারাঙ্গনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে রূঢ় সত্যি এই যে, নারীরা বারনারীতে রূপান্তরিত হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন নেতিবাচক কার্যকারণ পরম্পরার জন্য।

"অবিদ্যা সে বসে আছে রোজকার কড়ায় রেখে হাত"[৪৩]— এই অংশে একটি বিশেষ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সম্ভবত বিকেলোত্তীর্ণ সন্ধ্যায় সুবেশিনীরা কড়ায় হাত রেখে তাদের রোজগারের উৎস খরিদ্দারদের ডাকছে, আর সেই দ্বারে যাচ্ছে কারা— সেই 'ব্রহ্ম টানটান' পুরুষত্ব নিয়ে পুরুষকুল। এরপর কবি লিখেছেন :

নরকের দ্বার থেকে কে ফেরাবে চৈতন্যবিভ্রম ?
মধ্যরাতে শোভাযাত্রা বৈরাগীর নগ্ন পদব্রজ[৪৪]

আমরা সবসময় বলে থাকি অবিদ্যার বিভ্রম, কিন্তু চৈতন্যেরও বিভ্রম ঘটছে। পুরুষ-তো চৈতন্য, কারণ ব্রহ্মকে বলা হয় চৈতন্য। সদ্-চিদ্-আনন্দস্বরূপ-তো চৈতন্যস্বরূপ। তাহলে চৈতন্যের বিভ্রম ঘটছে, তাই সে ভুল দ্বারে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। তাহলে এখানে একটা সংশয়ী কৌতূহল তৈরী হচ্ছে— যে চেতন সে কীসের টানে নরকের দ্বারে উপস্থিত হচ্ছে !

গীতা চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব পাঠপরিধি অমেয়, তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে অধিকন্তু যে-দীক্ষা সংযুক্ত হয়েছিল তা তাঁর মননের দীপ্তিকে নতুনমাত্রায় প্রসারিত করেছিল। মৌনের আবেগ, নিষ্ঠার কাঠিন্য আর বৈরাগ্যের একটা আভা নিয়ে তিনি ছিলেন সজীব। ফলত সংবেদনশীল অনুভূতিঋদ্ধ হৃদয় নিয়ে মননের জগতে নিত্য পরিভ্রমণশীল এই এই কবিমনস্বিনী নারীর নারীত্বকে অত্যন্ত বিচারশীলতার সঙ্গে বুঝে নিতে চেয়েছেন। কোনো বিশেষ মতাদর্শের দ্বারা জারিত হয়ে নয়, কোনো কালের সীমার মধ্যে অবস্থান ক'রে নয়। তাঁর ফলপরিণামী বিচারসত্তাকে এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে খানিক বোঝার চেষ্টা করা হলো।

উৎস নির্দেশ

১. রাহুল দাশগুপ্ত, 'বাংলা সাহিত্যের আরভিং স্টোন', মাসিক কৃত্তিবাস, অক্টোবর ২০২১, পৃ.৩৭

২. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'ধর্ম', 'কবিতা সংগ্রহ', আদম, কৃষ্ণনগর, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ.২৪৯

৩. দ্র.ঐ, পৃ.২৫৫

৪. Roland Barthes, 'The Pleasure of the Text', (translated by Richard Miller with a note on the text by Richard Howard), Hill and Wang, New York, First American edition 1975, Twenty-third printing 1998, p.14

৫. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ', 'কবিতা সংগ্রহ', দ্র.ঐ, পৃ. ১৫৮

৬. তদেব

৭. তদেব

৮. মালাধর বসু, তথ্য : গোলাম মুরশিদ (সম্পাদিত), 'বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান'(প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৩, পৃ.২১২

৯. মুকুন্দ চক্রবর্তী, তথ্য : গোলাম মুরশিদ (সম্পাদিত), 'বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান'(প্রথম খণ্ড), দ্র.ঐ, পৃ.২১২

১০. বুদ্ধদেব বসু, তথ্য : গোলাম মুরশিদ (সম্পাদিত), 'বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান'(প্রথম খণ্ড), দ্র.ঐ, পৃ.২১৪
১১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, তথ্য : দ্র.ঐ
১২. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'কারজন্য এসেছেন ?', 'পদ্যসমগ্র-৩'আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৫, ষষ্ঠ মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৫, পৃ.৬৭
১৩. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ', দ্র.ঐ, পৃ.১৫৮
১৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'যক্ষের নিবেদন', 'কাব্য-সঞ্চয়ন', প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, প্রজ্ঞা বিকাশ সংস্করণ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ.১৪
১৫. হুমায়ুন আজাদ, 'নারী', আগামী প্রকাশনা, ঢাকা, বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ ষড়বিংশ মুদ্রণ, অক্টোবর ২০২১, পৃ.২৩৪
১৬. দ্র.ঐ, পৃ.২৫৩
১৭. Luce Irigaray, 'This Sex Which is Not One', (translated by Catherine Porter with Carolyn Burke), Cornell University Press, New York, First published 1985 by Cornell University Press ("Female sexuality has always been conceptualized on the basis of masculine parameters", p.23)
১৮. হুমায়ুন আজাদ, 'নারী', দ্র.ঐ, পৃ.২৪৫
১৯. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'অপত্য', দ্র.ঐ, পৃ.১৯৯
২০. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ', দ্র.ঐ, পৃ.১৫৯
২১. Julia Kristeva, 'Powers of Horror : An Essay on Abjection'(Translated by Leon S. Roudiez), Columbia University Press, New York, 1982, p.209
২২. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ', দ্র.ঐ, পৃ.১৫৯
২৩. অঞ্জলি দাশ, 'মৃত্তিকা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৯, পৃ.১২২
২৪. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ', দ্র.ঐ, পৃ.১৫৯
২৫. তদেব
২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চতুরঙ্গ', 'রবীন্দ্ররচনাবলী'(সপ্তমখণ্ড), রেস্কিন বাঁধাই, বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০১ বঙ্গাব্দ, পৃ.৪৯৫
২৭. বিষ্ণু দে, 'ঘোড়সওয়ার', 'চোরাবালি', 'কবিতাসমগ্র' আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৫, পৃ.৩২
২৮. মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'শাহবানুজন্ম', 'কথামানবী', 'কবিতাসমগ্র', দ্র.ঐ, পৃ.২৪০
২৯. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ', দ্র.ঐ, পৃ.১৫৯

৩০. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'নরকের দ্বারী, নারী', 'কবিতা সংগ্রহ', দ্র.ঐ, পৃ.২২৮
৩১. 'খাদির গৃহ্যসূত্র' ১/৪/১১, তথ্য : সুকুমারী ভট্টাচার্য, 'প্রাচীন ও অপ্রাচীন', কিশলয় প্রকাশন, দ্র.ঐ, পৃ.৩৪
৩২. সুকুমারী ভট্টাচার্য, 'ধর্ম এই সময়ে', দ্র.ঐ, পৃ.৩৮
৩৩. দ্র.ঐ, তদেব
৩৪. 'সেকশুভোদয়া', তথ্য : করুণাসিন্ধু দাস, 'অর্ধেক মানবী', পুলক চন্দ (সম্পাদিত), 'নারীবিশ্ব', গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৮, পৃ.২৮
৩৫. তদেব
৩৬. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'নরকের দ্বারী, নারী', দ্র.ঐ, প.২২৮
৩৭. তথ্য : 'বেদান্তদর্শন', 'অদ্বৈতবেদান্ত', অন্তর্জাল
৩৮. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'নরকের দ্বারী, নারী', দ্র.ঐ, প.২২৮
৩৯. তথ্য : মধুরা চক্রবর্তী, 'ছিন্নপত্রের তথ্যকোষ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৫, পৃ.৩৪২
৪০. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'নরকের দ্বারী, নারী', দ্র.ঐ, প.২২৮
৪১. তদেব
৪২. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বেশ্যা', তথ্য : রমিত দে, 'বারবণিতা : ব্রাত্যজনের ব্রতকথা', অর্ক দেব(সম্পাদিত), 'গণিকাসম্বাদ : ইতিহাস ও বহমানতা', বৈভাষিক, হুগলি, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ.৪৯
৪৩. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'নরকের দ্বারী, নারী', দ্র.ঐ, প.২২৮
৪৪. তদেব
৪৫. তদেব
৪৬. রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ(স্বামী চিদ্-ঘনানন্দ পুরী), 'আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ, পৃ.৯৯
৪৭. 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ : ২/৫' স্বামী গম্ভীরানন্দ(সম্পাদিত), 'উপনিষদ গ্রন্থাবলী', প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম সংস্করণ ২৪শে আষাঢ় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৭, পৃ.৩৭৬
৪৮. গীতা চট্টোপাধ্যায়, 'নরকের দ্বারী, নারী', দ্র.ঐ, প.২২৮
৪৯. তদেব

অমিয়ভূষণ মজুমদারের সাহিত্য ভাবনা

উর্বী মুখোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : অমিয়ভূষণ মজুমদার ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক ভিন্ন ধারার সাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্য সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা তাঁর একাধিক প্রবন্ধে তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম হল 'সাহিত্যের ধারণা', 'লিখনে কী ঘটে', 'উপন্যাসের ভাষা', 'সংবিত্তি', 'সাহিত্য ও স্বাধীন চিন্তার দায়িত্ব', 'উপন্যাস সম্বন্ধে', 'জনৈক ইমমরালিস্টের চিঠি', 'ঔপন্যাসিক ও জীবনদর্শন', 'শিল্পের আনন্দ', 'একটি কথন', 'উপন্যাসের গল্প', 'সাহিত্য প্রস্তাব', 'সাহিত্য নিবন্ধ' শীর্ষক বহু প্রবন্ধ। বর্তমান নিবন্ধে আমরা এই সকল প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করে সাহিত্যিকের নিজস্ব সাহিত্য ভাবনা কেমন ছিল তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি।
শব্দ-সূচক : উপন্যাস, উত্তরবঙ্গ, সংবিত্তি, উপন্যাসের ভাষা, চরিত্র, গঠন, ট্রমা, অধিদৈবত প্রভৃতি

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় যারা সাহিত্য রচনা করেছিলেন অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁদের মধ্যে এক ভিন্ন ধারার ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক। আত্মমগ্ন এই সাহিত্যিকের রচনা পাঠক মহলে কখনওই বহুপঠিত বা বহুচর্চিত ছিল না। অমিয়ভূষণ সাহিত্য রচনা শুরু করেন প্রায় মধ্য বয়সে। ১৯১৮ সালে জন্ম হলেও, তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে – 'নীল ভুঁইয়া'। এরপর অবশ্য তাঁকে থেমে থাকতে হয়নি। অসংখ্য ছোটোগল্প ও উপন্যাস রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। গল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে তিনি নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। রচনার প্রকরণ নিয়ে চলেছে নিরন্তর গবেষণা। ছোটোগল্প মাত্রই তা আকারে ছোটো হবে – এই প্রচলিত ধারণাকে তীব্রভাবে আঘাত করে রচনা করেছিলেন আয়তনে দীর্ঘ 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া'। আবার উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাঁর বিরোধী সত্তার প্রকাশ দেখা যায়। 'গড় শ্রীখণ্ড', 'রাজনগর', 'তসিলার মেয়র', 'চাঁদবেনে' উপন্যাসগুলি আয়তনে যেমন বিশাল, তেমনি অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে ব্যাপ্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম হল – 'মধু সাধুখাঁ', 'মহিষকুড়ার উপকথা', 'বিবিক্তা', 'বিনদনি' ইত্যাদি। শুধুমাত্র রচনার আয়তন নয়, তার বিষয়-বৈচিত্র্য ও ভাষা নিয়েও তাঁর পরীক্ষার অন্ত ছিল না। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও দৃঢ় ভাষা-ছাঁদকে সঙ্গী করেই তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন সাহিত্যের আঙিনায়। বাস্তবের অনুলিখন নয় বাস্তবের সমান্তরালে বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে এক মোহময় জগতের সন্ধান দেয় তাঁর সাহিত্য।

ভিন্নধারার সাহিত্য স্রষ্টার সাহিত্য চিন্তাও ছিল ভিন্নধর্মী। একাধিক প্রবন্ধে ও সাক্ষাৎকারে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্য বিষয়ক বহুমুখী ভাবনার। 'সাহিত্যের ধারণা', 'লিখনে কী ঘটে', 'উপন্যাসের ভাষা', 'সংবিত্তি', 'সাহিত্য ও স্বাধীন চিন্তার দায়িত্ব', 'উপন্যাস সম্বন্ধে', 'জনৈক ইমমরালিস্টের চিঠি', 'ঔপন্যাসিক ও জীবনদর্শন', 'শিল্পের আনন্দ', 'একটি কথন', 'উপন্যাসের গল্প', 'সাহিত্য প্রস্তাব', 'সাহিত্য নিবন্ধ' শীর্ষক বহু প্রবন্ধ এবং 'কেন লিখি', 'নিজের কথা', 'আমার সম্বন্ধে' প্রভৃতি আত্মজীবনীমূলক রচনায় প্রকাশিত মন্তব্য থেকে সাহিত্যিক অমিয়ভূষণের সাহিত্য সম্পর্কিত ভিন্নতর ভাবনার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

২

অমিয়ভূষণের ঠাকুরদা মথুরাপ্রসাদ মহাশয় অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত পাকুড়িয়ায় নীলকর সাহেবদের পরিত্যক্ত একটা বিশাল বাড়ি কিনেছিলেন। অমিয়ভূষণের ছেলেবেলা কেটেছিল এই বাড়িতেই। তাঁর অনেক রচনায় এই বাড়ির প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে। জমিদারী ধাঁচের এই বিশাল বাড়ি অমিয়ভূষণের মনে একটা মোহময় আবেশ তৈরি করেছিল। মল্লার পত্রিকায় দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে[১] তিনি জানান – "আমার পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত ফিউডাল।" সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব 'গড় শ্রীখণ্ড', 'নয়নতারা', 'রাজনগর'-এর মতো বেশ কিছু উপন্যাসে প্রাধান্য পেলেও, তাঁর মূল আকর্ষণ ছিল এর বিপ্রতীপে। কোচবিহারে অবস্থিত অমিয়ভূষণের মামার বাড়ি ছিল একেবারে উলটো প্রকৃতির। অত্যন্ত ছোটো ছিমছাম বাড়ি। ছেলেবেলার অনেকটা সময় তাঁর এই বাড়িতেও কেটেছিল। সেখানেই তিনি পরিচিত হন ব্রাহ্ম সংস্কৃতির সঙ্গে। তাই তিনি নিজেকে 'ফিউডাল' বলার পাশাপাশি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন "আমি অত্যন্ত পিউরিটান, আমাদের সংস্কৃতি হচ্ছে ব্রাহ্ম সংস্কৃতি।" একদিকে পাকুড়িয়ার আভিজাত্যপূর্ণ পরিবেশ ও অন্যদিকে কোচবিহারের রুচিশীল সংস্কৃতিসম্পন্ন মানসিকতা – দু'য়ের সহাবস্থান ঘটেছে তাঁর রচনায়। পরবর্তীকালে চাকুরি সূত্রেও তিনি উত্তরবঙ্গেই থেকে গিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর রচনায় নানাভাবে উঠে এসেছে উত্তরবঙ্গের নানান প্রসঙ্গ। তাই অমিয়ভূষণকে বলতে শোনা যায় –

> "উত্তরবঙ্গের উত্তরখণ্ডে আমার বাস। ...এই টেম্পারেট জোন-এর সুখ-সুবিধা, আরাম উত্তরবঙ্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তৈরি করেছে। ...আসলে আমার বিশ্বাস কলকাতা নামক ঔপনিবেশিক শহর ও কনজুমার গুড্সের আড়তের বাইরে মেদিনীপুর থেকে বীরভূম, পুরুলিয়া থেকে নদীয়া সীমান্ত, উলুবেড়ের উত্তর থেকে সীমান্তে ছড়ানো কলকাতার বাইরের যে-ভূমি যাকে তোমরা গ্রামবাংলা বলো যাকে প্রকৃতপক্ষে হিন্টারল্যাণ্ড ভাবা হয়, যেখানে দলদলে কাদায় পা পুঁতে দাঁড়িয়ে, ভালুক-ভালুক চেহারার কালো-কালো কৃষকেরা ঔপনিবেশিক শহরের অন্ন তৈরি করে, ...সেই ভূমি যা কলকাতার চাইতে অনেক অনেক বড়ো,

> সেখানে বাঙালিদের দশ ভাগের সাত ভাগ থাকে, সেই আমাদের মাতৃভূমি। ...কলকাতাকে বলতে চাইছি বেরিয়ে এসো ইংরেজিআনা থেকে – দ্যাখো এই মাতৃভূমি, ভালোবাসো একে, মরবে না।”[২]

এই মন্তব্য থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না তাঁর আগ্রহের দিকটি। আর এজন্যই হয়তো ‘গড় শ্রীখণ্ড’-এর সান্যাল বাড়ির জমিদারদের থেকে অনেক বেশি জীবন্ত হয়ে উঠেছে সুরতনু, ফতেমা, মাধাই, ইলিয়াস, রামচন্দ্র, ছিদাম-এর মতো চরিত্ররা। একাধিক বিষয় নিয়ে লিখলেও তাঁর অনেক রচনার মধ্যে ‘মহিষকুড়ার উপকথা’, ‘দুখিয়ার কুঠি’, ‘মধু সাধুখাঁ’র মতো উপন্যাস ও দুলারহিনদের উপকথা, তাঁতীবউ, উরুন্ডী, মাকচক প্রমুখ ছোটোগল্পগুলি পাঠক হৃদয়কে অনেক বেশি আকৃষ্ট করতে পেরেছে।

অমিয়ভূষণ সাহিত্য রচনাকে সামাজিক কর্ম হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন। তাঁর মতে সংস্কৃতিগত দিকে থেকে ভারতবর্ষের আলাদা অস্তিত্ব থাকায়, ভারতীয় সাহিত্যও পৃথক অস্তিত্বের দাবি রাখে। সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, ধ্বনি হল সাহিত্যের প্রধান উপাদান, তা ‘সংবিত্তি’ অর্থাৎ সংযোগ নির্মাণ করে। অমিয়ভূষণ ‘Communication’ অর্থে ‘সংবিত্তি’ শব্দটি ব্যবহার করতেন। তাঁর মতে সব মানুষের সংবিত্তি সমান নয়, কিন্তু তাই বলে সব পাঠকের মনের মতো করেও লেখা সম্ভব নয়। অমিয়ভূষণ ‘communication’-এর স্বার্থে উপন্যাসের dialogue-কে সহজ করলেও গদ্যকে সহজ করতে রাজি নন। কারণ, তাঁর মতে – তাঁর মনের মধ্যে যে ভিশনটা আছে, সেটাই তাঁর গল্প। লেখকের ভিশনে সেটা স্বপ্নের মতো। এই ভিশন বা স্বপ্ন বাস্তবের প্যারালাল-এ চলে। সেটা বাস্তব নয়, আবার বাস্তব থেকে খুব দূরবর্তীও নয়। কারণ ভিশনটা বাস্তব হলে, সেটা আর লেখার দরকার থাকে না। আকাশগঙ্গা আর বাস্তবের গঙ্গা এক নয়। ওই আকাশগঙ্গা হল – ‘mythos, ওটা imitation, ওটা Art’।

‘আধুনিক সাহিত্য’-র চরিত্র কেমন হবে সে সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে[৪] তিনি বলেছেন যে, সাহিত্য সৃষ্টি করে একজন বর্তমান মানুষ। সাহিত্যের উপাদান সে সংগ্রহ করে তার বর্তমান জীবন থেকে। আর বর্তমান মানুষ সব সময়ই আধুনিক। এবং বর্তমান জীবনও কখনওই অনাধুনিক নয় সেজন্য সব যুগেই আধুনিক সাহিত্য রচিত হচ্ছে। সাহিত্য প্রধানত মানুষের আবেগ-অনুভব ও উপলব্ধি নিয়ে কাজ করে। ‘একটি কথন’ প্রবন্ধে সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন –

> “প্রথমত তার উৎপত্তি আনকন্‌শাস থেকে। সাহিত্য, যেমন অন্যান্য চারুশিল্প, রূপ সৃষ্টি করে, রসের যোগান দেয়। সাহিত্য, একটি কৌমের অবচেতনে অবগাহন করে জাতিসত্তাকে উদ্ধার করে বর্তমানের মানুষকে তার শিকড় দেয়।”[৫]

সাহিত্য শিল্পীর অজ্ঞান মনের সৃষ্টি। একজন সাহিত্যিককে যেমন বাস্তব মানুষের প্রতিরূপ সাহিত্যে নির্মাণ করতে হয়, তেমনি তার মনকেও চিত্রিত করতে হয় ভাষা দিয়ে। সেইসঙ্গে সাহিত্যিককে শিল্পের নন্দনের দিকটিও খেয়াল রাখতে হয়। অমিয়ভূষণ সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যপাঠের প্রথম শর্ত হিসেবে প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের বলা 'সাত্ত্বিকতা'র কথা বলেছেন।

অমিয়ভূষণের একাধিক রচনায় আমরা 'ট্রমা' শব্দটি ব্যবহার হতে দেখেছি। সমালোচক রবিশঙ্কর বল তাঁর 'ট্রমা সম্পর্কে যেটুকু জানি'[৬] প্রবন্ধে বলেছেন - "ট্রমা। তার এক নাম জীবনানন্দ দাশ। অন্য নাম অমিয়ভূষণ মজুমদার।" পার্থক্য শুধু একটাই অমিয়ভূষণ ট্রমা থেকে মুক্তি পেতে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন আর জীবনানন্দ ঢুকে পড়েন ট্রমার ভিতরে। অমিয়ভূষণ সাহিত্য রচনার অনুপ্রেরণা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে 'সাহিত্য প্রস্তাব' প্রবন্ধে 'ট্রমা'র কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, প্রত্যেক সাহিত্যিক এই ট্রমা থেকে পালাতেই সাহিত্য রচনা করে থাকেন –

> "কি যোগী, কি সাহিত্যিক, তাদের মনে এমন অব্যক্ত বেদনা থাকে যাকে ট্রমা (Trauma) বলা যায়। ট্রমা হচ্ছে ব্যক্তির মনের সেই মানসিক অবস্থা, প্রতিকারহীন যে ব্যথার শেষ নেই, যেমন – নিজের মৃত্যুভয়, প্রিয়জনের মৃত্যু, মানুষমাত্রেরই মৃত্যুভয়... – এগুলি ট্রমা অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। ...কবি ট্রমার হাত থেকে এড়াতে দিবাস্বপ্ন তৈরি করতে করতে এই ট্রমাকেই অতিক্রম করে। আর দিবাস্বপ্ন নির্মাণ সার্থক হলে সে পায় রস।"[৭]

এই ট্রমা থেকে উদ্ধার পেতেই অমিয়ভূষণের 'অধিদৈবত' বা জীবনদেবতা সাহিত্য নির্মাণ করে থাকে। 'অধিদৈবত' সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হল –

> "গোষ্ঠী অবচেতনের অংশভাগ ব্যক্তি-অবচেতন যার স্বরূপ হতে পারে, সেই অধিদৈবত ম্যাজিকে দক্ষ, যা নেই তাকে চোখের সামনে আনতে পারে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিজের অন্তরে নিবিষ্ট করতে পারে এবং ইচ্ছামতো সে দারুণ স্টাইলিস্ট – এককথায়, লেখক হওয়ার সব যোগ্যতা তার এবং লেখাস্বরূপ স্টাইলের ম্যাজিক সেই করে থাকে।"[৮]

লেখক মনে করেন তাঁর এই অধিদৈবত পলায়নপর। পলায়নপরতা বা এস্‌কেপিজ্‌ম্ বহুনিন্দিত হলেও, না পালিয়ে উপায় নেই। এই পালানোই হল ট্রমা থেকে পালানো। ট্রমা থেকে বাঁচতে অধিদৈবত ট্রমাগুলোকে ভেঙেচুরে অধোচেতন অবস্থায় দিবাস্বপ্ন তৈরি করে। আর এই দিবাস্বপ্ন অধিদৈবতকে সেই সুপ্তির কাছে নিয়ে যায়, সেখানে সে ব্রহ্মস্বাদের সহোদর রসস্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে।

৩

অমিয়ভূষণ তাঁর একাধিক প্রবন্ধে উপন্যাসের গঠন, তার ভাষা কেমন হওয়া উচিত এ নিয়ে নানান গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন, যা থেকে উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর ধারণা

সম্পর্কে অনুমান করা যায়। 'উপন্যাস সম্বন্ধে' প্রবন্ধে উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন –

> "উপন্যাস একটা কলা এবং সেহেতু তার সংবেদন থাকবে। নাটক ও মহাকাব্যের জ্ঞাতি হওয়ার ফলে চরিত্র ও ঘটনাবলীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে সে একটি জটিল সংবেদন উপস্থিত করে থাকে। ...তার ভাষা আমাদের প্রত্যহের ভাষার অনুকৃতি, তার বর্ণনার অধিকাংশই প্রত্যহের দেখা বাস্তব। ...জন্ম থেকেই এই দায় আছে উপন্যাসের যে তাকে বাস্তবের বিশ্বাস উৎপাদন করতে হয়। রূপকথা, গল্প, মহাকাব্য, নাটক প্রভৃতির এমন দায় নেই। ...এই বিচারের ফলেই সায়েন্স ফিকশন ফিকশনই বটে, নভেল নয়। উপন্যাস এক রকমের গল্প, কিন্তু আকারে প্রকারে বড় গল্পমাত্রই উপন্যাস নয়।"[৯]

উপন্যাস আখ্যান জাতীয় রচনা হলেও, গল্প বলা যে তার প্রধান উদ্দেশ্য নয় সেই বিষয়টিও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন আর প্রবন্ধে।

> "উপন্যাস, একজন বিলেতি রসিকের কথা মনে এনে বলা যায়, গল্প থাকায় আমরা দুঃখিত, এবং গল্প যে রাখা হয় তা গল্প বলার উদ্দেশ্যে নয়, কোনটা আগে কোনটা পরে ঘটেছে তা ধরিয়ে দিয়ে। উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে একটা থিম যা আমাদের চোখের নীচে ফুটে ওঠে। একটা থিম যা হয়ে ওঠে। অর্থাৎ থিম নামে এক জীবন্ত বিষয়ের ভাব।"[১০]

অমিয়ভূষণ বিষয়ের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর অন্তর্নিহিত মূলভাবকে। এহেন উপন্যাসের মূলভাবকে পাঠক সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজন যথাযথ বিষয়ের। সে সম্পর্কে বলেছেন –

> "আমরা কালচার-উদ্বাস্তু। অন্য কথা : পৃথিবীময় উপন্যাসের উপাদান, প্রতিটি মানুষ উপন্যাসের নায়ক হওয়ার যোগ্যতা রাখে, পৃথিবীকে দেখে দেখেই তো উপন্যাস রচনা করা হয়।"[১১]

অন্যত্র বলেছেন, "উপন্যাস হল কালচার্‌ড ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি যে অধুনা ঘর হারিয়েছে।"[১২] অমিয়ভূষণের মতে উপন্যাস কোনও 'পোর্টম্যাণ্টো' নয় যে তার মধ্যে একই সঙ্গে মায়ের চিঠি, ফুটো মোজা ও ইস্তেহার একসঙ্গে রেখে 'আধুনিকতা' নামক গাড়িতে চড়া যেতে পারে। আবার উপন্যাস কৌতুহল নিবৃত্তির উপাদানও নয়, এমনকি পাঠকের 'অ্যাডোলসেন্ট যৌনপ্রকৃতির' পরিতৃপ্তির উপায়ও নয়।

উপন্যাস আধুনিককালের সৃষ্টি। তাই তার ভাষা কেমন হবে এ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, উপন্যাস কোনও তত্ত্ব নয়। তার ভাষাও তাই পরপর বাক্য সাজানো নয়। আবার উপন্যাস ভাষাচর্চার জায়গাও নয়। তাহলে উপন্যাস ও তার ভাষাকে ঠিক কীভাবে দেখেছেন অমিয়ভূষণ? তারই একটি প্রবন্ধে লুকিয়ে আছে এর উত্তর।

> “আমার ধারণা উপন্যাসকে তার ভাষা থেকে পৃথক করা যায় না। ...ভাষাটা উপন্যাসের সঙ্গে জন্মায়। কিংবা উপন্যাস ভাষা নিয়ে জন্মায়। তাকে বদলানো যায় না। ...উপন্যাসের ভাষাতে তার প্রতিটা শব্দকে হতে হবেই ...ইনেভিটেবল। তার সিচ্যুয়েশনকে যেমন ইনেভিটেবল হতে হবে, ভাষাকেও তাই। ...পাথর, প্রস্তর, নুড়ি – এ সবই সমার্থক। কিন্তু ব্যবহার? ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা যাবে, প্রত্যেকটা যেন আলাদা ব্যাপার, আলাদা ব্যবহার। দুঃখে প্রস্তর হয় না, পাথর হয়ে যায়, নুড়ি ছোঁড়া যায়, কিন্তু নুড়িতে ক্ষুর ঘষে না নাপিত।”[১৩]

শব্দের অব্যর্থ প্রয়োগের প্রতিই তিনি বেশি উৎসাহী ছিলেন। উপন্যাস ও ছোটোগল্প যা বাস্তব জীবনের কথা বলে, মানুষের কথা বলে, তার ভাষা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, সাহিত্যে ‘character’-কে যখন থেকে প্রাধান্য দেওয়া হল, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রাধান্য পেল তার ‘dialogue’, মুখের ভাষা। কিন্তু প্রশ্ন হল, ‘সাহিত্য’ যার প্রধান উদ্দেশ্য পাঠকের সঙ্গে সংযোগ বা ‘সংবিত্তি’ সাধন করা, তখন তার ‘dialogue’ কেমন হবে? তাঁর মতে, ‘এই Dialogue যদি সাঁওতালীয় হয়, তবে does it communicate to one who is Bengalee?’ তিনি মনে করেন – “ডায়ালগ নতুন করে তৈরী করতে হয়। আমি সেই ডায়ালগটাই দেব যাতে মনে হবে যেন একটা লোকাল কালার আছে, কিন্তু কোনো লোকালিটির নয় – সেটা সর্বজনগ্রাহ্য হবে।”[১৪] তাই তাঁর ‘গড় শ্রীখণ্ড’ বা ‘দুখিয়ার কুঠি’র ভাষা লোকভাষা হলেও সেটা কোনও বিশেষ অঞ্চলের নয়।

শুধু উপন্যাসের ভাষা নয়, সামগ্রিকভাবে বাংলা গদ্যের ভাষা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অমিয়ভূষণ তাঁর একটি পত্রে জানিয়েছেন,

> “গদ্যকে আরো শক্তিশালী করে তোলা দরকার। গদ্য নিয়ে পরীক্ষা কম হচ্ছে। ...গদ্যের আসল ব্যাপার ঠিক শব্দটাকে খুঁজে বার করে ঠিক জায়গায় বসানো। কবিতার চাইতে সহজ ব্যাপার নয়। মনে রাখতে হবে খবরের কাগজ ও নানাবিধ ইস্তেহার এবং আমাদের মুখের ভাষায় গদ্য থাকে না।”[১৫]

৪

অমিয়ভূষণের সাহিত্যচিন্তার প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে ব্যক্তি অমিয়ভূষণ, তাঁর মানসিকতা যেন পাঠক-সমালোচকের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সাহিত্য রচনা সম্পর্কে তাঁর মতামত যতটা স্পষ্ট, সমকালের সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তাঁর মানসিকতা ততটাই বিদ্রুপাত্মক। তাঁর দেওয়া একটি সাক্ষাৎকার[১৬] থেকে জানা যায়, তিনি সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাউকেই সেভাবে জায়গা দিতে চাননি। সমকালীনদের মধ্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সম্পর্কে তাই তিনি নির্দ্বিধায় বলেন – “আমার ভালো লাগে না।” সুনীলের ‘কাকাবাবু’ ও শীর্ষেন্দুর ‘চোর, ভূত’ বিষয়ক রচনা কিছুটা পড়লেও তিনি আর কোনও রচনা পড়েন না। “না, আমার সময় হয়নি। স্রেফ সময়

হয়নি” জাতীয় তাচ্ছিল্যসূচক উক্তির মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে সমকালীনদের প্রতি তাঁর মনোভাব। এই প্রসঙ্গে তিনি একাধিক পাশ্চাত্য সাহিত্যিকের কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন, টমাস হার্ডি ডিকেন্স থ্যাকারে চসার গোগোল কিংবা টলস্টয়-এর রচনা পড়েছেন বলেই তাঁর আর বাংলায় রচিত সাহিত্য পড়ার প্রয়োজন নেই। এইখানে একটা কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ নিশ্চয়ই খারাপ নয়, কিন্তু তিনি বারংবার যেভাবে বাংলার অপামর সাহিত্যসৃষ্টিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাতে তাঁর উন্নাসিকতাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

সূত্রনির্দেশ :

১। অমিয়ভূষণ মজুমদারের শেষ সাক্ষাৎকার, খোঁজ, আশ্বিন, ১৪০৮, পৃ. ২১।
২। অমিয়ভূষণ মজুমদার, ২০০২, ‘নিজের কথা’, অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, খণ্ড ১, পৃ.১৮।
৩। বিভিন্ন সময়ে দেওয়া অমিয়ভূষণ মজুমদারের চারটি সাক্ষাৎকার, বিজ্ঞাপন পর্ব/১০, অক্টোবর ১৯৮২-৮৩, পৃ. ২২-২৮।
৪। অমিয়ভূষণ মজুমদারের শেষ সাক্ষাৎকার, খোঁজ, আশ্বিন, ১৪০৮, পৃ. ১৯-২৫।
৫। অমিয়ভূষণ মজুমদার, ২০১০, ‘একটি কথন’, অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, খণ্ড ৯, পৃ. ৪৯৪।
৬। রবিশংকর বল, ‘ট্রমা সম্পরকে যেটুকু জানি’, দিবারাত্রির কাব্য পত্রিকা, বর্ষ ৯, ২০০১, পৃ. ৬৮-৬৯।
৭। অমিয়ভূষণ মজুমদার, ২০১২, ‘সাহিত্য প্রস্তাব’, অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, খণ্ড ১০, পৃ. ৩৯১।
৮। অমিয়ভূষণ মজুমদার, ২০০৫, ‘কেন লিখি’, অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, খণ্ড ৫, পৃ. ১৪।
৯। অমিয়ভূষণ মজুমদার, ২০০৭, ‘উপন্যাস সম্বন্ধে’, অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৩০।
১০। অমিয়ভূষণ মজুমদার, ২০০৮, ‘জনৈক ইমমরালিস্টের চিঠি-৩’, অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, খণ্ড ৬, পৃ. ৫৩৩।
১১। অমিয়ভূষণ মজুমদার, ২০০৭, ‘উপন্যাস সম্বন্ধে’, অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৩৫।
১২। অমিয়ভূষণ মজুমদার, ২০১০, ‘উপন্যাসের গল্প’, অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, খণ্ড ৯, পৃ. ৪৯৬।
১৩। অমিয়ভূষণ মজুমদার, ২০০৯, ‘উপন্যাসের ভাষা’, অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, খণ্ড ৭, পৃ. ৫১২।
১৪। বিভিন্ন সময়ে দেওয়া অমিয়ভূষণ মজুমদারের চারটি সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।
১৫। তপনকিরণকে অমিয়ভূষণের লেখা পত্র, ঐক্য পত্রিকা, ২০০৪, পৃ. ৯৯।
১৬। অমিয়ভূষণ মজুমদারের শেষ সাক্ষাৎকার, খোঁজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩।

ত্রিপুরায় হজাগিরি নৃত্য উৎসবের ইতিকথা

জীবনকৃষ্ণ পাত্র
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
বি.বি.এম.কলেজ, আগরতলা

সারাংশ: পার্বতী ত্রিপুরা রাজ্যের উনিশটি উপজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে রিয়াং হল দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতিগোষ্ঠী। রিয়াংদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যবাহী নৃত্য হল হজাগিরি বা হডাইগিরি। কোজাগরী (লক্ষ্মীপূজা) শব্দ থেকে হজাগিরি শব্দটি এসেছে বলে ধারণা করা হয়। রিয়াংরা স্মরণাতীত কাল থেকে হডাইগিরি নৃত্যকে লালন করে আসছেন। ত্রিপুরা সরকার 1993 সালে হজাগিরি নৃত্যকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে প্রতিবছর পর্যায়ক্রমিকভাবে রিয়াং অধ্যুষিত অঞ্চলে এই নৃত্য উৎসবের আয়োজন করে। এই নৃত্য বর্তমানে আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি লাভ করে শাস্ত্রীয় নৃত্যের তালিকায় স্থান পেতে চলেছে। প্রয়াত কবি অনিল সরকারের 'হজাগিরি' নামের কবিতায় এবং কবি স্নেহময় রায়চৌধুরীর 'হাইখে-ন' আনি ফায়সিং নয়িই তম নাবা' (এভাবেই তাকিয়ে থেকো আমার দিকে) কবিতায় হজাগিরি নৃত্যের সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে হজাগিরি নৃত্য উৎসবের ঐতিহ্য ও সাহিত্যপ্রয়াসের বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে।
সূচক শব্দ: রিয়াং, হজাগিরি, হডাইগিরি, আন্তর্জাতিক, শাস্ত্রীয় নৃত্য, ঐতিহ্য, সাহিত্যপ্রয়াস।

মূল আলোচনা:

পার্বতী ত্রিপরা রাজ্যের উনিশটি উপজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে রিয়াং হল দ্বিতীয় বৃহত্তম উপ-জাতিগোষ্ঠী। রিয়াংরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ত্রিপুরীদের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁদের ভাষা ত্রিপুরী ভাষা থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু দীর্ঘদিনের সংস্পর্শের কারণে ত্রিপুরী ভাষাগোষ্ঠীর দ্বারা রিয়াং ভাষা প্রভাবিত হয়েছে। রিয়াংরা মূলত মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর, তাঁরা এক সময় লুসাই দেশ (বর্তমান মিজোরাম)-এ বসবাস করতেন। তারপর তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যের একপ্রান্তে স্থায়ীভাবে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তাঁদের রাজ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের মাইনি পর্বতসহ গোমতী নদীর উজান এলাকা। তাঁদের রাজ্যের 'ফা' উপাধিধারীরা সমাজপতির ভূমিকা পালন করতেন। রিয়াংরা নিজেদের রাজা বা সমাজপতির অধীনে অত্যন্ত শৃঙ্খলায় জুম নির্ভর জীবন-যাপন ও তাঁদের বহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে লালন করে অত্যন্ত সুখে দিনাতিপাত করতেন। রিয়াংদের রাজারা 'রিয়াং কাসকাউ' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের অনুশাসনে রিয়াং সমাজ চালিত

হতো। রিয়াংদের 'ব্রু' বলা হয় এবং তাঁরা নিজেদের 'ব্রু' হিসেবে প্রতিপন্ন করেন। এর কারণ অনুসন্ধান করে সত্য উদঘাটন করেছেন শ্রদ্ধেয় গবেষক---

"In the Reang dialect, the term 'Brue' means 'man'. It is significant to note that many tribal communities use almost analogues appellations meaning 'man'. The Tipra call themselves 'Barak' meaning 'man', the Mikirs 'Arleng', the Garo, 'Achikmandi', the Lusai Mizo-all meaning 'man'. (১)

'ব্রু'-রা হিন্দু-সনাতন ধর্মের সংস্পর্শে আসার পর রিয়াং হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। রিয়াংরা ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসসূত্রে স্থায়ী হয়ে গেলেন। মাইনি পাহাড়ের উর্বর মাটির জুমের ফসল, বন্য পশু-পাখির মাংস, বনের সবুজ শাক-সব্জি, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ রিয়াংদের আকৃষ্ট করেছিল। তাঁরা খুবই স্বাধীনচেতা ছিলেন, কারণ---ত্রিপুরা রাজ্যের রাজাদের সাথে প্রাথমিকভাবে তাঁরা সম্পর্ক স্থাপন করেননি। পরবর্তী কালে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজা ধর্ম মাণিক্যের সাথে রিয়াংদের একটি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে মহারাজা ধর্ম মাণিক্য বংশানুক্রমে নির্ভীক যোদ্ধাজাতি রিয়াংদের ত্রিপুরা রাজ্যের অনুকূলে আনেন এবং তাঁদের মধ্যে নির্বাচিত বীর-যোদ্ধাদের রাজার সৈন্যবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেন। মহারাজা ধর্ম মাণিক্য ১২টি দফায় বিভক্ত রিয়াং জনগোষ্ঠীর সমাজপতি 'রিয়াং কাসকাউ'-দের 'রায়' উপাধি প্রদান করেন। 'রায়' উপাধিধারী ব্যক্তির মৃত্যুর পর নতুন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হবে, যিনি পরবর্তীকালে 'রায়' উপাধি গ্রহণ করবেন। একই সময় দুই ব্যক্তি 'রায়' উপাধি গ্রহণ করতে পারবেন না। এই নিয়ম দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজাগণ মান্যতা দিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের সময় এই নিয়ম লংঘিত হওয়ার কারণে রিয়াংদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ ১৯৪২-৪৩ সালে মহারাজাকে রিয়াং বিদ্রোহের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর রিয়াং 'রায়' দেবসিং-এর জীবিত অবস্থায় খগেন্দ্র রিয়াংকে 'রায়' হিসেবে নিযুক্ত করেন, ফলে একই সময়ে দুই 'রায়' এবং দেবসিং-এর অসম্মান রিয়াংরা মানতে পারেন নি। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিস্তৃতি, সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পেছনে রিয়াংদের অবদান তুলনাহীন। গবেষক যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে---

> "প্রথম ধর্মমাণিক্য থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্য পর্যন্ত প্রায় একশত বৎসর কাল সময়কে ত্রিপুরা রাষ্ট্রের উত্থানের যুগ বলে ইতিহাসে চিহ্নিত রয়েছে। ত্রিপুরা রাষ্ট্রের সীমা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্যের রাজত্বকালে। ত্রিপুরা রাষ্ট্রের এই সীমা বিস্তারে রণনিপুণ রিয়াং সেনাপতিদেরই বিশেষ অবদান রয়েছে বলে ত্রিপুরার ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।"(২)

আমরা জেনেছি মহারাজা ধন্য মাণিক্যের দুই রিয়াং সেনাপতি রায় কাচাক ও রায় কসম-এর শৌর্যবলে গৌড়ের নবাব হোসেন শাহের সৈন্যবাহিনী পর্যুদস্ত হয়েছিল। ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের বিস্তার সমতল বাংলার বৃহত্তর অংশ পর্যন্ত ঘটেছিল এবং দক্ষিণের চট্টগ্রামও ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে। মহারাজা দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্যের অধীনে রিয়াং বীরযোদ্ধা কালা খাঁ বা কালা নাজীরের বীরত্ব স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে শ্রীহট্ট ও খাসিয়া রাজ্যকে অনায়াসে আনতে পেরে ছিলেন। রিয়াংদের শৌর্য-বীর্য ও তেজস্বিতা যেমন ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁদের নৃত্য-গীতময় জাতীয় চরিত্রও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কারণ, তাঁদের হজাগিরি নৃত্য বর্তমানে বিশ্বের দরবারে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার আসন গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরা রাজ্য বিচিত্র সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে ভারত জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে তার সাংস্‌কৃকতিক প্রয়াসগুলিকে জাতীয় স্তরে পরিবেশন করে। সেই প্রয়াসগুলির অন্যতম হল হজাগিরি নৃত্য। ত্রিপুরা সরকার এই নৃত্যের ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান ও স্বীকৃতি প্রদান স্বরূপ ১৯৯৩ সাল থেকে হজাগিরি নৃত্যকে উৎসবের মর্যাদা দিয়ে প্রতিবছর রিয়াং অধ্যুষিত স্থানে ২-৩ দিনের জন্য হজাগিরি নৃত্য উৎসবের আয়োজন করে চলছে। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের বিলোনীয়া, অমরপুর, করবুক, লংতরাই ভ্যালি, গণ্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর, শান্তির বাজার প্রভৃতি অঞ্চলে রিয়াং গোষ্ঠীর মানুষেরা বসবাস করেন। সেই সূত্রে প্রতি বছর হজাগিরি নৃত্য উৎসবের জন্য এই সমস্ত অঞ্চলের কোনো না কোনো স্থানকে নির্বাচন করা হয়। ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং 'ব্রু সোসিও কালচারাল অর্গানাইজেশন'-এর সহযোগিতা ও ব্যবস্থাপনায় হজাগিরি উৎসব ২০১৯ সালে ২৭-তম বর্ষে পদার্পণ করে। স্থানীয় এডিসি প্রশাসন ও একনিষ্ঠভাবে এই উৎসবকে ফলপ্রসূ করার লক্ষে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

রিয়াং উপজাতিগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনে আমরা বিভিন্ন পূজা ও উৎসবকে লক্ষ করি। তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে গ্রামীণ জীবনে তাঁদের দেবদেবীর উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করেন। তাঁদের প্রত্যেক দেবদেবীর এক একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হলেন মতাইকতর। সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী রিয়াংরা বিশ্বাস করেন নানা দৈবশক্তি রয়েছে তাঁদের জীবনযাপন নিয়ন্ত্রণে এবং প্রকৃতির সমস্ত কিছুর মধ্যে। নদী-পাহাড়-বৃক্ষ-ফসল-জল প্রভৃতির উপর প্রভাব বিস্তারকারী দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করলে তাঁরা সুন্দর ও সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন। তাই তাঁরা তাঁদের পুরোহিত উক্‌চাই Aukchai)-র মাধ্যমে পূজা নিবেদন করে দেবদেবীদের সন্তুষ্ট করেন। তাঁরা ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মতো গড়িয়া পূজা, কেরপূজা, তুইবুমা (জলদেবী) পূজা করেন। এছাড়া এই সম্প্রদায় শ্রাবণমাসে জুমের পাকাধান (বেতি) সংগ্রহের জন্য 'মাইখ্‌লুঙমঃ' পূজার আয়োজন করে। রিয়াং জনজাতির ঐতিহ্যবাহী নৃত্য 'হডাইগিরিনৃত্য' বা হজাগিরি নৃত্যের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে এই মাইখ্‌লুঙমঃ পূজা ও আনন্দোৎসব থেকে।

প্রাচীনকালে 'ব্রু' বা রিয়াং জনজাতির সমাজপতি বা কাসকাউ রাজাগণ এই পূজার আয়োজন করতেন। কাসকাউ রাজার অধীনে বহু পরিবার অংশ গ্রহণ করতো এই পূজায়। পূজায় মোরগ, পায়রা ও শূকর বলি দিয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হতো। নানা রকমের খাদ্যের আয়োজন করে রাজা সকলকে খাওয়াতেন। কাসকাউ রাজা এবং পুরোহিত 'অউকচাই' চালের রসের মদ 'চঃবতুককলা' প্রথমে পান করেন। এরপর অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠগণ, তারপর যুবক যুবতীগণ 'চঃবতুককলা' পান করে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতেন। যুবক-যুবতীগণ মদিরা আস্বাদনের অনুভূতিতে ধীরে ধীরে নৃত্যের ছন্দে নিজেদেরকে মেলে ধরতে থাকে। নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গি বা কৌশল প্রদর্শন করতে করতে 'চঃবতুককলা' (মদ্য) কলসকে ঘিরে নাচতে থাকে। মাথায় তারা মদের বোতলের উপর জ্বলন্ত কুপিকে রেখে ভারসাম্য সৃষ্টি করে নাচতে নাচতে 'চঃবতুককলা' কলসের উপর দাঁড়িয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। কখনো কখনো এই ভারসাম্যকে আরও সুদৃঢ় করতে হাতে থালা নিয়ে থাকে, সাথে সাথে বাদকরা খাম (ঢোল) সুমু (বাঁশি) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে থাকে। এই নৃত্যকে 'ব্রু' রা 'হডাইগ্রি' নৃত্য বলতেন---পরবর্তীকালে এর নাম হয়েছে হজাগিরি নৃত্য। সময়ের সাথে সাথে এই হডাইগ্রি বা হজাগিরি নৃত্যের অনেক সংস্কার সাধন হয়েছে। বর্তমানে হজাগিরি নৃত্যে অংশগ্রহণ করে কেবল যুবতীরাই। পুরুষরা তাদের নাচের জন্য কেবল সহযোগী ভূমিকা অর্থাৎ নাচের উপকরণ নৃত্যস্থানে সরবরাহকারীর ভূমিকা পালন করেন।

হডাইগিরি নৃত্যকে বলা হয় Balance Dance' বা ভারসাম্যের নৃত্য। এই নৃত্য মাইখ্লুঙমঃ পূজার দেবদেবীকে উৎসর্গ করা হয়। রিয়াংরা আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠানে হডাইগিরি নৃত্য পরিবেশন করেন। রিয়াংরা নৃত্যপটীয়সী, নৃত্যের ছন্দ তাঁদের জীবনচর্যার সাথে যুক্ত হয়ে আছে, তাই তাঁরা দুঃখের সময়ও বিশেষ করে প্রিয়জনের মৃত্যুর পর নৃত্য পরিবেশন করেন। হডাইগিরি মূলত ফসল সংরক্ষণের উৎসবের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে সম্ভবত বাংলা 'কোজাগরী' শব্দের সাদৃশ্যে হয়েছে হজাগিরি। গবেষক বলেছেন---

> ''হজাগিরি বাঙলার কোজাগরী থেকে এসেছে। লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষ্যে হজাগিরি নৃত্য পরিবেশিত হয়।...হজাগিরি নৃত্যের পরিবেশনা যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা এর অনবদ্য ছন্দময় নৃত্যশৈলী, রূপশৈলী ও গরিমায় মুগ্ধ হবেন। আর যাঁদের নৃত্যরসে একটু আধটু প্রতীতি জন্মেছে তাঁরা এই নৃত্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ক্লাসিক অথবা বিদেশী উন্নতমানের 'ট্যুইস্ট' নাচের রূপ প্রত্যক্ষ করবেন। হজাগিরি নৃত্যের ছন্দমাধুর্য হিসাবে যা উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে কোমর থেকে পা পর্যন্ত শরীরের অংশটিকে আন্দোলিত করে নৃত্যসহকারে মৃদু পদসঞ্চালন-মুদ্রা।'' (৩)

হজাগিরি নৃত্যের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণগুলি হল---কলসী, ছোট্ট তেলের লম্ফ বা কুপি, বোতল, রুমাল বা ফুল, বাঁশের তৈরি থালার মতো বড় ডালা, ধাতব থালা, অলঙ্কার এবং রিয়া-পাছড়াযুক্ত পরিচ্ছদ।

হজাগিরি নৃত্যের সময় নৃত্য শিল্পীরা দুই হাতে দুটি করে ধাতব থালা নিয়ে উপরে-নীচে করে ঘোরাতে থাকে, তাদের মাথার উপর বসানো থাকে বোতল এবং বোতলের ওপর বসানো থাকে ছোট জ্বলন্ত কুপি। তারা কলসীর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে কলসীর ওপর উঠে এবং ঘুরতে ঘুরতে নাচতে শুরু করে। কখনো কখনো বাম হাতের তর্জনীর উপর বাঁশের তৈরি বড় ডালা রেখে ডান হাত দিয়ে ঘোরাতে থাকে। এদের মধ্যে কেউ কেউ শরীরকে পেছনের দিকে বাঁকিয়ে রুমাল বা ফুল মুখের সাহায্যে তুলে নেয়। নৃত্যশিল্পীদের এই নৃত্য ভঙ্গিমা দূর থেকে যেন মনে হয় সাপের দোদুল্যমানতা। হজাগিরি নৃত্যের বিভিন্ন মুদ্রায় 'ব্রু'-দের আর্থ সামাজিক অবস্থাকে উপস্থাপিত করা হয়। যেমন জুম ক্ষেতে শস্যবীজ বপন, আগাছা নিড়ানো, ধানকাটা, কাটা ধানগাছের আঁটি বাঁধা, পশুশিকার, মাছ শিকার, সবুজ শাক-সব্জি সংগ্রহ, দেবদেবীদের বলি নিবেদন প্রভৃতি কার্যকলাপ উপভোগ করার মতো। হজাগিরি নৃত্যের বিশেষ দিক হল কোমরের উপর অংশকে অকম্পিত রেখে নীচের অংশকে অপূর্ব হিল্লোলে সঞ্চালন করা এবং ছন্দের তালে তালে প্রকম্পিত করা। এই কারণে হজাগিরি নৃত্যকে 'ভারসাম্য নৃত্য' বলা হয়ে থাকে। এই নাচের গান আগের থেকে তৈরি করা থাকলেও অনেক সময় তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করে পরিবেশন করা হয়। বিশিষ্ট নৃত্যগবেষক হজাগিরি নৃত্য সম্পর্কে জানাচ্ছেন---

> "গানের সুরের মধ্যে একটা আদিম বন্যভাব আছে এবং একটা দুলানী ছন্দ পাওয়া যায়। রিয়াং মেয়েদের গয়না ত্রিপুরার অন্য উপজাতি মেয়েদের থেকে একটু অন্য ধরনের, তারা নৃত্যের পোশাক ছাড়া সব সময় এই রকম গয়নায় সজ্জিত হয়ে থাকে।
>
> "এই রিয়াং নৃত্য সম্পর্কে অনেক শিল্প-সচেতন মানুষ খুব আশাবাদী। কারণ, লোকনৃত্যগুলি শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রথম রূপ। ধাপে ধাপে রূপান্তরিত হয়ে শাস্ত্রীয় নৃত্যরূপ ধারণ করেছে লোকনৃত্যগুলি। তাই এই রিয়াংদের হজাগিরি নৃত্য দেখে অনেক বিশেষজ্ঞ কলারশিপ মন্তব্য করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদী হয়েছেন। তাঁরা বলেন, মণিপুরী নাচ এই উত্তর-পূর্ব ভারতের নৃত্য। এটি আগে লোকনৃত্য হিসেবে চিহ্নিত ছিল। বর্তমানে শাস্ত্রীয় নৃত্যের রূপ নিয়েছে এই লোকনৃত্য।" (৪)

ভবিষ্যতে হজাগিরি নৃত্য তার লোকনৃত্যরূপকে অতিক্রম করে শাস্ত্রীয় নৃত্যের পর্যায়ে পৌঁছোবে---এ বিষয়ে নৃত্য গবেষকগণ আশাবাদী আছেন।

সুপ্রাচীন এই ঐতিহ্যবাহী হজাগিরি নৃত্য ভারত সরকারের রেকর্ডভুক্ত হয় গত শতকের পঞ্চাশের দশকের প্রথমের দিকে। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯৫২ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম ব্লক জিরানিয়ায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে এসেছিলেন। তাঁর সাথে এসেছিলেন তাঁর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা নেহরু। এমনই এক মহৎ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করার জন্য যে সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয় তার মধ্যে অন্যতম একটি উপস্থাপনা ছিল হজাগিরি নৃত্য। সে সময় এই নৃত্যকে 'মহিলা নৃত্য' বলা হতো মহিলাদের অংশ গ্রহণের কারণে। হজাগিরি নৃত্যপরিবেশনের জন্য এসেছিলেন অমরপুর মহকুমা থেকে বাংকারাই ট্রাইবেল মডেল কলোনির রিয়াং সর্দার বাংকারাই চৌধুরীর দল। সকন্যা প্রধানমন্ত্রী নেহরু রিয়াংদের পরিচ্ছদ, অলংকার, নৃত্যশৈলী দেখে আনন্দিত ও অভিভূত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই নৃত্যদল ভারত সরকারের আমন্ত্রণে বহুবার দিল্লিতে গিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে। ওই সময় হজাগিরি নৃত্য ভারত সরকারের রেকর্ডে লিপিবদ্ধ হয়। হজাগিরির আর একটি দল পরবর্তীকালে খুবই সুনাম অর্জন করেছিল রাইমা-সরমা এলাকার রাজকুমার রিয়াং-এর তত্ত্বাবধানে। এই দলটিও ৯-১০ বার দিল্লিতে নৃত্য পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিল। এই দলের পরবর্তী কাণ্ডারি হন রাজকুমার রিয়াং-এর পুত্র শ্যামাপ্রসাদ রিয়াং। তিনি এবং তাঁর দল এই নৃত্য পরিবেশনের জন্য বহু মেডেল পেয়েছিলেন এমনকি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সাথে গ্রুপ ফটো তুলে ছিলেন। বহু মেডেল প্রাপ্তির জন্য অনেকে হজাগিরি নৃত্যকে 'মেডল নৃত্য' নামে নামাঙ্কিত করেছিলেন। হজাগিরি নৃত্যের আর একটি দল পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সময়ে দিল্লিতে পাড়ি দিয়েছিল করবুকের পাঞ্জিহাম রিয়াং-এর নেতৃত্বে (করবুকে একটি উচ্চতর বিদ্যালয় আছে এই পাঞ্জিহামের নামে)। দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে এই নৃত্যদল ত্রিপুরা থেকে প্রতিনিধিত্ব করে। নৃত্যানুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি রিয়াংদের কালো রঙের পাছড়া পরে আবেগাপ্লুতা হয়ে নৃত্যশিল্পীদের সাথে অংশ নিয়েছিলেন। ফলে হজাগিরি নৃত্য ক্রমশ জাতীয় স্তরে বিপুল জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। এর পরবর্তীকালে শান্তির বাজার মহকুমার সত্যরাম রিয়াং বেশ কয়েক বছর তাঁর হজাগিরি নৃত্য দলকে নিয়ে গিয়েছিলেন দিল্লিতে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে। টেবলু প্রতিযোগিতায় হজাগিরি নৃত্যদল এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে বেশ কয়েকবার প্রথম স্থান দখল করে। তাঁরই নেতৃত্বে হজাগিরি নৃত্যদল ১৯৮৮ সালে 'ভারত উৎসব' উপলক্ষ্যে রাশিয়ায় গিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে সবার নজর কেড়ে নেয়। সুলেখক পঞ্চরাম রিয়াং তাঁর সম্পর্কে জানাচ্ছেন---

> "...১৯৮৮ সালে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত 'ভারত উৎসব'-এ রাজ্যের বিখ্যাত 'হডাইগ্রি' নৃত্য পরিবেশন করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁদের দলের ঢোল বাদক শ্রী বিজয় রিয়াং (ইসামফা) একটানা বাহাত্তর ঘণ্টা ঢোল বাজিয়ে গিনেস রেকর্ডে স্থান করে নেন। রাজ্যের বিখ্যাত

> ঐতিহ্যবাহী ‘ব্রু’ নৃত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ভারত সরকার শ্রী সত্যরাম রিয়াংকে ‘সঙ্গীত নাটক একাডেমি-২০০৪’ পুরস্কারে সম্মানিত করে।...পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন তথা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও ‘হজাগিরি নৃত্যগুরু’ সম্মান প্রদান করা হয়। এছাড়া ‘ত্রিপুরা-রত্ন’ ও ‘অদ্বৈত মল্লবর্মণ---২০০৮’ পুরস্কারে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।’’ (৫)

প্রাচীন হডাইগ্রি নৃত্যের তাল, ভঙ্গি, মুদ্রা, লয়, ছন্দকে সত্যরাম রিয়াং যথার্থ শিল্প-সম্মতভাবে বিশ্বের দরবারে পরিবেশনের জন্য খুবই পরিশ্রম ও সাধনা করে ছিলেন। তিনি স্ব-উদ্যোগে ২০০5 সালে নিজের বাসভূমির কাছে ‘হজাগিরি অ্যাকাডেমি’ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হেলেনজয় রিয়াং এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়ে আরও উন্নত করার চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা এসে এই প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নেন। আমেরিকা, আয়ারল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি স্থানের বিজ্ঞব্যক্তি ও গবেষকগণ এই প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক তথ্য নিয়ে গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। এর পরবর্তীকালে হজাগিরি নৃত্যকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিলেন অমরপুর মহকুমা লগথুং রিয়াং ও কুবেজয় রিয়াং। কুবেজয় রিয়াং হজাগিরি নৃত্যদল নিয়ে গিয়েছিলেন আমেরিকার বিভিন্ন শহরে।

হডাইগ্রি/হডাইগিরি নৃত্য বা হজাগিরি নৃত্য উত্তরপূর্ব ভারতবর্ষের ছোট্ট পার্বতী রাজ্যের পার্বত্য এলাকা থেকে ক্রমশ রাজ্য পেরিয়ে, রাষ্ট্র পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আত্মপ্রকাশ করে ত্রিপুরা রাজ্যকে সীমাহীন সম্মান দান করেছে। এই সম্মান প্রাপ্তির পেছনে বহু শিল্পীর শ্রম-সাধনা-ত্যাগের বিষয়টি জড়িয়ে আছে। গত শতকের নব্বইর দশকের দিকে গড়ে ওঠা কাঞ্চনপুরের গাছিরাম পাড়ায় হজাগিরি নৃত্য দলের সুনিপুণ কোরিওগ্রাফিতে হজাগিরি নৃত্য একটি নিজস্ব ঘরানা পায়। এই নৃত্যদলের প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন শ্রীমতী অনিতা রিয়াং ও শ্রীমতী ববিতা রিয়াং। তাঁদেরই ব্যবস্থাপনায় হজাগিরি নৃত্য দল জাপানে আমন্ত্রিত হয়ে সেখানকার দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। এ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন নৃত্যদল সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক ইতিহাসের কথা বলেছি, কিন্তু হজাগিরি নৃত্যদল হিসেবে একটি সুগঠিত রূপ পায় ‘হজাগিরি সাংস্কৃতিক দল’ নামে এই কাঞ্চনপুরের গাছিরাম পাড়ায়। তার সূচনালগ্ন কিন্তু ১৯৮৬ সাল। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন কর্ণমণি রিয়াং ও মণীন্দ্র রিয়াং প্রমুখ। ১৯৯3 সালে ত্রিপুরা রাজ্যের তৎকালীন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী অনিল সরকার হজাগিরি নৃত্যের সুমহান ঐতিহ্য জনমনে প্রসারিত করার লক্ষে সরকারিভাবে হজাগিরি নৃত্য উৎসবের আয়োজন করেন। প্রথম সরকারিভাবে হজাগিরি নৃত্য উৎসবের আয়োজন করা হয় কাঞ্চনপুরের গাছিরাম পাড়ায়। তারপর প্রতিবছর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেখানে

যেখানে রিয়াং জনগোষ্ঠীর মানুষজন বসবাস করেন সেই সমস্ত স্থানে পর্যায়ক্রমে হজাগিরি নৃত্য উৎসবের আয়োজন করা হয়। কাঞ্চনপুর, অমরপুর, গণ্ডাছড়া, লংতরাইভ্যালি প্রভৃতি স্থানে হজাগিরি উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে এবং এই অনুষ্ঠান ২০১৯ সালে ২৭তম বর্ষে পদার্পণ করেছে।

হজাগিরি নৃত্য কেবল প্রতিবছর দিল্লির প্রজাতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠানে টেবলু পাঠিয়ে কিম্বা রিয়াং অধ্যুষিত স্থানে সরকারিভাবে উৎসব উদ্‌যাপনের মাধ্যমেই কি সীমাবদ্ধ? আসলে তা নয়। ত্রিপুরার বিচিত্র সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে হজাগিরি নৃত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে বলেই রাজ্যের বিভিন্নস্থানে যেকোনো উৎসব ও অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে হজাগিরি নৃত্যকে অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। রাজ্যে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপস্থাপনায় হজাগিরি নৃত্য যেমন স্থান পায়, তেমনি এ রাজ্যে বাইরের থেকে কোনও অতিথি এলে তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় সেখানে হজাগিরি নৃত্যও পরিবেশিত হয়। সুতরাং ত্রিপুরাবাসীর মন-মনন ও চেতনায় আছে হজাগিরি। হজাগিরি নৃত্যের দোলায়, তার ছন্দময় শৈলীতে, তার তাল-লয়ের যুগলবন্দীতে যে শিল্পিতরূপের উদ্ভাসন ঘটে, তা সত্যিই অবর্ণনীয় অনুভূতি দান করে। তাই কবি-মন্ত্রী এবং যিনি সরকারি ভাবে হজাগিরি নৃত্যকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসব হিসেবে পালনের জন্য ত্রিপুরাবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে রইলেন, তিনি লিখলেন ‘হজাগিরি’ নামের একটি কবিতা। এই কবিতাও ছন্দের দোলায় হিল্লোলিত, হজাগিরি নৃত্যশিল্পী যুবতী যেমন সুললিত তরঙ্গে নিজের শরীরকে শিল্পময় করে তোলেন, ঠিক তেমনি। কবিতাটি এখানে উল্লেখ করে সাহিত্য-রসিকদের তৃপ্তিদানের চেষ্টা করছি---

“রিয়াঙের/মেয়েগুলি/চঞ্চল পাখিলো।
ঢেউ তোলা/বনমালা/চঞ্চল আঁখিলো।।
ছন্দেতে/দোলে তারা/ নন্দিত রাগিণী।
কালো মেঘে/ ডোরাকাটা/ কোন্ বনে বাঘিনী।।
দোল দোল/ দে দোল/ মেয়েগুলি লতিকা।
রিয়াঙের/ হজাগিরি/ কবিতার কণিকা।।
হজাগিরি/ নাচ বুঝি/ কোজাগরি বাতিলো।
ঢোল বাজে/ বাঁশি বাজে/ ফাটে বুকের ছাতিলো।।
কলমীর/ কানাভরা/ কমনীয় পদ্ম।
হাতে থালা/ গলে মালা/ নাচে অনবদ্য।।” (৬)

উক্ত কবিতায় কবির কল্পনা, অনুভূতি ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী অসাধারণ কাব্যসুষমা লাভ করেছে। এই কবিতা পাঠের সাথে সাথে যেন চোখের সামনে হজাগিরি নৃত্য পরিবেশিত হচ্ছে বলে মনে হয়। কবিতাটি যেন পটে আঁকা একটি হজাগিরি নৃত্যের ছবি।

হজাগিরি নৃত্যের লাস্যময়তা উদ্ভাসিত হয় তরুণী-শিল্পীর দেহ বিভঙ্গের ছন্দ সুষমায়। কবি স্নেহময় রায় চৌধুরী তাঁর নায়িকা খাপাঙতির আন্দোলিত দেহের মধ্যে সেই হিল্লোলিত উচ্ছ্বাসকে বিপ্লবের মন্ত্রগুঞ্জরণে বিজয় পতাকা হিসেবে দেখেছেন। অসাধারণ কাব্যপ্রত্যয়ে কবি তাঁর (অনুভূতি) 'হাইখে-ন' আনি ফায়সিং নায়ৌই তম নাবা' (এভাবেই তাকিয়ে থেকো আমার দিকে) কবিতায় প্রকাশ করেছেন। কবিতার কয়েকটি পংক্তি এখানে উল্লেখ করি---

''রিসা কৌচাক সরৌই জেফুরু হিম' নৌম চবানি লাম'
তৌংফৌলাই কা আনি সাক
থাপা কৌতৌংন' সলৌই,
বৌচাং কলৌই রিগৌনই কবনরৌয়
জেফুর মৌসা নৌঙ হাথাইনি সাকা
মকল' নঙগ-বির' পাইমুঙনি বানা
হাই-ফেন' আনি ফায়সিং নায়ৌই তঙনবা নৌঙ খাপাঙতি।'' (৭)

বঙ্গানুবাদ : ''রক্তিম রিসা বেঁধে
তুমি যখন বিপ্লবের পথে হাঁটো
তেতে উঠে আমার শরীর
তপ্ত উনোনের মতো
পাহাড়ের বুকে কোমর দুলিয়ে
তুমি যখন নাচো পাছড়া উড়িয়ে
মনে হয় উড়ছে বুঝি জয়ের পতাকা
এভাবেই তাকিয়ে থেকো আমার দিকে তুমি খাপাঙতি।'' (৮)

নৃত্যের সাথে রাজনৈতিক দর্শনকে একীভূত করার এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে উচ্চশ্রেণির কবিপ্রতিভাকে নির্দিষ্ট করে।

ছোট্ট পার্বতী ত্রিপুরা রাজ্যে সাংস্কৃতিক মননশীলতার অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই মননশীলতা যে শিল্প-মনস্কতায় সুপ্রাচীন কাল থেকে ক্রমশ অগ্রগতির পথে যাত্রা করছে---তা নিঃসন্দেহে আনন্দের এবং গর্বের বিষয়। গড়িয়া, বিজু, লেবাংবুমানি, মসক বুমানি, চেরু প্রভৃতি নৃত্য যেমন অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে এই ত্রিপুরা রাজ্যে, তেমনি হজাগিরি নৃত্য এই ধারায় একটি উজ্জ্বল মাইলফলক নির্মাণ করেছে। তাই হজাগিরি নৃত্য আজ ত্রিপুরা রাজ্যের উৎসবের মধ্যে সীমায়িত নেই। বিশ্বের দরবারে এই নৃত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন দখল করে আছে।

তথ্যসূত্র :

(১) Gan Choudhury, Jagadish, The Reangs of Tripura, Page - 5

(২) রিয়াং, জি.কে, রিয়াং জনগোষ্ঠীর গৌরবময় ইতিহাস, দৈনিক সংবাদ পত্রিকা, ২৩ মে' ২০১১
(৩) দেববর্মণ, সুরেন, ত্রিপুরার উপজাতি সংস্কৃতি, পৃ.১৩৪
(৪) চক্রবর্তী, উমাশংকর, ত্রিপুরার লোকনৃত্য, পৃ.৬৭-৬৮
(৫) রিয়াং, পঞ্চরাম, ঐতিহাসিক হজাগিরি নৃত্য প্রসঙ্গে কিছু কথা, গোমতী বইমেলা-২০১৭, পৃ.৩৫
(৬) সরকার, অনিল, সেরা অনিল সরকার,-সম্পা. গোপালমণি দাস, পৃ.১০৫
(৭) রায়চৌধুরী, স্নেহময়, হাইখেন' আনি ফায়সিং নায়ৌই তম নাবা, ককবরক ভাষা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, পৃ.৭৯
(৮) তদেব, পৃ.৭৯

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা :

(১) দেববর্মণ, সুরেন, ত্রিপুরার উপজাতীয় আদিধর্ম, নৃত্যকলা ও দেবদেবী, জ্ঞানবিচিত্রা, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০০৪
(২) চক্রবর্তী, উমাশঙ্কর, ত্রিপুরার লোকনৃত্য,Language Wing, Education Dept.,TTAADC, Khumulwng, Tripura, 2010
(৩) দেববর্মা, নরেশচন্দ্র, ককবরক ভাষা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, নবচন্দনা প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০১০
(৪) Gan Choudhuri, Jagadish, The Reangs of Tripura, Tribal Research and Cultural Institute,Govt. of Tripura, 2011
(৫) দাস, গোপালমণি, সেরা অনিল সরকার, নবচন্দনা প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০১৩
(৬) চক্রবর্তী সমর, লোকসংস্কৃতি ও লোকপার্বণ, সৈকত প্রকাশন, আগরতলা, ত্রিপুরা, ২০১৩
(৭) গোমতী বইমেলা স্মরণিক, তথ্য ও সংসৃকতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, ২০১৭
(৮) দৈনিক সংবাদ পত্রিকা (২৩ মে, ২০১১, ১৩ আগস্ট,২০১৩, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭)

সাহিত্যের কোনও শর্ত নেই

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কে. কে. দাস কলেজ

সারাংশ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "সাহিত্যের কোনও শর্ত নেই" গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্য ভাবনা সম্পর্কিত নানা নিবন্ধ। সেই সব নিবন্ধ অবলম্বনে সুনীলের সাহিত্যচিন্তার একটা রূপরেখা নির্মাণের চেষ্টা লক্ষিত হবে বর্তমান রচনায়। তাঁর স্পষ্ট মত, সাহিত্য কোনও রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক বিধিও মেনে চলবে না, আবার তাত্ত্বিকের নিদান মেনেও রচিত হবে না। সাহিত্য সমালোচনার নানা দিক যেমন উঠে এসেছে তেমনই সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ, সরকার, পাঠক, অশ্লীলতার সম্পর্ক নিয়েও তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন।

শব্দসূচক : সাহিত্য, সাহিত্যিক, তাত্ত্বিক, সমালোচনা

সাহিত্য সৃজনে যিনি জনমোহিনী, শুধুমাত্র যাঁর দিকে তাকিয়েই নির্মিত হতে পারে জনপ্রিয়তার নন্দনতত্ত্ব – সাহিত্য সম্পর্কিত ভাবনায় তিনি শিরঃপীড়া উদ্রেককারী হবেন কেন? আখ্যনধর্মী গল্প উপন্যাসের পাশাপাশি অন্যান্য গদ্য রচনার ক্ষেত্রেও অনায়াস দক্ষ ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। চিরকালীন মানবতাবোধ ও গভীর জীবন-উপলব্ধির স্পর্শে তাঁর গদ্য নিতান্ত সহজ সরল ও কথকতায় মোড়া হয়েও উত্তীর্ণ হয় অন্য স্তরে। কিন্তু হয়ে ওঠার কোনও তাগিদ নেই, গন্তব্যে পৌঁছনোর কোনও দায় নেই – কৃত্রিম জবরদস্তিকে এড়িয়ে গিয়েই সুনীলের গদ্য নির্ভার, প্রাণচঞ্চল। 'ছবির দেশে কবিতার দেশে' বা 'ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ' ভ্রমণ-কাহিনিকে অতিক্রম করে চলে যায়। অথচ এই অতিক্রমণের প্রচেষ্টাও প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রভূত পরিমাণে কথাসাহিত্য রচনার ফাঁকে সাহিত্য সম্পর্কেও সুনীল টুকরো-টাকরা লিখেছেন, সে-সব লেখায় ফুটে উঠেছে তাঁর সাহিত্য ভাবনা, বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ও সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক নানা মতামত। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সে-রকম বেশ কিছু গদ্য নিয়ে সংকলিত হয়েছে তাঁর 'সাহিত্যের কোনও শর্ত নেই' গ্রন্থটি। বর্তমান নিবন্ধে সেই গ্রন্থ অবলম্বনে সুনীলের সাহিত্য-ভাবনা সম্পর্কে একটি সার্বিক রূপরেখা নির্মাণের চেষ্টা করা হল।

২

সাহিত্য সমালোচনা কেমন হবে বা হওয়া উচিত – সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এ নিয়ে বারবার ভেবেছেন। ভালো-লাগা বা মন্দ-লাগা পাঠকের অনুভূতি মাত্র, তা নিয়ে হাজারো তর্ক-বিতর্ক চলতেই পারে, কিন্তু তা-কে সমালোচনা বলে মানতে রাজি নন তিনি। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, বিভিন্ন সাহিত্যসভাতেও যে 'যুক্তিবিবর্জিত আবেগপ্রধান

নিন্দাস্তুতি'মূলক 'ভাসা-ভাসা আলোচনা' হয়, তা-ও প্রকৃত অর্থে সাহিত্য সমালোচনা নয়। সুনীলের মতে, বক্তব্যের জন্য নয় – রচনারীতির জন্য কোনও লেখা সাহিত্য হয়ে ওঠে। নতুন সাহিত্যে নতুন কথা কিছুই নেই, থাকার প্রয়োজনও নেই, সে-সবই আগে বলা হয়ে গেছে। শুধু নতুন ভাবে বা রীতিতে বলার জন্যই প্রতিদিন সারা বিশ্ব জুড়ে নতুন নতুন সাহিত্যের জন্ম। সুনীল স্পষ্ট করে বলেছেন –

> "লেখকেরা নতুন যে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যে দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি লিখছেন, যেসব শব্দ নির্বাচন করে তিনি ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করছেন – সেইটাই নতুন সাহিত্য, সব মিলিয়ে এটাকে লেখকের নিজস্ব বক্তব্য না বলে তার নিজস্ব রীতি বলাই যুক্তিসঙ্গত। সাহিত্য-রীতির এই আলোচনাই সাহিত্য সমালোচনা।" [১] (ভালো-লাগা মন্দ-লাগা)

গঠনবাদী আখ্যানতত্ত্ব তো এ-কথাটাই বলছে। এখান থেকে বোঝা যায়, আধুনিক সমালোচনা-তত্ত্ব সম্পর্কে সুনীল কতোটা সচেতন ছিলেন। যদিও এ বিষয়ে সিরিয়াস চর্চার পথে সেভাবে হাঁটেননি তিনি। স্বভাবতই সমালোচনার ক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন তাঁর কাছে বড়ো একটা বিবেচ্য ছিল না। কিন্তু এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে হয়েছে, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ সব সময় অবান্তর হয় না। দৃষ্টান্ত দিয়ে সুনীল বলছেন –

> "জেমস জয়েসের যে চোখ খুব খারাপ ছিল, তিনি মোটা লেন্সের চশমা পরতেন – এটা জানলে কিছুটা বুঝতে পারা যায়, তিনি দৃশ্য বর্ণনার বদলে শব্দ ঝঙ্কারের প্রতি কেন বেশি জোর দিয়েছিলেন।"[২] (ভালো-লাগা মন্দ-লাগা)

সাহিত্য সমালোচনা নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আর একটা আক্ষেপের জায়গা ছিল, বাংলায় সাম্প্রতিক বা কনটেমপোরারি সাহিত্য সমালোচনা বলে কিছু হয় না। কেননা তাঁর মনে হয়েছে, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জীবিত লেখকদের ছুঁতেই রাজি নয়'। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে নিকট সান্নিধ্য যে অনেক সময় লঘুতা আনে, বিশ্লেষণের খাতিরে সাহিত্যের গায়েও যে দূরত্বের রং লাগা দরকার – বাংলা গবেষণা মহলের এই প্রচলিত মত মানতে তিনি গররাজি। সমালোচকদের বিরুদ্ধে তাঁর অন্যতম অভিযোগ – 'জ্যান্ত টাটকা কোনও কিছু ছোঁয়ার যোগ্যতাই তাঁরা অর্জন করেননি'। উদাহরণ হিসেবে সুনীল জীবনানন্দের জীবদ্দশায় সমকালীন সমালোচকদের কাছ থেকে নিতান্ত গুরুত্বটুকুও না পাওয়া এবং পরবর্তীকালে গবেষক মহলে তাঁকে নিয়ে অতিরিক্ত চর্চা ও মাতামাতির কথা উল্লেখ করেছেন।

বাংলা সমালোচনার আর একটা বিষয়ের প্রতি সুনীল আমাদের নজর টেনেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, আমাদের দেশে শুধু সাহিত্য পাঠের বা রচনার মর্মোদ্ধারের উপর ভিত্তি করে সমালোচনা হয় না। 'লেখকটি কোন দলের, কোন পত্রিকায় লেখা ছাপা হয়েছে, কত কপি বিক্রি হল' – এগুলো গুরুত্ব পাওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলেই মনে হয়েছিল তাঁর।

৩

এ-দেশে মার্কসবাদী সাহিত্য-সমালোচনার গতিপ্রকৃতি নিয়ে সুনীল একাধিক প্রবন্ধে মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করতেন, মার্কস-প্রদর্শিত সমাজতত্ত্ব ভারতের মুক্তির জন্য জরুরি বলেই সেই মার্কসবাদের নাম করে 'অপাঠ্য বা দুষ্পাঠ্য' লিখে যাওয়া ঠিক নয়। শুধু তাই নয়, মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা যে স্বয়ং মার্কসের নন্দনতত্ত্বের সব দিক খতিয়ে দেখেন না, এ নিয়েও তিনি সচেতন ছিলেন।

> "আমাদের দেশে যাঁরা মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিত তাদের অনেকেরই লেখা পড়লে মনে হয়, আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, তাঁরা মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ধারাবাহিক ইতিহাস মন দিয়ে পড়েন না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাহিত্যের সংজ্ঞা কীভাবে বদলে যাচ্ছে তার খবর রাখেন না।"[৩] ("এখন কিচ্ছু হচ্ছে না!")

মার্কসের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তিনি দাবি করেছেন, শিল্প-সাহিত্যে রসের বিচারকে মার্কস একেবারে অস্বীকার করেননি। আর শিল্পের উন্নতি ও সামাজিক উন্নতির পাশাপাশি চলা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তার কথাও মার্কস বলেননি।

শিল্পের জন্য শিল্পসৃষ্টি-কে মার্কসবাদীদের বিরোধিতা করা, প্লেখানভ-এর 'আর্ট অ্যান্ড সোসাইটি' বা ট্রটস্কি-র 'লিটারেচার অ্যান্ড রেভোলিউশন' প্রভৃতিতে সমাজ গঠনে শিল্প-সাহিত্যের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা নিয়ে সুনীলের আপত্তি নেই। কিন্তু তাবৎ শিল্প-সাহিত্যকে ফতোয়া বা চোখরাঙানি দ্বারা বেঁধে ফেলা তিনি কখনওই সমর্থন করতে পারেননি। গোর্কি কখনও ব্যক্তিগত রাজনৈতিক আদর্শের স্বার্থে সাহিত্যচর্চার বদলে প্রচারমূলক পুস্তিকা রচনায় বেশি মনোযোগ দিতেই পারেন, কিন্তু কেবল সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার না করার জন্য রাশিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে যে ডস্টয়ভস্কি ও পুশকিনের মতো বিশ্বমানের শিল্পীকে দূরে সরিয়ে রাখা তিনি মানতে পারেননি। সুনীল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন, ছকে বাঁধা অত্যাচার ও প্রতিবাদের কাহিনি কাগজ-কালির অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা তা পাঠকের হৃদয় যেমন স্পর্শ করে না, তেমনই তা আদর্শ প্রচারেও ব্যর্থ হয়।

সুনীল এক্ষেত্রে রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক তাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রভেদ করেছেন। বারবার গোর্কির কথা বলেছেন। টেনেছেন নিউ ইয়র্কে বসে ১৯০৬-এ তাঁর 'সুন্দরী ফ্রান্স' লেখার প্রসঙ্গ। সমাজতন্ত্রের কট্টর সমর্থক হিসেবে বুর্জোয়াদের প্রবল ঘৃণা করা গোর্কি যে তাঁর ঘরানার একেবারে উলটো কোটির ফ্লবেয়ার-এর 'মাদাম বোভারি'-র সৌন্দর্যসৃষ্টি ও শিল্পবোধের উচ্চ-প্রশংসা করেন, সে-কথা সুনীলের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়া এবং চীনে যে সাহিত্য বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ বদলাচ্ছে, তার জন্য সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথাও উল্লেখ করেন তাঁর 'শিল্পী বনাম তাত্ত্বিক'[৪] প্রবন্ধে। ইউক্রেনের বিখ্যাত মার্কসবাদী ঔপন্যাসিক ওলেস হন্‌চার তাঁকে জানান, লেখক কোনও

মহৎ আদর্শের প্রতি অবশ্যই অবিচল থাকতে পারেন, কিন্তু শিল্পের স্বার্থে তাঁকে অনবরত লিখনরীতি বদলাতে হবে। এ প্রসঙ্গে এসেছে চীনের সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক মাদাম ডিং লিং-এর কথা। আজীবন কট্টরবাদী কমিউনিস্ট এই লেখক সুনীলকে সাক্ষাতে জানান, শুধু জঙ্গি মনোভাব নিয়ে কোনও আদর্শের ডঙ্কা বাজানো সাহিত্য কাগজের আবর্জনা মাত্র, শিল্প রস এবং বিশুদ্ধ মানবতাবোধ ছাড়া কোনও মহৎ সাহিত্য রচিত হতে পারে না। সুনীল স্পষ্টভাবেই জানাচ্ছেন –

> "শুধু রাগ কিংবা প্রতিবাদের চিন্তায় কোনোদিন কোনো উচ্চাঙ্গের শিল্প হতে পারেনি। স্নেহ, মমতা, বিষণ্নতা এবং একাকিত্ববোধ – এই সবরকম বিভিন্ন সময় মানুষের মনপ্রাণ জুড়ে থাকে, এমনকী ঘোর যুদ্ধের মধ্যেও।"[৫] (প্রগতি)

৪

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য অর্থাৎ এই গত শতকের নয়ের দশক থেকে এই শতকের প্রথম দশকের লেখালিখি তিনি গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। কবিতা বা উপন্যাসের তুলনায় ছোটোগল্পের অবস্থা যে বেশ সংকটজনক, তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই নিয়ে হা-হুতাশ করার লোক সুনীল নন। কেননা টি এস এলিয়টের 'এভরি জেনারেশন গেটস দা লিটারেচার ইট ডিসার্ভস' তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরবর্তী কালের লেখকগোষ্ঠী অর্থাৎ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখের হাতেই বাংলা ছোটোগল্প তার শিখর স্পর্শ করেছিল বলেই মত সুনীলের। কিন্তু তার পর থেকেই ছোটোগল্পের গৌরবের দিন অন্তর্হিত হয়। উপন্যাসের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে সে হয় পরাজিত। কিন্তু তবু সুনীলের মনে হয়েছে, বিগত বিশ-তিরিশ বছরে খুব কম উপন্যাসই মহৎ স্তরে উন্নীত হতে পেরেছে। অধিকাংশই যেন ছোটোগল্পকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড়ো করা। বরং দীর্ঘদিন ধরে ছোটোগল্পেই বাংলা ভাষা বিশ্বের দরবারে সবচেয়ে গর্ব করতে পারত।

তাহলে আজ ছোটোগল্পের এই দৈন্যদশা কেন? তার প্রতি লেখকদের এতো অনীহা কেন? এর বেশ কিছু কারণও অনুসন্ধান করেছেন তিনি। প্রথমত, বড়ো কাগজগুলো বা পত্রিকাগোষ্ঠী উপন্যাসের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। ফলে পাঠকের রুচি বা পাঠাভ্যাসও বদলে গেছে। দ্বিতীয়ত, উপন্যাসে অর্থাগম বেশি হওয়ায় নতুন লেখকরা কিছুদিন ছোটোগল্পের চর্চা করে ঠিকই, কিন্তু খ্যাতি পেলেই তাঁরা উপন্যাসের দিকে চলে যায়। তৃতীয়ত, উপন্যাসে যেহেতু কাহিনির প্রাধান্য, তাই ছোটোগল্প-কেন্দ্রিক বিভিন্ন আন্দোলনের ইস্তেহারে কাহিনিকে একেবারেই আস্বীকার করার প্রবণতা শুধুই কৃত্রিম কারসাজি হয়ে দাঁড়ালো, রচনার প্রকৃত মান সেভাবে না বাড়ায় 'কাহিনিখাদক' পাঠকের সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়াস পাঠকও মুখ ঘুরিয়ে নিল। চতুর্থত, ছোটোগল্পের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধির উদ্যোগেরও যথেষ্ট অভাব। রবীন্দ্র পুরস্কার কমিটি বা সাহিত্য অকাদেমির দীর্ঘদিন ছোটোগল্পকে গুরুত্ব না দেওয়া, ঔপন্যাসিকের সমমর্যাদার পুরস্কার থেকে

ছোটোগল্পকারকে বঞ্চিত করাকেও এক্ষেত্রে বিবেচ্য বলেই মনে হয়েছে সুনীলের। ছোটোগল্পের পক্ষে তিনি এভাবে সওয়াল করছেন –

> "উপন্যাস বা কবিতার মতনই ছোটগল্প যে সাহিত্যের আলাদা একটা শাখা, পাঠকের এই চেতনাই আস্তে আস্তে আস্তমিত হয়ে যাচ্ছে। ছোটগল্পের মধ্যে শুধু কাহিনির জটিলতার রস বা কবিতার শব্দ ঝঙ্কার আশা করা উচিত নয়। ছোটগল্প মানুষের জীবনের টুকরো অংশ বা অনুভূতির গদ্যরূপ। ...কোনো রকম আপস নয়, ছোটগল্পকে দাঁড়াতে হবে পূর্ণ সম্মান নিয়ে। উপন্যাস না লিখে যিনি শুধু ছোটগল্প লিখলেন সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকাকেও সম্যক গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা উচিত।"[৬] (আমার মতে)

৫

একেবারে খণ্ডিত বা টুকরো-টাকরা হলেও আরও বেশ কিছু লেখায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যচিন্তার নানা দিক ফুটে ওঠে। তিনি যেমন কখনও সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রসঙ্গে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন, তেমনই কখনও আবার শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে রাষ্ট্র তথা রাজানুগ্রহের সম্পর্ক নিয়ে ভেবেছেন। সাহিত্যে অশ্লীলতার যেহেতু কোনও স্পষ্ট মানদণ্ড নেই বা থাকা সম্ভবও নয়, তাই কোনও বইয়ের ভাগ্যে রাষ্ট্রের মানে আসলে গুটিকয় বিচারকমণ্ডলীর 'অশ্লীল' তকমা সেঁটে দেওয়া তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেননি। স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের ভঙ্গীতে বলেছেন –

> "কোনো সাহিত্যিক ব্যাকরণ ভুল করলে আদালতে তাঁর বিচার হয় না; ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার নামে কেলোর কীর্তি করলে তাঁর শাস্তি হয় না; সব দেশেই সাহিত্যের প্রধান আসামীর নাম অশ্লীলতা।"[৭] (অশ্লীল)

সুনীলের মতে, সাহিত্যিকদের কাছে অশ্লীল বলে কিছু হয় না। নারী-পুরুষের শরীর তার কাছে সমুদ্র, পাহাড়, অরণ্য বা শস্যক্ষেত্রের সমগোত্রভুক্ত। আর তথাকথিত অশ্লীলতা বলতে আমরা যা বুঝি, সাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

'লেখক-শিল্পী এবং সরকার'[৮] প্রবন্ধে শিল্প-সাহিত্যের পেছনে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। মধ্যযুগে রাজানুগ্রহ ব্যাতিরেকে সাহিত্যসৃষ্টি প্রায় অসম্ভব ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার বাধ্যতা গণতান্ত্রিক দেশে অন্তত লেখকের নেই। সমাজতান্ত্রিক দেশে যেভাবে শিল্পীর স্বাধীনতা খর্ব করা হয়, তার নিন্দা করেন তিনি। পাশাপাশি সুইডেনের কথা উল্লেখ করে জানান, সেখানে শিল্প-সাহিত্যের উপরে সরকারের নিয়ন্ত্রণ বিন্দুমাত্র নেই। আমাদের দেশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতাকে তীব্র ভাবেই আক্রমণ করেছেন। তাঁর উপলব্ধি, সৃষ্টিক্ষমতা বা প্রতিভার মধ্যগগনে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যিকরা সেভাবে সরকারী সহায়তা বা দাক্ষিণ্য না পেলেও, বার্ধক্যে রচনাশক্তি ও নতুন সৃষ্টির উদ্যম প্রায় হারিয়ে যাওয়ার সময় খেতাব বা পুরস্কারের সম্মানিত হন। উদাহরণ হিসেবে বাংলার নাট্যাচার্য

শিশির ভাদুড়ীর 'জাতীয় নাট্যশালা' গড়ার কাজে সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করেও ব্যর্থ হওয়া এবং পরবর্তী কালে তাঁর পদ্মশ্রী খেতাব প্রত্যাখ্যান করার কথা তুলে ধরেন।

প্রথাগত প্রবন্ধ-নিবন্ধ নয়, এ-রকম বেশকিছু ব্যক্তিগত গদ্য থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার একটা আলগা ধারণা নিশ্চয়ই পাঠক পেতে পারেন। এতে যেমন কোথাও অতিসরলীকরণের চেষ্টা নজরে আসতে পারে, কোথাও বা যৌক্তিক পরম্পরায় ফাঁক মিলতে পারে। সমাজতান্ত্রিক দেশে শিল্পীর স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার কথা যিনি বারবার বলেন, ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের ফতোয়ায় শিল্পীদের দেশ ছাড়ার প্রসঙ্গে তিনি নীরব কেন? সোভিয়েতে ডস্টয়ভস্কি বা পুশকিন-এর মর্যাদাহীনতার উল্লেখ করলে, স্ট্যালিন-জমানায় 'ডক্টরস জিভাগো' খ্যাত বরিস পাস্তেরনাকের দ্বীপান্তর প্রসঙ্গে আলোকপাত জরুরি হয়ে ওঠেনা কি?

আসলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রথাগতভাবে প্রাবন্ধিক ছিলেন না। তিনি নিতান্ত কথকতার ঢঙে সহজ সরল ভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাই তাঁর গদ্যে সিরিয়াস পাঠক কিছু অপূর্ণতা পেতেই পারেন। কিন্তু কী পাইনি শুধু তার হিসেব না মিলিয়ে প্রাপ্তির ঝুলির দিকে তাকালে প্রথমেই নজরে আসবে সুনীলের স্পষ্টতা ও ঋজুতা। সুনীলের বক্তব্যে কোথাও কোনও অস্বচ্ছতা বা অস্পষ্টতা নেই। সুনীল পরিষ্কারভাবে জানাতে পারেন, সাহিত্যিকের কাছে সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়া আর কোনও শর্ত থাকা কাম্য নয়। ফরাসি সাহিত্যিক যেমন ভারতীয় ধর্ম-প্রচারকের জীবনী লিখতে পারেন, তেমনই বাঙালি কবিও পাশ্চাত্য তত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারেন। বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ মেনে সাহিত্য রচনার ফতোয়া যেমন একটা শর্ত, তেমনই খাঁটি দেশজ উপাদান দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির বাধ্যতাও একটা শর্ত। কোনও রকম রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, সামাজিক নিয়মনীতি মেনে না নিয়ে, শুধু সাহিত্যের নিয়ম মেনে চলাই হওয়া উচিত সাহিত্যের একমাত্র শর্ত।

উল্লেখপঞ্জি :

১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ২০১১। সাহিত্যের কোনও শর্ত নেই। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ১০৬।
২. তদেব। পৃ. ১০৬।
৩. তদেব। পৃ. ৯৪।
৪. তদেব। পৃ. ১১৬-১২১।
৫. তদেব। পৃ. ৯৫।
৬. তদেব। পৃ. ৮৫।
৭. তদেব। পৃ. ১১১।
৮. তদেব। পৃ. ১২২-১২৫।

গল্পকার নজরুল

সারমিন রহমান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : কবি হিসেব নজরুল বহুল আলোচিত। তবে তুলনায় গল্পকার নজরুলের আলোচনা বেশ স্বল্প। তাছাড়া মুখ্যত কবি হিসেবে পরিচিত নজরুলের সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ গল্প রচনার মধ্য দিয়েই। কবি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত নজরুলের ছোটোগল্পেরও বেশ কিছু নতুনত্ব লক্ষ করা যায়। এ নিবন্ধে মূলত গল্পকার নজরুল এবং তাঁর ছোটোগল্পের পাঠ পর্যালোচনা করা হয়েছে।
সূচক শব্দ : গল্পকার, নজরুল, অভিনবত্ব

নজরুলের সাহিত্য জগতে প্রবেশ প্রথমত গল্পকার হিসেবে। পরে কবি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা। ১৯১৮ সালে মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় জৈষ্ঠ্য সংখ্যায় (১৩২৬ বঙ্গাব্দ) তাঁর লেখা 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়।[১] ১৯১৯ এর জুলাই মাসে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'মুক্তি' কবিতাটি। সে বছরেই প্রকাশিত হয় আরও দুটি গল্প— 'ব্যথার দান' এবং 'হেনা'।[২] তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছোটোগল্প সংকলন 'ব্যথার দান' প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।[৩] এ বছরেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'।[৪] তবে তথ্যে জানা যায়, 'ব্যথার দান'ই নজরুলের প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ।[৫] এ বইয়ের গল্প সংখ্যা ছিল ছটি— 'ব্যথার দান', 'হেনা', 'বাদল বরিষণে', 'ঘুমের ঘোরে', 'অতৃপ্ত কামনা', 'রাজবন্দীর চিঠি'।[৬] অর্থাৎ একদিকে যখন কবিতার কলম 'বিদ্রোহী', অন্যদিকে তখন গল্পের কলম আবেগময়। যদিও এর উল্টোটাই ঘটে থাকে— গদ্য জেহাদী এবং পদ্য আবেগময়। তবে এখানেই যেন নজরুল ব্যতিক্রমী। তবে জেহাদী গদ্যও যে তাঁর কলমে উঠে আসেনি তা নয়। দৈনিক 'নবযুগ' বা সাপ্তাহিক 'ধূমকেত'-র সম্পাদক নজরুলের কলমে প্রায়শই মিলেছে 'তীব্র-তীক্ষ্ণ জেহাদী গদ্য।' বলা বাহুল্য, নজরুলের ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্য কর্মের অভীপ্সা যেন তাঁর কাব্যপংক্তিতেই প্রকাশিত—"আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা',"[৭]

এক্ষেত্রে আলোচনার জায়গা, বিশেষত ছোটোগল্প এর সীমানায় নজরুল যে 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' মেতেছেন সে বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা। কবি হিসেবে নজরুলের যে পরিচিতি, গল্পকার হিসেবে ততটা নয়— একথা হয়তো স্বীকার করবেন অনেকেই। খুব স্বল্প পরিমাণ গল্প তাঁর সাহিত্য ভাঁড়ারে রয়েছে। গল্প সম্পর্কে যে সব আলোচনা তাতে তাঁর গল্পের নিন্দা বা প্রশংসা উভয়েরই প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে। বাংলা ছোটোগল্পের যে

নিরন্তর উৎসারণ, তাতে বাঙালি পাঠক নজরুলের কালে পৌঁছনো পর্যন্ত একাধিক শক্তিশালী, সৃষ্টিশীল সব লেখকদের ছোটোগল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছে। ১৯২২ সালে যখন নজরুলের প্রথম গল্পগ্রন্থ বা গল্প 'ব্যথার দান' প্রকাশিত হচ্ছে, তখন ছোটোগল্পের সার্থক স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ছোটোগল্পের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে ১৯২২ সালেই 'লিপিকা' নিয়ে ভিন্নতর চর্চায় মেতে উঠেছেন। অর্থাৎ বাংলা ছোটোগল্প যখন বহু পথ অতিক্রম করে, ভিন্ন স্বাদ বৈচিত্র্য এনে ফেলে, নিরন্তর চর্চারত ছোটোগল্পের একনিষ্ঠ লেখকদের মধ্য দিয়ে তার একটা মানদণ্ড নির্মাণ করে ফেলেছে, এমন একটা সময়ে মূলত কবি নজরুল গল্প রচনার কথা ভাবছেন। গল্পকার হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করবার কথা ভাবছেন। এহেন গল্পকার নজরুলের গল্পপাঠে আপাত ছন্নছাড়া ভাব বা শৃঙ্খলার অভাব মনে হলেও, বাংলা ছোটোগল্প পাঠের যে অভিজ্ঞতা, তার সঙ্গে নজরুলের গল্প পাঠের অভিজ্ঞতা বা পাঠ প্রতিক্রিয়া এক না হলেও, নজরুলের ছোটোগল্প কিছু নতুনত্বের প্রকাশ করে।

ছোটোগল্পের কাছে প্রাথমিক যে প্রত্যাশা একটা কাহিনি বা আখ্যান, সেটা অপেক্ষা নজরুলের গল্পে একটা কোনো আবেগ যেন অনেক বেশি প্রতিভাত হয়েছে এবং এক দুর্নিবার আবেগের প্রকাশই যেন গল্প হয়ে উঠেছে। আরো একটা ব্যাপার, সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, কাব্যের ক্ষেত্রে আবেগের প্রাপ্তিযোগ অনেক বেশি। কিন্তু নজরুলের ছোটোগল্পেও আবেগের চূড়ান্ত একটা প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাছাড়া তাঁর অধিকাংশ গল্পেই বেশির ভাগ লাইনের শেষে আবেগসূচক চিহ্নের ব্যবহার আবেগ প্রকাশের মাত্রাকে আরও বেশি করে প্রকট করে তুলেছে। কয়েকটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হল—

১. এই যে জীবনের অনেকগুলো দিন তোমার বিরহে কেটে গেল, তাতে তোমাকে না হারিয়ে আরও বড় করে পেয়েছি। তোমায় যে আমি হারিয়েছিলাম, সে তোমাকে এত সহজে পেয়েছিলাম বলেই। বিরহের ব্যথায় জানটা যখন "পিয়া পিয়া" বলে ফরিয়াদ করে মরে, তখনকার আনন্দটা এত তীব্র যে, তা একমাত্র বিরহীর বুকই বোঝে, তা প্রকাশ করতে আর কেউ কখনো পারবে না। দুনিয়ায় যত রকম আনন্দ আছে, তার মধ্যে এই বিচ্ছেদের ব্যথাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী আনন্দময় !(ব্যথারদান, পৃ.৭)

২. মাগো, কী ব্যথিত-পাণ্ডুর আকাশ! এই যে এত বৃষ্টি হয়ে গেল, ও অসীম আকাশের কান্না নয় তো?-না না, এত উদার যে, সে কাঁদবে কেন? আর কাঁদলেও তার অশ্রু আমাদের সঙ্কীর্ণ পাপ-পঙ্কিল চোখের জলের মত বিস্বাদ আর উষ্ণ নয় তো ! (ঐ, পৃ.১০)

৩. কী ভীষণ সুন্দর এই তরুণের মৃত্যু-মাধুরী ! (হেনা, পৃ.২২)

৪. আগুন তুমি ঝর— ঝম ঝম ঝম ! (ঐ, পৃ.২৩) ইত্যাদি।

বিষয় ভাবনার দিক থেকেও কিছু অভিনবত্ব নজরুলের গল্পে লক্ষ করা যায়। প্রেম অপেক্ষা বিরহ-বিচ্ছেদ বা দুঃখের আবেগই তাঁর গল্পে আবেষ্টন করে রয়েছে বেশি

মাত্রায়। ব্যক্তিগত জীবনের অভিক্ষেপ প'ড়ে কখনো কখনো যুদ্ধক্ষেত্রও হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের প্রেক্ষিত। আর বাংলা ছোটোগল্পের সচরাচর যে ভৌগোলিক চৌহদ্দী তার বাইরে গিয়ে গোলেস্তান, কাবুল, বেলুচিস্তান, ফ্রান্স, আফ্রিকা যেমন তাঁর গল্পের ভৌগোলিক প্রেক্ষিত হয়েছে, তেমনি আবার কোনো কোনো গল্পের প্রেক্ষিত হয়েছে বীরভূম এর ময়ূরেশ্বর কিংবা নান্নুর। আবার তাঁর গল্পের নারী চরিত্রের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা যেমন তার কাঙ্ক্ষিত পুরুষের সঙ্গে জীবন-যাপন করতে পারেনি ('ব্যথার দান'এ-বেদৌরা, 'বাদল বরিষণে'র কাজ্‌রিয়া, 'ঘুমের ঘোরে' গল্পের পরী প্রভৃতি নারী চরিত্রেরা), তেমনি এমন নারী চরিত্রও অমিল নয়, যে কিনা তার জীবনসঙ্গীকে অন্য নারী থেকে বিচ্যুত করতে প্রাণসংহার করতেও পিছপা হয়নি (রাক্ষুসী গল্পের বিন্দি) । নজরুলের গল্পের নতুনত্বের আরও একটা দিক, তা হল বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের বাইরে গিয়ে আরবি, ফার্সি বা উর্দু শব্দের বাংলা ছোটোগল্পে প্রয়োগ (ফরিয়াদ, বাদ্‌শাজাদী, নওরোজ, খোশবু, চমন, জান, আসমান, সয়লাব, ফেরেশতা, পিয়াস, দুষমন, খুন-খোশরোজ, শেরেবব্বর, অশেক, আঁসু, খওয়াব, গোর, দিল-মাতানো, বে-দিল প্রভৃতি)। এত সব নতুনত্বের দেখা মেলে নজরুলের ছোটোগল্পে। আর সমালোচকের দৃষ্টিতেও তা প্রতিভাত— "ব্যথার দান (১৯২২), রিক্তের বেদন (১৯২৪), শিউলিমালা (১৯৩১), তিনটি গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত সবক'টি গল্পই অনবদ্য এমন অসম্ভব দাবি কেউ করবে না কিন্তু পাঠকের বিস্ময় জাগাবে প্রথম থেকেই তাঁর কলমের জোর ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব। যে প্রবল স্বকীয়তা নজরুলের প্রধান অভিজ্ঞান, গল্পেও তা স্বয়ং প্রকাশ। নিঃসন্দেহে ছোটোগল্পের শিল্পরূপের সাহসিক নিরীক্ষা ও আমরা নজরুলের গল্পগুলিতে পাই।"[৮] নজরুলের গল্পের অভিনবত্বকে খুঁজতে গিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর ছোটোগল্পগুলির এক বিশেষ দিক বা সত্তা। আসলে নজরুলের গল্পে কবিতা পাঠের আস্বাদনও মেলে। নজরুলের গল্প পাঠ করতে গিয়ে শুধুমাত্র গল্পের আস্বাদনই নয়, কবিতার উপাদানের আদান-প্রদানও লক্ষ করা যায়। তবে নজরুলের ছোটোগল্পে কবিতার আস্বাদন কোথায়, কীভাবে পাওয়া যায়, তা অন্বেষণের আগে তাঁর গল্পগুলি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা যাক। দেখে নেওয়া যাক, কীভাবে নজরুলের ছোটোগল্পে 'স্বকীয়তার স্বয়ং প্রকাশ' এবং গল্প নিয়ে 'সাহসিক নিরীক্ষা' লক্ষ করা যায়। নজরুলের প্রথম গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'র সূচনা হয়েছে এভাবে—

> [বাঙালী পল্টনের একটা বওয়াটে যুবক আমার কাছে তাহার কাহিনী বলিয়াছিল নেশায় ঝোঁকেঃনীচে তাহাই লেখা হইল। সে বোগদাদে গিয়ে মারা পড়ে।][৯]

তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লেখকের বয়ান দিয়েই গল্পটির সূচনা। এরপর আত্মকথনের ভঙ্গিমায় গল্পটি বর্ণিত। এ গল্পটি সম্পর্কে 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক মোহম্মদ নাসিরউদ্দিন লিখেছিলেন, "তাঁর এই প্রথম মুদ্রিত রচনাটির ভাষা ও রচনাভঙ্গী ছিল

অভিনব ধরনের, যা আমাদের সাহিত্যে ইতি পূর্বে দেখা যায় নি। এটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নজরুলকে নিয়ে শুরু হল সাহিত্যিক মহলে জল্পনা।"[১০] গল্পটির ভাষা ও রচনা ভঙ্গি কেমন ছিল তা গল্প পাঠেই বোঝা যায়— "আমার ছোটকালের কোন কথা বিশেষ ইয়াদ হয় না। আর আবছায়া রকমের একটু একটু মনে পড়লেও তাতে তেমন কোন রস বা রোমান্স (বৈচিত্র্য) নেই। সেই সরকারী রাম-শ্যামের মত পিতা-মাতার অত্যধিক স্নেহ, পড়ালেখায় নবডঙ্কা, ঝুলঝাপপুর, ডাণ্ডা গুলি খেলায়, দ্বিতীয় নাস্তি', দুষ্টামি নষ্টামিতে নন্দদুলালকৃষ্ণের তদানীন্তন অবতার, আর ছেলেদের দলে অপ্রতিহত প্রভাবে আলেকজান্ডার-দি-গ্রেটের ক্ষুদ্র সংস্করণ!"[১১]

কথনের ভঙ্গিতেই বাউণ্ডেলের ভাব স্পষ্ট। 'ইয়াদ' শব্দটাও লেখকের এক সচেতন প্রয়োগ। সমালোচকের কথায়, "মাত্র তিনটি বাক্য, কিন্তু শব্দ বৈচেত্র্যে ভরপুর। তাঁর হীনমন্যতাহীন, সংস্কার-মুক্ত সৃষ্টিশীল স্বভাব ভাষার সতীত্ব বিচার করেনি। শুধু অবলোকন করে সৌন্দর্য্যকে। কলমের ডগায় তাই অনায়াসে এসে যায় পারিবারিক 'ইয়াদ', সামাজিক 'নবডঙ্কা', 'ঝুমঝাপপুর', 'রাম', 'শ্যাম', 'নন্দদুলাল', 'কৃষ্ণ' এবং অতি ব্যবহারে বাংলার সগোত্র সংস্কৃত 'নাস্তি'।[১২]

বাস্তবিকই নজরুলের ছোটোগল্পের প্রথম অভিজ্ঞান 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' থেকেই এমন বিচিত্র শব্দের প্রয়োগ, ভাষাভঙ্গি ও রচনার অভিনবত্ব যেমন ধরা পড়ে, তেমনই এই বিচিত্র শব্দ প্রয়োগে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সংস্কৃতির সমন্বয়টিও। তাছাড়া ছোটোগল্প নিয়ে নজরুলের স্বতন্ত্রতাও এড়িয়ে যাবার নয়। রবীন্দ্রনাথ ছোটোগল্পের সূচনা পর্বে আত্মকথনের রীতিতেই রচনা করেছিলেন 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা'। নজরুলও তাঁর প্রথম ছোটোগল্পটি লিখছেন আত্মকথনের ভঙ্গিতেই। তবু পাঠকমাত্রই বুঝতে পারেন রবীন্দ্রনাথের উক্ত ছোটোগল্পদ্বয় এবং নজরুলের এই 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্পটির মধ্যে পার্থক্যটা। তবে লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা'য় সমাপ্তিতে কুসুমের আত্মহত্যা, আর নজরুলের 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'তে যদিও নারী চরিত্র দুটি, তবুও দুজনেরই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে গল্পের সমাপ্তি। নজরুলের প্রথম গল্পটি থেকেই প্রেমের সঙ্গে বিচ্ছেদের এই সুর বাজতে থাকে, যা পরবর্তী প্রায় সব গল্পেই কম-বেশি সঞ্চারিত। তবু এসব কিছুর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের গল্পের বর্ণনাভঙ্গি, ভাষাভঙ্গি, শব্দচয়নে বিপুল পার্থক্য ধরা পড়ে।

নজরুলের প্রথম গল্প রচনার পর ছ'টি গল্প নিয়ে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' (১৯২২) প্রকাশিত হয়। 'ব্যথার দান' প্রসঙ্গে তৎকালীন 'আনন্দবাজার' এর প্রতিক্রিয়া— "ব্যথার দান' একখানি গদ্যকাব্য। তরুণ কবির ব্যথা ভারাতুর যৌবনের অর্দ্ধমগ্ন, স্মৃতিররাগ-রক্তে অনুরঞ্জিত কাহিনী এই কাব্যের কথা-রঙ।'[১৩] 'বসুমতী' প্রশংসা করে লেখে— তিনি 'বাঙলা গদ্যেও সিদ্ধহস্ত'[১৪] 'The Servant'ও বলে যে তাঁর লেখার ভঙ্গি নিজস্ব।[১৫] 'বঙ্গবাসী'ও প্রশংসা করে তাঁর 'ভঙ্গিশালিনী' ভাষার।[১৬] 'বাঙলার কথা' বলে, 'ভাষার এমন প্রাণশক্তি, এত মাদকতা সত্যকার উচ্ছ্বাসেই সম্ভব।'[১৭] 'আত্মশক্তি'

এবং ‘বিজলী’ ইত্যাদি প্রায় সব পত্রিকাই ‘ব্যথার দান’ এ খুঁজে পাই কাব্য রসকে।[১৮] পত্র-পত্রিকা ব্যতীতও ড.সুকুমার সেন ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড)’ এ বলেন, ‘নজরুলের প্রথম কবিতার বই ‘ব্যথার দান’’ এবং তার প্রকাশকাল উল্লেখ করেছেন **১৯২১**।[১৯] উপরোক্ত প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে দেখা যায়, ‘ব্যথার দান’ কে দেখতে চাওয়া হয়েছে কবিতার বই হিসেবে এবং সমালোচকেরা তাতে খুঁজে পেয়েছেন কাব্যরস। কিন্তু কেন এই দৃষ্টিভঙ্গি সেটাও অনুসন্ধান করতে হয়। কেননা, ‘ব্যথার দান’ তো নজরুল লিখলেন গদ্যে এবং নির্মাণ করলেন গল্প হিসেবে। তবে কেন তা গদ্যধর্মীতা অপেক্ষা কাব্যধর্মীতাকে অনেক বেশি করে প্রতিভাত করল? আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতেও “ব্যথার দান সংকলনের গল্পগুলি অনেকটাই কবির কলমে লেখা। গল্পসূত্রে ক্ষীণ, অনেক সময় কবিতার আবেগের চাপে প্রায় অলক্ষ্য। অনেকের কাছেই তাই এটিকে গদ্যকাব্য মনে হয়েছিল।”[২০] এ বক্তব্যে একটা কারণ স্পষ্ট ‘কবিতার আবেগের চাপ’। তবে বলাটাই বাহুল্য, শুধুমাত্র ‘ব্যথার দান’ই নয়, নজরুলের অধিকাংশ গল্পেই মেলে কবিতার আবেগ বা উচ্ছ্বাস। নজরুলের সমসাময়িক এক সমালোচক পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায়— “গল্পগুলি কবিত্বের অত্যুগ্র উচ্ছ্বাসে মাঝে মাঝে এমনি ফ্যানাই উঠিয়াছে যে তাহা একঘেয়ে হইয়া রসভঙ্গ করিয়াছে।”[২১] নজরুলের গল্পসমূহে কবিত্বের উচ্ছ্বাস রয়েছে— সে বক্তব্যের বহু সমর্থন পাওয়া গেছে। তবে নজরুলের গল্পে এই কবিত্বের উচ্ছ্বাস রসভঙ্গ করেছে কিনা তার বিচারের দায় হয়তো পাঠকেরও। একথা ঠিক, নজরুলের একাধিক গল্প যেমন— ‘ব্যথার দান’ ব্যতীতও ‘হেনা’, ‘বাদল বরিষণে’, ‘ঘুমের ঘোরে’, ‘পরীর কথা’, ‘রাজবন্দীর চিঠি’, ‘রিক্তের বেদন’, ‘মেহেরনেগার’, ‘সাঁজের তারা’ ইত্যাদি প্রায় সব গল্পেই আবেগের চূড়ান্ত মাত্রা লক্ষ করা যায়। তাছাড়া ছোটোগল্পের যে সংহত বাঁধন, চূড়ান্ত একটা মুহূর্ত, অবশেষে গভীরতর একটা ব্যঞ্জনা, তা যেন নজরুলের ছোটোগল্পে আবেগের তোড়ে প্রায় ক্ষুণ্ণ। সমালোচকেরও অভিমত— “নজরুলের গল্পগুলি ছোটগল্পের আঙ্গিক অনুসারে খুব পরিণত বা সুসংহত নয়। আবেগের বাড়াবাড়ি কোথাও কোথাও স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত করেছে।”[২২] তবে নজরুলের গল্পগুলি যখন আবেগের উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়িতে কবিতাক্রান্ত, তেমনই তাঁর শেষদিকের কিছু গল্পে পরিণতবোধের দিকে অগ্রসরের একটা ঝোঁক লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে ‘রাক্ষুসী’ বা ‘শিউলিমালা’ গল্প দু’টির কথা। এই দুই গল্পের প্রেমভাবনার সঙ্গে বা প্রেমের প্রকাশের সঙ্গে পূর্ববর্তী গল্পগুলির প্রেমভাবনা বা প্রকাশের পার্থক্য সুস্পষ্ট। ভাষার ক্ষেত্রেও এক্ষেত্রে এসেছে বলিষ্ঠতা। আবেগের বাহুল্য কম, কিন্তু প্রেমের গভীরতা সুস্পষ্ট।

‘রাক্ষুসী’ গল্পটির প্রেক্ষিত বীরভূম। গল্পের মূল চরিত্র এক বাগদী বউ। গল্পের বিষয় সাধারণ— বাগদীবউ এবং তার স্বামীর সুখের সংসারে তৃতীয় নারীর প্রবেশ। গল্পের সমস্তটা জুড়ে বর্ণিত সেই বাগদী বউ এবং তাঁর স্বামীর সুখের সংসারের কথা;

তাদের দাম্পত্যের গভীরতার কথা। তবে এই সুখের সংসার ভেঙে যায় স্বামীর জীবনে অন্য এক নারী এলে। বাগদী বউয়ের মাথার ঠিক থাকে না। স্বামীকে বারংবার বোঝানো সত্ত্বেও বোঝে না। অতএব বাগদী বউয়ের সিদ্ধান্ত—স্বামীকে হত্যা করবে সে। স্বামিকে সে এই পাপের হাত থেকে রক্ষা করতে চায়। অন্যায় থেকে বিচ্যুত করতে চায়। তাই হত্যা। আর সে হত্যার বর্ণনা যেমন নৃশংস, তেমনি বাগদী বউয়ের আত্মকথনে নারীর চিরকালীন লাঞ্ছনা এবং সাহসিকতার প্রকাশক—

> "নিজের সোয়ামী দেবতাকে নরকে যাবার আগেই ও পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। পুরুষেরা ওতে যাই বলুক, আমি আর আমার ভগবান এই দুইজনাতেই জানতুম, এ একটা মস্ত সোজাসুজি সত্যিকার বিচার! আর পুরুষেরা ওরকম চেঁচাবেই; —কারণ তারা দেখে আসছে যে সেই মান্ধাতার আমল থেকে শুধু মেয়েরাই কাটা পড়েছে তাদের দোষের জন্য। . . . আমি যদি ওরকম একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসতুম আর যদি আমার সোয়ামী ঐজন্যে আমাকে কেটে ফেলত তাতে পুরুষেরা একটি কথাও বলত না। . . . কারণ . . . পুরুষদের সাত খুন মাফ।"[২৩]

এ গল্পের পরিণত দিক তুলে ধরতে হলে পূর্ববর্তী গল্পের তুলনাও আবশ্যিক। ধরা যাক, 'ব্যথার দান' গল্পটির কথা, যেখানে দারা এবং অনাথা বেদৌরার প্রেমের কথা বর্ণিত। দারার কথা বর্ণিত এভাবে— "গোলেস্তান! অনেকদিন পরে তোমার বুকে ফিরে এসেছি। আঃ মাটির মা আমার কত ঠাণ্ডা তোমার কোল!"[২৪] বেদৌরার কথায়— "মাগো, কী ব্যথিত-পান্ডুর আকাশ! এই যে এত বৃষ্টি হয়ে গেল, ও অসীম আকাশের কান্না নয় তো?— না না এত উদার যে, সে কাঁদবে কেন? আর কাঁদলেও তাঁর অশ্রু আমাদের সংকীর্ণ পাপ-পঙ্কিল চোখের জলের মত বিস্বাদ আর উষ্ণ নয়তো! দেখছ, সে কতঠাণ্ডা! . . ."[২৫] বাগদী বউ এবং বেদৌরার স্বগতোক্তিতেই ধরা পড়ে আবেগের তারতম্য। আর সমালোচকের ভাষায়, এ গল্পের "গঠনটি বেশ নতুন ধরনের, বিষয়বস্তুর সঙ্গে মানানসই, কবিতা হলে বলা যেত 'ড্রামাটিক মনোলোগ'। অনেকের মতেই এটি নজরুলের শ্রেষ্ঠগল্প।"[২৬] তাছাড়া 'রাক্ষুসী' গল্পটির প্রকাশকাল ১৩২৭ বঙ্গাব্দের মাঘমাস 'সওগাত' পত্রিকায়। এরও কয়েক বছর পর ১৯২২-এ মাসিক 'বসুমতী'তে প্রকাশিত হচ্ছে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি'। আর ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'কল্লোল' পত্রিকায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রসকলি'। এ প্রসঙ্গেই নজরুলের আরও একটি সাধুবাদ প্রাপ্য, যা সমালোচকের বক্তব্যেই পরিস্ফুট— "অঞ্চল নির্ভর তন্ময়তা বাংলা সাহিত্যে একটা স্পষ্ট রূপ পাচ্ছিল এই সময় থেকেই। . . . পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপাদান নানাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে অন্যতম পথিকৃতের সম্মান নজরুল নিশ্চয়ই পেতে পারেন।"[২৭] নজরুলের গল্প এভাবেই স্বতন্ত্রতার গুণে প্রশংসিত হয়েছে। তবে তাঁর গল্পে কাব্যগুণের দিকটা বোধহয় অনালোচিতই থেকে গেছে। নজরুলের গল্পেকাব্যধর্মীতার কথা উল্লেখ করলেও বা কবিতার মতো আবেগের

উচ্ছ্বাসের উল্লেখ ব্যতীত কোথায়, কীভাবে সেই কাব্যধর্মীতা প্রকাশ পেয়েছে তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ খুব বেশি দেখা যায় না। তবে শুধু আবেগই নজরুলের ছোটোগল্পকে কাব্যময় করেছে তা নয়। কবিতার আরও কিছু উপকরণ বা লক্ষণ, যা কবিতাকে সুসজ্জিত, চিত্তাকর্ষী করে তোলে, তার অজস্রতাও নজরুলের গল্পে রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রথমত উল্লেখ করা যেতে পারে নজরুলের গল্পে ব্যবহৃত উপমাগুলির। যেমন—

১. আর তা দেখে অভিমানী স্নেহ-বঞ্চিতের মত আমার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আসবে না। — ব্যথার দান,পৃ.৫-৬

২. আমার হাতের ওপর কচি পাতার মত তোমার কোমল হাত দুটি থুয়ে মা অশ্রুজড়িত কণ্ঠে আদেশ করছেন, — ব্যথার দান, পৃ.৬

৩. আঙুরের ডাঁশা থোকাগুলোর সে আর লাবণ্যে ঢল-ঢল করেছে পরীস্থানের নিটোল-স্বাস্থ্য ষোড়শী বাদ্‌শাজাদীদের মত।— ব্যথার দান,পৃ.৭

৪. নাশপাতিগুলো রাঙিয়ে উঠেছে সুন্দরীদের শরম-রঞ্জিত হিঙুল গালের মত।— ব্যথার দান, পৃ.৭

৫. রস-প্রাচুর্যের প্রভাবে ডালিমের দানাগুলো ফেটে ফেটে বেরিয়েছে কিশোরীদের স্ফুরিত অরুণ অধরের মত। — ব্যথার দান, পৃ.৭

৬. সে কি মাতালের মত টলতে টলতে দৌড়ে লুকিয়ে পড়লে ঐ খোর্মা গাছগুলোর আড়ালে।— ব্যথার দান, পৃ.৯

৭. আর কাঁদলেও তার অশ্রু আমাদের সঙকীর্ণ পাপ-পঙ্কিল চোখের জলের মত বিস্বাদ আর উষ্ণ নয়তো ! — ব্যথার দান, পৃ.১০

৮. সেই গোলেস্তানে একজোড়া বুলবুলেরই মত মিলনেই অভিমান, — ব্যথার দান পৃ.১০

৯. ঠিক সেই সময় কোথা থেকে ধূমকেতুর মত সয়ফুলমূল্‌ক্ এসে আমায় কান-ভাঙানি দিলে— — ব্যথার দানপৃ.১১

১০. ভালবাসায় কী বিরাট শান্ত স্নিগ্ধতা আর করুণ গাম্ভীর্য, ঠিক ভৈরবী রাগিণীর কড়ি মধ্যমের মত ! — ব্যথার দান, পৃ.১১

১১. এই বাসনার ভোগে যে সুখ, . . . এতে শুধু দীপক রাগিণীর মত পুড়িয়েই দিয়ে যায় আমাদের ! — ব্যথার দান, পৃ.১১

১২. সেই সময় স্নিগ্ধ-মল্লারের মত সান্তনার একটা-কিছু পাশে না থাকলে সে যে জ্বলবেই – দীপক যে তাকে জ্বালাবেই ! — ব্যথার দান, পৃ.১১

১৩. কে আমার সমস্ত হৃদয়-আসন জুড়ে রাজাধিরাজ একচ্ছত্র সম্রাটের মত বসে আছে।— ব্যথার দান, পৃ.১১

১৪. তারপর কেমন সে উন্মাদের মত ছুটে এসে আমার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বললে, . . . — ব্যথার দান, পৃ.১২

১৫. সে যেন অগাধ অসীম এক যুদ্ধ-পিপাসা নিয়ে প্রচণ্ড বেগে মৃত্যুর মত কঠোর হয়ে অন্যায়কে আক্রমণ করছে।— ব্যথারদান, পৃ.১৫
১৬. এতদিনে না সত্যিকার ভালোবাসায় তাকে ঐ অসীম আকাশের মতই অনন্ত উদার করে দিলে।— ব্যথার দান, পৃ.১৭
১৭. কামনাটা হচ্ছে ঠিক বাদলেরমত; আর প্রেম জ্বলছে হৃদয়ে ঐ রবিরই মত একই ভাবে সমান ঔজ্জ্বল্যে।— ব্যথার দান, পৃ.১৯
১৮. এক একটা সিপাই শহীদ হয়েছে, আর যেন বিয়ের নওশার মত লাল হয়ে শুয়ে আছে। — হেনা, পৃ.২০
১৯. তুমি নেমে এস ঐ নদীর বুকের জমাট বরফের মত হয়ে— — হেনা, পৃ.২৩
২০. এখন সমস্ত বনটাকে একটা চিতাবাঘের মত দেখাচ্ছে।— হেনা, পৃ.২৫
২১. হেনা তার কস্তুরীর মত কালো পশমিনা অলোকগোছা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, — হেনা, পৃ.২৬
২২. আমার হাতের মুঠোয় হেনার হেনা রঞ্জিত হাত দুটি কিশলয়ের মত কেঁপে কেঁপে উঠল।— হেনা, পৃ.২৭
২৩. হেনা ছায়ার মত আমার পিছু পিছু ছুটল।— হেনা, পৃ.৩১
২৪. এত ভালবাসা, পাহাড়-ফাটা উদ্দাম জলস্রোতের মত এত প্রেম কি করে বুকের পাঁজর দিয়ে আটকে রেখেছিল হেনা? — হেনা, পৃ.৩১
২৫. আমার এই খাপ-ছাড়া জীবনে তার স্মৃতিগুলো ঝড়ের মুখে পদ্মবনের মত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে।— বাদল-বরিষণে, পৃ.৩২
২৬. তারই ঈষৎ ফাঁকে সুনীল গগনের একফালি নীলিমা যেন কোন্ অনন্ত-কান্নারত প্রেয়সীর কাজল মাখা কালো চোখের রেখার মত করুণ হয়ে জাগছিল ! — বাদল-বরিষণে, পৃ.৩২
২৭. ঝড়ে-ওড়া একদল পলকা মেঘের মত মল্লারের সুরে পথের আকাশ-বাতাস ভরিয়ে কাজ্‌রী গায়িকা রূপসীরা গেয়ে যাচ্ছিল— — বাদল-বরিষণে,পৃ.৩৩
২৮. . . . ঐ কাজ্‌রিয়ার ছোট্ট কালো মুখ, — যা শিল্পীর হাতের কাল-পাথর কোঁদা দেবী মুখের মত নিটোল! — বাদল-বরিষণে,পৃ.৩৩
২৯. বিজলী চমকের মত তার ঐ যে একটি দুরন্ত চপল গতি, — বাদল-বরিষণে,পৃ.৩৩
৩০. ঝঞ্ঝার উতরোলের মত দোল খেয়ে খেয়ে পাশের উপবন হতে তরুণী-কণ্ঠের মল্লার হিন্দোলা ভেসে আসছিল— — বাদল-বরিষণে,পৃ.৩৫
৩১. লেক-রোডের পাশে ছবির মত বাড়িটি।— শিউলি-মালা, পৃ.১৯০
৩২. গায়ে গোধূলি রং-এর শাড়ির মাঝে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মুখখানি-হলুদ রং বোঁটায় শুভ্র শিউলি ফুলের মতই সুন্দর দেখাচ্ছিল।— শিউলি-মালা, পৃ.১৯৪ ইত্যাদি
উপমা প্রধানত কবিতার অলংকার হলেও গদ্যকেও তা অলংকৃত করে কবিতার আস্বাদ এনে দিতে পারে। আর নজরুলের ছোটোগল্পে উপমার অজস্রতা প্রমাণ করে সেগুলো

শুধুমাত্র আবেগপ্রসূতই নয়, তার পশ্চাতে রয়েছে সক্রিয় একটি কবিমন। নজরুল তাঁর 'হেনা' নামক একটি ছোটগল্পে লিখছেন, "আমার এক ফাজিল বন্ধু বলছেন— 'কী নিমকিন চেহারা ! — আহা, কী উপমার ছিরি ! কে নাকি বলেছিল, — ষাঁড়টা দেখতে যেন ঠিক কাৎলা মাছ !"[২৮] উপমা সম্পর্কে কথকের এই বক্তব্য খানিকটা হয়তো তুলে ধরে লেখকের উপমা সংক্রান্ত ভাবনাকে। আর তার উপমাগুলির বিশ্লেষণে ধরা পড়ে কবিতার মাধুর্য— যেখানে ভালবাসা 'ভৈরব রাগিণীর কড়ি মধ্যমের মত', বাসনার ভোগের সুখ 'দীপক রাগিণীর পুড়িয়ে মারার মত', 'স্নিগ্ধ-মল্লারের মত সান্তনা', 'কামনা ঠিক বাদলের মত, যেখানেনারীকে আবাহন করে হচ্ছে 'নদীর বুকের জমাট বরফের মত হয়ে' আসার, আবার সমস্ত বনকে দেখা যাচ্ছে 'একটা চিতা বাঘের মত' অথবা যেখানে পূর্বতন প্রেয়সীর স্মৃতিগুলো 'ঝড়ের মুখে পদ্মবনের মত ছিন্ন-ভিন্ন' হয়ে যায়, যেখানে নারীর দৃষ্টি 'চখা হরিণীর মত ভীত ত্রস্ত', 'বালির নীচে ফল্গুধারার মত অন্তরের বেদনা', 'হেমন্তে শিশির পাতের মত অশ্রুর বেয়ে পড়া' ইত্যাদি আরও অজস্র সব উপমা গদ্যের যুক্তিপূর্ণ বলিষ্ঠ ভঙ্গি ছাড়িয়ে আসলে কবিতার কথাই মনে করায়। তাছাড়াও এ বক্তব্যটিও অস্বীকার্য নয় যে, "গদ্য যখন কবিতামুখি হয় তখন যে সে গদ্যের অন্বয়কে কিছুটা বদলাতে চায় তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে পদ্যের ছন্দকে সে যেহেতু গ্রহণ করতে পারে না, সেজন্য তার ছন্দকে সে এমনভাবে নিয়মিত করতে চায় যাতে, নিয়মিত ছন্দের কাছাকাছি যেতে পারে।[২৯] নজরুলের এই উপমাগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায়শই গদ্যের অন্বয়কে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার স্বাভাবিক ক্রম বারংবারই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েও নজরুল তাঁর ছোটগল্পের গদ্যে এনেছে কবিতার আমেজকে। এছাড়াও ছন্দবিলাসী নজরুলের গল্পে 'ধ্বনিপুঞ্জের পুনরাবৃত্তি'র মধ্যে দিয়েও যেন গদ্যেও ছন্দময়তাকে বজায় রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নজরুলের ছোটোগল্পে ছন্দহীনতার প্রতি একটা ব্যঙ্গ লক্ষ করা যায়। 'ব্যথার দান' গল্পটিতে এক পাগলের মুখে শোনা যায়—

'এ-পার থেকে মারলাম ছুরি কলা গাছে,
হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেল রে বাবা !'[৩০]

গল্প কথকের জিজ্ঞাসা— 'ভাই তুমি কি কবি?' . . . 'তা তোমার কবিতার মিল কই?[৩১] কবিতার মিলের প্রতি ঝোঁক এবং পক্ষপাতিত্ব— এ দুই-ই ছিল লেখকের। তাই গদ্যে রচিত ছোটোগল্পেও ধ্বনির সমোচ্চারণ ও পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়ে সেই ছন্দময়তাকে যেন বজায় রাখলেন গল্পকার নজরুলও। যেমন—

১. সে-দিন ফাগুন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে আকাশে-বাতাসে ফলে-ফুলে-পাতায় ! (ব্যথার দান, পৃ.৭)

২. আড়ালে-আবডালে বসে কোয়েল আর দোয়েল বধূর গলা-সাধার ধুম পড়ে গিয়েছে, কি করে তারা ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তাদের তরুণ স্বামীদের মশগুল করে রাখবে ! (ঐ, পৃ.৭)

৩. তোমার আলতা-ছোবানো পায়ের পাতার পাতলা দাগগুলি নির্ঝরের কূলে কূলে মিশিয়ে আসছে, (ঐ, পৃ.৮)
৪. . . . হাত দুটো মুঠো করে কিছু ধরবার চেষ্টা করছে। (ঐ, পৃ.৮)
৫. তুমি কি তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে আকাশ-ফড়িং ধরছ ? (ঐ, পৃ.৮)
৬. অনিলের নীল রংটাকে সুনীল আকাশ ভেবে ধরতে গেলে . . .। (ঐ, পৃ.৯)
৭. এক নিমেষে আমার মুখের মুখর হাসি মূক হয়ে মিলিয়ে গেল। (ঐ, পৃ.৯)
৮. বাইরে ফাগুনের উদাস বাতাস প্রাণে কামনার তীব্র আগুন জ্বালিয়ে দিলে ! (ঐ, পৃ.১১)
৯. কী অচিন্ত্য অপূর্ব অসম সাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করছে দারা ! (ঐ, পৃ.১৫)
১০. শুধু তার কানে কানে বলা গোপন-প্রেমালাপের মঞ্জু গুঞ্জন আর চরণ-ভরা মঞ্জীরের রুণু-ঝনু বোল। (ঐ, পৃ.১৭)
১১. বিরলে-গাঁথা ফুলহারগুলি আর বেদনা-বারিসিক্ত বিরহ-গানগুলি তারই পায়ে ঢেলে দিয়েছি। (ঐ, পৃ.১৮)
১২. আগুন তুমি ঝর— ঝম ঝম ঝম ! (হেনা, পৃ.২৩)
১৩. আমি চেয়েছি শুধু ক্লেশ শুধু ব্যথা শুধু আঘাত ! (ঐ, পৃ.২৬)
১৪. বুকের সমস্ত রক্ত আকুল আবেগে কেঁপে কেঁপে নৃত্য করে উঠল! (বাদল বরিষণে, পৃ.৩২)
১৫. মর্মে আমার তারই গাঢ় গমক গুমরে ফিরতে লাগল, (ঐ, পৃ.৩৪)
১৬. . . . দোদুল দোলায় দুলে সুন্দরীদের এলো চুলের মতই হাওয়ার বেগে মেঘের দিকে ছুটল, — (ঐ, পৃ.৩৫)
১৭. আজ শাঙন রাতের মাতামাতিতে হৃদয় আমার কথায় আর ব্যথায় ভরে উঠেছে, (ঐ, পৃ.৩৬)
১৮. সে কোন্ অনাদি যুগের অনন্ত অন্বেষণের পর। (ঐ, পৃ.৩৭)
১৯. এক বিন্দু অসম্বরণীয় অবাধ্য অশ্রু তার পাণ্ডুর কপোলে ঝরে পড়তেই . . . আর্ত দৃষ্টি হেনে ঐখানেই বসে পড়লো! (ঐ, পৃ.৩৮)
২০. পাগলা ঝরার মত ঝরে ঝরে পড়ছে—ঝম্ ঝম্ ঝম্ ! (ঐ, পৃ.৪০)
২১. বনে বনে বিহগের ব্যাকুল কূজন বনান্তরে গিয়ে তার প্রতিধ্বনির রেশ রেখে এল ! (ঘুমের ঘোরে, পৃ.৪১)
২২. সবুজ শাখীর শাখায় শাখায় পাতার কোলে ফুল ফুটল। (ঐ, পৃ.৪১)
২৩. সে ছিল এমনি এক চাঁদনী—চর্চিত-যামিনী, (ঐ, পৃ.৪৪)
২৪. মদির খোশবুর মাদকতায় মল্লিকা-মালতীর মঞ্জুর মঞ্জরীমালা মলয় মারুতকে মাতিয়ে তুলেছিল। উগ্র রজনীগন্ধার উদাস সুবাস অব্যক্ত অজানা একটা শোক-শঙ্কায় বক্ষ ভরে তুলেছিল। (ঐ, পৃ.৪৪)
২৫. . . . লালস-আলস ক্লান্ত সমীর . . .। (ঐ, পৃ.৪৪)

২৬. উল্লাস-হিল্লোলে শাখায় শাখায় ঘুমন্ত ফুল দোল খেয়ে উঠল। (ঐ, পৃ.৪৪)
২৭. আনন্দছন্দের হিন্দোলার দোল আর দুলল না। (ঐ, পৃ.৪৫)
২৮. অসম্বৃত আর লুণ্ঠিত চঞ্চল অচঞ্চল সম্বৃত হল। (ঐ, পৃ.৪৫)
২৯. . . . উল্লসিত-সরসী-সলিলের কল-কল্লোলে নিথর হয়ে থামল, (ঐ, পৃ.৪৫)
৩০. মুখর ময়ূরের কলকণ্ঠের সাথে মাঝে-মাঝে আকুল মেঘের ঝমঝমানি শোনা যাচ্ছে, ঝিম ঝিম ঝিম। (ঐ, পৃ.৪৮)
৩১. বর্ষণ-পুলকিত পুষ্প-আকুলিত এই বল্লী-বিতানের আর্দ্র-স্নিগ্ধ ছায়ে বসে আমার মনে হয়, (ঐ, পৃ.৪৮-৪৯)
৩২. ওগো আমার বসন্ত-বর্ষার বাসর নিশি, তুমি আর যেও না— হায় যেও না। (ঐ, পৃ.৪৯)
৩৩. সমাজ, ধর্ম আমার মনকে মুখ ভাঙিয়ে চোখ রাঙিয়ে বলছে, (পরীর কথা, পৃ.৫৩)
৩৪. একটি দুটি করে আসমানের আঙিনায় তারা এসে জুট্‌ছে, আমার মনের মাঝেও তাই অনেক দিনের অনেক সুপ্ত কথার, অনেক লুপ্ত স্মৃতির একটির পর একটির উদয় হচ্ছে। (অতৃপ্ত কামনা, পৃ.৫৬)
৩৫. . . . আমার কাছে এসে হেসে বলত, (ঐ, পৃ.৫৭)
৩৬. মুক্তকে যখন বন্ধনে আনবার চেষ্টা করে হয়, তখনই তার তরঙ্গের কল্লোলে মধুর চল-চপলতার কলহ বাণী ফুটে ওঠে। (ঐ, পৃ.৫৯)
৩৭. কত দিনের কত কথা কত ব্যথা আমার বুকের মাঝে ভরে উঠল। (ঐ, পৃ.৬২)
৩৮. সেই ম্লান দীপশিখাটির পাশে আমার আসার আশায় কোন কালো চোখের করুণ কামনা ব্যাকুল হয়ে জাগবে না। (ঐ, পৃ.৬৩) ইত্যাদি।

এভাবেই একই ধ্বনি বা ধ্বনিপুঞ্জের একাধিকবার ব্যবহারে নজরুলের ছোটোগল্পেও কবিতার ছন্দোময়তা এসে মিলেছে। আর আলোচনার শেষে বলা যেতে পারে গল্পকার নজরুলের ছোটোগল্পের অভিনবত্বের ক্ষেত্রে কবিতাধর্মীতাও এক বিশেষ অভিনবত্বের সংযোজন।

তথ্যসূত্র :

১. গোপা দত্ত ভৌমিক, “গল্প উপন্যাসের পাঠ-প্রসঙ্গ”, ‘ছোটোগল্পের নজরুল ইসলাম’, বইমেলা, অবভাস, কলকাতা, ২০০৬, পৃ.৮৫-৮৬
২. তদেব, পৃ.৮৫
৩. তদেব, পৃ.৮৫
৪. তদেব, পৃ.৮৫
৫. তদেব, পৃ.৫৮
৬. তদেব, পৃ.৮৫

৭. নজরুল ইসলাম, “সঞ্চিতা”, ‘বিদ্রোহী’, চতুঃষষ্টিতমসং, ডি.এম,লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৪১৪২, পৃ.২
৮. গোপা দত্ত ভৌমিক, “গল্প উপন্যাসের পাঠ-প্রসঙ্গ”, ‘ছোটোগল্পের নজরুল ইসলাম’, বইমেলা, অবভাস, কলকাতা, ২০০৬, পৃ.৮৫-৮৬
৯. কাজী নজরুল ইসলাম, “নজরুলগল্প-সমগ্র”, সাহিত্যম্, কলিকাতা, পৃ.৯২
১০. নজরুল সংস্কৃতি পরিষদ, আবদুর রাকিব, “নজরুল-রচনার ভাষা-বিভাষা”, বর্ষ-২, সংখ্যা-২, ২০০৫, পৃ.৫২
১১. কাজী নজরুল ইসলাম, “নজরুল গল্প-সমগ্র”, সাহিত্যম্, কলিকাতা, পৃ.৯২
১২. নজরুল সংস্কৃতি পরিষদ, আবদুর রাকিব, “নজরুল-রচনার ভাষা-বিভাষা”, বর্ষ-২, সংখ্যা-২, ২০০৫, পৃ.৫৩
১৩. তদেব, পৃ.৫৩
১৪. তদেব, পৃ.৫৩
১৫. তদেব, পৃ.৫৩
১৬. তদেব, পৃ.৫৩
১৭. তদেব, পৃ.৫৩
১৮. তদেব, পৃ.৫৩
১৯. সুকুমার সেন, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড)’, চতুর্থ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃ.৩০০
২০. গোপা দত্ত ভৌমিক, “গল্প উপন্যাসের পাঠ-প্রসঙ্গ”, ‘ছোটোগল্পের নজরুল ইসলাম’, বইমেলা, অবভাস, কলকাতা, ২০০৬, পৃ.৮৬
২১. কোরক, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, “নজরুলের গল্প উপন্যাস”, কোরক সাহিত্য পত্রিকা নজরুল সংখ্যা, বইমেলা ১৪০৫, পৃ.১৪১
২২. তদেব, পৃ.১৪১
২৩. কাজী নজরুল ইসলাম, “নজরুল গল্প-সমগ্র”, সাহিত্যম্, কলিকাতা, পৃ.১২৪
২৪. তদেব, পৃ.৫
২৫. তদেব, পৃ.১০
২৬. গোপা দত্ত ভৌমিক, “গল্প উপন্যাসের পাঠ-প্রসঙ্গ”, ‘ছোটোগল্পের নজরুল ইসলাম’, বইমেলা, অবভাস, কলকাতা, ২০০৬, পৃ.৮৯
২৭. তদেব, পৃ.৮৯
২৮. কাজী নজরুল ইসলাম, “নজরুল গল্প-সমগ্র”, সাহিত্যম্, কলিকাতা, পৃ.২৩
২৯. শিশির কুমার দাশ, ‘গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব’, তৃতীয় সং, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ.৪৬
৩০. কাজী নজরুল ইসলাম, “নজরুল গল্প-সমগ্র”, সাহিত্যম্, কলিকাতা, পৃ.৯
৩১. তদেব, পৃ.৯

গ্রন্থঋণ—

১. কাজী নজরুল ইসলাম— নজরুল গল্প-সমগ্র
২. নজরুল ইসলাম— সঞ্চিতা
৩. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ— কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা
৪. শিশির কুমার দাশ— গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব
৫. পবিত্র সরকার— গদ্যরীতি পদ্যরীতি
৬. গোপা দত্ত ভৌমিক— গল্প উপন্যাসের পাঠ-প্রসঙ্গ

পত্রিকা—

১. নজরুল সংস্কৃতি পরিষদ পত্রিকা, ২য় ও ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০০৫
২. নজরুল সংস্কৃতি পরিষদ পত্রিকা, বর্ষ ২, সংখ্যা ২, ২০০৫
৩. জিজ্ঞাসা, বর্ষ২২, ২-৩ সংখ্যা
৪. কোরক সাহিত্য পত্রিকা নজরুল সংখ্যা, বইমেলা ১৪০৫

দিনলিপির প্রেক্ষিতে হার্ডি ও জীবনানন্দ : প্রভাব ও প্রেরণা

ঐন্দ্রিলা তেওয়ারী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ: সাল ১৯২৭। প্রকাশ পেল জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'। কিন্তু প্রকাশের ক্ষণকাল পরেই কবির উপলব্ধি এ-কাব্যের সুর যেন ঠিক তাঁর নিজের নয়, প্রভাবিত। আর তাই নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় ১৯২৮-২৯ এই পর্বে অর্থাৎ যখন তিনি লিটারারি নোটস বা দিনলিপি লিখছেন, পড়তে লাগলেন একের পর এক বিদেশি গল্প, কবিতা, উপন্যাস। সেই তালিকায় এলেন ভার্জিল, হুইটম্যান, কিটস্, শেলি, টমাস হার্ডি প্রমুখ স্বনামধন্য সাহিত্যিক। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপক হওয়ার সুবাদে এঁদের সৃষ্টির সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল তাঁর, এখন সেই জানাশনা আরও নিবিড় হতে লাগলো। আর সেসব সাহিত্যের সঙ্গে মিল খুঁজতে লাগলেন নিজের জীবনের নানা ঘটনার। তবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বারংবার টমাস হার্ডির উপন্যাস, গল্প ও কবিতার প্রতি তাঁর বিশেষ আসক্তি, যা খুব কমই আলোচিত হয়েছে। ভিক্টোরিয়ান যুগের এই বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্মই শুধু নয়, তাঁর দিনলিপির নাম লিটারারি নোটসও ঐ হার্ডির রোজনামচার অনুসরণেই দেওয়া।

টমাস হার্ডির (১৮৪০-১৯২৮) মৃত্যুর পরের বছরই জীবনানন্দ যখন তাঁর দিনলিপি লিখতে শুরু করেন, তখন শুরুর দিকের এন্ট্রিগুলোতেই (২,৩,৪,৫,৬) পর পর স্থান করে নিলেন হার্ডি। নিজের লেখালেখিকে মেলালেন হার্ডির গল্প, উপন্যাস ও কবিতার সঙ্গে। তাঁর 'ফর কনস্যান্স সেক', 'আলিসিয়াস্ ডায়ারি', 'অ্যান ইমাজিনেটিভ উওম্যান', 'এ ফিউ ক্রাস্টেড ক্যারেক্টারস' প্রভৃতি আখ্যান, যার বেশিরভাগের বিষয়বস্তু প্রেম, ভালোবাসা – এসবই এই কালপর্বে জীবনানন্দ পড়েছেন। মিল খুঁজে পেয়েছেন তাঁর প্রেমজীবনের সঙ্গে, যার কেন্দ্রে আছেন 'By/y'। আবার হার্ডির 'দ্য রিভিজিটেশন' 'দ্য ট্রাম্প উওম্যান্স ট্র্যাজেডি' প্রভৃতি কবিতা বিশেষভাবে প্রভাবিত করার পিছনেও ছিল সেই প্রেম নিয়ে দুঃখজনিত উপলব্ধি। জীবনানন্দের ব্যক্তিগত প্রেমের অচরিতার্থতা 'নির্জন স্বাক্ষর', 'সহজ', 'বোধ' কবিতা কিংবা 'কারুবাসনা'র মতো উপন্যাসে একইভাবে চিত্রিত হয়েছে। এছাড়াও মানবেতর প্রাণিদের প্রতি হার্ডির অনুরাগ জীবনানন্দ আত্মস্থ করেছেন, মনস্ক পাঠক তা লক্ষ করবেন। কবিতার মধ্যে 'আমি যদি হতাম', 'হাঁস', 'আবার আসিব ফিরে', 'মাছরাঙা' ইত্যাদির মধ্যে একাধিক পাখিরর প্রসঙ্গে যেমন এসেছে, তেমনি 'ক্যাম্পে', 'হরিণেরা', 'বেড়াল' এসব কবিতায় এসেছে প্রাণিদের কথা। আবার 'নিরুপম যাত্রা' গল্পেও এ প্রসঙ্গ আছে। আমরা 'মাল্যবান' উপন্যাসে বেড়াল ও পায়রার প্রসঙ্গও ভুলতে পারি না কখনোই। এরই পাশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে ভাঙতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হার্ডির 'এ লাওডিসিয়ান'

উপন্যাসে যেভাবে প্রকাশিত তার প্রত্যক্ষ ছায়া পড়েছে জীবনানন্দের 'কল্যাণী' উপন্যাসে। তাই লিটারারি নোটস্ সূত্রে হার্ডির উল্লেখ পেয়ে আমরা এভাবেই জীবনানন্দের উপর তাঁর প্রত্যক্ষ অভিঘাত খুঁজে নিতে পারি, যা অবশ্যই এক গুরুত্বপূর্ণ উন্মোচন বলেই মনে করি।

মূল শব্দসমূহ : লিটারারি নোটস বা দিনলিপি, জীবনানন্দ, হার্ডি, প্রেমজীবন, সামন্ততন্ত্র, প্রত্যক্ষ অভিঘাত

মূল প্রবন্ধ

সাল ১৯২৫, জুলাই মাস – "Memories Summer" নামে তিরিশের কবি জীবনানন্দ দাশ হঠাৎ-ই লিখতে শুরু করলেন তাঁর দিনলিপি বা রোজনামচা। কিন্তু তাঁর এই লেখার ধরন প্রকৃত দিনলিপির মতো ছিল না, ইংরেজি হরফে টানা গদ্যে মাত্র কয়েকটি পাতা লিখে তিনি এ দিনলিপির ইতি টেনেছিলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী ডায়েরি লিখলেও তার ধাত একদম আলাদা। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,কালিদাস নাগের ডায়েরি আরো অন্যরকম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জীবনস্মৃতি' লিখলেও সেই বইয়ে তিনি দিন তারিখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিছু লেখেন নি। কিন্তু জীবনানন্দ আবারও লিখতে শুরু করলেন 'লিটারারি নোটস' এপ্রিল ১৯২৯ থেকে। লিখলেন ১৯৪৮ পর্যন্ত। এরপর জীবনের বাকি যে ছয় বছর (১৯৫৪ পর্যন্ত) লিখেছিলেন তার বিশেষ কোনো সাহিত্যমূল্য নেই। সাধারণ কোনো কথা, হিসেবনিকেশ সেসব দিনলিপির অন্তর্ভুক্ত। তবে এসব কিছুর মধ্যে জীবনানন্দ-গবেষক ভূমেন্দ্র গুহ পাঠোদ্ধার করতে পেরেছেন মাত্র বছর খানেকের নোটস (এপ্রিল ১৯২৯ থেকে মার্চ ১৯৩০)। থিমস্ ('Themes') শিরোনাম সেখানে ১৩৬ টি এন্ট্রি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, জীবনানন্দ ১৯২৫ এর পর হঠাৎ ১৯২৯ এ 'লিটারারি নোটস্' আবারও লিখতে শুরু করলেন কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের পৌঁছে যেতে হয় ১৯২৭ সালে। ঐ সময় প্রকাশ পেল জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'। কিন্তু প্রকাশের ক্ষণকাল পরেই কবির উপলব্ধি এ-কাব্যের সুর যেন ঠিক তাঁর নিজের নয়, প্রভাবিত। আর তাই নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় ১৯২৮-২৯ : এই পর্বে অর্থাৎ যখন তিনি লিটারারি নোটস বা দিনলিপি লিখছেন, পড়তে লাগলেন একের পর এক বিদেশি গল্প, কবিতা, উপন্যাস। সেই তালিকায় এলেন ভার্জিল, হুইটম্যান, কিটস্, শেলি, টমাস হার্ডি প্রমুখ স্বনামধন্য সাহিত্যিক। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপক হওয়ার সুবাদে এঁদের সৃষ্টির সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল তাঁর, এখন সেই জানাশোনা আরও নিবিড় হতে লাগলো। আর সেসব সাহিত্যের সঙ্গে মিল খুঁজতে লাগলেন নিজের জীবনের নানা ঘটনার। তবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বারংবার টমাস হার্ডির উপন্যাস, গল্প ও কবিতার প্রতি তাঁর বিশেষ আসক্তি, যা খুব কমই আলোচিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভিক্টোরিয়ান যুগের এই বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্মই শুধু নয়, তাঁর দিনলিপির নাম লিটারারি নোটসও হার্ডির রোজনামচার অনুসরণেই দেওয়া।

অপূর্ণ প্রেমের বেদনা

টমাস হার্ডির (১৮৪০-১৯২৮) নামের সঙ্গে সাহিত্যের পাঠক মাত্রই সবিশেষ পরিচিত। ভিক্টোরীয় যুগের এই কবি ও কথাকার সমকাল থেকে উত্তরকালে বিশেষ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর লেখনী আঞ্চলিক সাহিত্যের ধারাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, একথাও বহু আলোচিত। ইংলণ্ডের ওয়েসেক্স বা সাসেক্স-কে কেন্দ্র করে তাঁর কবিতা-গল্প-উপন্যাসের কাহিনি-চরিত্র-ঘটনাবলী প্রবাহিত হয়েছে। নিছক স্থানিক বর্ণিমা নয়, ওয়েসেক্সের পটভূমি তাঁর রচনায় নিয়ন্ত্রী শক্তির ভূমিকায় পর্যবসিত হয়েছে। আধুনিক মনস্তত্ত্বের অন্তর্বাস্তবতা নিবিড়ভাবে চিত্রিত না হলেও গ্রিক নাট্যসুলভ এক বিষণ্ণতাবোধ, ট্র্যাজিক মহিমা তাঁর আখ্যানের মূল সুর। 'ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের নাম, এই নাম তাঁর সমস্ত আখ্যানের বিশিষ্টতাসূচকও বলা চলে। কারণ, ওয়েসেক্সের গ্রাম জীবনের প্রেক্ষাপটকে তিনি এমন ভাবে তাঁর আখ্যানের নর-নারীদের সঙ্গে মিলিয়েছেন যে তাদের প্রেম-ঈর্ষা-আকাঙ্ক্ষা সবই এক আদিম-উদাসীন প্রকৃতির প্রেক্ষিতে বারবার পরাজিত হয়। প্রকৃতি-সমাজ-মানুষ --- এই তিনের বিন্যাসে তাঁর উপন্যাসে এক দুর্জ্ঞেয় ইচ্ছাশক্তিকে জয়ী হতে দেখা যায়। সমালোচকেরা এর পিছনে হার্ডির দার্শনিক সংশয় ও নৈরাশ্যচেতনার কথা বলেন, যা শোপেনহাওয়ার, ডারউইন এবং গ্রিক নিয়তিবাদ প্রভাবিত। এর বাইরে আছে তাঁর কবিতা; সেখানেও বিষণ্ণতাবোধ, দার্শনিকতা, গ্রামজীবনের স্মৃতি এবং সমীপ সময় ছায়া ফেলে। এখন দেখা যাক হার্ডির মৃত্যুর ঠিক পরের বছর থেকেই কীভাবে জীবনানন্দের ১৯২৯ এর থিমস্-এ হার্ডি উঁকি দিয়েছে বারংবার। যেমন :

১৯২৯-এ জীবনানন্দের লিটারারি নোটস এ যে ১৩৬টা এন্ট্রি আছে তার একেবারে শুরুর দিকের এন্ট্রিগুলোতেই (২,৩,৪,৫,৬) স্থান করে নিয়েছেন হার্ডি। মূলত ঔপন্যাসিক হিসেবে বিশেষ পরিচিতি থাকলেও হার্ডি ছিলেন একাধারে ছোটগল্পকার অন্যদিকে কবিও। থিমসের শুরুতেই জীবনানন্দ দেখি তার একের পর এক ছোটগল্প-এর কথা লিখে রেখেছেন- 'ফর কনশ্যনস সেক' (২), 'আলিসিয়াস ডায়েরি' (৩) 'অ্যান ইমাজিনেটিভ ওম্যান' (৪), 'আ ফিউ ক্রাস্টেড ক্যারেকটারস' (৫), হঠাৎ এ গল্পগুলোই কেন তাঁকে প্রভাবিত করে তা দেখা যাক :

থিমস ২- জীবনানন্দ লিখেছেন For conscience sake গল্পটির কথা, আর গল্পটির প্রথম প্রকাশ ফোর্টনাইটলি রিভিয়্যু, ১৮৯১ মার্চ, গ্রন্থভুক্তি : লাইফস্ লিটল আয়রনিস, খ্রি. ১৮৯৪। (১)

গল্পটি মিস্টার মিলবোর্ন নামে এক অবিবাহিত ব্যাংকারকে নিয়ে লেখা এক অসম্পূর্ণ প্রেমের কাহিনী। মিলবোর্ন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর লন্ডনে ভাড়া বাড়িতে থাকে, প্রতিদিন ক্লাবে যায়। কিন্তু এসবের মাঝেও একটা অপরাধবোধ

প্রতিনিয়ত তাকে দগ্ধ করে। কুড়ি বছর আগে টেনবরো নামের একটা বাইরের ওয়েসেক্স শহরের লেওনোরা নামের এক তরুণীকে গান-বাজনার দোকানে দেখে মজেছিলেন এবং প্রেম নিবেদন করেছিলেন। মেয়েটিকে বিয়ে করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ও তার সুযোগও নিয়েছিলেন। যার ফলে নেওনোরা হয়ে পড়েন গর্ভবতী। এসব কিছু সত্ত্বেও তাঁর চাইতে নিচু ঘরের বলে মেয়েটিকে মিলবোর্ন ত্যাগ করেন। সেই স্মৃতি কুড়ি বছর পরেও তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত করে যায়। মিলবোর্নের ডাক্তার বন্ধু বিনডেন-এর পরামর্শ মত টাকা পাঠিয়ে অতীত শুধরে নেওয়ার পর একবার ভাবলেও পরমুহূর্তে মনে হয়েছে তাতে একজন সম্মানীয় মানুষ হবার সুখ বোধটা নেই। তাই তিনি অনুসন্ধান করতে লাগলেন তার অতীত প্রেমকে। খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছলেন এক্সেনবারিতে। যেখানে তিনি আবিষ্কার করলেন কন্যাসহ মিসেস ফ্রাঙ্কল্যান্ডকে (নেওনোরা ছদ্মনামে)। বেশ কিছুদিন পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলেন ফ্রাঙ্কল্যান্ডই নেওনোরা। এরপর মিলবোর্ন আর বেশি দেরি না করে বিয়ে করে ফেলেন প্রাক্তন প্রেমিকাকে। তারা এক্সেনবারি ছেড়ে বসবাস করতে শুরু করেন লন্ডনে। কিন্তু এতে মেয়ে ফ্রানসেসের অসুবিধা হতে থাকে। তখন তার প্রেমিক কোপ তাকে বিয়ে করা নিয়ে দ্বিধান্বিত হওয়ায় মিলবোর্ন মা ও মেয়েকে এক জায়গায় রেখে নিজে আলাদা বাস করতে শুরু করেন। তিনি লিখলেন, আমাদের খারাপ কাজগুলো বিগত দিনগুলোতেই শুধু বিচ্ছিন্ন হয়ে প'ড়ে থাকে না, অপেক্ষা করে থাকে উল্টে যাবার জন্য - অনেকটা : সঞ্চরণশীল উদ্ভিদের মতন তারা ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং নতুন করে শিকড় গজাতে থাকে যতক্ষণ না মূল কান্ডটা ধ্বংস করে দেয়, যাতে তাদের নিজেদের খুন হয়ে যাওয়ার উপরে আর কোনো বাস্তব প্রভাব ফেলতে না পারে। এরপর থেকে মিলবোর্ন বেশি করে মদ খেতে শুরু করেন কিন্তু কারোর পক্ষে ক্ষতিকারক হলেন না। কাজেই গল্প থেকে এটা বোঝা যায় নেওনোরা সামান্যভাবে সাংসারিক ও চিন্তাশীল মানসিকতার নারী হয়েও, অদূরদর্শী এবং সামাজিক প্রথামান্যতার অনুগত নারীই । আর এই 'প্রথামান্যতার অনুগত নারী' জীবনানন্দকে যেন আঘাত করেছিল, প্রেমের থেকে বড় হয়ে উঠেছিল সামাজিক দায়বদ্ধতা। কারণ ঠিক এই সময়েই কবির জীবনেও এসেছিল এক অবৈধ প্রেম, সেজোকাকা অতুলানন্দের মেয়ে শোভনা বা বেবি। ডায়েরির পাতায় একাধিকবার বেবি/ by/ y- এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও না পাওয়ার ব্যথা ছড়িয়ে আছে। মিলবোর্নের সঙ্গে তিনি যেন নিজের সম্ভাবনাহীন প্রেমের গল্পটা মেলাতে পেরেছিলেন। মিলবোর্নের ক্ষেত্রে বাধাটা ছিল মেয়ে ফ্রান্সেস, আর জীবনানন্দের ক্ষেত্রে বাধা ছিল সমাজ।

আবার তৃতীয় এন্ট্রি তে পাই -" Alicia's Diary= Idyll wh might have been="। (২) এটি হার্ডির ডায়েরির ঢঙে লেখা ছোটগল্প এবং "এ চেঞ্জ ম্যান এন্ড আদার টেলস "(১৯১৩) গ্রন্থভুক্ত। গল্পটি আবর্তিত হয়েছে অ্যালিসিয়া, তার বোন

ক্যারোলাইন এবং শার্ল দ্য লা ফেস্তে নামে এক ফরাসি চিত্রশিল্পীকে নিয়ে। ক্যারোলাইন মায়ের সঙ্গে ভার্সেই-এর কাছাকাছি এক জায়গায় বেড়াতে গেলে সেখানে সাক্ষাৎ হয় শার্ল-এর সঙ্গে। ক্রমে তাদের দুজনের সম্পর্ক গভীর হয়ে ওঠে ও তাদের বাগদানও হয়ে যায়, কিন্তু ক্যারোলাইনের মা-এর মারা যাওয়া তাদের বিয়েকে স্থগিত করে দেয়। ইতিমধ্যে শার্ল ইংল্যান্ড-এ আসে ও প্রেমে পড়ে আলিসিয়ার। তবে শেষ পর্যন্ত আলিসিয়ার জোড়াজুড়িতে ক্যারোলাইনকে শার্ল বিয়ে করলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেয় ক্যারোলাইন নয়, ভালোবাসেন তিনি আলিসিয়াকেই। এর সঙ্গে আরো যোগ করে, যে এই বিয়েটার ফলাফলের জন্য তিনি কিন্তু জবাব দিতে আসবেন না। আর যেমন বলা তেমনি কাজ, বিয়ের কয়েকঘন্টার মধ্যে কাছাকাছি একটা মাঠের নদীর জলে ভেসে ওঠে শার্ল-এর দেহ। কালক্রমে থিওফাইলাস হ্যাইআম ক্যারোলাইনের প্রেমাসক্ত হয়ে পড়লে দিদি আলিসিয়া ভাবে যে বোন ক্যারোলাইনকে ঠকিয়ে যে পাপ সে করেছে তারই খেসারত দিতে হচ্ছে তাকে।

হার্ডির ভালো গল্পের মধ্যে এটি পড়ে না। গল্পটি অতিমাত্রায় সেন্টিমেন্টাল ও মেলোড্রামাটিক। শিল্পী শার্ল চরিত্রটা গল্পে সেভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। হার্ডি নিজেও এ-বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন : "আ ডজন মাইনর নভেলস"। তবু জীবনানন্দের গল্পটা মনে ধরেছিল, কারণ কিন্তু সেই বেবি (By)। কবি আলিসিয়ার ভূমিকায় ‘By’ কে কল্পনা করে এক ধরনের মৃদু প্রতিহিংসার সুখ উপভোগ করেছিলেন হয়তো।

ডায়েরির চতুর্থ এন্ট্রিতেও হার্ডি -"Imaginative woman= Interlopers at the knaps"। (৩) জীবনানন্দ এখানে “অ্যান ইমাজিনেটিভ ওম্যান" এবং " ইন্টারলোপাস অট দ্য ন্যাপ " নামে দুটো ছোট গল্পের নাম পাশাপাশি লিখে রেখেছেন। প্রথম গল্পটির রচনাকাল ১৮৯৩, প্রথম প্রকাশ ঐ সালেরই সেপ্টেম্বর এ ‘মল মল’ ম্যাগাজিনে। শুরুতেই বলতে হয় গল্পটি একটি প্রেমের গল্প যেটি লেখা হয়েছে উইলিয়াম ও এলা মার্চ মিল নামে দম্পতিকে নিয়ে। উইলিয়ামের স্ত্রী এলা রবার্ট ট্রেউই নামে এক তরুণ কবির কবিতার প্রতি মুগ্ধ ছিল। ভাগ্যক্রমে দম্পতি যখন ওয়েসেকস থেকে সোলেন্‌টসী’তে (সাউথসী) বসবাস করবেন বলে মনস্থির করলেন তখন তারা বাড়ি ভাড়া হিসাবে পেলেন রবার্ট ট্রেউই-এর ছেড়ে যাওয়া ভাড়া ঘর দুটি। এলা নিজে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং সরস্বতীর উপাসক। ট্রেউইর মত না হলেও সে কবিতা লিখতো। ট্রেউইর ছেড়ে যাওয়া ঘরে সে আবিষ্কার করতে থাকল তার নানা বই, কবিতার পান্ডুলিপি,এমনকী দেওয়ালে আটকানো ট্রেউই-এর ছবি। ট্রেউই-এ মগ্ন এলা প্রায়শই তার দেওয়ালে আটকানো ছবির দিকে তাকিয়ে বসে থাকত এবং ভাবত কিভাবে ক্ষণিক সাক্ষাৎ হবে তার সঙ্গে। ইতিমধ্যে খবরের কাগজ জানান দেয় ট্রেউই আত্মহত্যা করেছেন, এবং তদন্তে তার এক চিঠি পড়ে বলা হয় -একজন মা, অথবা একজন বোন অথবা আর এক ধরনের একজন নারী বন্ধু, যিনি তাঁর প্রতি করুণার ভালোবাসায় নিবেদিত- তার জীবনে থাকত, তাহলে বেঁচে থাকার একটা কারণ তিনি

খুঁজে পেতেন। এবং সেই সঙ্গে এলা এও জানতে পারে তাঁর শেষ বইটার উৎস এরকম একজন কল্পনার নারীর স্বপ্ন থেকে পাওয়া প্রেরণার কথা শুনে এলা সংজ্ঞা লুপ্ত হয় এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে এক সময় মারা যায় তৃতীয় সন্তান প্রসব করতে গিয়ে। গল্পটি শেষ হয় এভাবে এলার সদ্য জন্মানো ছোট ছেলেটির সঙ্গে এলার স্বামী উইলিয়াম ট্রেউই এর সাদৃশ্য দেখে বলেন যে, হতভাগা ছোঁড়া, বেরিয়ে যা! তুই আমার কেউ নোস।

দ্বিতীয় গল্প 'ইন্টারলোপারস অ্যাট দ্য ন্যাপ' যেখান প্রধান চরিত্র চার্লস ডারটন নামে এক ভদ্রলোক চাষী। গল্পটি তার বিয়ে করার ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্তকে নিয়ে। তরুণ ডারটনের স্যালি হল-কে বিয়ে করার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে বিধবা হেলেনাকে। কিন্তু বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই হেলেনার মৃত্যু হলে সে পুনরায় স্যালিকে বিয়ে করতে চায় এর ভাবে, যেসব জিনিস ঢের দিন হল ভুল পথে চলে গিয়েছে তাদের আবার ঠিক পথে নিয়ে যাবেন, আর ক্ষণিক মোহের চাতুরিতে ভুল করবেন না।

এখন জীবনানন্দ হঠাৎ এই দুটো গল্প পড়লেন কেন? ডায়েরিতে তার এন্ট্রি ১৯২৯ এর এপ্রিল-মে। এসময় তার বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা চলছে, বিয়ে করবেন তিনি ১৯৩০ এর ৯ই মে। যে-কোনও সংবেদনশীল মানুষকে বিয়ের আগে যেসব দুশ্চিন্তা উৎপীড়িত করে জীবনানন্দকেও তা করছে। এলার মতো একজন কল্পনাপ্রবণ মানুষ যদি কপালে জুটত তার ভালো হতো, কিন্তু এ তো রক্তমাংসের নারী নয়, তরুণ কবি ট্রেউই এলাকে পেয়েছিলেন স্বপ্নের ভিতর আর এই এলাও ট্রেউই দুজনেরই উৎস টমাস হার্ডির মস্তিষ্ক, মাটিপৃথিবী নয়। আর দ্বিতীয় গল্পে 'ক্ষণিক মোহের একটা চাতুরী' সমগ্র গল্পটাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। আর জীবানন্দের জীবনেও এই পর্বে By/ y কে ঘিরে এরকমই একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তাই হার্ডির এই দুটো গল্পকেই তিনি কোথাও একটা মেলাতে পেরেছিলেন নিজের জীবনের সঙ্গে।

মানবেতর প্রাণী : সপ্রেম দয়া

জীবনান্দের সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছিল মানবেতর প্রাণীর প্রতি হার্ডির ভালোবাসা। বিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্য পশুহত্যার বিরোধিতা করে যেসব মিটিং করতেন হার্ডির প্রথমা স্ত্রী এমা, তাদের কাগজপত্র লুকিয়ে পড়তেন হার্ডি এবং শিউরে উঠতেন। এ-প্রসঙ্গে ভূমেন্দ্র গুহ জানিয়েছেন - "সারাদিন গাড়ি টানতে টানতে যে ঘোড়াটার মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে আসছে, তার চোখে তিনি দেখেছেন ঘৃণা, হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর মজুর অথবা সেনা দাউনির কসরত করে বেরিয়ে আসা নীচু বর্গের সেনানী, মনে হয়েছে তাঁর ঘোড়াটা এদের গোত্রেই পড়ে। যে জিনিসটাকে তিনি বলেছেন প্রাথমিক সদাচার 'সপ্রেম দয়া'- তাকে তিনি সর্বদা উঁচু সম্মান দিয়ে এসেছেন, এমনকী যে ভদ্রলোক নিয়ম মেনে একটা আচারের মতন করে মেনে তাঁর কুকুরটিকে

রোজ রাস্তায় নিয়ে যান হালকা হওয়ার জন্য তিনিও তাঁর কাছে নমস্য।' (৪) গায়ক পাখিরা এসে তাদের কন্ঠ দান করে এবং মানুষের সঙ্কটের সময়ের শিকার হয; কখনও বা মানবিক আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, তিনি মনে করতেন। হার্ডি দাবি করেছেন, তাঁর ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে তিনি গণ্য হোন অথবা না হোন, তাঁকে যেন সেরকম মানুষ হিসেবে মনে রাখা হয়, যিনি মনুষ্যেতর প্রাণিদের সহৃদয়তা বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে ছিলেন। বাস্তব জীবনেও হার্ডি কুকুর, বেড়াল, খরগোশ এসব পরিবেষ্টিত হয়ে বাস করতেন। অন্ততপক্ষে আটটা বেড়াল তাঁর ম্যাক্স গেটের বাড়িতে ছিল। বাইরের বেড়ালদের ডেকে তিনি টি পার্টি দিতেন প্রায়ই। বাচ্চা খরগোশ তার বাড়ির বাগান চেটেপুটে খেয়ে ফেললেও মালির খরগোশকে খাঁচায় ঢোকানোর উপায় ছিল না হার্ডির স্নেহবশতার কারণে। হার্ডির দ্বিতীয় স্ত্রী ফ্লোরেস একটা এডোয়ার্ড ৭ টেরিয়ার নিয়ে এসেছিলেন বাড়িতে, হার্ডি তার নাম দিয়েছিলেন 'ওয়েসেক্স' (নিজের প্রথম কবিতার বই ও প্রথম গল্পের বইটির নাম দুটোর সঙ্গে মিলিয়ে)। এই ওয়েসেক্স হার্ডির এতটাই প্রিয় ছিলো যে তিনি কাউকে তার গায়ের লোম পর্যন্ত ছাঁটতে দিতেন না। ১৯২৬-এ ওয়েসেক্সের মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টির আড়ম্বর ছিল রাজকীয়। তবে এখানেই শেষ নয় তার মৃত্যুকে নিয়ে লিখলেন চার স্তবকের একটি কবিতাও "ডেড ওয়েসেক্স দ্য ডগ টু দ্য হাউসহোল্ড"- যেটার দুটি স্তবক প্রথমে ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় এবং পরে(১৯২৮) চার স্তবকের সম্পূর্ণ কবিতাটি 'উইনটার ওয়ার্ডস' বইটায় সংকলিত হয়। কবিতাটায় কতক সাদা ঝাঁকড়া চুলের টেরিয়ার কুকুর ওয়েসেক্স উদ্দিষ্ট বাড়ির বেদনা বিধুর মানুষজন কি তাকে মিস করছেন তা নিয়ে। তবে শুধু মৃত্যুর পরেই নয় জীবিত অবস্থাতেও তাকে নিয়ে লেখা হয়েছে একাধিক কবিতা, যেমন -"A popular person at home" ইত্যাদি। রানী ভিক্টোরিয়ার মতো একটা কবরখানা বানিয়েছিলেন হার্ডি, সমাধি ফলকের ব্যবস্থাসহ, পোষ্যদের জন্য এমনই ছিল তাঁর সপ্রেম দয়া।

হার্ডি-প্রাণিত জীবনানন্দও নিজের বিভিন্ন কবিতায়, গল্পে এনেছেন নানা পশু-পাখিদের কথা, ডায়েরির বিভিন্ন এন্ট্রিতে তিনি তার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। ১৯২৯-এ যে লিটারারি নোটস তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন, সেই থিমসের ৩৮নং এন্ট্রিটি এরকম ' পেঁচা-হাঁস-হায়না (nights)'। (৫) এই পর্বে লেখা 'ধূসর পান্ডুলিপি' কাব্যের একাধিক কবিতায় বিভিন্ন পাখির যেমন অনুষঙ্গ এসেছে, তেমনই পেঁচার প্রসঙ্গ এসেছে একাধিকবার। পেঁচা এখানে যথার্থই পাঠকের কাছে হয়ে উঠেছে কবিতার পাখি, প্রিয় পাখি, জীবনানন্দের পাখি। পেঁচার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে হৈমন্তিক জীবনদর্শন। তাঁর একাধিক কবিতায় পেঁচার (মাঠের গল্প, অবসরের গান, মৃত্যুর আগে) উল্লেখ পাওয়া গেলেও সবচেয়ে স্মরণীয় 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় পেঁচার উপস্থিতি। সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি কে ভুলতে পারে?

থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে

বলে নি কি! 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার! –
ধরা যাক কয়েকটা ইঁদুর এবার!'
জানায়নি পেঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার? (আট বছর আগের একদিন / মহাপৃথিবী) (৬)

পেঁচা ছাড়াও চিল, বুনোহাঁস, শালিখ, বক, দোয়েল, শকুন, পায়রার উল্লেখ তাঁর কবিতায় এসেছে বহুবার। জীবনানন্দের কবিতায় প্যাঁচা যদি অন্ধকার ও কবির সমাজবিচ্যুতি বিযুক্তির দোতক হয়, হাঁস তাহলে আলো, যা দয়া-মায়া-ভালোবাসার উদ্দেশ্যে কবির অভিযাত্রাকে বোঝায় (প্রসঙ্গত, আইরিশ কবি ইয়েটসের 'ওয়াইল্ড সোয়ানস্ অ্যাট কুলে' মনে পড়তে পারে আমাদের)। পাখির পাশাপাশি পশুর উল্লেখও রয়েছে জীবনানন্দে। এন্ট্রিতে হায়নার কথা উঠে এলেও হরিণ, চিতা, সিংহ, বেড়াল তাঁর কাব্যে প্রিয় পশু হিসেবে অবস্থান করেছে (বিখ্যাত স্যুররিয়াল কবিতা 'বেড়াল'-এর কথা আমরা জানি)। 'লিটারারি নোটস' লেখাকালীন সময় রচিত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা 'ক্যাম্পে' তে আগাগোড়াই হরিণের অনুষঙ্গ এসেছে, কখনো ঘাই হরিণী, ঘাই মৃগ, পুরুষ হরিণ ইত্যাদি নানা রূপে। এছাড়া 'হরিণেরা', 'শিকার' এসব কবিতার কথাও আমাদের জানা।

এবার আসা যাক গল্পে মানবেতর প্রাণীর কথায়। জীবনানন্দের 'নিরুপম যাত্রা' (রচনা ১৯৩৩) নামে একটি গল্প আছে। যে গল্পটার একটি প্রধান চরিত্র একটা ঘেয়ো উপোসী খোঁড়া রাস্তার কুকুর : কেতু। গল্পের নায়ক প্রভাত যে চাকরির সন্ধানে দীর্ঘকাল আছে কলকাতায়, তারই দেশের বাড়িতে আছে এই কুকুরটি। গল্পে প্রভাতের মা, স্ত্রী, ছেলে খোকার কথা যেমন এসেছে তেমনি বারে বারে এসেছে কেতুর কথাও। বাড়ির কথা ভাবতে ভাবতে তার মনে হয় কেতুর কথা, রাগের বশে সে বাচ্চা কেতুকে ছুঁড়ে ফেলায় তার পা ভেঙে যায়, সেই অনুতাপ আজও প্রভাতকে দগ্ধ করে। কেতু যেন মাঝে মাঝে এ মেসের কামরার ভিতর থেকে প্রভাতকে টানে - কি যেন বোবার কথা জানতে আসে। প্রভাত তাকে খুঁজেই চলে মনে মনে। গল্পের আর এক চরিত্র সমীরের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রভাত বলেছে এক মোক্ষম কথা - 'প্রেম বলতে তোমরা নর-নারীর নানা রকম সম্পর্ক বোঝ - কী বলো সমীর? কিন্তু আমি ঢের জিনিস বুঝি - স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক শুধু নয়, দেশের মাঠ,পথ, সেই ইস্কুলের বাড়ি, অশ্বত্থ গাছটা, খোকা বা কেতু।' (৭) অর্থাৎ প্রেমকে এখানে বৃহৎ অর্থে বোঝাতে গিয়ে মানবেতর প্রাণী অর্থাৎ কেতুরও স্থান দিয়েছে প্রভাত। সম্ভবত প্রিয় কুকুর ওয়েসেক্সের প্রতি হার্ডির অসম্ভব ভালোবাসা জীবনানন্দকেও প্রভাবিত করেছিলো। এছাড়াও 'মাল্যবান' (১৯৪৮) উপন্যাসে বেড়াল ও পায়রার উপস্থিতি অতৃপ্ত যৌনতা, ক্ষোভ ও যন্ত্রণার চিহ্নায়ক।

সামন্ততন্ত্রের ফসিল

হার্ডি বিষয়ক জীবনানন্দের লিটারারি নোটসের শেষ এন্ট্রিটি হল ১১৩ নং এন্ট্রিটি। সেখানে তিনি লিখেছেন,

' - These pictures (Hardy)'। (৮) হার্ডির একটা উপন্যাস আছে, তিনখন্ডে, ‘আ লাওডিসিয়ান’ (খ্রি ১৮৮১); সম্ভবত এই উপন্যাসটির কথা মনে করেছেন জীবনানন্দ। উপন্যাসটার শুরু ছবির গ্যালারি দিয়ে, শেষও ছবির গ্যালারি দিয়ে। মধ্যবর্তীতে গল্পটার টানাপোড়েনে নানা রকম ছবির ভূমিকা। জীবনানন্দের নজর ছিল দীর্ঘ গ্যালারির সারিবদ্ধ ছবিদের দিকে যারা অন্তমুখী সামন্ততন্ত্রের প্রতীক, যারা শেষ পর্যন্ত পুড়ে গিয়েছে। সমাজদার্শনিক জিয়ামবাতিস্তা ভিকো (১৬৮৮-১৭৪৪)-র তত্ত্ব অনুসারে যে-কোনো সামন্ততন্ত্র নিজের বিনাশের যে বীজ নিজেই ধারণ করে, যাদের তিনি দেখিয়েছিলেন তাঁদের প্রতিবেশী দোর্দন্ডপ্রতাপ জমিদার রায়চৌধুরীদের প্রাসাদের সভাঘরে অর্থাৎ তাঁর 'কল্যাণী' উপন্যাসে কল্যাণীর পিতৃগৃহে। হার্ডির পলা কুচক্রী ডেয়ারকে প্রত্যাখ্যান করে সৎ সমারসেটকেই জীবনসঙ্গী করেছে। সে এইভাবে নিজের জীবন বাঁচাতে পারলেও কল্যাণী কিন্তু রক্ষা করতে পারেনি নিজেকে। প্রতারক চন্দ্রমোহনকে বিয়ে করেছে সে এবং তার জান্তব লালসার শিকার হয়ে সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এছাড়াও আছে জমিদারতন্ত্রের পতনের ব্যাপারটি। হার্ডির উপন্যাসে পলা ও সমারসেটের চোখের সামনে পুড়ে যায় স্ট্যানচি ক্যাসেল, পুড়ে যায় পুরোনো আসবাব, আর সেই সঙ্গে জ্বলতে থাকে প্রাসাদের আগের মালিকদের গ্যালারিতে ঝুলতে থাকা ছবিদের স্কেচ। সামন্ততন্ত্রের ফসিলটাকে দূর থেকে আগুনের আভায় শেষ হতে দেখলেন পলা। 'কল্যাণী' তেও জমিদারী পুড়ে ছারখার হয়ে না গেলেও অর্থের অভাবে তা দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় ধ্বংসেরই মুখে। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে সে কথা জানিয়ে - 'রায়চৌধুরী মশাই নানারকম কথা ভাবছিলেন: প্রথমত জমিদারীটা কোর্ট অব ওয়ার্ডসে দিলে কেমন হয়'। (৯) অর্থাৎ একটাতে সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হয়ে গেল আর একটায় ধ্বংসের মুখে। ‘দেশ’ পত্রিকায় ১৯৯৮ সালে এই উপন্যাস প্রকাশ পেলে আমাদের কাছে একটি শিক্ষিত, স্বাধীন মেয়ের অসুন্দরের হাতে সমর্পণের ছবিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, কিন্তু দিনলিপি ও হার্ডির সূত্রে এই পাঠ নিঃসন্দেহে ভিন্ন আস্বাদ এনে দেয় আমাদের মনে।

দুঃখ পাওয়ার প্রতিভা

কথাসাহিত্যের বাইরে হার্ডির কিছু কবিতার কথাও জীবনানন্দের ডায়েরিতে স্থান পেয়েছে আমরা দেখতে পাই। থিমসের ২১ নম্বর এন্ট্রি '-Revisitation (Hardy) (১০) অর্থাৎ, হার্ডির 'The Revisitation' কবিতার কথা কবি বলেছেন এখানে। 'টাইমস লাফিংস্টকস এন্ড আদার ভার্সেস' (১৯০৯) বইতে কবিতাটা আছে। হার্ডি সেভাবে রাত্রির দৃশ্য এ কবিতায় এঁকেছেন। এমন জীবন্ত, প্রাণবন্ত উপস্থাপনা তার আর কোনো কবিতায় দেখা যায় না। তবে শুধু এ কবিতায় নয়, কবির দুঃখ পাওয়ার প্রতিভা

'দ্য ট্রাম্প উওম্যানস ট্রাজেডি' কবিতায় এসে সর্বাধিক পরিণতি পেয়েছে, সম্ভবত হার্ডির শ্রেষ্ঠ লিরিক গুলোর মধ্যে এটা একটা। জীবনানন্দের কবিতায় এই অপূর্ণ প্রেমের বেদনাজনিত দুঃখবোধের হদিশ মেলে এই পর্বে লেখা কবিতায়, যা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬) বা 'বনলতা সেন' (১৯৪২)-তে অন্তর্ভুক্ত হয় পরবর্তীকালে। 'নির্জন স্বাক্ষর', 'বোধ', '১৩৩৩' 'সহজ', 'হায় চিল' ইত্যাদি কবিতা এ-প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে : 'পৃথিবীর সব রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে'। আবার ১৯২৯ এর লিটারারি নোটসে ১৪নং এন্ট্রি -'Discontent after death'। (১১) এই পর্বে হার্ডিতে নিবিষ্ট জীবনানন্দের এ এন্ট্রির কারন খুব সম্ভবত তাঁর ' আহ, আর ইউ ডিগিং অন মাই গ্রেভ '(Ah, Are You Digging On My Grave) কবিতাটা যেটি তাঁর (হার্ডির) 'স্যাটায়ার্স অফ সারকামস্ট্যানসেস' (খ্রি ১৯১৪) কবিতার অন্তর্গত। কবরে থাকা এক মৃত মহিলার ' ডিসকনটেন্ট ' অথবা ক্ষোভ উন্মুখর হয়েছে এ কবিতায়। মৃত মহিলাটি বিশ্বাস করেছেন তাঁর কোনো প্রিয়জন রয়েছে তার কবরের পাশে। কিন্তু একরাশ হতাশার ভেতর দিয়ে গিয়ে সে বুঝতে পারে যে, তাঁর বিশ্বাসটা ভুল। তাঁর মৃত্যুর পর নতুন ধনী স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে বেরোনো স্বামীর মনে কোনোই অপরাধবোধ কাজ করে না। এমনকি তাঁর পোষা কুকুরটিও ঐ কবরটিকে হাড় রাখার জায়গা হিসেবেই দেখে। মৃত্যু যে কত কঠিন ও নির্মম এখানে বোঝান হার্ডি। জীবনানন্দের কবিতায় মৃত্যুচেতনার বিশিষ্টতার কথা আমরা সকলেই জানি, 'পিরামিড', 'বৈতরণী', 'মৃত্যুর আগে' 'আট বছর আগের একদিন' ইত্যাদি বহু কবিতায় মৃত্যুকে তিনি নানাভাবে দেখেছেন। সমীপ সময়ের কবিতা হলেও এক্ষেত্রে হার্ডির প্রভাব তেমন গভীর বলে মনে হয় না। অতএব লিটারারি নোটসের সাক্ষ্য মেনে দেখা যায়, জীবনানন্দ নানাভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন হার্ডির দ্বারা।।

উল্লেখসূত্র:

১) জীবনানন্দ দাশ : দিনলিপি / লিটারারি নোটস ১ (ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১১২

২) ঐ, পৃ. ১১৬

৩) ঐ, পৃ. ১১৯

৪) জীবনানন্দ দাশ : দিনলিপি / লিটারারি নোটস ২ (ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৪৯৮

৫) ঐ, পৃ. ৪৯৭

৬) জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), দে'জ, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১০৭

৭) জীবনানন্দ দাশ, ৫০টি গল্প, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৫৩৭

৮) জীবনানন্দ দাশ : দিনলিপি / লিটারারি নোটস ৩ (ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১০২৬

৯) জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র (দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), গতিধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ. ২৯

১০) জীবনানন্দ দাশ : দিনলিপি / লিটারারি নোটস ১ (ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৪০৭

১১) জীবনানন্দ দাশ : দিনলিপি / লিটারারি নোটস ১ (ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৪২৫

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

জীবনানন্দ দাশ : দিনলিপি / লিটারারি নোটস ১,২,৩,৪ (ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত), প্রতিক্ষণ, কলকাতা, ২০০৯

জীবনানন্দ দাশ, ৫০টি গল্প, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬

জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ (দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৩

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র (দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), গতিধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০০

সহায়ক গ্রন্থ

কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১৫

গৌতম মিত্র, পাণ্ডুলিপি থেকে ডায়েরি : জীবনানন্দের খোঁজে (১-২), ঋত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯-২০

তরুণ মুখোপাধ্যায়, জীবনানন্দ : শ্রাবস্তীর কারুকার্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪

পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত, জীবনানন্দ : বিভিন্ন কোরাস, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০০

মঞ্জুভাষ মিত্র, জীবনানন্দ দাশ : কবিতার কারুকার্য, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৮

মনসামঙ্গল কাব্যে হাসান -হুসেন পালা: বিভেদ অতিক্রামী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দলিল

মিজানুর মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: আমরা জানি বাঙালি একটি মিশ্র জাতি। অস্ট্রিক, ভোটচিনীয়, আর্য, দ্রাবিড় প্রভৃতির সমন্বিত রূপ। উত্তরকালে আরবীয়ান, আফ্রিকান জাতি সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে বাঙালি জাতির সঙ্গে। বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে বাঙালি সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু তার নিজস্ব একটা রূপ আছে। ভারতের অপরাপর ভারতীয় জাতির সাপেক্ষে বাঙালি জাতির সঙ্গে সহজে অনুধাবন করা যায়। বাঙালির প্রথম রূপ হিসাবে দেখা যায় সাংস্কৃতিক সমন্বয়।

অর্থাৎ আমরা বলবার চেষ্টা করছি যে, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ চিরকাল বিদেশি, বিজাতি বিজিত দেশ। এদেশের মানুষ কখন নিজের মেজাজে আত্মবিকাশের সহজ ও স্বাভাবিক পথ পায়নি। আমরা পূর্বেই বলেছি এখানে দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি জনজাতির সঙ্গে মিশেছে আর্য, মঙ্গলীয় জাতির মানুষ। তাই আমদের সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি ছিল পরমসহিষ্ণু। আমাদের বাঙালি জাতি সম্পর্কেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। এবং তার ফলে বাঙালি সংস্কৃতিতেও রয়েছে মিশ্রণ। সংস্কৃতি যদি বহুধারার মিশ্র রূপ হয় তাহলে তা সাহিত্যকে প্রভাবিত করবে। সেটাই এখন আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়।

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানেও এই উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে খ্রীষ্টানের কথা নাই; কিন্তু, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ধর্ম সমান শ্রদ্ধার যোগ্য, ঈশ্বর হিন্দুকে ও মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখেন, পুরাণ ও কোরানের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য এক -- এইরূপ উক্তি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায় । বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করবার চেষ্টা করব প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধর্মসমন্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

মূলশব্দ: মঙ্গলকাব্য, ধর্মসমন্বয়, সম্প্রীতি, হাসান-হুসেন, সংস্কৃতি।

মূল আলোচনা:

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কি অভিযানের অব্যবহিত পরে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ্য কর্তৃক জর্জরিত নিম্নবর্ণের অবহেলিত হিন্দুরা ইসলামধর্মের সাম্যবাদের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হয়। নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কারণে বাংলার সমাজজীবন ছিল সমস্যা জর্জরিত। সমাজে এইসময় হিন্দু- মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক কোন সৌহার্দ্যের

সম্পর্ক ছিলনা। নানা কারণে এই দুই সম্প্রদায় ছিল পরস্পর বিরোধী। তাদের পরস্পরের সংস্কৃতি, দর্শন, আচার ও ব্যবহারের মধ্যে ছিল বিস্তর পার্থক্য। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন সম্পর্ক ছিল শাসিত ও শাসকের। ধর্মের দিক থেকেও একদল নিরাকার, অন্যদল সাকার। একদল একেশ্বরবাদ অন্যদল বহু দেবতাবাদে বিশ্বাসী। ফলত এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা- বিদ্বেষ, বিরোধ- সংঘাত ছিল। গোপাল হালদার জানিয়েছেন-

> 'বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে হিন্দুর ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জীবন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো। রাজশক্তি হারিয়ে হিন্দু সমাজ প্রাণপণ প্রয়াসে আপনার ধর্ম-সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরলো, তার সহায়তায় আপনার সমাজকে সংরক্ষণ করতে চাইল। এই ভাব গ্রহণ করলেন স্বভাবত হিন্দু উচ্চবর্ণ, বিশেষ করে স্মার্ত পণ্ডিতেরা। তাঁরা সমাজকে আরও সংকীর্ণ অ-নমনীয় আরও সংরক্ষণশীল ও বর্জনশীল করে সংশোধিত করলেন। প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে প্রত্যেক বর্ণের ব্যবধান তখন থেকে আরো দুস্তর হয়ে গেল, আচার-বিচারের আর কোনো উদারতা রইল না।'[১]

পরবর্তীতে ১৩৪২ খ্রিঃ এ সামসুদ্দীন ইলিয়াসশাহ বাংলার স্বাধীন সুলতান রাজ্য স্থাপিত করলে দেশ অনেকটা ঐক্যবদ্ধ এবং রাষ্ট্রনৈতিক অশান্তি দূরীভূত হল। এই সময়ে আবার নতুন করে জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভবনা দেখা দিল। আর উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজ উপলব্ধি করলেন বাইরের শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে নিম্নবর্ণের সঙ্গে একটা আপোষ দরকার । ফলে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে সংযোগ সাধনের চেষ্টা লক্ষ্য করা গেল । নিম্নবর্ণের পূজিত দেবতাগণ উচ্চবর্ণের দ্বারা সমাদৃত হলেন। যে অনার্য দেব – দেবীরা উচ্চস্তরে স্থান পেয়ে মঙ্গলদেবী রূপে পরিচিত হলেন, তাঁদেরই নিয়ে রচিত ও প্রচারিত মাহাত্ম্যমূলক কাব্যই হল মঙ্গলকাব্য।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ চিরকাল ছিল বিদেশি, বিজাতি শাসিত দেশ। এদেশের মানুষ কখন নিজের মেজাজে আত্মবিকাশের সজহ ও স্বাভাবিক পথ পায়নি। এখানে দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি জনজাতির সঙ্গে মিশেছে আর্য মঙ্গলীয় জাতির মানুষ। তাই আমাদের সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি পরমসহিষ্ণু। পরধর্মসহিষ্ণুতা ভারতবর্ষের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। 'প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে ধর্ম্মসমন্বয়' প্রবন্ধে শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন-

> 'পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা হিন্দুর সনাতন চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। হিন্দু কেবল পরধর্ম্মসহিঞ্চুতা লইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই ; নিজের এবং পরের ধর্ম্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা হিন্দুই জগতে প্রথম প্রদর্শন করিয়াছে। অন্য ধর্ম্মের প্রতি হিন্দুর এই অকৃত্রিম ও অত্যধিক উদারতার সুবিধা লইয়া অন্য ধর্মাবলম্বীরা একাধিক স্থলে উপকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরই আধিপত্য

> বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে প্রাচীন কালে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচার সম্ভব হইত না, যদি না হিন্দু রাজারা ও সমাজের নেতারা সেন্ট জেভিয়ার (St. Xavier) প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকগণকে অবাধে কাজ করিযায় সুবিধা দিতেন। গৌড়দেশ তুর্কী কর্তৃক বিজয়ের পূর্ব্বেই, মুসলমান ধর্মপ্রচারকদিগের তথায় আগমন ও প্রতিষ্ঠা লাভ ঐতিহাসিক সত্য (সেখ শুভোদয়া গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। মোপলাদিগের ইতিহাস, গুজরাটরাজ দাহিরের রাজ্যে আরবগণের বাণিজ্য ইত্যাদি ঘটনা পরধর্ম্মের প্রতি হিন্দুর উদারতার ঐতিহাসিক প্রমাণ। হিন্দুধর্ম্মের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ মহারাজ পৃথ্বীরাজের রাজ্যে বসিয়া খাজা মৈনুদ্দীন চিশতির ইসলাম প্রচারও এই ব্যাপারের অন্যতম প্রমাণ।'[২]

সমাজের ভিত্তি ভূমির উপর নির্ভর করেই সাহিত্য রচিত হয়। ফলত সাহিত্যে অনিবার্য ভাবেই এসে পরে সমাজ জীবনের নানা কথা। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির কথা বিভিন্ন ধারায় যেমন- মঙ্গলকাব্য, ইসলামি সাহিত্য, গীতিকার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানেও এই উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে খ্রীষ্টানের কথা নাই; কিন্তু, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ধর্ম সমান শ্রদ্ধার যোগ্য, ঈশ্বর হিন্দুকে ও মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখেন, পুরাণ ও কোরানের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য এক -- এইরূপ উক্তি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায় । বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করবার চেষ্টা করব প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধর্মসমন্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

প্রথমেই যদি আমরা নারায়ণ দেবের কাব্য পর্যালোচনা করি তাহলে লক্ষ করব যে, নারায়ণ দেবের কাব্যে মুসলমান প্রসঙ্গ অতিসংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে। বিজয় গুপ্ত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে হাসন- হোসেন পালা বলে একটি পৃথক পালা পরিলক্ষিত হয়। আর দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে হাসন- হোসেন পালার নাম হয়েছে কাজির বিড়ম্বনা। উক্ত পালায় লক্ষ করা যায় হাসন- হোসেন দুই ভাই। তারা ধর্মে মুসলমান। তাদের রাজ্য হাসনহাটি। আলোচ্য পালায় মনসা পূজক রাখালবালকদের সঙ্গে মুসলমান কাজি ও তাঁর অনুগামীদের মনসা বিদ্বেষ, বিবাদের চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু নারায়ণ দেবের কাব্যে হাসান- হোসেন পালার বিস্তৃত বর্ণনা নেই। শুধুমাত্র কয়েক স্থানে সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগরের স্বদেশ প্রত্যাগমন অংশে লক্ষ করা যায় পুত্র লক্ষ্মীন্দরকে বিবাহ করিয়ে বণিক চন্দ্রধর শ্রীঘ্র স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কারণ সম্বন্ধে সাহে রাজার নিকট বলেছে-

'চান্দো বলে বেহাই সুন আমার উত্তর।
বিদায় পাইলে আমি জাই আপন ঘর।।

হুসেন হাসনের নিকটে আমার পুরি।
না জানি রাজ্যেত কীবা হইল ডাকা চুরি।।'[৩]

তুর্কি আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় জনজীবন। তৎকালীন সময় ছিল চুরি, ডাকাতির, মানুষের বিপন্নতা, ভয়, আতঙ্ক আর নিরাপত্তাহীনতা। আর এর দায় ছিল যেন হাসান-হোসেনের। তাই চন্দ্রধরের মনে এত শঙ্কা। তবে শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত উক্ত অংশের রচনা নারায়ণ দেবের নয় বলে মনে করেছেন। তিনি বলেছেন-'হাসন-হুসেনের যে সব উল্লেখ নারায়ণ দেবের পুথিতে পাওয়া যায়, তাহা যে অনেক পরবর্তী গায়কগণ ও লেখকগণ কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছে। সুতরাং প্রক্ষিপ্ত, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।'[৪]

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে 'কাজীর সহিত যুদ্ধ' অংশে মুসলমান সমাজ জীবনের পরিচয় দিয়েছেন। কাজির এলাকায় মনসার অত্যাচার বর্ণনায় কবি কাজির সংসার জীবনের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। কাজির তিন পত্নী নিয়ে সংসার। এছাড়াও আছে এক ঝি দাসী। তিন তিনটি স্ত্রীর মৃত্যু অপেক্ষা দাসীর মৃত্যু কাজির হৃদয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি বেদনা সৃষ্টি করেছে-

'মরিল দুলাল বান্দী তাহার লাগি কান্দে কাজী
স্মরণে রহিল তাহার কথা।
আরে সবে জত কান্দি তাহার সার জত বান্দী
এহার সম পাকানী নাহি এথা।।'[৫]

বিজয় গুপ্তের কাব্যে লক্ষ করা যায় কাজির দুই পুত্র হাসান- হুসেন। কাজির পুত্র বলে তাদের মধ্যে অহঙ্কার ছিল। শুধু তাই নয় তারা ছিল অত্যাচারী, মহাদুরন্ত এবং ধর্ম কর্ম বেদের সর্বত্র নিন্দা রটিয়ে বেড়াত। কাজির শালা আবদুল্লাহও ছিল অত্যাচারী। তার ভয়ে হিন্দুগণ সর্বত্র ত্রাস হয়ে থাকত। এবং ব্রাহ্মণের অপমান করাই ছিল প্রধান কর্ম-

'পরের মারিতে পরের নাহি বেথা।
চোপড় চাপড় মারে আর ঘাড়গাতা।।
ব্রাহ্মণে অপমান করে পৈতা পাইয়া কান্ধে।
প্যাদা সকলে তারা হাতে গলে বান্ধে।।'[৬]

অন্যদিকে সমাজে নিত্য মনসার পূজা বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাখাল বালকেরা মনসার পূজা করে। রাখালেরা মনসা পূজা করার অপরাধে তাদের ঘট ভেঙে দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় রাখালেরা সকলে জোটবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তারাও মোল্লাদের ওপর পাল্টা পীড়ন শুরু করে। উপায় না পেয়ে মোল্লা তখনকার মতো নাকে খত দিয়ে রক্ষা পায়। মোল্লারা কাজির নিকট হাজির হলেন। কাজির নিকট তারা জানায় যে এদেশে অনিয়ম চলছে। চারিদিকে 'হিন্দুয়ালের' বাড়বাড়ন্ত। কাজির আর কাছারিতে, মজলিশে বসে কোন কাজ নেই। এরপর সে তার নিজের ওপর অত্যাচারের

কথা কাজিকে সবিস্তারে অবগত করে। একথা শুনে কাজি ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্যদের রাখাল বালকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের জাতিনাশ করতে নির্দেশ দিলেন-

'যদি গিয়া লাগ পাম যতেক হিন্দুয়া।
জাতি নাশ করিব আজি গোস্ত খিলাইয়া।।
হুসন কাজি চলিল পায়ে দিয়া চামর।
গায়ে গায়ে সাজে সব জোলা কারিগর।।'[৭]

এবার মনসা তার নাগ সৈন্যদের নিয়ে কাজির নিকট হাজির হয় এবং হাসনহাটি আক্রমণ করেন। নাগ সৈন্য সর্বপ্রথম কাজিকে দংশন করে, পরে একে একে কাজির তিন বিবিসহ শত শত জনকে আক্রমণ করে দংশন করে। সমস্ত ব্যাপারটা উপলব্ধি করে হাসানের মায়ের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। হাসানের মা তাদের মনসার সঙ্গে বিবাদ করতে নিষেধ করে, মনসাকে পূজা করার কথা বলেন। মায়ের কথা শুনে কাজি ও হাসান হুসেন মনসা পূজা করতে সম্মতি প্রদান করে। এটাও লক্ষ করা যায় যে মনসা এসেছেন ক্রন্দনরতা হাসানের মায়ের নিকট। তখন হিন্দুর দেবী মনসাকে মুসলমান কাজি পূজার উপকরণ পাঠালেন-

'কাজরি মায়ে নিদ্রা হতে উঠে শীঘ্রগতি।।
পূজার সজ্জা করিল বিবিধ প্রকার।
ঘরখান বান্দিল বিচিত্র আকার।।
পূজার সজ্জা পাঠাইয়া আনন্দিত মতি।
সাক্ষাত হইয়া বর দিলা পদ্মাবতী।।'[৮]

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যে লক্ষ করা যায় যে মনসা নেতার পরামর্শে শিশু রাখালদের মধ্যে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে হাজির হলেন। রাখাল বালকেরা তাঁকে দেখে ডাইনি বলে মনে সন্দেহ প্রকাশ করল। এবং তারা মনসাকে অবগত করল যে মনসা যদি সাপ দেখাতে পারেন তাহলে বালকেরা তাঁকে পূজা করবে। মনসা সাপ দেখাতেই বালকদের মনে ভয়ের সঞ্চার হল। তখন বালকদের প্রধান পুরন্দর ঘোষ জানায় আরিষ্ট গাভী যদি দুধ দেয় তাহলে তারা মনসাকে পূজা করবে। অতপর পুরুন্দরের চুবড়ি দুধে ভরে উঠলে রাখাল বালকেরা মনসার পূজা করতে রাজি হল। পূজা পেয়ে মনসার মনবাঞ্ছা পূর্ণ হল এবং রাখালগাছি নামে এক গ্রাম স্থাপন করলেন-

'পুত্রে পৌত্রে ধনে জনে বাড়িবে আপার।
নাহিক সর্পের ভয় তোমা সভাকর।।
বর দিয়া বিষহরি বসাইল গ্রাম।
থুইল রাখালগাছি নাম অনুপাম।।'[৯]

নিকটেই ছিল তুরুকদের বাসস্থান। এদের প্রধান ছিলেন হাসান হুসেন। চিরকাল তারা সুখে শান্তিতে আপন ভুবনে বসবাস করছে। এদের কৃষি জমিতে কর্মের

জন্য নিয়োজিত আছে শতাধিক কৃষক। গোরা মিনা ছিলেন এদের মধ্যে প্রধান কৃষক। যেখানে রাখাল বালকেরা মনসা পূজা করছিল সেখান দিয়ে গোরা মিনার গোলাম স্নানের জন্য নদিতে যাচ্ছিলেন। অকারণে রাখাল বালকেরা গোলামকে প্রহার করতে উদ্যত হয়-

'গোরা মিনা নামে তার প্রধান কৃষাণ।
তাহার গোলাম গেল করিবারে স্নান।।
যেখানে রাখালগণ পূজে মনসায়।
দৈবযোগে সে গোলাম তথাকারে যায়।।
ক্রোধ যুক্ত হৈল সবে তুড়ুক দেখিয়া।
ধর ধর ডাক ছাড়ি গেল খেদাড়িয়াই।।'[১০]

এখানে বিরোধ বাধায় রাখালেরা। গোলাম নাদিতে স্নানের জন্য যাচ্ছিলেন পূজামণ্ডপের পাশ দিয়ে। রাখালেরাই এগিয়ে এসে আক্রমণ করে বিরোধের সূত্রপাত ঘটায়। আসলে তুর্কি আভিয়ানের ফলে এই সময় হিন্দু সম্প্রদায় বাস্তবে শাসকদলের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। বাস্তবে তারা প্রতিশোধ, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছিলেননা। কাজেই কল্পনায় তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলার বাসনা মনে পোষণ করতেন। বিপ্রদাসের কাব্যে আলোচ্য অংশে আমরা তারই যেন একটা বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করি।

আসলে রাখাল বালকদের পর দেবী মনসা হাসন হুসেনের পূজা গ্রহণের চেষ্টা করেন। কাজি প্রথমে মনসা পূজা করতে রাজি হয়নি। তখন মনসা চাপা বিবির সাহায্যে কাজিকে হিন্দু মুসলমান উভয়ধর্মের অভিন্নতার কথা বলেন। কিন্তু চাপা বিবির কোন কোথায় কাজিদ্বয় কর্ণপাত না করে সৈন্যসামন্ত নিয়ে মনসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পূজার স্থান, তুলসীতলা সর্বত্র ভেঙে দেয়। তখন রুষ্ট মনসা বিঘতিয়া নাগকে দিয়ে কাজিদ্বয়ের সৈন্যদলকে বধ করে নাজেহাল অবস্থা করেন। নিরুপায় হয়ে অসহায় হাসন কাতর কণ্ঠে মনসা দেবীর পূজা করতে সম্মতি দেয়। এইভাবে সংঘাতের মধ্যে দিয়ে সম্মিলনের চেষ্টা করা হয়েছে বিপ্রদাসের কাব্যে-

'অপরাধ ক্ষেম কর জগৎ জননী।
পাপমুখে কতেক বলিব মন্দ বাণী।।
জগৎ ঈশ্বরী তুমি আদি নিরঞ্জন ।
তুমি ব্রহ্ম তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ।।'[১১]

আসলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মই শ্রদ্ধার। এখানে পুরাণ ও কোরানের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে হাসান হোসেন পালা বিস্তৃত । হাসান হোসেন দুই ভাই। তাঁদের ধর্ম ইসলাম । স্বভাবতই তাঁরা মনসা বিদ্বেষী । হসান হাটিতে তাঁদের রাজ্য। তাঁদের রাজ্যের মধ্যেই কচুয়ার তীরে রাখালরা দেবী মনসার পূজার আয়োজন করেছে। খবর শুনা মাত্র দূত সাদ্যাকে পাঠালেন ব্যাপারটা জানতে। স্যাদা এসে পূজার

উপকরণ বিনষ্ট করলে রাখালরা তাকে লাঞ্ছিত করে। সাদ্যা ফিরে এসে হাসানকে সমস্ত অবগত করলে, হাসান যবন সেনা নিয়ে কচুয়াতট ঘিরে ফেললেন বিধর্মীদের উচিত শিক্ষা দিতে। মনসা তাঁর ভক্তদের বিপদ দেখে কৌশলে বিষধর ভীমরুল ও প্রচণ্ড চুলকানি যুক্ত আলকুশি সৃষ্টি করলেন। তখন যবন সেনা যে যার মত ছত্রভঙ্গ হল। পরবর্তীতে দেবী হাসানহাটি ধ্বংস করেন। সকালে নিঃশব্দ পুরী দেখে কপালে করাঘাত করতে থাকেন হাসান হোসেন। তাঁদের স্মৃতিপটে ভেসে উঠল জননীর কথা। যিনি হিন্দু দেবীর সঙ্গে বিবাদ করতে নিষেধ করেছিলেন। এমতবস্থায় অন্যত্র পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই দুইভাই । কিন্তু রাত্রে দেবী স্বপ্নাদেশ দিলেন –

‘শুনহ হাসান রাজা আমি খরতরি ।
যেই দেবী মজাইল তোর নিজ পুরী ।।
অদাতক আছে তোর বাপের মোকাম ।
মসিদ ভাঙ্গিয়া কর দেহার নির্মাণ।।
জীবে যদি বাঞ্ছা হেন থাকে তোর মনে ।
মোরে পুরছাড়ি দিয়া যাহ অন্য স্থানে ।।’[১২]

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে হাসান হোসেন পালার নাম হয়েছে – ‘কাজির বিড়ম্বনা।’ এবং আলোচ্য অংশে হিন্দু -মুসলমান সম্পর্কের সম্প্রীতির কথা আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় গোপবালকগণ দ্বারা মনসার পূজার সময় এক কাজি এসে উপস্থি হন। তিনি তাদের পূজাকে ভূতপূজা বলে বিড়ম্বনা শুর করেন। তখন সকল কাজি মিলে বলে উঠলেন –

‘পূজা ভাঙ্গি বাড়িয়ে ভাঙ্গি ঘট বারি ।
আসন করণ্ডী ভাঙ্গি কৈল খান চারি ।।’[১৩]

তৎকালীন ছিল মুসলমান রাজত্ব। সমাজে কাজিদের প্রাধান্য ছিল খুব বেশি। মাঝে মাঝে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধও গড়ে উঠেছিল। আমরা আলোচ্য দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে লক্ষ করি ক্ষমতাবলে মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছে কাজীর লোকজন কিন্তু সকলে তো সমান নয়। সমাজে কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরও দেখা মেলে। তাইতো এদের মধ্যে আবার একজন কাজি মধ্যে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা দেখা যায়। সে এটাকে মেনে নিতে পারেনি। তাই সে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বলে ওঠেন –

‘তার মাঝে একজন জাতি মুসলমান।
সে বলে, উচিত নহে, রাখ হিন্দুয়ান।।
একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু মুসলমান।
যার তার কর্ম সেই করে ধর্মজ্ঞান ।।
সকলের কুচার সৃজিলা গোঁসাই।

পাষণ্ড হইয়া তাতে কো কার্য নাই।।'[১৪]

কাজিদের উৎপীড়নে বালকগণ সকল মিলিত কাজিদের উপর পাল্টা আক্রমণ করে। কাজিরা তখন পালিয়ে গিয়ে হাসান হোসেনকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করল। এর ফলে হাসান হোসেন যুদ্ধযাত্রা করে। বালকগণ তখন তাদের পূজারস্থান ছেড়ে পলায়ন করে। তারা মনসা দেবীর শরণাপন্ন হন। দেবী আদেশে বিঘতিয়া নাগ সমস্ত যবনপুরী দংশন করে দেয়। পরবর্তীতে আবার হাসান হোসেনের মমতিজা বিবির ক্রন্দনে এবং নিজ পূজার বিনিময়ে মনসা তাদের পুনর্জীবন দেন। আসলে দীর্ঘদিন সহবস্থানের ফলে মিলেমিশে যায় আমাদের সংস্কৃতি। তাই দ্বিজ বংশীদাসও মনসার মাহাত্ম্য প্রচার বলেছেন -

'কলিযুগে মাও, তুমি সাক্ষাৎ দেবতা।
হিন্দু কি যবন তুমি সকলের মাতা।।'[১৫]

আসলে মনসামঙ্গলকাব্য হিন্দু- মুসলিম সকলের কাছেই প্রিয়। বিশেষত বেহুলাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে কারুরই উপায় থাকেনা। এইভাবে দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে আলোচ্য অংশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অসাধারণ চিত্রণ লক্ষ করি।

বাঙালির প্রথম রূপ হিসাবে দেখা যায় সাংস্কৃতিক সমন্বয়। সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে বাঙালির প্রধান পরিচয় এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে বাঙালির শিল্প সংস্কৃতিতে বিশেষত সাহিত্য ক্ষেত্রে সমন্বয় দিকটি অনেক ক্ষেত্রে তেমন স্পষ্ট নয়। অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য, এই পর্বে সংস্কৃতি সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি যে জায়গায় পৌঁছেছিল সাহিত্যে তার কোন প্রতিবিম্ব নেই। কেননা এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব হয়নি। দশম- দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত 'চর্যাপদ' সাংস্কৃতির ঐতিহ্যের ছবি লক্ষ করি, তা অবশ্যই ইতিবাচক। জাতীয় জীবনের অবক্ষয়ের চিত্র এখানে দেখা যায়।

'চর্যাপদ' পরবর্তী যে বাংলা সাহিত্য অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে সমন্বয়ের ছাপ সুস্পষ্ট লক্ষ করা যায়। এই সমন্বয়ের সামাজিক ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যায় তুর্কি আক্রমণের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর বাঙালি জাতি সম্প্রদায় তখন আবার একটা সুস্থির অবস্থায় অবস্থান করছে। সমাজের একটা শ্রেণি নবাগত ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে একটি শ্রেণি দেশীয় হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাস বজায় রেখেছে। ধর্মীয় বিশ্বাসে সমাজ জীবনে একটি সমন্বিত রূপ প্রাধান্য পাচ্ছে। সমাজ ইতিহাসের এই যে বিশেষ দিকটি তা ঘটনা চক্রে 'রামায়াণ', 'মহাভারত', 'ভাগবত' অনুবাদ সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়নি। এই না পাওয়ার কারণ সম্ভবত অমুসলিম কবিরা ইসলাম ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে একটা বিরূপতা পোষণ করেছিলেন। ফলত ধর্মসমন্বয়ের রূপ তাদের রচনায় পরিস্ফুট হয়নি। মুসলিম কবিরা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী মন ও মননের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে দ্বিতীয় সংখ্যায় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় মুহম্মদ এনামুল হক জানাচ্ছেন-

'কবি সৈয়দ সোলতান যে সময়ে (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয় সাধনের যুগ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের সর্ব্বত্র ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম্মের মিলনের এক বিরাট্ প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। এই সময়ে রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদু, চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় উদারহৃদয় হিন্দু মুসলমান সাধকদের আবির্ভাবে ভারতের শাসক ও শাসিতেরা একই প্রকারের চিন্তা- ধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া একই স্থানে আসিয়া মিলিত হইতেছিল। এই যে দুই যুধ্যমান ধর্ম্মের মিলন-প্রচেষ্টা, ইহা ভারতের এক প্রাপ্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। কবি সৈয়দ সোলতানের কাব্যগুলিতে আমরা এই উদার আন্দোলনের প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। বাঙ্গালার কি হিন্দু, কি মুসলমান, আর কোন প্রাচীন কবির মধ্যে সৈয়দ সোলতানের পূর্ব্বে এই প্রচেষ্টা দেখা যায় না।'[১৬]

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদের রচনায় ধর্মসমন্বয়, সাংস্কৃতির ঐক্যের রূপ বেশ সুস্পষ্ট। রাজ ক্ষমতা থেকে চ্যুত হবার কারণে হিন্দুসমাজ একদিকে যেমন মুসলিমসমাজ সংস্কৃতিকে আপন করে নিতে পারেনি, অন্যদিকে রাজ ক্ষমতায় থাকার জন্য দেশীয় সমাজ সংস্কৃতির (হিন্দু, বৌদ্ধ) সঙ্গে সখ্যতা জরুরি। এটা মুসলিম রাজন্যবর্গের পাশাপাশি অভিজাত সকল শ্রেনির মুসলিমরা সেদিন অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তবুও পরিশেষে বলতে হয় মনসামঙ্গলকাব্যে গুলিতে হিন্দু- মুসলমানের সম্পর্কের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা মূলত ছিল বিরোধের, তবুও অন্ধকারে একটি আলোকবর্তিকার মতও ধর্মসমন্বয়ের উক্তিগুলি আমাদের নিকট মূল্যবান।

তথ্যসূত্র:

১. গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা(প্রথম খণ্ড), পৃ-৪২-৪৩।
২. শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ধর্ম্মসমন্বয়, প্রবাসী ৪২ভাগ, প্রথম খণ্ড, বৈশাখ- আশ্বিন ১৩৪৯, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,(সম্পাদিত) পৃ-৫৯০।
৩. শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত (সম্পা); সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, পৃ-৬৫।
৪. তদেব;পৃ-ভূমিকা XVII।
৫. শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত (সম্পা); কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃ-১৪৩।
৬. তদেব;পৃ-১২২।
৭. তদেব;পৃ-১২৭।
৮. তদেব;পৃ-১৪৪।
৯. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা); বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, পৃ-৩১৫।
১০. তদেব;পৃ-৩১৫।
১১. তদেব;পৃ-৩৩১।

১২. অক্ষয় কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা); মনসামঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত, পৃ-১২৯।

১৩. শ্রীরামনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী; সম্পাদিত বংশীদাস বিরচিত পদ্মাপুরাণ, পৃ-১৭৭।

১৪. তদেব; পৃ-১৭৭।

১৫. তদেব; পৃ-২৯৭।

১৬. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, একচত্বারিংশ ভাগ, পত্রিকা পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত, ১৩৪১। কবি সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ এনামুল হক, পৃ-৪৮।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম যৌথ প্রকাশ, মে ২০১৫ ।

২. রায়, কালিদাস, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, প্রথম অপর্ণা সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৭ ।

৩. পোদ্দার, অরবিন্দু, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৯৯ ।

৪. গিরি, সত্যবতী, ও মজুমদার, সমরেশ, (সম্পা) প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, (১ম খণ্ড), রত্নাবলী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১৩ ।

৫. দেবরায়, শেখর, মনসাকথা, নবচন্দন প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০২।

৬. গুপ্ত, ক্ষেত্র, প্রাচীন কাব্যসৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৪ ।

৭. ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারা, হাউস অফ বুকস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৭ ।

৮. শরীফ, আহমদ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড) নিউ এজ পাবলিকেশান, ঢাকা, পুনমুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী।

মনুস্মৃতির প্রেক্ষাপটে দুর্গের তাৎপর্যালোচনা

শান্তিগোপাল হুদাতী
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

সারসংক্ষেপঃ- প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে সর্বাধিক অন্যতম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল 'মনুস্মৃতি'। বর্তমানে প্রচলিত 'মনুস্মৃতি' গ্রন্থে মোট বারোটি অধ্যায় এবং ২৬৯৪ টি শ্লোক রয়েছে। মনুস্মৃতির সপ্তম অধ্যায়ের নাম হল 'রাজধর্ম'। এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে মনু রাজার বসবাসের উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে 'দুর্গ' নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যের মতে সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের মধ্যে চতুর্থতম হল 'দুর্গ'। 'দুর্' পূর্বক 'গম্' ধাতুর উত্তর 'খল্' প্রত্যয় করে 'দুর্গঃ'- শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'দুঃখেন গম্যতে যত্র ইতি দুর্গঃ' অর্থাৎ যেখানে দুঃখের সঙ্গে বা কষ্ট করে পৌছাতে হয় তাকে দুর্গ বলে। প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে মনু মোট ছয় প্রকার দুর্গের নাম উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল যথাক্রমে- 'মরুদুর্গ', 'মহীদুর্গ', 'জলদুর্গ', 'বৃক্ষদুর্গ', 'নৃদুর্গ', 'গিরিদুর্গ'। উক্ত দুর্গগুলির মধ্যে থেকে যে কোনও একটিকে আশ্রয় করে রাজা নগরের অভ্যন্তরে বসবাস করবেন। দুর্গ নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো বর্হিশত্রুর হাত থেকে রাজার নিজে বাঁচা, রাষ্ট্রের মানুষকে বাঁচানো পাশাপাশি রাজকোষকেও সুরক্ষিত রাখা। বহুগুণ থাকার জন্য আচার্য মনু এই ছয় প্রকার দুর্গের মধ্যে গিরিদুর্গকে শ্রেষ্ঠরূপে অভিহিত করেছেন। এই ছয়টি দুর্গে আবার বিভিন্ন প্রাণী আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। প্রথম তিনটি দুর্গে মৃগ, মূষিক, কুমীর প্রভৃতি এবং শেষ তিনটি দুর্গে বানর, মানুষ এবং দেবতারা থাকেন বলে জানা যায়। চারদিকে পরিখা ও প্রাচীরের দ্বারা সুরক্ষিত এই দুর্গে সমস্ত ঋতুতে ফল ও পুষ্পের প্রাচুর্যযুক্ত, ধারাগৃহ বা জলধারাযুক্ত গৃহ, উদ্যান ও উপবনসমন্বিত নিজের ঘর রাজা নির্মাণ করাবেন। আচার্য মনু দুর্গে অস্ত্র, ধান, ধান্য, বাহন, ব্রাহ্মণ, শিল্পী, যন্ত্র, পশুখাদ্য, জল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির ব্যবস্থা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন যাতে সঙ্কটকালীন সময়ে রাজার নগররক্ষায় কোনও অসুবিধা না হয়।
সূচক শব্দঃ- মনু, মনুসংহিতা, কুল্লুকভট্ট, জনপদ, প্রস্রবন, রাজধর্ম, সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব, দুর্গ, মরুদুর্গ, মহীদুর্গ, জলদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, নৃদুর্গ, গিরিদুর্গ, চর্তুরঙ্গসৈন্য, রাষ্ট্র, কৌটিল্য, অর্থশাস্ত্র, মহাভারত, পুরাণ।

মূল আলোচনাঃ

ভারতবর্ষীয় চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণায় যুগযুগ ধরে 'মনুস্মৃতি' বা 'মনুসংহিতা' ধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সশ্রদ্ধ স্থান অধিকার করে আছে। বস্তুত মনু নামটি ভারতবর্ষে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত ও গৃহীত হয়। তাঁর রচিত 'স্মৃতি' বা 'সংহিতা'

সে-কারণে বেদের মতোই সনাতন ধর্মাবলম্বামীদের কাছে পূজ্য। শঙ্করাচার্য, কুমারিল ভট্ট এবং শবরস্বামীর মতো প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রে মনুর প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব স্বীকার করেছেন। মনুস্মৃতির উপর রচিত ভাষ্যের ও টীকার সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাষ্যকারদের নাম হল ভট্টমেধাতিথি, গোবিন্দরাজ, কুল্লুকভট্ট, সর্বজ্ঞনারায়ণ প্রভৃতি। এছাড়াও বিভিন্ন সূত্র থেকে বিশ্বরূপ, ধরণীধর, মাধবাচার্য, শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি ভাষ্যকারের নাম পাওয়া গেলেও তাঁদের রচিত ভাষ্য বা টীকা গ্রন্থগুলির খোঁজ পাওয়া যায় না। ভাষ্যগুলির মধ্যে ভট্ট মেধাতিথি রচিত মনুভাষ্য সবচেয়ে প্রাচীন এবং সর্ববৃহৎ হলেও কুল্লুকভট্ট রচিত 'মন্বর্থমুক্তাবলী' ভাষ্যটিই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত এবং নির্ভরযোগ্য। মনুস্মৃতির রচনাকার এবং রচনাকাল দুটি বিষয় নিয়েই যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। অনেকে আচার্য ভৃগুকে এই গ্রন্থের রচয়িতা বলে মনে করেন। গ্রন্থটির রচনাকাল নিয়ে পাওয়া বিভিন্ন তথ্যের ওপর নির্ভর করে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। বর্তমানে প্রচলিত 'মনুস্মৃতি' গ্রন্থে মোট বারোটি অধ্যায় এবং ২৬৯৪ টি শ্লোক রয়েছে। মনুস্মৃতির সপ্তম অধ্যায়ের নাম হল 'রাজধর্ম'। এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে মনু রাজার বসবাসের উপযুক্ত স্থান হিসাবে জাঙ্গলদেশের নাম নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন-

"জাঙ্গলং শষ্যসম্পন্নমার্যপ্রায়মনাবিলম্।
রম্যমানতসামন্তং স্বাজীব্যং দেশমাবসেত্"।।[১]

অর্থাৎ রাজা এমন স্থানে বসবাস করবেন যেখানে জল এবং তৃণ থাকবে অল্প পরিমাণে এবং অধিক পরিমাণে বায়ু এবং রোদ থাকবে। প্রচুর পরিমাণে যেখানে শস্য উৎপন্ন হবে এবং অনেক ধার্মিক লোকের বসবাস হবে। যেখানে কাছের অরণ্যচারী লোকেরা রাজার অনুগত এবং কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি জীবিকা যেখানে অনেক সুলভ। প্রাচীন পণ্ডিতগণ রাজ্য পরিচালনার সুবিধা এবং রাজার নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে দুর্গ নির্মাণ করে রাজাকে রাজ্যের নগরের অভ্যন্তরে বসবাসের পরামর্শ দিয়েছেন।

কৌটিল্যের রাষ্ট্র সম্পর্কিত মতবাদ গুলির মধ্যে অন্যতম হল 'সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব' বা 'সপ্তাঙ্গ মতবাদ'। মানব শরীরে যেমন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে তেমনই সাতটি অঙ্গের সম্মিলিত রূপই হল 'রাষ্ট্রশরীর'। রাষ্ট্রের এই সাতটি অঙ্গ বা উপাদান হল যথক্রমে- 'স্বামী', 'অমাত্য', 'জনপদ', 'দুর্গ', 'কোষ', 'দণ্ড', 'মিত্র'। কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের মধ্যে চতুর্থ ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল 'দুর্গ'। সাধারণত সুরক্ষিত রাজধানীর পরিকল্পনাকেই কৌটিল্য 'দুর্গ' বলেছেন। 'দুর্' পূর্বক 'গম্' ধাতুর উত্তর 'খল্' প্রত্যয় করে 'দুর্গঃ'- শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'দুঃখেন গম্যতে যত্র ইতি দুর্গঃ' অর্থাৎ যেখানে দুঃখের সঙ্গে বা কষ্ট করে পৌছাতে হয় তাকে 'দুর্গ' বলে। প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে মনু মোট ছয় প্রকার দুর্গের নাম উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন –

"ধন্বদুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা ।

নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেত্ পুরম্''।।[২]

অর্থাৎ 'মরুদুর্গ', 'মহীদুর্গ', 'জলদুর্গ', 'বৃক্ষদুর্গ', 'নৃদুর্গ', 'গিরিদুর্গ' এই ছয় প্রকার দুর্গের মধ্যে রাজা যে কোন একটিকে আশ্রয় করে বসবাস করবেন।

"প্রয়োজমনুদিশ্য মন্দোঽপি ন প্রবর্ততে" অর্থাৎ প্রয়োজন ছাড়া পাগলেও কিছু করেনা। এই দুর্গ নির্মাণের পিছনেও বেশ কিছু উদ্দেশ্য আছে। মনু বলেছেন দুর্গাশ্রিত বিভিন্ন পশুকে ব্যাধেরা যেমন আক্রমণ করতে পারেনা তেমনই শত্রুরাও রাজাকে হঠাৎ বিপদগ্রস্থ করতে পারে না। কারণ দুর্গম সেই স্থানে শত্রুর পক্ষে সহজে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রাচীন শাস্ত্রকারগন রাজার পক্ষে দুর্গ নির্মান একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছেন। আচার্য মনু দুর্গ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেছেন-

"যথা দুর্গ-আশ্রিতান্ এতান্ ন উপহিংসন্তি শত্রবঃ।
তথা অরয়ঃ ন হিংসন্তি নৃপং দুর্গসমাশ্রিতম্ ।।
একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্ধরঃ।
শতং দশ সহস্রাণি তস্মাদ্ দুর্গং বিধীয়তে"।।[৩]

সামনাসামনি যুদ্ধে একজন ধনুর্ধর একজন যোদ্ধার সঙ্গেই যুদ্ধ করতে পারেন। কিন্তু দুর্গের মধ্যে থেকে একজন ধনুর্ধর একশো যোদ্ধার সঙ্গে লড়াই করতে পারেন কারণ তিনি প্রায় চারিদিক থেকে সুরক্ষিত থাকেন আত্মরক্ষার জন্য তাকে আলাদা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়না। অনুরূপভাবে দুর্গের মধ্যে থাকা একশো জন ধনুর্ধর দশ হাজার বিপক্ষীয় ধনুর্ধরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ দুর্গ নির্মাণের আসল উদ্দেশ্য হলো রাজার নিজে বাঁচা এবং রাষ্ট্রের মানুষকে বাঁচানো পাশাপাশি রাজকোষকেও সুরক্ষিত রাখা।

'সমানৌ মরুধন্বানৌ'। সমানৌ অর্থাৎ সমানার্থে নির্জল দেশের নাম 'মরু' বা 'ধন্বন্'। এই দুর্গের বৈশিষ্ঠ্য নিরূপণ করতে গিয়ে কুল্লুকভাষ্যে উল্লিখিত হয়েছে- "ধন্বদুর্গম্ মরুবেষ্টিতং চতুর্দিশং পঞ্চযোজনমনুদকম্"।[৪] অর্থাৎ চারদিকে পাঁচ যোজন বা কুড়ি ক্রোশ ব্যাপি মরুভূমি বেষ্টিত জলশূন্য স্থানে যে দুর্গ নির্মিত হয় তাকে 'ধন্বদুর্গ' বা 'মরুদুর্গ' বলে। দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে শত্রু ও সৈন্যের পক্ষে রাজধানী আক্রমণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। চতুর্দিকে মরুবেষ্টীত থাকায় দুর্গের ভিভরে আলাদা করে জলের ব্যবস্থা রাখতে হয়। এই দুর্গে মৃগাদি প্রাণী আশ্রয় গ্রহন করে থাকে। অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যের মতে এই দুর্গ আবার দ্বিবিধ 'নিরুদকস্তম্বমিরিণং বা ধান্বনং'[৫] অর্থাৎ ১) 'নিরুদকস্তম্ব' ২) 'ইরিণ'। তিনি জলাশয় ও তৃণাঞ্চলের সম্পর্কশূন্য দুর্গকে 'নিরুদকস্তম্ব' এবং ঊষর বা বালুকাবেষ্টিত দুর্গকে 'ইরিণ' বলেছেন।

কুল্লুকভাষ্য অনুসারে- "মহীদুর্গম্ পাষাণেন ঐষ্টকেন বা বিস্তারাদ্ দ্বিগুণোচ্ছ্রায়েণ [দ্বৈগুণ্যোচ্ছ্রায়েণ বা] দ্বাদশহস্তাদ্যুচ্ছিতেন যুদ্ধার্থমুপরিভ্রমণযোগ্যেন সাবরণ-গবাক্ষাদি-যুক্তেন প্রাকারেণ বেষ্টিতম্"।[৬] অর্থাৎ এই প্রকার দুর্গ প্রস্তর বা ইষ্টক নির্মিত প্রাচীর

দ্বারা বেষ্টিত থাকে। এই প্রাচীরগুলির উচ্চতা বারো হাতেরও বেশি হয়ে থাকে। প্রাচীরের প্রস্থ এমন হবে যাতে প্রাচীরের উপর সৈন্যরা সহজেই যাতায়াত করতে পারে এবং উপর থেকে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে। প্রাচীরে ছাদ এবং বিশেষ ধরণের জানালা থাকে যাতে ভিতর থেকে বাইরে লক্ষ্য রাখা যায়। এই দুর্গে মুষিকাদি প্রাণী আশ্রয় গ্রহন করে।

"জলদুর্গমগাধোদকেন সর্বতঃ পরিবৃতম্"।[৭] চতুর্দিকে জলপূর্ণ পরিখা দ্বারা বেষ্টিত দুর্গকে 'অব্দুর্গ' বলে। ইহাকে জল দূর্গও বলা হয়। এই দুর্গের পাড় খুব খাড়া ও উঁচু হয় যাতে শত্রুরা সহজে পার হতে না পারে। এই দুর্গে সাধারনত সাপ, কুমির প্রভৃতি জলজন্তুর বাস থাকে। আচার্য কৌটিল্যের মতে এই দুর্গ দুইরকম হতে পারে একপ্রকার হল চতুর্দিকে নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত স্থলের ওপর নির্মিত দুর্গ এবং দ্বিতীয় প্রকার নিম্ন অর্থাৎ গভীর কয়েকটি সরোবরের দ্বারা অবরুদ্ধ স্থলের ওপর নির্মিত দুর্গ। তাই অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে- "অন্তর্দ্বীপং স্থলং বা নিম্নাবরুদ্ধমৌদকং"।[৮]

মনু নির্দিষ্ট চতুর্থ প্রকার দুর্গের লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে ভাষ্যকার বলেছেন- "বার্ক্ষদুর্গং বহিঃ সর্বতো যোজনমাত্রং ব্যাপ্য তিষ্টন্ মহাবৃক্ষকণ্টকিগুল্মলতাদ্যাচিতম্"।[৯] অর্থাৎ চারিদিকে একযোজন বা দুক্রোশ ব্যাপী বিশাল বিশাল বৃক্ষ, কন্টকযুক্ত গুল্ম ও লতা দ্বারা বেষ্টিত দুর্গকে বলে 'বার্ক্ষদুর্গ'। বানর, হরিণ প্রভৃতি জীব জন্তুরা এখানে বাস করে। অর্থশাস্ত্রকার আচার্য কৌটিল্য এই দুর্গকে 'বনদুর্গ' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন "খঞ্জনোদকং স্তম্বগহনং বা বনদুর্গং"[১০] অর্থাৎ বনদুর্গ হল দুই প্রকার ১) 'খঞ্জনোদকে' অর্থাৎ পঙ্কিল স্থানে নির্মিত হওয়া দুর্গ ২) 'স্তম্বগহন' অর্থাৎ ছোট ছোট গাছ ঘন ভাবে থাকায় যে স্থান দুষ্প্রবেশ্য, এমন স্থানে নির্মিত হওয়া দুর্গ।

হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এদের একত্রে 'চর্তুরঙ্গ সৈন্য' বলে। "নৃদুর্গং চতুর্দিগবস্থায়িহস্ত্যশ্বরথযুক্তবহহপাদাতরক্ষিতম্"[১১] চতুর্দিকে বহুসংখ্যক চতুরঙ্গ সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সুরক্ষিত দুর্গকে নৃদুর্গ বলে। এই দুর্গে মানুষ বাস করে।

"গিরিদুর্গং পর্বতপৃষ্ঠমতিদুরারোহং সঙ্কটৈকমার্গোপেতমন্তর্নদীপ্রস্রবণাদ্যুদকযুক্তং বহুশস্যোত্পন্নক্ষেত্রবৃক্ষান্বিতম্"।[১২] অর্থাৎ অতি দুর্গম ও দুরারোহ পর্বত শৃঙ্গে অবস্থিত, প্রস্রবন যুক্ত, ফলবান বৃক্ষ সমন্বিত দুর্গকে 'গিরিদুর্গ' বলে। এখানে আরোহণ করা দুঃসাধ্য। সংকটের সময় বাইরে থেকে প্রবেশের একটিমাত্রই পথ থাকে। এই দুর্গে শষ্য উৎপাদন যোগ্য একাধিক ক্ষেত্র থাকে। এই দুর্গকে আশ্রয় করে দেবতারা বসবাস করে বলে মনে করা হয়। এই দুর্গের দ্বিবিধত্ব নির্ণয় করে অর্থশাস্ত্রকার বলেছেন- 'প্রান্তরং গুহাং বা পার্বতং'[১৩] অর্থাৎ প্রথমটি হল পর্বত থেকে গৃহীত প্রস্তর দ্বারা নির্মিত দুর্গ এবং দ্বিতীয়টি হল পর্বতান্তর্গত গুহা।

আচার্য মনু এই ছয় প্রকার দুর্গের মধ্যে গিরিদুর্গকেই শ্রেষ্ঠরূপে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন-

"সর্বেণ তু প্রযত্নেন গিরিদুর্গং সমাশ্রয়েত্।

এষাং হি বাহুগুণ্যেন গিরিদুর্গং বিশিষ্যতে"।।[১৪]

কারণ পাহাড়ের নিজস্ব প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক স্থিতি ভালো হওয়ার জন্য অন্যান্য দুর্গের চেয়ে এই দুর্গে অনেক বেশী সুবিধা পাওয়া যায়। এই দুর্গে আরোহণ করা শত্রুদের পক্ষে দুঃসাধ্য এছাড়া শত্রুসৈন্যকে পাল্টা আক্রমণ করার সুযোগও এই দুর্গেই বেশী পরিমাণে থাকে। পাহাড়ের উপর থেকে নীচের শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখা অনেক সহজ হয়। পাহাড়ের উপর থেকে অল্প প্রযত্নে প্রস্তরখণ্ড গড়িয়ে বা তীরনিক্ষেপ করে শত্রুসৈন্য হত্যা করা যায়। তাছাড়া দেবতারা যেহেতু এই গিরিদুর্গকেই আশ্রয় করেন সেহেতু গিরিদুর্গই শ্রেষ্ঠ। মহাভারতে কিন্তু মনুষ্যদুর্গকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়েছে-

"দুর্গেষু চ মহারাজ! ষট্সু যে শাস্ত্রনিশ্চিতাঃ।
সর্বদুর্গেষু মন্যন্তে নরদুর্গং সুদুস্তরম্।।"[১৫]

কারণ, এতে হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকার ফলে নিরাপত্তাও বেশী থাকে। কৌটিল্য সেই অর্থে কোনো দুর্গের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন নি। তিনি এগুলির আপেক্ষিক উপযোগিতার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছেন- "তেষাং নদী-পর্বত-দুর্গং-জনপদারক্ষ-স্থানং, ধান্বনবনদুর্গমটবী-স্থানম্, আপদ্যপসারো বা"[১৬]। অর্থাৎ বিপদকালীন সময়ে এগুলির মধ্যে 'নদী' বা 'জলদুর্গ' ও 'পর্বতদুর্গ জনপদের রক্ষাস্থান হতে পারে, 'মরু দুর্গ' ও 'বনদুর্গ' বনবাসীদের রক্ষাস্থান হতে পারে, অথবা সঙ্কটকালীন সময়ে এটি রাজার অপসরণের আশ্রয়স্থান হতে পারে। আচার্য মনু দুর্গে কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য রাখার পরামর্শ দিয়ে বলেছেন-

"তত্ স্যাদায়ুধসম্পন্নং ধনধান্যেন বাহনৈঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ শিল্পিভির্যন্ত্রৈর্যবসেনোদকেন চ"।।[১৭]

অর্থাৎ যুদ্ধের সময় ব্যবহারের জন্য দুর্গে বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র রাখতে হবে। স্বর্ণাদি মূল্যবান ধাতুকে সংরক্ষিত করে রাখতে হবে। খবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ধান-চাল প্রভৃতি থাকবে। হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বাহনের ব্যবস্থা থাকবে। যন্ত্রপাতি মেরামতির জন্য ছুঁতোর প্রভৃতি শিল্পীকেও রাখার কথা বলা হয়েছে। পূজাপাঠের জন্য ব্রাহ্মণ থাকবেন। দুর্গে হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পশু থাকায় তাদের জন্য তৃণ গুল্মাদি পশুখাদ্যের জোগান রাখা প্রয়োজন। রোগনিরাময়ের জন্য চিকিৎসক ও ঔষধের ব্যবস্থা থাকে। এছাড়াও বসবাসের উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহগুলি রাখতে হবে। দুর্গের মধ্যে রাজা বাসস্থান নির্মাণ করবেন। তাঁর বাসস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"তস্য মধ্যে সুপর্যাপ্তং কারয়েদ্ গৃহমাত্মনঃ।
গুপ্তং সর্বর্তুকং শুভ্রং জলবৃক্ষসমন্বিতম্"।।[১৮]

অর্থাৎ এই দুর্গের মধ্যে নির্মিত ঘরগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণবিশিষ্ট হবে যাতে সেগুলি মধ্যে রাজার, রাজপুত্র, রাজকোষ, অস্ত্র ও অস্ত্রাগার প্রভৃতির থাকার কনো অসুবিধা না হয়।

চারদিকে পরিখা ও প্রাচীরের দ্বারা সুরক্ষিত দুর্গে সমস্ত ঋতুতে ফল ও পুষ্পের প্রাচুর্যযুক্ত, ধারাগৃহ বা জলধারাযুক্ত গৃহ, উদ্যান ও উপবনসমন্বিত নিজের ঘর রাজা নির্মাণ করাবেন। দুর্গমধ্যে জল ও জ্বালানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতেই হবে—যাতে শত্রু কর্তৃক দীর্ঘকালীন অবরোধের সময় রাজার নগররক্ষায় কোনও অসুবিধা না হয়।

শুক্রনীতিতে মনুকথিত নৃদুর্গের পরিবর্তে 'সেনাদুর্গ' শব্দটি ব্যবহার দেখা যায়। শুক্রনীতি অনুসারে 'সেনাদুর্গ' ছাড়া প্রায় সব দুগই 'বন্ধন' অর্থাৎ নিরাপত্তার পক্ষে যথেষ্ঠ নয়। পুরাণসমূহেও দুর্গের উল্লেখ রয়েছে। দেবতারা দৈত্যদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য 'মরু', 'কালঞ্জর' প্রভৃতি পার্বত্যদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করতেন বলে জানা যায়।

মহাভারতে 'মরুদুর্গ', 'ভূমিদুর্গ', 'গিরিদুর্গ', 'মনুষ্যদুর্গ', 'মৃত্তিকাদুর্গ' ও 'বনদুর্গ' প্রভৃতি ছয় প্রকার দুর্গের উল্লেখ রয়েছে।

শান্তিপর্বে বলা হয়েছে-

"ষড়্বিধং দুর্গমাস্থায় পুরাণ্যথ নিবেশয়েত্।
সর্বসম্পত্প্রধানং যদ্ বাহুল্যঞ্চাপি সম্ভবেত্।।
ধন্বদুর্গং মহীদুর্গং গিরিদুর্গং তথৈব চ
মনুষ্যদুর্গং মৃদ্দুর্গং বনদুর্গঞ্চ তানি ষট্"।।[১৯]

অর্থাৎ যে স্থানটি সমস্ত প্রকার সম্পদে পূর্ণ ও বিস্তৃত সেই স্থানে 'মরুদুর্গ', 'ভূমিদুর্গ', 'গিরিদুর্গ', প্রভৃতি ষড়্বিধ দুর্গ অবলম্বন করে রাজা নগর স্থাপন করবেন। মহাভারতকার এইসব দুর্গের বাইরে দৃঢ় প্রাচীর ও গভীর পরিখা নির্মাণের কথা বলেছেন। দুর্গের অভ্যন্তরে শস্য, অশ্ব, হস্তী, রথ, শিল্পী, ধার্মিক, সমস্ত কার্যে নিপুণ ব্যক্তি ও নানাবিধ বিপনী থাকার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছিলেন।

অর্থশাস্ত্রকার আচার্য কৌটিল্য চার প্রকার দুর্গের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল- 'ঔদকদুর্গ', 'পার্বতদুর্গ', 'ধান্বনদুর্গ' ও 'বনদুর্গ'। তাঁর মতে এই চার প্রকার দুর্গের মধ্যে যে কোনো দুর্গই মহীদুর্গ হতে পারে। কারণ প্রতিটি দুর্গই প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকে। এছাড়া প্রতিটি দুর্গকে নৃদুর্গও বলা যায় কারণ প্রতিটি দুর্গরক্ষার জন্যই সৈন্যসমাবেশ থাকে। উল্লেখ্য যে আচার্য মনু মনুসংহিতার রাজধর্ম বিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ে রাজা এবং রাজ্যের সুরক্ষার অন্যতম অঙ্গরূপে দুর্গের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও দুর্গের গঠনপ্রণালী ও নির্মাণ পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেননি। তিনি কেবলমাত্র দুর্গের প্রকারভেদ এবং তাদের স্বরূপ ও প্রয়োজনীতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন ভাষ্যকারদের রচিত ভাষ্যের ওপর পাঠকদের নির্ভরশীল হতে হয়েছে। অপরপক্ষে আচার্য কৌটিল্য রচিত 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে দুর্গের প্রকারভেদ এবং দুর্গের নির্মাণ পদ্ধতি, রচনাশৈলী সংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণ মানুষের কাছে আকর্ষণীয় ও অধিকমাত্রায় গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে শুধু ভারতবর্ষেই মনুস্মৃতির প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকেনি। বহির্ভারতে, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে মনুর গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান। ব্রহ্মদেশের কতক আইনের গ্রন্থে মনুর ঋণ স্পষ্টই স্বীকৃত হয়েছে। সিংহলের 'চুলবংশ' নামক গ্রন্থে মনুর রাজধর্মের উল্লেখ আছে। চীনদেশে প্রাপ্ত একটি পুঁথিতে মনুর আইন-কানুনের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় কিছু আইনের গ্রন্থ মনুসংহিতা-কে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে। ফিলিপাইনে সেনেট চেম্বারের আর্ট গ্যালারীতে মনুর মূর্তিটি আজও সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে।

তথ্যসূচীঃ

১) মনুসংহিতা (সপ্তমোঽধ্যায়), ডঃ অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী, ২০০৮, সপ্তমোঽধ্যায়/শ্লোক নং- ৬৯,পৃঃ-১৩৭

২) মনুসংহিতা (সপ্তমোঽধ্যায়), ডঃ অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী, ২০০৮, সপ্তমোঽধ্যায়/শ্লোক নং- ৭০,পৃঃ-১৪০

৩) মনুসংহিতা (সপ্তমোঽধ্যায়), ডঃ অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী, ২০০৮, সপ্তমোঽধ্যায়/শ্লোক নং- ৭৩-৭৪,পৃঃ-১৪৫-১৪৬

৪) মনুসংহিতা (সপ্তমোঽধ্যায়), ডঃ অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী, ২০০৮, কুল্লুকভাষ্য, পৃঃ- ১৪০

৫) কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্ (প্রথম খণ্ড) অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১০, পৃঃ- ১৮১

৬) মনুসংহিতা (সপ্তমোঽধ্যায়), ডঃ অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী, ২০০৮, কুল্লুকভাষ্য, পৃঃ- ১৪০

৭) মনুসংহিতা (সপ্তমোঽধ্যায়), ডঃ অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী, ২০০৮, কুল্লুকভাষ্য, পৃঃ- ১৪০

৮) কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্ (প্রথম খণ্ড) অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১০, পৃঃ- ১৮১

৯) মনুসংহিতা (সপ্তমোঽধ্যায়), ডঃ অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী, ২০০৮, কুল্লুকভাষ্য, পৃঃ- ১৪০

১০) কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্ (প্রথম খণ্ড) অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১০, পৃঃ- ১৮১

১১) মনুসংহিতা (সপ্তমোঽধ্যায়), ডঃ অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী, ২০০৮, কুল্লুকভাষ্য, পৃঃ- ১৪০

১২) মনুসংহিতা (সপ্তমোঽধ্যায়), ডঃ অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী, ২০০৮, কুল্লুকভাষ্য, পৃঃ- ১৪০

১৩) কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্ (প্রথম খণ্ড), অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১০, পৃঃ- ১৮১

১৪) মনুসংহিতা (সপ্তমোঽধ্যায়), ডঃ অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী, ২০০৮, সপ্তমোঽধ্যায়/শ্লোক নং- ৭১,পৃঃ-১৪৩

১৫) মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২০০৯, [শান্তিপর্ব, ৫৫-৩৫], পৃঃ- ৩১২

১৬) অর্থশাস্ত্র, অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ২ অধিকরণ, ২১ প্রকরণ, ৩ অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৮১

১৭) মনুসংহিতা (সপ্তমোঽধ্যায়), ডঃ অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী, ২০০৮, সপ্তমোঽধ্যায়/শ্লোক নং- ৭৫,পৃঃ-১৪৭

১৮) মনুসংহিতা (সপ্তমোঽধ্যায়), ডঃ অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী, ২০০৮, সপ্তমোঽধ্যায়/শ্লোক নং- ৭৬,পৃঃ-১৪৯

১৯) মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২০০৯, [শান্তিপর্ব, ৮৪/৪-১০], পৃঃ- ৩৪৫

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ-

১) পাহাড়ী, ডঃ অন্নদাশঙ্কর, মনুসংহিতা (সপ্তমোঽধ্যায়), সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা- ৭০০০০৬, ২০০৮

২) বসু, অনিল চন্দ্র, মনুসংহিতা (সপ্তমোঽধ্যায়/ রাজধর্ম), সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা- ৭০০০০৬, ২০০৪

৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক কুমার, মনুসংহিতা (সপ্তমোঽধ্যায়/ রাজধর্ম), সদেশ, কলকাতা- ৭০০০০৬, ২০১২

৪) শাস্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, মনুসংহিতা (সমগ্র),সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা- ৭০০০০৬, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

৫) বসু, অনিল চন্দ্র, কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা- ৭০০০০৬, ২০১২

৬) বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্ (প্রথম খণ্ড), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা- ৭০০০০৬, ২০১০

৭) গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন, রাজনীতির অভিধান, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা, লি, কলকাতা- ৭০০০০১, জুলাই,২০১৩

৮) আলম, বায়েজীদ, প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৭

৯) বসু, রাজশেখর, মহাভারত, লতিকা বুকস্, কলকাতা- ৭০০১০২, ২০১৫

১০) Buck, William, Mahabharata, Motilal Banarsidass, ISBN: 9788120817197, 2008

১১) সিংহ, কালীপ্রসন্ন, মহাভারত, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০০৯

১২) কুমার, ডঃ সুরেন্দ্র, মনুস্মৃতি, আর্শ সাহিত্য প্রচার ট্রাস্ট, জানুয়ারি, ২০১৭, ISBN- 819293201X

১৩) Kumar, Surendra, The Manusmriti, Govindram Hasananad, January, 2022, ISBN- 978-8170773160

১৪) Prason, Prof. Shrikant, Kautilya Arthashastra, V&S Publishers, 2012, ISBN- 9789350578179

ঔপনিবেশিক আমলে মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি ডাকাত দলের অতীত কথা

নূরমহম্মদ সেখ
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ

সারসংক্ষেপ : অপরাধ মানবজাতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। প্রাক কাল থেকে বর্তমান সময়েও মানবজাতি অপরাধের সাথে যুক্ত। এর মধ্যে ডাকাতি নামক অপরাধ ঔপনিবেশিক আমলে ক্রমশই বেড়েছিল। ভারতের তথা বাংলার প্রত্যেক জায়গা বা জেলাতে এর প্রবনতা অনেকটাই ছিল। মেদিনীপুর জেলার দিকে তাকালে আমরা একই চিত্র দেখতে পায়। সাধারণত নিম্নস্তরের মানুষজন অর্থের তাগিদে অনেকসময় এই পেশা বৃত্তি গ্রহন করে থাকতো। মেদিনীপুর জেলার এরূপ কয়েকটি ডাকাত দল হল- শবর দল, দেবী বর্মা'র দল, ভালকিশোল দল, রিয়াজুদ্দিন-রহমান দল ইত্যাদি।
শব্দসূচক : ডাকাত, শবর, দেবী বর্মা, ভালকিশোল, রিয়াজুদ্দিন-রহমান।

হিংস্রতা পশুর ন্যায় মানবজাতিরও এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই সবসময়ই মানুষ তার এই বৈশিষ্ট্যকে বহন করে চলেছে। এই হিংস্রতার সঙ্গে চতুরতা, ব্যভিচারিতা প্রভৃতি গুনাগুণ যুক্ত হয়ে পড়ে সভত্যার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। তাই সকলসময়েই আমরা মানুষের অবরাধপ্রবনতা মানসিকতা দেখতে পায়। কিন্তু আমাদের আলোচনার জায়গা আধুনিক যুগের মেদিনীপুর জেলার অপরাধ নিয়ে। ব্রিটিশ আমলে প্রচুর অপরাধের ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ সরকার 'Criminal Tribes Act' জারি করে ভারতের অনেক জাতির মানুষকে অপরাধি জাতি বলে সম্বোধন করেছে। যাইহোক, IPC (১লা জানুয়ারি, ১৮৬২ সাল) অ্যাক্ট অনুযায়ী অপরাধ প্রবনতাকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে তৃতীয় স্থানে ছিল – ব্যক্তি ও সম্পত্তিগত বা শুধু সম্পত্তিগত অপরাধ। উদাহরণ- ডাকাতি, চুরি, লুণ্ঠন, গোপনে গৃহে অনধিকার প্রবেশ ইত্যাদি।[১] সিঁধচুরি এবং চুরি- এই দু'টিও সম্পত্তিগত অপরাধ, যা 'Total Volume of Crime' (TC) -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[২] ঔপনিবেশিক বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রচুর ডাকাতির মতো অপরাধের ঘটনা ঘটেছিল। এর মধ্যে নদিয়া, হুগলী, বাখরগঞ্জ জেলা ছিল অন্যতম।

অষ্টাদশ শতকে বাংলায় বর্গী হামলা হওয়াতে বহু মানুষের যেমন বহুপরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তেমনি সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চুরি-ডাকাতির মতো বহু অপরাধের মতো ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিল। এই ধরনের অপরাধ বৃদ্ধির কারন হিসাবে অভাব ও দারিদ্রতাকে অনেকটা দায়ি করা হয়ে থাকে। এছাড়াও উনবিংশ

শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার বহু জেলাতে দুর্ভিক্ষ, খরা, অজন্মা, খাদ্যাভাব ইতাদি দেখা দিয়েছিল। ১৮৬৫-৬৬ সালে মেদিনীপুর- ওড়িশাতে দুর্ভিক্ষের, দরুন সেইসব জায়গায় খাদ্যাভাব-অর্থাভাব দেখা দেওয়ায়, সমাজে ডাকাতি করার প্রবনতা অনেকটা দেখা দিয়েছিল।[৩] একইরকমভাবে ১৮৭৩-৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের জন্য খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর সহ প্রভৃতি জেলাতে। ফলত ঐসব স্থানে সম্পত্তিগত অপরাধের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে গিয়েছিল। ফসল খারাপ হওয়ায় মেদিনীপুরে সম্পত্তিগত অপরাধ তথা চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই- এর সংখ্যা ১৮৬৬ সালে ছিল ১২৯৭ টি (চুরি ও ছিনতাই -১০৪৫ টি, এবং ডাকাতি ২৫২ টি), ১৮৬৭ সালে ছিল ৫৫০ টি (চুরি ও ছিনতাই - ৪৫৮ টি, এবং ডাকাতি ৯২ টি)।[৪] এইসময় মূলত খাদ্যশস্য লুঠপাঠ করা হত।

লর্ড হেস্টিংস সেকালের বাংলার ডাকাতদের ‘পিতা থেকে পুত্র পর্যন্ত সমাজের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা আইন অমান্যকারী জাতি’ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।[৫] তবে এটা ঠিক যে, বাংলায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের গোড়ার দিক থেকেই সাধারণ মানুষজন ডাকাতিকে নিজেদের জীবিকা হিসাবে গ্রহন করার ফলে সারা বাংলায় ডাকাতির একটা ব্যাপক বেড়াজাল তৈরি হয়েছিল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসে (চতুর্থ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ) লিখেছেন ‘প্রতাপ জমিদার ও তিনি দস্যুও’। অর্থাৎ সেইসময় জমিদার নিজ সম্পত্তি রক্ষার জন্য বা শত্রুদের দমন করার জন্য দস্যুদের সাহায্য গ্রহন করতেন। জমিদারদের অনেকসময় নিজস্ব লাঠিয়াল থাকতো, প্রয়োজনে তাঁরা ডাকাতি বা লুঠপাঠ করতো। ফলত সেই সময় কৃষকদের ডাকাতে পরিনত হওয়াটা একটা সাধারণ ব্যপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে- ১৭৭১ সালের ১৯শে এপ্রিল মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ পরিষদকে রউস লিখেছিলেন- ‘কিছু সংখ্যক কৃষক, যারা এতদিন পর্যন্ত প্রতিবেশীদের মধ্যে সবচেয়ে সচ্চরিত ছিল, নিজেদের জীবিকা অর্জনের জন্য এই চরম বেপরোয়া পথের আশ্রয় নিয়েছে’।[৬] অর্থাৎ যারা দিনে সাধারণ মানুষ বা কৃষক, রাতেই তাঁরা ডাকাতে পরিনত হত। অর্থাৎ ডাকাতি বা চুরির মতো অপরাধ যে পেশাগতভাবে অপরাধীদের দ্বারা ঘটত তা নয়; অনেকসময় সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, যেমন- কৃষি মজুর, ছোট কৃষক, ছোট শিল্প শ্রমিক যারা সাধারণত চাষাবাদের উপর অনেকটাই নির্ভর করে জীবনযাপন করে থাকতো, অভাব দেখা দিলে খাদ্য বা বেঁচে থাকার তাগিদে ডাকাতি তথা দস্যুবৃত্তি করে থাকতো।[৭] এর প্ররিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, চুরি বা ডাকাতি বা অন্য কোন অপরাধ যেকারনেই ঘটে থাকতো, তা যে সমাজ বিরোধী কাজ সেটা স্বীকার করতেই হয়।[৮] শুধুমাত্র খাদ্যের তাগিদেই বা বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তাই যে ডাকাতির মতো অপরাধমূলক ঘটনা গুলো ঘটে থাকতো তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে ধনী হওয়ার জন্য বা অনেকে সৎ ভাবে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত না থাকায় অনেক সময়

অপরাধমূলক কার্যকলাপকে পেশা হিসাবে গ্রহন করে থাকতো।[৯] সব দরিদ্র মানুষজন যে অপরাধমূলক কাজে নিজেকে জুড়িয়েছিল সেটা যেমন ঠিক নয়, তেমনই সকল অপরাধী যে আর্থিকভাবে দরিদ্র ছিল তা নয়।[১০] অপরাধের সাথে যুক্ত চোর-ডাকাতদের নিজস্ব একটি সংগঠন বা দল থাকতো। দলের প্রধানকে সাধারণত 'সর্দার' বলা হয়ে থাকতো। চুরি বা ডাকাতির পরিকল্পনা সাধারণত তিনিই করে থাকতেন। কবে, কোথায়, কীভাবে কার্যসম্পাদন করা হবে তিনি তা ঠিক করতেন এবং এই কার্যকলাপকে সঠিকভাবে সম্পাদন করতে আগে থেকেই সমস্ত বিষয়ে খবরাখবর রাখতেন গুপ্তচরদের মাধ্যমে।[১১] দলের সদস্যদের প্রত্যেকের কি ধরনের কার্যসিদ্ধি করতে হবে তা সর্দারই পরিকল্পিতভাবে ঠিক করতেন। ফলত ডাকাতি করে প্রাপ্ত সম্পত্তির অনেকাংশই তিনি নিজের অধীনে রাখতেন।[১২] ডাকাতেরা সাধারণত অস্ত্র হিসাবে সিঁধকাঠি, লাঠি, কুড়োল, তরবারি, টর্চ বা হারিকেনের আলো, দরজা ভাঙার জন্য ঢেঁকি, দেওয়াল পাড়ি দেওয়ার জন্য গরুর গাড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকতো।

বাংলার নদীপথ ডাকাতদের ডাকাতি করার অন্যতম পথ ছিল। সেইসময় বহু মানুষ নদীপথ বেয়ে কলকাতা যাতায়াত করতো। ফলত তাঁরা ডাকাতদের রোষানলে পড়ত। ডাকাতেরা কখনও স্থানিয়ভাবে বা কখনও দূরদূরান্তে গিয়ে ডাকাতি করতো। অনেকসময় কলকাতার ডাকাতরা প্রধানত হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় তাদের কার্যসম্পাদন করতো। স্থানীয় তালুকদার বা জমিদার অনেকসময় ডাকাতদের দ্বারা লুণ্ঠিত দ্রব্য জমা রাখতেন। মেদিনীপুর জেলায় 'চুয়াড়' জাতির মানুষেরা জমিদারদের পরোক্ষ সহায়তায় ডাকাতিতে নিযুক্ত থাকতো।

এখানে মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি ডাকাত দলের ইতিহাস বিশেষভাবে উল্লেখ্য-

শবর দল— মুলত শবর জাতির মানুষদের নিয়ে গঠিত এই চোর ও ডাকাতের দলটি। শবররা আদতে বেদে এবং কিছু ক্ষেত্রে জমিতে চাষাবাদের সাথে যুক্ত ছিল। ১৯১১ সালে পটাশপুর থানার অধীনে মাধবপুর ডাকাতির ঘটনা ঘটলে এই দলের প্রথম প্রকাশ ঘটে, যদিও তখনও কেউ সেই দলের প্রধান ছিলেন না। পরবর্তী সময়ে মহেন্দ্র ভঞ্জা দলের নেতৃত্ব গ্রহন করে এবং দলটি নতুনভাবে গড়ে উঠে। এই দলের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ২২ জন, ১৯২১ সালে সরকার যখন এই দলের রিপোর্ট লেখেন তখন অনেক সদস্য মারা গেছিল এবং অনেকে এই পেশায় আগ্রহ হারিয়েছিল। কিন্তু, তখন দলের সদস্য ছিল মোট ১৫ জন। এই সদস্যদের বাসস্থান ছিল জোরাগড়িয়া (৫ জনের), ধনেশ্বরপুর (২ জনের), তালিয়াগড়িয়া (৩ জনের), এছাড়াও অন্যান্য জায়গায়। মনে রাখতে হবে যে, এই সব গ্রামগুলো পাশাপাশি অবস্থিত ছিল।

দীর্ঘদিন ধরে এই দলের কথা স্থানীয় থানায় জানা ছিল। কিন্তু কোন জোড়াল প্রমাণ ছিল না, তাই কোন কার্যকর কার্যকলাপ নেওয়া হয়নি। তবে ১৯০৫ সাল থেকেই এই দলটির উপর আলোকপাত করা হয়ে থাকে। ১৯২০ সালে, কয়েকটি ডাকাতির

ঘটনাকে কেন্দ্র করে Mr. T. J. A. Craig (SP) এই দলের কয়েকজন সদস্যকে অপরাধী সাব্যস্ত করে এবং এই দলকে Criminal Tribes Act- এর অধীনে আনা হয়। ১৯২১ সালে, ডেপুটেড ইন্সপেক্টর প্রফুল্ল চরন গাঙ্গুলি ও সাব-ইন্সপেক্টর কালিপদ চৌধুরী এবং দু'জন পুলিশ অফিসার Y. Ali Khan (DSP) -এর অধীনে এই দলের সদস্যদের ধরপাকড় শুরু করে।

এই দলটি মোট ৩৪ টি জামিন অযোগ্য অপরাধমূলক কাজ করেছিল। যেমন- ১১ টি ডাকাতি, ৪ টি ছিনতাই, ৭ টি রাহাজানি, ১০ টি চুরি, এবং ২ টি আগুন লাগানোর মত অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল।[১৩]

দেবি বর্মা'র দল— মেদিনীপুর জেলার দেবি বর্মার নেতৃত্বে এই দলটি গড়ে উঠেছিল। দেবি বর্মার প্রধান সহকর্মী ছিলেন দিনু বা অধর সিংহ বা ভুমিজ। তিনি মূলত অপরাধের কুপ্রশিক্ষন পেয়েছিলেন দুইজন কুখ্যাত ডাকাত মুক্তনাথ মাইতি ও মহেন্দ্র মুচি- এর কাছ থেকে। ১৯১১ সালে দেবি বর্মা, শরৎ চৌধুরী, দিনু সহ অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ বেশ কিছু ডাকাতির ঘটনা ঘটান যা সেই সময় খড়্গপুর, ডেবরা ও পাশকুড়া থানায় নথিভুক্ত হয়। এই দলের অনেক সদস্য বার বার ধরা পড়ে এবং ১৯১৯ ও ১৯২২ সালে তাঁরা আবার নতুন করে দল গঠন করে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে। সরকারি তথ্য থেকে জানা যায়, এই দলটির মোট সদস্য ছিল ৩০ জন। এদের মধ্যে ব্রাহ্মন ২ জন, কায়স্থ ২ জন, মাহিষ্য ২ জন ও এছাড়া ছিল সৎগোপ, বৈষ্ণব প্রমুখ গোষ্ঠীর মানুষ। এরা সকলে খড়্গপুর, ডেবরা অঞ্চলের আশাপাশের বাসিন্দা ছিলেন। ১৯০৯ সাল থেকেই এই দল পুলিশের নজরে আসতে থাকে। ১৯১০ সালে এই দল ৬ টি- এরও বেশি ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই দলের সদস্যরা সর্বমোট ৪০ টি জামিন অযোগ্য অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এর মধ্যে ২১ টি ছিল ডাকাতি, ৮ টি ছিনতাই, ৪ টি রাহাজানি এবং অন্যান্য গুলো ছিল চুরির মতো ঘটনা।[১৪]

ভালকিশোল দল— সুজন সিংহ- এর প্রধানত্বে এই দল গঠিত হয়েছিল। এছাড়াও অন্য এক সদস্য ছিলেন বৈকুণ্ঠ আরি, জাতিতে লোধা, যিনি ১৯০৯ সালে খড়্গপুর থানায় দুইটি ডাকাতির ঘটনায় (কেস নং- ৩ ও ৫, সেপ্টেম্বর ১৯০৮) অভিযুক্ত হন এবং ৮ বছরের জন্য কারাবাস লাভ করেন। জেল থেকে বেড়ানোর পর ভূবন লোধা, কুঞ্জ লোধা, চামটু লোধা ও কেশব লোধার সহযোগিতায় অন্য একটি দল গঠন করেন। যাইহোক, ১৮ জন সদস্যবিশিষ্ট এই দলের বসতি ছিল ভালকিশল গ্রাম, বৈদ্যপুর, কাটমিমারো, চুপারা প্রভৃতি গ্রামে। খড়্গপুর, গোপি-বল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম থানার অন্তর্ভুক্ত আশেপাশের গ্রামে এই দলের গতিবিধি লক্ষ করা যেত। ১৯০৯ সালে এই দলের তিনজনকে চিহ্নিত করা গেলেও দলটি প্রথম পুলিশের নজরে আসে ১৯১৭ সালে। এই দলের এক সদস্য খড়্গপুর থানায় গ্রেপ্তার হলে, তাঁর স্বীকারোক্তিতে এই

দলের নাম প্রথম জানা যায়। এই দলটি মোট ১৭ টি অভিযুক্তর সাথে জড়িত ছিল, যার মধ্যে ১১ টি ডাকাতি, ৩ টি ছিনতাই, ২ টি চুরি ও অন্যান্য ঘটনা।[১৫]

রিয়াজুদ্দিন-রহমান দল— এই দলের প্রতিষ্ঠাতা রিয়াজুদ্দিন শেখ ও রহমান শেখ- এর নামানুসারে এই দলের নামকরণ। সর্বমোট ৭০ জন নিয়ে গড়ে ওঠা এই দলের ৪০ জনই ছিলেন জাতিতে মুসলমান। তাদের মধ্যে ৬১ জন কনটাই থানার অধীনে ২০ টি গ্রামে, এবং বাকি ৯ জন বাহিরি থানার অধীনস্থ ৭ টি গ্রামে বাস করতো। উক্ত সমস্ত গ্রাম ৭ মাইলের মধ্যেই অবস্থান করতো। এই দলের কিছু সদস্য পুলিশের নজরদারিতে আসতে থাকে ১৮৯৩ সাল থেকে, কিন্তু ১৯১৬ সালে কিছু বেআইনি কাজের জন্যে রিয়াজুদ্দিন শেখ ও হাবিব শেখ কারারুদ্ধ হলে, সেখানে সাব ইন্সপেক্টর রায়মোহন বোস- এর কাছে স্বীকারোক্তির ফলে দলটি সম্পর্কে পুলিশে জানতে পারে। মোট ৫১ টি অপরাধের সাথে দলটি যুক্ত ছিল। ১৯১৮-১৯১৯ সালে IPC ৪০১ সেকশন অনুযায়ী ১৬ জনের মধ্যে বেশ কয়েকজন ১০ বছরের জন্য এবং কয়েকজন সারাজীবনের জন্য কারারুদ্ধ হন। ১২ জন ২ বছরের জন্য, ৬ জন অজামিন যোগ্য, এছাড়া ২৫ জন বিভিন্ন অপরাধের জন্য কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।[১৬]

বিনপুরের পল্টু শেখ-এর দল— কাপগরি গ্রামের (থানা জাম্বনি) পল্টু শেখের নেতৃত্বাধীন এই দলটি গড়ে উঠে। প্রথমে তিনি ‘কাপগারি-বেরাগরি’ দলের প্রধান নেতা গোবর্ধন সিংহ- এর সহযোগী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। গোবর্ধন সিংহ- এর মৃত্যুর পরবর্তীকালে উক্ত দল পল্টু শেখ- এর দল নামে পরিচিত লাভ করে। ১৯২১ সালে এই দলটি পুলিশের নজরে আসে, কারন সেইসময় ঐ অঞ্চলে খুব বেশি ডাকাতির ঘটনা ঘটে থাকছিল। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ঝাড়গ্রাম থানার অধীনে বারাসুলি ডাকাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ এই দলের সন্ধান পান। ফলত, এই দলের চার জনের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয় এবং ১৯২২ সালের ৬ই এপ্রিল ধরা পড়েন এবং তিনি স্বীকারোক্তি দেন যে, তাঁরা ১৯২০ সাল থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে মোট ৩৮ টি ডাকাতি করেছিলেন এবং এই ৩৮ টির মধ্যে তিনি (পল্টু শেখ) নিজে ২৭ টি ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। মূলত, ৩৩ জন ব্যক্তি নিয়ে এই দলটি গড়ে উঠেছিল এবং এদের প্রত্যেকেই নিচু সম্প্রদায়ের হিন্দু জাতির মানুষ ছিলেন। যেমন- ভোক্তা ৭ জন, খেড়ীয়া- ৫ জন, ভুমিজ- ২ জন, ছত্রি-৫ জন, ঘড়িয়া-৬ জন প্রমুখ। বেশীরভাগ সময়ই ডাকাতি করার সময় এই দলের সদস্যরা মহিলা ছদ্মবেশ গ্রহন করতো। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম, গড়বেতা, বিনপুর থানা সমুহ ও বাঁকুড়া জেলার শালবনি ও রাইপুর থানা সংলগ্ন অঞ্চলে তাদের ডাকাতি করার প্রধান কেন্দ্র ছিল। পল্টু শেখের বয়ানে অন্যান্য সদস্যরা গ্রেপ্তার হওয়ায় তাঁরা ঝাড়গ্রাম জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় সাক্ষ্য লোপাট করার জন্যে পল্টু শেখ কে হত্যা করার চেষ্টা করেন। যাইহোক, মোট ৩৪ জন IPC ৩২৩-৩৩২, ১৪৭ ধারা সমূহে দোষী সাব্যস্ত হন।[১৭]

হিরালাল সিংহ দল— কাঁথি উপ-বিভাগের অন্তর্গত বাসুদেবপুর থানার কেনারাম দাস ও রামনগরের কপিল মিশ্র- এর পৃথক দুই ডাকাত দল ছিল। চন্দনপুর গ্রামে কপিল মিশ্রর বিয়ে হয় এবং ঐ গ্রামের বাসিন্দা কেনারাম দাসের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা বাড়ে এবং তাদের পৃথক পৃথক দল একত্রিত হয়ে নতুন একটি দল গড়ে ওঠে। এগ্রা থানায় ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে (কেশ নং-৯) কপিল মিশ্রর নামে কেশ হয় এবং কেনারাম দাস এককভাবে দলটির প্রতিনিধিত্ব করেন। পরবর্তীকালে এই দলের নেতা রূপে প্রতিষ্ঠিত হন হিরালাল সিংহ। হিরালাল সিংহ ছিলেন বাসুদেবপুর থানার অন্তর্গত বেতা মহেশপুর গ্রামের জমিদার নরেন্দ্র পাহাড়ির 'নগরি' রূপে নিযুক্ত ছিলেন। জাগুলিয়া ডাকাতির (এগ্রা থানা, কেশ নং- ৫, তারিখ ১৯শে আগস্ট ১৯১৩ সাল) সময় গ্রামবাসীদের হাতে কেনারাম দাস নিহত হন। এই দলের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৫ জন। এদের মধ্যে শিখ, তাতি, কৈবর্ত, গোয়ালা, মুসলমান প্রমুখ জাতির মানুষ ছিলেন। এইসব সদস্যরা এগ্রা থানার নয়টি গ্রাম এবং রামনগর থানার ছয়টি গ্রাম এবং কাঁথি থানার অন্তর্গত দু'টি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তবে উল্লেখ্য যে, সমস্ত গ্রামই ৮ মাইল এলাকার মধেই অবস্থিত ছিল। এই দল সর্বমোট ৫৪ টি ডাকাতির ঘটনায় যুক্ত ছিল।

১৮৮৮ সাল থেকেই এই দলের অবস্থিতি ছিল, কিন্তু ১৯১২ সালে এই দলের কার্যকলাপ পুলিশের নজরে আসে। ১৯১৫ সালে পুলিশ এই দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে থাকেন। পুলিশের মুখ্য কর্তা ছিলেন মতিলাল মজুমদার।[১৮]

কাপগরি-বেরাগরি দল— গোবর্ধন সিংহ ছিলেন এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাম্বনি থানার কুচুসুলি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ১৯২২ সালে মহেন্দ্র ভুমিজ- এর মৃত্যুর পর এই দলের নেতৃত্ব লাভ করেন তিনি। ১৯১৫ সালে এই দল প্রথম ছিনতাই ও চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের নজরে আসে এবং তদন্তের দরুন বেশ কিছুজন কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে বেরোনোর পর এই দলের সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯১৮ সালে ১৫ জন সদস্য এক বছরের জন্যে জেলে যান এবং এই দলের সদস্য আরও বেড়ে দাড়ায় ৮৩ জন। এই দলের প্রধান দায়িত্বে থাকেন মহেন্দ্র ভুমিজ ও পলটু সেখ। ১৯২১ সালের পর এই দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে— পলটু সেখ- এর নেতৃত্বে ৩৪ জন সদস্য এবং মহেন্দ্র ভুমিজ- এর নেতৃত্বে বাকি ৪৯ জন। মহেন্দ্র ভুমিজ- এর দলটি গোবর্ধন সিংহ- এর নেতৃত্বে 'কাপগরি-বেরাগরি দল' এবং পলটু সেখ- এর নেতৃত্বাধীন দল ' পলটু সেখ- এর দল' নামে পরিচিতি লাভ করে।[১৯]

উক্ত কয়েকটি দলের বিবরণ দেওয়া হলেও এই জেলায় বহু ডাকাতির ঘটনা ঘটে থাকতো। এখানে উল্লেখ্য, তাম্রলিপ্তের সেনাপতি অমরকেতু এক রাত্রিতে গড়ে আসবার পথে দেখেন একটি বড় ঘরে ডাকাতি হচ্ছিল, সেখানে প্রায় ১০০০ জন ডাকাত বহু অস্ত্র নিয়ে উপস্থিত ছিল, ফলত তিনি ডাকাতদের বিরুদ্ধে আক্রমণে নেমে পড়েন।[২০] এছাড়াও, এই জেলার অপরাধমূলক কার্যধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়

যে, পর্যায়ক্রমে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল যথাক্রমে ১৯৫১ সালে ৩৩ টি, ১৯৫২ সালে ৪৯ টি, ১৯৫৩ সালে ১৭ টি, ১৯৫৪ সালে ৫৩ টি, ১৯৫৫ সালে ৫১ টি, ১৯৫৬ সালে ২৫ টি, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে ১৫ টি করে, ১৯৫৯ সালে ৬১ টি এবং ১৯৬০ সালে ৭৮ টি। এছাড়া ছিনতাই ও চুরির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯৫১ সালে ১৮ ও ৩৩৯ টি, ১৯৫২ সালে ২১ ও ৩২৩ টি, ১৯৫৩ সালে ১০ ও ৩১৩ টি, ১৯৫৪ সালে ২৮ ও ৩৭৬ টি, ১৯৫৫ সালে ৭ ও ৩৭৮ টি, ১৯৫৬ সালে ১৪ ও ৩২৮ টি, ১৯৫৭ সালে ২৩ ও ৩১৯ টি, ১৯৫৮ সালে ১০ ও ৩৫৮ টি, ১৯৫৯ সালে ২২ ও ৩১২ টি, ১৯৬০ সালে ১৪ ও ৩৭০ টি।[২১] এখানে দেখাই যাচ্ছে যে এই জেলায় অপরাধের প্রবনতা অনেকটাই ছিল।

১৭৭২ সাল থেকে ১৮৬২ সালের মধ্যে বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোর, এবং ২৪ পরগণা ডাকাত দলের দ্বারা বেশ অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল।[২২] এর পরবর্তীকালেও অর্থাৎ উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও তারপরেও মেদিনীপুর জেলায় ডাকাতির সংখ্যা অনেকাংশে বেড়েছিল; ১৮৪৭-৫১ সালে ৫৫ টি, ১৮৫২-৬৪ সালে ৩১ টি, ১৮৬৫-৭৫ সালে ৬৭ টি, ১৮৭৬-৯৯ সালে ১৬ টি, ১৯০০-১৯০৪ সালে ৪৮ টি ১৯০৫-১২ সালে ২২ টির মতো ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল।[২৩]

পরিশেষে দেখা প্রয়োজন যে, কোন শ্রেণীর মানুষ বা কোন জাতির মানুষজন মূলত অপরাধের তথা চুরি ডাকাতিতে নিযুক্ত থাকতো। প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্থের তাগিদে ডাকাতির পেশাকে অনেকেই গ্রহন করেছিল। সাধারণত নিম্নস্তরের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এই কাজে লিপ্ত হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে সাধারণত সনদর ও তাতিয়া গোষ্ঠীর মানুষ অপরাধের সাথে জড়িত থাকতো। অন্যদিকে নিম্নস্তরের হিন্দুদের মধ্যে মেদিনীপুরে ছিল ভুমিজ, বাগদি, লোধা জাতির মানুষ।[২৪] মহেশ্বেতা দেবী এদের সম্পর্কে অনেক তথ্য লিখে গিয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জি:

১। Mukhrejee, Arun, Crime and Public Disorder in Colonial Bengal: 1861-1912, K. P. Bagchi and Company, Calcutta, p-26
২। তদেব, পৃষ্ঠা. ২৮-২৯
৩। তদেব, পৃষ্ঠা. ৫০-৫১
৪। তদেব, পৃষ্ঠা. ৫২
৫। চক্রবর্তী, রানা, সেকালের ডাকাত ও জমিদার সম্পর্ক, ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য, ফেসবুক বা https://www.facebook.com/groups/580588732085640/permalink/2725819814229177/?mibextid=Nif5oz, শেষ দেখা- ২৯/১২/২০২২

৬। Progs. Of Controlling Council of Revenue at Murshidabad, Vol. V. p. 63
৭। Mukhrejee, Arun, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৫
৮। তদেব, পৃষ্ঠা. ৬০
৯। তদেব, পৃষ্ঠা. ৯৪
১০। Banerjee, Sumanta, The Wicked City: Crime and Punishment in Colonial Calcutta, Orient BlackSwan, New Delhi, 2009, p. 21
১১। ভট্টাচার্য, পাঁচুগোপাল, বাংলার ডাকাত, শিশু সাহিত্য প্রচার সংস্থা, কলকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা. ১৯-২০
১২। Mukhrejee, Arun, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৮৩
১৩। Government of Bengal, Political Department, Police, Declaration of the Sabor Gang in the district of Midnapore, File No. P.3-T-15(1), November 1921, pp. 330-331
১৪। Government of Bengal, Political Department, Police, Declaration of the Debi Barma's gang of Midnapore, File No. P.3-T-6(1), May 1925, pp. 93-94
১৫। Government of Bengal, Political Department, Police, Declaration of the Bhalkishol gang of Midnapore, File No. P.3-T-24(1) of 1919, January 1920, pp. 63-64
১৬। Government of Bengal, Political Department, Police, Declaration of the Reazuddin-Rohoman's gang of Midnapore, File No. P.3-T-16(1), July 1920, pp. 17-18
১৭। Government of Bengal, Political Department, Police, Declaration of the Paltu Shaikh's gang of Binpur, District Midnapore, File No. P.3-T-17(1), October 1923, p. 20
১৮। Government of Bengal, Political Department, Police, Declaration of the Hiralal Singh's gang of Midnapore, File No. P.3-T-12(1), October 1917, pp. 13-14
১৯। Government of Bengal, Political Department, Police, Declaration of the Kapgari-Beragari gang of Midnapore, File No. P.3-T-18(1), December 1923, pp. 19-20
২০। জানা, যুধিষ্ঠির, বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস, কলিকাতা পুস্তকালয়, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা. ৩১০

২১। West Bengal District Census Handbook, Midnapore, Volume I, Census 1961, B. Ray, 1966, p. 443
২২। Mukhrejee, Arun, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৪১
২৩। তদেব, পৃষ্ঠা. ৪২
২৪। তদেব, পৃষ্ঠা. ৮৬

নারীর অন্তরের স্বাধীনতায় নারীত্বের উত্তরণ : কবিতা সিংহ (১৯৩১-১৯৯৮) ও সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০-২০১৫)-এর ছোটগল্প

সুরভি সাহা
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের জাগরণে ও বলিষ্ঠ ভাষার প্রয়োগে নারীকে নারীত্বের নিজস্ব আকাশে মুক্ত বাতাস নিয়ে বাঁচতে শেখানোয় বাংলা সাহিত্যের ষাটের দশকের অবিস্মরণীয় নাম কবি ও কথাসাহিত্যিক কবিতা সিংহ। তাঁর অন্তরের স্বাধীনতার প্রয়োগ কখনোই পুরুষ বিদ্বেষী হয়ে নয়; বরং কবিতা সিংহের ছোটগল্পের নারীর প্রকাশ ও বিকাশ নিজেদের অস্তিত্বের সচেতনতায়, 'মেয়েমানুষ' থেকে মানুষ হয়ে ওঠার গল্পে। পুরুষের ছায়ালম্বন থেকে বেড়িয়ে কবিতা সিংহের নারী সেই পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসনের কঠোর সময়ে দাঁড়িয়েও নিজস্ব বয়ানে নিজের কথা বলার স্বাধীনতা দেখিয়েছে, জীবনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সময়কালকে উত্তীর্ণ করে ষাট-সত্তর দশকের কবিতা সিংহের ছোটগল্পের নারী একবিংশ শতকের আধুনিক মননে একই ভাবে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আর নারীকে এই পৃথক অস্তিত্ব প্রদানে বিশ-একুশ শতকের সুচিত্রা ভট্টাচার্যও স্বাতন্ত্র্যময়ী, কখনো বা তাঁকে অনিচ্ছাকৃত উত্তরসূরী রূপেও ভাবতে পারি। এই দুই লেখিকাকে অনেক বিদগ্ধজনেরাই নারীবাদী লেখিকা বলে মনে করেন। কিন্তু এঁরা নারী পুরুষের লিঙ্গগত বৈষম্যের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কেবল পুরুষের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নিজের অধিকার আদায়ে বিশ্বাসী ছিলেন না এই দুই লেখিকা। বরং নারীত্বের আধুনিক বোধ ও উদার মানসিকতাকে মননে ও চেতনায় স্থান দিয়ে তারা জীবনের পথে হেঁটেছে। তাই তাঁরা নারীর যন্ত্রণা, সুখ, দুঃখ, অনুভূতিকে ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে নারীর সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতার দিকটি দেখাতে অস্বীকার করেননি। অন্তরের স্বাধীন ও উন্মুক্ত বোধে নারীকে উত্তরণের পথে হেঁটে যেতে সাহায্য করেছেন তাঁদের বলা জীবনের গল্পে। এই দুই নারী সাহিত্যিকের আধুনিকতা, জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশের বাচনভঙ্গিমা পৃথক হয়েও, যেন তাঁদের স্বতন্ত্র চেতনা নারীর নারীত্বকে বারবার গড়ে পিঠে নিয়েছে এক উন্মুক্ত আধুনিক সংস্করণ দিয়ে। কবিতা সিংহের গল্পের নারীর স্পষ্ট ও দৃপ্ত প্রতিবাদ কোথাও যেন সুচিত্রাদেবীর নারীর আধুনিক সমস্যা, অস্থিরতা-অন্তর্দ্বন্দ্বে ও জীবনের উত্তরণে মিশে যায়। তাই সুচিত্রাদেবী বা কবিতা সিংহ, দুই

লেখিকারই সৃষ্ট নারীসত্তারা চেতনে-মননে-অনুভবে কতটা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন তারই একটি নিরীক্ষণের পাঠ দেওয়ার প্রচেষ্টা রইল।

সূচক শব্দ : ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, নারীত্বের উত্তরণ, স্বাধীন চেতনা, উন্মুক্ত আধুনিকতা

"গাছের মতন তুমি, প্রত্যেক বসন্তে দেহে
নতুন মুকুল!
গাছের মতন তুমি, শরীরে ফেরাও সুর
অঙ্গে ফেরাওগান
অমর্ত আরতি!'

['নারীকে'/ অগ্রন্থিত কবিতাবলী, কবিতা সিংহ]

বিশ শতকের ষাটের দশকের কবি কবিতা সিংহের কলম নারীকে এমনই গাছের বৃহত্তর বর্ণময় ও বিচিত্ররূপে দেখতে চেয়েছিলেন বরাবরই। সেই দশকের পুরুষান্তরালকে অতিক্রম করে নারীর চোখে নারী সুন্দর হয়ে উঠেছে, নারীর একান্ত বয়ান প্রকাশ পেয়েছে। বলাবাহুল্য এর সূত্রপাত যদি দেখি, পঞ্চাশের দশকে রাজলক্ষ্মী দেবীর ভাষায় প্রথম পরিবর্তিত হচ্ছে নারী পরিচিতির আকাশ, স্বাতন্ত্র্যবোধ— 'অর্ধেক মানবী আমি, অর্ধেক যন্ত্রণা'। না, এসব আয়োজন কোনো উগ্র নারীবাদী কণ্ঠস্বর প্রতিষ্ঠার জন্য নয়; বরং নারীর যন্ত্রণা সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-অনুভূতি, অস্তিত্ব মূল্যবোধের টানাপোড়েনে নারী তার অস্তিত্বকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। সর্বোপরি নারীর নিজের একান্ত বয়ানে তার চিন্তনের স্বরূপ তুলে ধরতে চেয়েছে। আর এই চিন্তনই নারীর অন্তরের স্বাধীনচেতনা সত্তাকে গড়ে তোলে— যে স্বাধীন সত্তার সন্ধান আমরা কবিতা সিংহের ছোটগল্পের নারীতে বারেবারেই পাই। অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের এই প্রবহমান ধারায় বহু বছরের ব্যবধানে সেই একই স্বাধীনসত্তাকে খুঁজে পেতে আমরা আশি-নব্বই দশকের সুচিত্রা ভট্টাচার্যকেও আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতেই পারি। কারণ দশকের পর দশক জুড়ে নারীকলমের সৃজনীশক্তি নারীর গড়ে ওঠা জীবনের স্বতন্ত্র অভিমুখকে উন্মোচিত করে চলেছে— সুচিত্রাদেবী ও তাঁর গল্পের নারীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই নারীত্বের উত্তরণের পথে আমরা সুচিত্রাদেবীর বেশ কয়েকটি ছোটগল্পকেও বেছে নেব।

উক্ত বিষয়ের আলোচনায় বিংশ শতাব্দীর দুই পৃথক দশকের নারী সাহিত্যিক ও তাঁদের সেই বেশকিছু স্বাতন্ত্র্যময়ী নারীর ছোটগল্পগুলি নির্বাচন করা হল। ষাটের দশকের কবিতা সিংহ ও আশির দশকের সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কয়েকটি ছোটগল্পের পর্যালোচনায় নারীর অন্তরের আধুনিক বোধ ও স্বাধীন চেতনার প্রকাশকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করব। তার সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা করব এই পৃথক দুই দশকের সময়কালের পার্থক্য আদৌ দুই ছোটগল্প লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিক চেতনাকে ও লেখার বয়ানকে

প্রভাবিত করতে পেরেছে কিনা বা কতটা ভিন্ন হয়েও অভিন্ন হয়েছে। আসলে প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিকতাকে পেরিয়ে বাংলা সাহিত্যে নারী সত্তার উত্তরণের দিশা, তাঁদের কলমের স্বকীয়তায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যন্ত্রণা, আত্মসংকট, অপমানের বিরুদ্ধে তাঁদের গল্পের নারী প্রতিবাদ জানাতে পারে দৃষ্ট ভাষা ও আচরণে।এক্ষেত্রে কবিতা সিংহের কয়েকটি ছোটগল্প, যেমন— 'খেলতে খেলতে একদিন', 'চিন্ময়ীর নিজস্ব জীবন', 'টুলির বড়দিন', 'লীলার গভীরে', 'মায়ের মতো' (একটি অগ্রন্থিত গল্প), 'একটি অশুচি মেয়ের গল্প'— ইত্যাদি ভিন্ন নারী জীবনের গল্পেক বেছে নেওয়া হল। অন্যদিকে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'বয়ঃসন্ধি, দ্বিতীয় পর্ব', 'ময়না তদন্ত', 'আমি মাধবী', 'ঝিনুক খোঁজার বেলায়', 'বনসাই', 'একদিন কল্লোলিনী তিলত্তমা হবে', 'এপার ওপার'-এর মতো ছোটগল্পগুলি থেকে খুঁজে নেওয়ার প্রচেষ্টা থাকবে নারীর আধুনিক রূপকে ও স্বাধীন চেতনার পরিচয়কে।

বস্তুত কোনো গল্পেই কবিতা সিংহ ও সুচিত্রা দেবীর নারীর চূড়ান্ত প্রতিমা নির্মাণের লক্ষ্য ছিল না। বরং নারী চরিত্রের স্বতন্ত্র ও আধুনিক চেতনার ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে গল্প থেকে গল্পান্তরে চলে, তাঁদের এক অনন্ত নিরুদ্দেশযাত্রা। নারীর নিজস্ব চেতনার প্রকাশের বদল ঘটেছে প্রতি জীবনের গল্পেই। তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা, জীবনকে দেখার অভিজ্ঞতাই তাদের অন্তরে আধুনিকতার সংজ্ঞা ও স্বতন্ত্রচেতনাকে সৃষ্টি করতে উপযোগী হয়েছে। অর্থাৎ কবিতা সিংহ ও সুচিত্রা দেবীর ছোটগল্পের নারী কেবল আধুনিক পোশাকেই সজ্জিত নয়; আধুনিক মননেরও অধিকারী। স্বাধীন চেতনায় ও ভাবনায় তাদের সুগভীর আশা ও বিশ্বাস।

কবিতা সিংহের 'খেলতে খেলতে একদিন' গল্পের অনিমা নিরন্তর জীবনের পথে খেলতে নেমেছে। কোনো গভীর যন্ত্রণা, না পাওয়া গড়পড়তা জীবনের স্মৃতিরোমন্থন করতে 'গোল গোল নীল নীল চ্যাপটা চ্যাপটা— ঘুঁটি' সংগ্রহ করেছে একমাত্র মুক্তির পথ ভেবে। সে খুঁজে নিয়েছিল নারীসত্তার অপমান থেকে মুক্তির খেলাকে। হ্যাঁ, হয়তো সে পথ, সে খেলা অন্যরকম। তবুও তো সে স্বতন্ত্র মুক্তির পথ খুঁজেছে— অপমান, লাঞ্ছনা, না পাওয়ার কঠোর যন্ত্রণার জীবন থেকে, তার মতো করে। অনিমা পারেনি স্বামীর সঙ্গে 'বরাদ্দ ফূর্তি'-তে গা ভাসাতে। একদিন যে অনিমা মাঠে ছোটছেলেদের দিয়ে নাটক, সরস্বতী পূজা করাত, খেলার শেষে স্তব করাত— 'হে ভারত, ভুলিও না, তোমার নারী জাতির আদর্শ, সীতা সাবিত্রী দয়মন্তী'[১]— যাকে ওষুধের দোকানের ছেলেটি একদিন দূর্গামা ভাবত, আজ সে জীবনের 'গোলকধাম' খেলায় ঘুমের ওষুধের বড়ি সংগ্রহ করতে পথে নেমেছে। মিথ্যে কথা বলার অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেছে। স্বামী সুরেন, বিনয়, কনা, দীপু বা সেই বিধবা নার্সের কাছে সে যত নষ্ট-খারাপ মেয়েই হোক না কেন, আজ সে গোটা জগতকে মরবার কথা দিয়েও রাখতে পারল না—

> "তবু অনিমা আজ খুব পরিতৃপ্ত। কারণ আজ সন্ধ্যেবেলা সে প্রথম শিখল দুঃখ থেকে এই পৃথিবীতে কীভাবে খেলা বানাতে হয়।"[২]

হ্যাঁ, অনিমা তার একান্ত পৃথক জগতে স্বতন্ত্ররূপে মরে বাঁচতে গিয়ে খেলা খেলতে শিখেছে— তার খেলার বিপরীত পক্ষ তার পরিবার, জগৎ, হয়তো সে নিজেও। তাই তার অতি কষ্টে অর্জিত খেলার নীল গোল চ্যাপটা ঘুঁটিগুলো একটা হতচ্ছাড়া বিড়াল সব নষ্ট করে ফেললেও সে হার মানেনি, খেলা চালিয়ে যেতে চেয়েছে।

এই খেলা চালাতে চালাতেই অনিমা একদিন নারীসত্তার জোড়ে সকল বিফলতা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পাবে— এই তার স্থির বিশ্বাস। কিন্তু সুচিত্রা ভট্টাচার্য 'ময়না তদন্ত'-এ অনসূয়ার 'এক অভাগিনীর বিফলতার ইতিহাস'-এর গল্প লিখলেও, নিজেকে ভালোবেসেই সে স্বাধিকারে মুক্তির পথ খুঁজেছিল। এখানে অনসূয়ার সব সচেতনতা সব বিফলতাই খাতা আর কলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনসূয়ার আত্মহত্যার চেষ্টায় জীবন-মৃত্যুর মাঝের লড়াইয়ের সময়সীমা ধরে তার স্বামী সমরেন্দ্রর কাছে পুরো বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তাদের দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবনকে অনসূয়ার লেখা ডায়রির পাতাগুলো এক সন্ধেতেই যেন মূল্যহীন করে তোলে। যে অনসূয়া বিবাহপূর্বে নিজের মনের কথা জানিয়ে বাবার কাছে প্রতিবাদ করেনি, সে বিবাহ পরবর্তীকালেও স্বামী-সন্তান-সংসারে কেবল দাসী সেবিকা হয়ে থেকেছে। চার সন্তানের (দুই ছেলে ও দুই মেয়ে) জন্ম দিয়ে একটি সন্তানকেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নির্ভরতায় মনের মতো করে সে মানুষ করতে পারেনি; তাদের মধ্যে মানবিকতাবোধ ও স্বাধীন মতামত প্রতিষ্ঠার তীব্রতা গড়ে তুলতে পারেনি। অনসূয়ার এই স্বাধীনতাবোধের সচেনতায় তার ডায়েরির প্রতিটি পাতা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে অনসূয়ার বিফল অস্তিত্ব তাকে শিকড় থেকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তাই গল্পের শুরুতেই দেখব, অনসূয়া ঠিক আত্মহত্যা করার আগে স্বপ্নে মানুষ চেনার খেলায় মেতেছে। সারাজীবন ধরে সে কেবল মানুষের বাহির ও অন্তরের স্বরূপ চিনেছে মনে মনে; চিনতে চিনতেই সূর্য ডুবেছে, আবার সূর্য উঠেছে। তারই সন্তানদের দেখে সে বিস্মিত হয়েছে, আক্ষেপও করেছে মনে মনে :

> "হায়, এই তবে যুগের পরিবর্তন! এই তবে আধুনিকতা! বিবাহের শাড়ি গহনা পছন্দ করিবার স্বাধীনতাই তবে নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধ!"[৩]

আসলে নিজে না পারলেও অনসূয়া যুগের পরিবর্তনে নারীর স্বাধীনবোধের জাগরণ চেয়েছিল। নারীর সংকীর্ণ জীবনধারা ও মানসিকতার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছিল তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছেই। নারীর স্বতন্ত্র মূল্যবোধ এবং মতামতের মূল্যে নারী একজন মানুষ রূপে গণ্য হোক— এই অন্তরের স্বাধীন চেতনায় জীবনের সফল অর্থসন্ধানের উদ্দেশ্যে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় অনসূয়া; বলা ভালো আর একবার নারীসত্তার চিরন্তন আধুনিকতা নিয়ে নতুনরূপে জন্মগ্রহণ করে ফিরতে চায় সে। জীবনের কঠিন

যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে অনিমাও চেয়েছিল আত্মহত্যা করতে, সেই সত্যকে অনুধাবন করতে।

'লীলার গভীরে' গল্পটিতে কবিতা সিংহের বারংবার মনে হয়েছে— 'বেশীর ভাগ মেয়েই লীলা হয় না' অথবা 'মনে হয়, যেন মরণপন করেছে— আসলে সমস্তটাই বাঁচার ভূমিকা।'[৪] হ্যাঁ, লীলার আধুনিক মননও চেতনা, জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা তাকে বাঁচতে শিখিয়েছে, জিততে শিখিয়েছে, হেরে যেতে দেয়নি। লীলার পাশাপাশি লেখিকার জীবনের দৌড়ে হেরে যাওয়া অনেক মেয়ের কথাই মনে পড়েছে। লীলা ড. রায়ের হাতাহাতি অপরিণতি নষ্ট করার কাজে সাহায্য করে। আর সে চায় একটা আস্ত সংসার-স্বামী-সন্তান। পেয়েছেও স্বামী-সন্তান। অতীতের চোদ্দ বছরের ছেলের মুখ হয়তো সে মুছে ফেলেছে, সমাজে তাকে ভাই বলে পরিচয় দেয়। স্বামী-সন্তান-সংসারের লোভে স্বপনের কাছে বারবার তার শরীর, অর্থ লুটিয়ে দিয়েছে; পরিণামে পেয়েছে প্রতারণা। তবুও লীলা হেরে যায়নি— জীবন বোধের সত্য ও বাস্তবকে সে মেলাতে পেরেছে :

> "তুমি আমাকে আমার জীবনে মাথা নিচু হতে দেখনি...।"[৫]

তাই লীলা তার জীবনকে তার মতো করে গুছিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সুচিত্রাদেবীর 'আমি মাধবী' গল্পের যযাতি কন্যা মাধবী কি পেরেছিল নিজের মতো করে বাঁচতে। সে তো পণ্য রূপে বিক্রিত। বিক্রেতা পিতা, ক্রেতা প্রথম গালব, তারপর তিন রাজা ও গালবগুরু বিশ্বামিত্র। চিরকালটা তো মাধবীরা বিক্রিই হয়ে এসেছে সমাজে, সংসারে। আটশো সাদা ঘোড়ার সমতুল্য এক নারী অসাধারণ বিদ্রুপের ছোবল দিলেন লেখিকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি। তিনরাজার শয্যাসঙ্গিণী হয়ে পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েও তার একটাই আকাঙ্ক্ষা ছিল গালবের সান্নিধ্য লাভ। একসময় গালবও তাকে ভোগ করতে চেয়েছে পুরুষোচিত কামে। সেদিন কিন্তু মাধবীর নারীসত্তা তীব্র ঘৃণা করেছে, বাধা দিয়েছে। মাধবীর নারীব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল আধুনিক মনে জেদ চেপেছে, বলেছে—

> "আমি অন্যপূর্ব্বা নয়। সন্তান প্রসব করা হয়ে গেছে, এখন আমি আবার কুমারী।"[৬]

কিন্তু গালবের অট্টহাসি তার নারীত্বকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। পুনরায় ফিরে গেছে পিতা যযাতির সম্পত্তি হয়ে। নারীরা তো কেবল পুরুষেরই সম্পত্তির হাত বদল হয়। তাই চার সন্তান প্রসব করা কুমারী মেয়ের আবার সয়ম্ভর সভা ডাকলেন পিতা ও ভাইয়েরা। মাধবী আশ্চর্যও কিন্তু হল, তার মনে চরম প্রশ্ন জাগল নিজের গুরুত্ব বুঝে নিতে :

> "এত লোক আমাকে পেতে আগ্রহী? কেন? রাজার মেয়ে বলে? নাকি পুত্রদায়িনী সুলক্ষণা মেয়ে মানুষ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছি তাই?"[৭]

আর তাই সেই তীব্র স্বতন্ত্র চেতনার অধিকারী হয়ে বরমাল্য কাউকে দান করেনি, মালা নিজের হাতেই শুকিয়ে গেছে। হয়তো সে লীলার মতো সুস্থ সংসার-স্বামী-সন্তানের সুখ পায়নি, কিন্তু মাধবী পুরুষের এই একচেটিয়া আধিপত্যকে করুণা করে জঙ্গলের জীবনকে শ্রেয় মনে করেছে। সে জিতেছে নিজের অন্তরের কাছে, নিজের স্বাধীন চেতনার উন্মেষে নতুন নারীসত্তার জন্ম দিয়েছে এবং এক স্বতন্ত্র উত্তরণের পথে হেঁটেছে।

একটি খুব চেনা নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের গল্প সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'বনসাই'। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের গৃহবধূর স্বামীর কাছে যে চাওয়া-পাওয়া— বড় ঘর, কালার টিভি, ভালো জায়গায় ঘুরতে যাওয়া; আর না পেলেই স্বামীর অর্থ রোজগারের কমতি চোখে পড়া— এইসব ঘটেছে সীমা ও তাপসের জীবনে। তাপসের একমাত্র মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল বহু কষ্টে অর্জিত ফ্ল্যাটের একফালি বারান্দার টবে বনসাই, কতরকমের গাছ। যা যদিও সীমার বিরক্তির কারণ, সীমা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে চেয়েছে শুধু একটুদামি জীবনযাপন করতে, এত বনসাই নিয়ে কী হবে! কিন্তু একরাত্রে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে সীমা উলটে যাওয়া টবে খুঁজে পেয়েছে আসল জীবনের অর্থকে; বুঝেছে অন্তরের সৌন্দর্যই একমাত্র সত্য। সে দেখেছে দেড় ফুট কৃষ্ণচূড়ার ডালে ঝিরিঝিরি সবুজ পাতা আর আড়ালে ফোটা একটা টুকটুকে লালফুল। সীমার আধুনিক মনস্কতায় ধরা পড়েছে অসীমের সত্যসন্ধান :

> ''আপন সুখে বাড়তে না দেওয়া কাটা ছাটা গাছেও এমন রক্তিম ফুল ফোটে।''[৮]

অর্থাৎ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভিতে, ছোট্ট ফ্ল্যাটে আর পুরী বেড়াতে গিয়েও তাদের জীবন রঙিন হয়ে উঠতে পারে ভালোবাসার সযত্নে— শুধু প্রয়োজন স্বাধীন ও নির্ভার চেতনার। সেই চেতনার অধিকারী হয়ে কবিতা সিংহের 'টুলির বড়দিন'-এর সদ্য কিশোরী টুলিও একদিন জীবনের বড়দিনকে খুঁজে পেয়েছিল, বুঝতে পেরেছিল সেই চরম সত্যকে— তাকে ছেড়ে যাওয়া বাবার করুণাকে। টুলির মায়ের জীবনের টানাপোড়েনে প্রভাবিত টুলির কিশোরী মনও। সে উপলব্ধি করেছে :

> "খ্রিস্টমাস ঈভের রুটি থেকে আলাদা গন্ধ বেরোয়। করুণার গন্ধ। ভালোবাসার গন্ধ।"[৯]

টুলি শেষপর্যন্ত বড়লোক, অহংকারী বাবার করুণা চায়নি, হিরণমামার ভালোবাসার চেয়েছে। তাই বহু কাঙ্ক্ষিত বড়দিনে হিরণমামার ঘর সাজানো দেখে ক্রমে টুলি এক স্বতন্ত্র চেতনায় উত্তীর্ণ হয়ে বাবার সান্নিধ্যকে অস্বীকার করেছে :

> "চাই না, চাই না, চাই না, তুমি চলে যাও— চলে যাও।"[১০]

হিরণমামার হাত ধরে বড়দিনের একচিলতে হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে চেয়েছে।

কবিতা সিংহের 'চিন্ময়ীর নিজস্বজীবন' ও 'মায়ের মতো' (অগ্রন্থিত গল্প) গল্প দুটিতেই ব্যক্ত হয়েছে মাতৃসত্তা ও নারীসত্তার স্বাতন্ত্রময়ী রূপ। চিন্ময়ী তার চার ছেলে মেয়ের আলাদা আলাদা সংসারে উপস্থিতি দিয়ে গেছে। কিন্তু তারা নিজেদের সোকলড সংসারে নিজেদের মতো করে ব্যস্ত, কখনো মা চিন্ময়ীর সংসারে থাকার তাদের কোনো প্রয়োজন হয়নি। চিন্ময়ী বদ্ধ কিছু সংস্কারে বিশ্বাসী হয়েই সন্তান-নাতি-নাতনিদের সংসারে ছুটে যেত। কিন্তু একদিন হঠাৎ সে উপলব্ধি করে, কেন সুনীত বা অঞ্জনার বাড়ি :

> "তার কি নিজের বাড়ি নেই? নিজের আস্তানা? বড় দুঃখে তৈরি, নিজের জীবনেও তো তার থাকা দরকার।"[১১]

এই প্রয়োজনকেই চেতনায় সঞ্জাত করে নিজের ব্যক্তিত্বকে স্থাপন করেছে, খুঁজেছে নিজের ধারাকে। তাই ফিরে গেছে একান্ত নিজের বাড়িটায়— যাকে সবার ব্যবহার করে চলে গেছে। তবে চিন্ময়ীর নারীসত্তায় জীবনের চিরন্তন সত্যটি ধরা পড়েছে—

> "জীবন যে কোনও সময়েই শুরু করা যায়।"[১২]

আসলে কবিতা সিংহ ব্যক্তি হিসাবে নারীর নাগরিকতা ও স্বাতন্ত্র্য নারীব্যক্তিত্ব রক্ষার লড়াইকে সমর্থন করে গেছেন সারা জীবন ধরে। তাঁর রচিত 'মায়ের মতো' নামক একটি অগ্রন্থিত কাহিনিতে একজন মা (নলিনীদেবী) তাঁর সর্বস্ব দিয়ে তিন ছেলে মেয়েকে মানুষ করার পর স্বার্থপর সন্তানরা তা কীভাবে অনায়াসে ভুলে যায়, সেই স্বার্থপরতার নিদারুণ অভিঘাতকে দেখিয়েছেন। কিন্তু মা নলিনীদেবী সন্তানের প্রতি সমস্ত কর্তব্য দায়িত্ব পালন করে স্বল্প উপার্জনে নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিতে পারে বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে। পরে বড় সন্তান তার মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলে তাঁর নারীসত্তার চরম ব্যক্তিত্বময়ী বোধ বড় হয়ে উঠেছে, তাই সন্তানকে তিনি ফিরিয়ে দিয়ে এক শান্ত, স্নিগ্ধ অথচ আশ্চর্য এক দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পেরেছেন— আমি তো সত্যিই আর তোমার সেই মা নয়, আমি তোমার 'মায়ের মতো' একজন— যাকে ছেড়েও থাকা যায়, আবার একেবারে ছেড়ে দেওয়া যায় না। নারীর এই স্বতন্ত্র আত্মমর্যাদা বোধ সত্যিই আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়।

আবার সুচিত্রার নারীর হয়তো একটু অন্য ধাঁচের। তাই জীবনের প্রায় মাঝ দিগন্তে এসে তারা চায় উন্মুক্ত আকাশে একটু প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে। তাই সাতচল্লিশ বছর বয়সে এসেও, দুই বান্ধবীর প্রায় একযুগ পরে দেখা হতে তার অতীত যৌবনে যেন ফিরে গেছে। বন্ধু শৈবাল বসুর সঙ্গে এতদিন পরে দেখা করতে এসে অহেতুক সাজগোজ করেছে, মুখে রঙতুলির টানা দিয়েছে, অকারণে লজ্জাও পেয়েছে। কিন্তু বন্ধুর দেখা না পেয়ে বাথরুমে গিয়ে হঠাৎ সেই মেকিরূপকে তারা ঝেরে ফেলতে চেয়েছে

আপদ ভেবে। মুখে ও মনে জলের ঝাপটায় বোধ হয় তাদের সেই নারীর একান্ত অন্তরের রূপটাই ফুটে উঠল, তন্ন তন্ন করে খুঁজছে :

> "সাতচল্লিশ বছর বয়স কি কিছুই অবশিষ্ট রাখে না? দেবার মতো? দেখানোর মতো?"[১৩]

অন্য নারী মন উত্তর দেয় :

> "রাখে রে রাখে। কিছু একটা থাকেই। শরীর ছাড়াও।"[১৪]

তাঁর 'ঝিনুক খোঁজার বেলায়' গল্পটি একটি আবেগপূর্ণ গল্প। জীবনের সেই অন্তরের রূপকে নন্দিতা, শুভ্রার মতো মাধুরীও খুঁজে বেড়িয়েছে। তবে মাধুরীর সন্দান জীবন সমুদ্রের তীরে এসে। স্বামী দেবতোষকে হারিয়ে সে মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে সমুদ্রের কাছে বেড়াতে এসেছে। হয়তো পূর্বপ্রেমিক সুখময়কে দেখে অনেক অতীত স্মৃতি মন্থন হয়েছে। মাঝে মাঝে নিজের কাছে প্রশ্ন করেছে :

> "সত্যি কি তবে বাতিল হয়ে গেছেন তিনি? জীবন থেকে? সময়ের ওঠাপড়া থেকে?"[১৫]

কিন্তু একসময়—

> "সমুদ্র তাঁকে যেন নতুন করে জীবনের মানে বুঝিয়ে দিল। কিছুই হারায় না। বাতিল হয়ে যায় না। ... ভালোবাসা, তৃপ্তি, সুখ সবই ফিরে আসে নতুনভাবে।"[১৬]

তাই ভোরে ভেজা বালি থেকে মাধুরী একটা একটা করে ঝিনুক তুলতে গিয়ে জলের খুব কাছাকাছি চলে যাচ্ছিল তার স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতায় ও আধুনিক বিশ্বাসের তরী বেয়ে।

'একটি অশুচি মেয়ে গল্প' নামের গল্পটিতে কবিতা সিংহ 'অশুচি'র এক অদ্ভুত পরিচয় দান করলেন। রেবা তথা জ্যোতির হ্যালুসিনেশানে ডাক্তার বিভাস জানতে পারে তার জীবনের কথা। একটা হলুদ শাড়ির প্রচণ্ড শকই জ্যোতির জীবনকে কেমন যেন ওলটপালট করে দিল। সে চিরকাল সংসার-স্বামী-সন্তানের জন্য হয়তো বা অশুচির কাজ করেছে। তার বোধেও ঘুমন্ত চেতনায় ধরা পড়েছে সেই প্রথম খদ্দের লেখক প্রদীপ্ত, মগ্নতার সত্যতা আর নিচে পড়ে থাকা সেই জয়পুরী হলুদ শাড়ি। জ্যোতির স্বামী সবই জানত— স্ত্রীর অন্য পুরুষের কাছে সাপ্লাই হওয়ার কথা, এমনকি তার কাছে অনেক মেয়ে সাপ্লাই দিত মি. খান্না। ডাক্তার বিভাসের কাছে জ্যোতির উক্তি—

> "যতই ময়লা মাখুন, একটা চমৎকার শাওয়ার নিলেই তো ব্যস। একেবারে আনকোরা। তাই না?"[১৭]

কিন্তু সত্যি কি সেই ধারণা পোষণ করে গেছে শেষ পর্যন্ত জ্যোতি। দস্যু রত্নাকরের পাপ ও পিতামাতা, স্ত্রী সন্তান কেউ বহন করতে চায়নি।

> "রত্নকরের ছিল পেশায় পাপ...। কিন্তু রেবার ছিল লোভে পাপ। তাই সেই পাপেই তার তোদের সংসার থেকে মৃত্যুদণ্ড নিতে হল।"[১৮]

ডাক্তার বিভাসের বলা গল্পের জ্যোতি আর বাস্তবের রেবা তখন এক হয়ে গেছে। অর্থাৎ রেবা নিজেকে অশুচি ভাবতে ভাবতে কেবল পাপ ধোবে, হাত পা শরীর ধোবে পাগলা গারদে গিয়ে। আর তারই টাকা হবে সমাজ-সংসারের কাছে অপাপবিদ্ধ, শুচিময়— তাই সেই টাকায় ওরা জীবন চালাতে পারে। পরিবারের সব জানতে পারার ভয়ে ভীত রেবার এই শুচি অশুচির দ্বন্দ্বে নারীমন ও সত্তা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সেই পাপেই সুচিত্রা দেবীর সেই পাগলিনীও ('একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে') মৃত্যুকে বরণ করেছে। অথচ কী আশ্চর্য, পুরুষ সমাজ কিন্তু তাকে ভোগ করেছে বারবার নিজেদের কাম লালসাকে চরিতার্থ করতে— বিনিময়ে একটু খাবার, দুটো রুটি। আর পাগলিনীর কাছে সেটাই বেঁচে থাকার রসদ। তাস সে জানত খাবার পেতে গেলে তাকে শুয়ে পড়তে হবে। সমাজের এই পাপকে কে ধোবে? এরই উত্তর খুঁজতে জ্যোতি, পাগলিনীর মতো নারীরা জীবনকে বাজি লাগায়, পাপ করে, অশুচি হয়, মরেও যায়। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই জীবনকে ভালোবেসে তার জীবনে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। নিজেকে নিঃশেষ করে এক টুকরো খাবার পেতে প্রতিনিয়ত শোষিত হয়েছে— তবুও জীবনের দিক থেকে মুখ ফেরাতে পারেনি। আসলে সুচিত্রাদেবী বা কবিতা সিংহের গল্পের নারীজীবন প্রকৃতই বহুধাবিভক্ত ও বহুমাত্রিক ধারায় বয়ে গেছে নিরন্তর।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'এপার ওপার' গল্পটি এ প্রসঙ্গে না উল্লেখ করলেই নয়। যেখানে গল্পের সুতপা ও অন্য একটি মেয়ে এক অপরের বিপরীতমুখী চরিত্র হলেও মেয়েটি সুতপাকে জীবনে টিঁকে থাকা আর বেঁচে থাকার পৃথক দৃষ্টিতে প্রভাবিত করে। সুতপা চরিত্রটি একেবারে আমাদের চেনা সংসার-সন্তানে নিবেদিত প্রাণে জীবন অতিবাহিত করেছে। যে নারী সন্তানকে ঘিরে স্বপ্ন দেখে, তাকে মানুষ করবার জন্য কর্মজগৎকে ত্যাগ করতে পারে সে অনায়াসেই। সুতপা নিজেকে 'taken for granted' রূপে পরিবেশনের বিনিময়ে তার ছেলে, স্বামী ও সংসারের থেকে কেবল ঔদাসীন্যই পেয়েছে। স্বামী রাঘবের শখ মেটানো বা পাগলামিতে সঙ্গ দিতে দিতে সে এক একসময় হাঁপিয়ে ওঠে। কোনো এক বনবাংলো স্পটে বেড়াতে এসে সুতপার সঙ্গে অন্য একটি অল্পবয়সী দম্পতির সাক্ষাৎ হয়। মেয়েটির সঙ্গে যত কথা গল্প এগিয়েছে সুতপা ততই নিজের জীবনের সীমাবদ্ধতাকে ফিরে ফিরে দেখেছে। গল্পের অন্য মেয়েটি আধুনিক life style-এ অভ্যস্ত; বিয়ে টেঁকে না বলে সে পুরুষসঙ্গীর সঙ্গে 'live in'-এ বিশ্বাসী। ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী এই মেয়েটির প্রভাব পড়েছে সুতপার নারীত্বের উত্তরণের পথে। নারীর এই অবস্থানের বৈপরীত্যে সুচিত্রাদেবী এই মেয়ে চরিত্রটিকে যথাসম্ভব একটি মুক্ত ও উদার চেতনায় স্বনির্ভর করে গড়ে তুললেন। যে নিজের আমিকে সম্মান করে, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবনকে পর্যালোচনাও করতে পারে। আর সুতপার মতো নারীর ব্যক্তিসংকট ও নিজেকে সম্মান না করতে পারার অক্ষমতা

প্রকটিত হয়— তা থেকে উন্নয়নেরও পথ সন্ধান করে। তাই সুতপাও সমান্তরালভাবে ওই মেয়েটির জীবনবোধের সঙ্গে নিজের অস্তিত্বের সংকট ও অবস্থানকে নিরীক্ষণ করেছে। লেখিকা দেখালেন মেয়েটির আচরণে নয়, বরং চিন্তা-চেতনায় ও মননে স্বাধীনতার পরিচয়কে :

> "আমি কীরকম পার্টনার চাই জানেন? সমান সমান টাইপ। মেন্টালি। সেরিব্রাল। একজন সত্যিকারের কমরেড। উইথ প্যাশান। সে কেয়ারিং হবে, কিন্তু মাসেল ফোলাবে না। আমার ওপিনিয়নকে ততটাই রেসপেক্ট করবে, যতটা সে নিজের মতামতকে করে।"[১৯]

নারীর এই আধুনিক মননের বহিঃপ্রকাশ নারীর নিজের বয়ানে— এসবই বিশ-একবিংশ শতকের অভিব্যক্তি। আসলে নারীরা এঁদের গল্পে এক অসাধারণ নারীত্বের রূপে উজ্জ্বল হয়েছে, কারণআধুনিক মানসিকতায় আস্থা রেখে পুরুষের প্রতি হওয়া অন্যায়ে পুরুষেরও পাশে দাঁড়াতে পারে। বলাবাহুল্য সুচিত্রাদেবী বা কবিতা সিংহ এঁরা কেউই নারী পুরুষ লিঙ্গভেদে বিশ্বাসী নয়। বরং সর্বসময় নারীকে অন্তরের সত্য স্বাধীন আলোকে সঠিক উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন।

নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব প্রকাশে কবিতা সিংহ বা সুচিত্রা ভট্টাচার্য— এই দুই লেখিকাই তাঁদের সাহিত্য জগতে স্বাতন্ত্র্যময়ী কখনো বা অনিচ্ছাকৃত উত্তরসুরী হয়ে উঠেছেন। ষাটের দশকের বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠের অধিকারিণী কবিতা সিংহকে অনেক বিদগ্ধ জনেরাই নারীবাদী লেখিকা হিসাবে চিহ্নিত করতে চান। যদিও তিনি নারী পুরুষ ভেদাভেদে বিশ্বাসী ছিলেন না। আসলে কবিতা সিংহ তাঁর নারীদের খুব সযত্নে প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছেন। নারীর পর্দার আড়ালকে তিনি মেনে নেননি সেই দশকে দাঁড়িয়েও— যখন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা বা নারীর নিজস্ব স্পষ্ট উক্তি পোষণ অনেকটাই কঠিন ছিল। আর সুচিত্রা দেবী ধরতে চাইলেন আধুনিক নারী সমস্যাকে, অস্থিরতা-অন্তর্দ্বন্দ্বকে, পারিবারিক ভাঙনের জীবনের পচনশীলতাকে। অথচ এই দুই নারী লেখিকার আধুনিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি কোথাও বা মিলেও গেছে। তবে তাঁদের প্রকাশের ভঙ্গিমা বা জীবন অনুভূতির ব্যক্ততায় দুই লেখিকাই পৃথক, স্বতন্ত্র— দশকের বিভিন্নতা ও কালের সীমা কোথাও তাঁদের সংকীর্ণ করে রাখতে পারেনি। তাই এই কালোত্তীর্ণ লেখিকারা তাদের পৃথক, স্বতন্ত্র চেতনায় নারীকে গড়ে পিটে নিয়েছে বারবার। তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিত্বময়ীবোধকে চুপিচুপি যেন মস্তিষ্কে, রক্তে শিরায় সঞ্জাত করে দিয়েছেন। এঁদের নারীরা অধিকাংশই সবলা। নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। আর যখনই সেই অস্তিত্ব রক্ষায় টান পড়েছে, কেউ তখন মরে নতুন জন্ম নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে, কখনো বা ঘৃণা আর করুণার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে সমাজের প্রতি, আবার কখনো নিজের পথ নিজেই খুঁজে নিয়েছে। আসলে সুচিত্রার সৃষ্ট নারীসত্তা অথবাকবিতার সৃষ্ট নারী— চেতন-মননে-অনুভবে তারা আধুনিকা, স্বাধীন ও ব্যক্তি

স্বাতন্ত্র্য বোধে উজ্জ্বল– আর সেই অনুপুঙ্খতা বজায় রেখে গেছেন এই দুই নারী ছোটগল্পকারই।

তথ্যসূত্র

১. কবিতা সিংহ। পঞ্চাশটি গল্প। ‘খেলতে খেলতে একদিন’। প্রথম প্রকাশ। হাওড়া। সহজপাঠ প্রকাশক। জানুয়ারী ২০১৩, পৃ. ২০।
২. তদেব। পৃ. ২৪।
৩. সুচিত্রা ভট্টাচার্য। গল্পসমগ্র ১। ‘ময়না তদন্ত’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। দে’জ পাবলিশিং। জানুয়ারী ২০১৬, পৃ. ২৯৩।
৪. কবিতা সিংহ। পঞ্চাশটি গল্প। ‘লীলার গভীরে’। প্রথম প্রকাশ। হাওড়া। সহজপাঠ প্রকাশক। জানুয়ারী ২০১৩, পৃ. ৩৫।
৫. তদেব। পৃ. ৬৫৫।
৬. সুচিত্রা ভট্টাচার্য। গল্প সমগ্র ১। ‘আমি মাধবী’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। দে’জ পাবলিশিং। জানুয়ারী ২০১৬। পৃ. ৬৫৩-৬৫৪।
৭. তদেব। পৃ. ৬৫৫।
৮. সুচিত্রা ভট্টাচার্য। সুখ দুঃখ। ‘বনসাই’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। দে’জ পাবলিশিং। এপ্রিল ২০০৪। পৃ. ১০৫।
৯. কবিতা সিংহ। পঞ্চাশটি গল্প। ‘টুলির বড়দিন’। প্রথম প্রকাশ। হাওড়া। সহজপাঠ প্রকাশক। জানুয়ারী ২০১৩, পৃ. ৩২।
১০. তদেব। পৃ. ৩৩।
১১. কবিতা সিংহ। পঞ্চাশটি গল্প। ‘চিন্ময়ীর নিজস্ব জীবন’। প্রথম প্রকাশ। হাওড়া। সহজপাঠ প্রকাশক। জানুয়ারী ২০১৩। পৃ. ৩৪২।
১২. তদেব। পৃ. ৩৪২।
১৩. সুচিত্রা ভট্টাচার্য। গল্পসমগ্র ১। ‘বয়ঃসন্ধি দ্বিতীয় পর্ব’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। দে’জ পাবলিশিং। জানুয়ারী ২০১৬। পৃ. ১৬৮।
১৪. তদেব। পৃ. ১৬৮।
১৫. সুচিত্রা ভট্টাচার্য। গল্পসমগ্র ১। ‘ঝিনুক খোঁজার বেলায়’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। দে’জ পাবলিশিং। জানুয়ারী ২০১৬। পৃ. ৪৩৪।
১৬. তদেব। পৃ. ৩৩৬।
১৭. কবিতা সিংহ। পঞ্চাশটি গল্প। ‘একটি অশুচি মেয়ের গল্প’। প্রথম প্রকাশ। হাওড়া। সহজপাঠ প্রকাশক। জানুয়ারী ২০১৩। পৃ. ২২১।
১৮. তদেব। পৃ. ২২৭।
১৯. সুচিত্রা ভট্টাচার্য। গল্প সমগ্র ৩। ‘এপার ওপার’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। দে’জ পাবলিশিং। মে, ২০১৯। পৃ. ২৩৯।

ঔপনিবেশিক সময়কালে কলকাতা বন্দরের মধ্য দিয়ে বাংলার নাবিক শ্রমিকদের আত্মপ্রকাশের ইতিহাস (১৮৭০-১৯৪৭)

আজহারুল মিদ্দা
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপঃ ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতা বন্দরের ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বন্দরটির উন্নতি সাধন হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর হুগলী নদী তীরবর্তী অঞ্চলে শিল্প-কারখানার আবির্ভাবের ফলে বাণিজ্যিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে কলকাতা বন্দরের জৌলুস বেড়েছিল। শিল্প কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে বন্দর পরিকাঠামোর উন্নতিসাধনের জন্য বন্দর শ্রমিক নিয়োজিত হয়েছিল এবং কলকাতা থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজগুলিতে কর্ম সম্পাদনের জন্য অনেকে নাবিক, জাহাজের কাজে শ্রমিক হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিল। তবে এখানে নাবিক শ্রমিকেরা মূলত বাংলার বিভিন্ন জেলাগুলি থেকে এসে যোগদান করেছিল বলে এদের 'বাংলার নাবিক' নামে অভিহিত করা হত। এদের জাহাজের পাটাতনে রান্নাকরা, খাবার পরিবেশন, চুলকাটা, ইঞ্জিন রুমে কর্ম সম্পাদন করা, চুল্লিতে কয়লা ঠেলা এবং জাহাজ কেন্দ্রিক অন্যান্য কাজগুলি করে জাহাজকে সঠিকভাবে গন্তব্য বন্দরে প্রবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালন করতে দেখা গিয়েছিল। বাংলার নাবিক শ্রমিকদের সংগঠিত রূপে আত্মপ্রকাশের মূলে তাদের সংগ্রামী চিন্তাচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং শোষণের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছিল।
সূচক শব্দঃ কলকাতা বন্দর, জাহাজ, বাংলার নাবিক, সংগঠন, ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ, সংগ্রামী চিন্তাচেতনার বহিঃপ্রকাশ।

মূল আলোচনাঃ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকে বাংলায় কলকাতা শহর বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন শহরের তকমা লাভ করেছিল। এই কলকাতা শহরটি ১৯১২ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল। কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মফস্বল অঞ্চলের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত যুবকেরা শ্রমিকের কাজে যোগদান করেছিল। এই শ্রমিকেরা হাতে টানা রিক্সা থেকে শুরু করে মুটে, চটকল শ্রমিক, ট্রামওয়ে শ্রমিক, রেলওয়ে শ্রমিক, বন্দর শ্রমিক, বিভিন্ন কারিগরি শ্রমিক এবং জাহাজে কর্ম সম্পাদনের জন্য নাবিক শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে বাংলার মধ্যে কলকাতা এবং চট্টগ্রাম এই দুটি বন্দর জলপথে ব্যবসা-

বাণিজ্যের একমাত্র অবলম্বন হিসাবে বিবেচিত ছিল। তবে কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হওয়ায় কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব ছিল বেশি। যে সকল মানুষ কলকাতা বন্দরে জাহাজে কাজের সন্ধানে আসতো, তারা সরাসরি কাজ পেত না, হয় তারা জাহাজে কর্মরত স্থানীয় প্রতিবেশীর সুপারিশে অথবা অর্থের বিনিময়ে ঘাট সারেংদের মত দালালদের মাধ্যমে জাহাজের নাবিক হিসাবে কাজে যোগদান করত।

বৃহত্তর সামুদ্রিক বাণিজ্যিক কার্যের জন্য কলকাতা বন্দরের উন্নতিসাধন এবং সেই সঙ্গে বাংলার নাবিকদের আত্মপ্রকাশঃ হুগলী নদীর তীরে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহকে কেন্দ্র করে বিভিন্নরকম কলকারখানা গড়ে ওঠার নেপথ্যে কলকাতা বন্দরের ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী। এই হুগলী নদীর দুই তীরে যে অসংখ্য শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে কলকাতা বন্দরের নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল। কলকাতা বন্দরের মধ্যদিয়ে বৃহৎ জাহাজগুলির সঙ্গে ছোট বোট, স্ট্রীমার, নৌকার মাধ্যমে হুগলী নদীকে কেন্দ্র করে কমবেশি ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিক রমরমার জন্য কলকাতা বন্দরের সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৮৭০ সালে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের গঠন হয়েছিল।[১] এই পোর্ট ট্রাস্ট গঠনের ফলে কলকাতা বন্দরের উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে জেটিগুলিকে সংস্কার করে আধুনিকীকরণ করা হয়। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের নজরদারি করার জন্য একজন পোর্ট কমিশনারকে নিয়োজিত করা হয়েছিল। এরা বন্দরের পরিকাঠামোগত বিষয়টি সর্বদা তদারকি করত যাতে কোনোভাবে বন্দরের কোনো কাজ বিঘ্নিত না হয়।[২]

কলকাতা বন্দরে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য বৃহৎ আকৃতির ইউরোপীয় মালিকানাধীন জাহাজগুলি আনাগোনা করত। এই জাহাজে কাঁচাপাট, চা, কফি, খনিজ দ্রব্য, শিল্পজাত পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা হত, আমদানি করা দ্রব্যের মধ্যে ভারী যন্ত্রাংশ ছিল অন্যতম। এসকল পণ্যসামগ্রী জাহাজের মধ্যদিয়ে জলপথে কলকাতা বন্দর থেকে অন্য বন্দরে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাংলার নাবিকেরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ভারত ব্রিটিশদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ হওয়ায় বিংশ শতকের প্রথম দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনার ফলে ব্রিটিশেরা অর্থনৈতিক এবং সামরিক দিক দিয়ে ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের চোরাগোপ্তা সাবমেরিন জাহাজের অতর্কিত আক্রমণে ব্রিটিশ জাহাজে কর্মরত বাংলার নাবিকেরা ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল।[৩] তৎকালীন সময়ে ভারতীয় সৈনিকদের দীর্ঘ সমুদ্রপথ অতিক্রম করে ইউরোপীয় মহাদেশে মহাযুদ্ধের রণাঙ্গনে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাংলার নাবিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল কারণ জলপথে চলমান জাহাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই নাবিকেরা দক্ষতার সঙ্গে কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারত। ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলা থেকে আগত নাবিকেরা জাহাজে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সাহসিকতার সহিত কাজ কর্মের জন্য প্রশংসিত হয়েছিল।

বাংলার নাবিকদের জাহাজের কাজে অংশগ্রহণঃ এসকল নাবিকেরা বাংলার বিভিন্ন জেলাগুলি থেকে এসেছিল। নাবিকদের বেশিরভাগ অংশ পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) সিলেট, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ঢাকা প্রভৃতি জেলা এছাড়া পশ্চিমবাংলার দুই চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, কলকাতা ইত্যাদি নিম্নগাঙ্গেও অঞ্চল থেকে কলকাতা বন্দরে এসে নাবিকের কাজে অংশগ্রহণ করেছিল।[৪] প্রান্তিক গ্রাম বাংলার বেকার যুবক এবং মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের ছেলেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে নাবিকের কাজে যোগ দিয়েছিল, এদের অধিকাংশই মুসলিম পরিবারের সন্তান ছিল। এসকল নাবিকদের কর্মদক্ষতা এবং সাহসিকতার জন্য 'লস্কর' বলে অভিহিত করা হত। ঔপনিবেশিক ভারতে ইউরোপীয় জাহাজগুলিতে প্রধানত দুই ধরনের নাবিকদের লক্ষ্য করা গিয়েছিল। প্রথমত, ইউরোপীয় নাবিক, এরা সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে কাজ করেছিল এবং দ্বিতীয়ত, দেশীয় নাবিক, এরা লস্কর নামেও পরিচিত ছিল, সংখ্যাগত দিক দিয়ে এদের একটি বড়ো অংশ বাংলা থেকে জাহাজের কাজে যোগ দিয়েছিল। বাংলার নাবিকদের জাহাজে বিভিন্নরকম কাজকর্ম সম্পাদন করতে হত। কখনো কখনো আপৎকালীন পরিস্থিতিতে নাবিকদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে বাংলার বেকার যুবকেরা ৬ মাস কিংবা ১ বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নাবিক হিসাবে নিয়োজিত হয়েছিল। তারা তাঁদের নির্ধারিত সময়ে কাজ পরিসমাপ্তি করে নিজের বাড়িতে ফিরে কিছুকাল যাবত স্বচ্ছলভাবে জীবন কাটিয়েছিল। এইরকম ভাড়াটিয়া নাবিকদেরও কলকাতা বন্দরে জাহাজের কাজে যোগদানে করতে দেখা গিয়েছিল। নাবিকদের জাহাজে ইঞ্জিনরুম, অফিস ঘর, খাবার তৈরি করা ও খাবার পরিবেশন করা, নাপিত প্রভৃতি ক্রু মেম্বার হিসাবে জাহাজে কাজ করতে হত।[৫] শিল্প কারখানার শ্রমিকদের থেকে জাহাজের নাবিকদের জীবন পক্রিয়া ছিল অনেকটা ভিন্ন ধর্মী। নাবিকদের জাহাজে কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে বহু প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত, অন্য সকল শিল্প কলকারখানার শ্রমিকদের তুলনায় তাদের জীবনধারণ করা অনেকটা কষ্টসাধ্য এবং ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, এখানে প্রাণহানির মত ঘটনাও ঘটত। বাংলার যেসব নাবিক জাহাজের কাজে বহির্দেশে পাড়ি দিত সে যে আবার স্বদেশে তার পরিবার পরিজনের কাছে ফিরবে তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। ঊনবিংশ শতকে ইউরোপীয় মালিকরা কিছু ঠগবাজ প্রকৃতির লোককে গ্রাম বাংলা থেকে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত করেছিল। এসকল লোকেদের 'আড়কাঠি' বলা হত। এরা প্রান্তিক গ্রামের কর্মহীন নিরীহ প্রকৃতির মানুষগুলিকে জাহাজে কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বন্দরের মধ্যদিয়ে বিদেশে পাচার করে দিত। তাই এই নাবিকের কাজে যোগদানের ক্ষেত্রে আড়কাঠিদের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার বিষয়টিও তাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হত।[৬] নাবিকদের জাহাজে কাজের জন্য কলকাতা বন্দরে ঘাট সারেংদের শরণাপন্ন হতে হত। ঘাট

সারেংরা জাহাজ বন্দর থেকে ছাড়ার পূর্বে নাবিকদের কাছে ঘুষ হিসাবে মোটা অঙ্কের অর্থ গ্রহণ করত। এভাবে বন্দরে নাবিকেরা জাহাজের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারত।[৭]

এই নাবিক শ্রমিকদের জীবিকার বন্দোবস্ত হলেও পরবর্তীকালে শ্রমিকদের মজুরী, স্বাস্থ্য, শ্রমের নির্দিষ্ট সময়সীমা প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর জাহাজের মালিকেরা উদাসীনতা দেখিয়েছিল। বাংলার নাবিকেরা যোগ্যতার নিরিখে উপযুক্ত বেতন পেত না, এমনকি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ নাবিকেরা তাঁদের কাজের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলনা। জাহাজের মধ্যে সাদা চামড়ার নাবিকেরা দেশীয় নাবিকদের সাথে বর্ণগত ভেদাভদমূলক আচরণ করত। জাহাজে অবস্থানকালীন সময়ে বাংলার নাবিকদের খোলা পাটাতন কিংবা চুল্লির কাছে স্বল্প পরিসরযুক্ত অস্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকতে হত। কখন কখন এরা এই প্রতিকূল পরিবেশে থাকতে না পেরে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করত। এতকিছু প্রতিকূলতা সত্বেও নাবিকেরা সংগঠিতভাবে বাংলাতে বিভিন্ন সীমেন্স ইউনিয়ন গঠনের মধ্যদিয়ে তারা জাহাজে কর্ম সম্পাদন করে সংগ্রামী জীবনধারা চালিয়ে গিয়েছিল।

বাংলায় সীমেন্স ইউনিয়নের গঠন পক্রিয়া এবং এর কার্যকারিতাঃ থিওডোর মাজারেলোর (Theodore Mazarello) বিবরণ থেকে জানা যায় যে গোয়ানিজ নাবিকরা ১৮৯৬ সালে ভারতে প্রাথমিকভাবে *গোয়া-পর্তুগিজ, সীমেন্স ক্লাব (Goa-Portuguese, Seamen's Club)* গড়ে তুলেছিল। এর সদস্যরা *Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (P & O)* -এর সেলুন ক্রুদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল।[৮] এরপর ১৯০৮ সালের প্রথমদিকে কলকাতায় *ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান (Indian Seamen's Anjuman)* নামক প্রথম স্বীকৃত ইউনিয়ন হিসাবে সীমেন্স ইউনিয়নটি গড়ে উঠেছিল। বাংলায় ট্রেড ইউনিয়ন আবির্ভাবের প্রথম দিকের সংস্থাগুলির মধ্যে এটি ছিল নাবিকদের দ্বারা গঠিত সংগঠন। এই ইউনিয়নটির প্রধান অফিস কার্যালয় ছিল খিদিরপুর, সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোডে। S. Moghal Jan, Esq. কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের নিয়ে এই ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান নামক ইউনিয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সীমেন্স ইউনিয়নটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বৃন্দরা হলেন কাশিম আলি, সৈয়দ ওসমান আলি, সৈয়দ মিন্নাত আলি, মুক্তাদির আলি, আব্দুর রহমান প্রমুখ। এই ইউনিয়নটি গড়ে ওঠার কিছু দিনের মধ্যেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে কারণ এর অফিস-কর্তারা ইউনিয়নটির সক্রিয় সদস্য হলেও সমুদ্র যাত্রার কারণে প্রায়শই অনুপস্থিত থাকত।[৯] যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউনিয়নটি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নাবিকদের বিভিন্নপ্রকার সহায়তা প্রদান করেছিল। এই সুপ্ত থাকা সীমেন্স ইউনিয়নটি ১৯১৮ সালে মহম্মদ দাউদ, সৈয়দ মিন্নাত আলি, ডঃ এ. এইচ. জাহির আলা, সামুদ খান, আব্দুল রব প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় পুনরায় সংগঠিত হয়ে *ইন্ডিয়ান সীমেন্স বেনভেলেন্ট ইউনিয়ন (Indian Seamen's Benevolent Union)* হিসাবে পুনুরুজীবিত হয়েছিল।[১০] ইন্ডিয়ান সীমেন্স আঞ্জুমান ইউনিয়নটি বিভিন্ন প্রতিকূলতা এবং

বাধা বিপত্তির মধ্যদিয়ে ১৯২০ সালে *ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (Indian Seamen's Union)* রূপে গড়ে উঠেছিল।[১১]

বাংলার নাবিকেরা ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের ছত্রতলে থেকে সার্বিকভাবে তাদের অভাব অভিযোগ এবং দাবিদাওয়াগুলি পেশ করতে পেরেছিল। দাবিদাওয়াগুলি হল – (১) ভারতীয় নাবিকদের জন্য একটি ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (২) কলকাতায় প্রস্তাবিত নটিক্যাল ইনস্টিটিউটের পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটিতে এই ইউনিয়নের প্রতিনিধি রাখতে হবে। (৩) দালাল এবং ঘাট সারেংদের দ্বারা নাবিকদের নিয়োজিত হওয়ার ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্তি ঘটাতে হবে। (৪) ভারতীয় নাবিকদের পর্যাপ্ত মজুরি সুনিশ্চিত করণ করতে হবে। এবং (৫) ভারতীয় নাবিকদের পদোন্নতি, মজুরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্য দূর করা এবং নাবিকদের পেনশন, বোনাস ও ক্ষতিপূরণগুলি যাতে পায় তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[১২]

বাংলার নাবিকেরা তাদের বেতন বৃদ্ধি, ক্ষতিপূরণ, জাতিগত ও বর্ণগত বৈষম্যের জন্য ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের (ISU) সহযোগিতায় ধর্মঘট, সমাবেশ, আন্দোলনের মধ্যদিয়ে তাদের দাবিগুলি আদায়ে অনেকখানি সফলতা পেয়েছিল। ১৯২০ সালে নিখিল ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) গড়ে উঠলে অন্যান্য ছোট বড়ো শ্রমিক ইউনিয়নের মতো বাংলার ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নটি AITUC সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে জোরদার করে তুলেছিল। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাতে এই সীমেন্স ইউনিয়নটি বৃহত্তর ইউনিয়ন হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।[১৩] ১৯২০ সালে জেনেভাতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমাবেশে (ILO) ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা প্রতিনিধিত্ব করেছিল।[১৪] এই ইউনিয়নটি কেবলমাত্র বাংলার নাবিকদের আন্দোলনে ভূমিকা নয় বহির্বিশ্বের নাবিকদের সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগ্রহণ করেছিল।

উপসংহারঃ ঔপনিবেশিক সময়ে বাংলায় হুগলী নদীকে কেন্দ্র করে কলকাতা এবং এর সন্নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে বিভিন্নপ্রকার শিল্প-কারখানার বিস্তারলাভ ঘটতে দেখা গিয়েছিল। এই শিল্পগুলি বিস্তারের অন্তরালে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য। এই বন্দরের মধ্যদিয়ে বহির্দেশীয় এবং আভ্যন্তরীণ নদীকেন্দ্রিক ও উপকূলীয় বাণিজ্যের রমরমা ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল, যদিও চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্যদিয়ে বাণিজ্যিক কার্য সম্পন্নও হয়েছিল তবে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব ছিল বেশি। কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে বাণিজ্যিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বন্দর পরিকাঠামোর সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে হুগলী নদী তীরবর্তী শিল্প-কারখানাগুলিতে বাংলার বহু শিল্প শ্রমিকের আগমনের সঙ্গে কলকাতা বন্দরের উন্নতিসাধনের জন্য বাংলার বহু মানুষ বন্দর শ্রমিক এবং বাণিজ্যিক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য নাবিক রূপে জাহাজের কাজে যোগদান করেছিল। বাংলায় শিল্প-কারখানা এবং বন্দরগুলিতে শ্রমিকদের কাজকর্ম চলাকালীন

পরিস্থিতিতে মালিক এবং দালাল শ্রেণির ক্রমাগত শোষণের জন্য এরা সংগঠিত হয়ে আন্দোলন সমাবেশে সামিল হয়েছিল। বিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে বাংলার নাবিকদের সঙ্গে ইউরোপীয় নাবিকদের মজুরীগত ও বর্ণগত বৈষম্যতা এবং সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের পাটাতনে বাংলার নাবিকদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জোরপূর্বক অবস্থান ঘটানো প্রভৃতি বিষয়গুলির জন্য বাংলার নাবিকেরা প্রথম সংগঠিত হয়ে নিজেদের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। তবে এই নাবিক সংগঠনটি ক্রমাগত ভাঙন গড়নের মধ্যদিয়ে ১৯২০ সাল নাগাদ ***ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU)*** রূপে একটি পরিপক্ক ইউনিয়ন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিংশ শতকের প্রথম দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং এই একই শতকের তৃতীয় দশকের শেষদিক থেকে নিয়ে চারের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে বাংলার নাবিকদের জাহাজে বীরত্বের সাথে কর্মকাণ্ডের কথা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষরা স্বীকার করেছেন। এই দুই মহাযুদ্ধে শত্রুপক্ষের জাহাজ দ্বারা অতর্কিত আক্রমণের ফলে ব্রিটিশ জাহাজে কর্মরত বাংলার বহু নাবিকের নিরুদ্দেশ, সলিল সমাধি এবং অঙ্গহানির মতো ঘটনা ঘটেছিল।[১৫] কলকাতার শীপীং অফিসে ক্ষতিগ্রস্ত নাবিকের পরিবারের আত্মীয় পরিজন এবং তাদের বিধবা স্ত্রীরা তাদের পূর্বের প্রাপ্য বেতনের দাবি করলে তাদের অপমানিত করে ফিরিয়ে দেওয়া হত। তবে এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে ***ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন*** **(ISU)** নামক সংগঠনটি বাংলার নাবিকদের কল্যাণার্থে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল যা বাংলার নাবিকরা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে শানিত করতে পেরেছিল।

সূত্র নির্দেশঃ

১। Nilmani Mukherjee, *The Port of Calcutta, A Short History,* The Commissioners for the Port of Calcutta, Calcutta, 1968, p. 53.

২। *Ibid,* p. 53.

৩। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908 – 1924,* Publication date not known, Calcutta, Part-1, pp. 4-5.

৪। Gopalan, Balachandran, *Globalizing Labour? Indian Seafarers and World Shipping, c.1870 – 1945,* Oxford, New Delhi, 2012, pp. 73-74.

৫। *Ibid,* p. 29.

৬। সুকোমল সেন, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০ – ২০০০,* ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৫১।

৭। Gopalan, Balachandran, *Globalizing Labour? Indian Seafarers and World Shipping, c.1870 – 1945,* Oxford, New Delhi, 2012, p. 77.

৮। *Ibid,* p. 230.

৯। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908 – 1924,* Publication date not known, Calcutta, Part-1, p. 1.

১০। *Ibid,* p. 2.

১১। *Ibid,* p. 8.

১২। *Ibid,* p. 3.

১৩। Ranajit Das Gupta, *Labour and Working Class in Eastern India, Studies in Colonial History,* K P Bagchi & Company, Calcutta, 1994, p. 436.

১৪। Mahammed Daud, *The Indian Seamen's Union: History and Developments 1908 – 1924,* Publication date not known, Calcutta, Part-1, p. 7.

১৫। *Ibid,* p. 2.

বিশ শতকে বাংলার লোকধর্মে নারীদের অবস্থা

প্রদীপ মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ: প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় নারীরা স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার লাভ করেনি। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধের হাত ধরে যে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের উৎপত্তি হয়েছিল তাতেও নারীর স্বাধীন ধর্মচরণের অধিকার স্বীকৃতি লাভ করেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গড়ে ওঠা কর্তাভাজা, বাউল, সাহেবধনী, বলাহাড়ি হাড়ি, মতুয়ার মত লোকধর্ম সম্প্রদায় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রান্তিক সমাজের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই লোকধর্ম সম্প্রদায়ের একটি বিশেষত্ব হলো পুরুষের পাশাপাশি নারীদের প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান। তারা যেমন স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করতে পারে আবার নিজে গুনে হয়ে ওঠে সংগঠকের প্রধান পরিচালক অর্থাৎ নারীরা এখানে বঞ্চিত নয় পুরুষের পাশাপাশি তারাও সমানভাবে ধর্মীয় আচরণ পালন করতে পারে।এই প্রসঙ্গে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান সংগঠক রামশরণ পালের স্ত্রী সরস্বতী দেবীর কথা বলা যায়। রামশরণ পালের মৃত্যুর পর সরস্বতী দেবী হয়ে উঠলেন কর্তাভজাদের প্রধান পরিচালক এবং তিনি পরিচিত হলেন সতী মা নামে। লোকধর্মে নারীদের যে উচ্চ আসন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, অনেকক্ষেত্রে তা লক্ষ করা যায় না। তবে লোকধর্ম শাস্ত্রীয় ধর্মের তুলনায় নারীকে যে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠা করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সূচক শব্দ: কর্তাভাজা, বাউল, সাহেবধনী, বলাহাড়ি, মতুয়া, লোকধর্ম, শাস্ত্রীয়ধর্ম, প্রতিবাদী।

মূল আলোচনা:

আমাদের শাস্ত্রীয় ধর্ম কোনদিনই নারীকে স্বাধীন মানুষের মর্যাদা দেয়নি। চিরকালই তাকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে পুরুষের অধিন করে রেখেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ট শতকে যে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের উৎপত্তি হয়েছিল সেখানেও নারী তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। কিন্তু বাংলার লোকধর্ম নারীকে দিয়েছে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা। এখানে নারী পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। কর্তাভজা, বাউল, সাহেবধনী, বলাহাড়ি, মতুয়া ধর্মে নারীকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। গৌণধর্মে কন্যা সন্তানের জন্মকে অভিশাপ বলে মনে করা হয় না, এখানে কন্যা সন্তান পুত্র সন্তানের মতোই পালিত হয়। কারণ এখানে নারী পুরুষের সাধন সঙ্গিনী, নারীকে ছাড়া সাধনা অপূর্ণ।

লোকধর্মে নারীকে ব্যাপক স্বাধীনতা দেওয়া হয়ছে তাঁর প্রমাণ, এখানে অনেক ক্ষেত্রেই নারী হয়ে উঠেছে সংগঠকের প্রধান পরিচালক। এই প্রসঙ্গে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান সংগঠক রামশরণ পালের স্ত্রী সরস্বতী দেবীর কথা বলা যায়। রামশরণ পালের মৃত্যুর পর সরস্বতী দেবী হয়ে উঠলেন কর্তাভজাদের প্রধান পরিচালক এবং তিনি পরিচিত হলেন সতী মা নামে। একজন গ্রাম্য মেয়ে থেকে হয়ে উঠলেন সংগঠনের প্রধান। তিনি বাংলার নারীদের কাছে স্থাপন করলেন এক বিরল দৃষ্টান্ত। যদিও তিনি আউলচাঁদের কাছ থেকে কোন দীক্ষা নেননি। তথাপি রামশরণের মৃত্যুর পর তিনি শিষ্যদের আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন। এমন কি ভাঙ্গনের হাত থেকে তিনি কর্তাভজাদের রক্ষা করেছিলেন। উইলিয়াম ওয়ার্ড জানিয়েছেন, রামশরণের জীবিত কালেই কর্তাভজা সম্প্রদায় প্রায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কারণ ঘোষপাড়ার কাছেই কাঁচরাপাড়ায় আউলচাঁদের অপর শিষ্য কানাই ঘোষ অতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সতীমায়ের প্রচেষ্টায় এই বিভাজিত অংশটিও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের দিকে ঝুকে পরে। কানাই ঘোষের বাড়ি আজও সতীমায়ের মাসি বাড়ি বলে পরিচিত।[১] ঘোষপাড়ার বাৎসরিক দোলের মেলা সতীমায়ের মেলা নামে পরিচিত। সতীমায়ের মহিমা প্রচলিত আছে নানা গানে-

“সতী মার ওপর যেবা রাখিবে বিশ্বাস।
সেরে যাবে কুষ্ঠ ব্যাধি হাঁপ শূল কাশ।।
কৃপা হলে ভবে তাঁর ঘটে অঘটন।
অন্ধ পায় দৃষ্টিশক্তি বধিরে শ্রবণ।।
চিত্ত যেথা রাখে পায় বিত্ত পায় ভবে।
বন্ধ্যানারী পুত্র পাবে তাঁহার প্রভাব।।
সতী মার ভোগ দিতে হবে যার মতি।
সকল বিপদে সেই পাবে অব্যাহতি।।”[২]

বোঝাই যাচ্ছে কতটা প্রভাব প্রতিপত্তি থাকলে এই ভাবে জনমানসে তিনি আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন। তিনিই হয়ে উঠেছিলেন কর্তাভজাদের প্রধান স্তম্ভ। গৌণধর্মীয় সম্প্রদায়ের নারীদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অনুপ্রেরণা।

নারী ব্যতিত বাউল সাধনা সম্ভব নয়। তাই বাউল সাধনায় নারীকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাকে দেখা হয় আদ্যাশক্তি রূপে। এখানে নারী পুরুষ উভয়ই সমান। তবে তত্ত্বগত দিক থেকে নারীই শ্রেষ্ঠ। নারীকে দেখতে হবে কোন চোখে তা বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন বাউল গানে-

“যারে বলে মেয়ে মেয়ে
এ কোন মেয়ের খাইলে দুগ্ধ

কারে করলে বিয়ে?
তারে কোন চেনাতে চিনে নিলে
তা আমারে বল না।”[৩]

সাধিকার মধ্যে জননীকে অনুভব করা এবং মাতৃশক্তি রূপে নারীকে দেখা হয় বাউল সাধনায়। অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা মুর্শিদাবাদের ২১৮টি বাউল পরিবারের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে সেখানকার সমাজে নারীদের অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি জানিয়েছেন, নারী দীক্ষা নিলে সে গুরুর সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়। আর স্বামীর সাথে তাঁর মাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই বাউল স্বামী স্ত্রীকে প্রণাম করে। স্ত্রী গুরুর সম্পত্তি হলেও তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে স্বামী। কিন্তু যথেচ্ছভাবে তাঁকে ব্যবহার করতে পারে না।[৪]

বাউল সমাজ পুরুষের একাধিক বিবাহকে অনুমতি দেয় না। তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর অথবা বিশেষ প্রয়োজনে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে এবং গুরুর নির্দেশে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে সাধক। বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। তালাকের পর মেয়েদের পুনর্বিবাহের রীতি আছে। বাউল পরিবারে মেয়েদের মধ্যে পর্দার প্রচলন নেই। অনেকে শাঁখা, সিঁদুর পড়ে বা ঘোমটা দেয়। অনেক গায়িকা বাউল আছে, যারা গান করে উপার্জন করে। পাটকেবাড়ির হাওয়া বিবি, কানাই নগরের শাখাড়োণ ফকিরাণী, পলাশীপাড়ার শাহীদা উল্লেখযোগ্য বাউল গায়িকা।[৫] নদিয়া ও মুর্শিদাবাদের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য বাউল সাধিকা হলেন- আনন্দময়ী অধিকারী, কল্যাণী দাসী, কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী, গায়ত্রী দাসী, চন্দনা দাসী, চম্পা ঘোষ, তুলিকা মণ্ডল, মাধবী গোস্বামী, মিনতী মহান্ত, মীরা মোহান্ত, লক্ষ্মীরাণী বিশ্বাস, সুভদ্রা শর্মা, সুমিত্রা দাসী, সোমা বিশ্বাস, শ্রাবন্তী দাস, তুলসী দাসী, বাসন্তী দাস, লক্ষ্মী মণ্ডল, লক্ষ্মী চট্টরাজ, সরস্বতী দাস, সুচিত্রা দাস বাউল প্রমুখ।[৬] তবে বাউল পরিবারে নারীদের ওপর অত্যাচার বা শোষণ হয় না তা বলা ঠিক নয়। স্ত্রীকে মারা, সম্পত্তির ভাগ না দেওয়া বহুগামিতাও রয়েছে অনেকের মধ্যে।

সাহেবধনীদের সাধনা কর্তাভজাদের মত দেহবাদী। কাম থেকে প্রেমের উত্তরণ এই সাধনার উদ্দেশ্য। এই সাধনা নারীকে ছাড়া পূর্ণতা পায় না। অনেকেই মনে করেন সাহেবধনীদের প্রতিষ্ঠার মুলে রয়েছেন একজন নারী। সাহেবধনীদের একটি পদে আছে-

“সেই ব্রজধামের কর্তা যিনি
রাইধনী সেই নামটি শুনি
সেই ধনী এই সাহেবধনী।”[৭]

অর্থাৎ সাহেবধনীর পূর্বসূত্রে শ্রীকৃষ্ণ বা চৈতন্য নেই, আছেন শ্রীরাধা অর্থাৎ কোন একজন নারী। আসলে নারীর পাশাপাশি রয়েছে পুরুষের ভূমিকা। নারী-পুরুষের যুগল মিলনে গড়ে উঠেছে সাহেবধনীদের সাধনা। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহেব দিনের সম্প্রদায়ের শীর্ষ শাবক কমে গেছে বর্তমানে কিছু পুরুষ সেবায় তে থাকলেও নারী সেবায়েতের সংখ্যা নেই বললেই চলে।[৮]

সাহেবধনীদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল মহিলা আসনে ফকিরের অবস্থান। অর্থাৎ কোন নারী এখানে দীক্ষা দেওয়ার অধিকারী। অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন, "শরৎ পাল বলেন, আমাদের ঘরে এককালে খুব নাম করা মহিলা ছিলেন জগতীমাতা, দীনুরতন দাসী, লক্ষ্মীগর। তাঁদের অনেক শিষ্য ছিল। এখনও অনেক আছেন।"[৯] অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী আকন্দবেড়েতে এই রকম একজন মহিলার সাথে দেখা করে। হরিমতী নামে ঐ মহিলার সাথে তিনি আলাপ করেন এবং আশ্চর্য হন। সেখানে পাতা ছিল দীনদয়ালের আসন। ছিল ত্রিশূল, ফকিরি দণ্ড, পালবাড়ি থেকে আনা একজোড়া খড়ম। মহিলা শিষ্যরা গুরুকে সেবা করে থাকেন নানা উপায়ে। পূজার ভোগ প্রস্তুত করা, প্রয়োজনে গুরুর আহারাদির ব্যবস্থা করা, আসন পাতা প্রভৃতি তাঁরা করে থাকেন।

বলাহাড়ি সম্প্রদায়ে নারীকে আলাদা করে দেখা হয়নি, তাঁকে তাঁর যোগ্য সন্মান দেওয়া হয়েছে। এই সম্প্রদায়ে নারী পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক ভাই বোনের। হাড়িরামের ভোগরাগ নিবেদনের জন্য নারী-পুরুষ মিলিত হয়ে আরাধনা করতে পারে। আর যোগ্য নারী সম্প্রদায়ের পরিচালনার প্রধানও হতে পারেন। এখানে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ নেই বলে বলরামের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী বা সেবিকা ব্রহ্ম মালোনী মেহেরপুরে বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের প্রধান হন, তিনি হন সরকার অর্থাৎ প্রধান প্রধান পরিচালক বা সংগঠক। নারীরা কতটা স্বাধীনতা পেলে এই রকম একটা গুরু দায়িত্ব পেতে পারে। তবে কর্তাভজা বা বাউলদের মত বলরামীরা দেহবাদী নয়। তাই তাঁদের ধর্মে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা নেই। ফলে এই ধর্মে বিকৃতি কম। তবে বর্তমানে নিশ্চিন্তপুরের বেলতলায় হাঁড়িরামের যে আশ্রম রয়েছে তাতে কোন নারীর সেবাইত নেই। এর কারণ জানতে চাওয়া হলে বেলতলা পূজা কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক জানিয়েছেন কিছুদিন আগে একজন নারীকে রাখা হয়েছিল পূজা অর্চনার জন্য কিন্তু গ্রামের লোকেরা আপত্তি করায় তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই থেকে বেলতলায় নিত্য পূজা দেওয়ার জন্য কোন সেবাইত নেই।[১০]

মতুয়া ধর্মে নারীর স্থান পুরুষের সহযাত্রী হিসেবে। এই ধর্মে নারী সামাজিক বা ধর্মীয় দিকথেকে যে স্বাধীনতা পায় সেই দিক থেকে বিচার করে এই ধর্মকে আধুনিক মতাদর্শের ধারক বলা যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের সময় থেকেই বিভিন্ন মহোৎসব, শোভাযাত্রা, কীর্তনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের পরিচয় পাওয়া যায়। গুরুচাঁদ

ঠাকুরের সময় চৌত্রিশ জন মহিলা মতুয়া ধর্মকে আত্ম-নিবেদনের পন্থা হিসেবে বেঁছে নেয়। এরা হলেন, অম্বিকা, এলোকেশী, কাঞ্চন, কুসুম, কৈলাসসিনী, জয়মতী, জানকী, তপতী, দাসকন্যা, দাড়িয়ার মেয়ে, দেবী বিলাসিনী, পদ্মঠাকুরানী, পাগলী, প্রভাতী, প্রমীলা, ফুলমালা দেবী, বউ ঠাকুরানী, বিনোদনী, বিরোজ, ভগবতী, ময়নামতী, মাধবেন্দ্র জননী, মালঞ্চ সাহা, রতনমণি, রসমতি, রাধামণি, শান্তি, সরস্বতী, সাধনা, সাধনা, হাটবাড়ি, হেমন্ত কুমারি।[১১]

মতুয়াদের দ্বাদশ আজ্ঞার মধ্যেই রয়েছে নারীদের কথা। 'পরস্ত্রীকে মাতৃ জ্ঞান করিবে'- হরিচাঁদ ঠাকুর এই আজ্ঞার মধ্যে দিয়ে নারীদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের কথা বলছেন। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের কথা বলেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর। মতুয়াদের মতে নারীকে দূরে সরিয়ে রাখা হল নারীর প্রতি অন্যায়। তাই বলা হয়-

'করিবে গৃহস্থ ধর্ম লয়ে নিজ নারী।'

গৃহে থেকেই নারী সঙ্গে নিয়েই ধর্ম পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মতুয়া ধর্মে। মতুয়াদের বিচারে নারী হবে-

"পবিত্র রহিয়া যেবা সেবা করে।
লক্ষ্মী আসি বাস করে সদা তাঁর ঘরে।।
পতি গতি করে নারী পতিব্রতা কয়।
সদ্ভাবে চললে নারী 'সতী' আখ্যা পায়।।
সৎ থাকে পতি সেবে পতিব্রতা সতী।
সাধ্বীতী কথা তবে বলিব সম্প্রতি।।
সেবাদানে তোষে, পতি সন্তোষ বিধানে।
ইহাধিক সময়েতে ডাকে ভগবান।।
সাধনা-নিপুণা দেবী পরমা প্রকৃতি।
নরগণে বলে তারে সাধ্বাসতী।।"[১২]

মতুয়া ধর্মে নারীকে যে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল-

১. মতুয়া সম্প্রদায়ে পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে পিতা-মাতার সম্পত্তির সমান অধিকার পায়।
২. তাঁদের মধ্যে বহু বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।
৩. খুব সমস্যা ছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদ স্বীকৃত নয়।
৪. বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্ত্রী পুরুষ উভয়ই পুনর্বিবাহ করতে পারে।
৫. সভা সমিতি, সামাজিক অনুষ্ঠান, বিচার প্রথা সব ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের সমান অধিকার।
৬. বিবাহে পণ দেওয়া বা নেওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

৭. স্বামীর মৃত্যু হলে সম্পত্তির মালিক স্ত্রী হবেন।
৮. মেয়েদের আঠারো বছরের পূর্বে বিবাহ নিষিদ্ধ।
৯. অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।[১৩]

ধর্মীয় উদারতার কারণে মতুয়া ধর্মে নারী নগরকীর্তন, শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ, এমনকি দলপতির দণ্ড নেওয়া বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতে পারে। মতুয়া ধর্মে নারীরা যে স্বাধীনতা এবং মর্যাদা ভোগ করে তাকে সত্যিই আধুনিকতার অগ্রদূত বলা যায়।

লোকধর্মে নারীদের যে উচ্চ আসন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, অনেকক্ষেত্রে তা লক্ষ করা যায় না। লোকধর্ম সাধনায় নারীদেরকে পুরুষের তুলনায় উঁচুতে আসন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তব চিত্র অন্যরকম। অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন, "সাধিকা বা সঙ্গিনী কখনই প্রকৃত পথ জানে না- জানে গুরু। এখানেই গুরুর আধিপত্য এসে যায়।"[১৪] নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় যে বাউল আখড়া রয়েছে তার সবগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় পুরুষের দ্বারা, নারীর ভূমিকা সেখানে সেবাদাসী। আর যে সকল নারী লোকধর্ম সাধনায় যুক্ত হয়, তারা যে সবসময় সাধনার টানে আসে এমনও নয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর মত হল, "দেখেছি বেশির ভাগ বাউলের সঙ্গিনী জুটে যায় গানের মোহে, কেউ কেউ আসে যৌন আকর্ষণে।"[১৫] তাই সকলের পক্ষে সাধনায় সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় না। আবার অনেকেই শিকার হন ভণ্ড গুরুর লালসায়। সাধনার নামে অনেক নারীই যৌন লালসার শিকার হন। এর সঙ্গে অনেকেই শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। বাউল সাধিকা নির্মলা গোঁসাই জানিয়েছেন, "কী মার মেরেছে গোঁসাই- চড়চাপড় লাথি পর্যন্ত খেয়েছি।"[১৬]

দেখা গেছে লোকধর্ম গুরুদের একাধিক সাধন সঙ্গিনী থাকে। আর এই সাধন সঙ্গিনীদের মধ্যে চলতে থাকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা- কে গুরুর সবথেকে কাছের হবে। আসলে যে মোহে নারী লোকধর্মের সাথে যুক্ত হয় অনেক ক্ষেত্রেই কিছু দিনের মধ্যে মোহ ভঙ্গ হয়, তখন তার জীবনে নেমে আসে ঘোরতর অন্ধকার। সমাজ তাদের ভালোভাবে মেনে নেয় নে। ফলে স্বাভাবিক জীবন যাপন ব্যাহত হয়ে পরে। অনেকেই বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা লিখেছেন, "... নারীর সন্মান বাস্তবে রক্ষিত হয় না। স্ত্রীকে মারা, মেয়েদের সম্পত্তির ভাগ না দেওয়া, বহুগামিতা আছে কোন কোন সাধকের মধ্যে।"[১৭] সুতারং দেখা যাচ্ছে লোকধর্ম একদিকে যেমন নারীদের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, আবার অনেক ক্ষেত্রেই অনেক নারীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। তবে লোকধর্ম শাস্ত্রীয় ধর্মের তুলনায় নারীকে যে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠা করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্য সূত্রঃ

১। দে দেবেন্দ্রনাথ, *কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত,* জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫০, পৃ. ৪০।

২। নন্দী রতন কুমার, *কর্তাভজা ধর্ম ও সাহিত্য,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৪৭।

৩। আহমদ মোস্তাক, *লালন ভেদ সমগ্র,* সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৫৬৫।

৪। ওয়ার্ড. ডব্লু. ডব্লু., *অ্যাকাউন্ট অফ দ্য রিটিংস রিলিজিয়ন অ্যান্ড ম্যানারস অফ দ্য হিন্দুস,* মিশনারি প্রেস, শ্রীরামপুর, ১৮১১, পৃ. ৩৬৪।

৫। চক্রবর্তী সুধীর, *বাউল ফকির কথা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ২৪৬।

৬। তদেব, পৃ. ২৪৭।

৭। আহমেদ রাজিব, *কুবির গোঁসাই ও সাহেবধনী সম্প্রদায়,* আনন্দধারা, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৯৪।

৮। সাক্ষাৎকার : নাম- হেমন্ত পাল, বয়স- ৮২ (আনু.),। ঠিকানা- বৃত্তিহুদা, নদীয়া। তারিখ- ২৬.০৯.২০২০। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা- প্রদীপ মণ্ডল, স্থান- বৃত্তিহুদা।

৯। আহমেদ রাজিব, *কুবির গোঁসাই ও সাহেবধনী সম্প্রদায়,* আনন্দধারা, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৯৪।

১০। সাক্ষাৎকার: নাম- লালমোহন বিশ্বাস, বয়স- ৫২ (আনু.), পেশা- কৃষক। বিশেষ পরিচয়- বেলতলা পুজো কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক, ঠিকানা- নিশ্চিন্তপুর, নদিয়া। তারিখ- ২৬.০৩.২০১৮। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা- প্রদীপ মণ্ডল, স্থান- নিশ্চিন্তপুর।

১১। সরকার স্বরূপেন্দু, *সমাজ সংস্কারে মতুয়া,* কঙ্কা প্রকাশনী, বাগেরহাট, ২০০১, পৃ. ৯৭।

১২। সরকার তারক চন্দ্র, *শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত,* ওড়াকান্দি, ফরিদপুর, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮।

১৩। সরকার স্বরূপেন্দু, *সমাজ সংস্কারে মতুয়া,* কঙ্কা প্রকাশনী, বাগেরহাট, ২০০১, পৃ. ৯৭।

১৪। চক্রবর্তী সুধীর, *বাউল ফকির কথা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৫৮।

১৫। তদেব, পৃ. ১৬২।

১৬। তদেব, পৃ. ১৬৫।

১৭। ঝা শক্তিনাথ, *বস্তুবাদী বাউল,* দে'জ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৪৭।

সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার

হরিপদ মহাপাত্র
সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ: দীর্ঘদিন ধরে বহু প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সারা বিশ্বের তথা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তপ্রান মানুষ পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে স্নান করে পুণ্য লাভের আশায় ছুটে আসেন।সেই কপিল মুনির সময় থেকে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গঙ্গাসাগর মেলা আজও মৌলিকত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। আজও মানুষ বিশ্বাস করেন পৌষ সংক্রান্তির পূর্ণ তিথিতে যদি গঙ্গাসাগরের সমুদ্রে স্নান করা যায় বহু পাপ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। তাই গঙ্গাসাগর মেলা বর্তমানে আন্তর্জাতিক মেলা স্বীকৃতি লাভ করেছে।বিশ্বের ক্ষেত্রে কুম্ভ মেলার পর সবচেয়ে বড় দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে।মেলা কে কেন্দ্র করে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ফলে এই মেলা মানুষের মহামিলন ক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। পথ দুর্গম তার কারণে একসময় বলা হত সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার।

সূচক শব্দ: বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, দুর্গম, মেলা, বারবার, সংস্কৃতি।

মূল প্রবন্ধ:মুখমণ্ডল যেমন দেহের অভিব্যক্তির দর্পণ বলে ধরা হয় তেমনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন মেলা পুরাণ এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে স্পন্দনশীল সামাজিক জীবনধারার সঙ্গে এক সুতোয় গেঁথে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এক স্থানে সমবেত করে এবং কয়েকদিনের সামান্য পরিসরে ও নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনায় এক ক্ষুদ্র পৃথিবী গড়ে তোলে। গঙ্গাসাগর মেলা কে কেন্দ্র করে পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে সেখানেও আমরা ভিন্নতার সুর খুঁজে পাই। কাহিনীটি এইরকম অহংকারী নারদ সংগীতে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। অহংকারবশত: নারদ মুনীসঙ্গীতে অমনোযোগী হয়ে তাল লয় ভুল করেছিলেন।মহর্ষি নারদের এই অহংকার ভাঙ্গার জন্য অসন্তুষ্ট রাগিনীর বিকলাঙ্গ নরনারী রূপ ধারণ করেছিলেন। অবশেষে রাগ রাগিণীর এই অবস্থার জন্য মুনি তার নিজের সঙ্গীতের ত্রুটির কথা বুঝতে পারেন। যদি সংগীতের সাধক মহাদেব স্বয়ং সঙ্গীত পরিবেশনে সম্মত হন তবেই রাগ রাগিনী রা তাদের পূর্বাবস্থা লাভ করতে পারবে। তাই মুনিমুনির বিশেষ অনুরোধে মহাদেব সংগীত পরিবেশনে সম্মত হন। এই শর্তে যে সেই আসলে বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাকেও থাকতে হবে। পুরান কথায় ভগবান বিষ্ণুর পদাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত গলে যাওয়া, বিষ্ণু সত্তাকে অতি সাবধানে কমন্ডলুতে ধরে রাখেন ব্রহ্মা ইনি নাকি গঙ্গা!

অন্যদিকে বহুল প্রচলিত কাহিনী টি আছে বাল্মিকীর রামায়ণে। নাগরিক জীবনের মননে গঙ্গা ও গঙ্গাসাগরের মাহাত্ম্য ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।কারণ কথিত আছে গঙ্গায় শুধু জলে মোক্ষ, বারাণসীতে মোক্ষ জলেও স্থলে, আর গঙ্গাসাগরে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্রইমোক্ষ। তাই জনশ্রুতি "সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার"। স্কন্দ পুরাণে কাশিখন্ডে প্রশ্ন করা হয়েছে জেলে বা ধীবরগণ দিবারাত্র তীর্থ জলে মজ্জনকরে, তাতে কি তারা শুদ্ধ হয়? তদ্রূপ নাস্তিকেরা শত শত বার স্নান করেও পবিত্র হয় না। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প প্রচলিত আছে।একবার শিব দুর্গা আকাশপথে গঙ্গার উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন আর সেই দিন পৌষ সংক্রান্তিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ পাপ মোচনের জন্য গঙ্গাসাগরে স্নান করছিল। তা দেখে দেবী বললেন এখানে এত মানুষের সমাগন কেন? শিব বললেন আজ গঙ্গার মর্তে আসার তিথি, তাই এই লক্ষ লক্ষ মানুষ গঙ্গায় স্নান করে পাপ মোচন করছে। তখন দেবী বললেন এটা খুব ভালো, এই স্নানেসকলের পাপ মোচন হবে। তখন শিব বলেন সকলের পাপ মোচন হয় না, দু একজনের হয়। এই বলে শিব দুর্গা সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর বেশে গঙ্গা তীরে এলেন।সকলে দেখল এক সাধ্বী স্ত্রী তার রোগগ্রস্থ স্বামীকে ঝুড়িতে নিয়ে সবাইকে অনুরোধ করছেন কেউ যেন তার স্বামীকে একটু গঙ্গার জলে নামিয়ে দেয়।আবার কেউ তা করতে এলে তাকে সাবধান করে বলছেন যদি আপনি স্নান করে সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে থাকেন তাহলে করুন, আর শুদ্ধ না হলে আপনিও রোগে আক্রান্ত হবেন। এই কথা শুনে কেউ আর এগিয়ে এল না।অবশেষে এক দস্যু স্নান করে ফেরার পথে ঝুড়ি ধরে গঙ্গায় নামিয়ে দেয়, তখন ওই দস্যু শিব দুর্গার রূপ দর্শন পায়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে অথ:স্নানাদৌসদ্ভাপেক্ষা। স্নানফল লাভ করতে হলে সদাচারের প্রয়োজন।

“সব্বতীর্থেষুযৎপূন্যাংসর্বদনেষু যৎভবেৎ।
পূজায়াংসর্বদেবানাং দেবানাংতপসাংযঞ্চকম্মানাম্।।
সর্বপূন্যাশ্রমানঞ্চযৎপুন্যংসম্প্রজায়তে।
দর্শনাংস্পর্শনাৎপ্নৎস্নানচৈবাবগাহনাৎ।
লতেপুরুষ: সর্বংস্নাত্বাসাগর সঙ্গমে।।“

অর্থাৎ মানুষ তীর্থ সেবা সর্বপ্রকার দান, সর্ব দেবতার পূজা, সর্ববিধতপস্যা ও যঞ্জ, সর্বপুন্য শ্রমের পুণ্য,যতই আরোহন করুক এ সকলের মিলিত যে পুণ্য ফল তা একমাত্র গঙ্গাসাগরের স্নান করেই পাওয়া যায়।

বর্তমানে পৌষ সংক্রান্তির পূন্যতিথিকে ঘিরে গঙ্গাসাগর মেলায় যে পূণ্য স্নান করার রীতি প্রচলিত তা প্রকৃতপক্ষে কত প্রাচীন তা বলা মুশকিল যদিও মহাভারতের বন পর্বে যুধিষ্ঠির ও সপরিবারে গঙ্গাসাগরে পুণ্য স্নান করেছিলেন, আর তখন থেকেই হয়তো এই নিয়মের শুরু।

গঙ্গাসাগর মেলা কে কেন্দ্র করে লোকবিশ্বাস ও সংস্কার: প্রাচীনকাল থেকেই মেলা কে কেন্দ্র করে নানান ধরনের লোকসংস্কার গড়ে উঠেছিল। এই সংস্কার গুলির মধ্যে বেশ

কয়েকটি সতীদাহ প্রথার মতই নির্মম ছিল।আগেকার দিনেসাধারণ মানুষ গঙ্গার কাছে সন্তান মানত করতো এবং সেই মানত রক্ষার জন্য ছোটো ছোটো শিশুকে সমুদ্রের জলে বিসর্জন দিত।তাছাড়া ও বয়স্ক মানুষেরা পৌষ সংক্রান্তির পূন্য তিথিতে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সারারাত ধ্যান জপ করে সময় অতিবাহিত করতো।ভক্তরা মৃত্যুর পরে মর্ত থেকে স্বর্গে যাওয়ার পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে গরুর লেজ ধরে কিছুটা অংশ ছেঁটে বেড়াতো। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী মৃত্যুর পর গরু সঠিক পথ দেখিয়ে স্বর্গে নিয়ে যাবে।তাছাড়া, মেলায় আগত গরিব ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী এবং ভিক্ষুকদের যথাসাধ্য খাদ্য, অর্থ ,বস্ত্র দান করা রীতি আজও প্রচলিত আছে। মহিলাদের দেবী গঙ্গার মাহাত্ম্যের উপর বিশেষ গান ও নাচ করতে দেখা যায়।সাগরদ্বীপে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস বাবা কপিলমুনি থাকার কারণে সমুদ্রের নানা ধরনের বিপদের হাত থেকে দ্বীপবাসী রক্ষা পায়।

ধর্মীয় কারণে মুদ্রার অপচয়:

সারা বছর ধরে তীর্থযাত্রীরা গঙ্গাসাগরে আসেন,তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তারাঁ সমুদ্রে গঙ্গা দেবীর উদ্দেশ্যে খুচরো পয়সা নানান ধরনের মূল্যবান অলংকার সমুদ্রকে দান করেন। তাই হাজার হাজার এক টাকা দু টাকা, পাঁচ টাকার কয়েন সমুদ্রের জলে ফেলা হয়। ২০১৭ সালের গঙ্গাসাগর মেলা সরকারি রিপোর্ট অনুসারে ১৮ লক্ষ তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়েছিল।যদি প্রত্যেক তীর্থযাত্রী অন্তত একটি করে কয়েন ও সমুদ্রে ফেলে থাকে তাহলে কম করে ১৮ লক্ষ কয়েন সমুদ্রে ফেলা হয়েছে।

স্থানীয় মহিলাদের স্বনির্ভরতা ও মেলার ব্যবসা বাণিজ্য:

মেলার সময় প্রায় এক মাস ধরে নানান ধরনের ব্যবসার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পায় সেখানে নিমের দাঁতন কলাপাতা থেকে শুরু করে সব ধরনের জিনিস বিক্রি হয়।তাই স্থানীয় মহিলারা গ্রাম থেকে নিমের দাঁতন, কলাপাতা, খড়, শুকনো কাঠ, নানান ধরনের শাকসবজি সংগ্রহ করে মেলায় বিক্রি করে। তাতে তাদের সাময়িকভাবে কিছু অর্থ উপার্জন হয়।গঙ্গাসাগর মেলা কে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মানুষ ব্যবসার কারণে আসেন।

যুব সম্প্রদায়ের কাছে গঙ্গাসাগর মেলা:

কয়েকশো বছর আগে থেকেই পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের মেলায় নিরাপদে নিয়ে আসার কারণে যুব সম্প্রদায় মেলাতে আসতো। অবশ্য মেলায় আসার পর তারা নিজেদের মতো করে মেলার মধ্যে আনন্দ খুঁজে নিত।বর্তমানে এই ধারণা বদলে গিয়েছে সাধারণভাবে অন্যান্য উৎসব যেভাবে সব বয়সের মানুষের উপভোগ করে সেই রকমই গঙ্গাসাগর মেলা ও যুব সমাজের কাছে একটি উপভোগ্য মেলা হয়ে উঠেছে।

যুগ যুগান্ত ধরে সুরধ্বনি গঙ্গা এবং গঙ্গাসাগর:

মেলা কে কেন্দ্র করে লেখক ও কবির কল্পনার ফসল সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে। ঋকবেদের দশম মন্ডল এ৭৫তমসূক্তে, বৌদ্ধ সাহিত্য মিলিনূপঞ্হজৈন সাহিত্যে কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে গঙ্গা স্তুতির বর্ণনা আছে।সাহিত্য সম্রাট তার

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে সাগর থেকে ফেরার পথে সমুদ্র সৌন্দর্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অতুলনীয়।"অনন্ত জলরাশির চঞ্চল রবি রশ্মি মাখা প্রদীপ্ত হইয়া গগন প্রান্তে গগনসহিতমিশিয়াছে। নিকটস্থ জল সচরাচর সকর্দম নদী জল বর্ণ কিন্তু দূরস্থ বারি রাশিনীলাভপ্রভ।"নায়ক যুবপুরুষ নব কুমার কয়েকশো বছর আগে কোন এক মাঘ মাসের রাত্রি শেষে গঙ্গাসাগরের এই রূপ দেখে রঘুবংশ থেকে আবৃত্তি করেছিলেন "দূরাদয়শ্চক্রনিভস্যতন্বীতমালতালী।"

সাগরদ্বীপের লেখক বিজয় চক্রবর্তী গঙ্গাসাগর মেলার পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে" গঙ্গাসাগর তীর্থ কাব্য" রচনা করেছিলেন।এই কাব্যে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর পাশাপাশি ভগিরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনী বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সসম্ভ্রমে পূর্ণ ধারা স্পর্শে স্নিগ্ধ শান্ত প্রাণ। কহিলেন- মহেশানি!

মত গঙ্গে! অবতীর্ণা ধারা রূপে তব সুপবিত্রধরাতল। করুনা রূপিনী!

ক্রোধাগ্নি তে মম ভস্মিভূত সগরের বংশধর গণ।পুত: স্পর্শদানিসবে মুক্তি দাও মাত:।

গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে সহযাত্রীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় ভরপুর শঙ্কু মহারাজের লেখা ভ্রমণ কাহিনী "গঙ্গাসাগর"। এই ভ্রমণ কাহিনীতে ডায়মন্ড হারবার থেকে নদীপথেগঙ্গাসাগর যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে।

শুধু সাহিত্যিকদের কলমে গঙ্গাসাগর মেলা আটকে থাকে নি। ভারতবর্ষের সিনেমাতে ও জায়গা করে নিয়েছে১৯৭৮ খিস্টাব্দে থেকে গঙ্গাসাগরের পৌরাণিক কাহিনীকে নিয়ে তৈরি হয় "গঙ্গাসাগর" হিন্দি ভাষি ছবি। এই সিনেমা শুরুতেই শোনা যায় সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার।সিনেমাটির প্রযোজক এবং পরিচালক হলেন শিষ কুমার।সিনেমাটিতে ভারতের ধর্ম প্রিয় মানুষদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়া কবিতা গল্প টিভি সিরিয়ালে ও গঙ্গাসাগরের মেলা প্রসঙ্গ বারবার খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে দীর্ঘদিন ধরে একটি বৃহত্তর সমাজের ধর্ম বিশ্বাসের ছবি ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন ভাষা সাহিত্যের আঙিনায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশেকচুবেড়িয়া থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রাস্তা তৈরি হওয়ার মাধ্যমে সাগরদ্বীপের গ্রাম্য জীবন নগর জীবন উন্নীত হওয়ার পথে প্রথম ধাপ অতিক্রম করে।তখনো পর্যন্ত টেলিফোন যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি গঙ্গাসাগরে কিন্তু টেলিফোন মেলা পরিচালনা ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত জরুরীছিল। প্রায় ১৯৩০ সাল থেকে মেলার এই দরকার মেটাতোহ্যাম রেডিও অপারেটরগন। রেডিওর সাহায্যে বিশ্বের যেকোন প্রান্তের সঙ্গে অতি সহজেই যোগাযোগ করা সম্ভব।তাই বিশাল গঙ্গাসাগর মেলা বিভিন্ন দরকারি খবরা খবর আদান প্রদানের পাশাপাশি হারিয়ে যাওয়া তীর্থযাত্রীদের বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। তাই যেকোন প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশে হ্যাম রেডিও প্রকৃত বন্ধুর মতো পাশে থাকে। বর্তমানের উন্নত টেলিকম ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও একাধিক ভাষা জানেন এমন মানুষ হ্যামরেডিওরমাধ্যমেতীর্থযাত্রীদের সাহায্য করে

চলেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিকতার ভেতরে ভেতরেএই সংস্কৃতিতে ক্ষয় সৃষ্টি করেছে।আর ইদানিংকালে বছর গুলিতে অতিরিক্ত মানুষের চাপ যত্রতত্র জৈবিকঅবিশ্লেষ্যপদার্থ ছড়িয়ে যেজীবপরিবেশেরঅবর্ণনীয় ক্ষতি করে চলেছে।

প্রচার মাধ্যমের মনোযোগ সাধু মোহন্তদের আদর্শ জীবনযাত্রা, উচ্চমার্গের সাধন পদ্ধতি ইত্যাদি প্রকাশ করার বদলে তাদের অর্থহীন ক্রিয়াকলাপের দিকেই পড়ে থাকে।আর এই বিভ্রান্তিকর প্রদর্শন সাধুদের অর্থহীন শ্রদ্ধার বস্তু করে তোলে মনন শীল মানুষের চোখে। স্বল্প শিক্ষিত সাধারণ মানুষের কাছে এর মূল্য থাকলেও বাকীদের কাছে কিন্তু সাধুদের যে ইমেজ গড়ে ওঠা তা সাধুদের পক্ষে ক্ষতিকর।আরো চমকপ্রদ ব্যাপার হলো এই মেলাকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করার ব্যাপারে প্রশাসনের স্তরে স্বল্প উদ্যম দেখা যায়।তাই কুম্ভ মেলার মতো আন্তর্জাতিক মানের মেলা হয়ে ওঠার বদলে সাগর মেলা একটি বেড়াতে যাওয়ার বিষয় হয়ে থেকে যায়।

সুন্দরবনের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনার ক্ষমতা কিন্তু এই মেলারআছে। শেষ কয়েক দশকে দেখা গিয়েছে সাগর মেলায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কলকাতা ও ভারতের বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নিজেদের পসরা নিয়ে আসছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের দূরদূরান্তের জেলাগুলি থেকে ব্যবসায়ীদের আসতে দেখা যায়।তাই গঙ্গাসাগর মেলার বাণিজ্য ব্যবস্থা সুন্দরবনের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতির ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে চলেছে।

তথ্যপঞ্জি

১. চক্রবর্তী বিজয়, গঙ্গাসাগর তীর্থ কাব্য, চক্রবর্তী পাবলিশাস দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৪০১বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৬।

২. চক্রবর্তী বিজয়, পবিত্র হিন্দু ধর্ম ও সম্পূর্ণ গঙ্গাসাগর, মা বাসন্তী বুক স্টল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পৃষ্ঠা ২৪।

৩. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, কপালকুণ্ডলা, কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা ১৪২১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩ ।

৪. দত্ত সুতপা, সুমিত (সংকলন) ,ভারতের শত হিন্দু তীর্থ ,সাহিত্য তীর্থ, কলকাতা ২০১৩ পৃষ্ঠা ৫৮।

৫. বিশ্বাস গৌতম,মুক্তি তীর্থ গঙ্গাসাগর, গিরিজা, কলকাতা ২০১৩ পৃষ্ঠা ১৫৬ , ১৮৯,২০৬,২১৪।

৬. শঙ্কু মহারাজ,গঙ্গাসাগর, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে পৃষ্ঠা ১৮৭।

৭. শর্মা সেবক দাস, মাবাসন্তী বুক স্টল দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

৮. Datt, Barun Here to Eternity, Alchemy Publisher, New Delhi.

কবিতার ভাষা: সমর সেন

খোকন বর্মন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
নয়াগ্রাম পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সরকারি মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: "...কবিতা লেখার সময় ভাষার উপরে যে স্বতন্ত্র ছাপ পড়ে তার নাম ডিকশন, এবং এই স্বতন্ত্র ব্যবহারের শক্তি কবির পুরুষকারের পরিচায়ক।"[১] ভাষা যদি হয় জ্ঞাপনের মাধ্যম তাহলে কবিতার ভাষা কবির আত্মপ্রকাশের মাধ্যম। এই আত্মপ্রকাশ কবি-প্রতিভার তারতম্যে কবিতার ভাষার মধ্যে তফাৎ এনে দেয়। যে কারণে একই বিষয় নিয়ে পাঁচ জন কবি পাঁচটি কবিতা লিখলেও ভাবে ও ভাষায় তা পাঁচ রকম হতে বাধ্য। তাই রবীন্দ্রনাথের 'হাট' কবিতা এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হাট' কবিতা একই বিষয়ে নিবন্ধ হলেও ভাবে ও ভাষায় তা স্বতন্ত্র প্রকাশ হয়ে ওঠে। এই স্বতন্ত্রতা আসলে কবির ব্যক্তিত্বের প্রকাশ— সমর সেন যাকে 'পুরুষকার' বলেছেন। কবিতার ভাষায় কবির এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে ভাষার বিভিন্ন সূত্রে— যেমন, শব্দ নির্বাচন, শব্দের সঙ্গে শব্দ সংস্থাপন বা অন্বয়, বাক্য নির্মাণ কৌশল, ছন্দ অলঙ্কার প্রভৃতির বিশেষ ব্যবহার কিংবা কোনো বিশেষ প্রবণতা বা ভাষামুদ্রা প্রভৃতি। ভাষার এই বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ সূত্রে কোন কবির কবিতার ভাষার বিশেষত্বগুলি মোটামুটিভাবে তুলে ধরা সম্ভব। এই আলোচনা কবি সমর সেনের কবিতার ভাষার কিছু দিক নিয়ে কথা বলার বিনীত প্রয়াস।
সূচক শব্দ: কবিতার ছন্দ, ধ্বনিস্পন্দ, শব্দের বিশিষ্ট ব্যবহার, সমান্তরালতা, উপমা রূপক চিত্রকল্প, উল্লিখন প্রভৃতি প্রসঙ্গ।

মূল আলোচনা:
সমর সেনের কবিতার ভাষা নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই যে প্রসঙ্গটির অবতারণা করতে হয় তা তাঁর কবিতার ছন্দ। কারণ বাংলা কবিতার ধারায় সমর সেন তাঁর প্রথম আবির্ভাবেই প্রখর স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছিলেন এই ছন্দ ব্যবহারে। 'বাবু বৃত্তান্ত' মারফত আমরা জানতে পারি যে, বুদ্ধদেব বসু তাঁকে 'নিয়মিত ছন্দের চেষ্টা ছেড়ে গদ্যছন্দে যেতে'[২] বলেছিলেন। উল্লেখ্য যে, সমর সেনের প্রায় সমস্ত কবিতাই এই গদ্যছন্দে লেখা। তবে এমন নয় যে সমর সেন-ই বাংলা কবিতায় গদ্যছন্দ প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। তবে একথা সত্য যে প্রথম ব্যবহারকারী না হলেও তিনি গদ্যছন্দের যে রূপ বাংলা কবিতায় নিয়ে এলেন সমকালের নিরিখে তা অভিনবই ছিল। বুদ্ধদেব বসুর কথানুযায়ী "বাংলা গদ্য ছন্দকে এই তরুণ কবি যে-রূপ দিয়েছেন সেটা আর কারোরই

নয়; তিনি আবিষ্কার করেছেন এই ছন্দের অভিনব ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি।"[৩] প্রসঙ্গত আমরা সমর সেন-এর দু'টি কবিতা থেকে দু'টি স্তবক উদ্ধৃত করতে চাইব—

১. "কেন তুমি বাইরে যাও স্তব্ধ রাত্রে
আমাকে একলা ফেলে?
কেন তুমি চেয়ে থাকো ভাষাহীন, নিঃশব্দ পাথরের মত?
আকাশে চাঁদ নেই, আকাশ অন্ধকার,
বাতাসে গাছের পাতা নড়ে,
আর দেবদারু গাছের পিছনে তারাটি কাঁপে আর কাঁপে;
আমাকে কেন ছেড়ে যাও
মিলনের মূহূর্ত হতে বিরহের স্তব্ধতায়?"

২. "ঘনায়মান অন্ধকারে
করুণ আর্তনাদে আমাকে সহসা অতিক্রম করল
দীর্ঘ, দ্রুতযান—
বিদ্যুতের মত:
কঠিন আর ভারী চাকা, আর মুখর—
অন্ধকারের মত সুন্দর,
অন্ধকারের মতো ভারী।"

বুদ্ধদেব বসু তার মন্তব্যে যে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি আবিষ্কারের কথা বলেছেন, সমর সেন তাঁর কবিতায় তা সৃষ্টি করেছেন খন্ড খন্ড বাক্যের সমাবেশে— যে সমাবেশ কখনো পুনরুক্তিময় কখনোবা সমান্তরাল বাক্যের আশ্চর্য সুসমন্বয়। সমর সেনের প্রথম কবিতার বই 'কয়েকটি কবিতা'য় এই পুনরুক্তির প্রচুর উদাহরণ পাই। যেমন, 'একটি রাত্রের সুর' কবিতায় আমরা দেখি যে 'বাতাসে ফুলের গন্ধ/ আর কিসের হাহাকার' এই পংক্তিদ্বয় তিনবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এই পুনরাবৃত্তি ফুলের গন্ধের পাশাপাশি হাহাকারের আর্তিকে বহুগুণিত করেছে বা বলা যায় অন্তহীন হাহাকারের দ্যোতনাকে ফুটিয়ে তুলেছে। কিন্তু এই পুনরুক্তির তুলনায় যেখানে প্রায় একইরকম বাক্যের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার রয়েছে— অর্থাৎ আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানে যাকে সমান্তরালতা বলা হয়, সেখানে এই ধ্বনিময়তার পাশাপাশি অর্থময়তারও প্রকাশ অনেক বেশি। যেমন—

"কার নীল চোখে
এখনো সমুদ্রের গভীরতা কাঁপে,
ট্রাম লাইন শেষ হলে, শেষ হলে ধূসর শহর।
আর এখনো আকাশের মরুভূমিতে
নিঃসঙ্গ পশুর মত রাত্রি আসে,
ট্রাম লাইন শেষ হলে, শেষ হলে ধূসর শহর।"

এই উদ্ধৃতিটিতে 'ট্রাম লাইন শেষ হলে, শেষ হলে ধূসর শহর' দু'বার হুবহু ব্যবহৃত হয়ে পুনরুক্তির উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হলেও এই কারণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে দু'টি কাজের উল্লেখ করা হয়েছে, তা সমান্তরালতারই উদাহরণ। যথা—

i) কার নীল চোখে এখনো সমুদ্রের গভীরতা কাঁপে

ii)আর এখনো আকাশের মরুভূমিতে/ নিঃসঙ্গ পশুর মতো রাত্রি আসে

'যদি', 'তাহলে' এই হেতুবাচক প্রতিনির্দেশক সহযোগে একেরপর এক বাক্যের উপস্থাপনা দেখি আমরা সমর সেনের কবিতায় তা আসলে সমান্তরালতার-ই আরেক রকম উদাহরণ।—

"যদি এখনি এখানে গভীর সমুদ্র নামে,
যদি এখনি মুছে যায় এই মসৃণ পিচের রাস্তা,...
যদি এক মুহূর্তে মুছে যায় আমার চোখের ক্লান্তি...
তাহলে আমার সমস্ত শরীরে কি আবার চকিতে আসবে
সমুদ্র মদির উর্বশীর স্বপ্ন?"

সমর সেন চেয়েছিলেন কবিতা থেকে কাব্যিকতার আস্তরণগুলি খুলে ফেলতে। সুকান্ত তার একটি কবিতায় লিখেছিলেন কবিতা থেকে পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে ফেলে কঠোর কঠিন গদ্যে নেমে আসার কথা। সমর সেনের কবিতায় আমরা কবিতাকে গদ্যমুখীন করে তোলার কিছু কিছু দিক অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকি। যেমন গদ্যের যুক্তির বিন্যাসকে সমর সেন কবিতায় নিয়ে এসেছেন। 'যদিচ', 'তথাপি', 'সুতরাং', 'যখন-তখন', 'যে-সে', 'উপরন্তু' প্রভৃতি সাপেক্ষ সর্বনাম, অব্যয় বা ক্রিয়া বিশেষণ প্রভৃতি ব্যবহারে— ফলে কবিতায় সঞ্চারিত হয়েছে গদ্যময়তা বা গদ্যের আমেজ। যেমন—

১. 'তথাপি' সহযোগে বাক্য—

"যদিচ পৈত্রিক আশ্রয়ে এখনো বসবাস,
যদিচ বেকার, নিঃসঙ্গ, মনে মনে প্রেমিক,
তথাপি বামপন্থী পত্রিকায়
আসন্ন বিপ্লবের গান অবশ্য উচিত।"

২. 'সুতরাং' শব্দ সহযোগে বক্তব্য উপস্থাপন—

"সুতরাং
সবুজ চশমা চোখে আমরণ ছিল,
সে সবুজ আদি ভিটের জমিজমার,
কিছুবা আপন পৌরুষের।"

'আর' এই অব্যয় পদ সহযোগে বাক্য সংযোজন বা বক্তব্য উপস্থাপন সমর সেনের একটি প্রিয় মুদ্রা। আর এই শব্দ সহযোগে বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপন নেই এমন কবিতা সমর সেন-এর নেই বললেই চলে। কিছু উদাহরন নেওয়া যেতে পারে—

১. আর দীর্ঘরাত্রি ভরে তীব্র, নিঃশব্দ কীসেরসের হাহাকার
২. আর দেবদারু গাছের পিছনে তারাটি কাঁপে আর কাঁপে/ আর তারারা কাঁপে আপনমনে
৩. বাতাসে ফুলের গন্ধ,/ আর কিসের হাহাকার।
৪. আর অস্ফুট, শীর্ণ, বহুদূর।কীসের আর্তনাদ কঠোর কঠিন।
৫. আর দূরে পাহাড়ের অস্পষ্ট পিছনে/ চাঁদের অদ্ভুত রেখা

সমর সেনের কবিতার ভাষা সমকালীন বাংলা কবিতার ভাষা থেকে আরেকটি কারণে স্বতন্ত্র হতে পেরেছে— তা হল ক্রিয়াপদের অবিমিশ্র চলিত রূপের ব্যবহার। তিরিশের জীবনানন্দসহ প্রধান প্রধান কবিরাও তাঁদের কবিতায় ক্রিয়ার দুইরূপ-ই ব্যবহার করেছেন। চল্লিশে এসে দেখব যে, সমরসেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা ক্রিয়ার চলিত রূপ-ই গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে সমর সেন অগ্রণী তা বলা যায়। এবং বাংলা বাক্যের যে আদর্শ গঠন বা নর্ম কবিতার ভাষা প্রায়ই তার থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। অর্থাৎ আদর্শ গঠন অনুযায়ী ক্রিয়া বাক্যের শেষে ব্যবহৃত না হয়ে স্থানের বদল ঘটে। সমর সেন একদিকে ক্রিয়ার চলিত রূপ ব্যবহারের পাশাপাশি সেই আদর্শ গঠনকে মান্য করে বাক্য গঠনের প্রয়াস পেয়েছেন— তাই তাঁর কবিতার ভাষা গদ্যের কাছাকাছি চলে এসেছে বা বলা যায় কবিতায় গদ্যের রং ধরেছে। যেমন—

১. "আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হয়ে এলাম,
পার হয়ে এলাম
মন্থর কত মুহূর্তের দীর্ঘ অবসর;"
২. "সাড়ে তিনটের ঘণ্টা বাজাতে
ছেলেদের শেষহীন অস্পষ্ট গুঞ্জন
হঠাৎ মুখর হয়ে উঠল।"
৩. "দিন নেই, রাত নেই, বারেবারে চমকে উঠি—
শুধু মনে পড়ে—
মাঝ রাতের ঘুমের মতো তোমার কাল চুল
আমার মুখের উপরে নামল;"

ক্রিয়াপদ ব্যবহার প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় বলার অপেক্ষা রাখে যে, ক্রিয়া অনুক্ত অথবা উহ্য রেখে বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনা সমর সেনের কবিতার ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। যেমন—

১. "পথেঘাটে রৌদ্রের করাল উত্তাপ,
নাসারন্ধ্রে দুর্গন্ধ, স্তূপীকৃত জঞ্জাল,
শুনছি ধর্মঘটে কর্পোরেশন বেহাল,
কলেরা বসন্ত প্লেগের আসন্ন উৎসব।"

২. “অন্ধকার নেমে এল
পারহীন, নিঃশব্দ স্রোতে:
চাপা রক্তে ক্লান্ত পশ্চিমের আকাশ,
আর দগ্ধ রজনীগন্ধার
উপরে সন্ধ্যার স্তব্ধ হাসি।”

ক্রিয়াপদ ব্যবহারের ঊনতার পাশাপাশি আরেকটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না যে কবিতায় পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে পরবর্তী বাক্যের আপাত সম্বন্ধহীনতা। ফলে কবিতায় যেমন এক ধরনের উল্লম্ফনের সৃষ্টি হয়, তেমনি তা কবিতার ভাষায় এক ধরনের নৈঃশব্দের জন্ম দেয়— যে নৈঃশব্দ্য আসলে কবির না বলা কথা কে আরো বেশি বাঙ্ময় করে তোলে। যেমন—

“পাশের ঘরে
একটি মেয়ে ছেলেভুলানো ছড়া গাইছে,
সে ক্লান্ত সুর
ঝরে যাওয়া পাতার মতো হাওয়ায় ভাসছে,
আর মাঝে মাঝে আগুন জ্বলছে
অন্ধকার আকাশের বনে।”

‘সে ক্লান্ত সুর ঝরে যাওয়া পাতার মতো হাওয়ায় ভাসছে’ এবং ‘মাঝে মাঝে আগুন জ্বলছে অন্ধকার আকাশের বনে’ পংক্তি দুটির মধ্যে আপাত সম্বন্ধহীনতা কবিতার মধ্যে যেন নৈঃশব্দ সঞ্চার করেছে তা কবিতার মূল যে করুণ সুর তাকে আরো সকরুণ করে তুলেছে।

সমালোচক জানিয়েছেন, “কবিদের শব্দস্থাপনে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করতে হয় তাদের সমাস, বিশেষণ-বিশেষ্য পরম্পরা উপমা ও মেটাফর নির্মাণকে।”[৪] তবে এক্ষেত্রে অন্তত আরও একটি বিষয়কে গুরুত্ব না দিলে নয়, তা অনুপ্রাস। একই রকম ধ্বনি দিয়ে তৈরি দীর্ঘতর বা ক্ষুদ্রতর বাক্যের ব্যবহারে কবিতার ভাষায় যে এক ধরনের শ্রুতিসুভগতা তৈরি হয় তা কবিতা পাঠকের কান জানে। সমর সেনের কবিতায় এত অজস্র টুকরো টুকরো এরকম অনুপ্রাসের ব্যবহার আছে যে তা হঠাৎ হঠাৎ কাব্য পাঠকের মনে দোলা না দিয়ে যায় না। আপাতত কবিতায় বিশেষণ-বিশেষ্যর ব্যবহারে যে বিশিষ্টতা গড়ে ওঠে কবিতার ভাষায় সে বিষয়ে কিছু বলা যেতে পারে। বিশেষ্যের পূর্বে বিশেষণের ব্যবহারে অনেক সময় চেনা শব্দও অচেনা দ্যোতনা নিয়ে প্রকাশ পায়। যেমন জীবনানন্দ যখন বলেন ‘শ্যামার নরম গান’ এর কথা, তখন গানের পূর্বে এই নরম বিশেষণটি একটি অন্যরকম উপলব্ধির কারণ হয়। কিংবা জীবনানন্দ যখন বলেন ‘অদ্ভুত আঁধার’-এর কথা তখন আঁধারের বিশেষণ হিসেবে ‘অদ্ভুত’ শব্দটি প্রয়োগ হিসেবে কবির বিশিষ্টতার সূচক হয়ে ওঠে— এবং ‘অদ্ভুত আঁধার’ কথাটি পাঠকের মনে

মননে চিন্তা চেতনায় এক অন্যরকম ভাবনার স্তর গড়ে তোলে। প্রত্যেক বিশিষ্ট কবির কবিতার ভাষায় ভাষার এই প্রয়োগ ব্যবহার লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। আমরা সমর সেনের কবিতা থেকে এরকম কিছু বিশিষ্ট প্রয়োগ এর উদাহরণ তুলে ধরতে পারি—

স্পন্দমান মুহূর্ত, নিঃশব্দতার ছন্দ, নির্জন প্রান্তরের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়, মনের সমুদ্রের অন্তহীন ঢেউ, পাহাড়ের স্তব্ধ গভীরতা, শেষহীন অস্পষ্ট গুঞ্জন, ক্লান্ত বিকেল, উত্তেজনাহীন অশ্লীলতা, অসংখ্য মানুষে মরুভূমি প্রেক্ষাগৃহে, রক্তের গভীর অন্ধকারে, হলুদ রঙের অদ্ভুত চাঁদ, পুরনো মরুভূমির ব্যাকুলতা, আকাশের বিস্তীর্ণ মুক্তিস্রোত, সবুজ উদ্দাম বসন্ত, মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস, শরীরসর্বস্ব আলিঙ্গন, বরফের জ্বলন্ত স্তব্ধতা প্রভৃতি। প্রথম কাব্য ‘কয়েকটি কবিতার’ পর এই ধরনের প্রয়োগ আরো বৃদ্ধি পেতে দেখি। যেমন পরশ্রীকাতর চোখ, বিষণ্ণশান্ত ইন্দ্রধনু, স্বাধিকারপ্রমত্ত রক্ত, বন্ধ্যা নারীর অন্ধকারে, পণ্যযুবতীসংকুল পথ, সর্পিল সময়ের দুর্ভাবনা, সহজ মসৃন শরীর, সাধনা-সঙিন দিনগুলি, নিরপেক্ষ মড়ক, একচক্ষু ছিন্নপাখা জিজ্ঞাসার পাখি, পুঞ্জীভূত শতাব্দীর কসরৎ, বৃন্দাবনী বাঁশি, আসন্ন প্রসবা অন্ধকারে, দাঁত চাপা বৃদ্ধা গণিকা, পরজীবী পঙ্গপাল, মেকলের শিক্ষাপ্রাপ্ত বিষবৃক্ষ ফল, নক্ষত্রখচিত ওড়না, বিকলাঙ্গ মানুষের গলিত প্রলাপ, ধ্বংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন, অন্ধকার-বিরহিত সূর্য সংস্কৃত আকাশ এরকম আরও অনেক উদাহরণ তুলে ধরা যায় সমর সেনের কবিতা থেকে।

আগেই বলেছি যে অনুপ্রাস যেহেতু ধ্বনি-ভিত্তিক অলংকার, সুতরাং এই অলংকারের ব্যবহারে কবিতার ভাষায় এক শ্রুতিসুখকর আবেদন সঞ্চারিত হয়। সমর সেনের কবিতার ভাষায় আমরা এই অনুপ্রাসের ব্যবহার প্রায়শই লক্ষ করি। যেমন—

১. নির্জন গুহায় নিবিড় নিষিদ্ধ প্রেম
২. লজ্জাহীন গণিকার সলজ্জ প্রেম
৩. সে অন্ধকার জ্বেলে দিল কামনার কম্পিত শিখা/ কুমারীর কমনীয় দেহে
৪. ঘড়ির কাঁটায় মন্থর মুহূর্ত গুলি মরে
৫. সারি সারি শবদেহ সাজানো বাজারে
৬. শ্রোণীভারানত সুন্দরীর কালিদাসী সন্ধ্যা

এইরকম পূর্ণাঙ্গ বাক্যের অনুপ্রাস ছাড়াও খণ্ডবাক্য বা বাক্যাংশের অনুপ্রাসও লক্ষ্যণীয় সমর সেনের কবিতায়। কারণ এই জাতীয় অনুপ্রাসের ব্যবহারে কবিতায় এক ধরনের ক্ষীণ ধ্বনি-ঝংকারের মৌতাত তৈরি হয়। যেমন—ট্যাঁকেতে টাকা নেই, ব্যর্থ বিলাপের বিকাল, কালের ক্ষুধিত ক্ষত, লোলবুদ্ধিলোভ, শ্রেণীহীন সাম্রাজ্য পাস, পূর্বপুরুষের স্তব্ধপ্রেত, নিরানন্দ নারীদল, চিমনিতে চিরেছে আকাশ, ঝোড়োদিনে পোড়োবাড়ি, শতছিন্ন শবদেহ, পাপের পুনরাবৃত্তি, শতাব্দীর সঞ্চিত সুরা, দেহস্বার্থের স্বর্গ, সময়ের শূন্য মরুভূমি, দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ শকুন প্রভৃতি।

শব্দালঙ্কারের পাশাপাশি সমর সেনের কবিতায় যে-সকল অর্থালংকারের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা সমর সেনের কবিতার ভাষাকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। যদি উপমা অলংকারের কথা বলি তাহলে দেখব যে সেখানেও সমর সেন অনন্য পরতন্ত্র। কারণ কবি তার প্রেমিকাকে কামনা করেন বিষাক্ত সাপের মত,— 'বিষাক্ত সাপের মত আমার রক্তে/ তোমাকে পাবার বাসনা।' কবির দৃষ্টিতে একটি মেয়ের প্রেম স্যাকারিনের মত মিষ্টি—, 'স্যাকারিনের মতো মিষ্টি/ একটি মেয়ের প্রেম।' রাত্রির দিগন্তে ঘুরে বেড়ায় আদিম জন্তুর মত বিরাট মেঘ। জীবনানন্দ আমাদের জানান পাখির নীড়ের মতো চোখের কথা আর সমর সেন আমাদের জানান পেস্তাচেরা চোখের কথা— "চারিদিকে মেঘের মতো শালবনের অন্ধকার,/ পাহাড়ের মতো মেঘবর্ণ প্রাসাদ, অরণ্যে প্রেম/ পেস্তাচেরা চোখ মেলে প্রতিদিন পড়া। কবি দৃষ্টিতে তাঁর প্রিয়ার চুল মাঝ রাতে ঘুমের মতো। কবি অধরা মাধুরী উর্বশীকে কামনা করেন— চিত্তরঞ্জন সেবা সদন যেমন বিষন্ন মুখে উর্বর মেয়েরা আসে। কবির দৃষ্টিতে প্রকৃতি ধরা দেয় এক বীভৎস উপমায়—"শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শুকরের চামড়ার মত/ এখানে সন্ধ্যা নামল শীতের শকুনের মতো।" সমর সেনের কবিতায় ব্যবহৃত অনেক উপমা রূপক সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকার প্রয়োগ নৈপুণ্যে চিত্রকল্পের রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন—

১. 'অগণন ধোঁয়ার ফনা, চিমনিতে চিরেছে আকাশ।'

২. 'গেরুয়া ধান ক্ষেতে অতিকায় সূর্য অস্ত যায়।'

৩. 'মাঝে মাঝে মহাশূন্য ডানাঝাড়ে শকুনেরমতো
মধ্যরাতে তখন তীব্র বাঁশী বাজে।'

৪. 'মহিষ বর্ণ জগদ্দল মেঘে
দিগন্ত রুদ্ধ করে বৈশাখের একদিন।'

কবিতা যেহেতু শব্দের পর শব্দের সন্নিবেশ— তাই কবিতার ভাষার আলোচনায় শব্দ ব্যবহারের প্রসঙ্গ একটি অবশ্য আলোচ্য দিক। সমর সেনের কবিতায় শব্দ ব্যবহারের প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় যে তিরিশের কবিরা যে কবিতায় শব্দ ব্যবহারে রবীন্দ্র-সুচিতা পরিহার করে জীবনের সর্বভূমির শব্দকে কবিতায় স্থান দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন সেই পথ ধরে বাংলা কবিতার অঙ্গনে সমর সেনের আত্মপ্রকাশ। স্বাভাবিক ভাবে সমর সেন শব্দ ব্যবহারে সব রকমের শব্দকে কবিতায় গ্রহণ করেছিলেন। এমন অনেক শব্দ তিনি গ্রহণ করেছেন যা তিরিশের কবিদের স্মরণে রেখে বলা যায় যে শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্যে সমর সেন অগ্রণী। তৎসম তদ্ভব দেশী বিদেশী কথ্য ও মিশ্র শব্দের ব্যবহারে সেনের কবিতা এককথায় বৈচিত্র্যময় শব্দমালা।

সমর সেনের কবিতায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— বক্রদেহ নায়ক, লৌহরেখা, আকাশমণ্ডল, চক্রবৎ, নবধারা জলে, আশাভঙ্গ, বিগলিত বিষন্নতা, ক্ষুরধার স্বপ্ন, নববর্ষের নাগরিক, ধাবমান কাল, অভিপ্সা ব্যাকুল, দিগ্বিজয়,

মুক্তকচ্ছ, পঞ্জিকা, পৃষ্ঠদেশ, উদ্ভ্রান্ত প্রাণ, গাত্রদাহ, ব্রহ্মচারী, রক্তচক্ষু পুরোহিত, জগদ্দল বৃষভ প্রভৃতি। তৎসম শব্দের পাশাপাশি তদ্ভব শব্দের ব্যবহারও কম নয়, যদিও তার তৎসম শব্দের তুলনায় কম। সমর সেনের কবিতা পাওয়া যায় যথা চাঁদ, পাতা, পাখি, কুঁড়েঘর, কানা গরু, হাতকড়া টাকা, ভুঁইফোড়, ছেলেপিলে, বুড়ি, সাঁজোয়া, চাল, চুলো, বাঁজা বছর, পরচর্চা, ইঁদুর, অম্বল প্রভৃতি।

দেশি আটপৌরে কথ্যশব্দও সমর সেনের কবিতায় একটি বিশেষ জায়গা জুড়ে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, মেছুনি, ঝাপসা, গেঁজেল, মাতাল, দুরুদুরু, গোলাঘর, ট্যাক, নৈরাজ্য, গুমোট, হাতুড়ি, কাস্তে, আড্ডা, পাখসাট, গুমোট, ধাঙড়, হাতুড়ী, কাস্তে, ভেল্কি প্রভৃতি।

বিদেশি বা কৃতঋণ শব্দের মধ্যে আরবি ফারসি শব্দের এত বহুল ব্যবহার সমর সেনের কবিতায় পরিলক্ষিত হয় যে, বাংলা কবিতার ইতিহাসে নজরুলের পর এ-বিষয়ে অতি অবশ্যই সমর সেনের নাম নিতে হয়। যথা,— ফিরিঙ্গি, খালি, ফানুস, সরাইখানা, মিনার, আইন, হাসিস, বেতর, শোভানাল্লা, ইন্তজাম, কেরামৎ, লবেজান, মালগুজারী, কারখানা, খাজনা, জমিদার, ইনকিলাব, লাল, ইয়ার্কি, বেপরোয়া, মোলায়েম, নেহাত, আজান, কামান, দোস্ত, হারামি, মজুর, চিজ, দুশমন, নসিব, কুচকাওয়াজ, জিন্দগি, বলাৎকার, তামাম প্রভৃতি।

আরবি ফারসি শব্দের পাশাপাশি সমর সেনের কবিতায় ইংরেজি শব্দেরও বহুল ব্যবহার আছে। যেমন— ক্রিসমাস, এসেম্বলিহল, কার্নিভাল, বাস, ট্রাম, গ্লেসিয়ার, এরোপ্লেন, পিচ, ফ্যাক্টরি, কলেরা, প্লেগ, পার্টি, রোম্যান্টিক, ফ্লাড রিলিফ, প্যাকেট, সিগারেট, টেকনিক, স্যাকারিন, ডাস্টবিন, ব্লিচিং পাউডার, ট্রাফিক পুলিশ, স্টেশন, আটলান্টিক চার্টার, গোল্ড ফ্লেক প্রভৃতি। এছাড়াও কিছু কিছু ভিনদেশী শব্দ সমর সেনের কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন ফরাসি শব্দ বুর্জোয়া, তুর্কি শব্দ বারুদ, তাতার, রাশিয়ান শব্দ বলশেভিক, স্পেনীয় শব্দ তামাক প্রভৃতি। এছাড়াও প্রাদেশিক হিন্দি শব্দ চোখে পড়ে সমর সেনের কবিতায়। যেমন গোলকধাঁধা, রদ্দা, ঝান্ডা,ঠাট, টেরিকাটা প্রভৃতি। এ প্রসঙ্গে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য শব্দ যৌগ ও মিশ্র শব্দের কথাও উল্লেখ করতে হয়। যথা, তুখোড়ইয়ারের দল, হাসির গররায়, রেস্তহীন গুলিখোর, জিন্দাবাদ, ইভনিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ প্রভৃতি। এছাড়া নগন্ডা পয়সা, সাড়ে বত্রিশ ভাজা, বল হরি হরি বোল প্রভৃতি বিচিত্র বাক্যাংশের ব্যবহার সমর সেনের কবিতার ভাষাকে একটা স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছে।

সমর সেনের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, একদিকে তৎসম শব্দেরবহুল ব্যবহারের পাশাপাশি ক্রিয়ার চলিত রূপের মিশেলে এমন এক ভাষারূপ নির্মিত হয়েছে যা দ্বন্দ্বমুখর, উপল বন্ধুর। এ দ্বন্দ্বময়তা সমকালীন সামূহিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পরিস্ফুটনে সহায়ক হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব আরো

বেশি প্রকট রূপ পরিগ্রহ করেছে মাঝে মাঝে হিন্দি বাক্যাংশ বা সংলাপ ব্যবহারে। যেমন—
১. "মালগুজারী কৈসে লেওগে
ঝান্ডা মেরি জিন্দাবাদ।"
২. "আদাব্ আরজ্
হুজুর ধর্মরাজ
আশাকরি শরীফ মেজাজ।"
৩. "দুনিয়ার দূষণের প্রতিরোধে
দুনিয়াকো কিষাণ মজদুর মজদুর কিষাণ এক হো।"
প্রসঙ্গত সমর সেন তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন বাংলা লোক ঐতিহ্যের স্মারক বাগধারা। যেমন—
১. আপনি বাঁচলে বাপের নাম
২. তেরো পার্বণে বারোমাস সাঙ্গ হলো
৩. চোরেচোরে মাসতুতো ভাই
৪. আমাদের পিরীতি বালুর বাঁধ
বাগধারার পাশাপাশি কখনোবা এনেছেন রবীন্দ্রপংক্তির তির্যক ব্যবহার—
১. "এদিকে স্থান নেই, স্থান নেই রব,
ছোট এ ফ্যাক্টরি।"
২. "পলিটিক্স সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।"
৩. "আমার সোনার ধানে পরিচিত হাত রাখে শত্রুর দালাল"
৪. "কালস্রোতে ভেসে আসে নবীন জঞ্জাল"
রবীন্দ্র-পংক্তির পাশাপাশি কখনোবা এসেছে বৈষ্ণব কবিতার প্রসঙ্গ, সমকালীন পরিস্থিতির বর্ণনায়—
"এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা
কি করে আসবে বাটে
দূর বার্লিনে বঁধুয়া তিতিছে,
বেতারে শুনে পরান ফাটে।"

সমর সেনের কবিতায় শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, কিছু শব্দ ঘুরেফিরে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর কবিতায়। এরকম দুটি শব্দ হলো 'অন্ধকার' এবং 'হাহাকার'। এছাড়া নিঃসঙ্গতা, স্তব্ধতা, ধূসর, উপমান হিসেবে পাথর, ক্লান্তি, দুঃস্বপ্ন প্রভৃতি নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার সমর সেনের কবিতায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি। এই সকল শব্দের ব্যবহারে সমকালীন যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর ধ্বস্ত মানুষের ছবি যথাযথভাবে উন্মুক্ত হয়ে উঠেছে।

আমরা বলেছি সমর সেন তাঁর কবিতাকে বাংলা কবিতার যে সহজাত প্রবহমানতা জনিত গীতলতা বা লালিত্যময়তা কিংবা মিল প্রবণতা কিংবা সুচারু শব্দের সমবায়ে মৃদু ধ্বনিস্পন্দমানতা—এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। যে কারণে তিনি সমমাত্রার পর্ববিন্যাস অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট লয়যুক্ত ছন্দ আশ্রয় না করে খন্ড খন্ড অসমান বাক্যের গদ্যছন্দকে আশ্রয় করেছেন এবং মিলকে যথাসম্ভব বর্জন করেছেন। যথাসম্ভব বলার কারণ সমর সেন মিলহীন গদ্য ছন্দের মাঝে হঠাৎ হঠাৎ মিল এনেছেন। যেমন—

১. "সাজানো বাগানে শবাহারী-শৃগাল,
খাপছাড়া ঘুমে দূরে শুনি জোয়ারের জল,
কীসের কল্লোল!
বাঁধ ভেঙ্গে বন্যার জল।"

২. "চলেছি সমুদ্রের পথে;
বিস্তীর্ণ বালি, হলুদবালি,
হাতে কাজ নেই, মন খালি,
শূন্যে মেঘের ফালি।"

অন্তমিল এর পাশাপাশি সমর সেনের কবিতায় পদান্তিক মিলও চোখে পড়ে—

১. "হামলা কি হবে শুরু, মেঘ ডাকে গুরু গুরু
ঝোড়ো হাওয়া সারাদিন, মেঘে মেঘে আকাশ কঠিন।"

২. 'এখন হাটের বেলা, এখানে মজার খেলা'

কখনো কখনো চোরাগোপ্তা মিলও সমর সেনের কবিতার ভাষায় এক ধরনের বিচিত্র ধ্বনিময়তার সৃষ্টি করেছে—

১. "ব্যবসায়ী সংসার
বারে বারে পাকা ধানে মই দিল,
চোখ বেঁধে আজ ভবের খেলায় ভাসা!
তবুতো চারিধারে অদৃশ্য ধ্বংসের গ্লেসিয়ার।"

২. যদি কোনদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে

৩. ঝোড়োদিনে পোড়োবাড়ি, আলোজ্বলে অনেক দূরে

৪. তখন শাড়ির আর তাড়ির উল্লাসে

৫. বারে আর রবিবারে ডায়মন্ড হারবারে

অর্থাৎ সমর সেন বাংলা কবিতার যে আপাদমস্তক চরণান্তিক মিল বিন্যাস তাকে পরিহার করেছেন কিন্তু মিল পুরোপুরি বর্জন করেন নি। মিল পুরোপুরি বর্জন না করেও কবিতার ভাষায় গদ্যময়তাকে এনেছেন নানাভাবে। যেমন, ক্রিয়ার চলিত রূপ ব্যবহারে, অসম বাক্যবিন্যাস, বাক্যের পুনরুক্তিও সমান্তরালতা প্রভৃতি ব্যবহারে; কখনো কখনো বাংলা বাক্যের যে আদর্শগঠন বা নর্ম তাকে কবিতায় হুবহু ব্যবহার করে। যেমন—

১. “সাড়ে-তিনটের ঘণ্টা বাজাতে
ছেলেদের শেষহীন অস্পষ্ট গুঞ্জন
হঠাৎ মুখর হয়ে উঠল।”
২. “হলুদ রঙের চাঁদ রক্তে ম্লাল হলো,
তাই আজ পৃথিবীর স্তব্ধতা এল,
বৃষ্টির আগে শব্দহীন গাছে যে কোমল, সবুজ স্তব্ধতা আসে।”
৩. “আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হয়ে এলাম।”
তবে কবিতা কখনো গদ্যের বাগবিধি কে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে কিংবা গদ্যের অন্বয়গত বিন্যাসকে কবিতায় সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ গ্রহণ করতে পারেনা। তাই কখনো কখনো বাংলা গদ্যের বাগবিধিকে গ্রহণ করলেও অনেক ক্ষেত্রেই তার থেকে বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় সমর সেনের কবিতায়। যেমন—
১. কেন তুমি চেয়ে থাকো ভাষাহীন, নিঃশব্দ পাথরের মতো?”
২. “আমাকে কেন ছেড়ে যাও
মিলনের মূহূর্ত হতে বিরহের স্তব্ধতায়?”
৩. একটি মানুষকে ভুলতে কতদিনই আর লাগে,
কতোদিনই বা লাগে শরীর থেকে মুছে ফেলতে
আরেক জনের শরীর সর্বস্ব আলিঙ্গন;”
৪. “তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো!”

তখন বোঝা যায় কবিতার দায়, বাধ্যবাধকতা। যে দায় কিংবা দাবী থেকে কবির মুক্তি নেই। কবি চেষ্টা করতে পারেন কবিতাকে গদ্যের কাছাকাছি আনতে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন কবিতায় গদ্যের রঙ— ঠিক তাই। কবিতা যেদিন গদ্যের সঙ্গে তার সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়ে একাসনে বসবে— সেদিন কবিতা নামের একটি মহৎ সাহিত্য-সংরূপের অপমৃত্যু ঘটবে তা বলা যায়। সমর সেন নানাভাবে তার কবিতার ভাষায় গদ্যময়তাকে আনতে চেয়েছেন কিন্তু কবিতার ভাষার যে নিজস্ব পরিধি তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে নয়; বরং তিনি চেয়েছেন কবিতার ভাষার পরিধিকে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আরো ব্যাপ্তি দিতে। কিন্তু সমর সেনের কবিতার ভাষায় গদ্যের নানান বৈশিষ্ট্য রীতি প্রভৃতিকে স্থান দিলেও সমর সেনের কবিতার ভাষা কবিতারই ভাষা—তাই রবীন্দ্রনাথ সমর সেনের কবিতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন ‘গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্যের প্রকাশ’ তা যথার্থ। আমরা জানি যে সমর সেন মাত্র বারো বছর কাব্যসাধনা করেছেন, তাঁর কবিতা গ্রন্থের সংখ্যাও বেশিনয়, মাত্রপাঁচ। তাই তাঁর

কবিতার ভাষার বিবর্তন নিয়ে কথা বলার অবকাশ কম, তবে তাঁর কবিতার ভাষার যে বৈচিত্র্যময়তা তার আলোচনা ফুরোবার নয়।

উল্লেখপঞ্জি:

১। সেন, সমর; 'বাংলা কবিতা', 'কয়েকটি কবিতা', অনুষ্টুপ, আগস্ট ২০১২, পৃঃ- ৫৯

২। সেন, সমর; 'বাবু বৃত্তান্ত', দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ১৯৯৯, পৃঃ– ২১

৩। বসু, বুদ্ধদেব; 'সমর সেন: কয়েকটি কবিতা', 'কালের পুতুল', নিউ এজ পাবলিশার্স, মে ১৯৯৭, পৃঃ– ৬২

৪। সরকার, পবিত্র; 'জীবনানন্দের কাব্যভাষা', 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি', সাহিত্যলোক, জুলাই ২০১৬, পৃঃ– ৯৭

পুরুষার্থ রূপে মোক্ষ : একটি আলোচনা

সত্যম রায়
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ,
বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান

সারসংক্ষেপ: অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় 'মোক্ষ'কে পরম পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করেছে; যদিও মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় মোক্ষের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আবার কোন কোন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় মোক্ষের নৈতিক ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যাখ্যাও প্রাধান্য পেয়েছে। সাধারণভাবে আস্তিক সম্প্রদায়গুলি মোক্ষকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। কেননা এদের মতে, মোক্ষ হল আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আত্মার স্বরূপকে জানা, যার মধ্যে দিয়ে আত্মা যে স্বরূপত মুক্ত তা জানা যায়। আবার বৌদ্ধ ও জৈন নাস্তিক সম্প্রদায় নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মোক্ষকে ব্যাখা করেন। এদের মতে, মোক্ষ হল দুঃখ থেকে নিবৃত্তি এবং এই মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়, জীবনে কিছু নীতি, দৃঢ় সংকল্প ও সাধনার মাধ্যমে; এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনে অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও জৈন দর্শনে ত্রিরত্ন এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধটিতে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে পুরুষার্থ রূপে মোক্ষের স্বরূপ ও ভূমিকার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। আমাদের জীবনে এই পরম পুরুষার্থের গুরুত্ব কতখানি তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সূচক শব্দ (Keywords): মোক্ষ, পুরুষার্থ, আত্মজ্ঞান, ত্রিরত্ন, আস্তিক, আত্মা

মূল আলোচনা:

পুরুষার্থ: ভারতীয় দর্শনে মানবজীবনের একাধিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে, যাদের একত্রে বলা হয় পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষার্থ বলতে বোঝায় পুরুষের বা মানুষের প্রয়োজন সাধক বস্তু বা কাম্যবস্তু। মীমাংসাসূত্রে পুরুষার্থের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- **'যস্মিন্ প্রীতিঃ পুরুষস্য তস্য লিঙ্গার্থলক্ষণম্'** [1] অর্থাৎ যেখানে বা যে বিষয়ে মানুষের প্রীতি নিহিত থাকে তার কামনাই পুরুষার্থ। আবার অন্য একটি লক্ষণে বলা হয় – **'যেন প্রযুক্তঃ পুরুষঃ প্রবর্ত্ততে, স পুরুষার্থ'** অর্থাৎ যার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে পুরুষ তা সাধনের চেষ্টা করে তাই পুরুষার্থ।[2] আবার সংস্কৃতে 'পুরুষার্থঃ' পদটির কয়েকরকম ব্যুৎপত্তি হতে পারে যেমন- 'পুরুষানাম্ অর্থঃ পুরুষার্থঃ' অথবা 'পুরুষৈঃ অর্থ্যতে ইতি পুরুষার্থঃ'

---

[1] মীমাংসাসুত্র – ৪/১/২।

[2] চার্বাক দর্শনম, শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃ. ১৬।

এইরকম লক্ষণ অনুযায়ী পুরুষার্থ পদটির অর্থ হয় পুরুষ যা চায় অথবা মানুষ তার জীবনচর্চায় যাকে কামনা করে সেটাই তার জীবনের পুরুষার্থ। পুরুষার্থ কথাটির সংস্কৃত দুই শব্দ পুরুষ এবং অর্থ দ্বারা সংযুক্ত। পুরুষ কথাটির অর্থ হলো ‘পুরে বা শরীরে যিনি শায়িত আছেন’ এই অর্থ অনুযায়ী পুরুষের মৌলিক অর্থ হচ্ছে ‘জীব’।[3] কিন্তু এখানে আমরা পুরুষ শব্দের যোগরূঢ়ি অর্থ আশ্রয় করে পুরুষ পদের অর্থ মানুষ গ্রহণ করব। এবং অর্থ কথাটি অর্থ হলো চাহিদার উদ্দেশ্য সহায়ক বা প্রয়োজন। পুরুষার্থের সহায়ক যে কাম্য বস্তু তা শুধুমাত্র সাধনার দ্বারা লাভ করা যায়।

বেদাদি ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেবলমাত্র মানুষই এই চারটি বিষয়কে যথাযথভাবে জীবনে বরণ করতে পারে এবং সদ্ ব্যবহার করতে পারে। অবশ্য সব সম্প্রদায়ই এই প্রকারভেদ মানেন না। পুরুষার্থের সংখ্যা নিয়ে কিছু মতবিরোধ আছে। অনেকের মতে আদিতে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিই পুরুষার্থের অন্তর্গত ছিল যাদের একত্রে ত্রিবর্গও বলা হয়। রামায়ণে ও মহাভারতে প্রায়শই ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ পুরুষার্থের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মোক্ষবাদী দার্শনিকরা চতুর্থ পুরুষার্থ হিসাবে মোক্ষকে পুরুষার্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই চারটি পুরুষার্থকে একত্রে চতুর্বর্গ বলা হয়। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ বা পরমকাম্য বস্তুর উল্লেখ আছে। এখানে ধর্ম বলতে সৎগুন, অর্থ বলতে সম্পদ, কাম বলতে ইন্দ্রিয় সুখ এবং মোক্ষ বলতে আত্ম উপলব্ধিকে বোঝানো হয়েছে। যারা চতুর্বর্গে বিশ্বাস করেন তাদের মতে মোক্ষই মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। যাকে লাভ করলে আর কিছুই কামনা করার থাকে না, সব প্রয়োজনের নিষ্পত্তি ঘটে যায়, তাই মোক্ষ হচ্ছে পরম পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ ও কাম হল মোক্ষ লাভের সহায়ক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে জড়বাদী চার্বাকগণ অবশ্য একমাত্র কাম কেই পুরুষার্থ বলে গ্রহণ করেন। ‘সুখমেব পুরুষার্থ’। সুখ বা কামই চার্বাকদের নিকট পরম পুরুষার্থ। কাম চরিতার্থ করার জন্য অর্থের প্রয়োজন, এই অর্থে তাদের মতে, অর্থও পুরুষার্থ কিন্তু গৌণ পুরুষার্থ। অর্থ না হলে সংসার যাত্রা নির্বাহ হয় না, সুখে জীবন যাপন করা যায় না, অতএব অর্থও পুরুষার্থ।

এখন চতুর্বর্গ পুরুষার্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

ধর্ম : পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম পুরুষার্থ হল ‘ধর্ম’। ধৃ ধাতুর সঙ্গে কর্মবাচ্যে ‘মন্’ প্রত্যয় যোগ করে ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ধৃ + মন = ধর্ম। ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্মের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা দেওয়া হলেও এর একটি মুখ্য অর্থ আছে। ‘ধর্ম’ শব্দের একটি প্রাচীন অর্থ হল, ধর্ম তাই যা মানুষ ও সমাজকে ধারণ বা রক্ষা করে। ধর্ম বিশ্বের সবকিছুকেই ধারণ করে, ‘সর্বস্য ধারকম্’। যার দ্বারা বিশ্বজগৎ পরিচালিত হয় এবং বিশ্বের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় অর্থাৎ ধর্ম যেন একটি শৃঙ্খলাসূত্র।

---

[3] চাওয়ার চতুর্মুখ, লোকনাথ চক্রবর্তী, অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৬, পৃ. ২৩।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে ধর্ম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – ‘যতঃ অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ, স ধর্মঃ’[4] ঐহিক অভ্যুদয় আর পারলৌকিক নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি, এই দুটি যা থেকে উৎপন্ন হয় তাই হল ধর্ম। আবার মীমাংসা দর্শনে মহর্ষি জৈমিনি বলেছেন, ‘চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ’[5] অর্থাৎ বৈদিক বিধি মেনে কর্তব্য করাই হলো ধর্ম।

এখন প্রশ্ন হল ধর্মকে চিনব কোন্ উপায়ে? এর উত্তরে মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে-

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।

এতচ্চতুর্বিধং প্রাহু সাক্ষাদ্ ধর্মস্য লক্ষণং।।[6]

অর্থাৎ বেদ বা শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মতুষ্টি - এই চারটিকে ধর্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ বলা হয়েছে।

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে ধর্ম শব্দটি কোন পরাতাত্ত্বিক ধারণারূপে ব্যবহৃত হয়নি। এখানে ধর্ম শব্দটি বিশেষ কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বোঝায় না অর্থাৎ ধর্ম শব্দটির কোন ধর্মীয় অনুষঙ্গ নেই। ভাগবতগীতা বা ভারতীয় শাস্ত্রে ‘ধর্ম’ শব্দটি মানুষের কর্তব্য কে বোঝায়। প্রত্যেক মানুষের নিজের নিজের ধর্ম আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এক ছাত্রের ধর্ম বা কর্তব্য হল জ্ঞান অর্জন করা। সুতরাং এই জগতের প্রত্যেক মানুষের কিছু সাধারন ধর্ম আছে যা তাকে পালন করতে হয়। সমাজে তার কি কর্তব্য করা উচিত তা নির্ধারিত হয় আশ্রম ও বর্ণ অনুযায়ী। ভারতীয় শাস্ত্রে চারটি আশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়- ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই বিভিন্ন পর্যায় ভেদে মানুষের কর্তব্য ধর্ম নির্ধারিত হয়। বর্ণও চার প্রকার- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। বর্ণ শব্দটি এখানে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতাকে বোঝায়। প্রত্যেক বর্ণের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন কর্মপ্রবণতা দেখা যায়। এই অনুযায়ী বিভিন্ন বর্ণের মানুষের বিভিন্ন পালনীয় কর্ম বা ধর্ম আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গীতায় দেখা যায় যে অর্জুন যুদ্ধ করতে রাজি না হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ তাকে যুদ্ধ করতে উদ্বূদ্ধ করছেন কারণ যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের বর্ণধর্ম বা স্বধর্ম। একটি বর্ণের অন্তর্গত মানুষের সেই বর্ণগত যে ধর্ম তাই তার স্বধর্ম। এই স্বধর্ম পালনে প্রত্যেক মানুষই দায়বদ্ধ।

বিভিন্ন উপনিষদ ও পুরাণে বিভিন্ন রকমের নৈতিক কর্ম বা ধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা- অহিংসা, ক্ষমা, শম এবং দম, দয়া, শৌচ, দান, সত্য, তপস, অস্তেয়, জ্ঞান ইত্যাদি। এইসব ধর্মের মধ্যে আবার অহিংসাকেই পরমধর্ম বলা হয়েছে। জৈন ও বৌদ্ধ মতেও অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

---

[4] বৈশেষিক সুত্র, ১.২।

[5] মীমাংসা সুত্র, ১.২।

[6] মনুসংহিতা, ২.১২।

সুতরাং ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মকে পরিত্যাগ করে জীবনের কোন অভিষ্টই লাভ করা যায় না। ধর্মের পথেই অর্থ সংগ্রহ করতে হয়, আবার কামকেও ধর্মসম্মতভাবেই উপভোগ করতে হয়। এমনকি মোক্ষলাভও ধর্ম ব্যতীত সম্ভব নয়।

অর্থ : দ্বিতীয় পুরুষার্থ হল অর্থ। অর্থ বলতে জীবিকা অর্জনের উপায় কে বোঝানো হয়। মানুষের জীবনযাপনে অর্থের যে প্রয়োজন আছে তা ভারতীয় শাস্ত্রে অস্বীকার করা হয়নি। এমনকি ধর্ম পালনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। এখানে লক্ষণীয় যে অর্থকে কামনা করা হয় কাম সাধনের জন্য ও ধর্ম পালনের জন্য। অর্থাৎ কাম্যবস্তু ভোগ করতে হলে বা সঠিক নিয়মে ধর্ম প্রতিপালন করতে হলে মানুষকে অর্থ উপার্জন করতে হয়।

শাস্ত্রে অর্থ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'যতঃ সর্বপ্রয়োজনসিদ্ধিঃ স অর্থঃ'।[7] অর্থাৎ যার দ্বারা মানুষের সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তাকে অর্থ বলতে হয়। চাণক্য অর্থের পরিচয় বলেছেন, 'বৃত্তিমূলম্ অর্থলাভঃ'। 'অর্থমূলৌ ধর্মকামৌ'।[8]

এখানে অর্থ বলতে শুধু ধন-সম্পত্তিকে বোঝায় না- বিদ্যা, ভূমি, পশু, কাঠ, লোহা, কাপড় ইত্যাদি সমস্ত জিনিসই অর্থ পদবাচ্য হতে পারে। মহাভারতে এই সংসার কে কর্মভূমিরূপে আখ্যা করা হয়েছে, তাই এই সংসারের যা জীবিকার সাধনবস্তু সেগুলি সব অর্থ পর্যায়ভুক্ত।

তবে অর্থ কাম্যবস্তু হলেও সৎ ভাবে তা উপার্জন করতে হবে। অসৎ উপায়ে বা চৌর্যবৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কামনা নিবৃত্তি বা ধর্ম প্রতিপালন করা যায় না। তার কারণ এই যে, অর্থ পুরুষার্থ হলেও যে অর্থ নৈতিকভাবে সঞ্চিত নয়, তা পুরুষার্থ হিসাবে বিবেচ্য নয়। সুতরাং সেই অর্থই পুরুষার্থ যার নৈতিক পথে অর্থাৎ ধর্মপথে অর্জিত। আবার উপার্জিত অর্থ ভোগের অধিকার শুধু যিনি উপার্জন করেন তাঁর এবং তাঁর পরিবারেরই থাকে না, অধিকার থাকে দেবতার, পিতৃপুরুষের, বন্ধুদের, অনাথ, পশুপাখি এমনকি কীটপতঙ্গেরও।[9]

কাম : তৃতীয় পুরুষার্থ হল কাম। ধর্ম ও অর্থের মতো কামকেও এক প্রকারের পুরুষার্থ বলা হয়েছে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযুক্তি থেকে যে মানস আনন্দ পাওয়া যায় তাকে 'কাম' বলা হয়। কাজেই দেহ উপযোগী বস্তুর প্রাপ্তি ও ভোগ জীবের কাম্য হয়ে ওঠে, সেই কারণেই কাম হল এক পুরুষার্থ অর্থাৎ দেহের ও ইন্দ্রিয়ের সুখ প্রাপ্তি হয় যে সকল বস্তুর দ্বারা যেমন- বাড়ি, জমি, টাকা, সম্মান, বস্ত্র এমনকি পারলৌকিক স্বর্গও কাম পদবাচ্য। বলা যেতে পারে, বিষয় উপভোগ করে যে আনন্দ পাওয়া যায়

---

[7] চাওয়ার চতুর্মুখ, লোকনাথ চক্রবর্তী, পৃ. ১৪৬।

[8] চাণক্যসুত্র, ১.৯০-৯১।

[9] চাওয়ার চতুর্মুখ, লোকনাথ চক্রবর্তী, পৃ. ১৫৯।

আর বিষয় উপভোগের জন্য যে উপকরণ ও তার সাহায্যে যে প্রযত্ন, তাও 'কাম'ই। শাস্ত্রে জানা যায় যে, কাম অর্থাৎ বিষয়ের উপভোগের লক্ষ্য ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করা নয়, কাম অর্থাৎ সংকল্পের প্রয়োজন জীবন নির্বাহের জন্যই হয়।

কামকেও স্বতঃমূল্যবান বলা চলে না, তা অর্থের মতোই পরতঃমূল্যবান – মোক্ষলাভের সহায়ক হিসাবে মূল্যবান। এ প্রসঙ্গে I. C. Sharma বলেছেন, 'Artha, Kama and Dharma are instrumental values, but at the same time essential methods for the attainment of Moksa.'[10] নীতিসম্মত কামই মোক্ষলাভের সহায়ক। সুতরাং বলা চলে যে, ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থ ও কাম মানুষের ক্ষতিকারক হয় না।

মোক্ষ : মোক্ষের ধারণা প্রথম পরিলক্ষিত হয় উপনিষদে। চারটি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ বলা হয়েছে। এর কারণ স্বরূপে বলা যায় যে মানুষের মোক্ষের অভিমুখী করে তোলাই হল অন্যান্য পুরুষার্থগুলির উদ্দেশ্য। পরম পুরুষার্থ বলতে বোঝায় পরম কাম্যবস্তু, যাকে পাওয়ার পর আর কামনা করার কিছুই থাকে না। ধর্ম, অর্থ ও কাম হলো সুখ লাভের হেতু কিন্তু মোক্ষ হল সাক্ষাৎ সুখ স্বরূপ, এই কারণেও মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলা যায়। এই প্রসঙ্গে 'প্রেয়' ও 'শ্রেয়' এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। প্রেয় হল সুখদায়ক বস্তু আর শ্রেয় হল আত্যন্তিক দুঃখমুক্তি। যারা প্রেয়মার্গ অনুসরণ করেন তাদের কাছে ধর্ম, অর্থ ও কাম বেশি প্রিয়। তারা এই ত্রিবর্গ পুরুষার্থকেই মানেন এবং এদের মধ্যে ধর্মকে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করেন। অপরদিকে মোক্ষবাদীরা মোক্ষকে শ্রেয় বলেন এবং শ্রেয়কে প্রেয় অপেক্ষা অধিক কাম্য বলেন। তাদের মতে মোক্ষই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ। মোক্ষলাভ হলে মানুষ আনন্দ স্বরূপ হয়ে যান, দুঃখ-কষ্ট থেকে আত্যন্তিক নিবৃত্তি লাভ করেন। এই পুরুষার্থকে বিভিন্ন নামেও অভিহিত করা হয়- **'মোক্ষ', 'মুক্তি', 'কৈবল্য', 'অপবর্গ'** ইত্যাদি। সহজ ভাবে বললে মোক্ষ বা মুক্তি বলতে বোঝায়, জীবন যন্ত্রণা থেকে আত্মার মুক্তি। মোক্ষ যে মানুষকে দুঃখ হতে মুক্তিদান করে এই বিষয়ে সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় একমত। অবশ্য মোক্ষের স্বরূপ ও মোক্ষ লাভের উপায় নিয়ে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

জৈন মত: জৈন মতে মিথ্যা জ্ঞানই হচ্ছে আত্মার বন্ধনের মূল কারণ। কর্মশক্তির প্রভাবে আত্মায় পুদ্গল সংযুক্তি ঘটে, এর ফলে আত্মা দেহধারণ করে। আত্মার এই দেহধারণই হল আত্মার বন্ধন। কামনা-বাসনার জন্যই আত্মায় পুদ্গল সংযুক্তি ঘটে এবং এই কামনা-বাসনার মূলে রয়েছে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে মিথ্যা জ্ঞান। এই মিথ্যা

---

[10] Ethical Philosophies of India. I. C. Sharma. George Allen & Unwin LTD. London, p. 93.

জ্ঞানকে দূর করতে পারলেই আত্মা নিজের স্বরূপ ফিরে পাবে, যার ফলে সে মুক্তি পাবে। জৈন মতে, এই মিথ্যা জ্ঞান দূর করার উপায় বা মোক্ষলাভের উপায় হচ্ছে সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র, যাদের একত্রে **'ত্রিরত্ন'** বলা হয়। সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হয়। সম্যক্ জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন হয় সম্যক্ দর্শন এবং সম্যক্ দর্শনের জন্য প্রয়োজন হয় সম্যক্ চারিত্র। কাজেই জৈন মতে এই ত্রিরত্ন পালনই হচ্ছে মোক্ষ লাভের উপায়।

বৌদ্ধ মত: বৌদ্ধ দর্শনে মোক্ষকে 'নির্বাণ' বলা হয়। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই নির্বাণ বলা হয়েছে। 'নির্বাণং পরমং সুখং'। বৌদ্ধদর্শনে বন্ধনের কারণস্বরূপ দ্বাদশনিদানের উল্লেখ আছে অর্থাৎ দুঃখের উৎপত্তি কিভাবে হয় তা বলা হয়েছে। দুঃখ থেকে অবিদ্যা পর্যন্ত বা অবিদ্যা থেকে দুঃখ পর্যন্ত মত বারটি নিদান পরিলক্ষিত হয় এবং শেষপর্যন্ত দেখা যায় দুঃখের মূল কারণ হল অবিদ্যা। তার সাথে সাথে এই দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়ও বৌদ্ধদর্শনে উল্লেখিত হয়েছে। বৌদ্ধমতে, **অষ্টাঙ্গিক মার্গ** অনুসরণ করলে নির্বাণ লাভ হয়। এই আটটি মার্গ হচ্ছে সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি।

ন্যায়-বৈশেষিক মত: ন্যায় দর্শনে মোক্ষকে অপবর্গ এবং বৈশেষিক দর্শনে মোক্ষকে নিঃশ্রেয়স বলা হয়। এদের মতেও আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই হল অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স। ন্যায়-বৈশেষিক মতে মিথ্যাজ্ঞান হল বিশ্বের সকল দুঃখের কারণ। অবিদ্যার জন্য আত্মা নিজেকে মন, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সাথে অভিন্ন কল্পনা করে এবং পরিনামে দুঃখ ভোগ করে। আত্মার যথার্থস্বরূপের জ্ঞানই মোক্ষ বা অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স। যাকে লাভ করা যায় তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হয়। তত্ত্বজ্ঞান হলেই আত্মা উপলব্ধি করে যে আত্মা মন, শরীর ও ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন। বারোটি প্রমেয় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানই হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান। এই বারোটি প্রমেয় হল- আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, পুনর্জন্ম, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা **তত্ত্বজ্ঞান** অর্জন করতে হয়। তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করতে পারলেই মোক্ষ বা অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায়।

সাংখ্য-যোগ মত: সাংখ্য-যোগ দর্শনে মোক্ষকে কৈবল্য নামে অভিহিত করা হয়েছে। সাংখ্য সম্প্রদায়ের মতে, পুরুষ ও প্রকৃতির অবিবেক অর্থাৎ অভেদজ্ঞানই পুরুষের বন্ধনের কারণ। আর এই অবিবেক জ্ঞান দূর হলেই অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞানই হল বন্ধনমুক্তি। এই ভেদজ্ঞানের অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান এর জন্য দরকার তত্ত্বাভ্যাসের। তত্ত্বাভ্যাসের মাধ্যমেই বিবেকজ্ঞান লব্ধ হয়। যোগদর্শনে আত্মজ্ঞান লাভের উপায় রূপে **অষ্টযোগাঙ্গের** কথা বলা হয়েছে – যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই অষ্টযোগাঙ্গ যথাযথ পালনের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, যার দ্বারা মোক্ষ বা কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটে।

মীমাংসক মত: প্রাচীন মীমাংসকদের মতে, স্বর্গসুখ লাভই পরমপুরুষার্থ বা মোক্ষ। বেদ-বিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে। মীমাংসা দর্শনে তিন প্রকার কর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা-নিত্যকর্ম, যেমন প্রাতঃস্নান; নৈমিত্তিক কর্ম, যেমন চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে স্নানাদি এবং কাম্যকর্ম যেমন- স্বর্গলাভের কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান। কিন্তু পরবর্তী মীমাংসকগণ প্রাভাকর, কুমারিল ভট্ট প্রমুখ স্বর্গলাভের পরিবর্তে মোক্ষ লাভকেই পরম পুরুষার্থ বলেন। মোক্ষ অবস্থায় দুঃখ-কষ্টের নিবৃত্তি ঘটে। আত্মজ্ঞানের দ্বারা এই মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়।

বেদান্ত মত: অদ্বৈতবেদান্ত মতে, জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞানই জীবের বন্ধনের কারণ। জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানই মুক্তি। **'আমিই ব্রহ্ম'** এই তত্ত্বের সাক্ষাৎ প্রতীতি ঘটলেই মোক্ষ বা মুক্তি লাভ হয়। অদ্বৈতবেদান্ত মতে, মোক্ষ কেবল দুঃখের নিবৃত্তি নয়, এ এক আনন্দময় অবস্থা। কেননা ব্রহ্ম হল সৎ ও আনন্দ স্বরূপ। সুতরাং অদ্বৈত মতে, জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান হলেই মোক্ষ লাভ হবে। এই জ্ঞান লাভ করতে হলে সাধন চতুষ্টয়ের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। এই সাধন চতুষ্টয় হল- নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহলোক ও পরলোকের ফলভোগ বিরাগ, শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি অর্জন ও মোক্ষের ইচ্ছা এবং এরই সাথে প্রয়োজন বেদান্তপাঠ। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন হল বেদান্তপাঠের তিনটি অঙ্গ। এইভাবে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান হলে মোক্ষ বা মুক্তি ঘটে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে, কর্মফল ভোগ হেতু জীবের বদ্ধদশা। অবিদ্যা প্রসূত কর্মই জীবের বদ্ধদশার কারণ। রামানুজের মতেও বেদান্তপাঠের দ্বারা এই অবিদ্যা দূর হয়। তার মতে কর্ম অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম ও জ্ঞানের সংযোগেই মোক্ষ লাভ সম্ভব। আবার তিনি এও বলেছেন যে মোক্ষ লাভের জন্য ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভক্তি থাকা প্রয়োজন।

সুতরাং পরিলক্ষিত হল যে, একমাত্র চার্বাক ব্যতীত প্রায় সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই মোক্ষকেই জীবনের পরম পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করেছেন এবং কীভাবে এই মোক্ষকে পাওয়া সম্ভব তারও পথনির্দেশ করেছেন। মোক্ষ মানে হল মুক্তি, এক প্রকার স্বাধীনতা। 'আমি'র স্বরূপকে জানতে পারা অর্থাৎ এই সত্য উপলব্ধি করা যে, সাধারণভাবে আমরা যাকে 'আমি' বলে জানি, তা তো আসলে আমি নই অর্থাৎ মুক্তি হল আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞানের দ্বারাই দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। মোক্ষ অবস্থায় জানা যায় যে ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে কোন ভেদ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বেদান্ত দর্শনে মোক্ষকে আনন্দস্বরূপ বলা হয়েছে, সেই জন্য বেদান্ত দর্শনকে বলা হয় আনন্দবাদী। কারণ অদ্বৈতমতে মোক্ষ কেবল দুঃখমুক্তি নয়, তা এক আনন্দময় অবস্থা। যেহেতু ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ সেহেতু ব্রহ্মের সাথে অভেদ উপলব্ধিও আনন্দস্বরূপ। অপরদিকে বলা যেতে পারে যে বৌদ্ধদর্শন, জৈন দর্শন ইত্যাদি দর্শনে মোক্ষ অবস্থাকে

দুঃখের অভাব বলা হয়েছে, এই প্রসঙ্গে এদের মোক্ষের স্বরূপ সম্বন্ধ মতবাদকে দুঃখ অভাববাদী বলা যেতে পারে।

আবার ভারতীয় দর্শনে দু-প্রকার মুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়- জীবনমুক্তি ও বিদেহ মুক্তি। যারা স্বীকার করেন যে, জীবনকালেই মোক্ষলাভ সম্ভব, তারা জীবন্মুক্তিকে সমর্থন করেন অপরদিকে যারা বলেন যে জীবন দশায় কোনোভাবেই মোক্ষলাভ সম্ভব নয় তারা বিদেহ মুক্তিকে সমর্থন করেন। যেমন জৈন সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সম্প্রদায় জীবন্মুক্তি মানেন তাদের মতে জীবদ্দশাতেই নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়। অপরদিকে ন্যায়-বৈশেষিক, নব্যমীমাংসক, রামানুজ প্রমুখ বিদেহ মুক্তিকেই যথার্থ মোক্ষ বলেন।

গ্রন্থপঞ্জী

১. Dasgupta, Surendranath. *A HISTORY OF INDIAN PHILOSOPHY.* New Delhi: Rupa Publications India pvt. ltd.

২. Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami. *BHAGAVAD-GITA as it is.* Mumbai: The Bhaktivedanta Book Trust, 2018.

৩. Radhakrishnan, Sarvepalli. *INDIAN PHILOSOPHY.* New Delhi: Oxford University Press, 1923.

৪. Ravi, Illa. *Foundations of Indian Ethics.* New Delhi: Kaveri Books, 2012.

৫. Sharma, I.C. *Ethical Philosophies of India.* Londan: George Allen & Unwin LTD, 1965.

৬. Sinha, Jadunath. *Outlines of Indian Philosophy.* Varanasi: Pilgrims Publishing, 1963.

৭. Basu, B. D. (Edited), *The Sacred Books of The Hindus (Vol. XXVII – PART I).* Allahabad: the Panini Office, 1923.

৮. Tiwari, Kedar Nath. *Classical Indian Thought.* Delhi: Motilal Banarasidass Publishers, 2013.

৯. Tripathi, A. N. *HUMAN VALUES.* New Delhi: New Age International (P) Limited, 2014.

১০. গুপ্ত, দীক্ষিত. *নীতিশাস্ত্র,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭.

১১. বিদ্যাভাস্কর রামাবতার, *চাণক্যসুত্রাণি.* স্বাধ্যায়-মণ্ডল.

১২. চক্রবর্তী, লোকনাথ. *চাওয়ার চতুর্মুখ*, কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৭.

১৩. শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন. *চার্বাক দর্শন* (দ্বিতীয় সংস্করণ). কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৯.

১৪. শাস্ত্রী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য. (অনূদিত) *চার্বাক দর্শনম.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ.

১৫. মুখোপাধ্যায়, শ্রী উপেন্দ্রনাথ. (সম্পাদিত) *বৃহৎ মনুসংহিতা*, কলকাতা.

এক ব্যতিক্রমী নারীভাবনার কবি শামশের আনোয়ার

মোসাম্মত সামশুন নেহার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: শামশের আনোয়ার এমন একজন কবি যিনি বহুদিন ধরে প্রচলিত কাব্য ভাবনার ভীত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন।মা আর প্রেমিকার এক মিশ্রিত বন্ধনে শামশের এক দীর্ঘ সময় আচ্ছন্ন ছিল। সেই আচ্ছন্নতা প্রভাব ফেলেছিল তাঁর কবিতায়। নারীর মুখের সাদামাটা 'হাসি'ও অন্য মাত্রা পেয়েছে আনোয়ারের কবিতার পংক্তিতে। সমকালীন সময় যেমন প্রভাবিত করেছিল তাঁর কবিতাকে তেমনই জীবনে ঘটে যাওয়া বহু ঘটনাও প্রভাবিত করেছিল তাঁকে। অল্টার ইগো বা মনোবিকলন দ্বারাও প্রভাবিত তার কবিতা। সর্বোপরি শামশের আনোয়ারের কবিতা এক অভূতপূর্ব অনুভূতির সম্মুখীন করে সমুদয় পাঠককুলকে।

সূচক শব্দ: নগ্ন বাস্তব, ভালোবাসা,নারীর হাসি,মা এবং প্রেমিকা।

মূল আলোচনা:

২০১৩ সালে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের সিনেমা 'আনোয়ার কা আজিব কিসসা' মুক্তি পায়। নাওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী তাঁর অসাধারণ অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন আনোয়ার চরিত্রটিকে। এই সিনেমার জন্য প্রথমে বাংলায় স্ক্রিপ্ট লেখা হয়েছিল। কিন্তু আনোয়ার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বাংলায় তিনি যোগ্য অভিনেতা খুঁজে পাননি। তাই হিন্দিতেই লিখতে হয়েছিল স্ক্রিপ্ট। The film about a detective in search of himself. বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের অনবদ্য উপস্থাপন এবং নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীর দুর্দান্ত অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক দেখেছেন আনোয়ার নামের একটি চরিত্রকে যিনি একজন তুখোড় গোয়েন্দার মতোই ঢুকে যাচ্ছেন নিজের জীবনের পরতে পরতে। অনুসন্ধান করে চলেছেন জীবনের গূঢ় সত্যের।

২০১৭ সালের জানুয়ারিতে ইন্ডিয়াটাইমস-এ প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বলেছেন–

> Shamsher Anwar was my friend. We used to spend a lot of time together. He was an eminent poet. We started writing around the same time. But Shamsher, at one point of time, thought he wasn't contributing much and got very upset. I tried pulling him out of that state. Creativity makes you very difficult. I know I too can get

> very difficult at times. Having lost his mental balance, Anwar tried to commit suicide. No, he didn't die. For one month, he was lying like a log on the hospital bed. I would sit by his bedside and the doctors gave up hope. We lost him eventually. But I'm still very fond of the name. Whenever I hear Anwar, I look around, there's a happy feeling inside me.

যাকে নিয়ে এত আলোচনা তাঁর পরিচয় জানতে গেলে স্বাধীনতাত্তোর আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে প্রবেশ করতে হয়। খুঁজে পাওয়া যায় এমন একজন কবিকে যিনি বহুকাল ধরে বিবর্তিত বাংলা কবিতার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর কবিতা বাংলার সরল অনাড়ম্বর পাঠক সমাজের মন ও মননকে প্রবল নাড়া দেয়। সেই 'কানের ভেতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল গো'-এই সুখানুভূতি আর থাকে না পাঠকের। বরং এক প্রবল ঝাঁকুনি ধাক্কা দিয়ে দাঁড় করায় সেইসময়ের নগ্ন বাস্তব উত্তাল সময়ের সম্মুখে।

রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষণিকা' কাব্যের 'কল্যাণী' কবিতায় লিখেছেন—

"তোমার শান্তি পান্থজনে
ডাকে গৃহের পানে
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন
গেঁথে গেঁথে আনে"

পরবর্তীতে জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন' নারীর কাছে শান্ত ক্লান্ত মানুষ আশ্রয় পেয়েছেন সেই আদি যুগ থেকেই।শামশের আনোয়ার কিন্তু অন্য কথা শোনালেন,

"বড় ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম তোমাদের কাছে
বর্ষীয়সী মহিলাদের কাছে"

শামশের আনোয়ারের ক্ষেত্রে এ কথা বলা বিচিত্র কিছু নয়, যে কবি তাঁর কবিতায় অবলীলায় বলতে পারেন—

"আমার ইচ্ছে হয় কলমটাকে পেটের ভিতর বসিয়ে
দিই আমূল, বদ্ধ—যেখানে স্ত্রীলোকেরা ধারণ
করে ভ্রূণ কিংবা যে হৃদয়ের ভিতরে থাকে
স্বামীর প্রতি ভালোবাসা।
আমার ইচ্ছে হয় কলমের নিব ঠুকে বসিয়ে
দিই জিভের ওপর;
সংখ্যাহীন যা নাড়িয়ে নাড়িয়ে পৃথিবীর মানুষেরা কথা বলে

অথবা কপালের ভিতর ঢুকিয়ে বিদ্ধ করি মগজ—
যে চোখ দিয়ে মানুষ তাকায় ও বিচার করে
ইচ্ছে হয় সেই চোখের ভিতর মর্মান্তিক, ক্লিপ অবধি
ঢুকিয়ে দিই আমার কলম।”

তাঁর ক্ষেত্রে এ কথা বলা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু কেন এই অদ্ভুত স্বীকারোক্তি? কবির বন্ধুদের কিছু কথা এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারে। কবিবন্ধু ভাস্কর চক্রবর্তী ‘শামশেরের আনোয়ারের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন “শামশেরের সঙ্গে বন্ধুত্বটা ছিল একটা বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্বের মতো। এতটাই উদ্দাম, সজীবতা, দুঃসাহসিকতা ছিল শামশেরের—এতটাই আক্রমণাত্মক, বিষণ্ন আর ক্ষুব্ধ—এতটাই আন্তরিক ছিল শামশের—এতটাই আন্তরিক যে প্রকৃত শামশেরকে খুঁজে পাওয়াই ছিল মুশকিল। ...মা আর প্রেমিকার এক মিশ্রিত বন্ধনে শামশের এক দীর্ঘ সময় আচ্ছন্ন ছিল। ...সত্তরের এই মহাসময়ে তার জীবন ছিল যেমন বেপরোয়া, তার কবিতাও তেমনি। এমন সশস্ত্র এত আধুনিক কবি, সত্যিই খুঁজে পাওয়া ভার।”

বাংলা কাব্য কবিতায় আমরা মায়ের তিনটি রূপ দেখতে পাই। প্রথম জন্মদাত্রী মা,দ্বিতীয় দেবীমাতৃকা এবং তৃতীয় দেশমাতৃকা। এই তিন 'মা'য়ের বিভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে কবিদের কলমে। তবে আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে শক্তি সুনীল এবং পরবর্তীতে শ্রীজাত পর্যন্ত সকলেই প্রেমিকার রূপ উপস্থাপনের জন্য ভিন্ন কবিতাকে আশ্রয় করেছেন। শামশের আনোয়ারই প্রথম ও শেষ কবি যিনি মা এবং প্রেমিকাকে একইসঙ্গে একই কবিতায় স্মরণ করেছেন।

“তোমাদের বাড়িতে ছিলো না সীমান্তপ্রদেশ
কাঁটাতার, গুর্খা কিংবা গোলাবারুদ
প্রসূতিসদনের দ্বার খোলা ছিলো রাত দুটো অবধি
তোমার মা সেদিন স্নেহে পাগলিনী প্রায়
ব্যাকুল বাঘিনীর মতো সাহসে তেজে আমায় স্তন্যপান করিয়েছিলেন
আমার তৃষ্ণার কান্না তাঁর শুকনো বুকের
দুকূল ছাপিয়ে দুধের বান ডেকেছিলো
অফুরন্ত হৃদয় ঝরেছিলো দুচোখের পাতা বেয়ে
তোমরা যা পাওনি আমি পেয়েছি সে সবই
আমি তাঁর গর্ভের চোরাকুঠুরিতে ভ্রূণের মতো লুকিয়ে বেঁচেছি।
তোমার শরীরের পাতায় পাতায় আমি খুঁজেছি তারই রক্তের দাগ
বুকের মধ্যহ্ন আকাশে যৌবনের দীপ্ত জ্বালা
আমি তোমার সবুজ তলপেট জরায়ু আর হৃদয় খুঁড়ে-খুঁড়ে
ফিরে পেতে চেয়েছিলাম স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ।”[মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে]

শামশেরের একসময়ের সহপাঠী ও বন্ধু সুজিৎ ঘোষ শামশেরের মা সম্পর্কে বলেছেন—“মা ছিলেন যশোদার মতো—আমার মতো শামশেরের সখাকে একান্তে সর্বদা শামশেরের হিতাহিতের প্রতি নজর রাখতে অনুরোধ করতেন।” সংবাদপত্রে বন্ধুর আত্মহননের খবর পেয়েও সুজিৎ ঘোষ শামশেরের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেননি—“কেননা আমি জানতাম ওর একান্ত জগতের একটি অমোঘ কেন্দ্র ওর মা’ শামশেরের প্রেমিকা সম্পর্কে তেমন কোনো বাস্তব তথ্য প্রকাশিত নয়। তাঁর ‘রামমোহনপুরের স্মৃতি’ কবিতায়—

“রাত ২-টোর গল্প তোমার মনে পড়ে না   আমার কিন্তু মনে পড়ে
দিদির চোখ বাঁচিয়ে ঘন-ঘন তাকিয়েছিলে নিপুণ ভাবে
আমি তো কোনোদিন হিপ-হিপ হুররে করি নি ফরওয়ার্ড খেলি নি
অফ-ব্রেক মারি নি   বেদম জোরে জীপ হাঁকাই নি
ক্যামেরা কাঁধে ঘুরি নি   টুইস্ট নাচি নি মত্ত হয়ে
শর্ট রেঞ্জে কেঁপে ওঠে নি ভীরু পাখি
অথচ তুমি চেয়েছিলে বিরাট ব্লাডার নিয়ে শুকনো মাঠে খেলি
আমি কেঁদে ফেলেছিলাম রাত ২-টোর সময় তোমার হুইসল্ শুনে
ফাঁসি-দেওয়া মাঠে সিপাহীদের ডাক শুনে আমি চমকে গিয়েছিলাম
আমি বুঝিনি ১৪-বছরের ফুলে ফলে এত গূঢ় কাঁটা থাকে”

প্রেমিকা সম্পর্কে এক দুঃসহ স্মৃতির বর্ণনা পায়।

সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ দুই বাংলার ক্ষেত্রেই অস্থির সময়। পশ্চিমবঙ্গে সেই সময় নকশাল আন্দোলন চলছিল । বাংলার বহু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী প্রায় যুবসমাজের একটা বিরাট অংশ সমাজ বদলের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে নকশাল আন্দোলনে নাম লিখিয়েছিল। অন্যদিকে ওপার বাংলায় সে সময় চলছিল মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলা গড়ার তাগিদে। বাংলা সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল এই দুই আন্দোলন ।এপার বাংলার বহু কবি মুক্তিযুদ্ধ ও নকশাল আন্দোলন নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কিছু পরে হাংরি আন্দোলনও বাংলা কবিদের প্রভাবিত করেছিল। হাংরি জেনারেশন ও কৃত্তিবাসীর অ্ংশ হয়ে শামশের নিজস্ব এক কাব্যজগত তৈরি করেছিলেন। যদিও তাঁর ক্ষণস্থায়ী জীবনে(১৯৪৪-১৯৯৩) মাত্র তিনটি কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন তিনি।মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে (১৯৭৩), মূর্খ স্বপ্নের গান, শিকল আমার গায়ের গন্ধে (১৯৯১) এই তিনটি কাব্য আর কিছু প্রবন্ধ। এইটুকু স্বল্প প্রয়াসেই বাংলা কবিতার প্রচলিত ধ্যান-ধারণার আমূল বদল ঘটিয়ে দিয়েছিলেন—

“আমার মায়ের গর্ভে যে বাদুড়ের ছায়া ঘুরতো
সেই বাদুড়ের ছায়া এসে ঝাপটা মারছে গায়ে
আমি আলো জ্বালবো মা

কেননা আমার মায়ের গর্ভে কোন আলো ছিল না"

কবি বন্ধু সুজিৎ ঘোষের লেখা থেকে জানা যায় শামশেরের বাবা দেশ বিভাগের পরে পূর্বে পূর্বপাকিস্তানে চলে যান। স্ত্রী ও প্রথম সন্তানকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কবি শামসের আনোয়ার বা তাঁর মা কেউই এই প্রস্তাবে রাজি হননি। কবিতায় কী কিঞ্চিৎ ছায়াপাত ঘটেছিল এই ঘটনার?

প্রেমিকার মা সম্পর্কে আনোয়ারের উক্তি—

"তোমার মায়ের নিরামিষ প্রেমে নেই বিরূপতা
তাঁর মত, নিকেলের গয়নার চেয়ে সততার দাম বেশি
চরিত্রখারাপ মেয়ে রুনুদির সাথে তাই কথা বন্ধ হল তোমাদের
জলন্ত দুপুরে তুমি নাচ শেখো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে
তুমি টেলিফোন-ঘরে পরপুরুষের ঠোঁট হতে খাদ্য নাও।"

নগ্ন বাস্তবের উপস্থাপন বারবার ঘটেছে তাঁর কবিতায়। চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক কবিতায় নারীর চরিত্রস্খলনের কথা এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে । তাই কবিতা থেকে শুরু করে ধারাবাহিক সর্বত্রই নারীর চারিত্রিক দোষ ত্রুটির কথা উঠে আসে। আনোয়ারের কবিতাও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে ব্যতিক্রম রয়েছে পরবর্তী পংক্তিগুলিতে,

"প্রত্যেক সন্ধ্যায় তুমি শরীরে মেখেছো কেরোসিন
বলেছো আগুন হয়ে, 'খেলা করো তবে'
অনুমতিপত্র নেই জেনে তুমি ব্যঙ্গে হাসো
লাইসেন্স দেগে অন্য যুবকের চিতা জ্বেলে দাও
তোমার হৃদয় ভিড়াক্রান্ত নিলামের খোলা কুঠি
জানি প্রাপ্য নও তুমি অস্তিত্বের দামে"

তবে নিজেকে নিয়েও কোনো আড়াল ছিল না শামশের আনোয়ারের কবিতায়। রবীন্দ্র যুগে কবিতায় যে সুসভ্য আড়ালটুকু ছিলো, কল্লোল যুগের কবিদের কলমে তা 'সুসভ্যতার আলোক' ত্যাগ করে উন্মুক্ত রূপ পেয়েছিলো। আনোয়ার অবশ্য তাঁর কবিতায় নিজের ঈপ্সাকে সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত করেই প্রকাশ করেন,

"শিকল নাড়িয়ে বলি, মীরা দোর খোলো
ষড়-ঋতু বেদনার শিকল নাড়াই
চিৎকৃত ক্ষুধায় ডাকি: তুমি আত্মীয় বুক, শাবল ও কঠিন আঁধার
শরীরের কফিনের ঢাকা খুলে মীরা, কিছু ওম নিবিড়তা দাও।"
['তুমি আত্মীয় বুক, শাবল ও কঠিন আঁধার'/'মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে']

কেবলমাত্র দৈহিক চাহিদা নিবৃত্তির জন্য এই কাছে আসা। যদিও মীরাকে তিনি আত্মীয় বলে সম্বোধন করেছেন।শামশের আনোয়ার কবি হিসেবে অগোচরেই থেকে গিয়েছেন। নিজের ঢোল নিজের পেটানোর অক্ষমতার কারণে হয়তো কিন্তু তার

কবিতার ভেতরের বয়ান দৃশ্যায়িত করেছে সমকালীন প্রেক্ষাপটকে। ভাবনার আর শব্দের যৌথ সম্মেলনে তাঁর কবিতা ষাটের দশকে এক নতুন ভঙ্গি নিয়ে হাজির হয়েছিল। এই ভঙ্গিটার মধ্যে নৈরাশ্য, নৈরাজ্য, অবক্ষয়, হাহাকার, রাগ, কাম, রাজনীতি, স্যাটায়ার, অস্থিরতা, মাতৃকথা, নারী ভর করেছিল। অস্থির সেই সময়ের বিষয়-আশয় ঘিরে তাঁর কবিতার জগত কোনো রোমান্টিক প্রবাহমানতা তৈরি করতে পারেনি। বরং তাঁর ইতিহাসবোধ এবং চেতনা এন্টি-এস্টাব্লিশম্যান্ট-এর নতুন আখড়া হিসেবে হাজির হয় কবিতায়।

কবির প্রথম কাব্য 'মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে'-এর একটি কবিতা 'এই কলকাতা আর আমার নিঃসঙ্গ বিছানা' সেখানে দেখা যায় এক নারীর ক্রূর হাসির প্রসঙ্গ,

"কোনো বিদর্ভ নগরী আমার স্বপ্নের ভিতর জেগে ওঠে না
ইতিহাসে কোনো অর্থ নেই মূঢ়তা ও ভ্রান্তি ছাড়া
যে নারী আমাকে পথে বসালো তার ক্রূর হাসির ছাপ"

তাঁর কবিতায় 'নারীর হাসি' অন্য মাত্রা পেয়েছে। পার্থিব জগতের কপটতা ও কলুষতা বড় নির্মমভাবে উপস্থাপিত তাঁর কবিতায়। 'জন্মদিনে' কবিতায়—

"লীলায়িত বাহু নেড়ে ডাকো নি এখনোও
রক্তে ঢালো নি হিম হাসি"

বা

'জ্যোৎস্না ও শ্যামলীর হাসি' কবিতায়,

"হৃদয়ের ওপর বিশাল জ্যোৎস্না আড়াআড়ি শুয়ে আছে
ঘুমন্ত হাতের মতো শিথিল দেহ
নিষ্ঠুর পিঠ যেন খোলা মাঠ
স্পর্শাতীত সূক্ষ্ম চুলে হাসি ঢেকে শুয়ে আছে!
আমি ওই হাসির অর্থ বুঝি না, শ্যামলী, তুমিও তো
কতদিন শরীরের আবেগে শরীরের চেয়েও আবেগময়
চুলের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে হেসেছো;
তোমার অথবা জ্যোৎস্নার ঐ হাসিই তো শিল্প—
আবার ঐ হাসিই মৃত্যু
কেননা ঐ হাসির চেয়েও দুর্বোধ্য স্থাপত্য আমি আর
কিছু জানি না

'কৃত্তিবাস' পত্রিকা যখন খ্যাতির শীর্ষে তখন সেই পুরস্কারের প্রথম বিজেতা আনোয়ার। মাত্র তিনটি কাব্যগ্রন্থের মালিক হয়েও ষাট-সত্তরের বাংলা কবিতায় শামশের আনোয়ারকে নিয়ে তোলপাড় দেখা দিয়েছিলো। ছয়ের দশকে বাংলা কবিতায়

যে আত্মজৈবনিক কবিতার ধারা দেখা গেছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে সাহসী কলমটির মালিক ছিলেন শামশের। কবিতা লেখার এই অদ্ভুত ভঙ্গির মৌরসি পাট্টা যেন একান্তই তাঁর । নিজেকে উন্মোচনের সাহসিকতায় তিনি অন্যদের বেশ খানিকটা পেছনে ফেলে দিয়েছিলেন।

"...আমি তোমার সবুজ তলপেট জরায়ু আর হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে
ফিরে পেতে চেয়েছিলাম স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ।
কুসুমিত স্তন দুটির কাছে প্রার্থনা ছিলো
তোমার মায়ের কৈশোরিক গোলাপের ঘ্রাণ
অই সুরঙ্গেতে আছে তার বালিকাবেলার অব্যবহৃত চোরাকুঠুরী
অথচ তুমি কোনোদিনই গর্ভধারণের মতো ঘনিষ্ঠ হলে না।

(মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে/ ঐ)

তাঁর নিকটতম বন্ধুবর্গের মতে ব্যক্তিজীবনে বড়ো বেপরোয়া ছিলেন শামশের। তেমনই বেপরোয়া ছিলেন কবিতা লেখার ক্ষেত্রেও।

কোনো সেন্সরের কাঁচি বাগে আনতে পারেনি তাঁর কলমকে। লেখার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট বন্ধন বা গণ্ডি মানেননি শামশের। আত্মউন্মোচনে ছিলেন সদা তৎপর। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলি যেন বর্শাফলকের মতো সুতীক্ষ্ণ। তাঁর কবিতা পাঠের পর সাধারণ ছাপোষা বাঙালি মন অস্বস্তিতে ভোগেন। টমেটোর মতো বাঙালির অতি প্রিয় খাদ্য বস্তুকে নিয়েও যে কোনো দুঃসাহসিক কবিতা লেখা যায় তা আনোয়ারের কলমেই প্রথম দেখা গেল—

"টমাটোয় থাকে ঘনীভূত বীর্যের খোয়াব, সূর্য ও নারীর শ্রেষ্ঠতা
এনে দেয় যা আমাদের।
টমাটোর পাতার ধারাল চাবুকের গন্ধ অনুভূতিকে প্রখর করে —
আমাদের এনে দেয় লাল ও টাটকা ভোরের আস্বাদ,
টমাটো যুবতীদের হাসি, যুবতীদের পাছা ও যুবতীদের স্তনের গোল সারাৎসার।"

(টমাটো/ মূর্খ স্বপ্নের গান)

কবি শামশের আনোয়ার অবশ্য তাঁর এই ব্যতিক্রমী কবিতা ভাবনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিজের জবানিতে, ইনসমনিয়া নাইট মেয়ার, নার্ভাস ব্রেকডাউন অর্থাৎ ফিয়ার অব সাইকোসিস ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব হতো না কবিতা লেখা আর এটাই প্রকাশ করে একজন প্রকৃত কবির লেখার অথেন্টিক প্রসেস।

কবিতার যে জগত সে জগতে চিহ্ন বা প্রতীক বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে, কারণ একজন কবি সচেতন ভাবে চেতনার নানা অলিন্দে পরিক্রমা করেন। শামশেরের কবিতায় মৃত্যুচেতনা, অল্টার ইগো , মনো বিকলন পদ্ধতির প্রভাব দেখা যায়। শামসের আনোয়ারের মা এবং প্রেমিকার ভালোবাসায় আচ্ছন্নতাকে ঈদিপাস কমপ্লেক্সের আওতায় ফেলা যায়।ঈদিপাস কমপ্লেক্সে বিদীর্ণ শামশের লেখেন—

"তোমার স্তনের উৎসে মুখ রেখে শুষে নিয়েছিলাম দুঃখের কালো দুধ
সেই থেকে আমি বৃক্ষহীন নিজের ছায়ার গায়ে কুঠার মারি"

(মাতৃবন্দনা/ মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই কবি সম্পর্কে বলেছিলেন, "শামশের আনোয়ার বিশুদ্ধ শব্দ নির্মাণের কবি। ... কোনো কবিকেই সম্পূর্ণভাবে চেনা যায় না। মানুষ হিসেবে, কবি হিসেবে। প্রত্যেক প্রকৃত কবিই আস্তে আস্তে নিজের চারপাশে একটা অস্বচ্ছ বৃত্ত তৈরি করে নেন, স্বেচ্ছায় কখনো তার থেকে বেরিয়ে আসেন, আবার অনেক সময় অগোচর থাকতেই পছন্দ করেন। কখনো কখনো বৃত্তে সংঘর্ষও লাগে।'"

বন্ধুদের আড্ডায় শামশের আনোয়ার নিজের মৃত্যু সম্পর্কে বলেছেন—"আমার পছন্দ, শাদা ছটফটে বিছানায় শুয়ে মুঠো মুঠো স্লিপিং পিল খেয়ে, ধীরে ধীরে মৃত্যু উপভোগ করতে করতে নিঃশব্দে চলে যাব।" আড্ডায় মৃত্যু নিয়ে বলা এই কথাগুলো বাস্তবে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের সিনেমা 'আনোয়ার কা আজিব কিসসা'র শেষ দৃশ্যের সঙ্গে বাস্তবের শামশের আনোয়ারের জীবন কাহিনী যদি পাল্টে ফেলা যেত তাহলে মনে হয় একটু হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারতো আনোয়ারের কবিতার পাঠককুল।

তথ্যসূত্র :-

আকর গ্রন্থ:-

১) শামশের আনোয়ারের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩,প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ২০০২।

সহায়ক পত্রিকা

শামশের আনোয়ার:কবিতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, সুজিৎ ঘোষ এবং পরব, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯।

তপোধীর ভট্টাচার্যের ফ্রয়েড : সাহিত্যে অচলায়তনের বিনির্মাতা প্রবন্ধ থেকে ফ্রয়েড সম্পর্কিত তথ্য নেওয়া হয়েছে।

আন্তঃজালিক সহায়তাঃ

১)https://www.bindumag.com
২)https://sillypoint.co.in
৩)https://poros-por.com

বাংলা সাহিত্যে গাজি কাহিনি উদ্ভবে সামাজিক, সংস্কৃতির মানস প্রয়োজন, সুফি ও সমন্বয়ী ভাবধারা

উমা বেরা
গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার : বাংলা সাহিত্যে গাজি কাহিনি উদ্ভবে সুফি ও সমন্বয়ী ভাবধারার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটিয়েছিল। গাজি কাহিনি রচনার মাধ্যমে সমস্ত মুসলমান সমাজে আত্মসচেতনতা বোধ গড়ে ওঠে। কিস্‌সা-ধর্মী কাব্য রচনার মূল উদ্দেশ্য সাধকদের মাহাত্ম্য প্রচার এবং মুসলমান জাতিকে গৌরবান্বিত করা — এই বিষয়টিই আমার প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।
সূচক শব্দ : সাম্প্রদায়িকতা, সুফি, সমন্বয়ী ভাবধারা

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গদেশ মুসলমান শাসক কর্তৃক বিজিত হয়েছিল। ঐ সময় থেকে বঙ্গদেশে সুফি সাধকদের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। সুফি সাধকগণ বঙ্গবিজয়ের আগে থেকেই বঙ্গদেশে এসেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বে খ্রিস্টান মিশনারীরা যেমন এদেশে এসেছিলেন, ঠিক একই চিত্র মুসলিম শাসকের আমলেও দেখা গিয়েছিল। ইংরেজ শাসকগণ যেমন প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ মানুষকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেননি, তেমনই মুসলিম শাসকগণ প্রত্যক্ষভাবে ধর্মান্তরিত করেননি অ-মুসলমানদের। সুফি সাধকগণ প্রায় তিনশত বছর ধরে বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারত জুড়ে ধর্মান্তরকরণের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিল।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে বঙ্গদেশে আউল, বাউল, সাঁই, বৈষ্ণবধর্ম যে ভাবে বিস্তার লাভ ঘটেছিল, একই সঙ্গে সুফিবাদেরও বিস্তার লাভ ঘটে। ধর্মান্তরকরণের কাজ ঐ সময়ে কমে গেলেও সুফি সাধনার বিশেষ প্রভাব বিস্তার লাভ ঘটেছিল। সুফি, পীর, দরবেশদের মাহাত্ম্য প্রচারের মাধ্যমে। সেই সময় থেকেই অতি ধীর গতিতে ধর্মীয় সমন্বয় সংস্কৃতির আভাস পাওয়া গিয়েছিল। যবন হরিদাসের সঙ্গে চৈতন্যদেবের মানসিক সম্প্রীতি সেই ইঙ্গিতই বহন করে। এরই পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়-সম্প্রীতিও অতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, কারণ তৎকালীন সময়ে মুসলিম শাসকগণ বুঝেছিলেন যে স্থায়ীভাবে ও শান্তিপূর্ণ ভাবে শাসন কার্য চালাতে গেলে স্থানীয় অধিবাসীদের সম্প্রীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শাস্ত্রীয় ইসলামের প্রাচীন মতবাদ হল সুফিবাদ। এই সুফিবাদের একটি বিকৃত রূপ ও বহু পরিবর্তিত সংস্করণ হল পীরবাদ। ঠিক যেভাবে সুদৃঢ়, নৈতিক, প্রাচীন কৃচ্ছসাধনের উপর হিন্দুর প্রাচীন যোগবাদ স্থাপিত হলেও পরবর্তী বিকৃত তান্ত্রিক

মতবাদের সম্বন্ধ যতখানি ছিল প্রাচ্যের ভূখণ্ডে পীরবাদ প্রাচীন ও নৈতিক কৃচ্ছ্রসাধনমূলক সুফি মতবাদের সঙ্গে পুরোপুরি সেই ভাবেই সম্বন্ধযুক্ত। প্রাচীন ভূ-খণ্ডের পীরবাদের বিস্তার লাভের ফলে শাস্ত্রসম্মত ইসলাম ধর্ম প্রাচীন সুফিবাদের প্রভাব তুর্কি আক্রমণের পরবর্তীকালে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। ঐ সময় থেকেই পীরবাদ প্রাচ্য মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল। এই মতবাদ শাস্ত্রীয় ইসলামকে গ্রাস করে নিয়েছিল, তাই এই মতবাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় ইসলামধর্মের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই। পীরবাদ উত্তর ভারত তথা পারস্য, বোকারো, সমরখন্দ, আফগানিস্তান প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আর্য অধ্যুষিত দেশসমূহে শাস্ত্রীয় ইসলামধর্মের বিপরীতমুখী ধর্মবিশ্বাসের প্রাচ্য ধারা। প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে মূলত তুর্কিস্থান, আফগানিস্তান, পারস্য, বোকারো প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধধর্ম ত্যাগী মুসলমানদের মধ্যে কালক্রমে বৌদ্ধ-হিন্দু মানসিকতার মিশ্রণ ঘটেছিল। ফলে প্রাচীন সুফিবাদের মধ্য থেকে ধীর গতিতে পীরবাদের জন্ম হয়েছিল। একাদশ-দ্বাদশ শতকে বৌদ্ধধর্ম ত্যাগী নব্য মুসলমানগণ পীরবাদের বিস্তার ঘটিয়েছিল সমগ্র ভারত তথা বঙ্গদেশ জুড়ে।

তুর্কি আক্রমণের প্রায় তিনশত বছর পর থেকেই বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য, চরিত কাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, পীরসাহিত্য, ইসলামি সাহিত্য প্রভৃতি সাহিত্যধারার সৃষ্টি হয়েছিল। নিছক সাহিত্যরস সৃষ্টির জন্য বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সপ্তদশ শতক থেকেই মূলত ইসলামি সাহিত্য রচনা শুরু করেছিলেন মুসলমান কবিগণ। প্রণয় কাব্য রচনার পাশাপাশি মুসলমান কবিগণ ধর্মকাব্য, যুদ্ধকাব্য, কিস্‌সাধর্মী সাহিত্য, পীর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। সাহিত্যরস সৃষ্টির গোড়াতেই মুসলমান কবিগণ ধর্ম বিষয়ক কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সেই প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। কবি জয়ানউদ্দীন-এর ‘রসুল বিজয়’, ধর্মবিষয়ক কাব্য ‘বিদ্যাসুন্দর’-এর রচয়িতা ষোড়শ শতকের কবি শাবেরিত খান, শেখ ফয়জুল্লাহ ‘গোরক্ষ বিজয়’, ‘গাজি বিজয়’, ‘সত্যপীর’ প্রভৃতি ধর্মবিষয়ক কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি সৈয়দ সুলতান ‘রসুল বিজয়’, ‘নবীবংশ’, ‘ইবলিশনামা’, ‘জ্ঞানপ্রদীপ’ প্রভৃতি ধর্মবিষয়ক কাব্য রচনা করেছিলেন। ধর্মসাহিত্য, ইসলামি সাহিত্যের একটি অংশ, ইসলামি সাহিত্যে এই ধরনের বহু দৃষ্টান্ত আছে। ইসলামের মাহাত্ম্যসূচক রচিত কাব্যগুলির প্রথম পর্যায় পটভূমি ছিল এই উপমহাদেশের বাইরে। পরবর্তীকালে পটভূমি পরিবর্তিত হয়ে ঘটনার স্থান হিসেবে এই বাংলা তথা সমগ্র ভারতের মাটিতে স্থান পেয়েছিল। প্রথম দিকে রচিত এই ধরনের কাব্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ভাব দেখা যায় না। বরং উভয়ধর্মের মধ্যে ধর্মীয় সমন্বয়-সম্প্রীতি দেখা যায় এই শ্রেণির কাব্যের মধ্যে। ‘সত্যপীর’, ‘মাণিক পীর’, ‘একদিলশাহ্ পীর’ প্রভৃতি কাব্যগুলিতে ধর্মীয় সমন্বয়ের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ইঙ্গিত স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। বহুকাল ধরে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়মূলক সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল। সেই প্রতিচ্ছবি ইসলামি সাহিত্যের পরতে পরতে ফুটে উঠেছে।

এর পাশাপাশি বাঙালি মুসলমান কবিদের রচনার পরতে পরতে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম শাসকের বঙ্গবিজয়ের পর থেকেই বাঙলায় ইসলাম ধর্মের প্রচার শুরু হয়েছিল। মুঘল শাসনের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত তা টিকেছিল বলে মোটামুটিভাবে ধরা যায়। অথচ সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বাংলায় মুসলমান কবিদের রচিত কাব্যে এই সম্পর্কে কোন অতিশয়োক্তি দূরের কথা, এবিষয়ে কোন উল্লেখও নেই। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত মুসলমান কবিগণ এদেশের পটভূমিতে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ ও বিজয় কাহিনি রচনা করেননি, কিন্তু গাজি কাহিনি ও ওই জাতীয় অন্যান্য কাহিনি তথা পীর মাহাত্ম্যসূচক সকল কাহিনি দেখে ধারণা হয় যে এই বিষয়ে কোন কোন মুসলমান কবি নিস্পৃহতার অবসান ঘটিয়েছিল সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভকালে। এই সময় মুসলমানদের আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রে একটি নতুন রূপের সন্ধান পাওয়া যায় যা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়াটি সপ্তদশ শতকে একেবারে থেমে না গেলেও স্তিমিত হয়ে পড়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অথচ কোন কোন মুসলমান কবির রচনায় এই বিষয়টি বেশ দৃষ্টিকটুভাবে বর্ণিত হয়েছে। পীর কাহিনি ছাড়া গাজি কাহিনি ও পরবর্তীকালে রচিত অন্যান্য কাহিনিতে বিজয়ী মুসলমান যোদ্ধা বা পীর-দরবেশের দ্বারা যুদ্ধ জয় এবং ইসলাম মাহাত্ম্য প্রচারের মাধ্যমে এদেশের পরাজিত অ-মুসলমানদের নির্বিচারে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার ঘটনাটি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়ে ইসলামি সাহিত্যের নানা ধারার সৃষ্টি হয়েছে। এই সাহিত্য ধারায় গাজি কালু চম্পাবতী কন্যার পুঁথি 'বোনবিবি জহুরানামা' কাব্যে গাজি সাহেব ধর্মযোদ্ধা হিসেবে যেমন পরিচিত হয়েছেন, তেমনই কৃষ্ণদাস দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে ধর্মযোদ্ধার পাশপাশি পীর সাহেব হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন। এই সকল কাব্যগুলির কাহিনির মধ্যে ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়াটি সত্য অথবা মিথ্যা হোক বা অতিরঞ্জিত হোক — এগুলি যে সমসাময়িক ঘটনার কাহিনি নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই ঘটনাগুলি যে বহুকাল পূর্বের সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মুঘল আমলের শেষ পর্যায়ে এবং ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে এই ধরনের ঘটনা ঘটে নি। মুসলমান শাসনের প্রথমদিকে এই ঘটনা ঘটা হয়তো অসম্ভব ছিল না। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়ে তেমন কোন কাব্য রচনা হয়নি। ওই সকল কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত ঘটনাগুলি ইসলামি বাংলা সাহিত্যে কিস্‌সা সাহিত্য হিসেবে গড়ে উঠেছে যে সময়ে মুসলমানদের প্রশাসনিক ক্ষমতা স্তিমিত হয়ে আসছিল। এই সকল কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত ঘটনাগুলি বাংলা সাহিত্যে কাব্য আকারে প্রকাশিত হয়েছে এমন এক সময় যখন মুসলমানদের প্রশাসনিক ক্ষমতা স্তিমিত হয়ে আসছিল অথবা ঔপনিবেশিক প্রারম্ভ কালের শাসনকালে। এই ধরনের কাব্য কেন রচনা করা হয়েছিল এটি অনুশীলনের বিষয়; কারণ, এতদিন পর্যন্ত মুসলমান কবিরা হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সাধারণত সংঘর্ষের পটভূমিতে সাহিত্য রচনা করেন নি। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি

সময়ে এই ধরনের কাব্য রচনা শুরু হয়েছিল। এর মাধ্যমে সমগ্র মুসলমান সমাজে আত্মসচেতনতা বোধ দেখা গিয়েছিল। মুসলমান কবিরা এই ধরনের কাব্য রচনার মাধ্যমে সাধকদের মাহাত্ম্য প্রচারের দ্বারা মুসলমান জাতিকে গৌরবান্বিত করতে চেয়েছেন, এই প্রতিচ্ছবি গাজি কাহিনির পরতে পরতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে কয়েকজন কবি সত্যপীর পাঁচালি রচনা করলেও মূলত অষ্টাদশ শতকেই বাংলা সাহিত্যে বহু পীর পাঁচালি রচিত হয়েছে। সত্যপীর, দক্ষিণরায়, কানুরায়, বড়খাগাজি, বোনবিবি প্রমুখ হিন্দু ও মুসলমান দেবতাদের পারস্পরিক মিলনের মাধ্যমে শাসিত হিন্দু ও শাসনকারী মুসলমানের সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটেছে। বিষ্ণু আর বিসমিল্লা যে আলাদা নয়, মক্কার রহিম আর অযোধ্যার রাম অভিন্ন এই প্রতিচ্ছবি কবি কৃষ্ণরাম দাস 'রায়মঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণ রায় ও বরখান গাজির যুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। 'রায়মঙ্গল' কাব্যে হিন্দুর ঠাকুর দক্ষিণ রায় ও মুসলমান পীর গাজি সাহেবের মধ্যে তুমুল লড়াই হয়েছিল, কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি কারোর গায়েই লাগেনি, কারণ, যে দেবতা গাজি ও দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধ থামাতে এসেছিল তার অঙ্গে যুগপৎ হিন্দু-মুসলমানের ছাপ ছিল।

অর্দ্ধেক মাথায় কালা একভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি হাথে।।
ধবল অর্দ্ধেক কায় অর্দ্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরাণ-পুরাণ দুই হাথে।।[১]

ঈশ্বর গাজিকে সম্বোধন করে বলেছেন,

যেই তুমি যেই রায় বর্ব্বর লোকেতে তায়
ভেদ করে দুঃখ পায় নানা।।
একমাত্র যবে সার যত কিছু দেখ আর
সকল মিথ্যাকার খেলা।।[২]

এই বর্ণনার মাধ্যমে কবি কৃষ্ণরামদাসের সমাজ সচেতনতার পরিচয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সপ্তদশ শতকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল। দীর্ঘদিন এই দুই জাতি পাশাপাশি বাস করার ফলে প্রতিবেশী শ্রেণিভুক্ত হয়ে পড়েছিল। সামাজিক জীবনে সুস্থতা বজায় রাখার জন্য এই দুই শ্রেণির মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রয়োজন ছিল, যা তৎকালীন সময়ে রচিত বিবিধ সাহিত্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুর ফকিরের বেশ ধারণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে মুসলমানের কাছে যা সত্যপীর, হিন্দুর কাছে তা সত্যনারায়ণে রূপান্তরিত হয়েছিল। দৈবভাবের এই পর্যায় ক্রমিক পরিবর্তনই আসলে হিন্দু-মুসলিম ধর্মের সাম্প্রদায়িক সমন্বয় ঘটাতে সহায়তা করেছে।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে কয়েকজন মুসলমান কবি পীর পাঁচালি রচনা করেছিলেন যে উদ্দেশ্যে, তুর্কি আক্রমণের পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্য পাঁচালি আকারে রচিত হয়েছিল সেই একই উদ্দেশ্যে পীর পাঁচালি, গাজি কাহিনি প্রভৃতি এই সাহিত্যগুলি একদিকে যেমন বাঙালির পতন যুগের সাক্ষ্য বহন করেছেন, তেমনই অন্যদিকে সমসাময়িক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সমন্বয় সম্প্রীতির প্রতিচ্ছবি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ধর্মঠাকুর, দক্ষিণরায়, কালুরায়, বরখানগাজি, ইসমাইল গাজি প্রমুখ হিন্দু দেবতা মুসলমান পীর, গাজি প্রমুখের মাহাত্ম্য বর্ণনা পুঁথি আকারে বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তুর্কি-আফগান আক্রমণের পরবর্তী সময়ে এই কাহিনিগুলির উদ্ভব হয়েছিল বলে অনুমান করা হলেও সাহিত্যের স্থান পেয়েছিল প্রায় পাঁচশত বছর পর। এই রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সাধকদের গৌরবান্বিত করার মাধ্যমে মহিমা বিস্তার করা ও বীরত্বের প্রচার ঘটানো।

বোনবিবি, মানিক পীর প্রভৃতির চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় বৈষয়িক জীবন, সমাজ, শাস্ত্র, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ উপাখ্যান হচ্ছে ‘গাজি-কালু-চম্পাবতী’ কন্যার পুঁথি। এই উপাখ্যানের রচয়িতাগণ হলেন আব্দুল গফুর, শেখ খোদাবক্স, আব্দুল রহিম। বিশ শতকে সৈয়দ হালুমি বড় গাজির মহিমা বর্ণনার মাধ্যমে এই উপাখ্যানটি রচনা করেছিলেন। আব্দুল রহিমের ‘গাজি-কালু-চম্পাবতী’ কন্যার পুঁথিটি শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয়। এই উপাখ্যানে মূলত দেখা যায় বিরাট নগরের অধিপতি শা সেকেন্দারের পুত্র বড়খাঁ গাজি দশ বছর বয়সে রাজত্বে অনীহা প্রকাশ করলে রাজা কর্তব্য বোধে কঠোর অনুশাসনে রাখলে ফলস্বরূপ খোয়াজ ফিজির, গঙ্গা, দুর্গা, শিবের স্নেহপ্রাপ্ত গাজি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে রাতের আঁধারে ভাই কালুকে নিয়ে ঘর ছেড়ে ফকির বেশে পথে নেমেছিল। অলৌকিক ক্ষমতা বলে সুন্দরবন অঞ্চলে সাতবছর বসবাস করার পর নতুন পথের সন্ধানে চলতে চলতে ক্ষুধার্ত গাজিকালু ছাপাই নগম-এর রাজবাড়ি পৌঁছলেও খাদ্য এবং জল কিছুই পাননি। কারণ তৎকালীন সমাজে হিন্দুরা মুসলমানদের জল দিত না। সেই সামাজিক প্রতিচ্ছবি এখানে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে—

ক্ষুধায় কাতর অতি না পারে চলিতে
প্রজাগণ যথা গেল তাদের বাটিতে
না চাহিতে অন্ন আগে মার ২ বলে
অগ্নির সমান জ্বলে যবন দেখিলে
যে দেশের মধ্যে নাহি এক মুসলমান
যার ঘরে চাহে অন্ন কালু আর গাজি
মারহ বলি তারা আইলেন সাজি
আকুল হইয়া তবে ভাই দুইজনে
আল্লা ভাবি চলিলেন বিরস বদনে। [৩]

ধর্মীয় গোঁড়ামি কতখানি কঠোর ছিল তৎকালীন সমাজে সেই প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুটিত হয়েছে; অন্যদিকে কালুর ক্রোধে রাজবাড়ি অগ্নিদগ্ধ হলে রাজা ও প্রজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে রাজ্য ও রানী ফিরে পেল। এই ভাবেই জোরপূর্বক সমাজে ধর্মান্তকরণ হচ্ছিল সেই প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট।

কালু বলে আগে বেটা হও মোছলমান
শেষেতে বলিয়া দিব রানীর সন্ধান
শুনিয়া শ্রীরাম রাজা স্বীকার করিল
তবেত কলেমা গাজি পড়াইয়া
পাত্র মিত্র প্রজাগণ সকলে আসিয়া
কলেমা পড়িল হাতে গাজির ধরিয়া
তৎপরে গাজি কালু আল্লাহ বলি
তিনবার ফুঁক দিয়া কতগুলি ধূলী
ছাপাই নগর দিকে দিলেন ফেলিয়া
যত অগ্নি চলি গেল সকলি নিভিয়া। [৪]

একই ভাবে অরণ্যমধ্যে সাতভাই কাঠুরে গাজি কালুকে সেবা করার ফলে গাজি কালুর দয়ায় সাত ভাইয়ের ধনী হওয়া ও ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস এই পুঁথির পরতে পরতে বর্ণিত হয়েছে। দক্ষিণরাজ্য তথা ব্রাহ্মণ্য নগরের রাজা মুকুট রায়ের কন্যা চম্পাবতীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনের পূর্বে ব্রাহ্মণ্যনগরের ইষ্ট দেবতা দক্ষিণ রায় ও রাজা মুকুট রায়ের সঙ্গে গাজির ভীষণ যুদ্ধ হয়। পরাজিত দক্ষিণরায় গাজির কাছে নতমস্তক হন, মুকুট রায় প্রাণ এবং রাজ্য বাঁচাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং কন্যাকে বিবাহ দিয়ে গাজিকে জামাতা করেন —

কালু কাছে কহে রাজা কান্দিয়া
গাজিকে কহিবা বাবা তুমি বুঝাইয়া
প্রাণরক্ষা যদি তিনি করেন আমার
দিব যে চম্পার বিয়া কাছেতে তাহার
মোহাম্মদী দিল তার কবুল করিব
আর যাহা কয় তিনি সে কথা মানিব।[৫]

তৎকালীন সময়ে মুসলিম শাসনকালের প্রথমার্ধে সমাজে এই ধরনের ঘটনা প্রায় ঘটে থাকত। সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে এই বর্ণনায়।

বড়খাঁ গাজি সুন্দরবনে বাঘের দেবতা পীর হিসেবে ইসলাম প্রচারক ও বীর যোদ্ধা। হিন্দুর দেবতার চেয়ে মুসলিম পীরের শক্তি ও মাহাত্ম্য যে শ্রেষ্ঠত্বের গুণে হিন্দুর দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা প্রমাণ করাই এই ধরনের উপাখ্যান সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য।

এছাড়া তুর্কি বিজয়ের পরে হিন্দু সামন্তদের সঙ্গে ইসলাম প্রচারক সুফি, দরবেশদের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের প্রমাণ পরোক্ষভাবে বহন করে এই ধরনের উপাখ্যান।

দক্ষিণবঙ্গে গাজি কাহিনি বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করেছিল সুন্দরবনের আঠারো ভাঁটি অঞ্চলে। আঠারো ভাঁটি অঞ্চলে গাজি চরিত্র বেশ প্রাচীন, লৌকিক দেবতা দক্ষিণ রায়ের প্রায় সমসাময়িক। কারণ 'রায়মঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে গাজির যুদ্ধ হয়েছিল। আব্দুল রহিম ও শেখ খোদাবক্স 'গাজি-কালু-চম্পাবতী' পুঁথিতে ইসলাম ধর্মের জয়গান করতে গিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের বৈদিক, পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় দেবী চণ্ডী ও মা গঙ্গার স্তুতি করেছেন; মনসা ও শিব প্রমুখ দেব-দেবীর কথা তাদের পুঁথিতে উল্লেখিত হয়েছে। এই পুঁথির পর্যালোচনায় দেখা যায় গাজির দুর্দশায় দেবী চণ্ডী ও গঙ্গা প্রয়োজনমতো সহযোগিতা করেছেন। এই উপাখ্যানটিতে হিন্দু দেব-দেবীর উল্লেখ থাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্যতার দাবী রেখেছে। তবে এক্ষেত্রে গাজির সঙ্গে দেবী গঙ্গা ও চণ্ডীর মাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এমন প্রতিচ্ছবি 'গাজি-কালু-চম্পাবতী' কন্যা পুঁথিতে বর্ণিত হয়েছে। এই পুঁথিতে বর্ণিত গাজির সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধ ও পরাজিত হওয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া মুসলমান অভ্যুত্থানের ইতিহাস মনে করায়।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে রচিত মোহম্মদ খাতের সাহেবের 'বোনবিবী জহুরানামা' কাব্যে গাজি সাহেবের আর একটি মহৎ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তা হল বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ববোধ। এই কাব্যের দ্বিতীয়াংশে দেখা যায় বরিজ হাটি নিবাসী ধনামৌলে বাদাবনে মোহল করতে গিয়ে ভাটিশ্বর দক্ষিণ রায়ের কাছে নরবলি রূপে বালক দুখেকে ভাটিশ্বর রায়মণির আদেশে কেদোখালির চরে উৎসর্গ করে ফিরে গেলে মা বোনবিবীর দয়ায় দুখে শাহ দক্ষিণ রায়ের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে।

বিপাকে পড়িয়া দুখে কান্দে উভরায়
খাড়ি থাকে রায়মণি দেখিবারে পায়
হইয়া রাক্ষসবেটা বাঘের আকার
চলিল দুখের তরে করিতে আহার
বিষম দুরন্ত বাঘ আসে গাল মেলে
দুখে দেখে মা বলিয়া গিরে ভূমিতলে
কহে মা বোন বিবী কোথা রইলে এ সময়
জলদি এসে দেখ তোমার দুখে মারা যায়। [৬]

অন্তর্যামী মা বোনবিবী দুখেকে দক্ষিণ রায়ের হাত থেকে উদ্ধার করে। দক্ষিণ রায়ের নরবলি গ্রহণ করার মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাতা বোনবিবী শাস্তি প্রদান করতে চাইলে নিরুপায় দক্ষিণ রায় বন্ধু বরখান গাজির সাহায্যপ্রার্থী হন। বরখান গাজির পরামর্শে মাতা বোনবিবী দক্ষিণরায়কে ক্ষমা করে দেন ও পুত্ররূপে স্বীকৃতি প্রদান করেন। একই সঙ্গে বরখান গাজি দক্ষিণ রায় ও দুখে শাহ-র মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন

গড়ে দেন। ঔপনিবেশিক শাসনকালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন যে দৃঢ় হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, সেই ইঙ্গিত 'বোনবিবী জহুরানামা' কাব্যে গাজি চরিত্র মহিমা বর্ণনার মাধ্যমে সমসাময়িক সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট ধরা পড়েছে।

পীরমোবারক বরখান গাজি বঙ্গদেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে নানান নামে পরিচিত। সেই নামগুলি মোবারক শা গাজি, বড়খাঁ গাজি, বরখান গাজি, মর্বা গাজি, গাজি সাহেব, গাজি বাবা প্রভৃতি। দক্ষিণবঙ্গের সমগ্র চব্বিশ পরগণা জেলায় বিস্মৃতি বড়খাঁ গাজি বা বরখান গাজির মহিমা ও বীরত্ব বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কবিরা পীরগাজির সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যপ্রণালীর উপর অনুপ্রাণিত হয়ে গাজি সাহেবের লোকজীবনের উপর ভিত্তি করে ছড়িয়ে থাকা জনশ্রুতির অনুপ্রেরণা খুঁজে নিয়ে কিস্‌সাধর্মী সাহিত্য, উপাখ্যান, পাঁচালি, গাজির গান প্রভৃতি রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে গাজির স্থান সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সমন্বয় ঘটিয়েছে। সমগ্র চব্বিশ পরগণা জেলা ছাড়া যশোর, খুলনা, নদীয়া, ময়মন সিংহ জেলায় প্রভাব আছে। পীর মোবারক, বড়খাঁ গাজির জীবন ও তার কীর্তিকলাপ সম্বলিত কাব্যকাহিনি বা গদ্যকাহিনি আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক মানস প্রয়োজন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাবধারা বাংলা সাহিত্যে বিদ্যমান।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পাদক) (১৯৫৮)। কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী রায়মঙ্গল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শ্লোক সংখ্যা ৪১৬। পৃ. ২০১।
২. তদেব, শ্লোকসংখ্যা ৪১৯। পৃ. – ২০১।
৩. রহিমসাহেব, মুন্সী আব্দুল (১৮৫৩) । গাজি কালু ও চম্পাবতী কন্যার পুঁথি : G.K. প্রকাশনী মদন মোহন বর্মণ স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০ ০০৭। পৃ. ১৩।
৪. রহিমসাহেব, মুন্সী আব্দুল (১৮৫৩) । গাজি কালু ও চম্পাবতী কন্যার পুঁথি : G.K. প্রকাশনী মদন মোহন বর্মণ স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০ ০০৭। পৃ. ১৪।
৫. রহিমসাহেব, মুন্সী আব্দুল (১৮৫৩) । গাজি কালু ও চম্পাবতী কন্যার পুঁথি : G.K. প্রকাশনী মদন মোহন বর্মণ স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০ ০০৭। পৃ. ৭০।
৬. খাতের সাহেব, মনহুর মুন্সী মোহম্মদ (১৪১৬)। বোন বিবী জহুরানামা। কলকাতা – ৭ : গাওসিয়া লাইব্রেরী, জি.কে. প্রকাশনী, 30A মদনমোহন বর্মন স্ট্রিট। পৃ. ২৪।

গ্রন্থসূচি ::

আকর গ্রন্থ

- খাতের সাহেব, মনহুর মুন্সী মোহাম্মদ (১৪১৬)। বোন বিবী জহুরানামা গাওসিয়া লাইব্রেরী, জি.কে প্রকাশনী, 30A মদনমোহন বর্মন স্ট্রিট, কল–৭০০ ০০৭।

- জাকারিয়া, আব্দুল কালাম মহম্মদ (সম্পাদিত) (১৯৮৯)। বাংলা সাহিত্যে গাজি কালু ও চম্পাবতীর উপাখ্যান : বাংলা একাডেমি ঢাকা।
- ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ (সম্পাদক) (১৯৫৮)। কৃষ্ণরামদাসের গ্রন্থাবলী রায়মঙ্গল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নাভানা প্রিন্টিং বক্স : প্রাইভেট লিমিটেড ৪৭, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা।
- মণ্ডল, সুজিতকুমার (সম্পাদক), প্রথম প্রকাশ (মার্চ ২০১০)। বনবিবির পালা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, গাংচিল ওঙ্কারপার্ক ভোলাবাজার কলকাতা – ৭০০ ০১১।
- রহিম সাহেব, মুন্সী আব্দুল (১৮৫৩)। গাজি কালু চম্পাবতী : G.K. প্রকাশনী, মদন মোহন বর্মন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৭।

সহায়ক গ্রন্থ

- গোনি, ড. ওসমান (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯)। ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলা পুঁথি। রত্নাবলী ১১এ ব্রজনাথ মিত্র, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, বেনিয়াটোলা লেন।
- দাস, ড. গিরীন্দ্রনাথ প্রথম প্রকাশ (১৮ এপ্রিল ১৯৭৬)। বাংলা পীর সাহিত্যের কথা। শেহিদ লাইব্রেরি।
- দাস, গৌতমকুমার (২০০৯)। সুন্দরবনের পুঁথি ও পাঁচালী সোপান, কলকাতা।
- দাস, শশাঙ্ক শেখর (প্রথম প্রকাশ, ২০০৪)। বোনবিবি। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার, কলকাতা।
- নস্কর, ড. দেবব্রত (মে ১৯৯৯)। চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী পালাগান ও লোকসংস্কৃতির জিজ্ঞাসা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩।
- বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ (২০2০)। বাংলার লৌকিক দেবতা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩।
- মজুমদার তুলিকা (২০০৭)। বাংলার বনদেবতা, করুণাময়ী, কলকাতা – ৭০০ ০০৯।
- মণ্ডল, কৃষ্ণকালী (২০০2)। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী ও মূর্তি ভাবনা।
- সেন, সুকুমার (পঞ্চম মুদ্রণ, জুন ২০১৬)। ইসলামি বাংলা সাহিত্য। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা -৭০০ ০০৯।
- হক, ড. মুহম্মদ এনামুল (চতুর্থ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫)। বঙ্গে সুফী প্রভাব। র্যামন প্যারীদাস রোড, ঢাকা।

  শরিফ আহমেদ (দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৩)। বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড)। নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা।

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'নতুন ফসল' ট্রিলজি : প্রসঙ্গ রাঢ়বঙ্গের আঞ্চলিকতা ও সংস্কৃতি

সুজিত মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপঃ বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে সরোজকুমার রায়চৌধুরী একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিকও সাংবাদিক। মুর্শিদাবাদের মালিহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।শৈশব ও কৈশোর কেটেছে গ্রামেই। উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভাণ্ডার তাঁর খুব একটা কম নয়। তেত্রিশটি উপন্যাস ও এগারোটি ছোটগল্প সংকলন এবং তিনটি কিশোর সাহিত্য রচনা করেছেন।১৯২৭ সালে 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় 'রমানাথের ডায়েরি' গল্পের মাধ্যমে সাহিত্য জগতে প্রবেশ। প্রথম উপন্যাসের নাম 'বন্ধনী'।তবে লেখককে সর্বাধিক পরিচিতি দিয়েছে 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' এবং 'সোমলতা' নামক তিনটি উপন্যাস।এই ত্রয়ী উপন্যাস কে 'নতুন ফসল' ট্রিলজি নামে অভিহিত করা হয়। গ্রামের প্রতি লেখকের ছিল এক গভীর, নিবিড় জীবনবোধ।সেইজন্য তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে পল্লীগ্রাম। 'নতুন ফসল' ট্রিলজিতে রাঢ়বঙ্গের আঞ্চলিকতার নানা উপাদান কে ঔপন্যাসিক উপাচারে সজ্জিত করেছেন।মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম সংলগ্ন দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের কৃষক ও বৈষ্ণব জনজাতি এবং সমাজজীবনের উপর সেই অঞ্চলের সর্বাত্মক প্রভাব পড়েছে 'নতুন ফসল' ট্রিলজিতে। 'নতুন ফসল' উপন্যাস ত্রয়ী রাঢ় অঞ্চলের আঞ্চলিকতার দলিলে পর্যবসিত হয়েছে।এইজন্য সমালোচকরা রাঢ়বঙ্গের রূপকার হিসেবে সরোজকুমার রায়চৌধুরী কে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমানধর্মা' বলেছেন।ঔপন্যাসিক ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত কৃষক জীবনগাথা ও বৈষ্ণবের বাউল সুরকে একসুতোয় গেঁথেছেন 'নতুন ফসল' ট্রিলজিতে।

সূচক শব্দঃ শ্রী সরোজকুমার রায়চৌধুরী, নতুন ফসল ট্রিলজি, কৃষক-বৈষ্ণব সমাজজীবন, আঞ্চলিকতা, সংস্কৃতি

মূল আলোচনা :

বাঙালি পাঠক মনে সরোজকুমার রায়চৌধুরীর(১৯০৩-১৯৭২) নাম বিস্মৃতির কালগর্ভে। কল্লোল যুগের সমসাময়িক লেখকহলেও কল্লোলীয় প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। তিনি উত্তাল পরিস্থিতিতে কলম ধরলেও সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় পল্লীজীবনের ছবি এঁকেছেন।মুর্শিদাবাদের মালিহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে গ্রামে।পারিবারিক বৈষ্ণবীয় বাতাবরণে বড়ো হয়েছেন। গ্রাম কে দেখেছেন খুব নিকট থেকে।গভীর নিবিড় জীবনবোধের জন্য তাঁর সাহিত্য ভুবনে অসংখ্য পল্লীগ্রামী চরিত্র

ঠাঁই পেয়েছে।সরোজকুমার রায়চৌধুরীর উপন্যাস পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমল হোম কে এক চিঠিতে লেখেন-"সরোজ কোথায় পেল এসব চরিত্র, আমি এদেরদেখিনি।"

সরোজকুমার রায়চৌধুরী এগারো টা গল্পগ্রন্থ ও তেত্রিশ টি উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর বহুলপঠিত উপন্যাস হল "ময়ূরাক্ষী"(১৯৩৫),"গৃহকপোতী" (১৯৩৭), "সোমলতা" (১৯৩৮)। এই তিনটি উপন্যাস কেএকত্রে 'নতুন ফসল' ট্রিলজি নামে অভিহিত করা হয়। তিনটি উপন্যাস জুড়ে রাঢ় অঞ্চলের আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমানরয়েছে। 'নতুন ফসল' ট্রিলজিতে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের দক্ষিণ পশ্চিম গ্রামাঞ্চলের পটভূমিতে কৃষক ও বৈষ্ণব জনজাতির বাস্তবসম্মত সমাজজীবনের ছবি এঁকেছেন। 'নতুন ফসল' ট্রিলজিতেরাঢ়বঙ্গের আঞ্চলিকতার ইতিহাসের জন্য সমালোচকরা, সরোজকুমার রায়চৌধুরী কে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমতুল্য বলেছেন।ঔপন্যাসিক রাঢ় ভূখণ্ডের মানুষের জীবনকথাকে 'নতুন ফসল' ট্রিলজি তে সেই অঞ্চলের জীবনস্বভাব কে কতখানি বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন নিম্নে তা আলোচনা করবো।

(দুই)

'নতুন ফসল' ট্রিলজির প্রথম উপন্যাস 'ময়ূরাক্ষী।' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিনোদিনী পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক হারানের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।বিনোদিনী দুই সন্তানের জননী। পঞ্চাশ বিঘে জমি ও দুখানা হালের মালিক হারান গ্রামের একজন অবস্থাসম্পন্ন চাষি। ঊনিশ বছরের বিনোদিনী মধ্যবয়সী হারান কে কোনোদিন তাঁর জীবনে মেনে নিতে পারেনি। দিনে শত কাজে ব্যস্ত থাকলেও রাত্রে বিনোদিনীর বুক শূন্যতায় ভরে ওঠে।হারানের সঙ্গে নিত্য ঝগড়া করেই বিনোদিনী দুদন্ড শান্তি পায়। দুই সন্তানের জননী বিনোদিনী হারান কে একদিনের জন্যও ভালোবাসতে পারেনি। কারণ তাঁর ভালোবাসা বাল্যবন্ধু গৌরহরির প্রতি। জাতিতে বৈষ্ণব গৌরহরি বিনোদিনী একপলক দেখার জন্য ভিক্ষার অছিলায় কমলপুর গ্রামে হাজির হয়। গৌরহরির প্রতি বিনোদিনীর চিত্ত দুর্বল হলেও তাঁর চিন্তায় গৌরহরির কোনো স্থান নেই। হারাণের সংসারে দায়িত্ব,কর্তব্যের একনিষ্ঠতায় বিনোদিনী অবিচল। সংসারের শৃঙ্খলে বিনোদিনীর প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে।দুদণ্ড শান্তি পায় গ্রামের কলেজ ছাত্র দেওর তারাপদর সঙ্গে কথা বলে।বৌদির মানভঞ্জনের জন্য তারাপদ রসিকতার ছলে বিনোদিনীর পা ধরে। রাত্রিবেলা দু'জনকে এমন পরিস্থিতিতে দেখে ফেলে রসিকের বৌ।ফলত গ্রাম্য অশ্লীল কুৎসার কালিমালিপ্ত হয় বিনোদিনী।এই কুৎসা শোনার পর হারান ক্ষিপ্ত হয়ে বিনোদিনী কে বলে- "হারামজাদী বেশ্যা মাগী...তুই বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।"[১]হারাণের কথার সামান্য প্রতিবাদ না করে সেই রাত্রে বিনোদিনী কমলপুর গ্রাম ত্যাগ করে।বিনোদিনীর স্বামীগৃহ ত্যাগের মধ্যে দিয়ে 'ময়ূরাক্ষী' উপন্যাস টি শেষ হয়েছে।

'ময়ূরাক্ষী' উপন্যাসের পর বিনোদিনীর জীবন কাহিনি শুরু হয়েছে 'গৃহকপোতী' উপন্যাসে।বিনোদিনী শেষ রাতে স্বামীগৃহ ত্যাগ করে আশ্রয় নেয় বাল্যসখী ললিতার

কাছে। ললিতা ও বিনোদিনী এক গ্রামের মেয়ে। স্বামীর অত্যাচারে শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে ললিতা তাঁর মামার বাড়ির বাল্যপ্রেমিক রসময়ের সঙ্গে সাতগাঁ-কাঞ্চনপুরে আখড়া তৈরি করে বসবাস করে। বিনোদিনী বৈষ্ণব আখডায় আশ্রয় নিলেও বৈষ্ণবীয় আচার-আচরণ কিছুই পালন করে না। নিজের উপার্জনের জন্য বিনোদিনী ঢেঁকিতে ধান কলাই ভাঙার কাজ করে। একইসঙ্গে ললিতা ও রসময়ের আড়ালে সুদে বন্ধকি কারবার চালায়। 'গৃহকপোতী' উপন্যাসে আখড়ায় বিনোদিনীর গৃহিণী জীবনের সঙ্গে বৈষ্ণব সমাজের নানা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।আখড়ায় বিনোদিনী যখন নিজের মতো করে একার সংসারটা গুছিয়ে নিচ্ছে তখন বিনোদিনীর খবর পেয়ে তাঁর মা ও দাদা নিতাইপদ তাকে নিতে এসেছে। বিনোদিনীর দাদা ও মায়ের সঙ্গে বাপের গ্রামে ফিরে যাওয়ার ঘটনায় 'গৃহকপোতী' উপন্যাসের সমাপ্তি হয়েছে।

'নতুন ফসল' ট্রিলজির শেষ উপন্যাস 'সোমলতা' তে দেখি দাদা নিতাইপদর বাড়িতে বিনোদিনীর জীবন।দাদা নিতাইপদ ও বৌদি নয়নতারা তাঁদের সংসারে বিনোদিনী কে অনাদর করেনি আবার আপনও করে নেয়নি। বিনোদিনীর একমাত্র ভরসাস্থল তাঁর মা। শ্বশুরবাড়ি ফেরার পথ বন্ধ, দাদার সংসারে বোঝা বিনোদিনী নিজের মন ও মস্তিষ্কের প্রতিনিয়ত লড়াইয়ে ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতে আলোর দিশা না পেয়ে, নিজেরনিশ্চিত আশ্রয়ের জন্য বিনোদিনীর মন গৌরহরির প্রতি ধাবিত হয়। গৌরহরি বিনোদিনীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে মিলিত হয়।শারীরিক মিলনের পর গৌরহরি বিনোদিনী কে উপেক্ষা করে ষোড়শী বিধবা কন্যা বৈষ্ণবী তমাললতার সঙ্গে মালাবদল করে। উপন্যাসের সমাপ্তি অংশ দেখি হারান রসময়ের মুখে বিনোদিনী জীবিত থাকার খবর শুনে সন্তান সহ বিনোদিনী কে আনতে শ্বশুরবাড়ি যায়। ঔপন্যাসিক হারানের সপরিবারে কমলপুর গ্রামে ফেরার যাত্রাপথের বর্ণনা করেছেন এভাবে- " আগে হারান।তার মাথায় বিনোদিনীর পিটারী, কোলে মেনী।কালো কষ্টিপাথরে খোদাই করা মূর্তির মতো বলিষ্ঠ, সুদীর্ঘ, সুঠাম দেহ।মাথায় মধ্যাহ্ন সূর্যের পরিপূর্ণ আলোর রাজছত্র।যেন সে এই বসুন্ধরার দিগ্বিজয়ী রাজা।... পিছনে বিনোদিনী।ও যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত।ও যেন এই বসুন্ধরা স্বয়ং- আলোয় ছায়ায়, অন্ধকারে, ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপে দেয় দেখা।কলঙ্কে এবং মহিমায় সে রূপের আর শেষ নেই।"[২]

(তিন)

আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রথম শর্ত নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সীমা সংহতি। 'নতুন ফসল' ট্রিলজির পটভূমি ময়ূরাক্ষী নদীর দক্ষিণ পশ্চিম গ্রামাঞ্চল।অর্থাৎ বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন কমলপুর,সাতগাঁ- কাঞ্চনপুর গ্রামের পটভূমিতে উপন্যাস তিনটি রচিত হয়েছে।নদী অঞ্চলে গ্রামগুলি গড়ে ওঠায় এইসব গ্রাম্যমানুষদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। ঔপন্যাসিক এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের বসতির অবস্থান প্রসঙ্গে বলেছেন- "গ্রামখানি নিতান্তই ছোট।সকলেই চাষী গৃহস্থ।সম্মুখেই কয়েক ঘর হাঁড়ি- বাগ্দীবাস করে, গ্রাম

থেকে একটুখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে অত্যন্ত জরাজীর্ণ ছোট চালাঘর।কমলপুরে ভদ্রলোক নেই তবে অবস্থার তারতম্যে বড় ছোট বিভেদ যে নেই তা নয়। এরা সকলেই নিজের হাতে চাষ করে। এদের গল্পগুজব আলাপ-আলোচনা যা কিছু সবই চাষ নিয়ে।[৩]

দ্বিতীয় উপন্যাস 'গৃহকপোতী'র ভূভাগ হল সাতগাঁ-কাঞ্চনপুর গ্রাম। সাতগাঁ-কাঞ্চনপুর জমিদারি গ্রাম। তবে সাতগাঁ গ্রামে ব্রাহ্মণ- বৈদ্য-কায়স্থ জাতির বাস বেশি। তৃতীয় উপন্যাস 'সোমলতা'য় নির্দিষ্ট ভূভাগের নাম না থাকলেও বিনোদিনীর বাপের গ্রাম কৃষিভিত্তিক জনসমাজ।অতিক্ষুদ্র অঞ্চল এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী কে লেখক নির্দিষ্ট ভূভাগে বিন্যস্ত করেছেন।সরোজকুমার রায়চৌধুরীর উপন্যাসে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সীমা সংহতির বর্ণনাশক্তি দেখে সমালোচক লিখেছেন- "সরোজকুমারের রচনার ভৌগোলিক পটভূমি মুর্শিদাবাদ।এখানকার নদীপ্রান্তর,মানুষ তাঁর উপন্যাসের মূল উপকরণ।তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতই তাঁর উপন্যাসের একটি স্থানগত বৈশেষিকতা আছে।"[৪]

(চার)

সরোজকুমার রায়চৌধুরী মুর্শিদাবাদের মালিহাটি গ্রামে বৈষ্ণবীয় বাতাবরণে বড়ো হয়েছেন।গ্রাম্যজীবন কে দেখেছেন খুব নিকট থেকে।লেখকের গভীর জীবনবোধের জন্য চাষী এবং বৈষ্ণব চরিত্রগুলি স্থানিক রঙে রঞ্জিত হয়েছে। গল্পের মূল চরিত্র বিনোদিনী যথার্থই চাষি গৃহবধূ।একজন চাষিবধূর নিত্য যে সাংসারিক কর্ম বিনোদিনী কে সেই কর্মেই ব্যপৃত দেখি। ভোরে উঠোন ঝাঁট দেওয়া,নিকানো,গোয়ালঘর পরিষ্কার করা, ঘুঁটে দেওয়া, স্নান করে রান্না করা; বৈকাল থেকে আবার ধানভানা, বিছানা করা, গরুর শানি কাটা, সবশেষে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে দিনের কাজকর্ম শেষ হয়।

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র হারানের মুখে কেবল গোলাভরা ধানের গল্প এবং চোখে সোনার ফসলের স্বপ্ন।ফসল উৎপাদন হারানের কাছে সন্তান প্রতিপালন তুল্য। এছাড়া সদানন্দ, বৃন্দাবন, নিতাইপদ,শিবদাস,রসিক পাল কৃষক চরিত্র রূপে সার্থকতা পেয়েছে। এছাড়াও উপন্যাস তিনটিতে তারাপদ,স্কুল ছাত্র সুদামা রাধিকা,নয়নতারা,হাবলমেনী, গয়ানাথ, রাখাল প্রভৃতি অসংখ্য চরিত্র ভীড় করছে।চরিত্রগুলির উপর আঞ্চলিকতার প্রভাব থাকলেও ঔপন্যাসিক সেভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।

কৃষক চরিত্রের পাশাপাশি লেখক বৈষ্ণব চরিত্র চিত্রণে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন।ঔপন্যাসিকরাঢ়বঙ্গের স্বাধীন, স্বেচ্ছা- নিয়ন্ত্রিত বৈষ্ণব জীবন ও চরিত্র কে সহজ, নির্লিপ্ত,জীবন-মাধুর্য্যে প্রকাশ করেছেন।স্বামীগৃহ ত্যাগ করে ললিতা রসময়ের সঙ্গে কণ্ঠীবদল করে নতুন আখড়া তৈরি করে বসবাস করে। স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত বৈষ্ণব সমাজে একে অপরের কাছে কোনো চাওয়া-পাওয়া বা অধিকারবোধ নেই।বাউলের একতারার সুরের মতো তাঁরা মুক্ত।রসময়ের কাছে নারী কেবল সাধনার উপকরণ,প্রকৃতির একটা অংশ।পুরুষ নারী ব্যতীত অসম্পূর্ণ।স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা বৈষ্ণব যুগলের কাছে অকাম্য।তাদের কাছে একমাত্র ভালোবাসার বিষয়

রাধামাধব।সংসার কেবল মায়া। ললিতা রসময়ের সাধনসঙ্গিনী।রসময়ের অগোচরে তারাপদর সঙ্গে শারীরিক মিলনে কুণ্ঠা বোধ করেনি।গৌরহরিও বাল্যপ্রেমী বিনোদিনী কে পাওয়ার আশা ত্যাগ করেনি। বিনোদিনীর সঙ্গে শারীরিক মিলনের পর গৌরহরি তমাললতার সঙ্গে মালাবদল করে। কারণ সাধনার জন্য গৌরহরির যুবতী মেয়ে প্রয়োজন।রসময়,ললিতা,গৌরহরি সংসারের মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ নয়। তারা সকলেই উদাসীন বাউল।তাদের নিকট আখড়ায় ঘর,আখড়ায় বন। মায়ার সংসারে শতযোজন দূরে তাদের অবস্থান।ময়ূরাক্ষী নদীর বয়ে চলা স্রোত, ফসলের সবুজতার সঙ্গে বাউলের গান আর ভিক্ষায়, বৈষ্ণবদের একমাত্র সম্বল।

লেখকের বৈষ্ণব চরিত্র অঙ্কনের মুন্সিয়ানায় সমালোচক বলেছেন-"পথের দুধারে বৈষ্ণবের আখড়ার দুয়োর পর্যন্ত, যেখানে মিশেছে আসক্তি বিজড়িত মায়ার সংসার ও নির্লিপ্ত বাউলের উদাস বৈরাগ্য-এ দুয়ের সম্মিলন ঘটিয়েছেন সরোজকুমার।...পশ্চিম মুর্শিদাবাদের এক ধরনের বাউল-সমাজের জীবন সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণা বিমুক্ত হয়ে একটি অঞ্চল একটি অনন্য অনুভূতির সূত্রে গ্রথিত হয়েছে।"[৫]

(পাঁচ)

'নতুন ফসল' ট্রিলজিতে লেখক রাঢ় অঞ্চলের 'Local Colour' বা 'স্থানিক বর্ণিমা'র রঙে বর্ণনা করেছেন।কিন্তু আঞ্চলিকতায় 'Local Colour' এর ভূমিকা কী? সমালোচকরা Regionalism এর সঙ্গে Local Colour কে একই অর্থে ব্যবহার করতে চাননি।আঞ্চলিক উপন্যাসে Local Colour এর ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন-"This will include some description of the local dress,customs,music,etc. It is for the most part decorative. When it becomes an essential and intrinsic part of the work then it is more properly called Regionalism."[৬]

অন্য সমালোচকের মতে-"Local Colour thus presents superficial elements of setting, dialect,costume not as a basic element of the story but as decoration."[৭]

উক্ত সমালোচনা থেকে Local Colour সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা পেলাম তাহল, বিশেষ অঞ্চলের আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, সংস্কারে বিশ্বাস-অবিশ্বাস,খাদ্যাভাস ও ভাষার উপন্যাসে সুস্পষ্টভাবে ব্যবহার।এই স্থানিক বর্ণিমার প্রকাশ উপন্যাস কে আঞ্চলিকতার দলিলে বাস্তবায়িত করে।

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'নতুন ফসল' ট্রিলজিতে বীরভূমে ও মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন কৃষক সমাজের কথা বর্ণিত হয়েছে।নানারূপ অপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাসী গ্রামীণ চাষিরা প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে ফসলের ফলন,অতিবৃষ্টি,অনাবৃষ্টির অনুমান করে। আষাঢ়ের নবমীতে বৃষ্টি শুরুতে হারান ভীত হয়, কারণ

“যদি বর্ষে ফুনি ফুনি
বাঁশের ডগায় শোল পানি
যদি বর্ষে ছিটা ফোঁটা
তবে জানবে বর্ষা গোটা
যদি বর্ষে মুষলধারে
মাঝদরিয়ায় বগা চরে।”[৮]

হারানের মুখে ভবিষ্যতের আশংকার কথা শুনে সন্তানের জন্য বিনোদিনী এমন ঘটনা কে অস্বীকার করে।হারান তার অনুমান কে প্রতিষ্ঠার জন্য বলে-

“চত্তি মাসে পাঁচ শনি
লরের মাংস না খায় শকুনি”[৯]

ভবিষ্যতে অনাবৃষ্টির আশংকা থেকে হারান কে আশ্বস্ত করে সদানন্দ।সদানন্দ হারান কে 'পুষ্কর মেঘের' গল্প শোনায়।কমলপুর গ্রামে পুষ্কর মেঘ বাঁধা, দেশে অনাবৃষ্টি হলেও কমলপুর গ্রামে বৃষ্টি হবে।

অনাবৃষ্টি থেকে পরিত্রাণ পেতে গ্রামের মেয়েরা ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করে।মেয়েরা সুর করে বলে-

“হিস্পোলা পোলা ব্যাঙের বিয়ে দোব
বেয়ানের বাড়ি যাব
বেয়ান মেরেছে ঝাঁটার বাড়ি
আর যাব না বেয়ানের বাড়ি।”[১০]

ব্যাঙের বিয়ে দিয়ে,ভোজ খাওয়ার পর শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর মন্ত্র-

“ব্যাঙ লো রাণী
দে দো পানী
হে মথুরেশ জল দাও
হে বরুণ জল দাও।”[১১]

ব্যাঙের বিবাহের দিনই রাত্রে গ্রামে মুষলধারায় বৃষ্টি হয়েছে।

(ছয়)

গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে।ডাইনি বুড়ির রক্তপান,বন্ধ্যা নারীর সন্তান ধারণ ও স্বামী বশীকরণের জন্য মন্ত্রপূত কবচ,বাস্তুসাপ প্রভৃতি অন্ধবিশ্বাসের বর্ণনা আছে। রসিকের মেজছেলে পেটে কৃমির যন্ত্রণায় ছটফট করলে; গ্রামের লোকের বিশ্বাস, গ্রামের প্রান্তে বাস করা সাদা চুলওয়ালা ডাইনি বুড়ির কাজ। রোগীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার না ডেকে নরোত্তম ওঝা কে ডাকা হয় ঝাড়ফুঁক করার জন্য।লোকবিশ্বাস বাস্তুসাপ মারা যাওয়া পরিবারের অকল্যাণ। হারানের ঘরে বাস্তুসাপ মরায় হারান ঘরের দোষ কাটানোর জন্য গ্রামের দশজনের কথায় মৃত বাস্তুসাপটিকে শ্মশানে দাহ ও শ্রাদ্ধের আয়োজন করে।ফিটের জন্য বিনোদিনীর অজ্ঞান

হওয়া কে গ্রামবাসী তেঁতুলতলায় ত্রিসন্ধ্যাবেলায় বিনোদিনীর থুতু ফেলা কে দায়ী করে। কারণ-"দিন ও রাত্রির সন্ধ্যাকালে বিনোদিনী নিজের অজ্ঞাতসারে অপরাধ করে ফেলেছে।এখানে যে থুতু ফেলতে নেই একথা একটা বালকও জানে বিনোদিনী তো জানেই।"[১২]পরিবারের কল্যাণের জন্য তারাপদ দক্ষিণমুখে ভাত খায় না। কারণ-"বাপ বেঁচে থাকলে দক্ষিণ মুখে ভাত খেতে নেই।"[১৩]

(সাত)

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। 'নতুন ফসল' ট্রিলজিতে বিভিন্ন উৎসবের কথা আছে। কিছু আঞ্চলিক উৎসবের প্রসঙ্গ এসেছে যা কেবল কৃষক ও বৈষ্ণব সমাজের একান্ত।কৃষকদের অর্থনীতি বা লোকসংস্কৃতি ধানকেন্দ্রিক। ধান চাষিদের কাছে কেবল আহার্য বস্তু নয়; ধান চাষি ঘরে মা লক্ষীর সঙ্গে পূজিত হয়। চাষি সমাজে প্রচলিত ধানকেন্দ্রিক উৎসবের নাম 'মুঠ সংক্রান্তি।' অগ্রহায়ণ মাসে চাষি ঘরে মুঠ আনা হয়। ভোরবেলায় চাষি স্নান করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে,মাঠের ঈশান কোণের আড়াই গাছি ধান কেটে, লাল সালুতে জড়িয়ে বাড়ি আনে। গৃহিণী চাষির পা ধুয়ে লক্ষীরূপী ধান কে ঘরে বরণ করে নেয়। নিতাইপদর ঘরে হাবল মুঠ আনে।

চাষি সমাজে প্রচলিত আরেক উৎসব 'দাওন আনা'। মাঠের সব ধান ঘরে আনা শেষ হলে, চাষি এক আঁটি ধান মাথায় করে ঘরে আনে, একে বলে দাওন আনা। দাওন আনার খুশিতে কৃষকদের বাড়িতে পায়েস রান্না হয়। বিনোদিনীর চলে যাওয়ার পর হারান নিজে দাওনের পায়েস রান্না করে তারাপদ কে নিমন্ত্রণ করে। এছাড়া উপন্যাস তিনটিতে দুর্গাপূজা, নবান্ন, কার্তিক পুজোর উল্লেখ আছে।

কৃষক সমাজের পাশাপাশি বৈষ্ণব সমাজের উৎসবের বর্ণনা আছে।বৈষ্ণবদের নতুন আখড়া প্রতিষ্ঠা হলে মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। মহোৎসবে ভোজনের সঙ্গে বাউল, কবি গানের আসর বসে। গৌরহরির নতুন আখড়া প্রতিষ্ঠার পর, এমনই মহোৎসবের আয়োজন দেখি।

(আট)

অঞ্চলভেদে মানুষের খাদ্যাভ্যাসের পার্থক্য দেখা যায়। ঔপন্যাসিক 'নতুন ফসল' ট্রিলজিতে রাঢ় অঞ্চলের জনজাতির খাদ্যাভ্যাসের তালিকা দিয়েছেন।চাষির ঘরে প্রাতঃরাশে মুড়ি প্রধান খাদ্য। মুড়ির সঙ্গে চলে গুড় ও দুধ।গৃহস্থের বাড়িতে অতিথি এলে জলখাবারে দেওয়া হয় চিড়ে ভাজা,ছোলা ভাজা, নারকেল, আদা কুচি,কাঁচালঙ্কা,শশা,বড় জামবাটিতে মুড়ি,গুড়আরদই। এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত খুব একটা পছন্দের নয়। তাদের প্রিয় জলঢালা পান্তাভাত। সঙ্গে কলাইবাঁটা,আমড়াদিয়ে মাছের টক,শাক আর মাছের ঝোল।

(নয়)

'নতুন ফসল' উপন্যাস ট্রিলজিতে কৃষক ও বৈষ্ণব সমাজের মানুষরা চলিত ভাষায় কথা বলেছে। চলিত বাংলায় কথা বললেও রাঢ়ী বাংলার আঞ্চলিক কিছু শব্দ ব্যক্তি- চরিত্রের মুখে উচ্চারিত হয়েছে।আঞ্চলিক কিছু শব্দ যেমন-'গোবর শানা','ভগমান,' 'মিনসে','গাই দোওয়া কেঁড়ে','মেডুলি দেওয়া','শিকরেট','আংখার','আকা','গরু পিইয়ে যাওয়া' প্রভৃতি শব্দ।

চাষি মেয়েদের সংলাপ :

রসিকের বৌ- ❝ওদিকে মুখপোড়া দেবতা চোখের মাথা খেয়ে মরেছে,আর এদিকে লেগেছে অভাগীর বেটি সর্বনাশী।❞ [১৪]

রতনমণি- ❝ রূপ যৌবন বুঝি ছেরক্কাল থাকবে।❞ [১৫]

বিনোদিনী - ❝রটাক কোন শতেকখোয়ারি রটাচ্ছে শুনি? কার বেটা গো ভাগাড়ে গেল মুখ যে খসে পড়বে? এখনও যে চন্দ্র-সূর্য্যি উঠছে এখনও দিনরাত্রি হয়।❞ [১৬]

নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মনুষের পেশা,আচরণ,পরিবেশ কে কেন্দ্র করে সেই জাতির ভাষায় প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার হয়। উপন্যাস তিনটিতে চরিত্রের মুখে বহুল প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার হয়েছে।যেমন-

১) 'কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।'

২) 'চাষার মুখ না আকার মুখ।'

৩) 'মনচাঙ্গা তো কাটো রামগঙ্গা।'

৪) মাগুর মাছের ঝোল
যুবতী মেয়ের কোল
বোল হরিবোল

৫) 'কানা কুকুর মারেই সন্তুষ্ট।'

(দশ)

'ময়ূরাক্ষী','গৃহকপোতী' এবং 'সোমলতা' উপন্যাস তিনটিতে বর্ণিত হয়েছে গ্রামজীবনের নিবিড়-গভীর কাহিনি।প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং তাদের চরিত্র,রীতি-নীতি,সংস্কার,খাদ্যাভ্যাস, ভাষারীতি কে ঔপন্যাসিক সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। রাঢ় অঞ্চলের কৃষকজীবন গাথার সঙ্গে বৈষ্ণব জীবনের সুর কে একসুতোয় গেঁথেছেন। সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায় - ❝শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী তাঁহার তিনখানি উপন্যাস বা উপন্যাস ত্রয়ীতে('ময়ূরাক্ষী','গৃহকপোতী','সোমলতা') যে সৃষ্টি শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও অনন্যসুলভ।ইহাতে যেমন একটি বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ সমাজের জীবনালেখ্য অপূর্ব কলানৈপুণ্য সহকারে অঙ্কিত হইয়াছে তেমনই, সেই সমাজের অন্তরে পূর্ণ প্রবেশ করিবার যে সহানুভব-শক্তির পরিচয় তিনি দিয়াছেন,তাহাও উৎকৃষ্ট কবিশক্তি।যে ভূমি, যে প্রতিবেশ ও যে সংস্কৃতির পটভূমিকায় তিনি জীবনের এক নূতন রুপ আবিষ্কার করিয়াছেন, সে যে কত বাস্তব তাহা অনুভব করি তাঁহার স্টাইলে।... এ জাতীয় উপন্যাস ইহাই প্রমাণ করে যে,জীবনের বহিরঙ্গ শোভন যতই

সাধারণ বা তুচ্ছ হউক, সত্যকার দৃষ্টি যাহার আছে সে পথের উপরকার সর্ব্ববিধ পদচিহ্ন হইতেই অনন্তের তীর্থযাত্রার সঙ্কেত ধরিয়া দিতে পারে।”[১৭] সরোজকুমার রায়চৌধুরীর তিনটি উপন্যাস বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে সোনার ফসল। ‘নতুন ফসল’ ট্রিলজি সরোজকুমার রায়চৌধুরী কে বাংলা সাহিত্যে এক দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী করেছে।সবশেষে বলতে পারি, ‘নতুন ফসল’ উপন্যাস ত্রয়ী আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সার্থকতা পেয়েছে।

তথ্যসূত্র

১) ময়ূরাক্ষী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড,৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড়,কলকাতা ০৯, আগস্ট ১৯৫৭, পৃ. ১৬৭

২) সোমলতা, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বিদ্যোদয়লাইব্রেরিপ্রাইভেট লিমিটেড, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড়, কলকাতা-০৯, প্রথম বিদ্যোদয় সংস্করণ ১৯৬৪, পৃ. ১৪৫

৩) ময়ূরাক্ষী, পৃ. ৪

৪) বাংলা সাহিত্য সঙ্গী, শিশিরকুমার দাশ সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী-২০০৩, পৃ. ২২৬

৫) প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, ডঃ সত্যবতী গিরি, রত্নাবলী প্রকাশন,কলকাতা-০৪, পৃ. ১০৬৮

৬) Dictionary of literary terms and literary theory, J.A Cuddon, Penguin publishers,Editon 1999, pp. 176

৭) Dictionary of world literary terms, J.T Shelly, Penguin publishers, 2001,pp. 236

৮) ময়ূরাক্ষী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড,৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড়,কলকাতা ০৯, আগস্ট ১৯৫৭, পৃ. ২৬

৯) তদেব, পৃ. ২৮

১০) তদেব, পৃ. ৩৮

১১) তদেব, পৃ. ৪০

১২) তদেব, পৃ. ১৩৯

১৩) গৃহকপোতী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, সাহিত্য ভারতীপ্রকাশনী, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, দ্বিতীয় প্রকাশ- আশ্বিন ১৩৬০, পৃ. ১২৩

১৪) ময়ূরাক্ষী, পৃ. ২৪

১৫) ময়ূরাক্ষী, পৃ. ১২১

১৬) ময়ূরাক্ষী, পৃ.১৩৮

১৭) সাহিত্য-বিতান, মোহিতলাল মজুমদার, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টৌমার লেন, কলকাতা-০৯, নভেম্বর ২০০৬, পৃ-২৯৫

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি : উৎপত্তি, বিস্তার ও অবসান

সুমন মুখার্জী
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়,
মল্লারপুর, বীরভূম

সারসংক্ষেপ: বর্ণবাদ হলো এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি, যার মাধ্যমে মানবজাতিকে বিভিন্ন উঁচু-নিচু শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই বর্ণবাদ প্রথার মূলে ছিল গায়ের রং। সহজ করে বললে, কালো চামড়ার মানুষদের প্রতি সাদা চামড়ার মানুষেদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বৈষম্য। আফ্রিকায় বর্ণবাদের শুরুটা হয়েছিল প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে, যখন ইউরোপীয় সাদা চামড়ার বণিক সম্প্রদায় প্রথমবারের মতো কেপটাউন অঞ্চলে আসে। একেবারে আইনের মাধ্যমে বর্ণবাদের বৈধতা শুরু হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ১৯৪৮ সালে। কারণ ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকার গঠন করে ন্যাশনালিস্ট পার্টি, যাদের নির্বাচনের ইশতেহার ছিল কালো চামড়ার মানুষদের প্রতি বৈষম্যমূলক '*Apartheid*' আইন পাশ করা। ১৯৪৩ সালে তখনকার একটি নামী পত্রিকায় '*Apartheid*' ধারণাটি প্রথম প্রচার করা হয়। '*Apartheid*' এর আক্ষরিক অর্থ পৃথকীকরণ বা আলাদাকরণ। অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সব ধরনের অধিকার থেকে আলাদা রাখতে বা পার্থক্য করতে '*Apartheid*' শব্দটি ব্যবহৃত হত। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের নিপীড়ন প্রায় সাড়ে তিনশ বছর ধরে টিকে ছিল। কালো মানুষদের মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা জেল থেকে মুক্তি পান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হন। শেষ হয় আফ্রিকার বর্ণবাদের কালো অধ্যায়। এই আলোচনার মূল বিষয় হল-বর্ণবাদ কী? দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যবাদের কীভাবে সূচনা হয়? বর্ণবৈষম্যবাদের বিস্তার ও অবসানই বা কীভাবে হয়?

সূচক শব্দ: দক্ষিণ আফ্রিকা; বর্ণবৈষম্যবাদ ;কৃষ্ণাঙ্গ; নেলসন ম্যান্ডেলা

মূল আলোচনা:

দক্ষিণ আফ্রিকার জটিল ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, ১৬৫২ সালে Cape of Good Hope-এ ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা প্রথম ইউরোপীয় বসতি স্থাপিত হয়েছিল। ১৭৯৫ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা একটা ডাচ উপনিবেশ ছিল। সেই সময় ডাচরা 'Afrikaners' বা 'Boers' নামে পরিচিত ছিল। 'Boer' শব্দের অর্থ হল কৃষক।

বুয়ররা আফ্রিকার মূল জনগণের কাছ থেকে জোর করে জমি জমা দখল করে নিয়েছিল এবং আফ্রিকাবাসীদের শ্রমিক ও দাসে পরিণত করেছিল। বর্ণবাদ হলো এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি, যার মাধ্যমে মানবজাতিকে বিভিন্ন উঁচু-নিচু শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এই বিভাজনে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বিবেচ্য হয়। কখনো হয়তো গায়ের চামড়ার রং, আবার কখনো পেশা, গোত্র, অঞ্চল ইত্যাদি। মানবজাতির ইতিহাসে বর্ণবাদের নিপীড়ন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্ণবাদের মতো জঘন্য প্রথার চর্চা করা হতো। দেশ ও অঞ্চল ভেদে বর্ণবাদের ধরনও ছিল ভিন্ন রকম। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই বর্ণবাদ প্রথার মূলে ছিল গায়ের রং। সহজ করে বললে, কালো চামড়ার মানুষদের প্রতি সাদা চামড়ার মানুষেদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বৈষম্য। আফ্রিকায় বর্ণবাদের শুরুটা হয়েছিল প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে, যখন ইউরোপীয় সাদা চামড়ার বণিক সম্প্রদায় প্রথমবারের মতো কেপটাউন অঞ্চলে আসে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির কথা বলতে গেলে, অর্থাৎ একেবারে আইনের মাধ্যমে বর্ণবাদের বৈধতা শুরু হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ১৯৪৮ সালে। কারণ ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকার গঠন করে ন্যাশনালিস্ট পার্টি, যাদের নির্বাচনের ইশতেহার ছিল কালো চামড়ার মানুষদের প্রতি বৈষম্যমূলক '*Apartheid*' আইন পাশ করা। ১৯৪৩ সালে তখনকার একটি নামী পত্রিকায় '*Apartheid*' ধারণাটি প্রথম প্রচার করা হয়। '*Apartheid*' এর আক্ষরিক অর্থ পৃথকীকরণ বা আলাদাকরণ। অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সব ধরনের অধিকার থেকে আলাদা রাখতে বা পার্থক্য করতে '*Apartheid*' শব্দটি ব্যবহৃত হত।

দক্ষিণ আফ্রিকা দেশ গঠন:

১৭৯৫ সালে ব্রিটিশরা ফরাসি বিপ্লবের সময় Cape দখল করে নিয়েছিল। ১৮১৪ সালের শান্তি সম্মেলনে Cape-কে ব্রিটিশদের অধীনেই রাখা হয়েছিল। ইংল্যান্ড থেকে প্রচুর ব্রিটিশ জনগণ Cape-এ উপনিবেশ বিস্তারের জন্য গিয়েছিল। এদিকে ডাচ উপনিবেশবাসীরা ব্রিটিশ শাসনে অস্থির হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে যখন ব্রিটিশ সরকার সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ১৮৩৮ সালে সকল Slave দের মুক্তি দিয়েছিল। Slave-রা মুক্তি পেলে বুয়ররা ভাবল এর ফলে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে এবং অনেকেই কেপ উপনিবেশ ছেড়ে চলে যেতে মনস্থির করল। বুয়ররা উত্তরের দিকে চলে গেল এবং ওই অঞ্চল Great Trek' নামে পরিচিত হল। ১৮৩৫-৪০ সালের মধ্যে ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে তারা স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। আবার, কিছু ডাচ জনগণ পূর্ব দিকে চলে গেল যা নাটাল নামে পরিচিত ছিল। ১৮৯৯-১৯০২ সালে বুয়র যুদ্ধে ইংল্যান্ডের পরাজয়ের পর ১৯১০ সালে ট্রান্সভাল, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট,

কেপ উপনিবেশ এবং নাটাল এক সঙ্গে মিলিত হয়ে 'Union of South Africa' গঠিত হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার জনসংখ্যার পরিসংখ্যান ও বিন্যাস:

নতুন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল মিশ্র প্রকৃতির।[১] মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ ছিল কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকাবাসী যারা 'বান্টু' (Bantu) নামে পরিচিত ছিল। ১৮ শতাংশ ছিল ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত শ্বেতাঙ্গ। এদের মধ্যে ৬০ শতাংশ ছিল ডাচ এবং বাকিরা ছিল ব্রিটিশ। ৯ শতাংশ ছিল মিশ্র জাতি বা 'Colourds' এবং অবশিষ্ট ৩ শতাংশ ছিল এশিয়াবাসী (ভারতীয় ও পাকিস্তানি)।

কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকাবাসীরা দেশে অবহেলিত ছিল। শ্বেতাঙ্গরা রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং অর্থনৈতিক জীবনেও তাদের অবিস্মরণীয় একাধিপত্য বজায় ছিল। কৃষ্ণাঙ্গ জনসাধারণের ভোটাধিকারও ছিল না। কৃষ্ণাঙ্গ জনগণকে ফ্যাক্টরি এবং খামারগুলিতে শ্রমদান করতে হত এবং তাদের বাসস্থান ছিল শ্বেতাঙ্গ জনগণের বাসস্থান এলাকা থেকে বহু দূরে। সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার ৭ শতাংশ এলাকা নিয়ে ওই সংরক্ষিত এলাকা গঠন করা হয়েছিল। কালো লোকেরা তাদের নিজেদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন করতে পারত না এবং তাদেরকে রাষ্ট্রের সকল প্রকার কর প্রদান করতে বাধ্য করা হত। কালো অধিবাসীদের সংরক্ষিত এলাকার বাইরে জমি কেনা নিষিদ্ধ ছিল। কালো অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল আদিম ও সেকেলে। পৃথিবীর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাই ছিল এমন একটা দেশ যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গরা দেশ শাসন করত। শ্বেতাঙ্গ শাসকগণ শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ জনসাধারণের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। ওই নীতি 'Apartheid' বা বর্ণবৈষম্য নীতি নামে পরিচিত।

'Apartheid' আসলে কি?:

দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি বৈষম্য ও পৃথকীকরণ নীতিকে সাধারণ অর্থে 'Apartheid' বলা হয়। 'Apartheid' একটা আফ্রিকান শব্দ—ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বতন্ত্র পরিবেশে উন্নতি সাধন—এরূপ অর্থবোধক। Webster's Seventh New Collegiate Dictionary-তে 'apartheid'-এর অর্থ সম্বন্ধে লিখিত আছে-[২]

A policy of racial segregation, separateness, political and economic discrimination against non-Europeans groups in the union of South Africa-এই নীতির অর্থ হল শ্বেতাঙ্গ এবং অ-শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সর্বপ্রকারের পার্থক্য বজায় রাখা এবং যে কোনো পন্থায় দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের প্রাধান্য বজায় রাখা। John Hatch-এর ভাষায় বলা যায় যে—"This simply implies the maintenance of white domination at all points and at all cost throughout the nation.[৩] আবার, Wayne C. Mc Williams এবং Harry Piotrowski তাঁদের *The world since 1945*[৪] গ্রন্থে ওই নীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে

বলেছেন—‘Apartheid was a philosophy of psychological oppression, economic exploitation and political domination. It was a way of life that only force could maintain’. বর্ণবৈষম্য নীতির ভিত্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে N. J. Rhoodie এবং H. J. Venter বলেছেন—“The three foundation stone of apartheid are western culture, Christian morality and a specific racial identity”.[৫] আবার, C. W. de Kiewiet[৬] বর্ণবৈষম্য নীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মত দিয়েছেন যে, “The Social, Economic and Political distinctions which are the structural parts of apartheid are in the first place the logical results of the colonial relationship. A relationship of interiority and superiority was born of the difference between primitiveness and civilization, poverty and wealth, superstition and science”. যাইহোক, শ্বেতাঙ্গ ও অ-শ্বেতাঙ্গ জাতির মধ্যে সম্পূর্ণ বিভাজনই হল apartheid নীতির মূল উদ্দেশ্য।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য নীতির প্রবর্তন:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কালো জনগণকে শাসনের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৪৮ সালের মে মাসে Dr. Daniel Malan-এর নেতৃত্বে উগ্রপন্থী ‘Afrikaner Nationalist Party’ ক্ষমতাসীন হলে দক্ষিণ আফ্রিকায় apartheid নীতি প্রবর্তিত হয়। ‘Skin is a sin’— এই বিশ্বাসের কাছে নতি স্বীকার করে তিনি গাত্রবর্ণের ভিত্তিতে শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য বৈষম্যমূলক আইন সমূহ চালু করেন। ম্যালান সরকারের স্লোগান ছিল—‘Black heads to be kept-apart from white heads’—অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের জন্য স্বতন্ত্র জীবনযাপনের ব্যবস্থা, শ্বেতাঙ্গদের স্বার্থে কৃষ্ণাঙ্গদের সমান উন্নতির সুযোগ না দেওয়া, পরন্তু, বিধিবদ্ধ উপায়ে অ-শ্বেতাঙ্গদের এমন একটা পর্যায়ে অবনমিত করা যেখানে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হতে বাধ্য করা।

বর্ণবৈষম্য নীতির প্রবর্তনের সমর্থনে যুক্তি:

ন্যাশনালিস্ট পার্টি শুরু থেকেই apartheid-এর সমর্থনে একাধিক যুক্তির অবতারণা করে। প্রথমত, ঊনবিংশ শতাব্দীতে চিন্তাশীল মনীষীদের কাছে ইহা একটা আলোচ্য বিষয় ছিল যে, শিক্ষা সংস্কৃতিগত মান সকল জাতির জনগণের এক নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা অধ্যুষিত বিভিন্ন জাতিভুক্ত অধিবাসীদের শিক্ষা-দীক্ষার মানের অসামঞ্জস্য ও দ্বন্দ্ব হেতু তাদের অগ্রগতির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ব্যবহার করেন। দ্বিতীয়ত, শ্বেতাঙ্গ ও অ-শ্বেতাঙ্গদের অগ্রগতির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় করেন তাদের জন্মগত সংস্কার ও শিক্ষা সংক্রান্ত ঐতিহ্য ভিন্ন। এহেন শ্রেণিদ্বয় অভিন্ন পরিবেশে একত্র বসবাস করলে দেশের পক্ষে অশুভ হবে। শ্বেতাঙ্গ ও অ-শ্বেতাঙ্গ মিলনে যে জাতির উদ্ভব হবে তা সভ্য

দুনিয়ায় হবে অপাংক্তেয়। এ হবে এক প্রকার বর্ণসংকর সৃষ্টি। বর্ণসংকর দুই জাতির উদ্ভব অবাঞ্ছিত। তৃতীয়ত, apartheid নীতির সমর্থকদের ধারণা, একটা জাতির উদ্ভব নির্ভর করে সেই জাতির জনগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি ও নৈপুণ্যের ওপর। যেহেতু সব জাতির গুণাবলি এক প্রকার নয় সেই হেতু বিভিন্ন জাতির গুণাবলি ও অগ্রগতির বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে হওয়া উচিত। চতুর্থত, ন্যাশনালিস্ট পার্টি আতঙ্কিত হয় এই ভেবে যে, সংখ্যাধিক্য বশত কৃষ্ণাঙ্গ ভোটদাতারা একদিন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে পারে। সেই আশঙ্কা দূরীকরণের জন্যই এই নীতির প্রবর্তন। মোট কথা, ন্যাশনালিস্ট পার্টি প্রচার করে যে, শ্বেতাঙ্গ ও অ-শ্বেতাঙ্গ জনগণের জীবনধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হওয়ায় তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে যদি তাদের বাসস্থান ইত্যাদি স্বতন্ত্র করা হয় এবং মানসিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরস্পরের আত্মোন্নতির পৃথক ব্যবস্থা করা যায়। তবে apartheid-এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল অ-শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়কে পশ্চাৎভূমিতে নিক্ষেপ করা। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সমপর্যায়ে উন্নতির সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা। উভয় শ্রেণির জনগণের মধ্যে দৈহিক ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য বজায় রাখা। এক কথায়, জীবনযাপনে তাদের মধ্যে দুস্তর দূরত্ব সৃষ্টি করা।

বর্ণবৈষম্য নীতিকে প্রয়োগ করতে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন:

১৯৪৮-৫৯ সালের মধ্যে বহুবিধ প্রতিক্রিয়াশীল আইন বিধিবদ্ধ হয়। E. S. Sachs বলেছেন, apartheid নীতি অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজকে নতুন ছাঁচে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।[৭] ১৯৫০ সালে 'The Suppression of Communism Act' দ্বারা apartheid-বিরোধী যে কোনো চিন্তাধারা বা কর্মতৎপরতা কম্যুনিজম সভা হিসেবে খ্যাত হয়, দেশে রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সমর্থনে যে কোনো আন্দোলন উক্ত আইন অনুযায়ী অবৈধ হয় এবং আন্দোলনকারীরা দণ্ডিত হয়। ১৯৫০ সালে 'Population Registration Act' অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকাকে তিনটি জাতি গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। ১৯৫১ সালে 'Prevention of Illegal Squatting Act' দ্বারা অবৈধভাবে জমি দখল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং আদালতের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হয় জবরদখলকারীদের উচ্ছেদের জন্য, তাদের অস্থায়ী কুঁড়েঘর ভেঙে দেওয়ার জন্য এবং জবরদখলকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। ১৯৫১ সালে 'Bantu Authorities Act' দ্বারা বান্টু উপজাতিদের জন্য আঞ্চলিক প্রশাসন স্থাপন করা এবং তাদের জন্য পৃথক পরিবেশে অগ্রগতির ব্যবস্থা করা এবং উপজাতিটির জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগের ব্যবস্থা করা। কিন্তু দেখা গেল বান্টুদের স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে লিপ্ত প্রধান ব্যক্তিগত এবং অপরাপর কর্মীরা সকলেই শ্বেতাঙ্গ সরকার অনুমোদিত। সুতরাং বান্টু স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে চালু হল শ্বেতাঙ্গ শাসন। কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি প্রযোজ্য নিপীড়নমূলক আইন সমূহের মধ্যে ঘৃণ্যতম ছিল Pass Laws। কৃষ্ণাঙ্গদের গতিবিধির স্বাধীনতা সীমিত করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন সরকার কেপ উপনিবেশে Pass Laws চালু করে। ১৯৫২ সালে 'The Natives Abolition of

Passes and coordination of Documents Act' এর দ্বারা Pass Book Law প্রবর্তিত হয়। ওই Pass Book-এ লেখা থাকত বহনকারীর নাম, ঠিকানা। ওই Pass Book দাবিমাত্র সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীকে দেখাতে না পারলে দোষী ব্যক্তিকে ৫০ পাউন্ড জরিমানা বা ৬ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হত। ১৯৫৩ সালে 'Criminal Law Amendment Act' দ্বারা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন আইনত অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় এবং অপরাধীদের জন্য শাস্তির বিধান হয়। ১৯৫৩ সালে 'Bantu Education Act' দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গদের শিক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগ থেকে 'Native Affairs' মন্ত্রীর বিভাগে চলে আসে। এতে বান্টুরা আধুনিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের শিক্ষার মান নিম্নমুখী ছিল। বান্টুদের জন্য ভবিষ্যতে বে-সরকারি বিদ্যালয় স্থাপনও বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৬ সালে বিধিবদ্ধ হয় 'Native (Urban Areas) Amendment Act'। এই আইন দ্বারা স্থির হয়, শহরাঞ্চলে যদি কোনো কৃষ্ণাঙ্গের উপস্থিতি শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে তাহলে স্থানীয় প্রশাসক এহেন কৃষ্ণাঙ্গকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শহর ত্যাগে বাধ্য করতে পারে। ১৯৫৯ সালে বিধিবদ্ধ 'Promotion of Bantu Self Government Act' দ্বারা বান্টু উপজাতিদের স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের অজুহাতে শ্বেতাঙ্গ সরকার বান্টুগণকে ৪ টি ইউনিটে বিভক্ত করে যথা—North Sotho Unit, South Sotho Unit, Swazi Unit, Tsonga Unit, Tswana Unit, Venda Unit, Xhosa Unit এবং Zulu Unit। এরূপ বিভাজনের ফলে বান্টুদের মধ্যে উপজাতীয় বিভেদের সৃষ্টি হয়। এতে ন্যাশনালিস্ট সরকারের apartheid নীতি প্রশ্রয় পায়। এই প্রসঙ্গে M C Williams এবং Piotrowski[৮] বলেছেনে—"The creation of the 'home-lands' signaled the completion of the system of apartheid."

বর্ণবৈষম্য নীতির বৈশিষ্ট্য:

সমস্ত পর্যায়ে যতদূর সম্ভব শ্বেতাঙ্গ ও অ-শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে পুরোপুরি বিভেদ সৃষ্টি করা হল। গ্রামাঞ্চলে কৃষ্ণাঙ্গরা বসবাস করত একটা সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে। শহরাঞ্চলে তাদের পৃথক township ছিল যা শ্বেতাঙ্গদের বসবাস এলাকা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ জনসাধারণ পৃথক বাস, কোচ, ট্রেন, ক্যাফে, শৌচাগার, পার্ক, হসপিটাল, সমুদ্র, বিচ, পিকনিক এলাকা, খেলাধূলা এবং এমনকি চার্চের ব্যবহার করত। কৃষ্ণাঙ্গ শিশুরা পৃথক বিদ্যালয়ে যেত এবং তাদের নিম্নমানের শিক্ষা দেওয়া হত।

প্রত্যেক জনগণকে জাতিগত শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছিল এবং প্রত্যেককে চিহ্নিতকরণ কার্ড দেওয়া হয়েছিল। কালো জনগণের ওপর কঠোর পাস আইন প্রযোজ্য হয়েছিল। নিজের এলাকায় থাকতে হলে বা কাজের জন্য শ্বেতাঙ্গ এলাকায় যেতে হলে

পুলিশকে পাস দেখাতে হত। পাশ ছাড়া এবং পুলিশের অনুমতি ছাড়া কোনো স্থানে ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ ছিল।

বিবাহ এবং যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয় শ্বেতাঙ্গ এবং অ-শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে। শ্বেতাঙ্গ এবং অ-শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে অবৈধ প্রেম ঘোরতর অপরাধ বলে স্বীকৃত হয়।

'Bantu Self Government' Act দ্বারা Bantustan তৈরি করা হল। যাতে প্রকৃত কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ বাস করবে। দাবি করা হল যে, তারা স্ব-শাসন পাবে। ১৯৬৯ সালে প্রথম বান্টুস্তান Transkei কে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হল। কিন্তু দেখা গেল দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার Transkei-এর অর্থনীতি এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে থাকল। সমগ্র নীতিটাই সমালোচিত হল কারণ সমগ্র দেশের ১৩ শতাংশ এলাকা নিয়ে বান্টুস্তান গঠিত হল এবং ওই ছোটো এলাকায় প্রায় ৮ মিলিয়ন কালো জনগণ বসবাস করতে শুরু করল। এর ফলে স্থান সংকুলান করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। ১৯৮০ সালে অপর দুই আফ্রিকান হোমল্যান্ড Bophatswana এবং Venda কে স্বাধীনতা দেওয়া হল।

বর্ণবৈষম্য নীতির ফলে কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ তাদের সকল রাজনৈতিক অধিকার তথা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষের বিরোধিতা:

দক্ষিণ আফ্রিকার ভিতরে apartheid-এর বিরোধিতা করা কঠিন কাজ ছিল। যারা এই নীতির বিরোধিতা করত তাদের কমিউনিস্ট বলে আখ্যায়িত করা হত এবং নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দেওয়া হত। আফ্রিকানদের ধর্মঘট করা নিষিদ্ধ ছিল এবং কালো মানুষদের রাজনৈতিক দল African National Congress ও নিষিদ্ধ ছিল। ওই দলের নেতা Albert Luthuli একটা সংগঠিত প্রতিবাদ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। কৃষ্ণাঙ্গ জনসাধারণ প্রতিবাদ স্বরূপ তাদের কাজ কিছুদিনের জন্য বন্ধ রেখেছিল। ১৯৫২ সালে আফ্রিকানরা আইন ভঙ্গ করে শ্বেতাঙ্গদের সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করেছিল। এর ফলে প্রায় ৮০০০ কৃষ্ণাঙ্গকে গ্রেফতার করা হয় এবং লুথুলিকেও জেলে পাঠানো হয়। ১৯৫৫ সালে ANC এশিয়ান এবং কালারর্ড গ্রুপের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা মিলিত আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়েছিল। তারা জোহানেসবার্গের কাছে ক্লিপটাউনে মিলিত হয়ে স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করে। ওই সনদে বলা হয়েছিল—"South Africa belongs to all who live in it, black and white, and no government can claim authority unless it is based on the will of the people."[৯] তারা দাবি করেছিল—আইনের আগে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হোক। সভা, আন্দোলন এবং বাক্-স্বাধীনতা রক্ষিত হোক। ধর্মীয় ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষিত হোক। ভোটদানের ক্ষমতা এবং কর্মের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হোক। ৪০ ঘণ্টা কর্ম সপ্তাহ স্থির করা হোক। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হোক এবং বেকার সমস্যার সমাধান হোক। এছাড়া, তাদের প্রধান দাবি ছিল

বিনা অর্থে চিকিৎসার সুবিধা এবং মুক্ত, আবশ্যিক ও সমমানের শিক্ষা প্রদান করা হোক।

শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ চার্চ নেতা এবং মিশনারিরাও apartheid-এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ব্রিটিশ মিশনারি Trever Hadduston যিনি ১৯৪৩ সাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মরত ছিলেন।

১৯৫৭ সালে African National Congress বাস বয়কটের দ্বারা 'apartheid'-এর বিরোধিতা করেছিল। তাদরে township থেকে জোহানেসবার্গ পর্যন্ত বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে তারা প্রায় ৩ মাস পায়ে হেঁটে যাতায়াত করেছিল ভাড়া না কমা পর্যন্ত।

বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চরম সীমায় পৌঁছল ১৯৬০ সালে Sharpeville-এ পাস আইনের বিরুদ্ধে। পুলিশ জনসভায় গুলি চালায় এবং ৬৭ জন আফ্রিকান মারা যায় এবং ১৫০০ আফ্রিকানকে গ্রেফতার করা হয়। 'apartheid'-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গুলির মধ্যে এই আন্দোলনই ছিল সবচেয়ে বেশি হিংসাত্মক। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে AITC নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে যাবৎকালীন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু Luthuli অহিংস আন্দোলন নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর আত্মজীবনী '*Let My People Go*' প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। ১৯৬৭ সালে তাঁকে হত্যা করা হয়।

১৯৭০ সালে জনগণের অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ পুনরায় বাড়তে থাকে কারণ দেশে মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকানদের মজুরি বাড়েনি। ১৯৭৬ সালে ট্রান্সভালের প্রশাসন যখন ঘোষণা করেন যে, আফ্রিকানাস ভাষা কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্যালয়গুলিতে ব্যবহার করা হবে, তখন এক ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দেয় Soweto-তে। ওই বিক্ষোভে প্রচুর শিশু ও যুবক পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। apartheid-এর বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ এই সময় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৬ সালে Steve Biko নামের এক নতুন তরুণ নেতাকে হত্যা করা হয়।

বর্ণবৈষম্য নীতির আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া:

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। রাষ্ট্রমণ্ডল বা Commonwealth ভুক্ত দেশগুলি ওই নীতির বিরোধিতা করেছিল। ১৯৬০ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী Harrold Macmillan, Cape Town-এ বলেছিলেন— "the wind of change is blowing through the continent, ... our national policies must take account of it."[১০] তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে সাবধান করে দিয়েছিলেন কারণ সেইসময় আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি ঘটেছিল এবং 'Black Consciousness' বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯৬১ সালের কমনওয়েলথ বৈঠকে দক্ষিণ আফ্রিকার সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়।

U.N.O এবং O. A. U-এর ভূমিকা:

রাষ্ট্রসংঘ এবং Organization of African Unity ও 'apartheid'-এর বিরোধিতা করেছিল। তারা দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা দখলের ও বিরোধিতা করেছিল। U. N দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেছিল ১৯৬২ সালে। কিন্তু সকল সদস্য রাষ্ট্র U. N-এর এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেনি। U. K, U. S. A. ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালি 'apartheid'-এর বিরোধিতা করলেও তারা দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে গিয়েছিল। এই সময় 'apartheid'-কে কেন্দ্র করে দক্ষিণ আফ্রিকা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের জালে জড়িয়ে পড়ে। U. S. S. R অস্ত্রশস্ত্রের জোগান দিয়েছিল A. N. C কে কিন্তু U. S. A National party regime কে সমর্থন করেছিল আর্থিক সহায়তার দ্বারা। আমেরিকা চেয়েছিল আফ্রিকা থেকে সাম্যবাদকে বিতাড়িত করতে।

বর্ণবৈষম্য নীতির অবসান :

১৯৮০ সালের পর apartheid ধীরে ধীরে অবসান ঘটে। ১৯৭৯ সালে প্রধানমন্ত্রী P. W. Botha ক্ষমতায় এসে উপলব্ধি করেন যে, 'apartheid'-এর সংস্কার করা প্রয়োজন। কমনওয়েলথ, U. N. O এবং O. A. U-এর ক্রমাগত বিরোধিতা এবং ১৯৭৫ সাল নাগাদ শ্বেতাঙ্গ শাসিত পর্তুগিজ উপনিবেশ অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিক স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৮০ সালে জিম্বাবোয়েও স্বাধীনতা লাভ করে। এর ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। আবার দেশে অর্থনৈতিক সমস্যাও ছিল। দেশে কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের উত্তরোত্তর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এইসময় প্রায় ২১ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের জন্য 'Home lands' গঠনও ব্যর্থ হয়ে যায়। ওই 'Home lands'-এর অধিবাসীরা ছিল দুর্ভিক্ষ পীড়িত। কোনো বিদেশি সরকার তাদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। ১৯৭০ সালের পর থেকে U. S. A ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির বিরোধিতা করতে শুরু করে। ১৯৭৯ সালে P. W. Botha ঘোষণা করেছিলেন—"A Revolution in South Africa is no longer just a remote possibility. Either we adapt or we perish white domination and legally enforced are a recipe for permanent conflict." [১১] তিনি কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের এলাকায় অপ্রয়োজনীয় জাতি বিদ্বেষ বন্ধ করার চেষ্টা করেন। তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করেন যেমন—কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের Trade Union গঠন এবং ধর্মঘট করার অধিকার দেওয়া হয়। কৃষ্ণাঙ্গদের তাদের শহরের কাউন্সিলর নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। নতুন সংবিধানে পার্লামেন্টে দুটি কক্ষ সৃষ্টি করা হয়— একটা Colourds দের জন্য এবং অপরটি Asians দের জন্য। ১৯৮৫ সালে শ্বেতাঙ্গ এবং অ-শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বিবাহ এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৮৬ সালে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য 'Pass Law' রদ করা হয়। তবে Botha A. N. C-এর মূল দাবি ভোট দানের

অধিকারকে মেনে নেননি। ফলে সরকার ও A. N. C-এর মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল। A. N. C কৃষ্ণাঙ্গ পুলিশ এবং কাউন্সিলর যারা apartheid-এর সমর্থক ছিল তাদের হত্যা করতে শুরু করল। ১৯৮৫ সালে শার্পেভিল ঘটনার ২৫ বছর পূর্তিতে Port Elizabeth-এর জনসভায় পুলিশ গুলি চালালে প্রায় ৪০ জনের মৃত্যু হয়। ফলে ১৯৮৬ সালে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। T. V., Radio এবং সংবাদপত্রে গ্রেফতারি খবর প্রকাশ করা নিষিদ্ধ হল। ১৯৮০ সালের শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর আন্তর্জাতিক চাপ প্রচণ্ড বেড়েছিল।

১৯৮০ সালে ব্রিটেন বাদে রাষ্ট্রমণ্ডল ভুক্ত অন্যান্য দেশগুলি দক্ষিণ আফ্রিকাকে কোনো আর্থিক ঋণ, তৈল, কম্পিউটার সামগ্রী, পরমাণু সামগ্রী সরবরাহ করেনি। এছাড়া ওই সমস্ত দেশগুলি দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সম্পর্কও ছিন্ন করেছিল। ১৯৮৬ সালে আমেরিকা ঋণ প্রদান করেনি এবং বিমান পরিষেবা ছিন্ন করেছিল। এছাড়া, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে লোহা, স্টিল, কয়লা, বস্ত্র, ইউরেনিয়াম আমদানি বন্ধ করে দেয়।

কৃষ্ণাঙ্গ জনগণও তখন সুশিক্ষিত ও পেশাদারি মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। এছাড়া, একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণিরও উদ্ভব ঘটে। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন Desmond Tutu যিনি ১৯৮৪ সালে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। Dutch Reformed Church ও 'apartheid'-এর বিরোধিতা করেছিল। বেশিরভাগ শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীই বুঝতে পেরেছিল যে, দেশের রাজনৈতিক জীবন থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের বাদ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। শ্বেতাঙ্গ মধ্যপন্থী নেতারা 'apartheid'-এর অবসানে তৎপর হল।

১৯৮৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন F. W. De. Klerk। তিনি 'apartheid'-এর অবসান এবং দেশে কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগুরু শাসন প্রবর্তন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। অসীম সাহস ও ধৈর্যসহকারে এবং ডানপন্থী Afrikaner groups দের থেকে ব্যাপক বিরোধিতা সত্ত্বেও Klerk দেশে 'apartheid' নির্মূলকরণে অগ্রসর হন। ১৯৯০ সালে ২৭ বছর পর Nelson Mandela জেল থেকে মুক্তি পান এবং A. N. C-এর আইন সংগতভাবে নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৯০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা নামিবিয়াকে স্বাধীনতা দেয় কৃষ্ণাঙ্গ শাসনের অধীনে। A. N. C এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের মধ্যে আলোচনা শুরু হয় একটা নতুন সংবিধান রচনার জন্য যেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের পুরো রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা হবে। নেলসন ম্যান্ডেলা দেশে হিংসা বন্ধ করার আহ্বান জানান। De klerk ও National Party-এর ডানপন্থী নেতাদের কাছ থেকে ব্যাপক বিরোধিতা পেয়েছিলেন। A. N. C ও অপর একটা কৃষ্ণাঙ্গ দল Zulu Inkatha Freedom Party-এর সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। ১৯৯৩ সালে আলোচনা সফল হল এবং স্থির হল ১৯৯৪ সালে সারা দেশে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৯৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে

জিতে যায় African National Congress। নেলসন ম্যাণ্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন De Klerk।

এইভাবে দীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক অচলাবস্থার পর দক্ষিণ আফ্রিকার শান্তি ও সুস্থিতি ফিরে আসে। দীর্ঘকালের সশস্ত্র আন্দোলন, আতঙ্ক, কারাবরণ, স্ত্রী-পুরুষ-শিশুর নির্যাতন ও অকাল মৃত্যুর অবসান হয়। নেলসন ম্যাণ্ডেলার শাসনে দেশে বর্ণবৈষম্য দূরীভূত হয় চিরতরে। দেশব্যাপী জনগণ স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে ধন্য হয়। ডি. ক্লার্কের কূটনৈতিক দূরদৃষ্টি, রাজনৈতিক যুক্তি নির্ভর চেতনাবোধ এবং উদার মনোভাবের সঙ্গে ম্যাণ্ডেলার দেশপ্রেম, অসীম সহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও ঐতিহাসিক নেতৃত্বের অভূতপূর্ব মহামিলন 'apartheid' যুগের চিরতরে অবসান ঘটায়।

উপসংহারে বলা যায় যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের নিপীড়ন প্রায় সাড়ে তিনশ বছর ধরে টিকে ছিল। এই কালো অধ্যায় মুছে দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক কৃষ্ণাঙ্গ মুক্তিদূতের অবদান রয়েছে সত্য, তবে একজন শ্বেতাঙ্গর কথাও বলতে হয়। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্লার্ক, যিনি প্রথমবারের মতো ১৯৯২ সালে একটি গণভোটের আয়োজন করেন কৃষ্ণাঙ্গ বিরোধী আইনগুলো চলতেই থাকবে কি না সে বিষয়ে। অবশ্য এই গণভোটে অংশ নেয় শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গরাই। ভোট শেষে দেখা গেলো শতকরা ৬৯ ভাগ শ্বেতাঙ্গই বর্ণবাদ আইনের সংস্কার চায়। এরপরেই কালো মানুষদের মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা জেল থেকে মুক্তি পান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হন। শেষ হয় আফ্রিকার বর্ণবাদের কালো অধ্যায়। ম্যান্ডেলা বিজয়ী হওয়ার পর সাদা চামড়ার মানুষদের উপর কোনো প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণ করেননি। বরং তিনি সাদা-কালোর ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করে গেছেন আজীবন। তার এই মহানুভবতাই তাকে কালো মানুষদের নেতা থেকে বিশ্ব নেতায় পরিণত করে। apartheid যুগের অবসানের পর নেলসন ম্যাণ্ডেলা দেশের ভগ্নপ্রায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠনে মনোযোগ দেন। বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা রাষ্ট্র। বর্তমানে ম্যাণ্ডেলা অনুসৃত পথেই অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. Norman Lowe, *Mastering Modern World History*, New Delhi: Macmillan India Ltd., 2000, P. 470.

২. Webster's New Collegiate Dictionary (VIIth Edition)

৩. Asit Sen, *International Relations since world war I*, New Delhi: S. Chand & Company Ltd., 2000, P. 332.

৪. W. C. Macwilliams & H. Piotrowski, *The World since 1945: A History of International Relations*, Boulder & London: Lynne Reinner Publishers, 1997, P. 287.

৫. N.J. Rhoodie and H.J. Venter, A Socio-Historical Exposition of the Origin and Development of the Apartheid Idea, Capetown : Haum Publishers, 1960 ,P .22 .

৬. C.W. de Kiewiet, The Anatomy of South African Misery, London: Oxford University Press, 1956, p.23.

৭. E.S. Sachs, The Anatomy of Apartheid, London: Collet's Publishers, 1965, P. 249.

৮. W. C. Macwilliams & H. Piotrowski, op.cit. p. 287.

৯. Norman Lowe, op.cit. p. 472.

১০. Ibid., P.474.

১১. Ibid., P.475.

অনিতা অগ্নিহোত্রীর কথাসাহিত্যে প্রান্তিক জনজাতি

আনন্দ সাইনি
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
বাঁকুড়া জেলা সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সাহিত্য হল সমাজ ও জীবনের দর্পণ। শিল্পের নিরিখে বৈশ্বিক ও দৈশিক উভয়ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য স্বীকার্য। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য গতিপথ পরিবর্তন করে কালের এক বিশ্বস্ত প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ছিন্নমূল মানুষের কথা, উদ্বাস্তু সমস্যা, অভিবাসন সমস্যা, খাদ্য সংকট, শ্রমিক-কৃষক স্বার্থে লড়াই, শিল্পনীতি জনিত সংকট, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ও ভাঙন, নক্‌শাল আন্দোলন, জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থা রাজনীতির বিকাশ-বিবর্তন, সময়ের দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বোত্তরণের ছবি সাহিত্যের সব শাখায় সমান বিদ্যমান। এছাড়াও অনিতা অগ্নিহোত্রীর কথাসাহিত্যে বিস্তৃত অংশ জুড়ে প্রান্তিকতার স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে।
মূলশব্দ: প্রান্তিক, উন্নয়ন ও প্রান্তিকতা, উদার অর্থনীতি, বিশ্বায়ন

মূল আলোচনা:
বিশ শতকের আটের দশক থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রতিভাত হল নতুন কিছু প্রবণতা। বিশ্বায়ন, উদারীকরণ অর্থনীতির প্রভাব, সমাজনীতি-সংস্কৃতির টানাপোড়েন, ব্যক্তিমানুষের সংকট, বিচ্ছিন্নতাবোধ, মনস্তাত্ত্বিকতার বহুরৈখিক দিকের সার্বিক অবলোকন ঘটেছে একশ্রেণির সাহিত্যিকের দৃষ্টিকোণ থেকে। এই ধারার সাহিত্যিককূলে প্রধান ব্যক্তিত্ব হলেন অনিতা অগ্নিহোত্রী(১৯৫৬—)। বিশ শতকের সত্তরের দশকে বাঙালি পাঠক সমাজে অনিতা অগ্নিহোত্রীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তারপর প্রায় পাঁচ দশক ধরে তিনি সৃষ্টির প্রবহমানতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। লিখেছেন— কবিতা, গল্প, উপন্যাস, শিশু-কিশোর সাহিত্য ও প্রবন্ধ প্রভৃতি অনেককিছু। তবে তাঁর জীবনদৃষ্টি ও শিল্পভাবনার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে কথাসাহিত্যে।

নগর কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। পারিবারিক পরিসরে পেয়েছেন সাহিত্যচর্চার অবকাশ। “আমার কথা” প্রবন্ধে তিনি স্বীকার করেছেন, তাঁর বাবা ও দাদা কবি ছিলেন, আর মা ছিলেন নিষ্ঠাবান পাঠক। তিনি অকপট ভাবে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন তাঁর মা তাকে দিয়ে বারবার সাহিত্য লিখিয়ে নিয়েছেন। তাই শিশুকাল থেকে তিনি মায়ের কাছেই সাহিত্য রচনার প্রেরণা পেয়েছেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে কবিতা লিখে তা ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় পাঠানোর দুঃসাহস দেখিয়েছেন। “আমার কথা” প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন- ছোটোবেলা থেকে

তাঁর সাধ ছিল বড় লেখক হওয়ার। ১৯৬৯ সালে 'সন্দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা "রেলগাড়ি" প্রকাশিত হয়। কবিতা চর্চার কিছুদিন পর অনিতা অগ্নিহোত্রী আবার মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে গল্প লিখতে শুরু করেন। এরপর অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখায় ক্রমশ স্বদেশ, সমাজ, প্রকৃতি ও মানবিক সম্পর্কের বহুরূপ চিত্রিত হয়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপে। শিশু, কিশোর ও পরিণত মানুষ সব শ্রেণির পাঠকের জন্য চালিত হয়েছে তাঁর লেখনী।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন খুবই বর্ণময়। দুটি ক্ষেত্রেই অসম্ভব সঙ্গতি রেখে তিনি এগিয়ে গেছেন। শিশুকাল থেকে কৃতি ছাত্রী হওয়ার সুবাদে পড়াশুনায় তিনি কখনো শৈথিল্য প্রকাশ করেননি। ১৯৭৩ সালে হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় কলা বিভাগ থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গে প্রথম হন। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ ও ১৯৭৯ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ করেন। ১৯৮০ সালে ভারতীয় প্রশাসনিক সেবাতে (আই.এ.এস) যোগদান করেন। এরপর দীর্ঘ ছত্রিশ বছর তিনি প্রসাশকের দায়িত্ব সামলেছেন। ১৯৮০ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনি ভারত সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সচিব ছিলেন যথা- ক) সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক খ) আবাসন ও নাগরিক দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রক। ফলে কর্মসূত্রে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা তো বটেই সেইসঙ্গে দেশের নানা প্রান্তের মানুষকে দেখা সম্ভব হল তাঁর পক্ষে। সেইসূত্রে অনিতা অগ্নিহোত্রী জগত ও জীবনকে অবাধ দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন। আর জীবন-সিন্দুকে সঞ্চিত ও গচ্ছিত হল বিচিত্র অভিজ্ঞতা তথা সাহিত্য রচনার অজস্র উপাদান। তাই অনিতা অগ্নিহোত্রীর বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠেছে মূলত বাংলায় লেখা ভারতীয় সাহিত্য।

'প্রান্তিক' শব্দের অভিধানগত অর্থ হল প্রান্তবর্তী। অনিতা অগ্নিহোত্রী তাঁর "উন্নয়ন ও প্রান্তিকতা" গ্রন্থে কথারম্ভ অংশে বলেছেন- 'আমাদের দেশে মূলত দরিদ্র ও উন্নয়নের আওতার বাইরে থাকা প্রান্তিক মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি।' সুতরাং প্রান্তিক শব্দবন্ধটি ব্যাপক অর্থে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া জনমানসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজ আমাদের দেশের এক বিশিষ্ট অথচ প্রান্তিক অংশ। কিন্তু এর বাইরেও নারী, কৃষক, শ্রমিক ও ভূমি উচ্ছেদশীল মানুষ আজ প্রান্তিকতার সাথে জড়িত। অনিতা অগ্নিহোত্রী এই সার্বিক অবলোকনে তাঁর কথাসাহিত্যে প্রান্তিকতা যেভাবে দেখেছেন তা আমার আলোচ্য বিষয়।

ক) অনিতা অগ্নিহোত্রীর উপন্যাসে প্রান্তিক জনজাতি:

"মহুলডিহার দিন"(১৯৯৫): অনিতা অগ্নিহোত্রী রচিত প্রথম উপন্যাস হল "মহুলডিহার দিন"। উপন্যাসটির পটভূমি উড়িষ্যার সুন্দরগড় অঞ্চল, সুনির্দিষ্ট ব্রাহ্মণী নদী ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল। উপন্যাসটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কমলিকার উড়িষ্যায় দিনযাপনের এক

স্মৃতিচিত্র। গ্রন্থটির পরিচিতি দানে লেখক বলেছেন- '১৯৯৫তে প্রকাশিত মহুলডিহার দিন'ই আমার প্রথম উপন্যাস। ব্রাহ্মনী নদী, নদীকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষ, খনি ও শিল্পের রাজনীতির অভিঘাতে বিনষ্ট আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষের জীবন, মানুষ ও প্রশাসনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কমলিকার অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও পরাজয়ের অনুভূতি- মহুলডিহার দিন কোথাও আমার পাঠকদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল।' উপন্যাসটি আটটি পর্বে বিন্যস্ত। নাগরিক আস্ফালনে বিধ্বস্ত জীবনে মহুলডিহা ও কুমারডিহি প্রাথমিকভাবে যেন এক গ্রাম্য প্রশান্তি বয়ে এনেছে। কিন্তু কুমারডিহিতে ইন্সপেকশনে যাওয়ার সময় লেখকের ভ্রান্তি ধরা পড়েছে। যেতে যেতে চোখের সামনে অরণ্য সভ্যতার বিনষ্টিকরণ স্পষ্ট দেখতে পেল।

প্রান্তিক মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন বনজঙ্গল যেন হারিয়ে গেছে। অন্যদিকে ব্রাহ্মনী নদীতে এখন আর আগের মতো মাছ হয় না। উপন্যাসে আছে তিরিশ বছর আগে এই নদীতে প্রচুর মাছ থাকত, কিন্তু কারখানা হওয়ার পর এখন আর মাছ দেখা যায় না। তাহলে এই কারখানা স্থাপন প্রান্তিক জনজাতির অস্তিত্ত্ব বিপন্ন করেছে। কারণ জমি অধিগ্রহণের ফলে এই অঞ্চলের বহু মানুষ লোকালয় ছেড়ে চলে গেছে। বাস্তু চ্যুত হয়ে কেউ সামান্য কমপেনসেশন পেয়েছে, কেউ বা পায়নি। আখেরে লাভ হয়েছে দালাল মাফিয়া ও মালিক পক্ষের। ফলে ভূমিহীন উদ্বাস্তুদের থেকে তৈরি হয়েছে মোর্চা, অনেকে কৃষিকাজ হারিয়ে বাধ্য হয়েছে ঈঁট ভাটায় কাজে যেতে বাধ্য হয়েছে। সেখানেও প্রান্তিক জনজাতির নারীদের উপর চলেছে যৌননির্যাতন। উপন্যাসে তিরকী মুর্মু স্টান সাহেবের হাতে ধর্ষিত হয়। অথচ তার কোনো বিচার হয় না। তাহলে প্রান্তিক নারীরা আবার প্রান্তিকতার দ্বিতীয় পর্বে অবস্থান করছে। যেখানে নারী সুরক্ষা বা নিরাপত্তা মেলে না। উপন্যাসে সার্বিকভাবে প্রান্তিকতার বহুমাত্রিক দিকগুলি লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে এসেছে।

"সুখবাসী(২০০৯)": অনিতা অগ্নিহোত্রীর "সুখবাসী" উপন্যাস রচনার পটভূমি মূলত দক্ষিণ-পশ্চিম ওড়িশা ও ছত্রিশগড় অঞ্চল। আরো স্পষ্ট করে বললে কালাহাণ্ডি, কোরাপুট সংলগ্ন মারাগুড়া উপত্যকা ও সুনাবেড়া মালভূমি অঞ্চল। যেখানে প্রকৃত ভূমি সন্তানরা ভূমিহীন সম্পদহীন। সেখানকার প্রান্তিক মানুষ ও তাদের প্রান্তিক জীবন এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। এখানে বৃষ্টি তেমন হয় না। কথক বলেছেন- অজন্মাকে নিয়েও যারা গান বাঁধে তাদের বেঁচে থাকা কে রুখবে। শুধু তাই নয় এই প্রান্তিক ভোলানিয়াদের লোক গানকে নিয়ে দালাল চক্রের ব্যবসা রমরমিয়ে চলে। এই অঞ্চলে বহু অন্তেবাসীর একত্র বাস। উপন্যাসে স্থান পেয়েছে গোণ্ড, ভুঞ্জিয়া, পহরিয়া, বিন্‌ঝাল আর শবরদের জীবনযাত্রা।

গোণ্ড এখানকার প্রধান প্রান্তিক জনজাতি। পৌরাণিক ঐতিহ্য, লোককথা, মিথ ও কিংবদন্তি তাদের প্রাত্যহিক সহায়। গোষ্ঠিবদ্ধ প্রান্তিক জনজাতির এগুলি প্রধান বিশেষত্ব। একসময় এখানকার সব মানুষ কৃষি নির্ভর ছিল, কিন্তু কালে কালে

কোম্পানির আমলের শেষে ব্রিটিশ শাসনকালে তারা ভূমিহারা হয়ে পড়ে। জমির মালিক হয় তথাকথিত উচ্চবর্গের মানুষরা। সঙ্গত কারণে বলা যায় তাদের প্রান্তিকতার জন্য দায়ী এইসব তথাকথিত উচ্চবিত্ত মানুষেরা। ভূমিহীন হলেও বন ছিল তাদের জীবন জীবিকার আধার ও আধেয়। বন থেকে মধু, হরিতকী, কেন্দু পাতা, শাল-সেগুনের বীজ প্রভৃতি তারা হাটে বিক্রি করত ও সংসার চালাত। কিন্তু ভিনদেশী ব্যবসায়িরা সেখানে বাঁধ সাধল। পাইকারী দামে তারা বনজ সম্পদ এই প্রান্তবাসীদের থেকে কিনে চড়া দামে বিক্রি করে নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধি করত। প্রান্তিক জনজাতি যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেল। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত বন আইন তাদের জল জঙ্গল জমি সব দিক থেকেই বঞ্চিত করল।

তাহলে ধারাবাহিক অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ একদিকে যেমন কৃষিশ্রমিকদের বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে তেমনি অন্যদিকে জঙ্গল আইন ও বনজ সম্পদের অধিকার বিচ্যুত তাদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। ফলত তারা পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হয়। কিন্তু সেখানে আরম্ভ হয়ে গেছে শোষণের নতুন চক্র। মধ্যস্বত্ত্বভোগী দালাল চক্র জালে আদিবাসী শ্রম বিক্রি হয়। জীবন বাঁচানোর তাগিদে তারা সুদচক্র বলয়ে পড়ে, পাশাপাশি শুরু হয় অল্প দাদনে বন্দুয়া মজদুরী প্রথা। এভাবেই সমগ্র উপন্যাসটি হয়ে উঠে অসহায় প্রান্তিক জনজাতির এক নিঃশব্দ প্রতিবাদের আখ্যান।

“মহানদী”(২০১৫): অনিতা অগ্নিহোত্রীর অর্ন্তবাস্তবতার এক মরমী উপাখ্যান হল “মহানদী”। ছত্রিশগড়ের ধ্মতরি জেলার সিহাওয়া পর্বতের কোন এক খাঁজ “মহানদী”র উৎসস্থল। নদীর গতিপথ বদলের সাথে সাথে উপন্যাস অবয়বে বদল এসেছে। বদলে যার দু-পাশের গ্রাম তার মানুষজন। তাই “মহানদী” উপন্যাসে আবেদন ক্রমেই হয়ে উঠেছে নদীতীরবর্তী প্রান্তিক মানুষ ও তাদের দুঃখী জনজীবনের কাহিনি। এই উপন্যাসের প্রথমেই লেখক তুলে ধরেছেন “মহানদী”র উৎসের নিকটবর্তী চন্দনবাহার গ্রামের সাতচল্লিশ ঘরের মতো আদিবাসী গোঁড় জাতির জীবনচিত্র। এই গোঁড়দের জমি নেই। দুবেলা দুমুঠো অন্নের জন্য কি খাটুনিই না খাটিতে হয় তাদের। অরণ্য সন্তান বলে জঙ্গলের ঔষধী গাছ গাছড়া তারা চেনে। তাতে কিছু রোজগার আসে। তখন নিরুপায় হয়ে কাঁধে লাঙ্গল টেনে, ভাগচাষে মহাজনের কাছে ঠকেও তাদের দীনযাপন করতে হয়।

অনিতা অগ্নিহোত্রী সচেতন শিল্পী। তাই তিনি সাহিত্যের পরাকাষ্ঠায় কখোনো আপোষ করেননি। হীরাকুদ বাঁধ যে প্রান্তিক মানুষের উপর এক উচ্ছেদ ও বিপর্যয়ের কাহিনি তা তিনি তুলে ধরেছেন জামদা অঞ্চল বর্ণনা প্রসঙ্গে। সম্বলপুরের কাছে জামদায় রাজ্যের উপবর্তী মানুষদের জন্য গড়ে উঠবে হীরাকুদ বাঁধ। তাতে দু'শ গ্রাম জলের তলে চলে যাবে। বাঁধ নির্মানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বাণী কষ্ট পেলে দেশের জন্য পাওয়া উচিত তাদের পাথেয় হয়েছে ঠিকই কিন্তু ভূমি উচ্ছেদের পুনঃবাসন নীতি

তাদের জন্য কার্যকর হয় না। সঙ্গত কারণে সমালোচক বিজয় কুমার স্বর্ণকার বলেছেন- 'দেশের স্বার্থে বলতে গেলে একটা বিশেষ শ্রেণিস্বার্থের উদ্দেশ্যে স্বাধীন ভারতে ১৯৫৬ সালে জামদা, কুঠেরপালি ইত্যাদি দুশো গ্রামের নিম্নশ্রেণির মানুষের উপর নেমে এসেছিল এক ভয়ংকর অভিঘাত। কুঠেরপালির গৌতম কালোরাই ছিল হীরাকুদ বাঁধভাসিয়েদের শেষ উদ্বাস্তু।'

"মহানদী" তার উৎস পথ থেকে যতই সামনের দিকে এগিয়েছে ততই নানা রূপ ধরা পড়েছে। সেই সঙ্গে আছে নদী তীরবর্তী প্রান্তিক জনজাতির লোকবিশ্বাস-লোকসংস্কার, আছে জনপদে অবস্থিত প্রান্তিক মানুষের শোষনের চিত্র। যেমন বৌধ জেলার পরাগলপুরের ঝরা সম্প্রদায়ের চিংড়ি মাছ অল্প মূল্যে কিনে প্রতিনিয়ত ঠকায় সেখানের ধনী মহাজন। এছাড়াও আছে সুবর্ণপুরের মেহের সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁত শিল্পীদের কথা। বৈদ্যনাথ, নিমনা, তরভা ইত্যাদি তাঁতি গ্রামগুলি সুতো মজুরীর দুর্নীতিতে ধুঁকছে। নুয়াপাটনা অঞ্চলের তাঁতশিল্পীদের অবস্থাও একইরকম। আস্তে আস্তে সুতোকলগুলি বন্ধ হয়ে যায়। হতাশায় কেউ আত্মহত্যা করে কেউবা জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকে। উপন্যাসে কর্ণতোষ সুতো রাঙানোর পটাশিয়াম নাইট্রেট খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।নদী সাতকোশিয়া অভয়ারণ্যে আরো ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। জঙ্গলের পাতা ও টালি ছাওয়া তেইশটি পরিবারের বর্ণনা আছে এখানে। অত্যন্ত কষ্টের জীবন এই আদিবাসী কন্ধদের। দারিদ্র অপুষ্টি তাদের নিত্যসঙ্গী। বনজঙ্গলের কন্ধমূল খেয়ে তাদের দিন কাটে।

উপন্যাসের অন্তিম পর্বে রয়েছে জঙ্গিরা অঞ্চলের কথা। পার্বতী কেওটের প্রসঙ্গ। "মহানদী" বঙ্গোপসাগরে মেশার আগে পারাদ্বীপ বন্দর। এখানে কেউট জেলে পরিবারের বসবাস। আগে নদী বক্ষে জোয়ারের জলে মাছ আসত, তা থেকে তাদের জীবিকা চলত কিন্তু শেষ চার বছর হল একটা সার কারখানা সেখানে গড়ে উঠেছে। সেই বিষ জলের কারণে এখন আর মাছ আসে না। ফলত এই গ্রামের বধু পার্বতী সীমান্তের পুতুল কারখানায় কাজ নেয়। সেখানে দুশ্চরিত্র শ্যামের হাতে সে ধর্ষিতা হয়। অর্থাৎ প্রান্তিক জনজাতির অসহায়তা ও নারীদের নিরাপত্তা হীনতার দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

সার্বিকভাবে "মহানদী" উপন্যাসে জেলে-মাঝি, তাঁতশিল্পী, গোঁড় জাতি কেওট-ধীবর প্রমুখ প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মানুষদের মর্মস্পর্শী বহুরৈখিক আখ্যান উঠে এসেছে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে।

খ) অনিতা অগ্নিহোত্রীর ছোটগল্পে প্রান্তিক জনজাতি: অনিতা অগ্নিহোত্রী তাঁর ছোটগল্পের এক বিস্তৃত পরিসরে প্রান্তিক জনজাতির মর্মকথা তুলে ধরেছেন। অনিতা অগ্নিহোত্রী মনে করতেন প্রান্তিকতার নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চল সীমানা হয় না। আমাদের দেশের অভাব, দারিদ্র্যে জর্জরিত যে জনসমাজ সার্বিকভাবে পিছিয়ে, তারা সকলে প্রান্তিক। তিনি তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে এই প্রান্তিক জনজাতিকে যেমন ভাবে দেখেছেন

সাহিত্যে তেমনই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তাঁর ছোটোগল্পে উপস্থাপিত প্রান্তিক জনজাতি প্রসঙ্গে উদ্ভাসিত মূল দিকগুলি হল-

১) ভূমি উচ্ছেদ নীতি প্রান্তিক জনজাতির উপর এক ভয়াবহ অভিঘাত। শিল্পায়নের লক্ষ্যে সরকারী বা বেসরকারী হস্তক্ষেপে ভূমি উচ্ছেদের ফলে ছোট মাঝারি কৃষক ও কৃষিমজুর এক বিপন্নতার সম্মুখীন হয়। অনিতা অগ্নিহোত্রী তাঁর অনেক গল্পে ভূমি উচ্ছেদ নীতির বিরুদ্ধে প্রান্তিক জনজাতির প্রতিনিধি হয়ে প্রতিবাদের কলম তুলে নিয়েছেন নিজ হাতে। তার এই শ্রেণির গল্পগুলি হল- ‘প্লাবনজল’, ‘ছায়াযুদ্ধ’, ‘অক্ষর’ প্রভৃতি

২) প্রান্তিক অঞ্চল মাফিয়া রাজের এক উন্মুক্ত পরিবেশ। ‘অন্তর্ঘাত’ গল্পে আমরা লক্ষ করি উগ্রপন্থীরা তাদের যাবতীয় কাজকর্ম বনজঙ্গল ঘেরা পরিবেশ থেকে পরিচালনা করে। অনিতা অগ্নিহোত্রী প্রশাসনিক পদে থেকে দেখেছেন সেইসব প্রান্তিক অঞ্চলে অসংখ্য সরকারী পদ খালি। সুতরাং রাষ্ট্রের পরিকল্পনা এখানে মুখ থুবড়ে পড়ে। প্রান্তিক আরো প্রান্তিক হয়। এই শ্রেণির গল্পগুলি হল- ‘অন্তর্ঘাত’, ‘অংশুঘাত’, ‘বাতাসী’ প্রভৃতি

৩) ভারতবর্ষের প্রান্তিক মানুষরা অপেক্ষাকৃত কম জটিল। অনিতা অগ্নিহোত্রীর অনেক গল্পের বিষয় এই প্রান্তিক এই সহজ সরল মানুষজন। তাদের জীবনবোধ, নূন্যতম চাহিদা সনাক্তকরণে ‘বল্‌কার ভালো দিন’, ‘অতলস্পর্শ’র মতো গল্প রচিত হয়েছে।

৪) পরিবেশ সচেতনতা অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পের প্রাণ। যার ধারক প্রান্তিক জনজাতি। বনজঙ্গল ধ্বংস নয় রক্ষা করা তাদের ধর্ম। এই শ্রেণির গল্পগুলি হল- ‘গাছ’, ‘দেওয়ালের নীচে’, ‘অতলস্পর্শ’ প্রভৃতি

৫) প্রান্তিক জনজাতির মানুষ আমাদের নাগরিক মানুষদের দ্বারা অনেক বেশি প্রতারিত ও বঞ্চিত হয়। প্রকৃতির কোলে থেকে এরা মূলত শান্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত। কিন্তু সময় বিশেষে তাদের প্রতিবাদ প্রতিরোধ লক্ষ করা যায় কয়েকটি গল্পে। এই শ্রেণির কয়েকটি গল্প হল- ‘দালাল’, ‘ছায়াযুদ্ধ’

৬) অনিতা অগ্নিহোত্রী তাঁর ‘উন্নয়ন ও প্রান্তিকতা’ গ্রন্থে নারীদের প্রান্তিক অবস্থার রূপ-প্রকৃতি তুলে ধরেছেন। সেখানে প্রান্তিক নারীর শোষণ, অসহায়তা, নিরাপত্তাহীনতা ও অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরতার কথা তুলে ধরেছেন। সেই প্রান্তিক জনজাতির শরিক নারীদের নিয়ে বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। এই শ্রেণির গল্পগুলি হল-‘উষ্মকোঠী’, ‘ভাগ্যিমানির ছবি’।

অনিতা অগ্নিহোত্রী তাঁর কথাসাহিত্যের বিস্তৃত ভুবনে স্পর্শযোগ্য মানুষদের কথা বারবার তুলে ধরেছেন। এবং তাদের তিনি কখনো অপর করে দেখেন নি, বরং প্রান্তিকতার সাথে উন্নয়নের নিবিড় সম্পর্ক তাঁর কথাসাহিত্যে প্রধান বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে।

স্বরূপ গত ভাবে তাদের চরিত্র অনুধাবন করে তিনি সমস্যার গভীরে পৌঁছেছেন ও পাঠকদের দৃষ্টিভঙ্গি আকর্ষণ করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ

- অনিতা অগ্নিহোত্রী, 'অকালবোধন', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৪০৯।
- অনিতা অগ্নিহোত্রী, 'অতলস্পর্শ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ: আগস্ট ২০১৪।
- অনিতা অগ্নিহোত্রী, 'অনিতা বিচিত্রিতা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৪১৬।
- অনিতা অগ্নিহোত্রী, উপন্যাস সমগ্র,(১ম খণ্ড) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৪২৫।
- অনিতা অগ্নিহোত্রী, 'চন্দনরেখা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৪০৩।
- অনিতা অগ্নিহোত্রী, 'ভালোবাসার গল্প', সোপান, কলকাতা বইমেলা, প্রথম প্রকাশ: ২০১৪।
- অনিতা অগ্নিহোত্রী, 'মহানদী', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২।
- অনিতা অগ্নিহোত্রী, 'মহুলডিহার দিন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম সং: ১৯৯৬।
- অনিতা অগ্নিহোত্রী, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৪২৪, ২০১৮।

সহায়ক গ্রন্থ

- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের প্রতিমা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬।
- অলোক রায় (সম্পা.), 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য', সাহিত্যলোক, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১০।
- আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: মে ২০০৯।
- জগমোহন মুখোপাধ্যায়, 'গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা', আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: আগস্ট ২০১৪।
- তপোধীর ভট্টাচার্য, 'উপন্যাসের সময়', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৯।

- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সাহিত্যে ছোটোগল্প', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ: পৌষ ১৪২৩।
- রতনতনু ঘোষ (সম্পা.), 'উত্তরাধুনিকতা', কথাপ্রকাশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১০।
- শ্রীভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্প ও গল্পকার', মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম প্রকাশ: ২০১৭-২০১৮।
- সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১০।

বিশ শতকের সাতের দশকের বেকারত্ব ও *জন-অরণ্য* উপন্যাস

মৌমিতা দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বিশ শতকের সাতের দশকের শহর কলকাতার এক অবক্ষয়িত সময়কে তুলে ধরে মণিশংকর মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ শংকরের *স্বর্গ-মর্ত-পাতাল* ট্রিলজি। সেই সময়ের কঠোর ও নির্মম বাস্তবতাকে, সমাজের ভিতরে জাঁকিয়ে বসা অবক্ষয়িত রূপকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক মণিশংকর মুখোপাধ্যায়। *জন অরণ্য* উপন্যাসের কাহিনির সময় বিশ শতকের সাতের দশক। সেই সময়ের মানুষ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বলি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ক্রমাগত সাধারণ মানুষের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল বহু মানুষ আশ্রয়ের খোঁজে চলে আসে এদেশে। যার ফলে খাদ্য ও বাসস্থানের অভাব দেখা দেয়। পূর্ববঙ্গ থেকে বহু মানুষ আশ্রয় নেয় পশ্চিমবঙ্গে। দেশভাগের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হয় এবং অর্থনৈতিক অবনমন দেখা দিতে থাকে। এরফলেই স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে বেকার সমস্যা বাড়তে থাকে। অর্থনৈতিক মন্দা কেবল নয়, খাদ্য সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যাও মাথা চাড়া দিয়ে ভয়াবহ এক রূপ নিতে থাকে ছয়ের দশক থেকে, সাতের দশকে বেকারত্বের সমস্যা ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় মানুষের সামাজিক জীবনকে। *জন অরণ্য* উপন্যাসে সেই সময়ের পূর্ণ প্রতিফলন আছে।

আমরা মূলত এই নিবন্ধে শংকরের *জন-অরণ্য* উপন্যাসে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। আমাদের দেশে মধ্যবিত্তের অপর নাম চাকরি। তা কেবল বিশ শতক নয়, বর্তমান সময়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। *জন-অরণ্য* উপন্যাসে আমরা সোমনাথ ব্যানার্জিকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে পাই। চাকরির বাজারে আকাল দেখা দেওয়ায়, সে চাকরি পায় না। বেকার সোমনাথ চেষ্টা করে যায় একটা চাকরি পাওয়ার। সোমনাথ কেবল একা নয়, তার মতন সুকুমারও বেকার। সোমনাথের পরিবারের অবস্থা স্বচ্ছল হলেও সুকুমারের তা নয়। ভবিষ্যত সম্বন্ধে একটা ভয় নিয়ে বেঁচে থাকে তারা। একসময় সোমনাথ ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ব্যবসায় অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে হতাশ হতে হয় তাকে। নটবর মিত্তির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর সোমনাথ কলকাতা শহরের অন্ধকার জগতের খোঁজ রাখতে শুরু করে। গোয়েঙ্কাকে বশ করার জন্য সে বাধ্য হয় এ কাজ করতে। আর সেই সূত্রেই খুঁজে পায় শিউলিকে, যে আসলে সুকুমারের বোন কণা। উপন্যাসের শেষে নিজের ভিতরে গ্লানি বোধ হতে থাকে তার। মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ব-দ্বিধা, মানসিকতা পেরিয়ে বেকারত্ব মানুষকে কতটা সেসময় বিপথে চালিত করে, তা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সূচক/মূল শব্দ : অবক্ষয়িত, বেকারত্ব, মধ্যবিত্ত, অবনমন, হতাশা, সাতের দশক, মূল্যবৃদ্ধি, অন্ধকার, ট্রিলজি।

মূল আলোচনা :
বিশ শতকের সাতের দশকের শহর কলকাতার এক অবক্ষয়িত সময়কে তুলে ধরে মণিশংকর মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ শংকরের *স্বর্গ-মর্ত-পাতাল* ট্রিলজি। সেই সময়ের কঠোর ও নির্মম বাস্তবতাকে, সমাজের ভিতরে জাঁকিয়ে বসা অবক্ষয়িত রূপকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক মণিশংকর মুখোপাধ্যায়। উপন্যাসের কাহিনির সময় বিশ শতকের সাতের দশক। সেই সময়ের মানুষ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বলি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ক্রমাগত সাধারণ মানুষের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল বহু মানুষ আশ্রয়ের খোঁজে চলে আসতে থাকে এদেশে। যার ফলে খাদ্য ও বাসস্থানের অভাব দেখা দেয়। পূর্ববঙ্গ থেকে বহু মানুষ আশ্রয় নেয় পশ্চিমবঙ্গে। দেশভাগের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হয় এবং অর্থনৈতিক অবনমনও দেখা দিতে থাকে। এরফলেই স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে বেকার সমস্যা বাড়তে থাকে। অর্থনৈতিক মন্দা কেবল নয়, খাদ্য সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যাও মাথা চাড়া দিয়ে ভয়াবহ এক রূপ নিতে থাকে ছয়ের দশক থেকে, সাতের দশকে বেকারত্বের সমস্যা ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় মানুষের সামাজিক জীবনকে। *স্বর্গ-মর্ত-পাতাল* ট্রিলজিতে এই সময়ের পূর্ণ চিত্র আমরা পাই।

বিশ শতকের সাতের দশক ইতিহাস তথা সাহিত্যের এক অন্যতম সময়। কলকাতা শহরে সাতের দশক এক উত্তাল সময়। একদিকে নকশাল বাড়ি আন্দোলন, অন্যদিকে ভয়াবহ বেকার সমস্যা। আবার অন্যদিকে শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকপক্ষের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে মৃত্যু সংখ্যা বাড়তে থাকে। শুধু তরুণ সমাজে নয়, সমাজের সর্বস্তরেই তখন ভয়াবহ রকমের বিভ্রান্তি, নাগরিক জীবনের অস্থিরতা এবং নৈতিক অধঃপতনের উপাদানগুলো তখন ক্রমশ সমাজের মূল কাঠামোতে প্রবেশ করছে। ভয়াবহ বেকার সমস্যায় হতাশাগ্রস্থ তরুণরা সমাজে টিকে থাকার লড়াই করতে থাকে। আবার অন্যদিকে শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন ও পরিবারের কথা ভেবে বহু মেয়ে দেহ ব্যবসায় নামতে বাধ্য হয়। সেই দিক থেকে বিশ শতকের সাতের দশক এক অস্থির সময়। ট্রিলজির সময় সম্পর্কে লেখক নিজেই বলছেন –

> ...উপন্যাসত্রয়ীর সূত্রপাত ১৯৭০ এর গোড়ায়। এর পিছনে পুরো এক দশকের নানা চিন্তা ভাবনাও জড়ো হয়ে ছিল। এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অপর নাম চাকরিজীবি। চাকরিভিত্তিক বঙ্গজীবনে যে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে, যে সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায় ও মান-অপমানের অকথিত কাহিনি হাজার হাজার মানুষের হৃদয়ে পাথরের

> মতো জমে উঠেছে সে সম্বন্ধে সাহিত্য-পাঠককে অবহিত করার জন্যই প্রথম এই কঠিন কাজে হাত দিই।[১]

অর্থনৈতিক সংকটকে কোনো এক বিশেষ দশকে সীমাবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গে সাতের দশকের আলাদা করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য থাকলেও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় পূর্ববর্তী দশকের উৎপাদন কাঠামোর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের একটি ক্রমবিকাশ মাত্র। যার ফলে সাতের দশকের সমস্যাকে সাতের দশক কেবল নয়, তারো পূর্বের বেশ কিছু দশকের প্রেক্ষিতে দেখা উচিত। স্বাধীনতার পর ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে নতুন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ হয়। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি তখন সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে। সাতের দশকের আগে ও পরে ঘটে যাওয়া ঘটনা সমাজের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। মধ্যবিত্ত মানুষ এই সময় দলগতভাবে নয়, বরং নিজের নিজের ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একদল মানুষ ব্যবসা করতে শুরু করল, যার ফলে মূল্যবৃদ্ধির বাজারে তাদের আয় বৃদ্ধি পেল। অপর এক শ্রেণির মধ্যবিত্ত, যারা চাকুরিজীবি, তারা নিজেদের প্রমোশনের মাধ্যমে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করতে থাকল। তবে এই সমস্ত সুব্যবস্থাতে সম্পূর্ণ সমাজের প্রতিটি মানুষের সুবিধা হল না। এক শ্রণির মানুষ সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে, মূল্যবৃদ্ধির বাজারে অর্থের প্রয়োজনে অন্ধকার জগতে পৌঁছে গেল।

আবার, এই সময়েই একদল তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত তরুণ শিক্ষা শেষে দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে বিলিতি কোম্পানির অধীনে মোটা মাইনের চাকরি করতে চাইছিল। যার ফলে দেশে কলকারখানা, শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞানের উন্নয়ন সে অর্থে দ্রুত গতিতে হচ্ছিল না।

> লক্ষণীয় বিষয় এই যে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্র থেকে উদবৃত্ত কৃষিশ্রমিকরা এই নবোদ্ভূত শিল্পোৎপাদনে নিজেদের স্থান করে নিতে পারল না। ...নবোদ্ভূত শিল্পকাঠামোর নামমাত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হলেও, তাদের নিজস্ব উদ্যোগে তেমন কিছু গড়ে ওঠেনি বাংলাদেশে, বিশেষত পশ্চিমবাংলায়।[২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশে শিল্প অর্থনীতির অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের ছায়ায় জাতীয় শিল্পপতিদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। যার ফলে কিছু সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত তরুণ দেশে থেকে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। তাই বিশ শতকের সাতের দশককে একেবারেই অবক্ষয়িত রূপদান করলেই হয় না। এর কিছু ভালো সুফল আমরা লাভ করতেও পেরেছি। বিভিন্ন কল-কারখানা তৈরি হওয়ায় কিছু মানুষ কাজের সুযোগ পেতে থাকে। বিজ্ঞানের নানান অগ্রগতির ফলে সেই সময় নতুন আবিষ্কারের মুখও দেখতে পায়। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ট্রিলজিতে আমরা এই সম্পূর্ণ সময়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

'একের মধ্যে তিন এবং তিনের মধ্যে এক' – ট্রিলজি প্রসঙ্গে এমন কথা শংকর বলছেন। এর অর্থ একটি সম্পূর্ণ কাহিনি তৈরি করবে তিনটি কাহিনি, আবার যে তিনটি

কাহিনি আসলেই একটি কাহিনি। বিশ শতকের সাহিত্যের ভান্ডারে নজর দিলে সাহিত্যে নানা নতুন ধারার খোঁজ আমরা পেয়ে থাকি। তেমনি একটি ধারা বাংলা সাহিত্যে এই সময়েই শুরু হয়। যে ধারায় তিনটি পর্ব তৈরি করে একটি সম্পূর্ণ কাহিনি। বাংলা তথা অন্যান্য ভাষায় এই ধারা দেখা যায়। সময়ের প্রবহমানতার সঙ্গে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। - তা এই ধারাতে দেখা যাবে। যার ফলে কেবল ট্রিলজি নয়, ট্রেটালজি, পেন্টালজি, হেক্সালজি প্রভৃতি ধারা তৈরি হয়। আবার বহু লেখক, সমালোচকগণ মনে করেন এই তিন পর্বে লেখার জন্য যে আগ্রহ তা প্রাচীন সময় থেকে চলে আসছে। কেউ আবার বলেন, এই তিন পর্বের প্রতিটি আলাদা আলাদাভাবে পাঠের উপযোগী। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এই নাম একদিকে যেমন তিন ভুবনের দিকে ইঙ্গিত করে, তেমনি ট্রিলজির নামের দ্যোতক হয়ে ওঠে। লেখক প্রথমে *সীমাবদ্ধ* রচনা করেন, তারপর *আশা-আকাঙ্ক্ষা* এবং সব শেষে *জন অরণ্য*। কিন্তু ট্রিলজিতে রূপ দেওয়ার সময় তিনি কর্মহীন সোমনাথকে আগে নিয়ে আসেন। অর্থাৎ, তিনি পাতাল থেকে স্বর্গে যাওয়ার সিঁড়ি তৈরি করেছেন।

জন অরণ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শিক্ষিত বেকার যুবক সোমনাথ ব্যানার্জি। এছাড়া আরো এক শিক্ষিত বেকার যুবককে আমরা কাহিনিতে পাই যিনি সোমনাথের বন্ধু সুকুমার। ঔপন্যাসিক 'জন-অরণ্যর নেপথ্য কাহিনি' শীর্ষক এক রচনায় স্বীকার করেছেন –

> এই উপন্যাস লেখার প্রথম পরিকল্পনা এসেছিল আমার বেকার জীবনে। সে অনেকদিন আগেকার কথা। বাবা হঠাৎ মারা গিয়ে বিরাট সংসারের বোঝা আমার মাথার উপর চাপিয়েছেন। একটা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।...একদিন এক পদস্থ ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে আমাকে বকুনি লাগালেন, 'বাঙালিরা কি চাকরি ছাড়া আর কিছু জানবে না? বিজনেস করুন না।' 'কিসের বিজনেস?' ভদ্রলোক বললেন, 'এনিথিং – ফ্রম আলপিন টু এলিফ্যান্ট।' সেই শুরু। বিজনেসে নেমে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।[৩]

মনিশংকর মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ শংকরের ব্যক্তিগত জীবন খুব কঠিন সংগ্রামের ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে রক্তাক্ত পথ পেরিয়ে পশ্চিবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায় শরণার্থীর ঢল নামে। সেই সময় থেকেই সংগ্রামের শুরু ঔপন্যাসিক শংকরের। চঞ্চল, অস্থির সেই সময়ে তিনি শর্টহ্যান্ড শিখতে শুরু করেন। লেখাপড়া ছেড়ে প্রাণপণে শর্টহ্যান্ড শিখে নেন। কিন্তু তাতেও সাতের দশকের বেকারত্বের যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্তি পান না। জীবনের শুরুতে কখনো ফেরিওয়ালা, কখনো শিক্ষকতা কখনো কেরানি হিসেবে কাজ করেছেন। আবার বিজনেস করার সূত্রে অফিসে অফিসে বাস্কেট সাপ্লাইয়ের বিজনেস করতেও শুরু করেন। বাস্কেট তৈরি কারখানায় ঝুড়ি রঙ

করতেন সিন্ধি ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলারা। তাদের জীবনকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। তাদের সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলছেন -

> ... সন্ধেবেলায় যাঁদের অন্য পেশা ছিল। দেহবিক্রয় করেও দেহধারণ কঠিন হয়ে পড়েছিল বলে এরা পার্ট টাইম কুটির শিল্পে মনোযোগ দিয়েছিলেন। তখন আমার যা বয়স, কলকাতার অন্ধকার জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছুই জানি না। এইসব স্নেহশীলা মহিলাদের সাক্ষাত-সংস্পর্শে এসে অভিজ্ঞতার এক নতুন দিগন্ত আমার চোখের সামনে উন্মোচিত হলো।[৪]

সোমনাথের বাবা দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি এক অবসরপ্রাপ্ত বি সি এস অফিসার। সোমনাথের আরো দুই দাদা ও বউদি আছেন। দাদারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। কলকাতা শহরে একতলা পাকা বাড়িতে এই হল দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির মধ্যবিত্ত জীবন। ছোট ছেলে সোমনাথকে নিয়ে খুব চিন্তিত বাবা, কারণ চাকরির বাজারে প্রবল আকাল দেখা দেওয়াতে কোনো চাকরি সে জোগাড় করতে পারে না। বেকার সোমনাথের সেই সময় একমাত্র কাজ একটা চাকরি পাওয়া। বাবা দ্বৈপায়ন ব্যানার্জিও তাই সংবাদপত্রে কোথায় চাকরির ফর্ম ফিলআপ করা যাবে বা ইন্টারভিউ দেওয়া যাবে সেগুলিতে গোল দাগ দিয়ে রাখেন। কিন্তু কোথাও চাকরি হয় না। হতাশায়, চিন্তায় দ্বৈপায়ণ ব্যানার্জি বলেন –

> আমি তো কখনো পরীক্ষায় খারাপ করিনি। নিজের চেষ্টায় কম্পিটিশনে স্ট্যান্ড করে সরকারি কাজে ঢুকেছিলাম। ওর দাদাদের জন্য কোনোদিন তো মাস্টার পর্যন্ত রাখিনি। তারা অত ভালো করল। অথচ খোকন কেন যে এত অর্ডিনারি হলো?[৫]

সোমনাথের এই ব্যর্থতায় তার পাশে সবসময় থেকেছেন বড় বউদি কমলা। ফর্ম ফিলআপের ও হাত খরচের টাকা দিয়েছেন। অন্যদিকে সোমনাথের বন্ধু সুকুমারের পরিবারের অবস্থাও স্বচ্ছল নয়। তার বাবা কেরানি, বাবার পরে দায়িত্ব সুকুমারের উপরেই বর্তায়। ভবিষ্যত নিয়ে একটা ভয় ও আতঙ্ক তাদের মধ্যে সবসময় রয়ে গিয়েছে। চাকরির চেষ্টা করতে করতে প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তারা। চাকরির জন্য ইংরেজ শাসনকেও তাই সুকুমারের সুখের মনে হয়েছে সেসময়। তাই সে বলে –

> আমি ভাই তোকে ফ্রাঙ্কলি বলছি – সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এসব কিছুই বুঝতে চাই না। যে চাকরি দেবে, আমি তার দলে – সে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌, মাও-সে-তুং হলেও আমার আপত্তি নেই।[৬]

স্বাধীনতার পরে পেটের ভাতের জোগাড় করতে না পেরে ক্লান্ত স্বরে স্বদেশিয়ানা আসে না তাদের। যদিও হাটের মাঝে রাজনীতির কথা তারা বলতে ভয় পায়। কেউ শুনলে যদি তাদের চাকরি না হয়। তারা মনে করে –

> হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজনীতির গোবর ঘেঁটে লাভ নেই। বহু ছেলে তো ওই করে ডুবেছে। তারা পলিটিকস করেছে, দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার

> মেরেছে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে পার্টি ফান্ডের জন্যে চাঁদা আদায় করেছে, ঝান্ডা তুলেছে, মিছিলে যোগ দিয়েছে, স্লোগান তুলেছে, মনুমেন্টের তলায় নেতাদের বক্তৃতা শুনেছে – ভেবেছে এই সব করলেই সহজে চাকরি পাওয়া যাবে। এখন অনেক বাছাধন ভুল বুঝতে পেরে আঙুল চুষছে।[৭]

সুকুমার মনে করে, 'তিনমাস পরে যাঁদের পেটে ভাত থাকবে না তাদের এসব কথা মানায় না।' সুকুমার নিজের চাকরি না পাওয়ার কারণ হিসেবে জেনারেল নলেজের অভাবকে দায়ী করে। তাই সে দিনরাত জেনারেল নলেজের বই পড়ে। - 'আশা ছাড়িস না। ট্রাই ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই।' অন্যদিকে সোমনাথ ভাবে চাকরির চেষ্টা না করে সে ব্যবসার কাজে যোগ দেবে। সোমনাথকে ব্যবসা করার পরামর্শ দেয় বিশুদা। বাবার অনুমতি নিয়ে ব্যবসায় উন্নতির আশায় সোমনাথ ব্যবসায় যোগ দেয়। কিন্তু ব্যবসা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা ও ব্যবসার পলিটিক্স না বোঝার কারণে সোমনাথ ব্যবসায় সফলতা লাভ করতে পারে না।

> অর্ডার সাপ্লাই লাইনের গোড়ার কথাটাই যে সোমনাথ এখনও জানে না তা আবিষ্কার করে বৃদ্ধ মল্লিকবাবু বেশ কৌতুক বোধ করলেন।[৮]

সোমনাথের না জানা নিয়ে ব্যঙ্গ করলেন মল্লিকবাবু। এরপরও বহুবার অপমানিত বোধ করেছে সোমনাথ। এইসময় উপন্যাসে সোমনাথের প্রেমিকা তপতীকে আমরা দেখতে পাই। সোমনাথের ব্যবসার কাজের মধ্যে তাকে দেখা যায়। সে প্রায় অভিযোগ করে বসে যে সোমনাথ তাকে এড়িয়ে চলছে। ভিড়ের মধ্যে রাস্তায় তপতীর আসার কথা শুনে সোমনাথ বলে – 'কলকাতা শহরটা জঙ্গলের অধম হয়ে যাচ্ছে, তপতী। বিশেষ করে এই অঞ্চলটায় কিছু গরিলা আছে।' কলেজ জীবন থেকে সোমনাথ ও তপতীর সম্পর্ক। কিন্তু কলেজ জীবনের পর থেকে সোমনাথ চাকরি খোঁজায় ব্যস্ত। অন্যদিকে তপতী ইউ জি সি ফেলোশিপ পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছে। সোমনাথ তপতীকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু বাস্তব সময় তাকে সেই স্বপ্ন পূরণ করতে দেয় না। চাকরির চেষ্টা ছেড়ে ব্যবসা শুরু করলেও সে লাভের মুখ দেখতে পায় না। তপতীর বাড়িতে বিয়ের জন্য অশান্তি হয়, তপতী সোমনাথের সঙ্গে সংসার করতে চায়। তার উত্তরে সোমনাথ নিজেকে বলে,

> যার চাকরি নেই, রোজগার নেই, তাকে এই সমাজে যে মানুষ বলা চলে না – সে যে নির্ভরের অযোগ্য – এই সামান্য কথাটা বুদ্ধিমতী তপতী কেন বুঝতে পারছে না?[৯]

সবর্ত্র হেরে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সোমনাথ। এমনি এক সময় মাওজী ব্রাদার্স কোম্পানির ক্যামিকেল ব্যবসার সুযোগ আসে তার কাছে। কাপড়ের মিলের মালিক মি. গোয়েঙ্কার কাছে তা বিক্রি করার সুযোগ খোঁজে সোমনাথ। কিন্তু গোয়েঙ্কাকে সহজে বশ করতে পারে না। এই সময় নটবর মিত্তির সঙ্গে দেখা হয়

সোমনাথের, যিনি পাবলিক রিলেশনে একজন দক্ষ। এরপরই সোমনাথ জীবনে নতূন অভিজ্ঞতার সঞ্চার করতে থাকে। কলকাতা শহরের এক অন্ধকারময় জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। সোমনাথ নারী পণ্যের বাজারে ঘুরতে থাকে। তাকে খুঁজে আনতে হয় একজন পতিতা নারীকে। নিজের শিক্ষা, রুচি, মানসিকতা, আভিজাত্য, পরিবারের মর্যাদা, সম্মানকে প্রায় বিসর্জন দিয়ে খুঁজতে থাকে একজন নারী। সে ভাবতেও পারেনি কখনো তাকে এমন একটা কাজ করতে হতে পারে, তবু সময়ের বেড়াজাল তাকে পৌঁছে দেয় সেই সময়েরই এক অন্ধকার পথে। কিন্তু এই অন্ধকার পথেই সে নিজের জীবনের আলো পেতে পারে, কারণ নটবর মিত্তিরের পরামর্শ – 'গোয়েঙ্কাকে বশ করতে হলে যে ঔষধটি প্রয়োজন তা হল নারীসঙ্গ।' প্রথমে এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেও পরে গোয়েঙ্কার শারীরিক তৃপ্তির জন্য মেয়ের সন্ধান তাকে করতেই হয়। নিজের মন সায় না দিলেও বাধ্য হয়ে কলকাতার অন্ধকার কানাগলিতে পৌঁছে যায় সোমনাথ। এ এক বিস্মিত সময়ের কথা, যে সময় কেবল অর্থ উপার্জনের জন্য ঘরের মেয়ে, বউরা নিজেদের দেহ ব্যবসায় সামিল করেছে। আর অন্যদিকে সমাজের এক শ্রেণির মানুষ টাকার বিনিময়ে তাঁদের ভোগ করছে। সোমনাথ সেই সময় দুয়ের মধ্যে থাকা মানুষ, যে নিজের ব্যবসার প্রয়োজনে সংযোগ গড়ে তুলছে। মিসেস মলিনা গাঙ্গুলি, বিধবা মহিলার দুই মেয়ে এদের বিচিত্র জীবন উঠে আসে ক্ষনিকের চিত্রের মধ্য দিয়ে। মলিনা গাঙ্গুলির স্বামী মাতাল, সে দেহ ব্যবসা করলেও সেই রাতে তাকে নেশার ঘোরে যেতে দিতে চায় না। আর ওই বিধবা মহিলা দুই মেয়েকে হোটেলের ঘরে পাঠাতে চায় না। এর মাঝেই চরণদাসকে খুঁজে পাবো, যিনি দিনের বেলায় মেয়েদের স্কুল চালান, আবার সেই মেয়েদের পড়ানোর পাশে দেহ ব্যবসাও করান। তাদেরই একজন শিউলি, তার সম্পর্কে চরণ বলে –

> গেরস্ত ঘরের মেয়ে তো, লুকিয়ে আসে। ...একেবারে নতুন – দিন কয়েক হলো লাইনে জয়েন করেছে। গেরস্ত চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে কিছু না পেয়ে এ লাইনে এসেছে।[১০]

চরণ তাকেই দেয় সোমনাথের পার্টির জন্য। শিউলিকে গাড়ি করে হোটেলে পৌঁছে দেবার সময় তার মনে হয় –

> যে নগরীকে একদা গহন অরণ্য মনে হয়েছিল সেই অরণ্যের নিরীহ সদাসন্ত্রস্ত মেষশাবক সোমনাথ সহসা শক্তিমান সিঙ্ঘশিশুতে রূপান্তরিত হয়েছে। নিরীহ এক হরিণীকে কেমন অবলীলাক্রমে সে চরম সর্বনাশের জন্যে নিয়ে চলেছে।[১১]

কিন্তু কাহিনির শেষে সোমনাথের আরো একটি দিক উন্মোচিত হয়। গোয়েঙ্কাকে খুশি করে শিউলি বেরিয়ে যাওয়ার পর নটবরের মুখে শিউলির আসল পরিচয় জানতে পারে সোমনাথ। সে জানতে পারে গোয়েঙ্কার শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিল যে শিউলি, সে

আসলে তার বন্ধু সুকুমারের বোন কণা। যে সুকুমার পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় জেনারেল নলেজ জিজ্ঞাসা করে বেড়ায়। সোমনাথ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

উপন্যাসের শুরুতে আমরা বিপন্ন তরুণ বেকার সোমনাথকে চিৎপুর রোডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাই। অর্ডার সাপ্লাইয়ের জন্য সে নিজের গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু সময়ের হতাশা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। উপন্যাসের শেষে নিজের রোজগারের পথ সে খুঁজে পায়, কিন্তু তা বড়ই অন্ধকার। দুই বন্ধু সোমনাথ ও সুকুমার একসময় চাকরির পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ দিতে দিতে ক্লান্ত বিষন্ন হয়ে পড়েছিল, নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। সেই সময় ক্রমাগত একটা জেনারেশনকে হতাশায় ডুবিয়ে দিতে থাকে। সুকুমার নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করে, অসংখ্য জেনারেল নলেজের বই পড়তে থাকে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। এবং শেষ পর্যন্ত সে পাগল হয়ে যায়। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে থাকে, এবং সকলকে ডেকে ডেকে ইন্টারভিউয়ের সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়। আর অন্যদিকে সোমনাথ চাকরির আশা ছেড়ে অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করতে থাকে, এবং চিৎপুর রোডের বহুতল বাড়ির অফিসের গোলকধাঁধাতে পড়ে যায়। নটবর মিত্তির সঙ্গে আলাপের সুবাদে পথ পায় তা এক অন্ধকারময় পথ। অর্ডার পাওয়ার জন্য নারীলোভী ব্যবসায়ীর চাহিদা মেটাতে আগে কলগার্ল সাপ্লাই করতে হবে। তবেই অর্ডার পাওয়া সম্ভব। তাই উপন্যাসের শুরুতেই বিষন্ন, হতাশায় জর্জরিত সোমনাথ প্রায় বাধ্য হয়ে বিবেকের কথা না শুনে সেই পথেই এগোতে থাকে।

উপন্যাসের শেষে আমরা দেখতে পাই, এক মাড়বারনন্দনকে মেয়ে সাপ্লাই করে অর্ডার পেয়েছে সোমনাথ। ঠিক তার পরের মুহূর্তে সে জানতে পারে সেই মেয়ে শিউলি আর কেউ নয় তার বন্ধু সুকুমারের বোন কণা। সেই সময়, পেটের দায়ে বাধ্য হয়েছিল ঘরের মেয়েরা নিজের সম্মান, সভ্রমকে বিসর্জন দিয়ে, অন্ধকার রাস্তা বেছে নিতে। কিন্তু এই আকস্মিক আঘাতের পরে সোমনাথ বিবেকের দংশনে প্রায় শেষ হয়ে যেতে থাকে। নারী উপভোগকারী গোয়েঙ্কা শিউলি অর্থাৎ কণাকে হোটেলের ঘরে ভোগ করার পর খুশি হয়ে সোমনাথকে প্রতিশ্রুত অর্ডার সাপ্লাইয়ের চিঠি দিয়ে দেয়। নিয়মিত কেমিক্যাল সাপ্লাইয়ের কাজ ও টাকা পেয়ে যায় সে। প্রতিষ্ঠিত এক তথাকথিত সমাজের বেকারের তকমা মুছে যায় তার গা থেকে। কিন্তু সে বিবেকবর্জিত এক জীবে পরিণত হয়। না, এর জন্য সে দায়ী ছিল না। দায়ী ছিল সেই সময়ের সমাজ। অনটনের অভাব ঘোচে পরিবারে, হয়তো দেহ ব্যবসায় নেমে কণাও পারে পরিবারের স্বচ্ছলতা আনতে। কিন্তু সময়ের জটিলতায় হারাতে থাকে নীতি, বোধ, মান, সম্মান, বিবেক। সোমনাথের সাফল্যে সকলে খুব খুশি হয়। কেমিক্যাল সাপ্লাই করে নিশ্চিত অর্থ উপার্জন করতে পারবে সে। বউদির জন্য শাড়ি নিয়ে এসেও, বারণ করেছে বউদিকে ওই শাড়ি পরতে।

> বউদি, ওই কাপড়টা আপনি পরবেন না। ...সকালে যখন কিনেছিলাম তখনো বেশ পরিস্কার ছিল। এই সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ নোংরা হয়ে গেল। ওতে অনেকরকম ময়লা আছে বউদি - আপনি পরবেন না![১২]

কিন্তু কেন বারণ করল পরতে সে কথা কাউকে জানতে দেয় না। মধ্যবিত্ত সৎ, নিষ্পাপ, শান্ত মানুষটি সময়ের বেড়াজালে অন্ধকার জীবনের সঙ্গী হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

জন অরণ্য উপন্যাসকে বিশ শতকের সাতের দশকের বিক্ষুব্ধ ও নৈরাশ্যময় সময়ের এক দলিল বলা যেতে পারে। উপন্যাসে শিক্ষিত যুবকদের করুণ অবস্থাকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। বেকারত্বের জ্বালায় শিক্ষিত তরুণরা কিভাবে ক্রমশ একটা অন্ধকার জগতে পৌঁছে যায়, সেই কাহিনি ফুটে উঠেছে। লাঞ্ছনা, অপমানের ভয় আর তাদের আটকাতে পারে না, তারা বেকারত্বের বেড়াজাল ছিঁড়তে মরিয়া হয়ে ওঠে। কেউ কেউ হতাশায় ভেঙে পড়ে বাধ্য হয় নিজস্ব ন্যায়-নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধকে ত্যাগ করতে। কারণ, বেঁচে থাকার জন্য, পরিবার পরিজনদের জন্য, মা-বাবার প্রত্যাশা পূরণের জন্য – তারা বাধ্য হয় নোংরা পথ বেছে নিতে। তাই উপন্যাসের চরিত্র কেবল নয়, সাতের দশকের শিক্ষিত বহু বেকার তরুণদের বেছে নিতে হয়েছিল নোংরা কোনো এক কাজের জগতকে। অন্যদিকে প্রায় সমস্ত মা-বাবা নিজের নিজের সন্তানদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তায় নিমজ্জিত ছিলেন। কেউ ব্যক্তিগতভাবে কেবল নিজের সন্তানের চাকরি ও সুখের চিন্তার মগ্ন থেকেছেন। কেউ বা আবার সেই সময়ের রাষ্ট্রবিরোধী সংগ্রাম ও সামাজিক ভয়াবহ পরিবেশ থেকে সন্তানকে বাঁচাতে চেয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১) মুখোপাধ্যায়, মণিশংকর (শংকর), *স্বর্গ-মর্ত-পাতাল,* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩, লেখকের জবানবন্দি

২) আচার্য, অনিল, *সত্তর দশক(খন্ড এক),* অনুষ্টুপ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৩০

৩) মুখোপাধ্যায়, মণিশংকর (শংকর), *স্বর্গ-মর্ত-পাতাল,* দেজ পাবলিশিং, ২০১৩, পৃষ্ঠা – ২০৫

৪) তদেব, পৃষ্ঠা – ২০৬

৫) তদেব, পৃষ্ঠা – ৭১

৬) তদেব, পৃষ্ঠা – ৪৬

৭) তদেব, পৃষ্ঠা – ৪৬

৮) তদেব, পৃষ্ঠা – ১১৯

৯) তদেব, পৃষ্ঠা – ১৭২

১০) তদেব, পৃষ্ঠা – ১৯৫

১১) তদেব, পৃষ্ঠা – ১৯৬

১২) তদেব, পৃষ্ঠা – ২০২

লোকসাহিত্য বনাম শিশু সাহিত্যের ইতিকথা

শম্পা লাহা
সহকারী অধ্যাপক, পাঁচথুপী হরিপদ গৌরীবালা কলেজ
মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপঃ শৈশব আর কৈশোর এই নিয়ে আমাদের ছেলেবেলা, লিঙ্গান্তরে মেয়েবেলা।দায়-দায়িত্বহীন রূপকথা সেবিত রঙিন স্বপ্ন ঘেরা জীবনের এক আশ্চর্য সময়।এ হল সেই ছেলেমানুষের কাল যখন পাওয়া না পাওয়ার আনন্দ বেদনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে আমাদের অবুঝ মন। কল্পনার লঘুপক্ষে ভর দিয়ে এই সময়েই সম্ভব হয়ে ওঠে আমাদের খেয়ালী মনের অবাধ বিচরণ। নিজেকে হারিয়ে ফেলে আবার নতুন করে খুঁজে পাওয়ার উল্লাসেই শিশুবেলা আত্মবিভোল। এই সময়টা যেন মেঘ মুলুকের ঝাপসা রাজ্য। সেই রাজ্যের সীমানার মধ্যে যত অসম্ভবের অপ্রতিরোধ্য হাতছানি। তারপর সময়ের নিয়মে একদিন হঠাৎ করেই বড় হয়ে যাই আমরা। জীবনের সাফল্য লাভের ইঁদুর দৌড়ে সামিল হতে বাধ্য হই। ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় আমাদের শৈশবের স্বপ্নপুরী। এই স্বপ্নপুরীর কথাই এ প্রবন্ধে আলোচ্য।
সূচকশব্দঃ শিশু, লোকসাহিত্য, রায়, উপেন্দ্রকিশোর, রূপকথা।

মূলপ্রবন্ধঃ
শৈশব আর কৈশোর এই নিয়ে আমাদের ছেলেবেলা, লিঙ্গান্তরে মেয়েবেলা।দায়-দায়িত্বহীন রূপকথা সেবিত রঙিন স্বপ্ন ঘেরা জীবনের এক আশ্চর্য সময়।এ হল সেই ছেলেমানুষের কাল যখন পাওয়া না পাওয়ার আনন্দ বেদনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে আমাদের অবুঝ মন। কল্পনার লঘুপক্ষে ভর দিয়ে এই সময়েই সম্ভব হয়ে ওঠে আমাদের খেয়ালী মনের অবাধ বিচরণ। নিজেকে হারিয়ে ফেলে আবার নতুন করে খুঁজে পাওয়ার উল্লাসেই শিশুবেলা আত্মবিভোল। এই সময়টা যেন মেঘ মুলুকের ঝাপসা রাজ্য। সেই রাজ্যের সীমানার মধ্যে যত অসম্ভবের অপ্রতিরোধ্য হাতছানি। তারপর সময়ের নিয়মে একদিন হঠাৎ করেই বড় হয়ে যাই আমরা। জীবনের সাফল্য লাভের ইঁদুর দৌড়ে সামিল হতে বাধ্য হই। ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় আমাদের শৈশবের স্বপ্নপুরী।

শিশু, ছোট্ট একটি শব্দ অথচ বিশাল তার ব্যঞ্জনা। অথচ 'শিশুসাহিত্য' বলে ঠিক কোন ধরনের সাহিত্য সম্ভারকে চিহ্নিত করা হবে এই নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হলেও ইংরেজিতে'জুভেনাইল লিটারেচার' যে ব্যাপক অর্থ বহন করে, বাংলায় 'শিশুসাহিত্য'শব্দবন্ধ ঠিক সেই অর্থবাহী নয়। প্রকৃতপক্ষে শিশু যাদের বলা হয়, তারা সাহিত্যের রস গ্রহণেই সক্ষম নয়, কারণ যেসব ছেলে ভুলানো ছড়া, রূপকথা বা

ঘুমপাড়ানি গল্প তারা মা-ঠাকুমাদের মুখ থেকে শুনে আনন্দ পায় সেগুলি মূলত লোকসাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে 'শিশুসাহিত্য' হিসেবে দাবি করতে পারে একমাত্র সেই রচনা যা শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত এবং যাতে শৈশবের রস উপস্থিত। প্রাচীনকাল থেকেই শিশুদের আনন্দদানের জন্য ছিল মৌখিক সাহিত্যের পথ। বাংলাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। যদিও বাংলায় উনিশ শতকের পূর্বে শিশুদের জন্য কোন শিক্ষামূলক গ্রন্থই রচিত হয়নি, সাহিত্যমূলক গ্রন্থ তো দূরের কথা। অবশ্য শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরীর মতে,'আসলে ছেলেরা ভালবাসে শুধুই রূপকথা......সরূপকথাও নয়, অরূপকথাও নয়, অর্থাৎ জ্ঞানের কথাও নয়, নীতির কথাও নয়।.......আমরা যে শিশু সাহিত্য রচনা করতে পারিনে, তার কারণ আমরা চেষ্টা করলেও রূপকথা তৈরি করতে পারি নে।' [১]

তার কারণটাওস্পষ্ট।একেবারে সদ্যোজাত শিশুর সাহিত্য জ্ঞান থাকেন। বছর চারেক বয়স অবধিও তার সেই অর্থে রসবোধ যেহেতু জন্মায় না সেহেতু লিখিত সাহিত্য তার কাছে অপ্রয়োজনীয়। তার জন্য চাই মা-ঠাকুমাদের মুখের রূপকথা অথবা ঘুমপাড়ানি গান। তার পরের ধাপে নানা ধরনের ছড়া, ব্রতকথা ও রূপকথার গল্প বাংলাদেশ বহু আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। মূলত শ্রুতি নির্ভর এসব গল্পগুলির কথক ছিলেন দাদু-দিদিমা অথবা ঠাকুরমা-ঠাকুরদারা। বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক পরিস্থিতি ছিল এসবের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ পরিসরটি মোটেও ছোট নয়।

ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি এবং লোকায়ত ছড়ার ছন্দে যার সূচনা এবং ক্রমে জাতকের কথা, পঞ্চতন্ত্রের কথা, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগরের মধ্যে দিয়ে কালপ্রবাহে তার অগ্রগমন। বাংলা শিশুসাহিত্যের আদি মাধ্যম ছিল প্রাচীন রূপকথা এবং ছড়া, যেগুলি মৌখিক পরম্পরায় সঞ্চারিত হত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। যদিও বাংলা রূপকথার সঙ্গে যে নামগুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেগুলো হলো দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুখলতা রাও, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। লোকসাহিত্য বনাম শিশু সাহিত্যের এই ইতিকথাই এই প্রবন্ধের পরবর্তীতে আমার আলোচ্য।

বাংলা রূপকথার সঙ্গে যে নামটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা হলো দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। তিনি গ্রাম বাংলার পথ-প্রান্তর থেকে রূপকথাগুলো সংগ্রহ করে নিজস্ব ভঙ্গিতে সংকলিত করেছিলেন যেটি 'ঠাকুরমার ঝুলি' নামে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৭ সালে, দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মাধ্যমে, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স পাবলিকেশন থেকে। অর্থাৎ আদিকালের শিশুসাহিত্য বলতে যা বোঝাত তা ছিল মূলতলোকজ উৎসজাত এবং সংস্কৃত আরব্য ও পারস্য গল্প কাহিনী থেকে গৃহীত। কিছু উপকরণ এসেছিল বিদেশি 'ঈশপ ফেবলস' ও ক্রীলফের নীতিগল্প থেকে। তবে এগুলো মূলত শ্রুতিনির্ভর। প্রথম লিখিত শিশুসাহিত্য সৃষ্টি করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। তাঁরা ছিলেন মূলত শিক্ষাবিস্তারের কাজে অগ্রণী, ফলে তাঁরা

রচনা করলেন পুরাণাশ্রয়ী আখ্যান, সংস্কৃত এবং ইংরেজি থেকে অনুবাদ গ্রন্থ। তবে এগুলোর বেশিরভাগই ছিল নীতিকথামূলক। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত অধিকাংশ শিশুসাহিত্যের মূল লক্ষ্যই ছিল নীতি ওশিক্ষাপ্রচার। মৌলিক, শিশুদের মনোরঞ্জনকারী, শিশুসাহিত্যের সূত্রপাত হয় কেশবচন্দ্র সেনের 'বালকবন্ধু' (১৯৭৮) প্রকাশিত হবার পর।

শিশুসাহিত্যকে স্কুলের বাইরে পাঠযোগ্য করে তোলার প্রবণতা প্রথম দেখা যায় যোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর হাত ধরে। তারপর একে একে আমরা অনেক খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিককে দেখতে পাই এগিয়ে আসছেন শিশুসাহিত্য রচনায়। তবে সূত্রপাত সেই প্রথম। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' (১৮৯৯) গ্রন্থটির ভূমিকায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্যটিতে মেলেএর সমর্থন। “বাঙ্গালাতে এইরূপ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশক 'শ্রীযুত' যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে সেই অভাব দূর করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তিনিই বাঙালির মধ্যে এই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক।”(২)

রামেন্দ্রসুন্দর ভূমিকায়ছড়াকে 'শিশুসাহিত্য'বা 'ছড়াসাহিত্য' বলে উল্লেখ করেছেন। আবার সর্বপ্রথম বাংলায় 'শিশুসাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (১৮৯৪ খৃঃতে' ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে)। যদিও খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় 'খুকুমণির ছড়া'র অধিকাংশ ছড়াকে শিশুসাহিত্যের পর্যায়ে ফেলবার পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে শিশুসাহিত্যের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ আলাদা।

কেবল সাহেবরাই নয়, শিক্ষিত ভারতীয়রাও নিজের দেশেজ সম্পদ সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। রেভারেন্ড লালবিহারী দে প্রকাশ করেছিলেন 'বাংলার কৃষি জীবন' নামে একটি ইংরেজি বই। শম্ভুর মা নামে এক বৃদ্ধা রোজ সন্ধ্যায় গল্প শোনাতো গোবিন্দ নামক একটি ছেলেকে। সেই বই পড়ে সাহেবরাও মুগ্ধ হন। পরে বইটি নজরে আসে এক খ্যাতনামা ভারতীয় প্রশাসক স্যার রিচার্ড টেম্পলের পুত্র ক্যাপ্টেন আর কে টেম্পেলের।গল্প পড়ে মুগ্ধ টেম্পল সাহেব রেভারেন্ড লালবিহারী দে কে অনুরোধ করেন এদেশের মা-দিদিমা- ঠাকুমারা যেসব গল্প শুনিয়ে বাচ্চাদের মন জয় করে সেরকম গল্প সংগ্রহ করে যদিদু-মলাটে প্রকাশ করা যায়। কথা রেখেছিলেন লালবিহারী দে। গল্প সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন 'ফোকটেলস অফ বেঙ্গল' নামক অনন্য বইটিতে। বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদার। পরবর্তীকালে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার বহু স্থান ঘুরে ঘুরে প্রকাশ করেন 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদার ঝুলি', নামক ময়মনসিংহের রূপকথাগুলি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেনঃ “ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এতবড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কী আছে”(৩)

লোককথা সংগ্রহের আরএকটি সংযোজন হলো একে রামানুজনের 'ফোকটেল সঅফ ইন্ডিয়া''। তিনি ভারতে থাকার সময় এ সমস্ত লোককথাগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। এই গ্রন্থে ভারতের প্রায় সব কটি রাজ্যের শতাধিক লোককথা স্থান পেয়েছে। এছাড়া শোভনা দেবীর 'ওরিয়েন্টাল পার্লস' রূপকথার এক অনন্য সংকলন। দক্ষিণারঞ্জনের অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্যে আরো অনেক রূপকথা (লোককথার মধ্যে রূপকথাই আকারে দীর্ঘতম। রূপকথার মধ্যে কথকের ব্যক্তিগত মানসিকতা জুড়ে যায় বলেই তার আকার বাড়ে। এছাড়া মূল গল্পের সঙ্গে অনেক উপকাহিনী জুড়ে দেবার সুযোগ রূপকথাতে থাকে বলেও একই রূপকথা বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায় বিভিন্ন আকারে।) সংযোজিত হয়েছিল।এই গ্রন্থগুলির মধ্যে শান্তা দেবী ও সীতা দেবী রচিত 'হিন্দুস্থানী উপকথা', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'উপকথা', মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জাপানি ফানুস', 'ঝুমঝুমি', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা দিয়ে আঁকা রূপকথার গল্পগুলি অন্যতম। তবে এই বর্গের গল্প গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হলো উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'।

শিশুদের জন্য লেখার প্রথম নিদর্শন বলা যায় পন্ডিত বিষ্ণু শর্মার'পঞ্চতন্ত্র'কে। সম্ভবত গুপ্তযুগের কোন সময়ে দাক্ষিণাত্যের মিথিলা রোপ্য নগরের রাজা তাঁর তিন মেধাহীন, অমনোযোগী পুত্রের শিক্ষক রূপে ব্রাহ্মণ পন্ডিত বিষ্ণুশর্মাকে নিযুক্ত করেন। তিনি পাঁচটি অধ্যায়ে 'পঞ্চতন্ত্র' রচনা করে কুমারদের শিক্ষিত করে তোলেন। এভাবে শিশুশিক্ষায় নীতির প্রবেশ ঘটে। 'পঞ্চতন্ত্র' একাধারে আনন্দ ও উপদেশ দান করেছে। তবে নীরসভাবে নয়, জীবজন্তুও মানুষের জীবনকে আশ্রয় করে এখানে সাহিত্যরস পরিবেশিত হয়েছে। এরপরে রচিত 'বৌদ্ধ জাতক' বা নারায়ণের 'হিতোপদেশ' এ শিশুর আনন্দের কিছু উপাদান থাকলেও এগুলো মূলত নীতিপ্রধান। আবার কালিদাসের 'মেঘদূত’ এ আছে উদয়নের গল্প যাআবালবৃদ্ধদের মন জয় করে এসেছে প্রাচীন কাল থেকে। আবার সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' এ আছে সম্ভব-অসম্ভবের জগৎ পার হওয়া রূপকথার সংকলন। কিন্তু আধুনিককালের শিশুর যে কল্পনা বিলাসী মন স্বপ্ন দেখে, তাদের নিয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য রচনারসন্ধান পাওয়া যায়না। উক্ত গ্রন্থ গুলিতে শিশুর বোঝার মত কিছু বিষয় থাকলেও এগুলিকে যথার্থ শিশুসাহিত্য বলা চলে না।

এরপর মুসলিম শাসনের যুগে আরবী-পারসিকদের সাহিত্যের সঙ্গে ভারতের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। বাংলাতেও তার প্রভাব পড়ল। এইসময় ফার্সী কিসসা রূপে এল 'গুলেবকাওলী', 'হাতেম তাই','বাহার দানেশ' প্রভৃতি গল্প। এগুলোরও অনেক অংশ শিশুদের উপযোগী না হলেও শিশুর মনকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। আর মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের আগে বাংলাদেশেএই ছিল শিশু সাহিত্যের নিদর্শন।

এমন সময় সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।ঊনবিংশ শতকের সেই সময় বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে ধীরে ধীরে বদল আসছে।একদিকে যেমন ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে জাতীয়তাবোধের জন্ম হচ্ছে,

তেমনি হিন্দু পুনরুত্থান বাদের প্রভাবেদেশের সাহিত্যিক উপাদানও আলোচিত হচ্ছিল নতুন করে। সমালোচকের ভাষায়ঃ

> 'গ্রামীণ লোকমানসজাত যেসব সাহিত্য ভাণ্ডার পরাক্রান্ত নাগরিক উন্নাসিকতার জুজুর ভয়ে কুঁকড়ে গেছিল, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য নুতন এক ঔদ্ধত্যের চাপে তলিয়ে যেতে যেতে হয়ে গেল প্রায় খনিজ সম্পদ।' (৪)

কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে দেখা দিল এই অবস্থার পরিবর্তন। বয়স্ক-পাঠ্য সাহিত্যের পাশাপাশি এ সময় থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই অবস্থায় যেসব শিশুসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকে ভিত্তি করে লেখা কাহিনীর সংখ্যা প্রচুর। সে সময়ের শিক্ষিত, চিন্তাশীল বাঙালির মতো শিশু সাহিত্যিকরাও মনে করতে শুরু করেছিলেন যে, ছোটরাযারা ভবিষ্যতের নাগরিক, তাদের প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যসমূহের সঙ্গে পরিচয় না করালে তাদের শিকড় তৈরি হবে না। তাই তাঁরা সরল ভাষায় সহজ করে প্রাচীন সাহিত্যকে লিখেছেন ছোটদের জন্য। পুরোনোকে নতুন করে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য তাঁরা ব্যবহার করেছেন নতুন ভঙ্গী।এই কাহিনীগুলির আকর্ষণী ক্ষমতা,মানবিক গুণের প্রকাশ যে ছোটদেরও ভালো লাগবে--- একথা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরও রচনা করেছিলেন 'ছেলেদের রামায়ণ','ছোট্টরামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত','মহাভারতের গল্প','পুরাণের গল্প', 'টুনটুনির বই''।

শিশু সাহিত্যের বিশ্বে এতদিন জার্মানির গ্রিম ভাইয়েরা, ডেনমার্কের হান্স ক্রিশ্চিয়ান আন্ডারসন, ইংল্যান্ডের লুইস ক্যারল এবং রাশিয়ার মার্শ্যাক নিয়ে এসেছিলেন উপকথা বা রূপকথার গল্প। আর 'টুনটুনির বই' তে উপেন্দ্রকিশোর নিয়ে এলেন মোট ২৭ টি গল্প। নিতান্ত সংক্ষিপ্তাকার এই গল্পগুলো লিখতে গিয়ে তাঁকে কোন পাশ্চাত্য লোককথা, উপকথাবা রূপকথার দ্বারস্থ হতে হয়নি। 'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশে উপেন্দ্রকিশোর জানিয়েছেনঃ'সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহারনাকরিয়াইঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের স্নেহরূপিণী মহিলাগণ এই গল্পগুলিবলিয়াতাহাদের জাগাইয়া রাখেন। সেই গল্পের স্বাদশিশুরাবড়হইয়াও ভুলিতে পারে না। আশা করি, আমার সুকুমার পাঠক-পাঠিকাদেরও এই গল্পগুলি ভালো লাগিবে।' (৫)

বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম মাধ্যম ছিল প্রাচীন রূপকথা ও ছড়া এবং এগুলির মৌখিক পরম্পরা। তবে বাংলা রূপকথার সঙ্গে যে নামটি স্মরণে আসে সেটি হল দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। তিনিগ্রাম বাংলার পথপ্রান্তরথেকেরূপকথাগুলি সংগ্রহ করে নিজস্ব সংকলিত করেছিলেন বইটি।সেটি'ঠাকুরমার ঝুলি' এই নামে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৭ সালে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মাধ্যমে,'ভট্টাচার্য এন্ড সন্স',

পাবলিকেশন থেকে। 'কাঞ্চনমালা', 'মালঞ্চমালা', 'শঙ্খমালা', 'পুষ্পমালা' র গল্প..... যে গল্পগুলি দক্ষিণারঞ্জন সংগ্রহ করেছেন গ্রাম বাংলার পথ প্রান্তরথেকে। 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদার ঝুলি', 'ঠানদিদির থলে' দক্ষিণারঞ্জনের সাফল্যে, রূপকথার জনপ্রিয়তায় অনুপ্রাণিত হয়ে এ জাতীয় বইআরো লেখা হয়েছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে সংগ্রহের কাজ। প্রকাশিত হয়েছে চণ্ডীচরণ গুপ্তের 'ঠাকুরমার রূপকথা', কালীমোহন ভট্টাচার্যের 'ঠাকুরদাদার রূপকথা',শ্যামাচরণ দেএর 'বঙ্গের রূপকথা', সত্যচরণ মিত্রের 'ঠাকুরমারঝোলা', ও শিবরতন মিত্রের 'সাঁজের কথা''। যদিও সব টুকু আলোকেড়ে নিয়েছিল দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি'। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা নিশ্চিত ভাবেই এবইয়ের গুরুত্ব বাড়িয়েছিল। নিজস্ব স্বকীয়তাতেও উজ্জ্বল ছিল তাঁর লেখা।সেউজ্জলতা সময়ের ব্যবধানেও ফিকে হয়ে যায়নি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার রচনাসমগ্র (মিত্র ও ঘোষ) বইটির ভূমিকায় বারিদবরণ ঘোষ লিখেছেনঃ"গ্রাম বাংলায়সেই দামাল ছেলে (দক্ষিণারঞ্জন) হারিয়ে যাওয়া, প্রায় অবহেলিত; এক সম্পদকে উদ্ধার করার কাজে আত্মোৎসর্গ করলেন। ঢাকা ওময়মনসিংহের নিভৃত পল্লীর ঠাকুমাদের বলিরেখা, গ্রাম বৃদ্ধের কথকতার অসামান্য ভঙ্গি দক্ষিণারঞ্জনের সংগ্রহের পুস্তকে কালির আঁচড় কাটতে লাগল। একই গল্পবারবার বিভিন্ন জনের মুখে শুনে ছাঁটাই, বাছা, পরিবর্জন, পরিমার্জন করেছেন। করেছেন শ্রেণীবিভাগও। গীতিকথা, ব্রতকথা,রূপকথা ও রসকথা--- এই চতুর্বর্গে।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কী আছে? মাতৃদুগ্ধ একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলই ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে? যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতেদীনতম কৃষককে পর্য্যন্ত বুকে করিয়ে মানুষ করিয়াছে---- সকলকেই শুভ সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়াভুলাইছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের এই চিরপুরাতন গভীরতমস্নেহহইতেএইরূপকথা উৎসারিত। দক্ষিণারঞ্জন বাবুকে ধন্যবাদ। তিনি ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়াপুঁতিয়াছেন, তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনিই সবুজ, তেমনি তাজাইরহিয়াছে।"[৭]

মিত্র ও ঘোষ কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রওবলেছেনঃ 'দক্ষিণারঞ্জনের এই রচনাগুলির মত শিশুদের মনের সম্পদ আর কিছু হতে পারে না।'[৮]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও আর এক রূপকথাকার। তাঁর 'ক্ষীরের পুতুল' ওএক অনবদ্য রূপকথা। যদিও এর কাহিনী মৌলিক নয়, তবু অবন ঠাকুরের নতুন নির্মাণে সেটি এক অপরূপ রূপ কথারই মাত্রা পেয়েছে। তাঁর 'কানকাটা রাজার দেশ' ও রূপকথার রসে টইটুম্বুরএক উজ্জ্বল আখ্যান।এ প্রসঙ্গেগগন ঠাকুরের ভোঁদড় বাহাদুরের কথা মনে পড়ে।

অবনীন্দ্রনাথেরই কলম দিয়ে বের হয় 'ক্ষীরের পুতুল'(১৮৯৬), 'রাজকাহিনী' (১মখন্ড১৯০৯), 'ভূতপতরীরদেশ'(১৯১৫), 'নালক' (১৯১৬), 'রাজকাহিনী' (দ্বিতীয় খন্ড১৯৩১), 'বুড়োআংলা' (১৯৪১) ইত্যাদি ছোটদের জন্য লিখেগেছেন একের পর এক। কিছু বই অবশ্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর।'হংসনামপালা' (১৯৫১), 'মারুতিরপুঁথি'(১৯৫৬), 'চাঁইবুড়োর পুঁথি'(১৯৫৯),'হানাবাড়ির কারখানা' (১৯৬৩), 'যাত্রাগানে রামায়ণ' (১৯৬৯),'বাদশাহী গল্প' (১৯৭১) ইত্যাদি। এসত্যঅবশ্য স্বীকার্য যে অধিকাংশ বইই তাঁর মৌলিক রচনা নয়, দেশি-বিদেশি গ্রন্থের অনুবাদ।রূপকথা- মিথ-কিংবদন্তি ছাড়াও সংস্কৃত সাহিত্য, পুরাণ, ইতিহাস, বুদ্ধদেবের জীবন ইত্যাদি অবলম্বনে তিনি ছোটদের জন্য লিখেছেন বিস্তর।'শকুন্তলা' পৌরাণিক কাহিনী, 'ক্ষীরেরপুতুল' রূপকথা, 'রাজকাহিনী' ইতিহাস, 'নালক' গৌতম বুদ্ধের গল্প, 'খাতাঞ্চিরখাতা'য়ইংরেজি গল্পপিটারপ্যানের ছায়া, ' বুড়োআংলা'সেলমালাগেরলাফেররচিত একখানি বইকে অবলম্বনে লেখা, 'আলোর ফুলকি' ফরাসি লেখকরোস্তাঁদের গল্পের নতুন রূপ।

১৩১৫ বঙ্গাব্দে পরমেশ প্রসন্ন রায়ের 'মেয়েলি ব্রতকথা'র ভূমিকা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা লোকসাহিত্য চর্চারক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। লোককথাকেও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নানাভাবে গ্রহণ ও স্বীকার করেছেন। কখনো কোনও প্রচলিতও ঐতিহ্যমূলক লোককথাকেও তিনি পূনর্গঠনের জন্য নিয়েছেন, কখনো নিজেরই কোন কল্পিত কাহিনীকে বর্ণনা করেছেন লোককথার ঢঙে, কখনোবা ঘটিয়েছেন নানা রীতির মিশ্রণ।

প্রথম গদ্যরচনা 'শকুন্তলা'যাতে প্রেরণা জুগিয়ে ছিলেনস্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।এতে খুব সহজ-সরল ভাষায় প্রকাশ পেয়েছেমিলন ও বিরহ। রচনার সূত্রপাতওরূপকথারা আদলেই।এক অখণ্ড প্রকৃতির রূপআমাদের চোখের সামনে ভাসিয়ে। নদীতীর, টিয়া পাখির ঝাঁক, সবুজ মাঠ, রাখাল-ঋষি সবকিছুকে মিলিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন এক রঙিন চলচ্চিত্র। রূপকথার আদলে লেখায গল্পটিতে আছে গ্রামীণ সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার কথা। আছে গ্রামীণ মানুষের জীবিকার আভাস। শিশুসাহিত্যের পরমাশ্চর্য এই জাদুকর তাঁর 'বুড়ো আংলা' গল্পেও ঘটিয়েছেন রূপকথার প্রতিফলন।শিশুরমননিয়ে পৃথিবীকে দেখেছিলেন তিনি, দেখেছিলেন বিস্ময়ের চোখে, আর এই বিস্ময়কেই তিনি বারবার রূপ দিয়েছেন তাঁর লেখায়।'ক্ষীরের পুতুল'ওএর ব্যতিক্রম নয়। এটি আবার বিশুদ্ধ রূপকথারই গল্প। তাঁর মূল রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর কাছ থেকে অবনীন্দ্রনাথের সংগ্রহ করা। তবে বইটির প্রথম দিকরূপকথারঢঙেলিখিত হলেও শেষের দিকে ষষ্ঠী দেবীর মাহাত্ম্য কিছুটা প্রচারিত হয়েছে।

আবার রূপকথার অন্তরালে কল্পনার মুক্তি বস্তুটি সুখলতা রাওর গল্পেলক্ষ্য করা যায় আশ্চর্য রকম ভাবে।তাঁর 'ফুলরাণী' গল্পটিতে যখন বন্ধু চড়াই পাখির পিঠে করে ফুলরাণী যাত্রা করে তখন শিশুর কল্পনাপ্রবণমনেরও মুক্তি ঘটে। শিশুরা মনের পথ ধরে পাড়ি দেয়, ---'ঝড় উঠেছে, মেঘ করেছে আকাশে। মা এসে কোনিআর বাদলকে তাড়াতাড়ি উঠিয়ে নিয়ে গেলেন ঘরে। খেয়েদেয়ে বিছানায় শুয়ে জানলা দিয়ে বাদল দেখছে, আকাশ ছেয়ে প্রকাণ্ড কালো একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া যেন প্রকাণ্ড কালো ডানা মেলে ছুটে আসছে ঝড়ের আগে; তার পায়ের খুরের গায়ে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে।সাঁইসাঁইশব্দেঝড়ও ছুটেছে, ধুলোয় ধুলোয় চারিদিকঢেকে। গাছপালানুইয়ে পড়ছে তার দাপটে। ভেঙে পড়ছে মড়মড় করে। ঘরের চাল ফাঁক হয়ে যাচ্ছে বাতাসের ঝাঁকানিতে। হঠাৎ গুড়ুরুমশব্দেবাজপড়ল।বাদল বিছানায় ভয়েগুটিসুটি।' (৯)

এই গদ্য যে একান্ত ভাবে শিশুমনেরইউপযোগী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার ফরাসি রূপকথা 'দিস্লিপিং বিউটি' গল্পে অভিশপ্ত রাজকন্যারএকশো বছরের জন্য মৃত্যুনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ার গল্প অবলম্বনে তাঁর 'ঘুমেরদেশ''।'দিস্লিপিংবিউটি'গল্পের রূপভেদ।যা শিশুদের নিয়ে যায় রূপকথারস্বপ্নলোকে। পাখি, কাঠবেড়ালি,চড়াই, ইঁদুর, ব্যাঙ, গাধ, সোনার হাঁস, সোনার পুতুল, ভাল্লুক, বিড়াল রানী, নেকড়েও ছাগলছানা---গল্পগুলির চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছে।এই পশুপাখির গল্প শিশুদের আনন্দদানেসক্ষম।তাঁর'পাঁশকুড়ানীইলা' বিদেশি রূপকথা 'সিনড্রেলা' অবলম্বনে লেখা। পাঁশকুড়ানী একটি ছোট মেয়ে আসলে তার নামইলা। কিন্তু রান্নাঘরের ছাই ফেলে বলে তার নাম হয়ে গেছে পাঁশকুড়ানী। তার ওপরসৎবোনদের হিংসাএবং শেষ পর্যন্ত রাজার ছেলের সঙ্গে বিয়ে গল্পের উপজীব্য। সুখলতারগল্প সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য দিয়ে শেষ করা যায় তাঁর প্রসঙ্গঃ

'সুখলতার গল্প অবশ্য মৌলিক নয়, বিদেশী রূপকথার, প্রধানতগ্রিমভ্রাতাদের অনুসরণে লেখা। কিন্তু তাতে তাঁর গৌরবের কোন হানি হয় না।......গ্রিমের গ্রন্থওসূক্ষ্ম অর্থে মৌলিক নয়, জার্মান দেশের আদ্যিকালের রূপকথার সংগ্রহ, আর সেসব গল্প সুখলতার হাতে এমন অবাধ ভাবে দেশীয় হাওয়ায়প্রস্ফুটিত হয়েছে যে তারই জন্যে বাঙালি শিশু বংশানুক্রমে কৃতজ্ঞ থাকবে তাঁর কাছে।'(১০)

আর যাঁর কথা না লিখলে লোকসাহিত্য বনাম শিশুসাহিত্যের এই ইতিকথা অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'খুকুমণির ছড়া'(১৮৯৯) বইয়ের ভূমিকায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীখুব সোজা সুজি দেখিয়েছেন যে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত লোকসাহিত্য ব্যাপারটির দিকেও রবীন্দ্রনাথই প্রথম সচেতন ও সক্রিয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।লোকসাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথেরবিপুল অনুরাগ শুধু যে তাঁর নিজের শিশুসাহিত্যের পিছনেই উদ্দীপক ভূমিকানিয়েছিল তা নয়; রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও পোষকতায় বাংলা শিশুসাহিত্যের এক

সোনালী যুগেরও সূচনা হয়েছিল। 'সাধনা'(আশ্বিন-কার্তিক১৩০১) পত্রিকায় প্রথম বেরুলো রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত ছাড়ার প্রথম কিস্তি, যার ভূমিকায় তিনি বলেছিলেনঃ

> "বাংলা ভাষায় ছেলেভুলাইবার জন্য যে-সকল মেয়েলিছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যেএকটি সহজ, স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিইআমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধহইয়াছিল।[১১](পরে 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামে এই লেখাটি 'লোকসাহিত্য' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল)

রবীন্দ্রনাথ উদ্যোগী হবার আগে বাংলা শিশুসাহিত্যের একটা মস্ত অংশই ছিল বিদেশী কেতাবের তর্জমা। প্রধান প্রকাশক ছিলেন স্কুল বুক সোসাইটি। এসবঅনুবাদ বাছায়ানুসারী রচনার অধিকাংশই ছিল পাণ্ডিত্যপ্রবণ, উপদেশক ও তথ্যভারাক্রান্ত। এরপর'বালক' আর 'মুকুল'যখন বের হল, তখন অবস্থা বদলে যাচ্ছে; এবং এই শিশুপত্রিকাগুলির উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

'মুকুল' পত্রিকায়শিবনাথ শাস্ত্রী দেশি-বিদেশি সব রূপকথা নিজের ভাষায় লিখলেন,'বালক' এ বের হলো জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নাট্যরূপ দেওয়া বাংলাদেশের দুটি রূপকথা, 'টাকডুমাডুম' ও'সাত ভাই চম্পা'। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলম ধরেছিলেন, লিখেছেন একাধিকরূপকথাধর্মী শিশুসেব্য রচনা।তাই রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ ছাড়া এই প্রবন্ধ হোত অসম্পূর্ণ।

তাই উপসংহারে বলতেআপত্তি হয়না যে, রূপকথা বললেই চুপকথা শব্দটি চলে আসে, অর্থাৎ শিশুরা কথা না বলে চুপ করে বড়দের কাছ থেকে রূপকথার গল্প শুনবে। সন্ধ্যের পর সেসব গল্প শিশুকে রোমাঞ্চিত করে কল্পনার জগতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আসলে মানুষ যখন থেকে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন শুরু করেছে তখন থেকেই এই সমস্ত রূপকথার জন্ম হয়েছে। পৃথিবীজোড়া শিশুদের সামনে তখন থেকেই খুলে গেছে রূপকথার অফুরন্ত ভান্ডার। মানুষ তার চারপাশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে ছোটদের কাছে এই সমস্ত গল্প পরিবেশন করত।মুখে মুখে রচিত এই সকল গল্প বংশ-পরম্পরায় সাধারণত মেয়েরা স্মৃতিতে ধরে রাখতো। এভাবেই জন্মলোককথার অন্তর্গত রূপকথার। রূপকথার এই জগতে তাইক্ষীরের সমুদ্র, হীরে মুক্তোর গাছ, সেখানে কল্পনার জাদুস্পর্শে কুঁড়েঘর পরিণত হয় প্রাসাদে, আবার রানী পরিণত হয় ঘুটেকুড়োনি দাসীতে,আরশিশুর মনে গড়ে ওঠে এক অলৌকিক মায়ার জগৎ আর এখানেই নিহিত এর সার্থকতা।

তথ্যসূত্রঃ

১। আশরফী খাতুন সম্পাদিত,'বাংলা শিশুসাহিত্য সেকাল ও একাল', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২২ শে জুন ২০১৯, প্রবন্ধঃ 'শিশুসাহিত্য' লেখক- প্রমথ চৌধুরী, পৃষ্ঠাসংখ্যা৪৫৯

২। শ্যামা প্রসাদ ঘোষ,'পঁচিশটি প্রবন্ধঃ বিষয় শিশুসাহিত্য', খোলাচিঠি প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ -কলকাতা বইমেলা ২০২১, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫

৩। শূদ্রক উপাধ্যায় সম্পাদিত,'ইতিকথা এখন', শিশু-কিশোর সংখ্যা বইমেলা ২০১৬, হাওয়াকল, প্রিয়া বাইন্ডার্স, উত্তর ২৪ পরগনা, প্রবন্ধ- 'শিশুসাহিত্যেলোককথার একটি কথা রূপকথা', লেখক - পার্থসারথী ব্যানাজী, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০৩

৪। দীননাথ সেন,'উপেন্দ্রকিশোরের নির্মাণ ও সৃষ্টি', কোরক সাহিত্যপত্র, উপেন্দ্রকিশোর সংখ্যা, বইমেলা ২০০৫

৫। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, গ্রন্থকারের নিবেদন-'টুনটুনির বই', 'উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী-১', সম্পাদনাঃলীলা মজুমদার, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, আগস্ট ১৯৭৩ প্রকাশিত, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৪

৬। প্রাগুক্ত, 'পঁচিশটি প্রবন্ধঃ বিষয় শিশুসাহিত্য' পৃষ্ঠাসংখ্যা-৭৩-৭৪

৭। ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৪

৮। ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৪

৯। জয়িতা বাগচী সম্পাদিত, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রিত,'রচনাসংগ্রহ-২সুখলতা রাও', থীমা প্রকাশন, কলকাতা ২০১৮, গল্প-'মেঘের ঘাঘর', পৃষ্ঠাসংখ্যা ২১

১০। বুদ্ধদেব বসু,'সাহিত্যচর্চা' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণঃ১৪১৬ জ্যৈষ্ঠ / মে ২০০৯, প্রবন্ধঃ'বাংলা শিশুসাহিত্য', পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪১

১১। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,'রবীন্দ্রনাথঃ শিশুসাহিত্য', প্যাপিরাস, কলকাতা, প্যাপিরাস সংস্করণ-জুন২০০০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। ড. তিস্তাদত্তরায়,'বাংলা শিশুসাহিত্যঃরায়বাড়িও পরম্পরা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০১৪

২। বিতানদে সংকলিত,'বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যঃ চর্চায় চর্যায়', কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- মার্চ ২০২২

৩। সোমদত্তা ঘোষ কর, 'নন্দনকানন'-শিশু সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থ, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০২০

৪। আশা গঙ্গোপাধ্যায়,'বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশঃ ১৮০০-১৯০০', সোম পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সোম পাবলিশিং সংস্করণ- জুলাই ২০২১

৫। ড. অন্তরা মিত্র,'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষীরের পুতুল', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ উৎসব- ২০২১

৬। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,'কথামালাঃ খুশির ছড়া',দিসী বুক এজেন্সি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ- শুভ জন্মাষ্টমী ১৪২৪ / আগস্ট ২০১৭

৭। সুশীল সাহা সংকলিত ও সম্পাদিত, 'শিশু-কিশোর সাহিত্য- সকাল বেলার আলোয় দেখা', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০২১

৮। সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত, 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিমঃ বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের নিবিড় পাঠ', প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০২০

সহায়ক আকরগ্রন্থঃ

১। সুবিমল রায়, 'প্রেতসিদ্ধের কাহিনী ও অন্যান্য রচনা', নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণঃ মাঘ১৪২৫ / ফেব্রুয়ারি ২০১৯

কালকূটের কোথায় পাবো তারে উপন্যাসে মলুটীর ইতিবৃত্ত

সামিমা নাসরিন
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লস, কলকাতা

সারসংক্ষেপ : পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন বীরভূম জেলা ও বর্তমান ঝাড়খণ্ডের ছোট্ট মলুটী গ্রামটি তার মন্দিরের সংখ্যাধিক্যের জন্য বিশ্বের দরবারে 'ভারতবর্ষের মন্দির গ্রাম' এর মুকুটটি লাভ করেছে। মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটি অথবা একই রকম দেখতে ফুলপাথরের অলঙ্করণের জন্য শিল্প রসিকদের কাছে গ্রামটি এখন 'ঝাড়খণ্ডের বিষ্ণুপুর'।গ্রামের কোণায় কোণায় রয়েছে রহস্যময় অতীতের হাতছানি। সমরেশ মজুমদার যিনি কালকূট নামেও জনপ্রিয়, তাঁর 'কোথায় পাবো তারে' উপন্যাসে সেই দৃশ্য- শ্রাব্য মরীচিকা দর্শনে ছুটে গিয়েছেন এই প্রত্যন্ত পুণ্যভূমিতে। কথা প্রসঙ্গে উপন্যাসের কথক উদঘাটন করেছেন মলুটীর আলো- আঁধারি ইতিহাস ও সমসাময়িক সঙ্কট।

শব্দসূচক : মলুটী, মন্দির, পূজা, সাঁওতাল

মূল আলোচনা :

সমরেশ মজুমদারের লেখা 'কোথায় পাবো তারে' উপন্যাসটি প্রথমে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালে তা প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে মলুটী সম্পর্কে যে যে বিষয়গুলি উন্মোচিত হয়েছে তা হলো – ১) মলুটীর জন্মকথা ও মলুটীর রায় বংশের পূর্বকথা ২) বিশেষরূপে মলূটীর জীর্ণ মন্দিরগুলির সংকটময় অস্তিত্ব। ৩) মলুটীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।কথক উপন্যাসে ইতিহাস ও পুরাকথার এক রহস্যময় সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

১) মলুটীর জন্ম কথা ও রায় বংশের পূর্ব কথা— মলুটী রাজাদের আদি বাসস্থান ছিল না।প্রথমে তাদের রাজধানী ছিল কাটিগ্রাম বা ডামরা।রাজনগরের পাঠান জমিদারের সঙ্গে রাজচন্দ্রের যুদ্ধ হলে মলূটীর রাজা রাজচন্দ্র নিহত হন।"...তবে আলিনকি খাঁয়ের সঙ্গে যে রাজাদের যুদ্ধ হয়েছিল তাতো আর রূপকথা নয় হে । সেই যুদ্ধের থেকে তো মলুটীতে আগমন।" [i]রাজার বিধবা পত্নী ও সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে সেনাপতি নারায়ণ দলুই মতান্তরে হরি দলুই আশ্রয় নিলেন 'কাছেই মলুটীর জঙ্গলে! সেখানে রাজাদের এক গুপ্তঘর আছে। রানী চলে গেলেন দলুইয়ের সঙ্গে মলুটীতে...তখন ছিল ঘোর জঙ্গল,জন্তু-জানোয়ারদের রাজ্য'।[ii]এ-কথা প্রমাণিত হয় মলুটীর রাজাদের বংশধর ইন্দ্রনারায়ন চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থতেও।মলুটী নামটি নিঃসন্দেহে দ্রাবিড় 'মল' বা 'মল্ল' শব্দ থেকে আহূত যার অর্থ পাহাড় বা উচ্চস্থিত বসতি।[iii]

ছোটনাগপুরের মালভূমি সংলগ্ন এই গ্রামটির আশেপাশে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের বীরভুম জেলাতেও 'মল্ল' প্রত্যয় যুক্ত অনেক স্থান ই রয়েছে। যেমন-মল্লারপুর, কোট মল্লেশ্বর ইত্যাদি।কথিত আছে যে পূর্বে বীরভুম 'বরা' নামক মল্ল সম্প্রদায় কর্তৃক শাসিত হত।আমাদের মনে রাখা দরকার যে মলুটী গ্রামটি বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হলেও পূর্বে প্রাচীন বীরভুমের অংশ ছিল। নিকটস্থ মল্লারপুরে রাজত্ব করতেন মল্ল রাজাদের অধস্তন রাজা মল্লার সিং। আবার এমনও শোনা যায় যে এ-অঞ্চলে পূর্বে হাট বসত । তাই অনেকেই অনুমান করেন যে গ্রামের আদি নাম ছিল মল্লহাটি এবং পরে স্থানীয় মানুষদের উচ্চারণ বিকৃতিতে তা দাঁড়ায় মলুটীতে। [iv]সুতরাং সব মিলিয়ে গ্রাম নামের ক্ষেত্রে 'মল্ল' প্রভাব প্রবলভাবে অনস্বীকার্য । আরো একটি মত ও রয়েছে। মৌলীক্ষা দেবীর নামানুসারেই গ্রামনামের সূত্রপাত। "...গ্রামদেবী...তান্ত্রিক দেবী... মৌলীক্ষা থেকে গ্রামের নাম মলুটী"।[v]কার থেকে এই সিকমি তালুকদার রা এই নিষ্কর ভূখণ্ড রয়েছে তা নিয়ে নানামত প্রচলিত রয়েছে। বর্তমানে গবেষণালব্ধ মত হল যে গৌড় সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের থেকে বংশের প্রথম 'রায়' উপাধিধারী রাজা বসন্ত রায় এই নিষ্কর ভূখণ্ড লাভ করেছিলেন। এই সংক্রান্ত প্রচলিত ব্যাসকূটটিই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। "প্রায় তিনশো বছর হবে ।দিল্লীর বাদশা তখন ছোটখাটো কেউ না, মস্ত শাহানশা। সেইসময়ে এই রাঢ়ের এক গ্রামে থাকত এক ব্রাহ্মণ। ...নাগ...সন্ন্যাসী ...দীক্ষা দিয়ে সীমানা না বাঁধলে, ওর বিপদের সম্ভাবনা আছে। কাশীতে আমার বাস"।[vi] প্রবাদ রয়েছে যে, বসন্ত নামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান মাঠে গরু চরানোর সময় ক্লান্ত হয়ে আম গাছের নীচে ঘুমিয়ে পরলে তার মুখে রোদ এসে পরে। বিষধর সাপ ফণা উঁচিয়ে ছায়া দেয়। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কাশীর দণ্ডিস্বামীর চোখে এই দৃশ্য পরে।তিনি তৎক্ষণাৎ এটিকে রাজলক্ষণ চিহ্নিত করে উক্ত বালকটিকে সঙ্গে নিয়ে তার মায়ের কাছে উপস্থিত হয় এবং জানতে পারেন যে বসন্তের গুরুর দেওয়া মন্ত্রে অশুদ্ধির কারণে এখনো এর ভাগ্যের চাকা ফেরে নি। দণ্ডীস্বামী বসন্তের গুরুকে অনুরোধ করেন নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দিতে।কিন্ত বসন্তের পূর্বতন গুরু তা অস্বীকার করলে দণ্ডীস্বামী স্বয়ং বসন্তকে নবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। পরের ঘটনা প্রবাহ দ্রুত ঘটে যায়। রাণীর পোষা পাখি শিকল কেটে সোনার চেইন পায়ে উড়ে যায়। শোকাতুরা রাণীর মন খারাপ দেখে রাজা ঐ পাখির জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। ঘোষণা দেখে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সকলেই ফাঁদ পাতে।পাখি এসে ধরা দেয় বসন্তের ফাঁদে। সন্ন্যাসী বালক বসন্ত কে নিয়ে হাজির হন সুলতানের সম্মুখে।তিনি ঘোষণা করেন যে একটি ঘোড়ায় চেপে বসন্ত যতখানি অঞ্চল পরিক্রমা করবে,ততখানি অঞ্চল তার হবে।বসন্ত ঘোড়ার পিঠে চেপে চক্কর কেটে সূর্যাস্তের পর যখন ফিরে আসেন,সুলতান তখন খেতে বসেছেন।মুন্সী নিজে সুলতানের কাছে না গিয়ে বসন্তকেই পাঠিয়ে দিলেন দলিল হাতে।সুলতান খুশী হয়ে এঁটো হাতেরই ছাপ দিয়ে উক্ত নানকার অঞ্চলের বৈধ মালিকানার স্বীকৃতি দিলেন।[vii]

উপন্যাসে এই ভাবে ঘটনা টি বর্ণিত হয়েছে-“...সোনালী এক বাজ।তার এক পায়ে আবার একটা ছেঁড়া সোনার সরু শিকল ...বাদশার নিজের...ছেলের মামা বোনের বাড়িতে আসে... যাক, নিজের না হোক, ভাগ্নেরই পুরস্কার লাভ হোক...ছেলে ছুটল ঘোড়া নিয়ে... এঁটো হাতের পাঞ্জার ছাপ”।[viii] প্রবাদের সন্ন্যাসী উপন্যাসে বসন্তের মামায় পরিণত হয়েছেন।ঔপ্যনাসিক কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে দাবী করেছেন যে উক্ত দলিল টি বড় কর্তার কাছেই রয়েছে। "বড়ো কর্তা হেসেছিলেন...বাদশার হাতের ছাপ দেওয়া সেই ফরমানটা আজও আমাদের কাছে আছে। ফারসীতে লেখা তখনকার দিনের কাগজ। পুরনো হয়েছে কিন্ত এখনো বেশ শক্ত”।[ix] কিন্ত এই ধরণের ঘটনা যে অসম্ভব কল্পনা মাত্র,তা এই বংশেরই সন্তান সতীনাথ রায় উদঘাটিত করেছেন। তাঁর বংশের গোপন সত্য হল এই যে বসন্ত মোটেও অনাথ ছিলেন না। বসন্তের পিতা ভবানন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন নিকটবর্তী কাটিগ্রামের বাসিন্দা। কালকূটও তাই লিখেছেন, “বসন্ত মুখুজ্জে...আসলে মুখুজ্জে,ভরদ্বাজ গোত্র।রায় হলো এঁদের বাদশাহী খেতাব”।[x]ভবানন্দ গৌড় সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের অধীনস্থ্ উচ্চপদস্থ্ কর্মচারী ছিলেন। বেগমের পরোক্ষ চাপ ও গুপ্তঘাতকের আশঙ্কায় তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইতিহাসের অন্তরালে অন্তর্ধান করেন। বিনিময়ে উত্তরাধিকারী বসন্তের জন্য রেখে যান নানকার রাজ্য।[xi] উক্ত নির্মম সত্যের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয় সমসাময়িক বৈষ্ণব কবি দের রচনায় সুবুদ্ধি রায়ের পর্বের উপস্থিতি যা আলাউদ্দিন হুসেন শাহের ‘কৃষ্ণের অবতার’ প্রতিমূর্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। বিস্ময়কর রূপে সুবুদ্ধি রায় পর্বেও চূড়ান্ত খলনায়িকা ছিলেন সুলতানের বেগম। বসন্তের রাজ্যলাভ সংক্রান্ত গাল-গল্পের সাথে হুসেন শাহের সিংহাসন প্রাপ্তির প্রবাদ গুলির সাদৃশ্যও অনেক। উপন্যাসেদলিল সংক্রান্ত কল্পিত তথ্য দিলেও খাপছাড়া ভাবে মলুটীর বাবুদের সমাজে পতিত থাকার ইঙ্গিত রয়েছে। “...যার থেকে প্রবাদ হলো খানজা খাঁ , সেই নবাব খান জাহান খাঁ ...তাঁরা পতিতও হলেন...আর তাদের থেকেই নাকি পীরালী ব্রাহ্মণের সৃষ্টি। ...... অনেক দ্বন্দ্ব,যুদ্ধ, দেশে দেশে ছুটোছুটি।শেষ পর্যন্ত এই মলুটীতে”।[xii]শুধু মাত্র যবন শাসকের এঁটো হাতের পাঞ্জার ছাপ সংক্রান্ত দলিলের জন্য কোন জমিদার পতিত হবেন, তা বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য । পাখি ধরে পুরস্কার নেহাৎই জনসাধারণের চোখে ধুলো দেওয়া মাত্র। জাজপুর বা উড়িষ্যা আক্রমণের সময় যে আলাউদ্দিন হুশেন শাহ বীরভুমের পথে শিবির খাটানোর সময় যে কূপ খনন করেছিলেন,তার শিলা লৈখিক পাথুরে প্রমাণ বিদ্যমান।[xiii]

২)বিশেষরূপে মলুটীর জীর্ণ মন্দিরগুলির সংকটময় অস্তিত্ব— মলুটী হল মন্দিরের গ্রাম। উপন্যাসে ধনু তাই বলেছে,” মন্দিরের ঘটা দেখেছেন।আই বাপ,মন্দিরে মন্দিরে ছয়লাপ। গোটা গাঁটো ইটের পাঁজায় ভরতি।ইয়ারা সাপ পোষে।কিন্ত একটো ইটে হাত দিতে যান,ই-বাবা,একেবারে খেয়্যা ফেলে দেবে”।[xiv]কথিত আছে গ্রামে পূর্বে ১০৮ টি মন্দির ছিল। বর্তমানেও গ্রামে মোট ৭২ টি মন্দির রয়েছে।এর মধ্যে ৩০ টি মন্দির পোড়ামাটির অলঙ্করণযুক্ত।ধনুর কথায়, ‘ইট দ্যাখেন নাই, ইঁটের গায়ে ছাপা। ঠাকুর-

দেবতার ছাপ আছে না সব।আমার কাছে কত লোক চেয়েছে,মলুটীর মন্দিরের ছাপা ইঁট'।[xv]অলঙ্করণের বিষয়বস্তু হলো রামায়ণ, পুরাণ, বিষ্ণুর দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, রামলীলা এবং সামাজিক বিষয়বস্তু। মলুটী গ্রামবাসীদের কাছে তা হলো পরম সম্পদ। এই অলংকৃত ইঁটের প্রতি চোরা কারবারিদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল খুব স্বাভাবিক। অনেক অলঙ্করণ তাই চুরিও গিয়েছে। ধনু নিজেই স্বীকার করেছে, "দু-এক খান লিয়ে যে যাই নাই,তা লয়।একবার ধরা পড়ে গেছিলাম"।[xvi]মলুটীর ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যকভাবে সচেতন গোপালদাস মুখোপাধ্যায়ের দুটি চিঠিতে এই ধরণের চোরা কারবারের কথা জানা যায়। ১৯৮৩ সালের ১৭ই নভেম্বর গোপালদাস মুখোপাধ্যায় বিহার সরকারের শিক্ষা (প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর) বিভাগের যুগ্ম সম্পাদককে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,"....at least two beautiful terracotta plaques had been stolen during the recent Kalipuja when a large number of outsiders crowded the village."[xvii] অবশ্য তার ও পূর্বে ভাগলপুর ডিভিশনের রেজিস্টারিং অফিসার শ্রীঅজয় কুমার সিনহা দুমকা নিবাসি আরক্ষী অধিক্ষককেমৌলীক্ষা মন্দিরের চত্বর থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারক চুরি হওয়ায়, তারজন্য কমপক্ষে দুজন আরক্ষীকে মোতায়েন করার জন্য অনুরোধ করেন।[xviii]

৩) মলুটীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য— মলুটীর রাজাদের একটি বড় প্রথা হল 'কন্যাপালন প্রথা'। ডামরা থেকে রাজধানী মলুটীতে স্থানান্তরের পর সাধারনত রাজবংশের মেয়েদের কুলীন পরিবারে পাত্রস্থ করে ভিটে মাটি দিয়ে মলুটীতেই থাকার ব্যাবস্থা করে দেয়। উদ্দেশ্য অবশ্যই এই আদিবাসী পূর্ণ এলাকায় উচ্চবর্ণের সংখ্যাধিক্য তৈরি করা। আলোচ্য উপন্যাসেও দেখা যায় যে গ্রামে আগন্তুক আমাদের কথককেও উৎসুক গ্রামবাসী প্রশ্ন।কথকের ভাষায় "...কিন্তু জামাইবা বলে ক্যানে হে। নতুন কি কেবল জামাই নাকি"।[xix] তিনি উত্তর পান ছোট রায়ের মুখে, "রাজারা যখন মেয়্যাদের বিয়া দিতেন,তখন কুলীনের ছেল্যা লিয়ে এসে,জমি-জিরাত দিয়ে মলুটিতেই বাস করাতেন"।[xx]উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র জামাই চাটুজ্যে ছিলেন 'বাঘা কুলীন'-এর বংশধর।[xxi] উপন্যাসে রয়েছে আনন্দচন্দ্রের কথা যিনি 'ব্রাহ্মন বিদায়'-এর নিয়ম করেছিলেন। তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেছিল বিখ্যাত 'ভবানীমঙ্গল' রচয়িতা গঙ্গানারায়ণ। উপন্যাসের ভাষায়, "...তেমনি বিষয়ী ছিলেন আনন্দচন্দ্র ...তিনি ব্রাহ্মন বিদায়ের নিয়ম করে গিয়েছিলেন। আনন্দ ছিলেন রসিক সুজন, তাঁর সভায় ছিল রসিকদের আনাগোনা।এক ছিল স্বভাব-কবি, নাম গঙ্গানারায়ণ।[xxii]ভবানীমঙ্গলের গুণমুগ্ধজনে স্বীকার করেছেন যে মঙ্গলকাব্যটি সমসাময়িক অশ্লীলতাদোষমুক্ত।[xxiii]মলুটীর সতীঘাট নিয়ে প্রবাদে যে রাজা রাখড়চন্দ্রের স্ত্রীর 'ইচ্ছামৃত্যু'র কথা রয়েছে, তাও কথক উপন্যাসে উল্লেখ করতে ভোলেন নাই ।[xxiv]

মলুটীর সব থেকে বড় উৎসব কালীপূজা। উপন্যাসে রায় মশাই তাই বলেন, "...কালীপুজাই যে আমাদের সব। মলুটীতে দুর্গাপূজা নাই।রাজবংশের দুর্গাপূজা নাই"।[xxv] কথক দেখেছেন শুধু একটি তরফের কালীপুজাতেই কম সে কম 'বিশ-পঁচিশটি অজা', সুতরাং চার তরফ মিলিয়ে কম সে কম শত বলির ঘটনা বিচিত্র নয়। তাছারা 'মুণ্ডহীন রক্তাক্ত দেহ নিয়ে, শূন্যে ছুঁড়ে লোফালুফি...,রক্ত নিয়ে গায়ে ছোঁড়াছুঁড়ি, রক্ত ছিটিয়ে খেলা'[xxvi]... এর মধ্যে অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব প্রকট। ছোটনাগপুর অঞ্চলের মালপাহাড়িয়া জনজাতির মধ্যে ছাগমুণ্ড নিয়ে মুড়া কাড়াকাড়ির উচ্ছ্বাস এখনো আছে।[xxvii] সব থেকে লক্ষ্যনীয় কালীপুজায় সাঁওতাল প্রজাদের উপস্থিতি। এই সাঁওতালদের কাছে কালীপুজার আবেদন গুরুত্বপূর্ণ। সাঁওতালরা অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এই জেলায় আসে। তারা জঙ্গল পরিস্কার করে।বুনো পশুদের তাড়িয়ে দেয়। এই বুনো পশুরা সে সময় জেলায় দাপিয়ে বেড়াত। বুকানন ও হ্যামিলটনের পুঁথি থেকে জানা যায় যে প্রকৃতপক্ষে সাঁওতালরা এসেছিল পালামৌ ও রামগড়ের জঙ্গল থেকে। ১৮৭২ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী দেখা যায় যে সে সময় জেলায় সাঁওতালদের সংখ্যা ছিল ৬৯৫৪ জন, যা ১৯০১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৭,২২১ জন।[xxviii] তাঁরা ছিলেন আদিম ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী। উপন্যাসে আমরা তাই দেখি, "মেয়ে-পুরুষ-শিশু,পরিবারের সাঁওতাল প্রজারা এসেছে রাজার গ্রামে। পূজায় এসেছে। যে যেখানে পেরেছে,পেতেছে রাত্তির আস্তানা"।[xxix]মলুটীতে দুর্গাদেবীর শাকম্ভরী রূপ কল্পনা করে নবপত্রিকা ও ঘট সহযোগে অনাড়ম্বরভাবে পূজা করা হয়। পূর্বতন খরাপ্রবণ বীরভূমে শস্যদেবী শাকম্ভরীর পূজা প্রচলন অস্বাভাবিক কিছু নয়। পাশাপাশি প্রাথমিক পর্বে বাংলায় দুর্গাপূজা যে ভাবে 'বাবু' সংস্কৃতির উৎকট দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিল,মলুটির বাবুরা সতর্ক ভাবেই স্রোতের উল্টো পথে হেঁটে ছিলেন। পূর্বে এই বংশের ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় যে পল্লবিত ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছেন,সেখানে অবশ্য বলা হয়েছে যে আনন্দচন্দ্র দুর্গা পূজা শুরু করতে চাইলেও প্রথম বৎসরই সপ্তমীর দিন তাঁর পুত্রের অপমৃত্যু হলে পরের বছর থেকে শুধু ঘট স্থাপন করে পূজা করা শুরু হয়।[xxx]এই ভাবেই দেখা যায় যে সমসাময়িক মলুটীর আত্মা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এই প্রতিভাবান লেখকের লেখনীতে।

তথ্যসূত্র :

---

[i]ঘোষ,সাগরময়(স:), কালকূট রচনা সমগ্র,দ্বিতীয় খণ্ড,মৌসুমী প্রকাশনী,কলকাতা,১৯৫৭,পৃ ৪০৮

[ii]তদেব, পৃ ৪০৯

[iii]দাশ, সত্যনারায়ণ,বীরভুম জেলার গ্রামনাম,তারাপদ সাঁতরা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট,দুর্গাপুর,২০১৭, পৃ ৪৭

[iv]আলি,মহম্মদ ফিরোজ , মলুটীর মন্দির, এমএ গবেষণা সন্দর্ভ,(সনৎ করের তত্ত্বাবধানে), ১৯৯৯, যোজন সংখ্যা ডি৪৪১,কলাভবন লাইব্রেরী, পৃ ৪

[v]ঘোষ,সাগরময়, (সঃ) প্রাগুক্ত ,পৃ ৩৮২

[vi]তদেব, পৃ ৩৮২

[vii]মুখোপাধ্যায়,গোপালদাস,বাজের বদলে রাজ, হর্ষ এন্টারপ্রাইজ, কাষ্ঠগড়া,২০১৭,পৃ ৮-১৮

[viii]ঘোষ,সাগরময় (সঃ) প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮২

[ix]তদেব, পৃ ৩৮৪

[x]তদেব, পৃ ৪০৭

[xi]রায়, সতীনাথ,মলুটী রাজবংশের ইতিহাস (প্রামাণ্য বংশ-লতিকা সহ),হর্ষ এনটারপ্রাইজ্, কাষ্ঠগড়া,২০১২, পৃ ৩-৪

[xii]ঘোষ ,সাগরময়, (সঃ,),প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮৪

[xiii]বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, বাঙ্গালার ইতিহাস,২য় খণ্ড,দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা,১৩৮১ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৭৭

[xiv]ঘোষ, সাগরময় (সঃ),প্রাগুক্ত,পৃ ৩৯৯

[xv]তদেব,পৃ ৪০০

[xvi]তদেব, পৃ ৪০০

[xvii]চিঠি, পত্র প্রেরক গোপালদাস মুখোপাধ্যায়,স্থানীয় বাসিন্দা,মলুটী,পত্র প্রাপক যুগ্ম সম্পাদক , শিক্ষা (প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর),বিহার সরকার,তাং ১৭ই নভেম্বর,১৯৮৩,ব্যাক্তিগত সংগ্রহে সংরক্ষিত।

[xviii]চিঠি, পত্র প্রেরক শ্রীযুক্ত অজয় কুমার সিনহা, রেজিস্টারিং অফিসার, ভাগলপুর, বিহার, পত্র প্রাপক আরক্ষী অধিক্ষক,দুমকা, সাঁওতাল পরগণা, তাং ২৮ শে ডিসেম্বর, ১৯৮০, ব্যাক্তিগত সংগ্রহে সংরক্ষিত।

[xix] ঘোষ,সাগরময়(সঃ),প্রাগুক্ত,পৃ ৩৯৭

[xx]তদেব,পৃ ৩৯১

[xxi]তদেব,পৃ ৪০৬

[xxii]তদেব,পৃ ৪০৯

[xxiii]প্রবাসী, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কার্ত্তিক সঙ্খ্যা,১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ৯৩

[xxiv]ঘোষ, সাগরময় (সঃ), প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮৬

[xxv]তদেব, পৃ ৩৮৮

[xxvi]ঘোষ, সাগরময়(সঃ), কালকূট রচনা সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মৌসুমী প্রকাশনী,কলকাতা,১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৮

---

xxvii চট্টোপাধ্যায়, ডঃ অনিমেষ, প্রসঙ্গঃ উত্তর রাঢ় ,পৃথা প্রকাশনী,কলিকাতা,১৯৯৯, পৃ ২৮৩

xxviii O'Malley,L.S.S.,Bengal District Gazetteers:Birbhum,Government of West Bengal,Calcutta,1996,pp 39-40

xxix ঘোষ,সাগরময়, (সঃ), কালকূট রচনা সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪

xxx , চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনারায়ন, মলুটী-রাজবংশ,মল্লেশ্বর প্রিন্টিং প্রেস,মল্লারপুর,১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ ৪১

গীতা অনুসারে, শান্তি লাভের উপায় অন্বেষণ

মানস মন্ডল
সংস্কৃত বিভাগ, স্টেট এডেড কলেজ টিচার
পাঁচথুপী হরিপদ গৌরীবালা কলেজ, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপঃ এই জগতে শুধু মানুষ নয় মনুষ্যেতর প্রাণীরাও শান্তিতে বাঁচতে চায়। মানুষ শান্তিতে বেঁচে থাকতে চাইলেও বহু মানুষ শান্তি লাভের সঠিক রাস্তা খুঁজে পায় না। প্রত্যেকটি কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। যেমন কোন একটি স্থানে পৌঁছাতে গেলে নির্দিষ্ট পথে গমন করতে হয় তাছাড়া কোনভাবেই সে স্থানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ঠিক সেই রকমই শান্তি লাভেরও সঠিক রাস্তা আছে তা অবলম্বন করার প্রয়োজন। মানুষ এই জগতে যে জিনিসগুলোর পিছনে ছোটে, ভাবে সেই জিনিসগুলি পেলে জীবনে শান্তি ফিরে আসবে আসলে কিন্তু তা হয় না। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় শান্তি লাভের সহজ পদ্ধতি প্রকাশ করেছেন। শান্তিলাভের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন –

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।। (1)

শ্রীকৃষ্ণ জানিয়েছেন, যে সংযমী স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সমস্ত কামনা ত্যাগ করে সর্ব বিষয়ের স্পৃহাশূন্য, কর্তৃত্বাভিমানবর্জিত ও মমতা রোহিত হয়ে বিচার করেন তিনি পরম শান্তি লাভ করেন। গীতার জ্ঞানযোগ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শান্তি লাভের আরো একটি রাস্তার কথা জানিয়েছেন। এখানে খুব সুন্দর ভাবে ধাপে ধাপে বিষয়টিকে প্রস্ফুটিত করা হয়েছে –

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।। (4)

“যিনি শ্রদ্ধাবান, একনিষ্ঠ সাধন তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয় তিনি জ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া অচিরাৎ পরম শান্তি লাভ করেন “(ii)অর্থাৎ জীবনের শান্তি পেতে গেলে শ্রদ্ধাবান,একনিষ্ঠও ইন্দ্রিয় সংযামী হতে হবে।

জীবনের শান্তি পেতে গেলে জ্ঞান অবশ্যই লাভ করতে হবে। জ্ঞানহীন ব্যক্তি জীবনে কখনোই শান্তি পেতে পারে না। জ্ঞানের মত পবিত্র বিষয়ে এই জগতে আর কিছুই নাই, তাই বলা হয়েছে-

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।।(5)

সূচক/ মূল শব্দ-- শ্রী গীতা, স্থিতপ্রজ্ঞ, মমত্ব ,স্পৃহা, শ্রদ্ধাবান, নিষ্কাম, সংযমী, সাধন তৎপর, জিতেন্দ্রিয়, আত্মজ্ঞান ইত্যাদি।

মূল আলোচনাঃ

বর্তমান সমাজে পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করা খুব কঠিনই নয় বরঞ্চ দুষ্করও বটে। জীবনকে পবিত্রময় করে তুলতে আধ্যাত্মিক ধ্যান- ধারণা সর্বোপরি জীবনের মূল্য উপলব্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এর জন্য জীবনের সঠিক দিশার প্রয়োজন। এই দিশা নির্দেশ করার জন্য চায় প্রকৃত জ্ঞানীগুরুর। এই সংসারে এসে যে বস্তুর পিছনে আমরা সব সময় বেশি ছুটি, অনেকটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বুঝতে পারি যে সেই জিনিসের প্রতি ছোটর প্রয়োজন অতটা ছিল না যত আমরা ছুটি। এই বোধ শক্তি আসার জন্য চাই প্রকৃত জ্ঞান। জীবনকে পবিত্রময় করে তুলতে জীবনে শান্তির প্রয়োজন। অশান্ত চিত্ত ব্যক্তি জীবনে স্থির থাকতে পারে না। শান্তচিত ব্যক্তিই পারে ধীর-স্থিরভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে।

এই জগতে শুধু মানুষ নয় মনুষ্যেতর প্রাণীরাও শান্তিতে বাঁচতে চায়। মানুষ শান্তিতে বেঁচে থাকতে চাইলেও বহু মানুষ শান্তি লাভের সঠিক রাস্তা খুঁজে পায় না। প্রত্যেকটি কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। যেমন কোন একটি স্থানে পৌঁছাতে গেলে নির্দিষ্ট পথে গমন করতে হয় তাছাড়া কোনভাবেই সে স্থানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ঠিক সেই রকমই শান্তি লাভেরও সঠিক রাস্তা আছে তা অবলম্বন করার প্রয়োজন। মানুষ এই জগতে যে জিনিসগুলোর পিছনে ছোটে, ভাবে সেই জিনিসগুলি পেলে জীবনে শান্তি ফিরে আসবে আসলে কিন্তু তা হয় না। সুখ ও শান্তি শব্দ দুটি আমরা একই অর্থে ব্যবহার করলেও দুটির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। শরীর যার দ্বারা স্বাচ্ছন্দ বোধ করে তাহলে সুখ আর মন যার দ্বারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, তাহলে শান্তি। ঠান্ডার সময় প্রচন্ড ঠান্ডা লাগলে আমরা গরম চাদর ঢাকা নি তাতে শরীর আরাম পায় এটি হলো সুখ। ঘরে ঝগড়াঝাঁটি হলে তা যদি আস্তে আস্তে মিটে যায় আমরা বলি এবার একটু শান্তি পেলাম অর্থাৎ মন এর দ্বারা আশ্বস্ত বোধ করে। আমরা সুখী হওয়ার পিছনে ছুটি কিন্তু শান্তি পাওয়ার প্রতি চেষ্টা করি না। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় শান্তি লাভের সহজ পদ্ধতি প্রকাশ করেছেন। শান্তি লাভের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন –

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।। (1)

শ্রীকৃষ্ণ জানিয়েছেন, যে সংযমী স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সমস্ত কামনা ত্যাগ করে সর্ব বিষয়ের স্পৃহাশূন্য, কর্তৃত্বাভিমানবর্জিত ও মমতা রোহিত হয়ে বিচার করেন তিনি পরম শান্তি লাভ করেন।এই শ্লোকে সংসারে থেকেও শান্তি লাভের উপায় বলা হচ্ছে। শান্তিলাভের উপায় হিসেবে প্রথমেই বলা হচ্ছে সমস্ত কামনা বাসনা ত্যাগ করে সমস্ত ভোগ্য পদার্থে স্পৃহাশূন্য হতে হবে। কাম্য পদার্থ পাওয়ার জন্য যে তীব্র ইচ্ছা জন্মায়- তাই স্পৃহা।এই পদার্থ আমার খুব প্রিয়, এটি আমার চাই ই, এটি ছাড়া আমি বাঁচবো না, এটি ছাড়া আমার চলবে না, যে প্রকারে হোক এটি আমায় পেতেই হবে। এটি বাসনার তীব্র রূপ। এটি অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। চিত্তকে সর্বদা কামনা বাসনা

থেকে দূরে রাখতে হবে। কামনা-বাসনার দ্বারা চিত্তকে বিচলিত করা যাবে না। বাসনার তীব্রতা না থাকলেও অনেক স্থলে কাম্য বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থেকে যায়। এই আকর্ষণও ত্যাগ করতে হবে।

তারপর মমতা শূন্য হতে হবে। মমতা মানুষের চিত্তে নানা ভাবে, নানা আকারে প্রকাশ পায়। প্রত্যেক মানুষেরই দেহ এবং প্রাণ সেই ব্যক্তির নিকট অত্যন্ত প্রিয়। প্রাণ কেউই ত্যাগ করতে চায় না, দেহের সুখ দুঃখে মানুষ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। মমতার এটি প্রথম অভিব্যক্তি। তারপর আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ঘর,আমার বাড়ি- এইরূপ মমত্ব বুদ্ধি জন্মায়। মমত্ব বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির মনে হয় স্ত্রী,পুত্র এরাই সব কিছু, এরা সুখী থাকলে আমি সুখী, এদের ছাড়া কিছুতেই বাঁচবো না – এটি মমতার তীব্র রূপ। এটি ক্রমশ বর্ধমান। এই যে মমত্ব বুদ্ধি অর্থাৎ 'আমার''আমার' বোধ এই ভাব ত্যাগ করতে হবে।

এরপর অহংকার রূপ ভয়ঙ্কর ব্যাধিটি ত্যাগ করতে হবে। এই জগতের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে অহংকার করতে থাকে। অনেকে ধন, জন, রূপ, বিদ্যা বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে গর্ব করে বেড়ায়। আমি ধনী, আমি বিদ্বান, আমার উচ্চ বংশ আমি অনেক বেতন পায়, আমার অনেক ক্ষমতা – অনেক ব্যক্তি এই বিষয়গুলিকে নিয়ে অনেক গর্ব অনুভব করেন। এই সমস্ত ব্যক্তিরা হচ্ছে মূর্খ দাম্ভিক। আবার কেউ কেউ বাইরে প্রকাশ করেনা কিন্তু মনে মনে অনুভব করে। বাইরে প্রকাশ করুক বা না করুক আমি ধনী, আমি বড়, আমি বিদ্বান এই প্রকারের অনুভূতি এটি হলো অহংকারের আশ্রয়স্থল। এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় বিষয় তাই সর্বদা বর্জনীয়। আমি কর্তা আমার জন্যই কর্ম হচ্ছে -এই প্রকারের অনুভূতিই অহংকারের আর এক রূপ। এই আমিত্ববোধকে বর্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই প্রকারের স্পৃহাহীন, মমত্তরোহিত ও অহংকার শূন্য হয়ে যিনি সংসারে বিচরণ করেন, বিষয় ভোগ করেন তিনিই শান্তি লাভের অধিকারী।

শান্তি লাভের জন্য প্রথমেই কামনা ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। বিষয়ের প্রতি চিন্তা থেকেই কামনার জন্ম হয়। কামনা ত্যাগ করতে না পারলে জীবনে কোনদিনই শান্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জানিয়েছেন---

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে।। (2)
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। (3)

অর্থাৎ বিষয়চিন্তা করতে করতে মানুষের তাতে আসক্তি জন্মায়, আসক্তি কামনার জন্ম দেয় কামনা বাধা পেলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ থেকে মোহ,মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধি নাশ, আর বুদ্ধিনাশ ঘটলে

বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ কামনা ধীরে ধীরে মানুষকে মৃত্যু পথযাত্রী করে তোলে। বিষয়টি হালকা ভাবে না নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা উচিত বিষয়টি শ্রী বৈদ্যনাথ ভৌমিক নামচিন্তামণি গ্রন্থে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন-“ যেমন একজন শিক্ষিত যুবক একটি যুবতী ছাত্রকে পড়াইতেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইতেই তিনি সেই ছাত্রীর রূপ যৌবনা আকৃষ্ট হইয়া ভাবিলেন ছাত্রীটিকে জীবন সঙ্গিনী রূপে পাওয়া যায় কিনা (বিষয় চিন্তা)। অতঃপর ভাবিলেন ইহাকে শয্যাসঙ্গিনি করিতে পারিলে সাথী সাতিশয় আনন্দ হইত(আসক্তি)। মনের অন্তরালে সেই মনমাতানো বিষয়টিকে অবিরত চিন্তা করিতে করিতে তিনি কামান্ধ হইয়া পড়িলেন (কামনা)। অবশেষে ছাত্রীর অভিভাবককে পরিণয়ের জন্য প্রস্তাব দিলেন। অভিভাবক অসম্মত হইতেই দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় তাহার অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হইল (ক্রোধ)। ক্রোধের পরিণাম এতই বেশি হইল যে আহার নিদ্রা কমিয়া গেল। তদবস্থায় কেবল সেই অপরূপ দেহশ্রীর চিন্তা (মোহ) এবং সেই চিন্তার জালে এমনভাবেই জরাইয়া পড়িলেন তিনি যে একজন শিক্ষক, সমাজের বুকে তাঁহার যে প্রভূত পরিমাণে সম্মান প্রতিপত্তি আছে তাহা সমস্তই বিস্মরণ হইয়া গেল (স্মৃতিনাশ)। স্মৃতির বিলোপ হইতেই তাহার সেই নারী দেহটিকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে অবৈধ উপায়ে ঐ পরম রমণীয় পুরুষার্থ প্রাপ্তির প্রচেষ্টাতে তাহার চরিত্রে কলঙ্ক অঙ্কিত হইল। সেই দুশ্চিন্তাতে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন (বিনাশ) এবং শ্রী ভগবানের আইন শাস্ত্র (গীতা১৪/১৮) অনুযায়ী বলা যায় দেহান্তে তাঁহার অধোগতি হইল। অতএব দেখা যাইতেছে এই কামই জীবের সর্ব অনর্থের মুলীভূত কারণ।” i

গীতার জ্ঞানযোগে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শান্তি লাভের আরো একটি রাস্তার কথা জানিয়েছেন। এখানে খুব সুন্দর ভাবে ধাপে ধাপে বিষয়টিকে প্রস্ফুটিত করা হয়েছে –

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।। (4)

“যিনি শ্রদ্ধাবান,একনিষ্ঠ সাধন তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয় তিনি জ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া অচিরাৎ পরম শান্তি লাভ করেন “(ii)অর্থাৎ জীবনের শান্তি পেতে গেলে শ্রদ্ধাবান,একনিষ্ঠও ইন্দ্রিয় সংযামী হতে হবে।

জীবনের শান্তি পেতে গেলে জ্ঞান অবশ্যই লাভ করতে হবে। জ্ঞানহীন ব্যক্তি জীবনে কখনোই শান্তি পেতে পারে না। জ্ঞানের মত পবিত্র বিষয়ে এই জগতে আর কিছুই নাই, তাই বলা হয়েছে-

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।।(5)

"ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই। নিষ্কাম কর্মযোগে যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহার চিত্তে এই পবিত্র জ্ঞান কালক্রমে আপনিই ফুটিয়ে ওঠে। "(iii) যা অশুদ্ধি ও মলিনতা দূর করে তাকেই লোকে পবিত্র বলে থাকে। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থ ভ্রমনকে পবিত্র বলা হয়, কারণ এগুলির দ্বারাই চিত্রের কিছুটা পবিত্রতা সাধিত হয়। কিন্তু জ্ঞান চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূর করে তাকে একেবারে নির্মল করে দেয় এই রূপ আর কিছুতেই হয় না। তাই জ্ঞানকেই সর্বাপেক্ষা পবিত্র বলা হয়েছে। এই যে জ্ঞান তা কর্মযোগে সিদ্ধিলাভকারী ব্যক্তি আপনা থেকেই লাভ করে থাকেন। জ্ঞান স্বপ্রকাশ, কিন্তু মানুষের অজ্ঞান বা মোহ এই জ্ঞানকে ঢেকে রাখে বলে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে না।

অর্থাৎ জ্ঞান হল এই জগতের সব থেকে পবিত্রতম বিষয়। তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কি উপায়ে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব? শ্রীকৃষ্ণ গীতার জ্ঞানযোগ সুন্দর ভাবে এই রাস্তার কথা উল্লেখ করেছেন। গীতাতে দুই প্রকার রাস্তার কথা বলা হয়েছে এই দুই প্রকার রাস্তাকে অন্তরঙ্গ সাধন ও বহিরঙ্গসাধন হিসেবে ধরা যেতে পারে। বহিরঙ্গ সাধন হিসেবে শ্রী ভগবান অর্জুনকে যে রাস্তার কথা নির্দেশ করেছেন তা হল –

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। (6)

অর্থাৎ গুরুচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম দ্বারা, নানা বিষয়ে প্রশ্ন দ্বারা এবং গুরু সেবা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর, জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী গুরু তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করবেন।

বহিরঙ্গ সাধনের ক্ষেত্রে জ্ঞান লাভের জন্য তিনটি রাস্তা কথা বলা হয়েছে – গুরু চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম দ্বারা, নানা বিষয়ে প্রশ্ন দ্বারা এবং গুরু সেবা দ্বারা। শুধু এর দ্বারায় জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয় তাই বহিরঙ্গ সাধনের পর অন্তরঙ্গ সাধনের পথ নির্দেশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ স্বরূপ বলেছেন—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।।(7)

অর্থাৎ যিনি শ্রদ্ধাভান একনিষ্ঠ সাধন তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয় তিনি জ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভ করে অচিরাৎ পরম শান্তি লাভ করেন।

শ্রদ্ধাবান – জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে গীতায় যে পন্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত। শ্রদ্ধা বলতে বেদান্তসার গ্রন্থে বলা হয়েছে –" গুরুপদিষ্টবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাস: শ্রদ্ধা।" iv গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। বেদ,শাস্ত্র, ঈশ্বর ও মহাপুরুষদের বচনে এবং পরলোকে যে প্রত্যক্ষের ন্যায় বিশ্বাস এবং সেই সবে পরম শ্রদ্ধা ও উত্তম চিন্তা থাকে- তাকে বলা হয় শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যার মধ্যে থাকে তারই বাচক এই 'শ্রদ্ধাবান' পদটি। তাই শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞানী মহাত্মাদের

কাছে গিয়ে প্রণাম, সেবা এবং বিনয় সহ প্রশ্নাদির দ্বারা তাদের কাছ থেকে উপদেশ লাভ করে জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগের সাধন দারা সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেন। যখন আমরা কোন কিছু শেখার জন্য গুরুর নিকট যায় সেটা রান্নার কাজ হতে পারে, পড়াশুনার কাজ হতে পারে, মূর্তি তৈরীর কাজ হতে পারে তা যে গুরু শেখাবেন সেই গুরুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন।

তবেই আমরা সেই বিষয়টি সঠিকভাবে শিখতে পারবো আর যদি গুরুর কথায় আমাদের শ্রদ্ধা না থাকে তাহলে সেই বিষয়ের প্রতি কোনদিনই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

তৎপর-জ্ঞানার্থীর শ্রদ্ধাবানের সাথে সাথে তৎপর হওয়া প্রয়োজন তা না হলে জ্ঞান লাভ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। ছাত্র-ছাত্রীরা যখন পাঠের জন্য গুরুর নিকট যায় তখন গুরু ও বিষয়গুলিকে সহজে বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং বিভিন্ন বিষয়গুলি আরো ভালোভাবে কিভাবে বুঝতে পারবে তার রাস্তা দেখিয়ে দেন। ছাত্র-ছাত্রীরা যখন গুরুর কথা মত পাঠাভ্যাস করতে থাকে তখন তাদের মনে বিশ্বাস জন্মে যে তারা যদি এইভাবে পড়াশুনা করতে থাকে তাহলে তারা ভালো ফল করতে পারবে। এই বিশ্বাস যত দৃঢ় হয়, তারা আরো বেশি তৎপর হয়ে ওঠে। তারা অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীরা খুব সকালে উঠে পাঠাভ্যাস করতে থাকে। ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয় গিয়ে তারা পড়াশোনা করে এবং তারা পড়াশোনার ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি হয় সেগুলো শিক্ষক মহাশয়ের নিকট মিটিয়ে নিতে থাকে ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। গুরু, ছাত্র-ছাত্রীদের তৎপরতা দেখে জ্ঞানদানের ক্ষেত্রে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু যদি ছাত্রছাত্রীরা তৎপর না হয় তাহলে শিক্ষক মহাশয় ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানদানে নিরুৎসাহিত থাকেন। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয় না।

জিতেন্দ্রিয়-শ্রদ্ধাবান ও তৎপর হওয়ার সত্বেও যদি ইন্দ্রিয়সংযমী না হয় তাহলে জ্ঞান লাভ করা কখনোই সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয় সংযত না হলে সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হবে। কারণ ইন্দ্রিয় সংযোজনী না হলে চিত্তের মধ্যে স্থিরতা আসেনা। আর অস্থিরচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কোনদিনই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। চলমান জলের স্রোতে নিজের মুখের ছবি কোনভাবেই দেখা সম্ভব নয়, এর জন্য দরকার স্থির জলের। ইন্দ্রিয়গুলি যত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে তত চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে।আর ইন্দ্রিয় চঞ্চল হলে কখনোই স্থির সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠ সাধন ও ইন্দ্রীয় সংযম- এই তিনটি জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধনা। এগুলির সাহায্যে জ্ঞানলাভ হলে সাধক পরম শান্তি লাভ করেন। রাগ -দ্বেষ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ভাব থেকে মুক্তি হতে না পারলে পরম শান্তি লাভ করা যায় না। সংসারে যে শান্তি লাভ হয় তা আপেক্ষিক এবং ক্ষণস্থায়ী। অজ্ঞানীর পক্ষে পরম শান্তি লাভ অসম্ভব, কারণ তার চিত্ত সর্বদাই সংশয়, সন্দেহ ও বাসনার দ্বারা আন্দোলিত। একমাত্র জ্ঞানীই পরম শান্তি লাভ করতে পারেন।

শ্লোক সূচি :

১. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (2/71)
২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (2/62)
৩. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (2/63)
৪. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (4/39)
৫. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (4/38)
৬. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (4/34)
৭. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (4/39)

সহায়ক গ্রন্থ :

১. সেন, অতুলচন্দ্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৩৬ সাল।
২. ঘোষ,জগদীশচন্দ্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা কলেজ স্কয়ার, আশ্বিন, ১৩৮৪ সন।
৩. দত্ত,চৈতালী,চাণক্য সংগ্রহ, নবপত্র প্রকাশক, কলকাতা জানুয়ারী ২০০০
৪. আত্মশ্রদ্ধানন্দ,স্বামী, ছাত্রজীবনের ভগবদ্গীতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, জুন ২০১৩।
৫. ভট্টাচার্য,ডঃ সমরেন্দ্র, ভগবদ্গীতা, বুক সিন্ডিকাট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৬।
৬. ভৌমিক,শ্রীবৈদ্যনাথ, নামচিন্তামণি, আশ্রমপাড়া, নদীয়া, ১৯৯২ খ্রীঃ।
৭. পাল, বিপদভঞ্জন, বেদান্তসার, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার,৩৮ বিধান সরণি, কলকাতা-৬, প্রথম সংস্করণ-১৯৮২
৮. শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ : গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর -২৭৩০০৫(ভারত)
৯. রঙ্গনাথানন্দ,স্বামী,। ভগবদ্ গীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা, উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: শ্রী মায়ের উদ্বোধন বাড়িতে ৯৬ তম শুভ পদার্পণ তিথি ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১২
১০. গোয়েন্দকা,জয়দয়াল, শ্রীমদ্ ভাগবদ্ গীতা, গীতাপ্রেস গোরখপুর -২৭৩০০৫ (ভারত)

তথ্যসূত্র:

i. ভৌমিক,শ্রীবৈদ্যনাথ, নামচিন্তামণি, আশ্রমপাড়া, নদীয়া, ১৯৯২ খ্রীঃ, পৃষ্ঠা সংখ্যা 3-4
ii. জগদীশচন্দ্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা কলেজ স্কয়ার, আশ্বিন, ১৩৮৪ সন,পৃষ্ঠা সংখ্যা147
iii. সেন, অতুলচন্দ্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৩৬ সাল
iv. মেধাচৈতন্য, ব্রহ্মচারী, বেদান্তসার : অভিনব মুদ্রণী, কলকাতা-৬, ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬

গুণময় মান্নার উপন্যাসে (নির্বাচিত) শ্রমজীবী জীবন ভাবনা

সুদীপ্ত মণ্ডল
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে গুণময় মান্না (১৯২৫-২০১০) অন্যতম। মফস্বল জীবনমনস্ক এবং শ্রমজীবী দরদী এই লেখকের গল্প-উপন্যাসে শ্রমজীবী জীবন ভাবনা নতুন মাত্রা লাভ করেছে। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসেই গ্রামজীবন কেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিজীবী মানুষের সুখ-দুঃখময় দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা যেমন সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি কলকারখানা কেন্দ্রিক শ্রমিক জীবনের জীবন সংগ্রামের উত্থান-পতন, তাদের ভাবনাচিন্তা ও কর্মধারার বিবর্তন স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করেছে। অর্থাৎ একদিকে গ্রাম জীবনের প্রেক্ষিতে জমিদার, জোতদার, মহাজনের অমানুষিক শোষণ-জুলুম যেমন ধরা পড়েছে; বিপরীতে তার বিরুদ্ধে বঞ্চিত কৃষকদের বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, গণ-অসন্তোষ আর অধিকার রক্ষার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করাকে মূর্ত করেছেন। অন্যদিকে কলকারখানায় নানাবিধ শোষণ পদ্ধতির দ্বারা তিলে তিলে পিষ্ট হয়ে মরতে থাকা শ্রমিকদের অসহায় অবস্থার বর্ণনা দিয়ে তাদের সংগ্রামকে মর্যাদা সহকারে উপস্থাপন করেছেন। ঔপন্যাসিক গুণময় মান্না বিভিন্ন প্রকার শ্রমজীবী শ্রেণীর শাসন-শোষণ পদ্ধতির বিবরণ যেমন দিয়েছেন; সেই সঙ্গে তাদের মুক্তির পথও দেখিয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর 'লখিন্দর দিগার', 'কটা ভানারি' এবং 'শালবনি' উপন্যাস পর্যালোচনা করে তাঁর শ্রমজীবী জীবন ভাবনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সূচক শব্দ : শ্রমজীবী, শ্রমিক, কৃষক, গ্রামীণ, অত্যাচার, শোষণ, জুলুম, অধিকার, জমিদার, মহাজন, সোচ্চার, আধিপত্য, অধিকার, সংগ্রাম, স্বাধীনতা প্রভৃতি।

মূল আলোচনা :

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্যে বলিষ্ঠ এবং শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে গুণময় মান্না বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মফস্বলজীবন ও দৈহিক শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে গভীরভাবে অবহিত এই কথাসাহিত্যিকের মানসপ্রবণতা সাধারণ পাঠকের কাছে আকর্ষণীয়। অহং বিসর্জন দিয়ে অবলীলাক্রমে তিনি গ্রামের চাষি, খেতমজুর এবং কারখানার কর্মীদের সঙ্গে মিশতে পেরেছিলেন, তাদের জীবনের সমস্যাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন তাই তাঁর কথাসাহিত্যে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অগ্রগতি-ব্যর্থতা, জীবন সংগ্রামের উত্থান-পতন, তাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তার নানামাত্রা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

শ্রমজীবী শ্রেণির দুই বৃহত্তর গোত্র কৃষক ও শ্রমিক উভয়ের জীবন সংগ্রামের ইতিকথা তাঁর উপন্যাসের কাহিনিকে গতি দান করেছে। তিনি অতি কল্পনার মায়াজাল রচনা করে পাঠককে সন্তুষ্ট করেননি কিংবা মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেননি। উপকরণ সংগ্রহ করেছেন একান্ত চেনাজানা জগৎ থেকে, তাই কৃষক জীবনের কাহিনি তুলে ধরতে গিয়ে বারে বারে সেই ঘাটালেই ফিরে এসেছেন। অন্যদিকে শ্রমিক জীবন নিয়ে যে সব উপন্যাসের কাহিনি সৃজন করেছেন তাও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ফসল। এ সত্যতার প্রমাণ দিয়েছেন লেখক পত্নী উমা মান্না – "কতবার যে বার্নপুর ইস্পাত কারখানায় ঢুকেছেন তার হিসেব নেই। একবার যখন কারখানায় ঢোকা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল, তখন এক স্টাফের ছদ্মবেশে ঢুকেছিলেন, অবশ্যই বন্ধুজনদের সাহায্যে। বার্নপুর ছাড়াও কুলটির কারখানা এবং ওদিকে জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানা দেখতে গিয়েছিলেন। কয়লা খনির শ্রমিকদের নিয়ে লিখবার সময়ও রানীগঞ্জের কাছে মহবীর কোলিয়ারিতে ভূগর্ভে ঢুকে গাঁইতি চালিয়ে কয়লার চাঙ ভেঙেছেন....... এই সেদিন কানোরিয়া জুটমিল নিয়ে লেখার জন্য বেশ কয়েকবার একাধিক জুটমিল ঘুরেছেন এবং শ্রমিক বসতিতে গেছেন। উল্লেখ করতে চাই যে উলুবেড়িয়া অঞ্চল ঘোরার সময় আমি তার সঙ্গী ছিলাম।"[১]

সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে, তিনি রোমান্টিক ভাবালুতার আশ্রয় না নিয়ে প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতা অবলম্বনে যথার্থভাবে শ্রমজীবী জীবনকে আঁকতে চেয়েছেন। এছাড়া ভারতবর্ষ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ, জন্মসূত্রে গ্রামীণ হওয়ার কারণে তিনি অনুভব করেছিলেন কৃষি ও কৃষক জীবনের সমস্যাবলী। তাই তাদের ভাবনা চিন্তা এবং কর্মধারার বিবর্তন ও রূপান্তর স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়েছে তাঁর সৃষ্ট উপন্যাস সমূহে। কৃষক-শ্রমিক উভয় শ্রেণীর শ্রমজীবীর আর্থসামাজিক অবস্থা এবং জীবনযাপনের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে গুণময়ের সমস্ত উপন্যাসে। শাসকের আধিপত্য কখনো নীরবে সহ্য করেছে নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা, কখনোবা মুক্ত হওয়ার জন্য সংগ্রাম করেছে। 'লখিন্দর দিগার' (১৯৫০), 'কটা ভানারি' (১৯৫৪), 'জুনাপুর ষ্টীল' (পূর্বখণ্ড ১৯৬০, উত্তরখণ্ড ১৯৬২), 'শালবনি' (১৮৭৮), 'ঘরানা' (১৯৮৫), 'মুটে' (১৯৯২), 'গঙ্গা প্রবাহিণী (২০০৬)' প্রভৃতি উপন্যাসে গুণময় শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষের উত্থান-পতনের নানা চিত্র উদঘাটন করেছেন। কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাস বিচার বিশ্লেষণ করে তাঁর শ্রমজীবী জীবন ভাবনা দেখা যেতে পারে।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে 'লখিন্দর দিগার' উপন্যাসটি। কৃষিজমি, ধান আর ফসলের লোভ; সেইসঙ্গে নতুন দিনের স্বপ্নে পাগল হয়ে উঠেছে কৃষক সমাজ। কৃষিকাজ করাকে তারা সম্মানজনক মনে করে, সমাজের পালনকর্তা ভেবে নিজেরা গর্ব অনুভব করে। উপন্যাসের শুরুতে গরু লাঙ্গল নিয়ে জমি চাষের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। চাষি লখীন্দরের ভাষায় – "আজ

তুমি চাষী, তোমার হাল বন্ধ করো দিকিনি, কালকে দেশের উকিল-মুক্তাররা দেখি কি খায়।"[২]

প্রাণপণ খেটে কৃষক ফসল উৎপাদন করে বটে কিন্তু শেষপর্যন্ত তা জমা হয় মহাজনের খামারে। চাষিরা মহাজনের কাছে বাঁধা পড়ে থাকে। ঋণগ্রস্ত চাষি মুক্তির পথ খুঁজে না পেয়ে যখন দিকভ্রান্ত, ঠিক তখনই মহাজন জমি গ্রাস করে নেয়। এইভাবে কৃষকের হাত থেকে জমি চলে যায়, আর সেই জমিতেই দিনমজুরি করে জীবন অতিবাহিত করতে হয় তাকে। ক্রমে ক্রমে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে, বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, জমিদার জোতদারের অমানুষিক শোষণ, জুলুমের বিরুদ্ধে বঞ্চিত কৃষকরা জাগবার ও সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে। গুণময় দেখালেন, কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের প্রণোদনায় কৃষকদের মধ্যে এই ভাবনা জাগ্রত হয়নি, তাদের অনুভব স্বতঃস্ফূর্ত, "তমরা একটু জাগ। নিজেদের জিনিস বুঝে লাও। তমরা যদি না পারলে তো তমরা মরলে। মেরে ফেলবে তমাদের!"[৩]

কৃষকরা বারেবারে ধৈর্য, স্থৈর্য আর সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে। শান্তি দিয়ে শান্তি ফেরানোর চেষ্টা করেছে তবুও মহাজন শ্রেণী অসহায় দরিদ্র নিরন্ন কৃষকের ফসল নিয়োজিত লেঠেল বাহিনী আর সরকার নিয়ন্ত্রিত পুলিশের সাহায্যে করায়ত্ত করতে চাইলে কৃষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা ব্যর্থ হয়। সকল চাষী ঐক্যবদ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত, জোট শক্তির নির্ভরতায় নিজেরা নিজেদের খামারে ধান তুলতে সমর্থ হয়েছে। ন্যায়-অন্যায় বুঝতে সমর্থ হয়েছে তাই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে মরিয়া হয়ে উঠেছে, মূক মানুষরা মুখর হয়ে উঠেছে। মনের সাহস মুখের ভাষাতেও ব্যক্ত হয়ে উঠেছে – "বলি আমরা তো মানুষ। লেজ্য – অলেজ্য একটা আছে, আজ আমার ঘাড় ভাঙবে, কাল তমার, তা ইটা কি আমরা মুখ বুজে মেনে লুব? তা লুবনি!"[৪]

ন্যায় কাজের নৈতিক সমর্থনে এবং অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে উদ্দীপিত হয়ে সকলে একত্রিত হয়। তারা সর্বদাই ঠকে, আইন আদালত তাদের বিমুখ করে, ন্যায্য বিচার চেয়ে বঞ্চিত হয়, সুবিচারের আশায় সর্বস্বান্ত হয়। মানসিক যন্ত্রণা আর নৈরাশ্যে ক্লান্ত হলেও কৃষিকার্য চালিয়ে যায়। নানাবিধ শোষণ পদ্ধতির দ্বারা পিষ্ট হয়ে তিলে তিলে মরতে থাকে। তাই জীবন্মৃত এইসব কৃষক শ্রেণীর প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে কৃষক নেতা গোবিন্দ, কৃষক কর্মী সতীশ আর সাধারণ কৃষক লখীন্দর। লখীন্দরের প্রাণপাত করা ভাষা, 'ধান আমরা দুবনি, তাতে যা হয় হউ।' সকলের মনের কথাই উচ্চারিত হয়েছে তার কণ্ঠে, লখীন্দর সকলের মনের মানুষ হয়ে উঠেছে। কৃষক নেতা হয়ে উঠেছে, তার জন্য সকলে সমস্ত অত্যাচার স্বীকার করতেও রাজি। একতা আর সঙ্ঘশক্তিতে আস্থা রেখে সকলে বিজয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখে – "যতক্ষণ আমরা একসঙ্গে আছি, কারো বুকের পাটা নাই এগাবার।"[৫]

লখীন্দর এ গুণ অর্জন করেছিল কৃষক নেতা গোবিন্দর আনুকূল্যে। গোবিন্দর মা ধান ভেনে, ঘুঁটে কুড়িয়ে সন্তানকে শিক্ষিত করেছে, মানুষ করেছে। নিজস্ব সমাজের

কাছে দায়বদ্ধতার কারণে গোবিন্দ সহমর্মী হয়ে উঠেছে কৃষকদের প্রতি। গোবিন্দ সর্বস্বান্ত কৃষকদের মুক্তির কথা ভেবেছে, তাই পুরানো সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখে। জমিদার ধনী মহাজনদের ষড়যন্ত্র নির্মূল করতে সে নিরন্তর চাষিদের উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। সে কৃষকদের সাহস দিয়েছে, মানসিক বল দিয়েছে, পাশে থাকার ভরসা দিয়েছে। তাদের বোঝাতে শিখিয়েছে; জমি কৃষকের ত্রাতা, জমি কৃষকের অভিভাবক স্বরূপ। নেতা স্বশ্রেণীর মধ্য থেকে উঠলে তার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা সাবলীল হয়। অকৃত্রিম দরদের জন্য তার গ্রহণযোগ্যতা আর বিশ্বাসযোগ্যতা অন্যের কাছে প্রগাঢ় হয়; এই গুণে গোবিন্দ আর লখীন্দর নেতা হয়ে উঠেছে। গোবিন্দ কৃষকদের বিস্মরণের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে প্রাণশক্তি জাগ্রত করে তুলতে চায় – "গেল বারের তেভাগা আন্দোলনের কথা মনে পড়ে আপনাদের? আমরা ধানের ভাগা নিয়ে লড়েছিলাম। এবার আমরা জমি নিয়ে লড়বো। যে চাষী, সে চাষ করবে, জমি হবে তারই। আর কাউকে আমরা মানিনে।"[৬]

উপন্যাসের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে রয়েছে মালিক মহাজন আর প্রশাসনের জুলুম, অপরদিকে রয়েছে তা থেকে মুক্তি পাবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। সরকার কম দামে কৃষকদের ধান বিক্রি করাতে বাধ্য করালে গণ-অসন্তোষ আর বিরোধিতা শুরু হয়। পুলিশের অত্যাচার থামাতে উত্তেজিত কৃষকরা পুলিশের বন্দুক কেড়ে নেয়। পাড়ার মেয়েরা বটি, কুড়ুল, ঝাঁটা, কাটারি নিয়ে ভাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে সশস্ত্র দলকে। খাজনা দিতে না পারায় জমিদার প্রজার হাল বলদ আটকালে সঙ্ঘবদ্ধ চাষীরা সম্মিলিতভাবে তা কেড়ে নিয়ে আসে। শুধু কৃষকরা নয়, কৃষক বালকও সাহসের প্রদর্শনে পিছপা হয়নি। একদিকে রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র অন্যদিকে মালিক মহাজনের শোষণচক্রে পিষ্ট হয়েও কৃষকরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে গেছে। পুলিশি অত্যাচার সহ্য করেছে। তাদের লক্ষ্য প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন। স্বাধীনতা ভাবনাটি স্পষ্ট হয়েছে গোবিন্দের চিন্তায় – "স্বাধীনতা চাই। কার কাছে? না পরস্পরের কাছে। আর সবাই মিলে হাত ধরাধরি করে সেই স্বাধীনতা গড়ে তুলব।"[৭]

সবই হয়েছিল ঠিকমত কিন্তু সমস্ত অভিযান ব্যর্থ করতে পুলিশ লখিন্দরকে জেলে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু লখিন্দর যে আশা আর স্বপ্ন সঞ্চারিত করেছে কৃষক মনে তা প্রজন্মক্রমে বয়ে চলবে, তা কখনো ব্যর্থ হওয়ার নয়।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মেদিনীপুরে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়, ঔপন্যাসিক তাঁর 'কটা ভানারি' উপন্যাসে ঠিক এই প্রেক্ষাপটটি ব্যবহার করেছেন। উপন্যাস জুড়ে ঘাটালের দুরবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এতদিন ধরে ঘাটাল ধান-চালের ব্যবসার উপর টিকে ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অবস্থা খুব শোচনীয়। গ্রামের গরিব মানুষের কোনো কাজ নেই। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও ধানের মড়কের ফলে গ্রামের কৃষকরা বেকার। দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মরার চেয়ে কেউ কেউ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে

গেছে। মানুষ সর্বত্র কাজের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে মরছে। হাহাকারময় পরিস্থিতিতে কেউ ধানের চোরাকারবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে, কেউবা ধান ভেনে পেট চালাচ্ছে। সবমিলিয়ে অন্নহীন ভুখা মানুষের মিছিল লক্ষিত হয়েছে সর্বত্র। শহরে পালানো যুবকদের মধ্যে ভূষণ কলকাতায় এক প্রেসে কম্পোজিটরের কাজ করে এবং বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগ দিতে দিতে কলকাতায় শ্রমিক আন্দোলনের নেতা হয়ে উঠেছে। যারা রয়ে গেল গ্রামে তাদের মধ্যে ফকির সামন্ত মাঝবয়সী যুবক, প্রতিদিন রসিকগঞ্জ থেকে রোজ সকালে 'পান্তা' কিংবা 'বাসি ভাত' খেয়ে ঘাটালের উদ্দেশে আসে 'মুটেখাতে কাজ' করতে। অন্যদিকে কুঠি বাজারের এক মনোহারী দোকানের কর্মচারী সতীশ পাড়েকে লেখক উপস্থাপন করেছেন; যার সাধ আর সাধ্যের সামঞ্জস্য দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন কম মাইনেতেও এইসব শ্রমজীবীরা বাবুগিরি করতে চায় আর কেমনভাবে নিজেকে ফিটফাট রাখতে চায়।

অবস্থার দুর্বিপাকে সবাই যখন ঘর ছাড়া, উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কমলার স্বামীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সংসারের অভাব মোচনের জন্য স্ত্রী-পুত্র, পরিজন ত্যাগ করে রোজগারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল সে অন্যত্র। দীর্ঘ ছ'মাস বাইরে থাকার পর কিছুদিনের জন্য হাতেগোনা কাজ জুটেছিল ভাগ্যে। তাতে না হয় নিজের সচ্ছন্দে জীবন নির্বাহ, না হয় পরিবারের জন্য সাশ্রয়। অবশেষে ধার করে ফিরে আসতে হয় নাড়ির টানে আপন গ্রামে। স্ত্রী অভিযোগ করে না বরং স্বামীর প্রত্যাবর্তনে আনন্দিত হয়ে ওঠে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে থাকে। উভয়ে মিলে 'কটা-ভানা' করে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। ব্যক্তি শরৎ-এর অসহায়তা পাঠক উপলব্ধি করতে পারে। সংসারে সকলের 'মুখে ভাত তুলে দেওয়া পুরুষের ধর্ম' জেনেও সে নিরুপায়। চন্দ্রকোনা, গড়বেতা, বিষ্ণুপুরে কাজের সন্ধানে গিয়ে খেয়ে না খেয়ে উদভ্রান্তের মতো ঘুরেও সংসারকে সচ্ছল করতে পারেনি। তার পরিশ্রমের প্রচেষ্টা আর নৈরাশ্য পাঠককে অশ্রুভারাক্রান্ত করে তোলে। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, সংসারকে সচ্ছল করে তোলার জন্য 'গতর' সম্বল করেই একদল মহিলা-পুরুষ, সধবা-বিধবা, বউ-ঝি টাকার জন্য কিভাবে কটাতি হয়ে উঠেছে।

দরিদ্র শ্রমজীবী পরিবারে অভাব রয়েছে, অনটন আছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে রয়েছে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়া। সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে তুলতে উভয়েই ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে ভাঙাঘর মেরামত করার কাজে হাত লাগিয়েছে। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও ঔপন্যাসিক হতশ্রী জীবনে পারস্পরিক নির্ভরতাকে দেখিয়েছেন। পিতা-মাতার জোড়াতালি দেওয়া সংসারের ভার একটু হলেও উপশম করার জন্য কিংবা সংসারের মানুষগুলির কষ্ট লাঘব করার জন্য দশ বছরের পুত্র সন্তানকে 'চার টাকা পাঁচ আনা পয়সা' উপার্জনের জন্য রাতের অন্ধকারে এক কোমর জলে নেমে মোট বইতে হয়। এক অসহায় মাতার দীর্ঘশ্বাস, অক্ষমতা, ব্যর্থতা, হাহাকার আর অন্তরের ক্রন্দন পাঠক উপলব্ধি করতে পারে। কমলা তার প্রাণপ্রিয় পুত্রের শৈশব কেড়ে নিয়ে শিশু শ্রমিকে

পরিণত করতে চায় – "লেখাপড়া আর তো শিখবিনি তুই। তোর বাপ এসু, তোকে একটা দোকানে ঢুকি দিতে বলব। তদ্দিন এই কাজে লেগে পড়.....।"[৮]

পূর্বে 'লখীন্দর দিগার' উপন্যাসে যেমন দেখেছিলাম এখানেও দেখতে পাই সরকারের বাধা দামে কৃষকের ধান দিতে গণ অসন্তোষ প্রকাশিত হতে – "বাধা দামে গরমেন্টকে ধান দিলে আমাদের খরচই পোষাবে নি, তার উবরে আমাদের খোরাক পোশাক আছে। হামার খামার আছে, মহাজন মূলধন আছে। কিসে কি হয় বলুক দিকি।"[৯]

অবশেষে এখানেও শ্রমিকদের ভাগ্যে জোটে কন্ট্রাক্টরের জুলুম। শিলাবতী নদীর বাঁধ মেরামতীতে কম মাইনে দিয়ে তাদের কাজে লাগাতে চায়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জলসেচ করার জন্য শ্রমিকেরা অপর্যাপ্ত মাত্রায় শ্রম দেয়। অন্যদিকে লাভের মুনাফা ভোগ করে সুবিধাবাদী শ্রেণী। তাই দালাল কন্ট্রাক্টরের শোষণের বিরুদ্ধে বাঁচতে আর নিজেদের প্রাপ্য বুঝে নিতে সম্মিলিতভাবে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শ্রমিকেরা। উপায়হীন শ্রমিকদের জীবনে ধর্মঘটই চাহিদা পূরণের একমাত্র অবলম্বন। ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে অনড় শরৎ-এর ভাষায় – "ভাঙি যদি একসঙ্গে ভাঙবো, মরি যদি একসঙ্গে মরব, আর থাকি যদি একসঙ্গে থাকব। ভাই, পুরুষের বাচ্চা আমরা পুরুষের বাচ্চার মতন কাজ করব। দুটো পয়সার লোভ দেখলে এদিক-ওদিক ছুটবো নি।"[১০]

প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পুরুষই শুধু রাস্তায় নামেনি। অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে নারীও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কমলা বাপের বাড়ির গ্রাম থেকে পঞ্চাশজন মহিলাকে নিয়ে অন্ন-বস্ত্রের দাবিতে ঘাটাল এস.ডি.ও কোর্টের উদ্দেশে শোভাযাত্রা করে বেরিয়েছে। স্বামী সন্তান সংসার আর নিজেদের লজ্জা নিবারণের উপায় নির্ধারণ করতে এর থেকে আর বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না তাদের পক্ষে। তবুও এ সামান্য দাবি পূরণ না হলে বিদ্রোহী কমলার মুখে ব্যক্ত হয় – "আমরা গরিব বলে আমাদেরই বেলা যত নাই নাই, থালে তোমার মাগছেলে অত কাপড় পায়ে কি করে, তমার ঝিয়েরা থালে পরে কি।"[১১]

এখানেও গরিব নিরন্ন মানুষের একতা আর সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রামের প্রয়াস যেমন লক্ষিত হয়, তেমনি পুরুষের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে নারীর এগিয়ে আসাকেও ঔপন্যাসিক গুরুত্ব দিয়ে দেখিয়েছেন।

'শালবনি' কৃষক বিদ্রোহ নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা। নকশাল আন্দোলনের ইতিহাস নয়; তার আত্মিক সত্যটুকু লেখক গ্রহণ করেছেন উপন্যাস রচনায়। এই আন্দোলনের বিকৃতি বা বিবৃতি না দিয়ে সারসত্যটুকু পরিস্ফুটনের চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায়, চাঁদসোলার গাজন দুলের শালীর ছেলে মোহন মনের আনন্দে চাষবাস করছে, নিয়মমতো খেতে লাঙ্গল দিচ্ছে। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে গ্রামের সর্বস্বান্ত পুরুষ-মহিলারা কেউ মহাজন গণপতি সিংহের পুকুরে মাছ ধরছে, কেউ তার জমিতে মুনিষ খাটছে, আবার কেউবা তার রাইস মিলে ধান সিদ্ধ - শুকনো করে

জীবন জীবিকা নির্বাহ করছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র শ্যামলীর মা মহাজন গৃহে ধান সিদ্ধ করতে গিয়ে পায়ে গরম ধান ফেলে খোঁড়া হয়ে গৃহবন্দী। স্বামীর মৃত্যুর পর অন্যের বাড়িতে গিয়ে ঝি গিরি করে কিংবা ধান সিদ্ধ শুকনো বা রান্নার কাজ করে সংসার চালিয়ে এসেছে। তাদের দেহের মূল্য ততখানি, যতদিন তারা শ্রম দিয়ে মালিক মহাজনের সেবা করতে পারবে। শারীরিক অসুস্থতায় কাজে যেতে না পারলে বারবার তাগাদা আসে যেতে না পারার জন্য কিন্তু শ্রমজীবীর শরীরের খবর নেওয়া তাদের কাছে মূল্যহীন বিষয়। মায়ের অসুস্থতায় শ্যামলী মহাজনের বাড়িতে বদলির কাজ করে। বাড়ির বাসন মাজা, ঘর ন্যাতা দেওয়া, গোয়ালের কাজ করা, ধান ভাঙ্গানো, ধান সেদ্ধ শুকনো করা সেই সাথে তো রয়েছেই।

এছাড়া বিভিন্ন প্রকার শ্রমজীবী চরিত্রের উপস্থাপন করেছেন, তাদের কেউ ভূমিহীন হয়ে মুনিষ মাহিন্দারের কাজের সন্ধানে বিভিন্ন প্রান্ত অনুসন্ধান করেই চলেছে। কেউ জঙ্গলে কাঠ চুরি করে সংসার প্রতিপালন করে চলেছে। এছাড়া কর্মহীন মহিলা পুরুষ ধান রোয়ার কাজে ছুটে চলেছে দূর দূরান্তে। দেখা যায় ঝুনি বুড়ির মুড়ি বিক্রি করে সংসার চালানোর ইতিবৃত্ত। শিশু শ্রমিকের সন্ধান মেলে যে, ঘর তৈরীর জোগাড়ে মজুর হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করেছে।

একদিকে রুজি-রোজগারহীন মানুষের উদ্ভ্রান্ত অবস্থা, অন্যদিকে সিং বাবুদের বিলাস বৈভব। উপন্যাসে উঠে এসেছে সিং বাবুরা লাঠিয়ালদের জোরে বেশি পরিমাণ জমি আয়ত্ত করতে পেরেছে, অধিকার করতে পেরেছে, আর যাদের জমি গিয়েছে সেই উদ্ভ্রান্ত কৃষকদের পরিত্রাণের জন্য মহাজন খতমের রাজনীতি উপন্যাসে প্রভাব বিস্তার করেছে। সমাজের আগাছা পরিষ্কার করে জঞ্জালমুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চেয়েছিল তারা। রাতের অন্ধকারে মহাজন হত্যা কাহিনীর নতুন মোড় নেয়। সত্তর দশকের ছাত্র আন্দোলন উপন্যাসের ভিত্তিভূমিতে উঠে আসে। সমাজ বদলের অঙ্গীকার নিয়ে সশস্ত্রভাবে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের চেষ্টা দেখা যায়। গরিব কৃষকদের শাসন ও শোষণমুক্ত করতে এবং সুস্থ সমাজ গঠন করতে এগিয়ে এসেছিল মোহনের মত অসংখ্য বিপ্লবী ছাত্ররা; যাদবপুর, কলকাতা, প্রেসিডেন্সির অতি মেধাসম্পন্ন ছাত্ররা। এই সংগ্রামে একজন ছাত্র বিপ্লবী কিনা তার মাপকাঠি হলো শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে তারা একাত্ম হয়েছে কিনা। সত্তরের ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল একাত্ম হওয়ার মানসিকতায় ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করা। জমিদার তথা শোষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে কৃষকের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে চেয়েছিলেন এরা। গ্রামের গরিব খেতমজুরদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলতে এরা ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। এদের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল গ্রামে যাবার, গ্রামের কৃষকের সংহত করার। উপন্যাসের নায়ক মোহনের পরিচয় একটু তুলে ধরা যেতে পারে। এই মোহন আসলে অমলেশ চ্যাটার্জী। তার পরিচয়, "অমলেশ চ্যাটার্জী, সান অব হরদেব চ্যাটার্জী, এ স্কুল টিচা অব চান্তারনাগোর, ইউ, আ ব্রিলিয়ান্ট

স্টুডেন্ট অফ প্রেসিডেন্সি কলেজ, ফিজিক্স অনার্স, পার্ট ওয়ান ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট..........।"[১২]

শহুরে যুবকরা যতই গৃহকোণ থেকে কৃষকদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়, একাত্ম হওয়ার বাসনায় বেরিয়ে পড়ুক না কেন, কৃষকরা নিজেরাই যদি সংগঠিত হতে না পারে তাহলে আন্দোলন কখনো সফল হবে না। কিন্তু উপন্যাসে দেখা যায় মোহনের বিপ্লবী চেতনা মথুর কৌড়ির মধ্যে সঞ্চারিত হাওয়ায় সে সকলকে নেতৃত্ব দিতে পেরেছে। ধান তোলাকে কেন্দ্র করে যে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন হয়েছে, 'ভিন গাঁ' থেকে যেসব মজুররা এসেছে সবই মথুরের আহ্বানে। সবকিছুই পরিচালিত হয়েছে মথুরের অঙ্গুলি হেলনে। মথুর কৌড়িই পেরেছে মোহনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে। যৌথ প্রয়াসে ফসল তোলার উৎসবের নেতৃত্ব দিয়েছে। যৌথ রান্নাঘর চালু করতে সমর্থ হয়েছে। কিশোররাও এই সংগ্রামে পিছিয়ে থাকেনি, কিশোর পচাই, বনাও মোহনের ছায়াসঙ্গী হিসেবে সর্বদা সাহায্য করেছে এবং দালাল নারানকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে।

নারীরাও পিছিয়ে থাকেনি তারাও পুরুষের সাথে এ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে, ফসল তোলার উৎসবে কামিনী কৃষকদের রান্না করে খাইয়েছে, শ্যামলী কৃষকের শত্রুদের বল্লম দিয়ে পেট ফুঁড়ে দিতে গিয়েছে। কৃষকরা এতদিনের দেখা স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছে, সবার ঘরে ঘরে ধান, খামারে ধান, উঠোনে ধান কিন্তু সব লুটপাট হয়ে গেল মালিক মহাজনদের দ্বারা, বাকি ফসল চোর-ডাকাত নিয়ে গেল। আবার সেই শূন্যতাই সম্বল; হঠাৎ জ্বলে ওঠা আলো নিমেষে নিভে গেল কৃষকদের জীবন থেকে। তবুও মথুর কৌড়ি মৃত্যুর আগে দা ছুঁড়ে, বল্লম মেরে আর লাঙ্গলের ফলা দিয়ে কিছুটা হলেও জঞ্জাল পরিষ্কার করে গেছে।

ঔপন্যাসিক কৃষক সমাজের স্বপ্ন দেখা যেমন দেখিয়েছেন আর স্বপ্ন পূরণের পর হতাশ জীবনের চিত্রও তুলে ধরেছেন। পুলিশের ঘৃণ্য অমানবিকতা আর পাশবিকতার প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের শেষে হাহাকার আর শূন্যতা ছাড়া কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না। কর্মচ্যুত মানুষরা কেউ মেদিনীপুর বা খড়গপুরের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। কেউ কলা আর মুলোর সন্ধানে গভীর জঙ্গলের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে, কেউবা কাজের সন্ধানে শহরমুখী হওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কৃষকরা যে স্বপ্ন দেখেছে তা হারিয়ে যাওয়া কিংবা ফুরিয়ে যাওয়ার নয়। মোহন কিংবা মথুরের মৃত্যুতে বিপ্লব শেষ হয়ে যায় না। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয়ে চলে সংগ্রামের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। শ্যামলীর গর্ভে মোহনের সন্তান ধারণ তারই ইঙ্গিত দেয়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালের শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের বাস্তব চিত্র মূর্ত হয়েছে গুণময় মান্নার উপন্যাস সমূহে। ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমজীবী শ্রেণী তাদের অধিকার আদায়ের চেষ্টায় সমবেতভাবে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রভু শ্রেণীর তীব্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়েছে। কখনো

কখনো ভাগ্যে সাফল্য জুটেছে কিন্তু হঠাৎ তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে বলে মনে হয়। পুরুষের সম্মিলিত সংগ্রামে মহিলা, যুবক, শিশু সকলেই সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে এসেছে। ঔপন্যাসিক কৃষক এবং শ্রমিকের পরবর্তী প্রজন্মের উত্তরণের চেষ্টাকে দেখিয়েছেন। শ্রমিক কৃষকদের সাধারণ অবস্থা থেকে তাদের নেতায় পরিণত করেছেন, যারা স্বশ্রেণীর মুক্তির পথ দেখাতে সমর্থ হয়েছে। গুণময় মান্না তাঁর উপন্যাসে অকৃত্রিম দরদ দিয়ে শ্রমজীবী শ্রেণী সৃষ্টি করেছেন। শ্রমজীবী আন্দোলনের যে পথের সন্ধান তিনি দিয়েছেন তা কৃষক অথবা শ্রমিকের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম থেকে শুরু করে পরবর্তী কালের সাহিত্যিকদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার পাথেয়।

উল্লেখপঞ্জি:

১. উমা মান্না, গুণময় মান্না জীবন ও সাহিত্য, গুণময় মান্না সংখ্যা, সপ্তদশ বর্ষ, দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, শারদীয় ১৪১৭, পৃষ্ঠা – ১১১
২. গুণময় মান্না, লখীন্দর দিগার, অরুনা প্রকাশনী, কলকাতা, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, অরুনা সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃষ্ঠা – ৪
৩. তদেব, পৃষ্ঠা – ৫
৪. তদেব, পৃষ্ঠা – ৪৭
৫. তদেব, পৃষ্ঠা – ৫১
৬. তদেব, পৃষ্ঠা – ৮২
৭. তদেব, পৃষ্ঠা – ১৭৪
৮. গুণময় মান্না, কটা ভানারি, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ইন্ডিয়ানা লিমিটেড, শ্রাবণ ১৩৬০, পৃষ্ঠা – ২০২
৯. তদেব, পৃষ্ঠা – ৯২
১০. তদেব, পৃষ্ঠা – ১২৫
১১. তদেব, পৃষ্ঠা – ১৩৫
১২. গুণময় মান্না, শালবনি, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সিগনেট বুক শপ, নভেম্বর ১৯৭৮, পৃষ্ঠা – ১৬৩

গ্রন্থপঞ্জি

<u>আকর গ্রন্থ</u>

১. মান্না গুণময়, কটা ভানারি, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ইন্ডিয়ানা লিমিটেড, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, জানুয়ারি ২০০৬
২. মান্না গুণময়, লখীন্দর দিগার, কলকাতা, অরুনা প্রকাশনী, ৭ যুগল কিশোর দাস লেন, অরুনা সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮
৩. মান্না গুণময়, জুনাপুর স্টিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ১৯৬০

৪. মান্না গুণময়, শালবনি, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সিগনেট বুক শপ, নভেম্বর ১৯৭৮
৫. মান্না গুণময়, ঘরানা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, নাথ ব্রাদার্স, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, বৈশাখ ১৩৯১
৬. মান্না গুণময়, মুটে, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী, কলেজ স্ট্রিট, নভেম্বর ২০১১

সহায়ক গ্রন্থ

১. আচার্য অনিল (সম্পা.), সত্তর দশক, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২-ই নবীন কুণ্ডু লেন, জানুয়ারি ২০১২
২. ঘোষ ফটিক চাঁদ, নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কথাসাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, রথযাত্রা ২০১২
৩. চক্রবর্তী অমিতাভ, বাংলার কৃষক কালে কালোত্তরে, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, উবুদশ, জানুয়ারি ২০১৪
৪. দত্ত শুভাশিস, বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের পালা বদল (১৯৮০-১৯৯৫), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, অফবিট, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, আশ্বিন ১৪২১
৫. দেবসেন সুবোধ, বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্য সমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, বেনিয়াটোলা লেন, এপ্রিল ২০১২
৬. বসু নির্বাণ, অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, শঙ্কর ঘোষ লেন, জানুয়ারি ২০১৩
৭. বন্দ্যোপাধ্যায় রুমা, স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, নভেম্বর ২০০৫
৮. বন্দ্যোপাধ্যায় শিবাজী, বাংলা উপন্যাসে ওরা, প্যাপিরাস সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২
৯. ভদ্র গৌতম ও চট্টোপাধ্যায় পার্থ, নিম্নবর্গের ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ২০১২
১০. ভট্টাচার্য শান্তিময়, বাংলার কৃষক সংগ্রাম ও তরণী, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, সেপ্টেম্বর ২০০২
১১. মিত্র শৈবাল, ষাটের ছাত্র আন্দোলন, তৃতীয় পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, কলকাতা, আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড, বি.পি. সাত সেক্টর ৫, জানুয়ারি ২০০৭
১২. রায় ধনঞ্জয়, তেভাগা আন্দোলন, প্রথম সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, বেনিয়াটোলা লেন, ডিসেম্বর ২০১১

১৩. সেন সুকোমল, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, চতুর্থ পরিবর্তিত সংস্করণ, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, জানুয়ারি ২০০৩

১৪. সেনগুপ্ত অমলেন্দু, জোয়ার ভাটায় ষাট সত্তর, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পার্ল পাবলিশার্স, মে ১৯৯৭

১৫. হক আজিজুল, নকশালবাড়ি তিরিশ বছর আগে এবং পরে, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, জানুয়ারি ২০০২

পত্র-পত্রিকা

১. এবং মুশায়েরা, গুণময় মান্না সংখ্যা, সপ্তদশ বর্ষ, দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা, শারদীয় ১৪১৭

‘গহিন গাঙ’ উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্বেষণ

স্বরূপ হালদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ- ‘গহিনগাঙ’ এর পরিক্রমায় দেখা যায়, জল আর জঙ্গলের ঘেরাটোপে, অভাবক্লিষ্ট, দারিদ্র্য পীড়িত মালোসমাজের ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক অবস্থানকেও। এই উপন্যাসে মালো সমাজের এহেন অবস্থানগত দিকটিও যেমন পরিস্ফুট, তেমনি পরিস্ফুট সাংস্কৃতিক দিকটিও। ‘গহিন গাঙ' উপন্যাসের এমনই বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির আত্তীকরণের দিকটি এ আলোচনার অভিমুখ।
সূচক শব্দ-বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি, গহিন গাঙ, মৎস্যজীবী, সাধন

মূল আলোচনা:
বিশ শতকের সত্তর-আশির দশকের অন্যতম প্রতিভাশালী একজন লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায়। তার পিতৃদত্ত নাম চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। সাধন তাঁর ছদ্মনাম। এই দায়িত্বশীল লেখক সমাজের প্রান্তীয়, নিরন্ন,শ্রমজীবীদের জন্য কলম ধরেছেন। যদিও এই সাহিত্য রচনার কোনো মানসিকতা তাঁর পূর্বকল্পিত ছিল না। তাই তিনিবলেন— “১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া এবং হঠাৎ সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। এর আগে সাহিত্য নিয়ে আদৌ কোনো ভাবনা চিন্তা ছিল না। বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম’পাঠ করে মনে হয়েছিল এসব লেখা ‘আমিও পারি।’ (বাংলা উপন্যাস বীক্ষা ও অন্বেষণ সম্পাদনাসুবল সামন্ত, এবং মুশায়েরা, পৃ: ২৬৭) ।

একথা বলতে দ্বিধা নেই যে সাধন চট্টোপাধ্যায় সিরিয়াস হয়ে সাহিত্য রচনাতে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি প্রধানত লিটল ম্যাগাজিনের লেখক। তিনি বিশ্বাস করতেন এই লিটল ম্যাগাজিনের মাধ্যমেই সাহিত্যে আন্দোলন গড়ে তুলবেন। লেখকের এই অভিব্যক্তি কতটা সার্থক, পাঠকই তার উত্তর দেবে। তিনি সাহিত্যকে অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে না দেখে গভীরসিরিয়াস বিষয় হিসেবে দেখেছেন। এমনতর অভিব্যক্তির কারণ হয়তো তার জীবনখানিই। তিনি ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে অধুনাবাংলাদেশের বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পরে সামাজিক, রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক অবস্থা লেখকের মননকে তৈরি করে। জন্মের কয়েক বছর পরেই রাষ্ট্রের কলমের আঁচড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজের বাড়ি-ঘর ছেড়ে এক অপরিচিত পরিবেশ এসে উপস্থিত হয়। সাধনও তার পরিবারের হাত ধরে চলে আসে অপরিচিত এক দেশে। তাই জীবনের সূচনালগ্নে যাঁকে এই রকম বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়,তাঁর লেখায় স্বাভাবিকভাবেই অন্যমাত্রার হবে এটাই কাম্য। তাই লেখক বলেন—“এই তৃতীয় বিশ্বের আধুনিকতা আমার লেখার ভাবনায় সাম্প্রতিকতম বাঁকের সূচনা করতে চলেছে। যখন

মুক্ত অর্থনৈতিক বাজারে সব কিছুই গ্ল্যামার এবংপণ্যে পরিণত, প্রগতিসাহিত্যিকরা বারবার ফিনিক্স পাখির মতো নিজের ভস্মের মধ্যে জেগে ওঠেন সুতরাংআমরাও...।”লেখকের রচনা সিরিয়াস হবার কারণ, বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটপরিবর্তন। লেখকের সামনে ঘটেছে ভারত-চিন যুদ্ধ, ষাটের খাদ্য আন্দোলন, নকশাল বাড়ি মতো রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, জরুরি অবস্থা, বিশ্বায়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয় । ফলত খুব স্বাভাবিকভাবেই লেখকের রচনায় ফেনিলতা না এসে এসেছে সিরিয়াস সমস্ত বিষয়। তিনি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তার সাহিত্যকে সময়োপযোগী করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি বলেন— “মনুষ্যচৈতন্য, সমাজচৈতন্য, তার নান্দনিক বোধ, তার আত্মা, তার মুক্তি, তার বিশালত্বে রূপান্তর এসব ধরতে গেলে আমার ঐতিহ্য, মিথ, শিকড় সমস্ত কিছুকে এনে মথিত করে আধুনিক সময়ের মধ্যে দিয়ে আসতে না পারলে...ভাষাকে নতুনভাবে না পড়তে পারলে আমাদের সাহিত্য বোধহয় মানুষের হৃদয়ের কাছে পৌঁছবে না।” ('প্রবজ্যা' গল্প ২০০০)।

এই মানসিকতা পুষ্ট কথাকার সাধন চট্টোপাধ্যায় 'নন্দন' (১৯৬৬) পত্রিকায় 'বন্যা' ছোটগল্পের মধ্যদিয়ে তার সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম উপন্যাস 'অগ্নিদগ্ধ' প্রকাশ হয়। সেটি ‘চতুষ্কোণ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর থেকে তার বিখ্যাত সমস্ত উপন্যাস প্রকাশ হয়। ‘গহিন গাঙ' (১৯৭৯), দুই ঠিকানা (১৯৮২), উদ্যোগপর্ব (১৯৮২), পিতৃভূমি (১৯৮৫), পক্ষ-বিপক্ষ (১৯৮৮), তেঁতুলপাতার ঝোল (১৯৯৫), সাতপুরুষ ডট কম (২০০৫) প্রভৃতি। আপাততঃ আমাদের আলোচনার বিষয় 'গহিনগাঙ' উপন্যাস। লেখক এই উপন্যাস রচনার নেপথ্যের কাহিনি জানান —“সত্তরের দশকতো এ-দেশে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ হিসেবে পরিচিত।খুনোখুনি,জেলভাঙা, গুপ্তহত্যা, জরুরি অবস্থা,গণতান্ত্রিক আন্দোলন এমন প্যাণ্ডরার বক্স বাঙালির সমাজ জীবনে পূর্বাপর দৃষ্টান্ত রহিত। মানুষতো নিজের মধ্যেই দৃষ্টিচোখের জন্ম দিচ্ছিল নিঃশব্দে। ঐ পর্বে আমি সুন্দরবন অঞ্চলটায়ঘুরবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ...শুধুই জঙ্গল এবং জল-জঙ্গলযে মাটি অসমান ভেদের, না গেলে টেরই পেতাম না। মুগ্ধ দৃষ্টি ও আকর অভিজ্ঞতায়। কাঁচাজঙ্গল, অঞ্চলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অপরাধপ্রবণতা, মিথ, সংস্কার থেকে মৌলে, কাঠচোর, খুনি, শোষক – আমার মধ্যে নতুন অস্তিত্বের জন্ম দিয়েছিল। জীবন কী ? তার কিছু আলাদা দাবি, রহস্যময়তা, সমষ্টিগত রূপ সম্পর্কে আপন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে শুরু করলাম।... ‘নাগপাশ' নামে এ-সব অভিজ্ঞতাজাত একটি বড় গল্প লিখেছিলাম। প্রয়াত চলচ্চিত্র পরিচালক রাজেন তরফদারের মনে ধরায়, তিনি এটি ছবি করেন। প্রযোজনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। ঐ সুযোগে দ্বিতীয় পর্যায়ে সুন্দরবন যাবার সুযোগ ঘটে।... গোসাবায় দেখলাম ‘বিধবাপল্লী' – একটা পুরো অঞ্চলে এমন কোনো পরিবার নেই, যাদের ঘর থেকে এক-আধজন পুরুষ বাঘের পেটে গিয়ে, বিধবার জন্ম দেয়নি, মর্মান্তিক। আজ হয়তো সে অবস্থা

বদলে গেছে। পরিচয় হয় ডঃবর্মণ বলে এক রহস্যময় ডাক্তারের সঙ্গে – যিনি জীবনের দীর্ঘপথ মাছমারাদের নিয়ে আছেন। লঞ্চে গভীর জঙ্গলের এত অভ্যন্তরে ঢুকলাম, আর জনবসতি নেই। দেখলাম গভীর নির্জনে কিছু মাছমারা ঘাপটি মেরে জাল পেতে আছে। ... সমবায় গঠন নিয়ে লড়াই সংগ্রাম। দেখি সাধারণ মানুষের সমষ্টিগত রূপ। শোষকরা এটাকেই ভয় পায়।" (কেন উপন্যাস লিখি – সাধন চট্টোপাধ্যায়, কোরক সাহিত্য পত্রিকা,প্রাক্ শারদ সংখ্যা, পৃ:১৪৩)

'গহিন গাঙ' উপন্যাসটি সুন্দরবনের মালোপাড়ার পটভূমিকায় রচিত। এই মালোপাড়ার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বেলেগাঙ নদী। যার পোশাকি নাম বেতনা। এই মালোপাড়ার মৎস্যজীবীরা পেটের তাগিদে সুন্দরবনের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীতে মাছ ধরতে যায়। কিন্তু সেই জলে এবং ডাঙায় প্রতিমুহূর্তে চলে মৃত্যুর খেলা। তাই বাড়ির পুরুষেরা মাছ ধরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে সেই বাড়ির সদস্যরা সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে এরকম দুর্ঘটনা হামেশায় ঘটে। তা সত্ত্বেও জেলেরা মাছ ধরতে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে না। এই মালোপাড়ার নিয়ন্ত্রক বলা চলে মহাজনদের। এমনই মহাজনদের মধ্যে অন্যতম হল আবদুল। ইনি বিভিন্ন কৌশলে মাছমারাদের প্রাণের মূল্যে আহরিত মাছ কমদামে বিক্রি করাতে বাধ্য করেন। দাদন নেওয়ায় মৎস্যজীবীরা ইচ্ছা মতো যে-কোন জায়গায় তাদের মাছ বিক্রি করার ক্ষমতা থাকে না। সেই মালোপাড়ায় প্রথম শ্রীপদ ও মধু অন্যজায়গায় মাছ বিক্রি করার সাহস করে। কিন্তু কৌশলী আবদুলের কাছে তারা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এবং পুনরায় শ্রীপদ, আবদুলের নৌকায় মাছ ধরতে যায়।

'গহিন গাঙ' উপন্যাসটি মালো সমাজের জীবনসংগ্রামের ইতিহাস। 'মালো' জীবনের খুঁটিনাটি এর আগে বহু উপন্যাসের বিষয় রূপে গৃহীত হয়েছে এবং প্রতিটি উপন্যাসেই তার বিচিত্র প্রকাশ, যেমন— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', আব্দুল জব্বারের 'ইলিশ মারির চর', সমরেশ বসুর গঙ্গা', মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল', 'বন কেটে বসত' প্রভৃতি। উপরোক্ত প্রায় উপন্যাসেই বিশেষত 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ তিতাস পাড়ের মালো জীবনের সংস্কৃতি, তাদের আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার, তাদের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খবর্ণিত হয়েছে। গহিনগাঙ' উপন্যাসটিতেও উঠে আসতে দেখা যায়, মালোজীবনের অনুপুঙ্খ বিবরণ। তবে এই'মালো'সমাজের ভৌগোলিক অবস্থান পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রের দক্ষিণ দিকে, জল আর জঙ্গলঘেরা উভয় সংকটের পরিসীমায়। যে চিত্র দেখা যায়, মনোজ বসুর 'জল-জঙ্গল', 'বনকেটে বসত' বা সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' এবং নানান ঔপনাসিকের উপন্যাসে। তেমনই'গহিনগাঙ' এর পরিক্রমায় দেখা যায়, জল আর জঙ্গলের ঘেরাটোপে, অভাবক্লিষ্ট, দারিদ্র্য পীড়িত মালোসমাজের ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক অবস্থানকেও। এই উপন্যাসে মালো সমাজের এহেন অবস্থানগত

দিকটিও যেমন পরিস্ফুট, তেমনি পরিস্ফুট সাংস্কৃতিক দিকটিও। ‘গহিন গাঙ' উপন্যাসের এমনই বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির আত্তীকরণের দিকটি এ আলোচনার অভিমুখ। এই উপন্যাসে মালোসমাজের নিজস্ব কিছু লোকসংস্কৃতি উঠে আসতে দেখা যায়। উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক একটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। এই প্রবাদের মারফতেই লেখক উপন্যাসের মূল ঘটনার আভাস দিতে চেষ্টা করেন। ‘বায়ের আগে বার্তা ছোটে’ – এই প্রবাদের মাধ্যমে লেখক জানায় সুন্দরবনে ললিত মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের মুখে প্রাণ হারায়। কিন্তু সুন্দরবন জঙ্গলে আকীর্ণ বলে সেই বার্তা অনেক পরে মালোপাড়ায় পৌঁছায়। রাস্তার ধারে দয়ালখুড়াকে যখন শ্রীপদ তার বাবার মৃত্যু খবর বলে তখন তার মাও সেই কথা শুনে ফেলে। প্রিয়জন হারিয়ে ননীবালা কান্না জুড়ে দিলে, সেই গাঁয়ের অন্য এক বিধবা মহিলা তাকে হাত ধরে একটি প্রবাদ বলে- কপাল কেউ খণ্ডাতে পারে না। দয়ালের মর্মান্তিক মৃত্যু পাড়ার চায়ের দোকানেও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়। চায়ের দোকানদার ঈশ্বর এই প্রসঙ্গে প্রবাদ কাটে - জীবন নাকি পদ্মপাতার জলের মতো ; এই আছে এই নেই।আপাত-সাধারণ সহজতর এ বাক্যে ধরা পড়েছে জীবনের গভীরতর ব্যঞ্জনা।

আবার শ্রীপদর স্ত্রী কড়ি দীর্ঘদিন সন্তান না হওয়ায় পাড়ায় লোক তাকে ‘আঁটকুড়ি’ আখ্যা দিয়েছে। সন্তান জন্ম দিতে না পেরেও তার স্বামী তাকে খুব ভালোবাসে। তাই পাড়ার বউরা তাকে বিদ্রুপ করে প্রবাদ কাটে – ‘বউয়ের রূপ কাঁখে, নদীর শোভা বাঁকে’। বস্তুত সমাজের প্রচলিত ধারণা মা না হতে পারলে নারীর পূর্ণতা নেই। আর শুধু তাই নয়, মালো সমাজের সংস্কার সংসারে নারীর প্রয়োজনীয়তা বংশবৃদ্ধিতে। এহেন প্রচলিত ধারণার সঙ্গে খাপ খায়নি শ্রীপদর বউয়ের নিঃসন্তান থাকা এবং তা সত্ত্বেও তাকে স্বামীর ভালোবাসার প্রাপ্তি। এমনতর প্রচলিত সমাজ অভিজ্ঞতার ধারক এবং বাহক এ প্রবাদটি – তা বলা চলে। এছাড়াও উপন্যাসে আরো প্রবাদ প্রয়োগ হতে দেখা যায়। যেমন – ‘গরু ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল’। এবং ‘আকাশের চাঁদ ধরা’ ইত্যাদি।সুন্দরবনের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য মৃত্যু সেখানে সহজলভ্য। সুন্দরবনের ঐ সব অঞ্চল ‘জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ' এরমতোঅবস্থা। উপন্যাসে মালোপাড়া 'বিধবাপল্লী' নামে চিহ্নিত। যদিও জীবনবাস্তবতা বোধের জন্য পরেরদিনই সেই জঙ্গলে মাছ ধরতে যেতে বাধ্য হয়। মৃত পরিবারে সেদিন গানবাজনা করেমনে শান্তি আনার চেষ্টা চলে। শ্রীপদর বাড়িতে সেই রকম অনুষ্ঠানের আয়োজনে গান গাওয়া হয়। তার একটি উদাহরণ—‘গাছের ফল গাছে রইল / বুট গেল খইসা।/ ... দয়াল গুরুরে।'এ গানে রয়েছে সামাজিক জীবনাভিজ্ঞতা। তেমনই উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে ওতপ্রোত তাদের সহজাত লোকগান । মৎস্যজীবীরা সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রমের পর অবসর যাপনে তাই গলা বেয়ে গেয়ে ওঠে — ‘মনের জ্বালা মোর জুড়োয় দিলি না.. কালা’। এই গান যেমন রয়েছে। তেমনি রয়েছে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্যতম কিংবদন্তীও। উপন্যাসে দয়াল খুড়াকে কেন্দ্রকরে মালোপাড়ায়

কিংবদন্তী প্রচলিত। দয়াল মালোপাড়ার প্রাচীন ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম একজন। এককালে তিনি নামজাদাসাঁইদার ছিলেনমোহনায় মাছ মেরেছেন। যেখানে জঙ্গলের শেষ, কেবল উঁচু উঁচু নলঘাস আর মস্ত শিংঅলা বাছুরের মতো হরিণ সেই জঙ্গলে তিনি জীবনে দু'বার বনবিরির দেখা পেয়েছেন – ‘সাবোরের নৌকাতেই মাছ তুলে ক্লান্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখেছিল নির্জন বনে ছমছম ঘুঙুরের শব্দে কে যেন সামনে। হালকা চন্দনের গন্ধ, দয়াল আধো জাগরণের মধ্যে দেখছে নৌকোর কিছু তফাতে সুন্দরী গাছের গোড়ায় স্বয়ং বনবিবি। তার মুখখানা ম্লান, চোখজোড়া বিষণ্ণ। এই নির্জন অরণ্যে তিনি নাকি কষ্টে আছেন। তাঁরঅভিলাষ পূর্ণ হচ্ছে না, একটা মন্দির চান। ...শেষে চাঁদা তুলে, এই গভীর জঙ্গলে তারা তৈরি করেছিল বনবিবির থান। ...আর সাগরে মাছ ধরতে গেলে সবাই এসে প্রথমে এখানেই ওঠে, পুজো দেয়, খাওয়া-দাওয়া করে ফের নৌকো ছেড়ে দেয় বন্দর-বন্দর ডাকে। (উপন্যাস সমগ্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, গহিন গাঙ, করুণা প্রকাশনী, (পৃ. ১৩)

সুন্দরবনের মালো সমাজে দানোর ভাবনা দীর্ঘদিনের। সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা' উপন্যাসেও আমরা এই ‘দানো’র উল্লেখ পাই। ‘গহিন গাঙ' উপন্যাসে দানো সম্পর্কে যে কিংবদন্তী প্রচলিত তা এই রকম—“সুযোগ পেলে জলের দানোনাকি জেলেদের নৌকো ডুবিয়ে দেয় ; গাঙের জল ফুলে ওঠে। ঢেউ নাচতে নাচতে আকাশ ছোঁয়। সেই জলস্তম্ভ ভেঙে দানোরা দেহ বার করে। জটার মতো চুল, লাল চোখ দুটো ঝুলে চোয়ালের কাছে নেমে আসে,গায়ের ভেজা লোম, নৌকো গিলে তবে তার শান্তি।” (গহিন গাঙ পৃ: ১৪)। এহেন কিংবদন্তীর সত্য-মিথ্যার যথার্থতা যাচাই অন্যতম সমীক্ষার বিষয়। তবে গল্প শোনা এবং বলার যে অভ্যেস তা তো বহু আদিম। কিংবদন্তীগুলি যেন সেই পুরাতন অভ্যেসের ধারক-বাহক। এ সমস্ত কিংবদন্তী শুধু গল্পপিপাসু মনের চাহিদা মেটাতেই সক্ষম নয়, উপরন্তুসে সকল বর্ণিত গল্পের মাধ্যমে উপন্যাসে মালসমাজের সংস্কার বা বিশ্বাসের চিত্রটিও প্রতিফলিত হয়। যা কিছুর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, সেখানে কল্পনা-বাস্তব মিলে মিশে রহস্যময়তার আবরণে তৈরি হওয়া গল্প যেমন লোকসমাজেরঐতিহ্যকে ধরে রাখে, তেমনি সেসব উপাদান উপন্যাসে বর্ণিত হয়ে উপন্যাসের কাহিনি বস্তুকে বা ঘটনার অভিমুখকে অগ্রসর হতেও সাহায্য করে আর সর্বোপরি লোকসংস্কৃতির উপকরণগুলিকে উপন্যাসের অঙ্গীভূত করেবা কোন বিশেষ সমাজগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতিকে যথাযথভাবে তুলে ধরে সেই সমাজ সম্পর্কিত একটি সামগ্রিক ধারণা গড়ে ওঠা সম্ভবপর হয়। এক্ষেত্রেও ‘গহিন গাঙ' নামক স্বল্পায়ত উপন্যাসটির আধারে বাক্‌কেন্দ্রিক কিছু লোকসংস্কৃতির পর্যালোচনায় সেখানকার মালো সমাজের অশিক্ষা, দারিদ্র্য, সংস্কার, বিশ্বাস, প্রচলিত প্রথা এককথায় সামগ্রিকতাকে জানা যায়। গহিনগাঙের স্বল্পায়তনে সেই সামগ্রিকতার গহীনতাই ধরা পড়েছে যেন।

চলচ্চিত্র ও বাঙালির সত্ত্বা নির্মাণ

সুপর্ণা কুণ্ডু চ্যাটার্জী
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, রানাঘাট কলেজ

সারসংক্ষেপ : সহস্র বছর ধরে এই বঙ্গভূমিতে নির্মিত হয়েছে বাঙালি সত্বা। চর্যাপদের থেকে যার সূত্রপাত সেই বাংলা সাহিত্যের হাত ধরে শুরু হয়েছিলো এই নির্মাণ। সেই নির্মাণের ধারায় বিগত একশ' বছরের কম সময় ধরে চলছে চলচ্চিত্র নির্মাণ। সেই নির্মাণে একে একে উঠে এসেছেন অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক, গায়িকা, কাহিনীকার, পরিচালক। বহু বহু চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে এই বাংলায়, এমনকি হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্রেও বহু বাঙালি শুধু অভিনয় করেননি বা গান করেননি, বহু কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে বাংলা ও বাঙালীকে নিয়ে। তার চরিত্রায়ন, কাহিনী নির্মাণ থেকে শুরু করে পটভূমি পর্যন্ত বাংলা বা বাঙালিকে নিয়ে যা গভীর ভাবে নির্মাণ করেছে বাঙালী সত্বা।

দর্শনে, সত্ত্বা হল বস্তুর বস্তুগত বা অজৈব অস্তিত্ব। যা কিছু আছে তা তাই সত্ত্বা। সত্বা এমন একটি ধারণা যা অস্তিত্বের বস্তুনিষ্ঠ এবং বিষয়গত বৈশিষ্ট্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। সত্বায় অংশগ্রহন করে এমন কিছুকে "সত্বা"ও বলা হয়, যদিও প্রায়শই এই ব্যবহারটি এমন সত্বার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে যাদের আত্মীয়তা রয়েছে (যেমন "মানুষ" অভিব্যক্তিতে)। দর্শনের ইতিহাসে "সত্ত্বা"-র ধারণাটি অনিবার্যভাবে অধরা এবং বিতর্কিত হয়েছে, পশ্চিমা দর্শনে প্রাক-সক্রেটিস যুগে এটিকে বুদ্ধিমত্তার সাথে স্থাপন করার প্রচেষ্টার সাথে শুরু হয়েছিল। ধারণাটিকে চিনতে এবং সংজ্ঞায়িত করার প্রথম প্রচেষ্টাটি পারমেনাইডসের কাছ থেকে এসেছিল, যিনি বিখ্যাতভাবে এটি সম্পর্কে বলেছিলেন যে "what is-is"।

বক্ষ্যমান নিবন্ধে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যে বাঙালির "what is-is" কিভাবে ধরা পড়েছে চলচ্চিত্রে বা কিভাবে নির্মিত হয়েছে কিংবা আদৌ হতে পেরেছে কিনা অথবা এই নির্মাণ আসলে কোনও বিনির্মাণ ঘটিয়েছে কিনা।

প্রতিটি সত্ত্বার একটি ড্যাজাইন থাকে। সেই ডাজাইন কি কোনও ভাবে চলচ্চিত্রে নির্মিত ? বা কোনো অথেন্টিক ড্যাজাইনাল আইকন কি বাঙালির ক্ষেত্রে নির্মিত হয়েছে? নির্মিত হওয়া কি সম্ভব?

ধর্ম ও মত-পথের ভিন্নতা বাঙালির আত্ম পরিচয় ও চিরায়ত জীবন ভাবনাকে খন্ডিত, বিভক্ত ও সংকটাপন্ন করতে পারেনি কখনই। ধর্মপরিচয় অক্ষুন্ন রেখে এবং ধর্মের আবশ্যকীয় আচার-আচরণ পালন করে এ ভূখন্ডের অধিকাংশ মানুষ নিজেদের বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করেছে চিরকাল। ধর্ম নয়; ভাষা, শিল্প সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য এ ভূখন্ডের মানুষের আত্মপরিচয় নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে।

দেশভাগ তাকে নতুন পরিচয়ের প্রান্তে উপনীত করলেও দেশ নির্বিশেষে তাঁরা নিজেদের বাঙালি বলেই পরিচয় দিয়েছেন। বাঙালি সংস্কৃতির অবিনাশী শক্তিই দ্বিধাগ্রস্ত বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানকে পথে র সন্ধান দেখায় এবং সে খুঁজে পায় তার আত্ম পরিচয়কে। এই নির্মাণ চলচ্চিত্র জগতে কতটা গতিশীল ক্ষেত্র বিশেষে সেটির আলোচনাও উঠে এসেছে এই ক্ষেত্রে।

চলচ্চিত্র জগৎ ভারতে সূত্রপাত হয়েছিল একপ্রকার বাঙালিদের হাত ধরে। পরবর্তী একশত বছরে বাঙালিরাই সর্বভারতীয় ও বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে দাপিয়ে বেরিয়েছে, যা নিশ্চিতভাবে এক বিশাল মাত্রার বাঙালি সংস্কৃতির চেহারা চলচ্চিত্রে যেমন ফুটিয়ে তুলেছে, তেমনি বাংলার সমাজেও প্রভাব ফেলেছে। এই দ্বৈত চরিত্রের জন্য চলচ্চিত্র ও বাঙালি সত্ত্বা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও এর নিয়মিত চর্চাও হওয়া উচিত।

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে কয়েকটি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এই নির্মাণ-বিনির্মাণের কাহিনী আলোচিত।

মূলশব্দ :- বাংলা, বাঙালি, চলচ্চিত্র, সংস্কৃতি, সত্ত্বা, কলকাতা, বাঙালিত্ব।

মূল প্রবন্ধ :

সহস্র বছর ধরে এই বঙ্গভূমিতে নির্মিত হয়েছে বাঙালি সত্ত্বা। চর্যাপদের থেকে যার সূত্রপাত সেই বাংলা সাহিত্যের হাত ধরে শুরু হয়েছিলো এই নির্মাণ। সেই নির্মাণের ধারায় বিগত একশ' বছরের কম সময় ধরে চলছে চলচ্চিত্র নির্মাণ। সেই নির্মাণে একে একে উঠে এসেছেন অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক, গায়িকা, কাহিনীকার, পরিচালক। বহু বহু চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে এই বাংলায়, এমনকি হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্রেও বহু বাঙালি শুধু অভিনয় করেননি বা গান করেননি, বহু কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে বাংলা ও বাঙালীকে নিয়ে। তার চরিত্রায়ন, কাহিনী নির্মাণ থেকে শুরু করে পটভূমি পর্যন্ত বাংলা বা বাঙালিকে নিয়ে যা গভীর ভাবে নির্মাণ করেছে বাঙালী সত্ত্বা।

"বাঙালি" শব্দটি একটি বিশেষ এথনিক গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে যাদের ভাষাগত, বংশগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় মূলত বাংলার মাটি থেকে। এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মিশ্র নৃতাত্ত্বিক বাঙালি জাতি বাংলার অন্য ভারতীয় উপমহাদেশীয় জাতিগুলো থেকে আলাদা(১)। বাঙালি এবং বাংলা, উভয় শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে বাঙ্গালা শব্দে থেকে, যা ছিল ফার্সী ভাষায় এই অঞ্চলের নাম(২)। মুসলিমদের আগমনের পূর্বে, বাঙ্গালা বা বাংলা নামে কোন অঞ্চল ছিল না কারণ এই অঞ্চলটি অসংখ্য ভূরাজনৈতিক উপরাজ্যে বিভক্ত ছিল। যেমন দক্ষিণাঞ্চলের বঙ্গ (যার নাম থেকে বাঙ্গালা শব্দ এসেছে বলে মনে করা হয়), পশ্চিমাঞ্চলের রাঢ়, উত্তরাঞ্চলের পুণ্ড্রবর্ধন ও বরেন্দ্র, এবং পূর্বাঞ্চলের সমতট ও হরিকেল(৩)। প্রাচীন কালে, এই অঞ্চলের মানুষ এসব বিভাগগুলির নাম দিয়ে

তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় দিতেন। যেমন মহাভারতের মত বৈদিক গ্রন্থগুলিতে পুণ্ড্র নামের একটি জাতির উল্লেখ আছে(৪)। এহেন গোষ্ঠীর সত্বা বুঝতে গেলে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

দর্শনে, সত্বা হল বস্তুর বস্তুগত বা অজৈব অস্তিত্ব। যা কিছু আছে তা তাই সত্বা। সত্বা এমন একটি ধারণা যা অস্তিত্বের বস্তুনিষ্ঠ এবং বিষয়গত বৈশিষ্ট্যকে অন্তর্ভুক্ত করে(৫)। সত্বায় অংশগ্রহন করে এমন কিছুকে "সত্ত্বা"ও বলা হয়, যদিও প্রায়শই এই ব্যবহারটি এমন সত্বার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে যাদের আত্মীয়তা রয়েছে (যেমন "মানুষ" অভিব্যক্তিতে)। দর্শনের ইতিহাসে "সত্ত্বা"-র ধারণাটি অনিবার্যভাবে অধরা এবং বিতর্কিত হয়েছে, পশ্চিমা দর্শনে প্রাক-সক্রেটিস যুগে এটিকে বুদ্ধিমত্তার সাথে স্থাপন করার প্রচেষ্টার সাথে শুরু হয়েছিল(৬)। ধারণাটিকে চিনতে এবং সংজ্ঞায়িত করার প্রথম প্রচেষ্টাটি পারমেনাইডসের কাছ থেকে এসেছিল, যিনি বিখ্যাতভাবে এটি সম্পর্কে বলেছিলেন যে "what is-is"(৭)।

ধর্ম ও মত-পথের ভিন্নতা বাঙালির আত্ম পরিচয় ও চিরায়ত জীবন ভাবনাকে খন্ডিত, বিভক্ত ও সংকটাপন্ন করতে পারেনি কখনই। ধর্মপরিচয় অক্ষুন্ন রেখে এবং ধর্মের আবশ্যকীয় আচার-আচরণ পালন করে এ ভূখন্ডের অধিকাংশ মানুষ নিজেদের বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করেছে চিরকাল। ধর্ম নয়; ভাষা, শিল্প সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য এ ভূখন্ডের মানুষের আত্মপরিচয় নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। দেশভাগ তাকে নতুন পরিচয়ের প্রান্তে উপনীত করলেও দেশ নির্বিশেষে তাঁরা নিজেদের বাঙালি বলেই পরিচয় দিয়েছেন। বাঙালি সংস্কৃতির অবিনাশী শক্তিই দ্বিধাগ্রস্ত বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানকে পথের সন্ধান দেখায় এবং সে খুঁজে পায় তার আত্ম পরিচয়কে। এই নির্মাণ চলচ্চিত্র জগতে কতটা গতিশীল ক্ষেত্র বিশেষে সেই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকের প্রেক্ষাপটে।

চলচ্চিত্র জগৎ ভারতে সূত্রপাত হয়েছিল একপ্রকার বাঙালিদের হাত ধরে(৮)। পরবর্তী একশত বছরে বাঙালিরাই সর্বভারতীয় ও বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে দাপিয়ে বেরিয়েছে, যা নিশ্চিতভাবে এক বিশাল মাত্রার বাঙালি সংস্কৃতির চেহারা চলচ্চিত্রে যেমন ফুটিয়ে তুলেছে, তেমনি বাংলার সমাজেও প্রভাব ফেলেছে। এই দ্বৈত চরিত্রের জন্য চলচ্চিত্র ও বাঙালি সত্ত্বা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও এর নিয়মিত চর্চাও হওয়া উচিত।

হীরালাল সেনের হাত ধরে বাংলায় চলচ্চিত্রের প্রবেশ ঘটেছিল। ম্যাডান থিয়েটার (পার্শী কোম্পানি), এম পি, অরোরা, মুভিটোন এবং নিউ থিয়েটার্স প্রভৃতি প্রযোজক সংস্থার ভূমিকা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিৎ কারন তাঁরাই প্রথম চলচ্চিত্র প্রযোজনা ও স্টুডিও তৈরি করে একপ্রকার এই চলচ্চিত্র শিল্পে বিপ্লবের সূচনা করেন(৯)।

বাংলা চলচ্চিত্র প্রথম দিকে ব্যাপক পরিমানে সমস্যার সম্মুখীন হয়, যদিও শুরুতেই পৃষ্ঠপোষক হিসাবে পেয়েছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যিনি নিজে ছবি পরিচালনা করেন ও একাধিক প্রেক্ষাগৃহের নামকরন করেন(১০)। তা ছাড়া তাঁর কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত হয় অজস্র ছায়াছবি এবং তাঁর রচিত সঙ্গীত ব্যবহারকারী ছবির সংখ্যা বিগত একশ বছরে অজস্র।

পরবর্তীকালে বাংলার চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদান রাখেন প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া (গৌরীপুরের রাজকুমার), কানন দেবী, উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, তপন সিংহ, সত্যজিৎ রায়, তরুন মজুমদার, অঞ্জন চৌধুরী, স্বপন সাহা, রঞ্জিত মল্লিক, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সবশেষে যাঁদের নাম বলা যায় তাঁরা হলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

এদের নাম এই কারণে করা হলো যে বাঙালীর এই বিগত শত বছরের চলচ্চিত্রযাপনে এঁরা একটা নির্দিষ্ট সময় জুড়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন বা নিজেরা ব্যাক্তি হয়েও প্রায় এক একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন।

যারা বাঙালি বুদ্ধিজীবী তাদের মধ্যে যারা চলচ্চিত্রপ্রেমী বিগত বিশ শতকের মধ্যে ৫০, ৬০ এবং ৭০ এই তিনটে দশককে বাংলা ছবির স্বর্ণযুগ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তার কারণ হলো এই সময় বাংলায় অসাধারণ কিছু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে , যার একটা কারণ হলো বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের লেখনী অবলম্বনে ছবিগুলি নির্মিত হয়েছিল। অসামান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা এতে রূপদান করেছিলেন এবং এই সময়টাতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষিত পরিচালক বাংলা ছবিতে কাজ করেছেন।

ভাল মূলচরিত্র বা নায়ক নায়িকার পাশাপাশি নিজেদের দাপটের নজির রেখে গেছেন অসাধারণ কিছু চরিত্রাভিনেতাও। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কমেডি বা হাস্যরস সৃষ্টিতে বিশেষ পারদর্শী ফলে তাঁদের যোগদান পুরো স্বর্ণযুগটাকেই আলাদা মাত্রা দিয়েছিল(১১)। এসেছিলেন প্রতিভাসম্পন্ন গীতিকার সুরকার ও নেপথ্য সঙ্গীতশিল্পীরা। ফলে সব মিলিয়ে সিনেমা অন্ততঃ বাংলায় অন্যমাত্রায় পৌঁছে যায়, যার ভিত্তি ছিলো বাংলার সমাজ ও বাঙালীর সত্ত্বা।

চলচ্চিত্র যে শিল্প, তার সঙ্গে মানুষ-সমাজ-রাজনীতির দিনরাত্রির যোগসাজস রয়েছে, জীবনের মূল সত্যকে যে চলচ্চিত্র ছুঁতে পারে এই সত্যিটা তখনকার বাংলা ছবি এমনকি তখনকার ছবি নির্মাতারা বুঝে উঠতে পারেননি। লক্ষ্যনীয় স্বাধীনতার জন্য বাংলা ও বাঙালির সংগ্রাম, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, কলকাতার রাজপথে মৃত্যু-মিছিল, দেশভাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানবতা ধ্বংসকারী ফ্যাসিবাদের উত্থান – একের পর এক ঘটনার একটিও কি তখনকার বাংলা ছবির কোথাও এতটুকু ছায়া ফেলেছিল? একটি ছবির একটি দৃশ্যেও না(১২)।

১৯৩৬ সালে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হল। ওই সংগঠনের ইস্তাহারে আবেদন জানানো হল; '...আমাদের বিপর্যস্ত সমাজের দাবি মেনে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমরা চাই জনসাধারণের সঙ্গে সর্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ।'(১৩)

বাংলা সাহিত্য স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই সময়ের দাবী মেনে সমাজ রাজনীতির চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে উঠছিল। বাংলা সিনেমার কিন্তু এসব নিয়ে কোনও হেলদোল ছিল না।

বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে এই ভাবনা ক্রমেই মাথাচাড়া দিতে থাকে যে সিনেমা একটি শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম বা আরও কিছু। সিনেমা সম্পর্কে নতুন ভাবনার সূত্রপাত হয় একঝাঁক তরুণের উদ্যোগে। কলকাতায় ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সূচনা হয়। সেই আন্দোলন থেকে একে একে উঠে এলেন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, রাজেন তরফদার, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, বংশী চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই গঠিত হয় ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। বলা যায় তখন থেকেই বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রকারদের ধ্রুপদী ছবিগুলির প্রতি মনযোগ পড়ে অর্থাৎ দেখা শুরু হয়, সেগুলি নিয়ে চর্চায় নিজেদের সমৃদ্ধ করা আর একই সঙ্গে শুরু হয়ে যায় ভালো সিনেমা নির্মাণের প্রস্তুতি।

ঊনিশ শতকের চল্লিশের দশকে আমাদের দেশের প্রায় সর্বত্র যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ থেকে স্বাধীন হওয়ার সমস্ত রকম চেষ্টা চলছে, সেই সময়ে বাংলা শিল্প সাহিত্যে নবচেতনার ভাবনা শুরু হয়। বলা যেতে পারে এই সময়টাই ছিল বাংলার সারস্বতভূমির মহা সৃজনকাল। বহু নবীন প্রতিভার আবির্ভাব এবং তাদের সৃষ্টিতে বাংলার সারস্বতভূমিতে, শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের সৃজনভূমিতে নতুন চেতনা ও বোধের ছোঁয়া লাগে। তবে বাংলা চলচ্চিত্রে এই নবচেতনা ও বোধের ছোঁয়া লাগে তারও পরে।

পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই বাংলা সিনেমা-ভাবনা থেকে শুরু করে সিনেমা নির্মাণ সম্পর্কিত যাবতীয় ধ্যানধারনা সবটাই ওলটপালট হয়ে যায়। বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি পথের পাঁচালীর নির্মাণভাবনা থেকে শুরু করে শিল্পরূপ, পাশাপাশি ছবিটির অভাবনীয় সাফল্য বোধসমৃদ্ধ চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ছবির পরিচিতি ঘটায়।

কেবলমাত্র সত্যজিৎ নন, তাঁর সমসাময়িক বাংলা চলচ্চিত্রের অন্য দুই গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনও স্বাধীনতার পরে প্রায় একই সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পে পা রেখেছিলেন। একই সময়ে এই তিনজনের সৃষ্টির উড়ানে চেপেই বাংলার এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের বিশ্ব চলচ্চিত্রের আসরে গৌরবময় অবস্থান।

সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল-এর পরই বলা উচিত প্রায় বিস্মৃত রাজেন তরফদারের নাম। ১৯৫৭ থেকে ১৯৮৭ তিন দশকে মাত্র ৭টি ছবি- অন্তরীক্ষ, গঙ্গা, অগ্নিশিখা, জীবনকাহিনী, আকাশছোঁয়া, পালঙ্ক আর নাগপাশ। অথচ গঙ্গা আর পালঙ্ক ছাড়া তাঁর বেশির ভাগ ছবির নামই আজ বিস্মৃতির অতলে(১৪)।

বাংলা ছবির সেই নতুন অধ্যায়ের সুচনায় তাঁর কথা যে উচ্চারণ করতে হবে, সে কেবল তাঁর ছবি তৈরির জন্যই নয় বোধহয়, তার চেয়ে বেশি তাঁর বিচিত্র বিষয় নিয়ে ছবি তৈরির জন্য। গঙ্গাকে তিনি দেখেছিলেন এক দার্শনিক কোণ থেকে। সেই কারণে রাজেন তরফদারের গঙ্গায় খুঁজে পাওয়া যায়নি সমরেশ বসুর উপন্যাস। 'আকাশছোঁয়া'র কেন্দ্রে ছিল সার্কাস। নায়ক মোটরবাইক স্টান্ট খেলোয়াড়। এমন বিষয় বাংলা ছায়াছবিতে আগে বা পরে দেখা যায় নি।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনি অবলম্বনে তৈরি হয়েছিল পালঙ্ক। দেশভাগ, পূর্ববাংলা, অধুনা বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপটে উদ্বাস্তুদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং একটি পালঙ্ক ঘিরে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ এবং সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে আসে বাঙালি মূল্যবোধ। সমরেশ বসুর কলম থেকে মাছমারাদের জীবন, আত্মহত্যা-প্রবণ এক বৃদ্ধকে জীবনে টেনে আনার গল্প কিংবা একটি পালঙ্ককে ঘিরে টানাপড়েন। একথাও সত্যি যে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে রাজেন তরফদার সে ভাবে আলোচিত হননি।

গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের ছাত্র রাজেন তরফদার কর্মজীবন শুরু করেন ডে ওয়াল্টার টমসন-এ। বিজ্ঞাপন-জগৎ থেকেই সিনেমার জগতে আসা, ১৯৫৭-য়। তখন থেকেই সর্বক্ষণের চলচ্চিত্রকার-জীবন শুরু। শুধু পরিচালনাই নয়, অভিনয়ও করেছেন মৃণাল সেনের 'আকালের সন্ধানে' ও 'খণ্ডহর', শ্যাম বেনেগালের 'আরোহণ' আর শেখর চট্টোপাধ্যায়ের 'বসুন্ধরা'য়।

বহুচর্চিত সমান্তরাল সিনেমা-র বাইরে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে স্মরণীয় হয়ে আছেন, থাকবেনও তপন সিংহ। যিনি খুব ভাল করেই জানতেন সংস্কৃতিমনা বাঙালির রুচি কোন ধরনের সিনেমায়, অথচ জনরুচির সিনেমা নির্মাণে তিনি যে চলচ্চিত্র জীবনে কোন সমঝোতা করতেন না। তিনি সেলুলয়েডে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে তারাশঙ্কর, বনফুল, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, শংকর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের গল্প। অঙ্কুশ, উপহার, কাবুলিওয়ালা, ক্ষুধিত পাষাণ, ঝিন্দের বন্দী, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, নির্জন সৈকতে, জতুগৃহ, হাটে বাজারে- পর্যন্ত ছবিগুলি মোটের উপর সাহিত্য নির্ভর। এরপর আপনজন, সাগিনা মাহাতো ইত্যাদি ছবিতে আমরা তপন সিংহকে পাই একেবারে অন্যভাবে। যিনি সময়ের দাবি মেনে রাজনীতি এবং সমাজকে কেবল যে বোঝবার চেষ্টা করছেন যার মাধ্যমে বাংলার সমাজ তথা বাঙালি সত্ত্বা ধরা পড়ে।

তার আতঙ্ক ছবিটিতে সময়কে আরও বেশি স্পষ্ট ও সোচ্চার হতে দেখা যায় । দীর্ঘ ষাট বছরের চলচ্চিত্র জীবনে 'অঙ্কুশ' ১৯৫৪ থেকে শেষ ছবি 'আনোখা মতি' (হিন্দি) ২০০০ সাল পর্যন্ত ৬টি হিন্দি সহ মোট বিয়াল্লিশটি ছবির মধ্যে একটাও এমন ছবি নেই যা প্রযোজককে মুনাফা দেয়নি। কিন্তু ছবিগুলির বাণিজ্যিক সফলতা দেখেও চলচ্চিত্র বোদ্ধারা নিশ্চিতভাবেই তার সিনেমা নির্মাণের মুন্সিয়ানা কিংবা শিল্পবোধকে খাটো করতে পারেন না(১৫)। স্বীকার করতেই হয় যে তপন সিংহ স্বাধীনতা-উত্তর মূলধারার সিনেমায় এযাবৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র নির্মাতা।

তরুণ মজুমদারের সিনেমার সহজ রসায়ণ ভালো গল্প ও মন ছোঁয়া গান । এই রসায়ণে পলাতক, আলোর পিপাশা, বালিকা বধু, শ্রীমান পৃথ্বীরাজ, ফুলেশ্বরী, সংসার সীমান্তে, গণদেবতা তার উল্লেখযোগ্য কাজ। অন্যদিকে ভালোবাসা ভালোবাসা, দাদার কীর্তি, আলো বিপুল সমর্থন পায় দর্শকদের (১৬)।

সিনেমা সমালোচকদের আলোচনায় অনালোকিত থাকে মেইনস্ট্রিম বা মূল স্রোতের ছবি। তাই বাংলা বাংলা ছবির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় জায়গা মেলে না নীরেন লাহিড়ী, অগ্রদূত, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায, পিনাকী মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায, অসিত সেন, অজয় কর, সুশীল মজুমদার, কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস ভট্টাচার্য, পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায়, বিকাশ রায় প্রমুখ পরিচালকদের। অথচ নিশ্চিত বলা যায়, বাংলা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যে বাঙালি সত্ত্বার নির্মাণ তা এঁদের দ্বারাই হয়েছিল।

স্বাধীনতা উত্তরপর্বে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সাবালক হয়ে ওঠা থেকে শুরু করে বাংলা সিনেমা শিল্প গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এদের অসামান্য অবদান রয়েছে। এইসব অভিনেতাদের ছবি দেখতে বাঙালি দর্শক প্রেক্ষাগৃহের টিকিট কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন দিয়েছে, বিনোদিত হয়েছে বলেই প্রযোজকরা বাংলা ছবিতে লগ্নি করতে সাহস পেয়েছেন। একটি শুটিং-স্টুডিয়োর পাশে যেমন ক্যান্টিন তৈরি হয়েছে তেমনি প্রেক্ষাগৃহের বাইরে ঝালমুড়িওলা, চা-বিক্রেতা প্রমুখ ছোট ব্যবসায়ীরা অস্থায়ী আস্তানা পেতেছেন। আজ ওই অবস্থা পুরোপুরি বদলে মাল্টিপ্লেক্স চর্চায় পরিণত হয়েছে।

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মূলস্রোতের বাংলা সিনেমার সবথেকে জনপ্রিয় কালপর্বের সূত্রপাত হয়েছিল পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ঢুলি, চৌরঙ্গি, অগ্রদূতের অগ্নিপরীক্ষা, সবার উপরে, সাগরিকা, পথে হল দেরি, কার্তিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত চন্দ্রনাথ, অজয় কর পরিচালিত হারানো সুর, সপ্তপদী, সাত পাকে বাঁধা, চিত্ত বসুর মায়ামৃগ, ছেলে কার, বন্ধু, সুশীল মজুমদারের পুষ্পধনু, হসপিটাল, লালপাথর, অসিত সেন পরিচালিত চলাচল, পঞ্চতপা, দীপ জ্বেলে যাই, উত্তর ফাল্গুনী, মমতা, সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত শাপমোচন, শেষ পর্যন্ত, দুই ভাই, যাত্রিকের কাঁচের স্বর্গ, স্মৃতিটুকু থাক, নীরেন লাহিড়ীর ইন্দ্রাণী, রাইকমল, হরিদাস ভট্টাচার্যর সন্ধ্যা দীপের শিখা , কমললতা, নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের অদ্বিতীয়া, সলিল দত্ত পরিচালিত স্ত্রী, সরোজ দে পরিচালিত ডাকহরকরা, বিজয় বসু পরিচালিত আরোগ্য নিকেতন, বিকাশ রায়

পরিচালিত মরুতীর্থ হিংলাজ, কেরী সাহেবের মুন্সী, অরবিন্দ মুখার্জীর ধন্যি মেয়ে, অগ্নিশ্বর, সুনীল ব্যানার্জীর দেয়া-নেয়া প্রভৃতি ছায়াছবির মধ্য দিয়ে যা আজও বাঙালি দর্শকদের স্মৃতিতে উজ্বল হয়ে আছে ।

এইভাবে যুগে যুগে বাংলা চলচ্চিত্র বাঙালির সংস্কৃতি ও সত্ত্বা দুইই সমান্তরাল ভাবে ঘটিয়ে চলেছে।

টীকা ও তথ্যসূত্র:

১. Eaton, Richard M. (1993). The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760. University of California. ISBN 978-0-520-20507-9. Retrieved 13 July 2017।

২. বাংলার ইতিহাসের বিবর্তনের ধারায় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গ-শব্দজাত বঙ্গাল শব্দটি পাওয়া যায়। এ নাম পূর্ববঙ্গের, আর সমগ্র বাঙ্গালা দেশ বুঝাতে গৌড়বঙ্গাল শব্দটি ব্যবহৃত হতো। বাঙ্গালা নামটি মুসলমান অধিকারের গোড়ার দিকেই চালু হয়েছিল। ফারসি 'বঙ্গালহ' হতে পর্তুগিজ বেঙ্গালা (Bengala) এবং ইংরেজ আমলে বেঙ্গল (Bengal) হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের আগে বাঙ্গালা ভাষার কোনো নাম ছিল না। সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা জানতেন পণ্ডিতদের ভাষা সংস্কৃত আর আমজনতার ভাষা দেশি বা লৌকিক। সেটাই তাদের মাতৃভাষা। উনিশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশকে পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে বলতেন গৌড়ীয় ভাষা। রাজা রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ গ্রন্থের নামও গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ (১৮৩৩)। বাংলা ভাষাকে 'বঙ্গভাষা' হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে মুসলিম অনুষঙ্গে। উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ফার্সি গোলেবকাঅলি ইতিহাস (১৮৪২) অনুবাদ করতে যেয়ে ভূমিকায় বলেন : 'পারস্ব হইতে এই ইতিহাস সার/ইচ্ছা হৈল বঙ্গভাষে করিতে প্রচার'।

৩. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস (History of the Emergence of Independent Bangladesh)। এপ্রিল, ২০১৪। পৃষ্ঠা ৪।

৪. Devendrakumar Rajaram Patil (1946). Cultural History from the Vāyu Purāna. Motilal Banarsidass Pub. p. 46. ISBN 9788120820852.

৫. Hubert L. Dreyfus, Mark A. Wrathall, eds., A Companion to Heidegger (2008), p. 3.

৬. Palmer, John (2020). "Parmenides". In Zalta, Edward N. (ed.). Stanford Encyclopedia of Philosophy.

৭. Simplicius (22 April 2014). Commentary On Aristotle Physics. Vol. 1.3-4. A&C Black. p. 55-56. ISBN 978-1-4725-1531-5. Retrieved 13 April 2022.

৮. McKernan, Luke (31 December 1996). "Hiralal Sen (copyright British Film Institute)". https://www.victorian-cinema.net/sen. Retrieved 1 November 2006.

৯., The SAGE Handbook of Media Studies, John H Downing et al., p- 520, SAGE, 2004, ISBN 0-7619-2169-9.

১০. চলচ্চিত্র ও রবীন্দ্রনাথের দৃশ্যভাবনা - সোমেশ্বর ভৌমিক- কালি ও কলম, ১৭/৪/২০১৯, https://www.kaliokalam.com/%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A7%87/।

১১ স্মৃতির স্মরণিতে বাংলা চলচ্চিত্রের অর্ধশতক - প্রথম খণ্ড, রবি বসু, পৃষ্ঠা-৩৮। দে'জ পাবলিশিং- ১৯৯৮।

১২ বস্তুত, একটিও ছায়াছবিতে সরাসরি এই বিষয় গুলি না এলেও এর ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তু সমস্যা বহু চলচ্চিত্রে দেখা গেছে।

১৩. প্রগতি লেখক সঙ্ঘের ইস্তেহার- ১৯৩৬।

১৪. Bengali cinema. Nandan. Kironmoy Raha; Nandan (Organization : Calcutta, India) (1991). Retrieved 22 December 2012.

১৫ The Cinema of Tapan Sinha: An Introduction, AMITAVA NAG, Om Books International, 2021, ISBN-9385252860, 9789385252860।

১৬. চিরতরুণ. Ei Samay (in Bengali). Retrieved 3 January 2021.

যন্ত্ররূপে জগত : একটি হাইডেগেরিয় অনুসন্ধান

সৌভিক ঘোষ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ
রানাঘাট কলেজ, রানাঘাট, নদীয়া

সারসংক্ষেপ: হাইডেগার ছিলেন একজন অস্তিবাদী দার্শনিক। অস্তিবাদীদের মূল আলোচ্য বিষয় হল মানব অস্তিত্ব। তিনি তাঁর সমগ্র বই জুড়ে মানবসত্তাকে বোঝাতে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেটি হল- 'Dasein'। সাধারণত 'Dasein' এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয় 'Being-in-the-world' অর্থাৎ জগত-সম্পৃক্ত সত্তা হিসেবে। অর্থাৎ তাঁর কাছে মানব অস্তিত্ব মানেই 'জগত-সম্পৃক্ত' মানব অস্তিত্ব। হাইডেগার বলেছেন মানুষের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে জগত হল অপরিহার্য কিন্তু জগতে অবস্থিত অন্যান্য সত্তা বা পদার্থগুলি মানুষের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য নয়। জগতকে বাদ দিয়ে মানুষের অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ। 'Being-in-the-world' এ 'in' শব্দটি আবশ্যিক, পূর্বতঃসিদ্ধ সম্পর্ককে নির্দেশ করে কারণ জগত থেকে মানুষকে আলাদা করা যাবে না। তিনি বলেছেন মানুষ জগতের মধ্যে যে সমস্ত বস্তুকে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করে, সেগুলিকে নিছক বস্তু বা 'thing' বলা যাবে না। তিনি সেগুলিকে যন্ত্র বা 'equipment' বলেছেন। এই ভাবে জগতে যন্ত্রজালের সৃষ্টি হয়। তাঁর মতে মানুষের প্রাত্যহিক যাপিত অস্তিত্বের জন্য এই যন্ত্ররূপী জগত অপরিহার্য।

সূচক শব্দ: মানবসত্তা, জগত-সম্পৃক্ত, জ্ঞানীয় সম্পর্ক, যন্ত্র

মূল আলোচনা:

হাইডেগার ছিলেন একজন অস্তিবাদী দার্শনিক। অস্তিবাদীদের কাছে দর্শন মানেই এই ব্যক্তি মানুষের দর্শন। অস্তিবাদী দর্শনিকদের কাছে কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল ব্যাক্তি মানুষ। ব্যাক্তি মানুষের সক্রিয় মূর্ত অস্তিত্ব অর্থাৎ ব্যাক্তি মানুষের প্রাত্যহিক যাপিত জীবন। অস্তিবাদীদের কাছে দর্শন মানেই ব্যাক্তি মানুষের দর্শন। হাইডেগার অস্তিবাদী ঘরানার মধ্যে তাঁর দর্শন চর্চা করলেও নিজেকে কখনও অস্তিবাদী দার্শনিক বলেননি, তিনি নিজেকে অস্তিত্বের দার্শনিক বলতে চেয়েছেন। এমনকি তিনি তাঁর দর্শনকেও অস্তিত্বের দর্শন বলেছেন(Philosophy of existence), কখনও অস্তিবাদী দর্শন(Philosophy of existentialism) বলেননি। কারণ তিনি মনে করতেন ব্যক্তির সক্রিয়, প্রাত্যহিক, মূর্ত অস্তিত্বকে কোন তত্ত্ব বা ভাবাদর্শের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। ব্যক্তির অস্তিত্ব তার স্বতঃফূর্ত নির্বাচন। এই নির্বাচনের দ্বারা ব্যক্তি কোন কিছুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, স্বনিয়ন্ত্রিত। তিনি বলেছেন একটি টেবিল হয় বা আছে, একটি চেয়ার হয় বা আছে, একটি পেন হয় বা আছে কিন্তু একমাত্র মানবসত্তাই যথার্থ অর্থে অস্তিত্বশীল হতে

পারে। একটি টেবিলের বা চেয়ারের থাকাটা তার নিজস্ব স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচন নয় কিন্তু মানুষের অস্তিত্বশীল থাকাটা তার নিজস্ব স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচন। তাই তিনি বলেছেন মানুষ কিছু হতে চাই। তাহলে প্রশ্ন মানুষ কি হতে চাই? উত্তর হল মানুষ যা নয় তাই হতে চাই। মানুষের এই হতে চাওয়ার প্রবনতা কেই তিনি বলেছেন 'to be'। তিনি বলেছেন প্রকৃত অস্তিত্বকে অর্জন করতে হয় এবং সেই সার্মথ্য মানুষের মধ্যে আছে। এই অর্থে মানব সত্তা অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে।

হাইডেগার তাঁর মূল বই *Being and Time* এর সমগ্র অংশ জুড়ে মানব অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেই মানবসত্তাকে বোঝাতে, 'মানুষ', 'consciousness' ইত্যাদি কোনপ্রকার শব্দই তিনি ব্যবহার করেননি। তিনি তাঁর সমগ্র বই জুড়ে মানবসত্তাকে বোঝাতে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেটি হল- 'Dasein'। এটি মূলত একটি জার্মান শব্দ। 'Dasein' শব্দটিকে ভাঙলে দুটি শব্দ পাওয়া যায়- 'Da' ও 'Sein'। এর মধ্যে 'Sein' শব্দটির অর্থ হল 'to be' বা 'being' বা সত্তা, এবং 'Da' শব্দটির অর্থ হল কোন একটি স্থান যা এই জগতের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং 'Dasein' শব্দটির অর্থ হল একপ্রকার সত্তা যা এই জগতের মধ্যে রয়েছে। এই অর্থে 'Dasein' এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয় 'Being-in-the-world' অর্থাৎ জগত-সম্পৃক্ত সত্তা। সুতরাং হাইডেগারকে অনুসরণ করে বলা যায় মানবসত্তা হল 'জগত-সম্পৃক্ত সত্তা', যা এই জগতের মধ্যে রয়েছে। ফলত বোঝা যাচ্ছে হাইডেগার মানব অস্তিত্বের ক্ষেত্রে মানবসত্তার সাথে জগতের এক প্রকার সম্পর্ককে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। এবার মনে হতে পারে এই সম্পর্ক কি প্রকারের সম্পর্ক? কেন তিনি মানব অস্তিত্বের সাথে জগতকে যুক্ত করলেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা পাব জগত সম্পর্কে হাইডেগারের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার মাধ্যমে।

হাইডেগার বলেছেন মানব অস্তিত্বকে জানতে গেলে জগতকে জানা অপরিহার্য। তবে এই 'জানা' কোন জ্ঞানীয় অর্থে জানা নয়। তিনি বলেছেন জগত হল 'Dasein' এর অপরিহার্য কাঠামো। এবং এই জগত মানুষের অস্তিত্বের কাঠামোর মধ্যে রয়েছে। তাই Solomon বলেছেন, " "The World," in this special sense, is an essential characteristic or structure (*an existential*) of Dasein."1 । তাই তাঁর কাছে মানব অস্তিত্ব মানেই 'জগত-সম্পৃক্ত' মানব অস্তিত্ব। হাইডেগার বলেছেন মানুষের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে জগত হল অপরিহার্য কিন্তু জগতে অবস্থিত অন্যান্য সত্তা বা পদার্থগুলি মানুষের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য নয়। তিনি বলেছেন তাঁর পূর্বে অন্যান্য দার্শনিকরা জগত সম্পর্কে জ্ঞানীয় সম্পর্কের (Cognitive relation) কথা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর পূর্বে মনে করা হতো জগত হল আমার জ্ঞানের বিষয় এবং জগতের সাথে আমার যে সম্পর্ক তা হল জ্ঞানীয় সম্পর্ক (Cognitive relation)। এবং তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের জগত সম্পর্কে এই প্রকার ব্যাখ্যাকে তিনি ভুল ব্যাখ্যা বলে মনে করেছেন। তাই Solomon বলেছেন, "It has been the traditional

mistake of philosophers to suppose that our *consciousness* of the world is primarily a knowing of the world (compare Descartes, Kant, and Husserl)."2 । তাই হাইডেগার মানবসত্তাকে বোঝাতে 'Dasein' নামক শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার দ্বারা এই বিষয়ী-বিষয় দ্বৈততা দূরীভূত হয়ে যায়। 'Dasein' শব্দটি ব্যবহার করে তিনি মূলত মানুষের সাথে জগতের আবশ্যিক ও প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক সম্পর্ককে বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন মানুষের সাথে জগতের প্রাথমিক বা মুখ্য সম্পর্ক কখনও জ্ঞানীয় সম্পর্ক হতে পারে না, তা হল ব্যবহারিক সম্পর্ক। 'Dasein' শব্দটি ব্যবহারের ফলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে মানবসত্তা আত্ম-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, সে নিজের এবং জগত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। হাইডেগার বলেছেন মানুষ হল জগতে নিক্ষিপ্ত এক সত্তা। মানুষের অস্তিত্ব হল জগত সাপেক্ষ। বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায়, জগতের সত্তার মাঝেও আমি আছি এবং আমার সত্তার মাঝেও জগত আছে। জগতকে বাদ দিয়ে মানুষের অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ। কারণ জগতই একমাত্র ক্ষেত্র মানুষের সম্ভাবনাগুলি রূপায়নের জন্য। এই অর্থে 'Being-in-the-world' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন। এবার মনে হতে পারে এখানে এই 'in' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? এই 'in' শব্দটি কি কোন বিশেষ তাৎপর্যকে সূচিত করে? এই 'in' শব্দটি তিনি কি অর্থে ব্যবহার করেছেন তা দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে। এই দুটি শব্দ হল- 'Being-in-the-world' এবং 'Apples are in the box'। এখানে দুটি ক্ষেত্রেই 'in' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দুই স্থানে 'in' শব্দটি দুই রকম অর্থকে সূচিত করে।

প্রথমত, প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ 'Being-in-the-world' এ 'in' শব্দটি আবশ্যিক সম্পর্ককে নির্দেশ করে কারণ জগত থেকে মানুষকে আলাদা করা যাবে না। অন্যদিকে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ 'Apples are in the box' এ 'in' শব্দটি আপতিক সম্পর্ককে নির্দেশ করে। আপেল এবং বাক্সের মধ্যে আপতিক সম্বন্ধ কারণ তাদের একটিকে অন্যটির থেকে আলাদা করা যায় এবং একে অপরের থেকে আলাদা থাকতে পারে।

দ্বিতীয়ত, 'Being-in-the-world' বাক্যে জগত ও মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক তা হল পূর্বতঃসিদ্ধ বা 'a priori' কারণ মানুষের অস্তিত্বের গঠনের মধ্যেই জগত রয়েছে। সুতরাং জগতের অস্তিত্ব কোন অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে হয় না। আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া মানেই আমার জাগতিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। অপরদিকে আপেল ও বাক্সের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা হল অভিজ্ঞতা নির্ভর। কারণ আপেলগুলি বাক্সের মধ্যে রয়েছে কিনা তা দেখার জন্য আমার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। সুতরাং 'Apples are in the box' বাক্যে যে প্রকার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে তা পূর্বতঃসিদ্ধ বা 'a priori' নয়।

তৃতীয়ত, আপেলের অস্তিত্বের জন্য বাক্স অপরিহার্য নয়, কারণ বাক্সকে আমরা স্থগিত রাখতে পারি। কিন্তু অন্যদিকে মানুষের অস্তিত্বের জন্য জগত হল অপরিহার্য। তাই জগতকে কখনই বন্ধনীর মধ্যে রাখা যাবে না। জগত ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক হল অবিচ্ছেদ্যের সম্পর্ক বা 'Inalienable relation', এক্ষেত্রে এদের একটিকে অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাই জগত ও মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক তা হল 'Primary relation' বা আদি সম্পর্ক বা মুখ্য সম্পর্ক। তিনি বলেছেন তাঁর আগে জগতের সাথে মানুষের জ্ঞানীয় সম্পর্কের কথা বলা হতো। এই জ্ঞানীয় সম্পর্ক বা 'Cognitive relation' হল একপ্রকারের তাত্ত্বিক সম্পর্ক, যেখানে বিষয়ী এবং বিষয় আলাদা। এই জ্ঞানীয় সম্পর্ক ছাড়াও তিনি আর এক প্রকারের সম্পর্ক স্বীকার করেছেন তা হল ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক সম্পর্ক। এই ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক সম্পর্কই তাঁর কাছে প্রাথমিক সম্পর্ক। ব্যবহারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিষয়ী এবং বিষয় আলাদা হতে পারে না, তারা পরস্পর সম্পৃক্ত। ব্যবহারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ সব সময় অবহিত। তাই তিনি বলেছেন এই ব্যবহারিক সম্পর্কটা হল মুখ্য এবং জ্ঞানীয় বা তাত্ত্বিক সম্পর্কটা হল গৌণ। তিনি জ্ঞানীয় সম্পর্ক বা তাত্ত্বিক সম্পর্ককে অস্বীকার করেননি, তিনি বলেছেন এটি হল গৌণ এবং এটিকে প্রাথমিক সম্পর্ক বা ব্যবহারিক সম্পর্ক থেকে পাওয়া যায়। এই জন্য হাইডেগার বলেছেন, "Man is practically bound up with the world."। এ বিষয়ে M. King বলেছেন, "The original disclosure of man's own being in a relational-whole constitutes the fundamental structure of his being as being-in-the-world."3

হাইডেগার বলেছেন জগতের প্রতি মানুষের যে প্রাথমিক মনোভাব তা হল ব্যবহারিক মনোভাব। এর ফলে মানুষ জগতের বিভিন্ন বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। এবং মানুষ তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য জগতের অন্যান্য বস্তুগুলিকে ব্যবহার করতে শেখে। ফলে জগতের বস্তুগুলির প্রতি মানুষের একপ্রকার আগ্রহ তৈরি হয়। এ বিষয়ে Solomon বলেছেন, "Heidegger characterizes these general 'practical' attitudes as *concern* (*Besorge*)."4 । হাইডেগার জগতের বস্তুগুলির প্রতি এই ব্যবহারিক মনোভাবকে *concern* বলেছেন। তিনি বলেছেন মানুষ জগতের মধ্যে যে সমস্ত বস্তুকে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করে, সেগুলিকে নিছক বস্তু বা 'thing' বলা যাবে না। তিনি সেগুলিকে যন্ত্র বা 'equipment' বলেছেন। Solomon বলেছেন, "Being-in-the-world is primarily using entities, and the entities thus encountered are not *things*: *we shall call those entities which we encountered in concern* 'equipment'."5 । ফলে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে হাইডেগারের কাছে বস্তু বা 'thing' এবং যন্ত্র বা 'equipment' এর মধ্যে পার্থক্য আছে। Dreyfus বলেছেন, "Heidegger first notes that we do not usually encounter (use, talk about, deal with) "mere things," but

rather we use things at hand to get something done. These things he calls "equipment" [*Zeug*], in a broud enough sense to include whatever is useful: tools, materials, toys, clothing, dwellings, etc."6 । হাইডেগার বলেছেন তাঁর পূর্বে অধিকাংশ দার্শনিকই একটি বচনকে বিশ্লেষণাতীতভাবে সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। বচনটি হল- "The world is full of things."। অর্থাৎ এই জগত হল অসংখ্য বস্তুর সমষ্টি। এবং এই বস্তুগুলিকে সরাসরি জানা যায়, অর্থাৎ এই বস্তু গুলির সাথে আমার সম্পর্ক হল জ্ঞানীয় সম্পর্ক। কিন্তু হাইডেগার বলেছেন এই সব বস্তুকে সরাসরি জানা যায় না, জানি সেগুলিকে ব্যবহার করার মাধ্যমে। তিনি বলেছেন একটি বস্তুকে ব্যবহার করার পর সেই বস্তু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয়, এই জ্ঞান হল যন্ত্রের জ্ঞান। তিনি আরও বলেছেন এই 'বস্তুর' ধারণা হল একটি আরোহণমূলক ধারণা বা প্রাপ্ত ধারণা, যা আমরা আরোহণ করি 'যন্ত্রের' ধারণা থেকে। সুতরাং যন্ত্রের ধারণা থেকে আমরা বস্তুর ধারণা লাভ করি। তাই হাইডেগার বলেছেন, "The notion of *thinghood* is a derivative concept, derivative of the concept of the *equipment*."7

হাইডেগারের কাছে জগতটা একটা যন্ত্র বা 'equipment' বা 'tool', যা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বস্তু বা 'thing' এবং ব্যবহার যোগ্য যন্ত্র বা 'equipment' এর মধ্যে তফাৎ করেছেন। পার্থক্যগুলি এভাবে আলোচনা করা যায়-

প্রথমত, বস্তু বা 'thing' এর কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে বা লক্ষণ দেওয়া যায়। যেমন- দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, বিস্তৃতি, আকার ইত্যাদি হল বস্তু বা 'thing' এর লক্ষণ। এই লক্ষণগুলির সাহায্যে আমরা বস্তুকে চিনে থাকি, পরিচয় দিয়ে থাকি। অপরদিকে যন্ত্র বা 'equipment' এর এইরকম কোন লক্ষণ দেওয়া যায় না বা নিজস্ব কোন লক্ষণ নেই। যন্ত্রকে শুধুমাত্র নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য হল একটিই কোন উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হওয়া। তাই যন্ত্রের উপরে কোন লক্ষণ আরোপ হয় না, লক্ষণ আরোপ হয় বস্তুর উপর। তাই হাইডেগারের কাছে যন্ত্র মানেই ব্যবহার যোগ্য যন্ত্র।

দ্বিতীয়ত, বস্তু বা 'thing' হল "context free", অর্থাৎ 'প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ'। প্রসঙ্গ নিরপেক্ষতা বস্তুর একটি লক্ষণ। 'প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ' কথাটির অর্থ হল কোন বস্তুকে চিনতে গেলে বা সংজ্ঞা দিতে গেলে কোন কিছুর প্রসঙ্গ প্রয়োজন হয় না। যখন আমরা কোন বস্তু টেবিল এর কথা বলি তখন অন্য কোন প্রসঙ্গের প্রয়োজন হয় না বরং ওই টেবিল নামক বস্তুটিকে কতকগুলি গুনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করি। তাই বস্তু বা 'thing' হল "context free"। অন্যদিকে 'equipment' বা যন্ত্র হল "context dependent" বা প্রসঙ্গ সাপেক্ষ। যন্ত্র মানেই ব্যবহার যোগ্য যন্ত্র, যা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হয়। এখন কোন অবস্থায়, কোন পরিস্থিতিতে একটি যন্ত্র কোন

উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হবে তা প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে। একটা যন্ত্রকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে পারি। জগতের সাথে আমার ব্যবহারিক সম্পর্ক তাই অনেক রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাদের হতে হয়। সেই কারনে যন্ত্র হল "context dependent" বা প্রসঙ্গ সাপেক্ষ।

তৃতীয়ত, বস্তু বা 'thing' হল নৈর্ব্যক্তিক, যা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে না। যেমন- টেবিলের সাধারন ধারণা সবার কাছে সমান। কারণ ব্যক্তির সাথে বস্তুর কোন সম্পর্ক নেই। টেবিল নামক বস্তুর সাথে ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই, বস্তু টেবিল হল ব্যক্তি নিরপেক্ষ। অপরদিকে যন্ত্র যেহেতু প্রসঙ্গ সাপেক্ষ তাই তা ব্যক্তি সাপেক্ষ। কারণ যন্ত্র নিজে ক্রিয়া করতে পারে না। যন্ত্রকে ব্যবহার করতে হয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। যখন আমি একটি পেনকে ব্যবহার করি কিছু লিখতে তখন পেনটি আমার কাছে যন্ত্ররূপ। এবং এর পেনটির সাথে আমার একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা হল ব্যবহারিক সম্পর্ক। তাই যন্ত্র হল ব্যক্তি সাপেক্ষ।

চতুর্থত, বস্তুর সাথে আমার বাহ্যিক সম্পর্ক বা 'external relation'। জগতকে যখন বস্তু হিসেবে দেখবো তখন জগতের সাথে আমার বাহ্যিক সম্পর্ক। এবং জগতকে আমি ব্যাখ্যা করবো কতকগুলি লক্ষণ দিয়ে। হাইডেগার বলেছেন পাশ্চাত্য দর্শনে জগত বিষয়ে বা জগতের সাথে আমাদের সম্পর্ক বিষয়ে যে সব তত্ত্বগুলি আছে সেখানে জগতকে বস্তু হিসেবে দেখা হয়েছে বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি বলেছেন তাঁর পূর্বে সবাই বস্তুরূপী জগতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু জগতের সাথে আমাদের কোন বাহ্যিক সম্পর্ক নেই। যন্ত্ররূপী জগতের সাথে আমাদের আন্তঃসম্পর্ক বা 'Internal relation'। কারণ যন্ত্রকে বাদ দিয়ে আমরা আমাদের কর্মের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারিনা। যেমন- যে চসমাটা দিয়ে আমি দেখি, যা আমার বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে সেটি আমার কাছে বস্তু নয়, যন্ত্র। এবং এই চসমাটা আমার থেকে আলাদা নয়। এইরূপ যন্ত্ররূপী জগতও আমার থেকে আলাদা নয়, আমার অস্তিত্বের মধ্যেই তার অবস্থান।

পঞ্চমত, বাহ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিষয়ী-বিষয় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ জগতটা যখন আমার কাছে বস্তু তখন জগত আমার কাছে বিষয় এবং আমি হলাম বিষয়ী। কিন্তু যন্ত্রের সাথে আমার বিষয়ী-বিষয় সম্পর্ক নয়। যন্ত্র আমার কাছে কোন বিষয় নয়। অর্থাৎ জগত যখন যন্ত্র তখন তা আমার কাছে কোন বিষয় নয়, বরং তাকে বাদ দিয়ে আমি অসম্পূর্ণ।

ষষ্ঠত, হাইডেগারের মতে বস্তুগুলি বস্তু হিসেবে পরস্পর একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। যেমন- বস্তুরূপী চেয়ার, বস্তুরূপী টেবিল থেকে পরস্পর ভিন্ন। এদের নিজেদের মধ্যে কোন আন্তঃসম্পর্ক নেই। অন্যদিকে যন্ত্রগুলির মধ্যে কিন্তু আন্তঃসম্পর্ক আছে। কারণ একটি যন্ত্র অপর একটি যন্ত্রের উপর নির্ভর করে। এভাবেই তারা একে অপরের সাথে যুক্ত। এভাবে জগতে যন্ত্রজালের সৃষ্টি হয়।

সুতরাং মূল কথা হল হাইডেগার তাঁর দর্শনে জগতকে যন্ত্র বা ‘equipment’ রূপে দেখেছেন। এই যন্ত্রের সাথে মানুষের সম্পর্ক হল ব্যবহারিক সম্পর্ক। এই অর্থে একটি কলম যেটি দিয়ে আমি লিখি সেটি হল যন্ত্র। কারণ এই কলমটি দিয়ে আমি কিছু লিখতে চাই, এবং এই কারণে আমি কলমটিকে ব্যবহার করি আমার বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। এই ব্যবহারিক সম্পর্ককে বোঝাতে বলা যেতে পারে- “I deal with the pen” অথবা “I use the pen”। কিন্তু আমাকে যদি এই কলমটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে আমার উদ্দেশ্য পূরণ ব্যাহত হবে। তিনি বলেছেন জন্মের পর থেকে মানব সত্তা এই জগতের সম্মুখীন হয় এবং কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জগতকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে চলে। হাইডেগার বলেছেন এই জগত শুধু যন্ত্র নয়, এই জগত হল যন্ত্রজাল। এই জগতের প্রতিটি বস্তু অন্য বস্তুকে নির্দেশ করে। Dreyfus বলেছেন, “Equipment always refers to other equipment...An “item”of equipment is what it is only insofar as it refers to other equipment and so fits in a certain way into an “equipmental whole”.”8 । এভাবেই সৃষ্টি হয় যন্ত্রজালের। যেমন- কলম দিয়ে লিখতে গেলে কলম, খাতা, কালি, টেবিল ইত্যাদি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এভাবেই জগতে একটি যন্ত্র অন্য যন্ত্রকে নির্দেশ করে- “Equipment–in accordance with its equipmentality—always is in term of its belonging to other equipment: inkstand, pen, ink, paper, blotting pad, table, lamp, furniture, windows, doors, room.”9 । হাইডেগার বলেছেন তাঁর পূর্বে জগতকে বস্তু হিসেবে দেখা হতো। কিন্তু তিনিই প্রথম বললেন জগত হল যন্ত্ররূপ তাই জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক হল ব্যবহারিক সম্পর্ক। তিনি বলেছেন একমাত্র মানুষই জগতকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এজন্যই মানুষের সাথে অন্যান্য সত্তার পার্থক্য আছে। একমাত্র মানুষেরই ‘Ontological existence’ আছে। একমাত্র মানুষই নিজের সম্পর্কে এবং জগত সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারে, জগতকে পরিবর্তন করতে পারে এবং জগতের সাথে তার ব্যবহারিক সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত হতে পারে। তিনি বলেছেন আমাদের জগতের এই ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের জগতকে ব্যবহার করার বিষয়ে সাবধান হতে হবে। এই ব্যবহারিক সাবধানতাকে তিনি বলেছেন ‘Circumspection’। জগত সম্পর্কে এই ব্যবহারিক সাবধানতা অবলম্বন না করলে জগতের মধ্যে থাকা যন্ত্রগুলি নিছক বস্তুতে পরিণত হতে পারে। তিনি বলেছেন তিন ধরনের বাঁধা পেলে যন্ত্র কোন কোন সময় বস্তুতে পরিণত হয়।

এই ভাবে হাইডেগার মানব অস্তিত্বের সাথে জগতকে যুক্ত করেছেন। তাঁর কাছে জগত যন্ত্রস্বরূপ। যে যন্ত্রকে ব্যবহার করে মানুষ তার সম্ভাবনাগুলিকে রূপায়নের মাধ্যমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

তথ্যসূত্রঃ

১. Robert C. Solomon, *From Rationalism to Existentialism* (New York: Haspers & Row Publishers, 1972), 202.
২. Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 203-204
৩. Magda King, *Heidegger's Philosophy* (New York: The Macmillan Company,1964), 71.
৪. Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 204
৪. Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 203-204
৬. Hubert L. Dreyfus, *Being-in-the-World* (Cambridge: The MIT Press, 1972), 62.
৭. Solomon, *From Rationalism to Existentialism*, 204
৮. Dreyfus, *Being-in-the-World*, 62.
৯. Dreyfus, *Being-in-the-World*, 62.

গ্রন্থপঞ্জীঃ

১. Barrett, Willam. ***Irrational Man.*** London: Heinemann, 1961.
২. Dreyfus, Hubert L. ***Being-in-the-World.*** Cambridge: The MIT Press, 1972.
৩. Grene, Marjorie, ***Introduction to Existentialism.*** Chicago, U.S.A: The University of Chicago, 1948.
৪. Heidegger, Martin. ***Being and Time.*** Trans. John Macquarrie & Edward Robinson. New York: Hasper & Row Publishers, 1962.
৫. King, Magda. ***Heidegger's Philosophy.*** New York: The Macmillan Company, 1964.
৬. Macquarrie, John. ***Existentialism.*** New York: Penguin Press, 1972.
৭. Solomon, R. C. ***From Rationalism to Existentialism.*** New ৮. York: Haspers & Row Publishers, 1972.
Warnock, Mary. ***Existentialism.*** New York: Oxford University Press, 1978.
৯. সরকার, স্বপ্না. ***অস্তিবাদী দর্শন ও প্রতিভাস বিজ্ঞান.*** কলেজস্ট্রীট, কলকাতা ৭৩: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৩.

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘ডমরু-চরিত’: নিছক আড্ডা ও উদ্ভট-ব্যঙ্গ-কৌতুক কাহিনি

দেবাশিস মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি

‘ডমরু-চরিত’ গল্প গ্রন্থটি সমগ্র ত্রৈলোক্য সাহিত্যের নির্যাস, গ্রন্থটিতে মোট সাতটি গল্প আছে। এই সাতটি গল্প প্রথম প্রকাশিত হয় ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকার সাতটি পুজো সংখ্যায়। এই গল্প সাতটিতে ডমরুধরের জীবনের নানান অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে। ডমরুর সমতুল্য চরিত্র শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর যে কোনো দেশের সাহিত্যে বিরল। শিশিরকুমার দাস বলেছেন– “ডমরুধর ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য সৃষ্টির প্রতীক। অর্থাৎ তাঁর উদ্ভট কল্পনা সামাজিক ব্যঙ্গের মূর্তিমান বিগ্রহ।”[১] ডমরুধরের আসরে গাঁজা, গুলি বা মদ চলে না, তবে কল্পনার আকাশে ঘুড়ি ওড়ে। এই আসরে ডমরুর নিত্যসঙ্গী হল লম্বোদর, শঙ্কর ঘোষ, পুরোহিত। অবশ্য মাঝে মাঝে কলেজে পড়া ছেলে বা জাহ্নবী ঘাঁই, গণপতি ভড় বা পুঁটিরাম চাকীও দেখা দেয়। ত্রৈলোক্যনাথের সৃষ্ট ডমরুধরকে ‘মুক্তামালা’র ‘মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্প’ পর্বটির তিনুবাবুর উত্তরসূরী ভাবা যায়। সে বয়সে বৃদ্ধ, চেহারা কালো এবং কদাকার, স্বার্থের প্রয়োজনে সর্ববিধ নীতিবোধ-বিবর্জিত। ইহলোক-পরলোক সবই ডমরুর চেনা, সকল স্থানেই সে যেন বিরাজমান এবং সমান তৎপর। কুমির, ভূত, সুন্দরবনের চড়ুই পাখির মতো মশা, বাঘ– সবই তার একান্ত প্রণত প্রজা। সব মিলিয়ে ব্যঙ্গ, কৌতুক ও উদ্ভটের সার্থক প্রয়োগে ‘ডমরু-চরিত’ হয়ে উঠেছে ত্রৈলোক্য-সাহিত্যের সার্থকতম ফসল।

প্রথম গল্পটির পটভূমিকা হিসাবে যে আড্ডার স্থানটি নির্বাচিত হয়েছে সেটি হল ডমরুধরের পূজার দালান। দেহ ও আত্মাঘটিত অদ্ভুত কল্পনা আছে গল্পটিতে। ডমরুধর আড্ডায় সকলের কৌতুহল সৃষ্টি করে তারপর বেশ সরস করে ‘সন্ন্যাসী বিভ্রাটে’র গল্পটি বলেছে। ডমরুধর যে পূজো করছে তার অন্যতম প্রধান কারণ, পূজোর সময় আবাদের প্রজারা এসে যে প্রণামী দেয়, তা থেকে তার দু-পয়সা রোজগার হয়। পুজো করার এই ধরনের ব্যবসার মধ্যে দিয়ে ত্রৈলাক্যনাথ চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে তার দূরদৃষ্টির চরম সার্থকতা লক্ষ করা যায় বর্তমান বারোয়ারী পুজোর মাধ্যমে- “শুনিয়াছি যে, কলিকাতার পূজা করা এক নূতন ব্যবসা হইয়াছে । একটি প্রতিমা খাড়া করিয়া বন্ধু-বান্ধবদিগকে লোক নিমন্ত্রণ করে, পরে তাহাদের কান মলিয়া প্রণামি আদায় করে। পূজা করিয়া অনেকে দুই পয়সা উপার্জন করে।”[২] এই পূজার থেকে অর্থ লাভের আশায় একদল লোক যেমন বেশি উৎসাহী ছিল, তেমনি নব্য

শিক্ষিত সম্প্রদায় অধিক পরিমাণে উদাসীন ছিল– কোনো বিষয়ই লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। নব্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে ত্রৈলোক্যনাথ ডমরুধরকে দিয়ে বলিয়েছেন যে বাবুরা এখন দেশ থেকে বিদেশে গিয়ে হাওয়া সেবন করেন আর অন্যদিকে বাপ-পিতামহের পুজোর দালান ছুঁচো-চামচিকাতে অপরিষ্কার করে। কথাটি নির্ম্মম হলেও সত্য। এর কারণ এই নয় যে ত্রৈলোক্যনাথ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন বা নব্যশিক্ষিতরা পূজা করে না বলে তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এর কারণটি তিনি লম্বোদরের উক্তির মাধ্যমে বলেছেন যে সেকালে পূজার সময় লোক বিদেশ থেকে বাড়ি আসত, বন্ধুদের সাথে মিলিত হতো, যার যেমন ক্ষমতা মায়ের পূজা করত, গরিব দুঃখীরা অন্তত এই সময় এক সরা খয়ে-মুড়কি ও নারিকেল নাড়ু খেতে পারত। পূজা সম্বন্ধে এই গরিবদের জন্যেই ত্রৈলোক্যনাথের সহানুভূতি ছিল, দরিদ্রের অভাব দূর করার জন্যই নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি এই কথাগুলো বলেছেন । যারা আমোদ প্রমোদ করে পয়সা নষ্ট করে অথচ পূজা করে না, পূজাকালে প্রাচীন ঐতিহ্যের পাশাপাশি দুঃখীদের সামান্যতম সাহায্যও হয়, তাদের উদ্দেশ্য করেই ত্রৈলোক্যনাথ এখানে ব্যঙ্গ করেছেন।
গল্প মধ্যে সন্ন্যাসীর বায়ু আহার করে থাকা, মাকাল ঠাকুরের ভর করা ইত্যাদি ঘটনাগুলো হুজুগপ্রিয় বাঙালি জাতির সাময়িকভাবে সময়কাটানোর খোরাক জুগিয়েছে। বাঙালি যেমন বেশি পরিমাণে হুজুগ প্রিয় তেমনি একটি হুজুগ নিয়ে বেশিদিন থাকতেও পারে না। তাই তারা একবার সন্ন্যাসী হুজুগে মেতে উঠেছে আবার পরক্ষণেই মাকাল ঠাকুরের হুজুগে মেতে উঠেছে। ত্রৈলোক্যনাথ বাঙলির এই হুজুগপ্রিয়তাকেই ব্যঙ্গ করেছেন।

সন্ন্যাসীর চাল বুঝতে পেরেও ডমরুধর অর্থের লোভে সন্ন্যাসীর ফাঁদে পা দিয়েছে। সন্ন্যাসী ওষুধের সাহায্যে ডমরুর আত্মাকে তাঁর শরীর ছাড়া করে নিজের আত্মা তার মধ্যে ঢুকিয়ে শরীরটি অধিকার করেছে। সন্ন্যাসী যে ভণ্ড তা তার কথাতেই প্রকাশিত হয়েছে। সন্ন্যাসীর ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়নি, তাই সে ডমরুর বাগ্দত্তা বধূকে বিয়ে করে আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছে। সন্ন্যাসীর এরকম ভোগাকাঙ্ক্ষার প্রতিই লেখক তীব্র কটাক্ষ করেছেন।

ডমরুর আত্মা দেহ ছেড়ে আকাশে ঘুরে বেড়াবার সময় যমদূতের হাতে ধরা পড়ে যমরাজের সভায় গিয়ে পৌঁছেছে। যমদূতের হাতে ডমরুর আত্মা ধরা পড়ার বর্ণনাটি বেশ কৌতুককর । তারপর যখন যমদূত জানতে পারে মৃত্যুর আগেই ডমরুর আত্মা যমপুরী এসেছে তখন যমদূতের আজ্ঞায় ডাঙ্গস মেরে ডমরুকে মর্ত্যে পাঠানোরর দৃশ্যটিও বেশ মজাদার।

ডমরুধর মর্তে ফিরে এসে অন্য কোনো উপায় না দেখে সন্ন্যাসীর শরীরেই ঢুকতে বাধ্য হয়েছে। সন্ন্যাসীর শরীরে অনেক কষ্টভোগ করেছে সে। ডমরুর সব রকম কষ্টের জন্য তাঁর অর্থলোলুপতাই দায়ী। ত্রৈলোক্যনাথ ডমরুধরের মতো অর্থলোভাতুর

লোকদের ডমরুর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন। এরকম বিপদের সময় ভক্ত একান্তভাবে দেবীকে ডাকতে আরম্ভ করেছে। অবশেষে সন্ন্যাসী যখন ডমরুর মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করতে যাচ্ছে তখন সহ্য করতে না পেরে ডমরু দেহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর অনেক জায়গায় ঘুরে সুন্দরবনে বাঘের খোলসের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে সন্ন্যাসীর কাছে এসে ভয় দেখিয়ে নিজের শরীর দখল করেছে– এ সমস্ত দৃশ্যে ত্রৈলোক্যনাথ বেশ কৌতুকবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে অবশ্য উদ্ভট রসের পরিচয়ও আমরা লক্ষ করি, কারণ কোনো মানুষের বাঘের ছালের মধ্যে ঢুকে সত্যিকারের বাঘের মতো আচরণ করা পুরোপুরি অসম্ভব। যাইহোক অবশেষে দেবীর কৃপায় ডমরু সমস্ত বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং স্বদেশী কোম্পানি খুলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। সেজন্য সে প্রতি বছর দেবীর পূজা করে এবং সেই পূজা উপলক্ষ্যেই আড্ডার সূত্রপাত।

ডমরুধর আগের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে নিজের অতীত জীবনের কাহিনি বলেছে দ্বিতীয় গল্পটিতে। ‘ডমরুচরিতে’র সাতটি গল্পের মধ্যে ডমরুধরের জীবনের সমগ্র কাহিনি বিক্ষিপ্তাকারে আছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা ডমরুধরের মধ্যে দিয়ে লেখক তা দেখিয়ে আমাদের বিপুল অর্থলোলুপতাকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। এই গল্পটিতে ডমরুধর বাল্যকালের দরিদ্র অবস্থা থেকে আরম্ভ করে ধনী হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার বর্ণনা করেছেন। সংসারে গরীবের স্থান খুব সংকীর্ণ একথা সে উপলব্ধি করেছে এবং লোককে ঠকিয়ে একজন ধনী ব্যক্তি হয়েছে। প্রয়োজনে সে চুরিও করেছে।

পিতা-মাতা জীবিত থাকতেই ডমরুর প্রথম পক্ষের বিয়ে হয়। পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যায়। প্রহ্লাদ সেনের মেয়ে মালতীকে দেখে তাঁর হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে দরিদ্র, তাকে কেউ মেয়ে দিতে চায় না, সে জন্যই সে ঝিকে বশীভূত করে এবং সে যে সম্পন্ন ব্যক্তি সেই কথা মেয়ের বাবাকে বলতে বলেছে। অবশেষে নানান ফন্দি করে মালতীকে সে বিয়ে করেছে। সে নকল গয়না একশো টাকায় কিনে শ্বশুরকে ঠকিয়েছে। সে যে একশো টাকা জোগাড় করেছে তারও আলাদা ইতিহাস আছে । মশারির জন্য পেরেক পুঁততে গিয়ে দেওয়াল আলমারির সন্ধান পেয়ে সে গোলক দে-র জমানো একশো মোহর বের করে আবার দেওয়াল মেরামত করে দিয়েছে। ডমরু এই মোহরগুলি ফিরিয়ে তো দেয়নি উপরন্তু মনে মনে সে যে কথা ভেবেছে তা হাস্যাস্পদ – “ভগবান আমাকে মোহরগুলি দিয়াছেন। সে টাকা ফিরিয়ে দিলে আমার মহাপাতাক হইবে।”[৩] ডমরুর আত্মপক্ষ সমর্থনের এই রীতিটি কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক।

দ্বিতীয় গল্পের মধ্যে আরও কিছু হাস্যকর ঘটনা আছে- সুন্দরবনে অদ্ভুত জীব, মশার মাংস, শূন্য পথে লোহার সিন্ধুক, সন্ন্যাসীর কালীঠাকুর, চুম্বকের সার এবং কুম্ভীর বিভ্রাট। ডমরুধর গোলক বাবুর একশো মোহর নিয়ে এবং কিছু অর্থ সঞ্চয় করে সুন্দরবনে আবাদ কিনেছে। ডমরু সস্তায় সম্পত্তি কিনে লাভবান হতে চেয়েছিল কিন্তু ওই আবাদে চড়ুই পাখির মতো এক প্রকার অদ্ভুত জীব ছিল, যার জন্য কোনো প্রাণীই ওই অঞ্চলে বাস করতে পারে না। ডমরু ওই অদ্ভুত জীবগুলিকে 'মশা' বলেছে। কিন্তু ডমরুও দমবার পাত্র নয় সে শক্ত জালের মশারি করে তার ভিতর তীরন্দাজ রেখে মশাগুলোকে বধ করে শেষ করেছে। মশা মারার দৃশ্যটিতে ত্রৈলোক্যনাথ এক অবিশ্বাস্য কৌতুক রস সৃষ্টি করেছেন। এই সময় মশা মারতে এবং জমি সংস্কার করতে ডমরুর সব টাকা শেষ হয়ে যায়, ফলে তার আরও টাকার সন্ধান করতে হয়।

ডমরু যখন দোকানে কাজ করত তখন থেকে সরকেল মশায়ের সাথে তার আলাপ। সরকেল মশায়কে সে ধর্মের দোহাই দিয়ে ঠকাত। সরকেল মশায়কে ঠকানোর মধ্য দিয়ে দোকানদারদের অসাধু নীতির আভাস পাওয়া যায়। লেখক এখানে এই সব দোকানদারদের ব্যঙ্গ করেছেন। পূর্ব আলাপ স্মরণ করে ডমরুধর সরকেল মশায়ের কাছ থেকে টাকা নেবে ঠিক করেছে। কিন্তু তার আগেই সন্ন্যাসীরা সরকেল মশায়ের বাড়িতে চুরি করে, ঘটনাচক্রে ডমরুধরও তাদের সাথে জড়িয়ে পড়ে। আর এই চুরির জন্যই সরকেল মশায়ের কাছ থেকে ডমরুর ধন নেওয়ার আর প্রয়োজন হয় না। অবশ্য সে যে চুরির সঙ্গে যুক্ত ছিল একথা মানতে চায় না। লম্বোদর যখন বলে "সে চোরগণ তোমার অপরিচিত লোক ছিল না।"[৪] তখন ডমরুর উক্তি সত্য হলেও কৌতুককর। এই শ্রেণির লোকেরা চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে, কিন্তু সেই চুরি বা মিথ্যাকে কিছুতেই লোকের কাছে প্রকাশ করে না।

ডমরুধরের অর্থ কামনার হাস্যকর চিত্রণ আর একটি ঘটনা অর্থাৎ 'কুম্ভীর-বিভ্রাট' অংশে বিশেষভাবেই প্রকট হয়ে উঠেছে। ডমরুধরের আবাদের কাছে নদী ছিল, সে নদীতে একটি ভীষণ আকৃতির ভয়ানক কুমির ছিল। একবার এক পূর্ব দেশীয় ভদ্রলোক কলকাতা থেকে সপরিবারে দেশে ফিরছিলেন হঠাৎ সেই ভীষণ কুমিরটি নৌকা ডুবিয়ে সকলকে গিলে ফেলেছিল। এদের মধ্যে একটি মহিলা সর্বাঙ্গ বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিতা ছিলেন। ডমরু তখন ভাবল কুমিরকে বধ করে সেই গহনার মালিক হবে। অনেক খরচ করার পরও ডমরুর সে আশা ব্যর্থ হল। ডমরুর আশা ব্যর্থ হলেও আমরা তাতে প্রচুর মজা উপভোগ করি। মানুষের চরমতম অর্থমোহ ডমরুধরের 'কুম্ভীর বিভ্রাট' শীর্ষক গল্পাংশে দেখিয়ে লেখক হাস্যরসের হালকা গতিতে ব্যঙ্গ করেছেন।

এই গল্প শুনে, গল্প যে সত্য শঙ্কর ঘোষ তার প্রমাণ চাইলে ডমরু তার কোমরে ব্যথার জন্য বাধা দাঁত দেখায়, তখন লম্বোদর বলে সেই কুমির যদি তাল গাছ অপেক্ষা বৃহৎ ছিল, তবে তার দাঁত এত ছোট কেন?' ডমরুধর তখন বলে– "অনেক মানুষ

খাইয়া সে কুমীরের দাঁত ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল।”[৫] ডমরুর এমন উত্তর শুনে আমরা হেসে গড়াগড়ি দিই, আমাদের মনে কৌতুকবোধ জাগ্রত হয়।

ডমরু পূর্ব জন্মে দেব-সেনাপতি কার্তিক ছিল, বিয়ে করে সংসারী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে দেবী তাকে মর্ত্যে পাঠিয়েছেন। তৃতীয় গল্পের মধ্যে ডমরুধর সেটিই প্রমাণ করেছে। কার্তিককে স্বর্গে কেউ মেয়ে দেবে না বলেই দেবী তাঁর প্রিয় পুত্র কার্তিককে মর্তে পাঠিয়েছেন। সেই জন্যেই ডমরুবেশী কার্তিক এলোকেশীকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। কার্তিকের প্রতি নন্দীর একটু ঈর্ষা আছে কেনানা কার্তিক দেবীর প্রিয় পুত্র তাই। নন্দীর অভিশাপের জন্য ডমরুধরই যে কার্তিক সে কথা সে ভুলে গিয়েছে।

গল্পটিতে দেখা যায় ডমরুধরের দুটি সত্তা প্রকাশ হয়ে বেশ জ্বালাতন আরম্ভ করেছে। ডমরুধরের অন্তর ও বাহির এই দুটি সত্তাকেই লেখক ‘ঘরে গৌতম বাহিরে গৌতম’ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। ডমরু নিজের মতো এলোকেশীকেও চরিত্রহীন বিচার করে অশান্তিতে কাল কাটিয়েছে। মনের শান্তির জন্য এলোকেশীকে ছেড়ে ডমরু সুন্দরবনে গিয়ে বাস করেছে। সেখানেও দুটো ডমরুধর দেখে তার সন্দেহের জ্বালা আরোও বেশি হয়েছে। ডমরুধরের এলোকেশীর প্রতি সন্দেহের অবসান হয়েছে এলোকেশীর কাছে ঝাঁটা খেয়ে, আর তার সাথে সাথে ডমরুর দুটো সত্তাও এক হয়েছে। এলোকেশী যে পতি পরায়ণা ঝাঁটা মেরে সে কথা প্রমাণ করে দেওয়া মাত্র ডমরুধর গলবস্ত্র হয়ে পায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করেছে- “মা, তুমি কে বল?”[৬] স্ত্রীর প্রতি ডমরুধরের এরকম প্রশ্ন বেশ কৌতুককর।

বহুচারী বলেই ডমরুধর চিরকাল মেয়েদের সন্দেহ করেছে, আজ তার সেই ধারণা এলোকেশী পূরণ করে দিয়েছে বলে ডমরুধর তাকে অসামান্যা নারী বলে সম্বোধন করেছে। তার এই রকম বিকৃত ধারণা আছে বলে দুর্লভী, চঞ্চলা ও ধাঙ্গড়ানীর কাছে গিয়ে অপমানিত হয়েছে। এরকম অপমানের মধ্য দিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ ডমরুর মতো চরিত্রদের ব্যঙ্গ করেছেন।

ডমরুধরের কারবার শুধু মানুষের সাথে নয়, ভূতের সাথেও। সে মহাদেবের কাছ থেকে একটা ছোট ভালোমানুষ ভূত চেয়ে নিয়েছে। ডমরুধর অন্যভূতের সাথে ধস্তাধস্তিও করেছে, ভূতকে কামড়েও দিয়েছে- ভূতের সাথে ডমরুর এরকম ঝগড়া করার চিত্র বেশ উপভোগ্য। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর অনেক গল্পেই ভূত নিয়ে এসেছেন। এখানেও ডমরুর সাথে ভূতের সাক্ষাৎ হয়েছে। লেখক অন্যান্য গল্পে যেমন ভূত সম্বন্ধে বলেছেন– তাদের রক্ত কালো, ভূতও মরে ইত্যাদি, ডমরুধরও সেইসব কথা বন্ধুদেরকে শুনিয়েছে। ডমরুর পুজোর পর দেবী যখন দোলায় করে ফিরে যাচ্ছেন, তখন উড়ে

ভূতেদের ওড়িয়া ভাষার দ্বারা লেখক কৌতুক সৃষ্টি করেছেন– "নদী কোঁঠীগলা, দের ইউচি ঠিকে জলদি কর।"[৭]

এই গল্পটির মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ আরো কতকগুলো ছোট ছোট ঘটনার অবতারণা করে কৌতুক রস সৃষ্টি করেছেন। 'ডমরুধরের মানুষ খেকো গাছ লাগান', 'বি-এ পাস করা চতুর্ভুজ' ইত্যাদি। চতুর্ভুজ লেখাপড়া শিখেও শিব-দুর্গার স্তোত্র জানে না বলে লম্বোদর ব্যঙ্গ করেছে। আর পুরোহিত মশায় ডমরুর পুজোকে 'অজা-যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'র সাথে তুলনা করেছে। এরকম নানান ঘটনার মাধ্যমে লেখক গল্পাংশে কৌতুক- ব্যঙ্গ রস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

চতুর্থ গল্পে ডমরুধর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে এবং কার্তিকের ময়ূরে চড়ে আকাশ পরিক্রমা করার জন্য ময়ূরটি চেয়ে নিয়েছে। দেবীও এক দিনের জন্য ময়ূরটি দিয়েছেন, তবে দেবী একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন। সেই মন্ত্রটি না বললে ডমরুকে ময়ূর নির্দিষ্ট জায়গায় নামাবে না। ত্রৈলোক্যনাথ যেমন গল্পের মধ্যে ভূত নিয়ে এসে তাদের ভৌতিক অস্তিত্ব রেখে দেননি, দেবতাদেরও তেমনি দৈবমহিমা খর্ব করে মানুষ করে তুলেছেন।

ডমরুধর আকাশ পরিক্রমা না করার সময় 'পিং' এর পরামর্শে অশ্বাণ্ড পরিদর্শন করেছে। অশ্বাণ্ডের উৎপত্তিটি চমৎকার। স্বদেশী কোম্পানি খুলে যারা অপরের টাকা হজম করেছে তাদের জন্যই অশ্বাণ্ড সৃষ্টি। সেকথা শোনার পর ডমরুরও ভয় হয়েছে। তবে তখনই স্মরণ হল যমরাজ তো জানেন, সে একাদশীর দিন পুঁইশাক খায়নি। সুতরাং তার আর ভয় কি? ত্রৈলোক্যনাথ এখানে আমাদের ভ্রান্ত ধর্মবোধকে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন। ডমরু যে অপরকে ঠকিয়েছে সেটা বড় কথা নয়, সে যে একাদশীর দিন পুঁইশাক খায়নি তার জন্যেই সে ধার্মিক হয়ে উঠেছে।

আকাশ পরিক্রমা শেষ করে ডমরুধর ময়ূরের পিঠ থেকে নামার সময় মন্ত্র ভুলে গিয়েছে, দুর্ভাগ্যক্রমে সে একটা বাজে মন্ত্র উচ্চারণ করা মাত্র ময়ূর তাকে আকাশ থেকে ফেলে দিয়েছে। ডমরু তখন আকাশ থেকে বাঘের হাঁ করা মুখের ভিতর গিয়ে পড়েছে। এবার ডমরু বাঘের কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বাঘের পেট থেকে কর্মচারীকে চিঠি লিখেছে। কর্মচারী তখন বাঘকে যমনের ওষুধ খাইয়ে ডমরুকে উদ্ধার করেছে। এবার ডমরু পায়ে হেঁটে বাড়ির পথে রওনা হয়েছে। পথে ক্লান্ত হয়ে এক ধাঙ্গড়ের বাড়িতে উঠেছে। ধাঙ্গড়নীকে দেখে ডমরু মুগ্ধ হয়েছে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিফলও পেয়েঅই। ধাঙ্গড় বাড়ি এসে ডমরুকে প্রহার আরম্ভ করেছে। ধাঙ্গড়ের হাতে মার খেয়ে ডমরু ক্লান্ত হয়ে পুষ্করিণীর পাশে শুয়ে পড়েছে। রাত শেষ হয়ে গেলে সকালবেলা গ্রামের বধূগণ ঘাটে জল নিতে এসে উলঙ্গ ডমরুকে দেখে 'ভূত! ভূত!' বলে চিৎকার করেছে। এসবেও ডমরুর লজ্জা নেই। সে যে কত বড় কদাকার, মেয়েদের ভূত ভয়ে ভীত হওয়ার মধ্যে তা লুকিয়ে আছে। এরপরে ডমরুর ঘাগরা, চুরি

পরিধান, নিজেকে সুন্দর বলে কল্পনা করে দুর্লভী বাগদিনীর ঘরে আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি পর্ব এত অসঙ্গতিপূর্ণ যে আমরা প্রচুর হাসি। এরপরে আবার কেষ্টা ও তার পিতার হাতে পড়ে ডমরুর যে দুর্দশা হয়েছে তাও যথেষ্ট কৌতুককর।

ডমরুধরকে দুর্লভীর ঘরে আটকে রেখে সাধারণ মানুষ যেভাবে তাকে অসহায় অবস্থায় নিক্ষিপ্ত করেছে তা লেখক সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন এবং তার সাথে সাথে সেই সব হুজুগপ্রিয় সাধারণ মানুষদেরকে ব্যঙ্গও করেছেন, যারা কোনো কিছু সত্যতা না ভেবেই হুজুগে মেতে সব কিছু করতে পারে। গল্পটিতে লেখক ক্রোধান্ধ এলোকেশীর হাস্যকর চেহারাটিরও বর্ণনা দিয়েছেন।

ডমরুধর গল্পের স্থানে স্থানে প্রসঙ্গক্রমে সমাজের অন্যান্য বিষয় নিয়েও সরস টীকা টিপ্পনী করেছে। ডমরুধরের গল্প শুনে বন্ধুরা মন্তব্য করেছে– "অতি চমৎকার! বন্ধুদিগের পুস্তক সমালোচনা করিবার সময় কোনো লোক লেখক যেরূপ প্রেমে মজিয়ে রসে ভিজিয়া ভাবে গেঁজিয়া বলেন– মরি মরি! আহা মরি! এও সেই আহা মরি!"[৮] লেখক এখানে সাহিত্য সমালোচকদের সমালোচনার ধারাকে প্রকাশ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে সমালোচকদের কর্তব্য নিরপেক্ষ বিচার করা, কিন্তু বন্ধুর রচনাকে কেউ কেউ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ এখানে তাদেরই উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়েছে।

ডমরুর স্বদেশী কোম্পানি খুলে অনেকের টাকা মেরে দিয়েছে। এটি ডমরুর দ্বিতীয়বার স্বদেশী কোম্পানির পরিকল্পনা, যা পঞ্চম গল্পে দেখানো হয়েছে। ডমরুধরকে কথায় ভুলিয়ে তাঁর কাছে শঙ্কর ঘোষ রং ফরসা হওয়ার ওষুধ বিক্রি করেছে। শঙ্কর ঘোষের বাকচাতুর্যে ডমরু মুগ্ধ হয়েছে এবং সে ভেবেছে যে শঙ্কর ঘোষ সামান্য ছোকরা নয়, এর সাহায্যে অনেক কাজ হতে পারে। লোক চরিত্র অভিজ্ঞ ডমরু শঙ্করকে চিনতে ভুল করেনি, তার প্রমাণ আমরা পাই যখন এঁটেল মাটি হতে কাগজ তৈরি করে শঙ্কর ডমরুকে দেখিয়েছে, ডমরুও চতুর মুখে কিছু না বলে এঁটেল মাটি ও কাগজ দেখে শুধু হেসেছে। তারপর দুজনে মিলে 'গ্রান্ড স্বদেশী কোম্পানি লিমিটেড'-এর প্রতিষ্ঠা করেছে। কোম্পানির পরিচালক হিসাবে কয়েকজন বড়লোকও তারা সংগ্রহ করেছে। এই বড়লোকদের সাহায্যেই ডমরুধরের স্বদেশী কোম্পানিতে অজস্র টাকা এসেছে। কিন্তু কিছুদিন পর কোম্পানি ডুবে গেল, মামলা হলে শঙ্কর ঘোষ এমন হিসাব দেখাল যাতে লাভ দূরের কথা লোকসানই দেখানো হয়েছে। মোকদ্দমার শেষে ডমরুধর শঙ্কর ঘোষকেও অংশ না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। নিজের হিসাবের ফাঁদে শঙ্কর ঘোষ নিজেই জড়িয়ে পড়েছে, আসলে ডমরুর চতুরতার কাছে শঙ্কর ঘোষও পরাজিত হয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথ স্বদেশী কোম্পানি প্রসঙ্গে আমাদের আবেগ প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করেছেন- "দেশে দেশে ধন্য পড়িয়া গেল। সকলে বলিতে লাগিল যে, আর আমাদের

ভাবনা নাই। যখন এঁটেল মাটি হইতে কাগজ প্রস্তুত হইবে, তখন বালি হইতে কাপড় হইবে। বিদেশ হইতে কোন দ্রব্য আর আমাদিগকে আমদানি করিতে হইবে না।"[৯] আমরা আবেগে ভেসে গিয়ে কোন জিনিসের গুরুত্ব না বুঝেই প্রচার করার জন্য মেতে উঠি, এখানে লেখক আমাদের এরকম ব্যবহারের প্রতিই কটাক্ষ করেছেন। স্বদেশী জিনিসের প্রতি ভালোবাসা থাকা ভালো এবং বিদেশি জিনিস বর্জন করা উচিত কিন্তু যদি স্বদেশী জিনিসের সঠিক জোগান থাকে তাহলে, আর যদি স্বদেশী জিনিসের আনুকূল্য না-ই থাকে তো বিদেশি জিনিস বর্জন করে লাভ কি? আমরা এ সমস্ত কথা না ভেবেই উৎফুল্ল হয়ে উঠি। এসব জিনিসের প্রতিই লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।

লেখক অন্যত্র ভিকু ডাক্তারের মাধ্যমে আমাদের দেশের হাতুড়ে ডাক্তারদেরকে হাস্যকরভাবে চিত্রিত করেছেন। ভিকু ডাক্তারের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে লেখক স্বল্প- কথায় যা বর্ণনা করেছেন তা অতি সংযত ও সীমাবদ্ধ এবং তাতে বেশ কটাক্ষও আছে। লেখকের সেই সংযত ও সীমাবদ্ধ বর্ণনার মধ্যে ভিকু ডাক্তারকে একেবারে আনাড়ি বলেই ধরা হয়েছে। এই ডাক্তারের মুখে যখন তার চিকিৎসক জীবনের অপূর্ব ও অদ্ভুত সব কাহিনি শুনি তখন আমাদের বুঝতে আর বাকি থাকে না যে তার সব কাহিনিই মিথ্যাশ্রয়ী। এইসব ডাক্তারের মতো এক শ্রেণির লোক আছে যারা নিজেদের মিথ্যাকে লুকিয়ে রাখে কথার পাকে, এখানে লেখক তাদেরই ব্যঙ্গ করেছেন। ভিকু ডাক্তার হাস্যকর হলেও দুর্লভী, চঞ্চলা বা গ্রামের অন্যান্য ব্যক্তিগণ তার ছলনাকে বোঝে না, ভাবে ইঁহার তুল্য বিচক্ষণ ডাক্তার জাতে নাই।"[১০] সুতরাং হাতুড়ে ডাক্তারের সাথে এই গ্রাম্য সাধারণ মানুষগুলোও ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে ওঠে।

ডমরুধর শ্রেণির লোকেদের জীবনে দুটো কামনা খুব বেশি করে দেখা যায়– অর্থ ও নারীসঙ্গ। ডমরুধরের নারীসঙ্গ লাভের লোলুপতার অন্ত নেই, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী এলোকেশী থাকা সত্ত্বেও দুর্লভী, ধাঙ্গড়নী, চঞ্চলার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছে। চঞ্চলার কাছে যাওয়ার সময় রাস্তার একটি মোটরের আঘাতে ডমরুধরের সাথে চঞ্চলার গাইটিও দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। ডমরুর শরীরের নিচের অংশ গাড়ির চাকার সাথেই লেগে গেছে। ভিকু ডাক্তার সেই সময় ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সে তখন ওষুধ দিয়ে ডমরুধরের সঙ্গে চঞ্চলার গাই-এর নিম্নাঙ্গ জুড়ে দিয়েছে। সেই থেকে ডমরু ওই গ্রামে একমাস কয়েদ ছিল। ডমরুর নিচের অংশ চঞ্চলার গাই-এর, সেজন্য সে দুধ দুইত, আর ভিকু ডাক্তারকে ডমরু দুর্লভীর রোগের সময় টাকা দেয়নি বলে ভিকু ডাক্তার ডমরুকে একটা গরুর সাথে লাঙ্গল দেওয়াত। এভাবে কিছুদিন চলার পর স্বদেশী কোম্পানির অংশীদার শঙ্কর ঘোষ তার দাবি নিয়ে হাজির হলে, এলোকেশীও সেখানে পৌঁছেছে। সকলে ডমরুর প্রতি অধিকারের দাবিতে ডমরুকে ধরে টানাটানি করেছে, যে দৃশ্য খুব কৌতুককর। টানাটানির ফলে ডমরুর গো দেহ ঘুচে গিয়ে তার নিজের

দেহ ফিরে পেয়েছে। অবশ্য ডমরু কথিত এ-গল্পটি সমস্তই স্বপ্ন, তার প্রমাণ আমরা গল্পের শেষে এলোকেশীর উক্তিতেই পেয়েছি "কাল রাত্রিতে বিড়বিড় করিয়া ওরূপ বকিতেছিলে কেন? চঞ্চলা কে?"[১১]

'ডমরু চরিত'-এর ষষ্ঠ গল্পটিতে ডমরুধরের স্বভাব চুরি ও লোককে প্রতারণা করার কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। নষ্টচন্দ্র দেখে চুরি না করলে কলঙ্ক হয় এই ভাবনা থেকে ডমরুধর প্রথম দিন দুর্লভীর শসা চুরি করতে গিয়ে দুর্লভীর উগ্রমূর্তি দেখে ফিরে এসেছে। পরের দিন সে গদাই ঘোষের পুকুরে বঁড়শি নিয়ে মাছ চুরি করতে গিয়েছে, যে পুকুরটি দুর্লভীর রক্ষণাবেক্ষণে আছে। দুর্লভীর মন তার উপরই আছে। এই ভেবেই সে চুরি করতে গিয়েছে, তবুও বিপদ হল কেষ্টার আবির্ভাবে। বঁড়শি নাল গাছে আটকে যাওয়ায় কাপড় ডাঙ্গায় রেখে ডমরু জলে নেমেছে, সেই সুযোগে কেষ্টা কাপড় নিয়ে পালিয়ে গিয়ে দুর্লভীকে মাছ চুরির সংবাদ দিয়েছে। লোকজনের শব্দ পেয়ে ডমরু উলঙ্গ অবস্থায় সাহেবি টুপি মাথায় দিয়ে পালিয়েছে। উলঙ্গ অবস্থায় সে বেশি দূর না গিয়ে দুর্লভীর বাড়িতে চুপি চুপি আশ্রয় নিয়েছে। এসব দৃশ্যগুলিতে লেখক খুব কৌশলে নিপুণ কৌতুক ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন।

দুর্লভীর বাড়ি থেকে তাড়া খেয়ে ডমরু বিন্দু ব্রাহ্মণীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। তারপর বলাই চিন্তি বিন্দুর বাড়ি থেকে নারিকেল বোরার সঙ্গে ডমরু যে বোরায় আশ্রয় নিয়েছে সেটিকেও গরুর গাড়িতে তুলে নিয়েছে। মাঠের মধ্যে ডমরুকে গরুর গাড়ি থেকে বোরা সমেত পালিয়ে যেতে দেখে বলাই চিত্তি ডমরুকে ভূত ভেবে গ্রামের সকলকে ভূতের কথা বলেছে। এরকম ভূতের গোলমালের সময় ডমরু কেষ্টার ঠাকুমাকে ধাক্কা দিয়ে একটা খালি পাল্কির মধ্যে ফেলে দিয়ে পালিয়েছে। তারপর বনের মেনী ও ভিলেদের ঘরে আশ্রয় নিয়ে ডমরু ধীরে-সুস্থে বাড়ি ফিরেছে।

ডমরু যখন মেনীদের বাড়িতে লুকিয়েছিল তখন মেনী ও তার ভাই ভিলের কথাবার্তা শুনেছে, সংসারের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে দরিদ্র নিঃস্ব ভাই-বোন পরের দিন জলে আত্মহত্যা করবে বলে ঠিক করেছে। এরকম একটা করুণ পরিস্থিতিতে ডমরু আনন্দিত হয়েছে, কারণ মেনী ও ভিলে মারা গেলে ডমরুর বাগানের খোঁচ টুকু ঘুচে যাবে। ত্রৈলোক্যনাথ পরার্থলোভী, মনুষ্যত্বহীন ডমরুর মতো চরিত্রের প্রতি গভীর ঘৃণাই প্রকাশ করেছেন এখানে।

এক ধনী গৃহিণী মেনীর মাসিকে একটি পাথর পুরস্কার স্বরূপ দিয়েছিলেন। দৈবাৎ মেনী শিশি বোতল বিক্রি করার সময় বোতলের ভিতর থেকে সেই চকচকে পাথরটি পায়। সেই পাথরটি ডমরু দু-পয়সা দিয়ে কেনে। পাথরটি যে খুব মূল্যবান সে কথা মেনী জানত না। ধনী ভদ্রলোকের সরকার মশায় পুনরায় প্রভুর আদেশে পাথরটি কিনতে এসে মেনীকে সেই মূল্যবান পাথরের কথা জানায়। ফলে পাথরটি ফিরিয়ে

দিতে হয়েছিল ডমরুকে। ডমরু হীরক খণ্ড ও জমি দুই-ই হারাল। এসব হারানোর পর সে আর দেবীর পূজা করবে না ঠিক করে। এরপর ডমরুকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেবী কর্তৃক জরাসুরকে প্রেরণ, রাঘব ও নকুল ভট্টাচার্যের পোড়ানো ও শ্রাদ্ধের কথা বলা, এলোকেশীর রাঘব ও নকুল দুজনকেই ঝাঁটা পেটা করা ইত্যাদি বিষয়গুলো বেশ হাস্যকর। এলোকেশীর চরিত্রের রহস্যময়তা লেখক এ দৃশ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ডমরু পর্যন্ত তার ভয় জড়িত কণ্ঠকে কিছুটা হালকা করে নিয়ে ঈষৎ হাস্য সহকারে বলেছে "এলোকেশী! তুমি যাহা করিলে, তাহাতে আমার অর্ধেক রোগ ভালো হইয়া গেল। আর আমাকে ঔষধ খাইতে হইবে না।"[১২] এলোকেশী এই কথায় চুপ করে থাকল না, ডাক্তার ডাকতে পাঠাল। ডাক্তার এসে ডমরুর বুকে দু'চার জায়গায় প্যাঁচ আছে জানালেন। এই সময় ডমরুধরের যে উক্তি তা একসাথে হাস্যের ও ব্যঙ্গের। এ ব্যঙ্গ কিছুটা ডাক্তারের কিছুটা এলোকেশীর উদ্দেশ্যে বর্ষিত। প্যাঁচের কথা শুনে ডমরুর মনে ভরসা হল, ডমরু ভাবল তাঁর বুকে যখন এত প্যাঁচ আছে, তখন সে মরবে না, বহুকাল বাঁচবে।

তৎকালীন হিন্দুদের আচার নিষ্ঠা, শাস্ত্রের নামে অধর্ম আচরণ পালন ইত্যাদিকে লেখক সপ্তম গল্পের মাধ্যমে এঁকেছেন। গল্পে ডমরুধরের অন্যতম পরামর্শদাতা বন্ধু শুক্লাশ্বর ঢাক মশায়ের অসার আচার নিষ্ঠাকে ব্যঙ্গ করেছেন লেখক। ডমরুধরের সাহায্যে তৎকালীন হিন্দুদের ধর্মবোধ, বিধবার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ, সমুদ্র পারে বিদেশ গমন করার প্রতি অন্যায়বোধ ইত্যাদিকে ত্রৈলোক্যনাথ চিত্রিত করেছেন। তৎকালীন সমাজের রুচিবোধ, শিক্ষা, ধর্ম চেতনা ও মানুষের নিষ্ঠুরতাকে লেখক তীব্র বিদ্রুপ করেছেন। লেখক ঢাক মশায়ের চরিত্রে হিন্দুধর্মের অসঙ্গতিময় বিচারহীন দুর্বলতার সুষ্ঠু রূপায়ণ করেছেন। ঢাক মশায় তাঁর বিধবা মেয়ে কুন্তলাকে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দিয়েছে। কুন্তলা গ্রীস্মকালের একাদশীর দিন জল না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছে। ঢাক মশায় কুন্তলাকে জল দেওয়া উচিত কিনা তা পরামর্শের জন্য ডমরুকে ডেকে পাঠিয়েছে। ডমরুও একাদশীর দিন জল দিলে ধর্মলোপ পাবে একথা শুনিয়েছে। অবশ্য ডমরু ঢাক মশায়ের বাড়িতে এসেই জল পিপাসায় একঘটি জল খেয়েছে। কুন্তলাকে জল না দেওয়ার পরামর্শটা যে কতটা অমানবিক তা বোঝাবার জন্যই ত্রৈলোক্যনাথ ডমরুর পিপাসার ছবিটি এঁকেছেন। অবশ্য ডমরু ঐ রকম পরামর্শ বোধ হয় ঢাক মশায়ের মনেভাব বুঝে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য দিয়েছে।

ঢাক মশায় ত্রিসন্ধ্যা করে, গুরুগিরি করে, প্রয়োজন হলে ডমরুকে মামলা-মোকদ্দমায় অনেক পরামর্শ দেয়। কুন্তলার মৃত্যু সংবাদ চারিদিকে ছড়ানো মাত্র ঢাক মশায়ের নিষ্ঠার জন্য লোকে তাকে ধন্য ধন্য করেছে। এরূপ নিষ্ঠার জন্য একমাসের মধ্যে তাঁর একশোর বেশি নতুন শিষ্য হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ ঢাক মশায়ের হৃদয়হীনতার পরিচয়ের সঙ্গে নতুন শিষ্যের খবরটি দিয়ে তাঁকে বিদ্রুপ করেছেন।

ঢাক মশায়ের নিষ্ঠুরতা কেবলমাত্র বিধবা মেয়ে কুন্তলার ক্ষেত্রেই নয়, তার সধবা মেয়ে কালিকাকেও সে অকথ্য নির্যাতন করেছে। কালিকার স্বামী কেশব চাকুরির প্রয়োজনে বোগদাদে গিয়েছিল বলে ঢাক মশায় মেয়েকে জামাইয়ের কাছে পাঠাতে চায়নি। আসলে সাগর পারে গেলে ধর্মলোপ হয়ে যায় এরকম ধারণা থেকেই ঢাক মশায় মেয়েকে জামাইয়ের কাছে পাঠাতে নারাজ ছিল। এটা আসলে তৎকালীন সমাজের একটা কুসংস্কার। এই কুসংস্কারজনিত কারণেই ত্রৈলোক্যনাথকে সাগর পারে (বিলাত) গিয়ে প্রচুর উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়, সেই উৎপীড়নের চিত্রই তিনি এ গল্পে ব্যঙ্গের মাধ্যমে স্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

ঢাক মশাইরা প্রকৃত শক্তিশালী ব্যক্তির সামনে পড়লে কেমন যেন ভীত, অসহায় হয়ে পড়ে। এক ডমরুধর ছাড়া জিনের আবির্ভাবে সবাই ভয় পেয়েছে। জিনের ভয়ঙ্কর রূপের সামনে ঢাক মশায়ের সকল শক্তি কোথায় হারিয়ে গেছে। তাই লেখক তাকে এক চক্ষুহীন, দামড়া গরুতে রূপান্তরিত করে দেন, যেন তাঁর সব পাপকর্মের শাস্তিকে তিনি এভাবে দেখাতে চান। সুখ ও প্রতিপত্তিকে হারিয়ে গোয়ালে যেতে যেতে ঢাক মশায়ের দুই চক্ষু দিয়ে দরদর করে জল পড়তে থাকে। এমন দৃশ্য আমাদের করুণাই হওয়া উচিত, কিন্তু তা হয় না, বরং আমরা এতে কৌতুক অনুভব করি। দামড়া গরুর গায়ে শক্তি আছে। কিন্তু তার নিজস্ব কোনো ইচ্ছার প্রকাশ করতে আমরা দেখি না। তাকে যেমন আমরা চালাব, সে তেমনি চলবে, পরের ভারই সে বয়ে বেড়াবে চিরকাল। মানুষ থেকে দামড়া গরুতে রূপান্তরিত হওয়াটা অত্যন্ত হাস্যকর। ঢাক মশায়ের এরকম শাস্তি দানের মধ্যে দিয়ে লেখক যেন তার মতো লোকেদের সতর্ক হওয়ার কথা ব্যঙ্গচ্ছলে বলে গেছেন।

জীবনে যে ভূয়োদর্শন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা একজন হাস্যরসিকের থাকা আবশ্যক ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে তা পর্যাপ্ত পরিমাণেই ছিল। তাঁর রচিত সাহিত্যভাবনা এমন একটা রসজগৎ সৃষ্টি করেছে যা বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাঁর নির্মিত সেই অঞ্চলে খুব বেশি লেখকের অবাধ যাতায়াত লক্ষ করা যায় না। ত্রৈলোক্যনাথের কল্পনার জগৎ ছিল লাগামহীন, বইয়ের দুই মলাটের দেওয়াল না থাকলে তাঁর কল্পনার ঘোড়া বোধহয় থামতই না।

সাহিত্যে বিশেষ করে ছোটগল্পের জগতে ত্রৈলোক্যনাথের আবির্ভাব অনেকটাই ব্যঙ্গকে আশ্রয় করে। তিনি লেখনী ধারণ করেছেন মূলত সমাজ কল্যাণে ব্রতী হয়ে। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতিমূলক আচরণের প্রতি ব্যঙ্গবান বর্ষিত হয়েছে। কৌলিন্য প্রথার উপহাস্যময় ছবিটি সুন্দরভাবে এঁকেছেন তিনি। বিশেষত বয়সের দিক দিয়ে অসম বিবাহ ও এক কুলীন পাত্রে একাধিক কন্যা সম্প্রদানের প্রথা লেখকের ব্যঙ্গ প্রবণতাকে উদ্রিক্ত করেছে।

ত্রৈলোক্যনাথ বয়োবৃদ্ধদের বিবাহ বাসনা যে কী ধরনের বিকৃত রুচির পরিচয় বহন করে তারও সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন। সমাজের বিবাহ সম্বন্ধে পণপ্রথার ভয়াবহ পরিণামও তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। লেখক পণপ্রথার দোষাবহ পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাকাঙ্ক্ষী সমাজকেও তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন। সমাজের ভাগ্য নিয়ন্তা জমিদার শ্রেণিও ব্যঙ্গাত্মকভাবে চিত্রিত হয়েছে তাঁর গল্পে। অনেক সময় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণেরাও অসঙ্গত আচরণের জন্য হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছে তাঁর লেখনীর খোঁচায়। আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মবোধকেও লেখক তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন ভ্রান্ত ধর্মবোধকে ব্যঙ্গ করার সাথে সাথে প্রকৃত ধর্মের তাৎপর্যও বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। ইংরাজি শিক্ষার ফলে তরুণ সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য ত্রৈলোক্যনাথ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং বিদেশি বেশভূষা অনুকরণ করে সাহেব হওয়ার হাস্যকর প্রচেষ্টাকেও তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। স্থানে স্থানে বাঙালির অধিক হুজুগপ্রিয় প্রবণতাকে তিনি তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন।

শুধু ব্যঙ্গ নয় ত্রৈলোক্যনাথের রচনার স্থানে স্থানে উদ্ভট, কৌতুক ও করুণ রসেরও প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। উদ্ভট রস সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যে তিনি অদ্বিতীয়। যেখানেই উদ্ভট রস সৃষ্টি করার তিনি সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই এমন উদ্ভট রস ফুটিয়ে তুলেছেন যা বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলকেই কৌতুক রসে মাতিয়ে রাখে। অপরদিকে তাঁর সৃষ্ট করুণ রস এক ধরনের চরিত্রের দুর্ব্যবহারের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য ভাবনায় ভূতের অনুষঙ্গ ঘুরে ফিরেই বারে বারে উঁকি মেরেছে। ভূতদের নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ কি শুধু মজাই করেছেন? ভূতেদের উপলক্ষ্যমাত্র, আসলে লক্ষ্য তো বাঙালি সমাজ। তাঁর ইশারায় ভূতেরা এসে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোটরা কখনো সেই ভূতের ভয়ে চোখ বন্ধ করেছে আবার কখনও কৌতুকের মজায় ডুবে গেছে। ভূতের সঙ্গে অদ্ভুতের, কায়ার সঙ্গে ছায়ার, কল্পনার সঙ্গে উৎকল্পনার, প্রত্যক্ষের সঙ্গে পরোক্ষের, স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের এমন গলায় গলায় মিলন বাংলা সাহিত্যে সত্যিই অভিনব বিষয়।

ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন অকৃত্রিম ও দরদী লেখক। অসহায় মানুষের প্রতি ভালোবাসায় তাঁর অন্তর সর্বদা কানায় কানায় ভরা। তাদের সহজ প্রাণধারার অভাব, তাদের হীনতা, দীনতার পাশাপাশি প্রকৃতি-লালিত, উদারতা, সরলতা লেখককে কেমন যেন স্তম্ভিত করে তোলে, এই ভাবনা লেখককে মর্মাহত করে তোলে। তাই তো তিনি প্রতিকার স্বরূপ সহজ-সরল পথটিই বেছে নিলেন। হাসির মধ্য দিয়ে হৃদয়ের ব্যথাকে ভুলতে চাইলেন, হাসির মধ্য দিয়ে আমাদের সতর্ক করতে চাইলেন।

এ যাবৎকাল ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক রচনায় যে নিম্নমানের রস এবং বিদ্বেষ প্রবণতা লক্ষ করা যেত তাকে নিছক ভাঁড়ামির নামান্তর বলা যায়। সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাস্যরস রচনায় এই ভাঁড়ামি অনেকটাই উন্নত হয়ে

থাকলেও পরিপূর্ণভাবে সফল হননি তাঁরা। সেই অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টা প্রথম সার্থকতা পেল ত্রৈলোক্যনাথের রচনায়। পরবর্তীকালে যারা ব্যঙ্গ, আজগুবি, ভৌতিক, অবিশ্বাস্য গল্প লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই তাঁরা ত্রৈলোক্যনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। আসলে হাস্যরসের ধারাকে (বিশেষ করে ব্যঙ্গ, কৌতুক ও উদ্ভট কাহিনি) ত্রৈলোক্যনাথের আগে বা পরে কোনও সাহিত্যিকই তাঁর মতো আপন করে নিতে পারেননি। আর সে কারণেই তাঁর ব্যঙ্গ, কৌতুক ও উদ্ভট কাহিনি কালোত্তীর্ণতায় আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অদ্বিতীয় এবং এতটাই প্রাসঙ্গিক।

সূত্র নির্দেশ:

১. সান্ত্বনা চক্রবর্তী, ত্রৈলোক্যনাথ স্বর্ণকুমারী প্রভাতকুমারের গল্প, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০০৩, পুস্তক বিপণি, পৃ. ৩১

২. সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), তৃতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০১১, কামিনী প্রকাশালয়, পৃ. ৪৪৯

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭০

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৯

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৪

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৬

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৩

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৬

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. অজিতকুমার ঘোষ: বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০০2, করুণা প্রকাশনী।

২. আব্দুশ সাকুর, রসিক বাঙালি, প্রথম প্রকাশ (বাংলাদেশ) ফেব্রুয়ারি ২০০৯, প্রতিভাস।

৩. দেব নারায়ন রায়, ত্রৈলোক্যনাথ: জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি।

৪. পরিমল গোস্বামী, আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯, প্রথম বাংলা আকাদেমি সংস্করণ মাঘ ১৪১৬ (জানুয়ারি ২০১০), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

৫. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, ত্রৈলোক্যনাথ: কথাসাহিত্য ভাবনা, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা মাঘ ১৪১১, জানুয়ারি ২০০5, রত্নাবলী।

৬. মীরা অধিকারী, পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ রচনা, প্রথম সংস্করণ ১৩ আশ্বিন, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০), সাহিত্য প্রকাশ (পরিবেশক)

৭. সান্ত্বনা চক্রবর্তী, ত্রৈলোক্যনাথ-স্বর্ণকুমারী-প্রভাতকুমারের গল্প, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০০৩, পুস্তক বিপণি।

৮. সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), তৃতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০১১, কামিনী প্রকাশালয়।

ধর্ম ও সমাজ ভাবনায় আবুল বাশারের *ফুলবউ*

নন্দিতা পণ্ডিত
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার : *ফুলবউ* (১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ) আবুল বাশারের প্রথম উপন্যাস আর এই প্রথম উপন্যাসেই তিনি বিষয় হিসেবে বেছে নিলেন সমাজের একটি স্পর্শকাতর দিক। বইয়ের দেশ পত্রিকায় দেওয়া আবুল বাশারের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, এই বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাজ করেছে ঔপন্যাসিকের সামাজিক দায়। যে সামাজিক দায় থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখের উপন্যাসে বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে হিন্দু বিধবা নারীর জীবন-যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত। শুধুমাত্র সামাজিক দায় নয়, ঔপন্যাসিকের ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারমুক্ত মনন *ফুলবউ* উপন্যাসের জন্ম দিয়েছে। পথ খুঁজেছে বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত অন্ধকারময় দিকগুলির আঁধার মুক্তির। উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট মিল্লাত ও রাজিয়াকে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত। সেখানে ঔপন্যাসিকের ধর্মীয় মতামত ব্যক্ত হয়েছে তার মানস প্রতিনিধি রিয়াজ চরিত্রের মাধ্যমে। বিভিন্ন হাদিস থেকে তার বক্তব্যের সপক্ষে জবাব দিয়েছে রিয়াজ। তবুও আবুল বাশার মিল্লাতের সঙ্গে রাজিয়ার শুভ পরিণয় দেখাতে পারেননি, সম্ভবত তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই। অথবা বাঙালি পাঠক তখনও প্রস্তুত ছিল না মিল্লাত ও তার ফুলবউয়ের সুখী দাম্পত্য জীবনের সাক্ষী হতে। এখন হয়তো পাঠক কিছুটা হলেও প্রস্তুত।

সূচক শব্দ : তালাক, খালাস, হাদিস, ক্ষতচিহ্ন, ধর্ষণ, রক্ষণশীল।

মূল আলোচনা :

> *ভাষাভেদ মানুষকে বিভিন্ন করে, খাদ্যাভ্যাস আলাদা করে দেয়- সর্বোপরি ধর্ম কখনই এক হতে দেয় না।*[১]

এমন কথা যিনি বলতে পারেন সেই প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক আবুল বাশারের(১৯৫১-) উপন্যাসে যে তাঁর ধর্ম ও সমাজ ভাবনার বিচ্ছুরণ প্রতিফলিত হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মুসলমাল সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ ও তালাক সমস্যা আবুল বাশারের উপন্যাসে ঘুরে ফিরে এসেছে, ঠিক যেভাবে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রানাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এসেছে হিন্দু নারীর বৈধব্য জীবনের সমস্যা। আবুল বাশারের লেখা প্রথম উপন্যাস *ফুলবউ* (১৯৮৮ খ্রিঃ) তাঁর সমাজসংস্কারমূলক মনোভাবের সাক্ষ্য বহন করে।

আনন্দ পুরষ্কার প্রাপ্ত *ফুলবউ* উপন্যাসটি ঔপন্যাসিককে সাহিত্যের বৃহত্তর অঙ্গনে প্রবেশ করায়। এ উপন্যাসে মুসলমান সমাজে দাম্পত্য, যৌন সংস্কার, প্রেম-অপ্রেমের

থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে মুসলমান সমাজে নারী স্বাধীনতার অভাব, বহু বিবাহ, তালাক ও খালাস বিষয়ের জটিলতর দিকগুলি। প্রথমে এটি ছিল *খালাস* শিরোনামে লেখা একটি গল্প, পরে তা সুধীর চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণায় ছ'বার পুনঃলিখনের পর বর্তমান উপন্যাসের রূপ পায়। উপন্যাসের নায়িকা রাজিয়ার উপর চাপিয়ে দেওয়া ধর্ম ও সমাজের নানাবিধ উৎপীড়ন বর্ণনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মুসলমান ধর্ম ও সমাজের অন্ধকারময় রক্ষণশীলতার দিকগুলি তুলে ধরেছেন। যার অনিবার্য ফলস্বরূপ আবুল বাশারকে তাঁর নিজের বাসভূমি মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার টেকরায়পুর গ্রাম ছাড়তে হয়েছিল। গ্রামের ধর্মগোঁড়া লোকেরা *ফুলবউ* উপন্যাসের কাহিনিকে মোটেই ভালো চোখে দেখেনি। কিন্তু উপন্যাসের মূল ঘটনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়, ঠিক এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল ঔপন্যাসিকের পাশের গ্রামে। *ফুলবউ* উপন্যাসে হাজীর চতুর্থ বিবাহের এই আকুলতা পুরোপুরি ঔপন্যাসিকের কল্পনাপ্রসূত নয়। ঔপন্যাসিকের গ্রামজীবনের ঘনিষ্ঠ সাহিত্যিক বন্ধু রকিবউদ্দিন ইউসুফের বাবা তিন পত্নী থাকা সত্ত্বেও চতুর্থ বিবাহের জন্য ছটফট করতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ওই চতুর্থ বিবাহ তাঁকে শাস্ত্র-অবধারিত সুন্নতে পৌঁছে দেবে। এই উপন্যাসটি লেখার বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় ঔপন্যাসিক লেখেন,

> *সর্ব ক্ষণ হিন্দু-সংসর্গে-থাকা মুসলমান আর শুধু মুসলিম-সংসর্গে থাকা মুসলমান (কচ্চিৎ হিন্দু-সংসর্গ) জীব হিসেবে আলাদা। শুধু মুসলমান যেখানে, সেখানে সংকট আলাদা। গোঁড়ামি আলাদা। নারীর দুঃখ আলাদা। নারীর উপর নিষ্পেষণ ও ফলত হুতাশন ও গোঙানি আলাদা। কথায় কথায় সেখানে মেয়ে তালাক হয়। .... ধর্ম আর দারিদ্র একেবারে লেপে আছে। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, দ্বিবিবাহ ওই জনপদে ঢুঁড়ে বড়াতে হয় না।* [২]

নারীর সেই গোঙানির প্রতিধ্বনি শোনা গেছে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে। রাজিয়া নিস্তার পায়নি বৈদ্যবাটীর বৃদ্ধ হাজী নিসার হোসেনের হাত থেকে। হাজীর মা রাজিয়াকে তার নাতবউ করতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ তিনি চেয়েছিয়েন মিল্লাতের সঙ্গে সুন্দরী, বুদ্ধিমতি রাজিয়ার বিবাহ দিতে। যদিও এ বিষয়ে মিল্লাত কিছুই জানত না। মিল্লাত বিশেষ কিছু করে না, প্রাইভেট টিউশন পড়িয়ে আর কলকাতার বাড়ির ভাড়াটেদের থেকে যা পায় তাতেই তার চলে যায়। রাজিয়ার মা তার শিশুকালে তালাক নিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ করে এবং সেই একই বছরে তার বাবাও পরবর্তী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যার ফলে বাবা-মা পরিত্যক্ত ছোট্ট রাজিয়া দাদির (বাবার মা) কাছে মানুষ হয়। চরম দারিদ্রের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে রাজিয়া। বলতে গেলে ভিক্ষা করতে হত দাদিকে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন মানুষের থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে নবম শ্রেনি পর্যন্ত পড়েছে রাজিয়া। মেধাবী রাজিয়ার পড়াশোনায় ইতি টেনে দিয়ে মিল্লাতের বাবা হাজী নিসার হোসেন বলপূর্বক বিবাহ করে তাকে চতুর্থ স্ত্রীর আসনে অভিসিক্ত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইসলাম ধর্ম এবং ভারতীয় সংবিধানের মুসলিম পরিবার ও ব্যক্তিগত আইন অনুযায়ী একজন

মুসলমান ব্যক্তি সর্বাধিক চারটি বিবাহ করতে পারেন এবং বিবাহের জন্য মেয়েদের কোনো সর্বনিম্ন বয়ঃসীমার উল্লেখ নেই। ঋতুচক্র শুরু হওয়া কোনো মেয়ের সম্মতি থাকলেই বিবাহ হতে পারে। ঔপন্যাসিক আবুল বাশার বিষয়টিকে মোটেই ভালো চোখে দেখেন না। কেননা একই দেশের মানুষ হয়েও হিন্দুদের জন্য পৃথক আইন, তাদের একাধিক বিবাহের অনুমতি নেই। তার সঙ্গে বিবাহের জন্য নারী পুরুষের বয়ঃসীমাও নির্দিষ্ট যথাক্রমে আঠার ও একুশ বছর। পাশাপাশি বিবাহ বিচ্ছেদের পদ্ধতি তালাকের মতো অতোটা সহজ সরল নয়। যদিও একবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় মুসলমান নারী আন্দোলনের দৌলতে তালাক বিষয়টিতে আইনগত পরিবর্তন এসেছে (২০১৭, আগস্ট)। কিন্তু আবুল বাশার যখন 'ফুলবউ' লেখেন তখন তালাক বিষয়ে পুরুষের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। ইসলাম ধর্মানুসারে তালাকের সঙ্গে খালাস বিষয়টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও বিষয় দুটি এক নয়। মৃত্যুশয্যায় থেকেও হাজী নিসার হোসেন রাজিয়াকে মুক্তি দেয়নি, খালাস পায়নি রাজিয়া। কিন্তু তাদের তালাক হয়েছিল। আনোয়ারের কাছ থেকে রিয়াজ সেই তালাকনামার কাগজ উদ্ধার করে দু'শত টাকার বিনিময়ে।

ইসলামে বিয়ে একটি অসম চুক্তি। হুমায়ুন আজাদের মতে, *বিয়েতে একটি পুরুষ 'দখল করে' একটি নারীকে। দখল করে 'সম্ভোগের অধিকার দ্বারা'। 'সম্ভোগ' ও 'দখল' দুটিই নৃশংস পশুর কাজ। এ চুক্তির অনন্ত সুফল উপভোগ করে পুরুষ। নারী হয় শিকার।* [৩] কোরান পুরুষকে কেবল অধিকার ও কর্তৃত্বই দেয়নি, অবাধ্য স্ত্রীকে প্রহার করার নির্দেশও দিয়েছে- স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে ভাল করে উপদেশ দাও, তারপর তাদের বিছানায় যেওনা ও তাদেরকে প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ খুঁজবে না। (-সুরা নিসা, ৪/৩৪) আর তাই ধর্মের প্রচ্ছন্ন মদতে হাজী নিসার হোসেন, বাসর রাতে সদ্য বিবাহিত রাজিয়া তার কাছে ধরা না দিয়ে তার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইলে শাস্তি স্বরূপ গনগনে আগুন থেকে কাঠকয়লার টুকরো বের করে রাজিয়ার হাতের কনুইয়ের কাছে পুড়িয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। যে ক্ষতচিহ্ন রাজিয়া আজীবন ঢেকে রাখে লম্বাহাতা ব্লাউজের নিচে। হাজীর কাছে তা অপরাধ নয়। কেননা তিনি মনে করেন তিনি ঈশ্বর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেছেন মাত্র। এভাবে বিবাবহিত নারী পাশবিক ধর্ষণের শিকার হয়ে চলেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। *না* শব্দটি তাদের কাছে প্রহসনের সংলাপ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ *ঠাকুরের* *যোগাযোগ* উপন্যাসের কুমু, শরৎচন্দ্রের *গৃহদাহ* উপন্যাসের অচলা, বানী বসুর *গান্ধর্বী* উপন্যাসের অপালা বা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের *দহন* উপন্যাসের রমিতা কিম্বা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *না নিষাদ* উপন্যাসের লায়লির মতো রাজিয়াও পুরুষের পাশবিকতার সম্মুখীন হয়েছে। এমন দুঃসময়ে নারী হয়ে উঠেছে নারীর প্রতিদ্বন্দ্বী, রাজিয়া আশ্রয় পায়নি হাজীর পূর্বের স্ত্রীদের কাছে। শেষমেষ রাজিয়াকে নিজের শয্যাসঙ্গী করতে ব্যর্থ হওয়ার রোষ মেটায় তাকে খালাস না দিয়ে।

মহানবী হজরত মুহাম্মদের দৃষ্টান্ত দিয়ে ধর্মাচরণের অজুহাতে হাজী তার বন্ধুস্থানীয়, ভাগচাষী দরিদ্র মাবুদের স্ত্রী হাজেরা বিবিকে বিবাহ করতে চেয়ে মাবুদকে বলেছিল, *হাজেরাকে তুই তালাক দে মাবুদ। খেতে দিতে পারিস না, মুই তারে শাদী বসাই। তালাক দিলে তোকে দু'বিঘা ধানী জমি দিব।* [৪] হাজীর বাড়িতে হাজেরা বিবির নিয়মিত যাতায়াত, তাই মিল্লাত ও নবীনার শরণাগত হয় তাদের হাজেরা ফুফু (পিসি)। হাজেরা বিবির ভয় ছিল পাছে হাজীর কথার জালে ফেঁসে জমির লোভে মাবুদ যদি তাকে তালাক দিয়ে বসে তাহলে তিন ঋতুকাল অর্থাৎ নব্বই দিন পর হাজীর হাত থেকে সে নিস্তার পাবে না। হাজীর চতুর্থ পত্নী লাভের এই আকুলতার প্রতিবাদ জানিয়েছিল মিল্লাত ও তার বোন নবীনা। নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করলেও যথেষ্ট ব্যক্তিত্বময়ী নবীনা। বৃদ্ধ পিতাকে নিরস্ত করার জন্য নবীনাকে তিব্বতে দ্রৌপদী বিবাহ প্রথার খুব মান্যতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে দেখা যায়। কিন্তু যথেষ্ট পড়াশোনা জানা হাজী সাহেব সব কিছুকে ধর্মীর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। ধর্মের চাদর গায়ে চাপিয়ে করে চলে একের পর এক অন্যায়। মনে পড়ে যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *জুলেখা* গল্পের অংশুর ডেপুটি মামার কথা। এছাড়াও হাজেরা বিবিকে নিজেদের সমকক্ষ, সতীন হিসাবে মেনে নিতে হাজীর প্রথমা স্ত্রী কুলশম বিবি সহ অন্য দুই স্ত্রীও মোটেই রাজি নয়। হাজেরাকে তারা পরিচারিকা হিসাবে দেখে, তাকে করুণা করা সহজ, সমকক্ষ ভাবা সহজ নয়। তাই তারা হাজেরাকে মেনে নিতে পারে না, কিন্তু পাশের গ্রামের অষ্টাদশী অপরিচিতা রাজিয়াকে মেনে নেয় সহজে। আর সেকারণেই হাজেরা বিবি রেহাই পেলেও নিস্তার মেলে না রাজিয়ার।

দুর্বলের উপর ক্ষমতাবান বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে জোর খাটিয়ে থাকে। কখনো কখনো তা ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। বৈদ্যবাটি থেকে কলকাতা এসেও আনোয়ার, জয়েদ, ময়েদদের হাত থেকে সহজে নিস্কৃতি মেলে না রাজিয়ার। গ্রামের রঙে চাপা তথাকথিত সুন্দরী নয় এমন মেয়েদের বিবাহের সম্বন্ধ এলে আসল পাত্রীর পরিবর্তে সুন্দরী রাজিয়ার মুখ দেখিয়ে বেশ কিছু বিবাহ হয়েছে। পরে জানতে পেরে বিবাহবিচ্ছেদও ঘটেছে। রাজিয়া প্রথমে বিষয়টিতে মজা পেলেও, তার জন্য একটি মেয়ের বিবাহ সম্ভব হচ্ছে ভাবলেও পরে এভাবে অন্যায়ভাবে মুখ দেখাতে না চাওয়ায় তাকে ধাওয়া করে গ্রামের কুরুচিপূর্ণ ক্ষমতাবান সেই সব মানুষ। সে যাত্রায় তাকে রক্ষা করে মিল্লাতের বন্ধু মবিন। পরে কলকাতার রাস্তায় রাজিয়া ও মিল্লাতের পিছু নিতে দেখা যায় তাদের। নবীনার স্বামী সাদিক এসেও সাবধান করে যায় রাজিয়াকে। যদিও বৈদ্যবাটিতে এই সাদিকের অনুরোধে তার মামাতো বোনের মুখ দেখানিতে গিয়ে বিপদে পড়েছিল রাজিয়া। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক পাড়াগাঁয়ের রাজিয়ার মতো অসহায় সুন্দরী মেয়েদের সামাজিক লাঞ্ছনার দিকটি তুলে ধরেছেন। যা প্রাথমিকভাবে একটি তুচ্ছ ব্যাপার মনে হলেও, এই তুচ্ছ বিষয় আবার মানুষের প্রাণনাষে উদ্যত হয়।

মিল্লাত তার ফুলবউ রাজিয়াকে সুখী দেখতে চায়। তাকে দিতে চায় একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন। তাই রাজিয়ার প্রতি নিজের অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন না হয়ে সে বন্ধু মবিনকে অনুরোধ করে তার ফুলবউকে বিবাহ করার জন্য। মবিন কলকাতায় ঔষধের দোকান চালায়। বৈদ্যবাটিতেও তার নিয়মিত যাতায়াত। নবীনার প্রতি ভালোবাসা থেকে মিল্লাতের প্রস্তাবকে সে গোড়াতেই নাকজ করে দেয়। পরে আপন মনে রাজিয়ার চরিত্র বিশ্লেষণ করে। কখনও সে গদ্য কবিতার সঙ্গে তুলনা করে তাকে, আবার কখনও তাকে *বেশ্যা* ভাবে। মবিনের মা জয়গুণও রাজিয়াকে ভালো চোখে দেখে না। সে নিজের অজান্তে লালন করে চলেছে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা। তাই রাজিয়াকে অনায়াসে ছলনাময়ী, ধুর্ত, লোভী ভাবতে পারে। কিন্তু মবিনের নানী (মায়ের মা) তথা জয়গুণের মা রাজিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল। মবিনের ভাগ্নের খৎনার (শৈশবে পুত্র সন্তানের যৌনাঙ্গের একটি পর্দা অপসারণ করা) অনুষ্ঠানে মিল্লাতের পাশে রাজিয়াকে প্রথম দেখে বৃদ্ধা নানী রাজিয়াকে মিল্লাতের স্ত্রী ভেবেছিল, তৎক্ষণাৎ তাঁর মেয়ে ভ্রান্তিমোচনে তৎপর হয়ে ওঠে। তাতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে, নানী হাজীর বর্বরোচিত আচরণের তীব্র নিন্দা করে। আর এখানেই তাঁর মানসিক বিস্তৃতির প্রমান মেলে। যে নবীনার প্রতি আকর্ষণের জন্য মবিন মিল্লাতকে না করেছিল সেই নবীনাও মবিনকে অনুরোধ জানায় তার ছোটোমা রাজিয়াকে নতুন জীবন দিতে। কারণ নবীনার পক্ষে মিল্লাত এবং রাজিয়ার একত্রবাস মেনে নেওয়া সহজ হয়নি। তার সমাজভাবনা, সাধারণ ধর্মীয় জ্ঞান তাকে সহজভাবে দেখতে দেয়নি। তাই বৃষ্টির রাতে কামার্ত মবিনকে নবীনা মিল্লাতের জমির দলিল দিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে মবিনের পৌরুষে আঘাত লাগায় রাজিয়ার শরীরে নবীনাকে ধর্ষণ করে সেই আহত পৌরুষ। এতেও ক্ষান্ত হয়নি মবিন। রিয়াজকে দ্রুত তাদের বিয়ের বন্দোবস্ত করতে বলে। হঠাৎ করে অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ হয়ে ওঠে মবিন। রিয়াজ মিল্লাতের সঙ্গে রাজিয়ার বিয়ের পরিকল্পনা করলে মবিন ধর্মের, সমাজের ভয় দেখায়। ছিঁড়ে ফেলে দেয় রিয়াজের হাতে থাকা রাজিয়ার তালাকনামা। এমনকি জোর করে তুলে এনে রাজিয়াকে বিয়ে করার হুমকিও দেয়। কেননা ধর্ষণ করার পর তার মধ্যে কোনো পাপ বোধ জন্মায়নি। এখানে ধর্ষণের সঙ্গে প্রবেশ করেছে ধর্ম।

প্রতিবাদী চরিত্রের নবীনা সাদিকের থেকে তালাক চায়। সে বলে, *মেয়েদের নসীব তো খোদা বানায় না। মানুষ তৈরি করে।...খোদার লীলা পুরুষেরই হাতে। খোদা একটা পুতুল।* [৫] মবিনের সঙ্গে তার অবৈধ যৌন-সম্পর্কের কথা ভেবে অপরাধবোধে ভোগে। রিয়াজের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মবিন রিয়াজকে খুন করতে পারে এই আতঙ্কে ঘুমোতে পারে না। তার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। উপন্যাসের শেষে রিয়াজের ফাঁকা বাড়িতে আত্মহত্যা করে নবীনা।

ঔপন্যাসিকের মানস প্রতিনিধি রিয়াজ। ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের নিজের স্বার্থে গড়া সামাজ-বিধির মারপ্যাঁচে তার শৈশব, পিতৃপরিচয় কালিমালিপ্ত। মুসলমান সমাজে তালাক দেওয়ার পর সেই স্ত্রীকে আবার রাগ কমে গেলে ঘরে ফিরিয়ে আনা অধর্ম। সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আবার তার থেকে তালাক নিতে পারলে পূর্বের স্বামী পুনরায় স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারবে। এই নিয়মের ছেলেখেলায় আদিনা ও মুজতবার সংসারে রিয়াজের জন্ম। বাড়ির ভৃত্য মুজতবার বিয়ের তিন মাস পর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কথা ছিল। সে তালাক না দেওয়ায় তাকে খুন হতে হয়। ফলে বাধ্য হয়ে এক মাস বয়সের রিয়াজকে কোলে নিয়ে আদিনা পুনরায় আলিজান মণ্ডলের সঙ্গে সংসার করে। বহুকাল চলে আসা ধর্মের নামে সামজের এই অসঙ্গতিগুলি ঔপন্যাসিক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন।

রিয়াজ পেশায় লাইব্রেরিয়ান। ধর্মের ধ্বজাধারীদের কোরান, হাদিস ঘেঁটে ধর্মের ভাষায় নিরস্ত করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। আকবর মৌলবীকে রিয়াজ রাজি করায় মিল্লাত ও রাজিয়ার বিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু মবিনের চক্রান্তে তা বিফল হয়। ঝড়-বৃষ্টিতে একাকী অসহায়ভাবে সাইকেল ঠেলে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করে রিয়াজ। ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত সৈনিক মনে হয় তকে।

আলোচনার সমাপ্তি পর্বে এসে মনে হয়, আবুল বাশার রাজিয়া তথা ফুলবউয়ের জন্য কোনো যথার্থ পথের সন্ধান পাননি। মনে পড়ে যায়, *চোখের বালির* (১৯০৩) বিনোদিনীকে। রবীন্দ্রনাথ শেষে তাকে কাশীতে পাঠান। আবুল বাশার তার রাজিয়াকে পাঠালেন নিরুদ্দেশে। তাদের এই অন্তিম পরিণতি দিয়েছে সাহিত্যিকের ধর্ম ও সমাজ ভাবনা। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও আমাদের সমাজ বিনোদিনীকে সংসারী হতে দিলেও রাজিয়া-মিল্লাতের মিলন হতে দেবে না সহজে। তার জন্য হয়তো অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুকাল, আরও কিছু সংস্কার।

সূত্র নির্দেশ :

১. আবুল বাশার, *মরুস্বর্গ,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ২০.
২. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২ ডিসেম্বর ২০১২, রবিবার।
৩. হুমায়ুন আজাদ, *নারী,* আগমনী প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৭৬.
৪. আবুল বাশার, *ফুলবউ,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ৩৩.
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১৫৮.

প্রমথ চৌধুরীর গল্পে ইউরোপীয় প্রসঙ্গ

স্বপন বর্মন
গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সাধনায় বিশেষ করে, গল্প রচনায় সার্থকতার মূলে ছিল 'সবুজ পত্র' (১৯১৪-১৯২৭) পত্রিকা। 'সবুজপত্র' পত্রিকাটি প্রকাশের পূর্বে তিনি তেমন কোনও মৌলিক গল্প রচনা না করলেও এর দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই বেশকিছু গল্প প্রকাশ করতে শুরু করেন। ফলে পাঠকের হাতে এসে পৌঁছোতে শুরু করে একে একে 'চার-ইয়ারী কথা' (১৯১৬), 'আহুতি' (১৯১৯), 'নীললোহিত' (১৯৩২), 'নীল-লোহিতের আদি প্রেম', 'ঘোষালের ত্রিকথা' (১৯৩৭) ও 'আশুকথা'র (১৯৩৯) মতো একাধিক শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি। এইসব একাধিক গল্পের পটভূমি ছিল ইউরোপ। আর বিষয়বস্তু হিসেবে দেখতে পাই, উনিশ শতকে অনেকে বিলেত থেকে সাহেব-সুবা হওয়ার চেষ্টা স্বরূপ অতিরিক্ত মদ্যপান, বিলাতি সাজ-পোশাক ও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতেন। আবার বিলাতে পড়তে গিয়েও অনেক প্রবাসী বাঙালি বিলাতি মেয়ের প্রেমে পড়া, বিয়ে করা, ফিরে আসার সময় ইউরোপের মাটিতে প্রেমিকাকে রেখে এসে স্বদেশের মাটিতে সেই আদি প্রেমের স্মৃতি রোমান্থন করা ইত্যাদির পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। আসলে প্রমথ চৌধুরীর গল্পে বিদেশি পরিবেশের এক অপূর্ব বহিরাগত স্বাদের, পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। স্বাদের ভিন্নতার কারণ পরিবেশের বৈচিত্র্য এবং চরিত্রের বৈচিত্র্য। আর এই চরিত্রের বৈচিত্র্য অবশ্য ইউরোপীয়।

সূচক শব্দ: প্রমথ চৌধুরী – **ইউরোপ** – উনিশ শতক – সবুজপত্র – চার-ইয়ারী কথা।

মূল আলোচনা:

ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে পারদর্শী বিলাতফেরত ব্যারিস্টার প্রমথ চৌধুরী সমাজের কাছে 'চৌধুরী সাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন। এই 'চৌধুরী সাহেবে'র পক্ষে বাংলা সাহিত্যচর্চা এক আশ্চর্য ঘটনা বলা চলে। প্রমথ চৌধুরীর প্রথম অনূদিত গল্প 'ফুলদানি' সাহিত্য পত্রিকায় ১২৯৮ সালে এবং প্রথম মৌলিক গল্প 'প্রবাস স্মৃতি' প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩০৫ সালে। তবে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সাধনায় বিশেষ করে, গল্প রচনায় সার্থকতার মূলে আছে 'সবুজ পত্র' (১৯১৪-১৯২৭) পত্রিকা। এই পত্রিকার লেখক গোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যে আবেগের পরিবর্তে যুক্তি এবং উচ্ছ্বাসের চেয়ে সংযমকে আনতে চেয়েছিলেন। পত্রিকাটির অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল ইউরোপীয় ভাব-প্রবণতার সঙ্গে দেশীয় সাহিত্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপনা করা। তাই সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী এ সম্পর্কে বলেছেন, ইউরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে আমাদের সাহিত্যের যে মুক্তি, স্ফূর্তি ও

সচলতার গতি এসেছে তাকে অবরুদ্ধ না করা। সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেন, ইউরোপীয় শিক্ষা আমাদের অতীত গৌরবের পাশাপাশি ভবিষ্যতের স্বপ্নকেও চিনিয়েছে। তাই আমাদের উচিত দেশকালের সীমারেখাকে অতিক্রম করে সর্বকালিক ভাবকে অবলম্বন করে নিজের দেশের এক নতুন সাহিত্য গড়ে তোলা। বলা বাহুল্য, প্রমথ চৌধুরী সেই কাজটিই করে গেলেন তাঁর 'সবুজপত্র' পত্রিকায়। প্রকাশিত হতে থাকে একের পর এক নতুন আঙ্গিকে নতুন স্বাদের গল্প। যদিও আর্থিক সংকটের কারণে প্রমথ চৌধুরী পত্রিকাটিকে কিছুদিন পরেই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

'সবুজপত্র' পত্রিকাটি প্রকাশের পূর্বে তিনি তেমন কোনও মৌলিক গল্প রচনা না করলেও এর দ্বিতীয় বর্ষ থেকে বেশকিছু গল্প প্রকাশ করতে শুরু করলেন। ফলে পাঠকের হাতে এসে পৌঁছাতে শুরু করল একে একে 'চার-ইয়ারী কথা' (১৯১৬), 'আহুতি' (১৯১৯), 'নীললোহিত' (১৯৩২), 'নীল-লোহিতের আদি প্রেম', 'ঘোষালের ত্রিকথা' (১৯৩৭) ও 'আশুকথা' (১৯৩৯)-র মতো একাধিক শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি।

প্রবাসস্মৃতি (১৩০৫): প্রমথ চৌধুরীর প্রবাস জীবনের অর্থাৎ ইউরোপের অক্সফোর্ডে পড়াকালীন সময়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা একাধিক গল্পে নানাভাবে উঠে এসেছে। 'প্রবাসস্মৃতি' প্রমথ চৌধুরীর এমনই একটি গল্প। এছাড়া এটি তাঁর প্রথম মৌলিক গল্পও বটে। এই গল্পটির পটভূমি ইংল্যান্ড এবং এর নায়ক-নায়িকা ইংরেজ, শ্বেতদ্বীপ বাসিনী। গল্পটিতে গল্পকথক ও তার বন্ধু বসন্তকালে অক্সফোর্ড পার্কে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার বিলেতি পার্কের সৌন্দর্য, নরনারীদের প্রেম-ভালোবাসা নিবেদন, নারীর প্রতি আসক্তি ও নিজেদের যৌবনের উদ্দাম শক্তির বিকাশ ইত্যাদির কথা উঠে এসেছে। সৌন্দর্য পিপাসু প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'প্রবাসস্মৃতি' গল্পে পার্কে বেড়াতে গিয়ে সেই সৌন্দর্যসত্র দেখে ছিলেন। এছাড়াও সেখানে একাধিক ইউরোপীয় পুরনরনারীদের মধ্যে প্রেম নিবেদনের অঙ্গভঙ্গির ও তাদের শব্দচিত্র তাকে মোহমুগ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেইসব ইউরোপীয় নারীদের 'শব্দচিত্র'— তাদের শরীর ও মনের চেহারার সমান দক্ষতার সঙ্গে শিল্পীর নিপুন তুলিতে এঁকেছেন, ঠিক যেমনটি দেশীয় নায়িকাদের জীবন রূপায়নে করেছেন।

আসলে প্রমথ চৌধুরীর যে, পরবর্তীকালের একজন সৌন্দর্যে মণ্ডিত মন ও মনের অধিষ্ঠাত্রী চিরন্তনী নারীর পূজারী লেখক হয়ে উঠবেন তার সূচনা যেন ঠিক এখান থেকেই।

চার-ইয়ারী কথা (১৯১৬): 'সবুজপত্র' চৈত্র ১৩২২ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরীর 'চার-ইয়ারীর কথা'। 'চার-ইয়ারী কথা' আদপে চারটি গল্প; একটি শিরোনামে প্রকাশিত।

'চার-ইয়ারীর কথা' গ্রন্থটি লেখক সমবেত চার বন্ধুর এক আড্ডার পরিবেশকে নিয়ে রচিত গল্পটি। গল্পের শুরু ঝড়-বৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে। চার বন্ধুর-ই বাড়ি ফেরার তাড়া থাকলেও বাধা হয়ে দাড়িয়েছে সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

সময় কাটানোর জন্য এরা সকলেই সুরা পানে মজেছে। আর এই পরিবেশ চার বন্ধুর মনের আগল ভেঙে দিয়েছে, ভেঙে দিয়েছে সমাজ সংস্কার ও অভ্যাসের সৌধ। ফলে তাদের প্রত্যেকের মুখ দিয়ে অবলীলায় বেড়িয়ে এসেছে এতদিনের যৌবনকালের হারানো চারটি মন, যেখানে পূর্ণ ছিল যৌবনের সৌন্দর্যাভিসারের বেদনা সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। প্রত্যেকের অতীত অভিজ্ঞতার বর্ণনা এক একটি গল্পে পরিণত হয়েছে। গল্পের পটভূমি বিচারে দেখা যাবে, ভারত ও ইউরোপের সংযোগ সমন্বয় ঘটেছে। গল্প গ্রন্থটির চারটি গল্পের মধ্যে প্রথম গল্পটি ছাড়া বাকি তিনটি গল্পের ঘটনাস্থল হল ইউরোপ এবং চারটি গল্পেই নায়কেরা ভারতবর্ষীয় হলেও তাদের নায়িকারা সকলেই বিদেশিনী তথা ইউরোপীয়। গল্প গ্রন্থটিকে আদ্যপ্রান্ত পাঠ করলে আপাতভাবে এটিকে একটি প্রেমের গল্প বলে মনে হতেই পারে। কিন্তু গভীরভাবে পাঠ করলে বোঝা যাবে, গল্পটি আসলে তা নয়। গল্পের মধ্যে জড় আত্মার বিকাশ ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন নারীর আদর্শকে মেলাতে চেয়েছেন লেখক। আর তা যে ক্ষুদ্র দেশ-কাল-সংস্কারের মধ্য আবদ্ধ মানুষে সম্ভব নয়; সেজন্যই গল্পের শুরুতেই লেখক ঝড় এনে সেই দেশকালের গণ্ডিকে ভেঙে দিয়েছেন। এরপর নায়কেরা একে একে দ্বিধাহীনভাবে তাদের 'প্রেমের' অভিজ্ঞতা সকলের সামনে বলেছে।

প্রমথ চৌধুরীর 'চার-ইয়ারি কথা' গ্রন্থে ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে চারবন্ধুর চারটি পৃথক প্রেমের অভিজ্ঞতার বর্ণনা আমাদের সমস্ত রকমের রোমান্টিক প্রেমের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে বিপর্যস্ত করে সম্পূর্ণ এক নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছে। অথচ গল্পগুলির আকর্ষণ কিংবা গল্পরস আস্বাদন অক্ষুন্ন রয়েছে। তাই এই গল্পগুলি সাধারণ প্রেমের গল্প নয়। গল্পগুলিতে বিশেষ কোনও নারীর প্রতি জৈবিক আকর্ষণ নেই, পরিবর্তে নারীর মধ্যে মূর্ত সৌন্দর্যের ভাবসত্ত্বের প্রতি অর্থাৎ চিরন্তন নারীর প্রতি আকর্ষণই গল্পচতুষ্টের মূল প্রসঙ্গ। এখানে নায়কেরা সম্পূর্ণ নীতিশাসন মুক্ত হয়ে তাদের বেপরোয়া যৌবনের প্রাণচাঞ্চল্যেকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে।

মেরি ক্রিস্‌মাস (আশ্বিন, ১৩৪৪) : এদেশের ছাত্রদের বিলেতে গিয়ে প্রেমে পড়া ছিল খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু তাদের বিয়ে হত কদাচিৎ। তবে এই প্রেমের স্মৃতি যে কতটা তরতাজা থাকত এবং সেই স্মৃতি নিয়ে কীভাবে ভবিষ্যৎ কাটাতেন আর কতটা হাবুডুবু খেতেন, তারই গল্প হল 'মেরি ক্রিসমাস'।

এই গল্পের কথক একজন বিলেত ফেরত, যিনি দীর্ঘদিন বিলেতে থেকে পড়াশুনা করেছে, বিলেতি মেয়ের প্রেমে পড়েছে এবং বর্তমানে দেশে ফিরে সংসার যাপন করছে। কথকের নিজের কথায়, 'আমি বিলেতে প্রেমে পড়েছিলুম, কিন্তু বিলেতি মেয়েকে বিয়ে করি নি; করেছি দেশে ফিরে দেশের মেয়েকে, আর নির্বিবাদে সস্ত্রীক সমাজের পিতলের খাঁচায় বাস করছি।'[১] কিন্তু কথক দেশি মেয়েকে বিয়ে করলেও তার মন পড়েছিল সেই বিদেশিনীর প্রতি, তার স্মৃতিকে পুরোপুরি ভুলতে পারেনি। তাই

কথক কখনও একাকী বসে থাকলে সেই বিলেতি মেয়ের অশরীরী ছায়ামূর্তি সম্মুখে এসে উপস্থিত হত। এরকমই ঘটনা বছর চার-পাঁচ আগে শীতকালে বড়োদিনের আগের ঘটেছিল। সেই রাতে তার মনে হয় বিলেতি কিশোরীটি শোবার ঘরে তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে থাকে— এই আছে, এই নেই। ফলে সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় না, জেগে স্বপ্ন দেখতে থাকে। পরের দিন স্ত্রী-র সখের জন্য চৌরাঙ্গীর একটি থিয়েটারে শৌখিন বিলেতি সাহেব-মেমদের গান শোনার জন্য গেলে সেখানেও কথক আনমনা হয়ে পড়েন। আবারও তিনি আবিষ্কার করে তার পাশের চেয়ারে বসেছে সেই বিলেতি আদি প্রণয়িনী। তার সেই গ্রীসিয়ান নাক, সেই ভায়োলেট চোখ। আর সেই ঠোঁট-চাপা হাসি, যার ভিতর ছিল শুধু জাদু। এরপর সেই প্রণয়িনীর চোখের ইশরায় থিয়েটারের বাইরে বেরিয়ে এসে একে অপরের খোঁজ-খবর নেওয়া থেকে শুরু করে অতীত প্রেমজীবনের আর বর্তমানের সাংসারিক জীবনযাপন মিলিয়ে মিশিয়ে ট্রাজেডি ও কমেডিময় জীবনের কথাবার্তা চলতে থাকে। এমন সময় তার স্ত্রী তাকে খুঁজতে এলে কথকের সমস্ত স্বপ্নময়তার অবসান ঘটে। তার স্ত্রী এই একা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলে কথক জানায়, “আজ আমার Merry Christmas.”

অদৃষ্ট (অগ্রহায়ণ, ১৩২৬): ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিলাতি রুচি, আদব-কায়দা, বাঙালি সমাজের অনেককেই আকৃষ্ট করেছিল। বিশেষত শহর কলকাতায় অনেকেই বিলাতি ঘরানায় বাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছেদ, খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন নিজেদের যোগ্যতা আর সামর্থ পরখ না করেই। এর ফলে তাদের জীবনে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়নি। প্রমথত চৌধুরীর ‘অদৃষ্ট’ গল্পটি তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই গল্পে খেলারাম পালবাবুদের বাড়ির সংস্কৃতি ছিল বিলেতিয়ানায় সাজানো। এই বাড়ির ফটকে বনেদী বাড়ির মতোই সিংহদ্বার ছিল, কিন্তু সেই সিংহদ্বার বিলেতি দস্তরে সাজানো ছিল নাচ ঘর।

> ‘ইতালী থেকে আমদানি-করা তুষার-ধবল নবনীতসুকুমার মর্মর-প্রস্তরে গঠিত প্রমাণ-সাইজের স্ত্রীমূর্তিসকল সেই বারান্দার দুধারে সার বেঁধে দিবারাত্র ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত— প্রতিটি এক-একটি বিচিত্র ভঙ্গিতে।’[২]

কিন্তু বর্তমানে এই নাচ ঘরের অবস্থা খুবই শোচনীয়। যদিও পালবাবুদের এই বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ অংশীদারি বিবাদ। ফলে সেই নাচঘরের এখন আসবাবের ভিতর আছে একটি জরাজীর্ণ কাঠের লেখার টেবিল আর কতগুলি ভাঙা চৌকি। এ ঘরে এখন ম্যানেজার-সাহেব দিনে আপিস করলেও রাত্রিতে সেখানে নর্তন হয় ইঁদুরের আর কীর্তন হয় ছুঁচোর। অথচ এই নাচঘর মেরামতের দায়িত্ব যার কাছে পড়েছিল তিনি হলেন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি সাত বছর চেষ্টা করেও উকিল-ব্যারিস্টার হতে না পারলেও সাহেবদের দোকানে তৈরি ইংরেজি পোষাক পরতেন। গল্পে দেখি—

> ‘... বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা একটানা ফার্স্ট ডিভিসনেই পাস করে এসেছেন, কিন্তু আদালতের পরীক্ষা তিনি থার্ড ডিভিসনেও পাস করতে পারলেন না। ...

> যখন সাত বৎসর বিনে রোজগারে কেটে গেল, আর সেই সঙ্গে বয়সেও ত্রিশ পেরুলো, তখন তিনি হাইকোর্টের জজ হবার আশা ত্যাগ করে মাসিক তিনশ টাকা বেতনে পালবাবুদের জমিদারি সম্পত্তির ম্যানেজারের পদ আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হল।'[৩]

যদিও এই ওকালতি করার কায়দা থেকে সম্পূর্ণ উল্টো ছিল জমিদারি করা। আসলে সেকালে অনেকেই বিলেতি বিদ্যার বিশেষত ব্যারিস্টারি পড়তে চাইলেও সকলে সফল হত না, পরিবর্তে নিজেরা সেই মোহে সর্বস্বান্ত হয়ে পরত। এবং শেষ পর্যন্ত দেশীয় জমিদারের অধীনস্ত নানা রকম কাজ করে জীবন নির্বাহ করত – তারই উদাহরণ হল এই গল্পটি।

স্বল্প গল্প (আষাঢ়, ১৩৪৫): বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় একদিকে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারি প্রথার বিদায় ঘন্টা বাজতে শুরু করে আর অন্যদিকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির আগমন—এই দুটি চিত্রই 'স্বল্প গল্প' গল্পটিতে চিত্রিত হয়েছে। গল্পে আমরা কথকের থেকে জানতে পারি, তার আকৈশোর বন্ধু কুমারেশ্বর, কুমারেশ্বর বাহাদুর পাড়া-গায়ের মধ্যবিত্ত জমিদারের একমাত্র সন্তান ছিলেন। সেই কথকের বন্ধুর মনেও লেগেছিল বিলেতিয়ানার ছোঁয়া। ফলে তিনি বি. এ. পাশ করে পাড়া গায়ে জমিদারি তদারকির পাশাপাশি সময় কাটাতেন ইংরেজদের মতো শিকার করে আর বিলেতি নভেল পড়ে। কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল, প্রথমে নম্বরের বন্দুক ও নভেল শুধু বিলেতেই জন্ম নিয়েছিল। এরকম বিলাতিয়ানার প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধার কারণেই তিনি দেবদেবীর ভক্ত না হলেও ঠাকুরবাড়ি দেখার জন্য আগ্রহের কমতি ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন architecture-এর অনুরক্ত, যা একরকমের বিলাতি শখ বটে। সময়ের সঙ্গে এই জমিদারি ব্যবস্থার সংকট দেখা দিলে সেই সংকট উত্তরণের জন্য বন্ধু কাছে পরামর্শ কথা উঠে এসেছে।

পূজার বলি (আশ্বিন, ১৩৩৪): প্রমথ চৌধুরীর 'পূজার বলি' গল্পে ব্যবহারজীবী বা উকিলেরা তাদের আয় উপার্জন বা ব্যাবসার প্রতি কতটা সচেতন ছিলেন তার অনেকটা বাস্তব পরিচয় পেয়ে থাকি। গল্পের শুরুই হচ্ছে তারই ইঙ্গিত দিয়ে,

> 'উকিল অবশ্য আমরা সবাই হই পয়সা রোজগার করবার জন্য। কিন্তু পয়সা সকলের ভাগ্যে জোটে না। তবুও যে আমরা অনেকেই ও ব্যাবসার মায়া কাটাতে পারি নে তার কারণ, ও ব্যাবসার টান শুধু টাকার টান নয়। ...'[৪]

পেশাদার উকিলেরা আদালতে তাদের পেশায় এক চরিত্র কৌশলে আর বাইরে মক্কেলদের কাছে আর এক চরিত্র কৌশলে হাজির হতেন। উকিলদের ছল শক্তির কথা প্রসঙ্গে বলেছেন,

> '... উকিলের কাছ থেকে যাঁরা ফৌজদারি আদালতে প্র্যাকটিস্ করেন; আর non-violent লোকেরা যে কত অবস্থায়, কত ভাবে, কত প্রকার ছল প্রয়োগ

> করেন তার সন্ধান পাওয়া যায় সেই-সব উকিলের কাছ থেকে— যাঁরা দেওয়ানি আদালতে প্র্যাকটিস্ করেন।'[৫]

এই উকিলেরা মামলায় হারলেই হারের জন্য জজের বিচারের দোষ ধরেন ঠিক যেমনটি পরীক্ষায় ফেল হলে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষকের দোষ ধরে থাকেন।

প্রিন্স (বৈশাখ, ১৩৩১): গল্পটি বিলেতের পটভূমিতে লিখিত। সে সময়ে বিলাতিয়ানায় বাঙালি যুবসমাজ নিজেকে কীভাবে ডুবিয়ে রাখতেন ও আত্ম-অহংকারে গদগদ করতেন তার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল প্রমথ চৌধুরীর 'প্রিন্স' গল্পটি।

গল্পকথকের বিলেতে থাকাকালীন এক হিন্দুস্থানী যুবক প্রিন্সের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে যুবকের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক হলে কথক জানতে পারে তার পূর্বপুরুষেরা পশ্চিমের রাজবংশের সন্তান ছিলেন। বর্তমানে ভাগ্য ও আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে পিতৃপুরুষের 'প্রিন্স' উপাধি ব্যবহার করে না। কিন্তু উপাধি ব্যবহার না করলেও

> 'তিনি পোশাকে দেদার টাকা খরচ করতেন এবং এ বিষয়ে অতিব্যয় করবার জন্য তাঁকে অপরাপর বিষয়ে অতিশয় মিতব্যয়ী হতে হত; এমন-কি, তাঁর আহার একরকম উপবাসের শামিলই ছিল। ইংলন্ডের রাজপুত্র যে দোকানে পোশাক তৈরি করান তিনিও সেই দোকানে পোশাক তৈরি করাতেন সমান ব্যয় করে, কিন্তু তিনি জীবন ধারণ করতেন রুটি মাখম ও কলা খেয়ে।'[৬]

এরপর প্রিন্সের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। এরপর বিলেতি মেয়েকে বিয়ে করে কোটিপতি হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাকে প্রেম নিবেদন করার কথা ভাবতে থাকে। একদিন এই প্রেম নিবেদনের উদ্দেশ্যেই তিনি লন্ডনের একটি বড়ো হোটেলে বাস করে পাঁচশো টাকায় একটি তেজি ঘোড়া ভাড়া ও পোশাক তৈরি করে Hyde Park-এ বিলাতি কন্যার সম্মুখে উপস্থিত হন। ঘোড়াটি রাস্তায় স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করলেও Hyde Park-এ প্রবেশ করেই হঠাৎ ধনুকের মতো বেঁকে চার পা তুলে লাফাতে থাকে। প্রিন্স অনেক কষ্টে কোনো রকমে তার প্রণয়পাত্রীর ঘোড়ার পাশে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে I love you এই কথাটি বলবার অভিপ্রায়ে শুধু I lo— পর্যন্ত বলেছেন আর অমনি ঘোড়া হঠাৎ এমন জোরে মাথা তুললো যে, সেই অশ্বমস্তকের আঘাতে তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা বের না হয়ে তাঁর নাক দিয়ে রক্তস্রাব হতে শুরু করল। এই দৃশ্য দেখে প্রেয়সী মহিলা খিল খিল করে হেসে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। আর তিনি হোটেলে ফিরে শয্যাশায়ী হলেন। আসলে তিনি মনে প্রাণে চাইতেন সাহেবিয়ানা, কিন্তু তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার অভাব ও দৈন্য। সে প্রায় প্রতিমাসেই এইরকম প্রেমের বিপদে পরতেন এবং অন্যসব বন্ধুরা সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতেন।

বীরপুরুষের লাঞ্ছনা (কার্তিক, ১৩৩১): এই গল্পে কথক বিলেতের তার ব্যারিস্টারি পড়ার সময়কালের ঘটনা জানাছেন এভাবে 'আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে। আমি সে দেশে থাকাকালীন এ দেশ থেকে একটি যুবক ব্যারিস্টারি পড়বার

জন্য ইংলণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হলেন।'[৭] পরে অবশ্য কথকের সঙ্গে এই যুবকের বন্ধুত্ব হয়। এই যুবক টেনিস খেলতে, ঘোড়ায় চড়তে, দাঁড় টানতে, খুবই সক্ষম হলেও পৃথিবীর অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে বিলেতের পাড়াগাঁয়ের একটি মেলায় গিয়ে এক সার্কাস গার্লের সঙ্গে পরিচয় হয়। প্রথমে তার সঙ্গে গলাগলি ভাব, স্বামী-স্ত্রীর মতো হাত ধরাধরি করে নাগর দোলায় চড়ে, হোটেলে যায়। এর পর যুবকটি সেই বিলেতি সার্কাস গার্লের মন জয় করার জন্য নিজেকে শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর বলে প্রমাণ করতে গিয়ে নাস্তানুবাদ হয়ে পরে। একসময় চরম আঘাতপ্রাপ্ত হলে কথকেরা উদ্ধার করে। এরপর সার্কাস গার্ল নিজেই তার পারদর্শিতার পরিচয় দিতে থাকে।

বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে বিলেতি মেয়ের প্রেমে পড়ে কীভাবে নিজেদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিত, কীভাবে উন্নত ইউরোপীয় শিক্ষা, বুদ্ধির কাছে বাঙালি ছাত্রেরা পিছিয়ে থাকত তার একটি অন্যতম উদাহরণ এই গল্প। এছাড়াও বিলেতের শিক্ষা-সাংস্কৃতি ও মেলা, নারী পুরুষের প্রেম নিবেদন, সখ্য, সূক্ষ্মবিদ্যার পারদর্শিতার ইত্যাদির পরিচয় পেয়ে থাকি।

ঝাঁপান খেলা (চৈত্র ১৩৩৭): 'ঝাঁপান খেলা' গল্পটিতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে বাঙালি সমাজ ও মনের মধ্যে ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও তাদের কর্মজীবনে প্রভাব ফেলেছিল তাই যেন সম্পূর্ণ একটি দেশীয় গল্পের আখ্যানের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। গল্পটি আমাদের কথকের বন্ধু শুনিয়েছেন। এই বন্ধুর পরিচয় দিতে কথক বলেছে—

> 'বন্ধুবর আসলে ছিলেন মুন্সেফ, কিন্তু তাঁর হওয়া উচিত ছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। প্রথমত তাঁর ছিল পুরো হাকিমি মেজাজ; আর সেই কারণে তিনি পরতেন ইংরাজি পোশাক, খেতেন ইংরাজি খানা, ফুঁকতেন আধ হাত লম্বা বর্মা চুরুট। উপরন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি লেখেন নির্ভুল ইংরাজি, আর বলেন ইংরাজের মুখের ইংরাজি। কিন্তু মুন্সেফি আদালতে এই দুই বিদ্যের পরিচয় দেবার তেমন সুযোগ নেই— এই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান দুঃখ।'[৮]

কথকের বাবারও ছিল ইংরেজ প্রীতি। কথকের বাবাও ছিলেন সেকালের ইংরাজি-পড়া ঘোর moralist। এছাড়াও তাঁর বাবার ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা, সাহেবদের ন্যায় বিলেতি ফ্যাশানে কুকুর পোষা, দেশি কুকুরের বিলাতি নামকরণ ইত্যাদি বিষয়েও বিলেতিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

গল্পলেখা (অগ্রহায়ণ, ১৩৩২): এই গল্পের মধ্যে আমরা দেখি, গল্পের পাত্র-পাত্রীরা ইউরোপীয়। আর এই ইউরোপের সেদেশের লোকজনেদের মধ্যে আবার ফ্রান্স বা প্যারিসেকে বেশি প্রাধান্য দিতে দেখি। তাইতো সব বিখ্যাত সব লেখকেরাই ইউরোপের ফ্রান্স বা প্যারিসের বসবাস করে। সেই সঙ্গে ইংরেজি গল্পের বাংলা অনুবাদের প্রসঙ্গ, বিলেতে লেখা গল্পের অলৌকিকত্ব কী বা কেমন তারও প্রসঙ্গ

এসেছে। পাশাপাশি ইংরেজি ও বাঙালির বাইরের চেহারা ও মনের চেহারার মধ্যে পার্থক্য প্রসঙ্গ এসেছে।

লন্ডনের একটি গরীব যুবক পেটের খিদেয় কীভাবে নারীবাদী, নারীমনস্তাত্ত্বিক লেখক হয়ে উঠলেন, অন্তত সমালোচকের দৃষ্টিতে তারই ব্যাখ্যান হল এই গল্পটি। যুবকটি নারীমনস্তাত্ত্বিক লেখক হওয়ার সুবাদে বিলেতের বড় বড় ঘরের মেয়েদের কাছে মধ্যহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ পেতে থাকেন। যদিও সেখানে খাবারের থেকে প্রশ্নের সংখ্যা থাকে অনেক বেশি। লেখকের আশা ক্রমে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকলে সেই নব লেখক এযুগের শ্রেষ্ঠ লেখকের আসনের আকাঙ্ক্ষায় অন্যান্য বিখ্যাত লেখকদের মতোই প্যারিসে আশ্রয় নেন। আর সেখানেই এক তরুণী নভেলিস্টের কাছে আসা, ভালোলাগা এবং তার কিছুদিন বাদে মেয়েটি আর্থিক সংকটের কারণে লন্ডনের এক উকিলকে বিয়ে করেন। এদিকে তরুণ নারীবাদী লেখক এই নারীর মন বুঝতে পারেনি, তাই ভালবাসলেও তা কোনোদিন বলতে পারেনি, এখানেই তার আক্ষেপ।

ধ্বংসপুরী (১৩৪৮): এই গল্পে দুই বিলেত ফেরতের সন্ধান পাই— এদের মধ্যে একজন সদ্য বিলেত ফেরত আর একজন পঁয়তাল্লিশ বছরের পূর্বেকার বিলেত ফেরত। আর এই দুজন বিলেত ফেরতের কথার মধ্যেই উঠে আসে ইউরোপীয় নগরীর এক ধ্বংসপুরীর কথা। যে ধ্বংসপুরীর ইতিহাস কেউ জানে না, কেবল লোকপরম্পরায় তার ইতিহাস লোকমুখে প্রচলিত। সেই অনুযায়ী, এই ধ্বংসপুরী ছিল Fox Hunting করা একটি বড় লোকের। সেকালে তারা রাজার হয়ে যুদ্ধ করত। তারা ছিল নিষ্ঠুর, নির্মম এবং যথেচ্ছারী। বর্তমানে তাদের শৃগাল বধ করা নেশা ও পেশা হলেও সেকালে মানুষ বধ করা ছিল তাদের ধর্ম ও কর্ম।

ধ্বংসপুরীর বাড়ির মালিক ছিল নামকরা যোদ্ধা, দু-তিন বছর অন্য দেশে যুদ্ধ করতে যান। এই সময় তার পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বিশ্বস্ত বন্ধু Lord-এর হাতে দিয়েছিলেন। কিন্তু একদিন হঠাৎ দুপুরে বাড়ি ফিরে দেখেন তার জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হয়েছে Lord। এতে বাড়ির মালিক সেই পরম বন্ধুকে হত্যা করেন এবং নিজে আহত অবস্থায় লুটিয়ে পরেন। এমত অবস্থায় মালিককে আহত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার স্ত্রী তাকে বল্লম দিয়ে খুন করে। এই ভ্রষ্টাচারী ও পতিহন্ত্যা মহিলাটি পরে ঘোর ধার্মিক হয়। পরে গুরুর মন্ত্রবলে তার স্বামীর ভূত নামালে সে তার উপপতির জন্য ব্যাকুল হয় এবং পাগল হয়ে আত্মহত্যা করে।

ভূতের গল্প (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯): এই গল্পে এক ইংরেজ সাহেব পেশায় সরকারি ইঞ্জিনিয়ার যে কর্মসূত্রে বিলেত থেকে সুদূর বাংলায় আসেন। সাহেবের কথায়, 'আমি যখন বিলেত থেকে চাকরি পেয়ে প্রথম এ দেশে আসি, তখন এ অঞ্চলের একটি জঙ্গুলে জায়গা হল আমার প্রথম কর্মস্থল।'[৯] ফলত একজন ইউরোপীয় বা বিদেশীর কর্মসূত্রে চোখে দেখা বাংলা তথা ভারত কেমন ছিল, বাঙালি নায়িকাদের রূপ ও তাদের

সাজসজ্জা ইত্যাদি সুন্দর রূপচিত্র ধরা পড়েছে এক ভূতরে স্বপ্ন গল্পের মাধ্যমে। সেই স্বপ্নময় ভূতের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

> ‘বিছানা থেকে উঠে রিভলভার হাতে নিয়ে নাবার ঘরের দরজা খুলে দিলুম। খুলেই দেখি, একটি স্ত্রীলোক। চমৎকার দেখতে, একেবারে নীলপাথরের ভেনাস। তার গলায় ছিল লাল রঙের পুঁতির মালা, দুকানে দুটি বড়ো বড়ো প্রবাল গোঁজা, আর ডান হাতের কব্জায় একটি পুরু শাঁখের বালা। মাথার বাঁ দিকে চুড়ো বাঁধা ছিল, আর পরনে এক হাত চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ি। এ মূর্তি দেখে আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।’[১০]

বাঙালি নায়িকাদের চোখে ইংরেজের সাহেবদের প্রেম ও ভালোবাসার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই সাহেবরা যে কেবল নিজেদের প্রয়োজনে এদেশীয় নারীদের ব্যবহার করত এবং প্রয়োজন ব্যতিরেকে ছুঁড়ে ফেলে দিত সেটিও প্রমথ চৌধুরীর এই লেখার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। এছাড়াও ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে রচিত গল্পের মধ্যে বাংলার সৌন্দর্যের এবং লোকায়ত সংস্কৃতির কথাও প্রকাশিত হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর ইউরোপের প্রবাস জীবন নিয়ে লেখা ও দেশীয় মানুষের ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রবণতা নিয়ে লেখা গল্পগুলিকে এক স্বতন্ত্র প্রকৃতি দান করে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। বিলাতে পড়তে গিয়ে অনেক প্রবাসী বাঙালির বিলেতি মেয়ের প্রেমে পড়া, বিয়ে করা, ফিরে আসার সময় ইউরোপের মাটিতে প্রেমিকাকে রেখে এসে স্বদেশের মাটিতে সেই আদি প্রমের স্মৃতি হাতড়ানো ইত্যাদির পরিচয় ও আমরা পেয়ে থাকি। এদিক থেকে প্রমথ চৌধুরীর ‘চার-ইয়ারী কথা’র চিন্তার স্বাচ্ছন্দ্য, বুদ্ধির দীপ্তি ও ভাষার বিদ্যুৎ তাঁর অন্য সব রচনার শিল্পমূল্যকে অতিসহজেই অতিক্রম করে গেছে।

পরিশেষে বলতে পারি, প্রমথ চৌধুরীর গল্পে ইউরোপ যৌবন-চঞ্চল বসন্তভূমি এবং স্বাস্থ্য সৌন্দর্য আনন্দময় দেশ। এই ইউরোপ একই সঙ্গে প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য ও সংগ্রামের দেশ, যা বাংলাদেশ থেকে শুধু দূরত্বে নয়, ভাব-ভাবনাতেও বহু যোজন দূরে, এটাই তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

উৎস নির্দেশ:

১. চৌধুরী, প্রমথ, *গল্প সংগ্রহ,* সুনীল কুমার সরকার (প্রকাশক), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪১২, পৃষ্ঠা- ৪০৫
২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯১
৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯২-১৯৩
৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫৮
৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫৮

৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ২২০-২২১
৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ২২৫
৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭৪
৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০২
১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০৩

সহায়ক গ্রন্থ

- আত্মকথা, প্রমথ চৌধুরী, দি বুক এম্পরিম লিমিটেড১৯৪৬ ,
- গল্পসংগ্রহ ,প্রমথ চৌধুরী ,সুনীল কুমার সরকার (প্রকাশক(, বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ ,প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩
- প্রমথ চৌধুরী মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ ,জীবেন্দ্র সিংহরায় ,
- *বাংলাসাহিত্যে ছোট গল্প ও গল্পকার*, ভূদেব চৌধুরী, মর্ডান বুক এজেন্সি, কলকাতা১৯৬২প্রথম প্রকাশ ,
- বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী, রথীন্দ্রনাথ,রায় , জিজ্ঞাসা১৯৬৯ ,
- শিশিরকুমার দাশ ,*বাংলা ছোটগল্প(১৮৭৩-১৯২৩)*, দেকলকাতা ,জ পাবলিশিং' ১৯৬৩

প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ দেশভাগ ও মানুষের বহুমাত্রিক বেদনার স্বর

বিদ্যুৎ সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ

সংক্ষিপ্তসার : বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে দেশভাগকে নিয়ে যাঁরা কলম ধরেছেন তাঁদের মধ্যে প্রফুল্ল রায় অন্যতম একজন অবিস্মরণীয় রচনাকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রফুল্ল রায় নিজেই একজন দেশান্তরিত শরণার্থী'। তাঁর গল্পের বিষয়ভাবনা হিসেবে উঠে এসেছে দেশভাগ জনিত উদ্বাস্তু সমস্যা, সম্প্রদায়িক হানাহানি, নারী লুঠ, ধর্ষণ- এসবের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, দেশত্যাগের বেদনাবহ স্মৃতিচারণ, দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে আইডেনটিটি সমস্যা প্রভৃতি। 'শুধু এপার বাংলা বা ওপার বাংলা নয় বাংলার বাইরেও ভারতের নানা প্রান্তে দেশভাগ জনিত সামগ্রিক সমস্যার কবলে পড়ে মানুষ যে অতি অসহায়
অবস্থার মাঝে জীবন কাটাচ্ছে , তারই বাস্তব রূপচিত্র স্বতন্ত্রতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে তাঁর ছোটোগল্পে। তাঁর লেখা প্রায় বেশিরভাগ গল্পের মধ্যেই উঠে এসেছে। দেশভাগের প্রসঙ্গ। তবুও তাঁর লেখা দেশভাগকেন্দ্রিক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্পের নাম ‘মাঝি’, ‘ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী’, ‘অনুপ্রবেশ’, ‘শেকড়', ‘রাজা যায় রাজা আসে’ প্রভৃতি। আমি আমার আলোচনাপত্রে তাঁর দেশভাগকেন্দ্রিক গল্পগুলির মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি গল্প বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছি কীভাবে দেশভাগের যন্ত্রণার শিকার হয়েছে সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি দেখিয়েছি দেশভাগের দুঃসময়েও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে গিয়ে মানুষ কীভাবে রক্ষা করেছে মানুষকে।

সূচক শব্দ : দেশভাগ, প্রফুল্ল রায়, উদবাস্তু, ছিন্নমূল, শিকড়, দেশান্তরিত মানুষ, অনুপ্রবেশ, দাঙ্গা, শরণার্থী ।

প্রতিপাদ্য বিষয়

“সুশান্ত, তোমার মনে পড়ে
সরলার মাকে, যে এখানে
কাজ করত? হঠাৎ সেদিন
শুনল যেই বন্যা পাকিস্তানে,
বুড়ি গিয়ে বসল বারান্দায়
দেখি তার চোখে জল ঝরে।”
(‘চিঠি' ; মনীন্দ্র রায়)

দেশভাগ বাঙালির ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতির উপর যে ভয়ংকর প্রভাব [ফেলেছে তার বাস্তব রূপচিত্র ফুটে উঠেছে এপার বাংলা ও এপার বাংলায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে।হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশভাগ পরবর্তী উদবাস্তু সমস্যা, দেশভাগের বিষাদময় স্মৃতি- এককথায় দেশভাগকে মূল ভাববস্তু হিসেবে ধরে বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে অজস্র ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা প্রভৃতি। এপার বাংলা ও ওপার বাংলার যে সকল সহৃদয়বান লেখকের রচনায় দাঙ্গা, দেশভাগের নির্মম বাস্তবচিত্র এবং স্মৃতিভারাতুর চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন সলিল সেন, মনীন্দ্র রায়, বিষ্ণু দে, সোমেন চন্দ, বিভুতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, সমরেশ বসু, অমিয়ভূষণ মজুমদার, হাসান আজিজুল হক, প্রফুল্ল রায়, প্রমুখ।

বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে দেশভাগকে নিয়ে যাঁরা কলম ধরেছেন তাঁদের মধ্যে প্রফুল্ল রায় অন্যতম একজন অবিস্মরণীয় রচনাকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর জন্ম ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর অখণ্ড বাংলার ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আটপাড়ায়। বাল্য এবং কৈশোরকাল কেটেছে পূর্ববঙ্গে, দেশভাগের পর চলে আসেন ভারতবর্ষে। প্রফুল্ল রায় নিজেই একজন দেশান্তরিত শরণার্থী। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন – "দেশভাগের পর পূর্বপুরুষের ভিটে মাটি থেকে শিকড় ছিড়ে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের সঙ্গে সীমান্তের এপারে চলে আসি। নিঃস্ব, সর্বস্ব-খোয়ানো এই মানবগোষ্ঠীর আমি একজন। আমাদের গায়ে একটি মোলায়েম তকমা সেঁটে দেওয়া হয় - শরণার্থী'। শুরু হয় টিকে থাকার জন্য দাঁতে-দাঁত চাপা যুদ্ধ। দিনের পর দিন। জীবন সংগ্রাম' শব্দটি তখন আমাদের হাড়ে-মজ্জায় ঢুকে গেছে। সেটা যে কী নিদারুণ লড়াই, প্রতি মুহুর্তে টের পাচ্ছি।"১

প্রফুল্ল রায়ের গল্পের বিষয়ভাবনা হিসেবে উঠে এসেছে দেশভাগজনিত উদবাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, হত্যা, নারী লুঠ ধর্ষণ এসবের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, দেশত্যাগের বেদনাবহ স্মৃতিচারণ, দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে আইডেনটিটি সমস্যা প্রভৃতি। শুধু এপার বাংলা বা ওপার বাংলা নয় বাংলার বাইরেও ভারতের নানা প্রান্তে দেশভাগ জনিত সামগ্রিক সমস্যার কবলে পড়ে মানুষ যে অতি অসহায় অবস্থার মাঝে জীবন কাটাচ্ছে, তারই বাস্তব রূপচিত্র স্বতন্ত্রতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর ছোটোগল্পে। তাঁর লেখা প্রায় বেশিরভাগ গল্পের মধ্যেই দেশভাগের প্রসঙ্গ এসেছে। হয়তো কোথাও প্রত্যক্ষভাবে আবার কথাও হয়তো পরোক্ষভাবে। তবুও দেশভাগকে নিয়ে তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হল - 'মাঝি', 'অনুপ্রবেশ, 'রাজা যায় রাজা আসে', 'ধুনীলালের দুই সঙ্গী', 'স্বপ্নের ট্রেন', 'শিকড়', 'দেশ নেই', 'রক্তকমল', 'স্বাদ', 'বিদেশী', 'যেখানে সীমান্ত নেই', প্রভৃতি।

প্রফুল্ল রায়ের লেখা প্রথম গল্প 'মাঝি' । দেশভাগকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গাই হচ্ছে গল্পটির পটভুমি। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ফজল। সে ধলেশ্বরী নদীতে নৌকা বায়। সে ভালোবাসে সলিমাকে। সলিমাকে বিয়ে করে স্বপ্নের ঘর বাঁধতে চায় সে। কিন্তু সলিমার বাজান সলিমার বিয়ের জন্য সাত কুড়ি টাকার কথা বলেছে।তাই সে কঠোর পরিশ্রম করে টাকা সঞ্চয় করতে থাকে। দিন রাত নৌকা বায় আর স্বপ্নের সাগরে ভাসতে থাকে সলিমাকে নিয়ে। সাতকুড়ি পূর্ণ হতে তার আর তিন টাকার প্রয়োজন। দেশ ভাগের কারণে দলে দলে হিন্দুরা কলকাতায় যাচ্ছে একটা "কেরায়া মিললে তার স্বপ্ন পূর্ণ হবেই। ভবিষ্যতের স্বপ্নমাখা মধুর দিনের কল্পনা করে গান গাইতে গাইতে তন্ময়তার মধ্যে হঠাৎ মনে পড়ে যায়। 'সন্ধ্যার সময় মর্মরিত নারকেল বনে' সলিমার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা। "অতএব তাড়াতাড়ি উঠে 'পারা' তুলল ফজল। নৌকা ভাসাতেই কেরায়া চেয়ে সওয়ারির হাঁক 'মাঝি, কেরায়া যাইবা নিকি?' কাছে আসতেই ফজল তাকে চিনতে পারে। পাশের গ্রাম মালখানগরের ইয়াছিন শিকদার , সঙ্গে বরখা ঢাকা এক মহিলা। ফজলের ধারণা মহিলাটি ইয়াছিন শিকদারের বিবিজান। সে সওয়ারি হতে চায় ইসমাইল চরে। ফজল ইসমাইল চরে যেতে দশ টাকা ভাড়া দাবি করে। ইয়াছিন প্রথমে রাজি না থাকলেও শেষে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু নৌকায় উঠতে গিয়ে দেখা যায়, বরখা পরিহিতা মহিলা ইয়াছিনের সঙ্গে যেতে চায় না। সে তীক্ষ্ণ গলায় যেতে আপত্তি জানায় - "না না আমি যামু না। আমারে ছাইড়া দ্যান। আপনের পায়ে পড়ি।"২ ইয়াছিন মহিলাটিকে চাপা গর্জন করে বলতে থাকে –" হারামজাদীর সুখে থাকতে ভূতে কিলায়। গিয়া থাকবি খাঞ্জা খাঁর নাতিনের লাখান। নাইলে গুয়াখোলার ওই কেরামত ডাকুই তরে নিয়া যাইত। তার কিল খাওয়ার থিকা আমার খোদ বেগম হওন কি ভাল না?"৩ এই ঘটনা দেখে ফজল ইয়াছিনের উদ্দেশে হঠাৎ বলে উঠে"কি মিঞাছাব, বিবিজান চর ইসমাইলে যাইতে চায় না নিকি?"৪ 'ও কিছু না বলে ইয়াছিন ফজলকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেও ফজলের মনে সন্দেহ হয়। ইয়াছিন নারীমূর্তিটিকে প্রায় জোরাজুরি করে নৌকার পাটাতনে তুলতে চাইলে সে আকাশ ফাটানো চিৎকার শুরু করে। ফজল অনেকটা শঙ্কিত হয়ে বলে-"মিঞাছাব, আমার যান কেমুন লাগতে আছে। আপনে কাই হকালেই যাইয়েন।" ফজলের কথায়। ইয়াছিন জানায়, তাকে সেই রাতেই ইসমাইল চরে পৌছাতে হবে বরং দশ টাকার পরিবর্তে পনের টাকাই সে দেবে। পনের টাকার কথা শুনে ফজল ভাবে, পনের টাকা পেলে তার এতদিনের স্বপ্ন পূরণ হবে। সলিমার বাজানকে সাত কুড়ি দেওয়ার। পরও বারটা কাঁচা টাকা তার গেজেতে থেকে যাবে। এই সকল ভাবতে ভাবতে তার মনটা আনন্দে ভরে উঠে। ধলেশ্বরীর অন্তহীন স্রোতের মাঝে তার সাধের নৌকাকে ভাসিয়ে দিয়ে মনের সুখে গান ধরল ফজল। কিন্তু নৌকার ছইয়ের ভেতর

থেকে ইয়াছিনের ধস্তাধস্তির আভাস পেয়ে ফজলের বুকের ভেতরটা যেন শুকিয়ে গেল। গান বন্ধ হল। নারীমূর্তীটির চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে আসল ফজলের কানে –"তাই, তাই করেন। হয় আমারে মাইরা ফালান, নাইলে ছাইড়া দ্যান। নাইলে আমি জলে ঝাপ দিমু।"৬ নারীমূতীটির কথায় ইয়াছিন খিক খিক করে হেসে উঠে বলে –"মরণ কি অতই হস্তা, এমনে তরে মারুম নিকি? এটু এটু কইরা খুন করুম।"৭ ইয়াছিন ও নারীমুতাটির এইরূপ কথাবার্তা শুনে ফজল বিব্রত হয়ে পড়ে। এদিকে ছইয়ের ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ-" আমারে ছইবেন না, ছইবেন না এই আপনের ধর্মের বিচার! এইর লেইগা অগো হাত থিকা আমারে ছিনাইয়া আনছেন? আপনে কইছিলেন না আমারে কইলকাতায় পৌছাইয়া দিবেন।"৮ নৌকার ছইয়ের ভেতর ইয়াছিনের সঙ্গে অসহায় নারীমূর্তীটির ধস্তাধস্তিতে ধলেশ্বরীর বুকে ফজলের নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। এই পরিস্থিতিতে নারীমুতীটি তীব্র গলায় চিৎকার করে -" আমারে বাচাও মাঝি, বাচাও। আমার সব্বনাশ কইরা ফালাইল।"৯ ফজলের মন থেকে সলেমার স্বপ্ন মুছে গেছে। মানবিক চেতনার দীপ্ত আলোকে তার মানস চেতনা হল উদ্ভাসিত। তার চোখ দুটি বাঘের চোখের মতো জ্বলে উঠল। ভয়ঙ্কর গলায় 'মিঞাছাব' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই ছইয়ের ভেতর থেকে ইয়াছিন বেরিয়ে বসল বাইরের পাটাতনের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ভীত সন্ত্রস্ত অসহায় মেয়েটিও ঝাঁপিয়ে বাইরে বেরিয়ে চিৎকার করে উঠল আমারে বাচাও মাঝি, আমারে বাচাও। আমি তাতি বাড়ির বউ। দাঙ্গায় আমার হোয়ামীরে মারছে ওরা। আর এই-১০ মেয়েটির কণ্ঠের এই কথাগুলো শেষ হতে না হতেই ইয়াছিনকে লক্ষ্য করে হাতের থাবা থেকে কোঁচটা সজোরে ছুঁড়ে মারে ফজল। ইয়াছিন বাধা দেওয়ার আগেই তার জরে গেথে যায়। ইয়াসিন ধলেশ্বরীর স্রোতে হারিয়ে যায় কোথায়।

গল্পের শেষে দেখি ফজল মেয়েটিকে তারাপাশা স্টিমার ঘাটে নিয়ে আসে। স্বপ্নের সলেমাকে পাওয়ার জন্য তিল তিল করে জমানো টাকা থেকে মেয়েটির জন্য কলকাতার টিকিট কেটে অবশিষ্ট টাকাটাও মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে ধলেশ্বরীর বুকে উধাও হয়ে যায় ফজল।

গল্পটির মধ্যে লেখক একদিকে দেখিয়েছেন দেশভাগের কারণে দলে দলে হিন্দু পূর্বপাকিস্তান ছেড়ে কলকাতায় যাচ্ছে এবং দাঙ্গা, নারী লুণ্ঠণ। এই সবকিছুর মাঝে তিনি দেখিয়েছেন উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ মানবিক চেতনাদীপ্ত ফজল মাঝিকে। যে মুসলমান হয়েও হিন্দু নারীর সম্মান রক্ষার জন্য নিজের সুখ-স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়ে। নারীলুঠেরাকে হত্যা করেছে। তাঁতি বউয়ের সম্মান রক্ষার দ্বারা প্রকৃতভাবে সে সলেমার নারী সত্তাকে রক্ষা করেছে, সমগ্র নারীসত্তার সম্মান রক্ষা করেছে। ফজল চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক এই বার্তা দিয়েছেন দেশভাগ পরবর্তী পূর্বপাকিস্তানের সব মুসলমান দাঙ্গাবাজ হত্যাকারী লুঠেরা ছিল না, তাদের মধ্যে ফজলের মতো। মানবিক চেতনাদীপ্ত

মানুষও ছিল। যারা মানুষের দুঃসময়ে মানুষের রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে, মানুষের সম্মানকে রক্ষা করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছে।

একই ভাবে ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী' গল্পে দেশভাগের সময়ে দাঙ্গাবিধ্বস্ত বিহারের সহায় মুসলমানদের রক্ষকর্তা হয়ে দেখা দেয় হিন্দু ধুন্নিলাল। দেশভাগ পরবর্তী বিহারে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত প্রফুল্ল রায়ের অন্যতম একটি গল্প 'ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী'। পূর্বে আলোচিত 'মাঝি' গল্পে আমরা দেখেছি মুসলমান মাঝি ফজল হিন্দু নারীর সম্মান রক্ষা করে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে নিয়েছিল। এই গল্পেও দেখি বিহারের হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের উস্কানিতে বিহারের হেকমপুরায় মুসলমান নিধন শুরু হলে, ধুন্নিলাল মুসলমান চাচা জমিরুদ্দিন এবং তসমাকে বাঁচায় হত্যাকারীদের হাত থেকে। গল্পের কাহিনি বিশ্লেষণে দেখতে পই কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লি, পাঞ্জাব লাহোর - এই সব জায়গার দাঙ্গার খবর লাছায় বিহারের বারহৌলি, হেকমপুরায়। হেকমপুরা থেকে মাত্র বার মাইল দূরে বরহৌলিতে খুনখারাপি শুরুর পর হেকমপুরার গরীব অসহায় মুসলমানরা ভীত। সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ধুন্নিলাল তার আদরের ঘোড়ার গায়ে হাত বুলাতে বুলোতে মনে পড়ে – "আজ দশটার মধ্যে হেকমপুরার সবচেয়ে বড় ব্যবসাদার গৈৰীনাথ মিশ্রর। বাড়ির সামনের বড় মাঠে বিরাট 'মিটিন' হবে। পাটনা থেকে বড় বড় আদমিরা এসে কী সব বলবেন।... গৈবীনাথ এই এলাকার সব চেয়ে বড় ব্যবসাদার তো বটেই, হিন্দুদের সব থেকে জবরদস্ত নেতা। তাঁর হুকুমনামা অমান্য করার মতো। বুকের পাটা কারুর নেই। বিশেষ করে ধুন্নিলালের।"১১ কারণ কিছুটা লেখাপড়া। জানার জন্য ধুনিলাল গৌবিনাথের আড়তে হিসাব রাখার কাজ করে।

মিটিং-এর খবর পৌঁচেছে হেকমপুরার নিরীহ মুসলমান টৈলিতেও। ধুন্নিলাল যাওয়ার পথে তার নজরে পরে নিরীহ মুসলমান আতঙ্কিত জমিরুদ্দিনকে। পুরো মুসলমান টৌলির মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ এই বৃদ্ধ জমীরুদ্দিন। তার সংসারে একমাত্র নাতনি আসমা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই। ধুন্নিলালের বুঝতে পারে। জমীরুদ্দিনের আতঙ্কের কারণ সম্পর্কে। ধুন্নিলাল তার সঙ্গীদের মিটিং -এ যেতে বলে জমীরুদ্দিনের কাছে চলে আসে ধুন্নিলাল। দাঙ্গার আশঙ্কায় মুসলমান মহল্লা ছেড়ে বেশির ভাগ মানুষ চলে গেছে নিরাপদ আশ্রয়ে কিন্তু জমিরুদ্দিনের রিস্তেদার কেউ না থাকায় তাকে পড়ে থাকতে হয়েছে এই হেকমপুরায়। ধুন্নিলাল জমিরুদ্দিনের মৃত ছেলে রসিদের বন্ধু। হত্যা খুন-খারাপির ভয়ে জমিরুদ্দিন ধুন্নিলালের উদ্দেশে বলে "ধুন্নি, তুই আমার বেটা য্যায়সা। বলে দে, এখন আমি কী করব?"১২, এই বলে ধুন্নিলালকে আঁকড়ে ধরে জমিরুদ্দিন। ধুন্নিলাল তাকে আশ্বস্ত করলেও জমিরুদ্দিন বলে –"আমার মন বলছে হেকমপুরায় আগুন জ্বলবে।"১৩ ধুন্নিলাল সবটাই বুঝতে পারে। সে জমিরুদ্দিনের

উদ্দেশে বলে- "যদি এর ভেতর দেখ, কোনো ঝামেলা হচ্ছে, আসমাকে নিয়ে সোজা আমাদের কোঠিতে চলে যেয়ো। ঘরে মুনিয়া আছে। তাকে বলো আমি তোমাদের যেতে বলেছি। ... বড় সড়ক দিয়ে যাবে না, কারুর নজরে পড়ে যাবে। কেন ওদিক দিয়ে যেতে বারণ করছি জরুর বুঝতে পারছ।"১৪

এদিকে মিটিং থেকে নেতাদের স্পষ্ট বার্তা 'কলকাতা, নোয়াখালি, লাহোরের বদলা নিতে হবে।' মিটিং শেষে শুরু হল বদলার পালা। মুহূর্তের মধ্যেই মুসলমান মহল্লায় আগুন লাগানো হল। কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেল। ধুন্নিলাল হতভম্ব হয়ে একটু দাঁড়িয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে জমীরুদ্দিনের মহল্লার ভেতর ঢুকে - "আতিপাতি করে চারিদিকে জমিরুদ্দিনদের খোঁজ করল কিন্তু তাদের পাওয়া গেল না। তবে তিন চারটে লাশ দেখা গেল। ওরা হল ফরিদ, আমজাদ, মইনুল আর আসাদ। মৃতদেহগুলোর শরীর থেকে তখনও টুইয়ে চুইয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে।... হতবুদ্ধির মতো কিছুক্ষণ আসাদদের দেখল ধুন্নিলাল। তারপর প্রায় টলতে টলতে উঁচু সড়কে উঠে এল।"১৫

ধুন্নিলাল বাড়ি গিয়ে দেখতে পায় জমিরুদ্দিন তার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তার মন থেকে চিন্তা দূর হয়নি। তার চিন্তা এই হত্যালীলা থেকে জমিরুদ্দিন আর আসমাকে কীভাবে বাঁচাবে। এদিকে পাঁচদিন পর তার বাড়িতে জমিরুদ্দিনের আশ্রয় নেওয়ার খবর জানতে পেরে হত্যাকারীরা ধুন্নিলালের বাড়িতে আসছে। শিউনাথের কাছে এই সংবাদ পেয়ে ধুন্নিলাল এক মুহুর্ত হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে থেকে পরক্ষণেই ঘোড়া আর বন্দুক, তার এই দুই সঙ্গীকে নিয়ে আসমা, মুনিয়া, আর জমিরুদ্দিনকে ঘোড়ার উপর তুলে ঝড়ের গতিতে হেকমপুরার বড় রাস্তায় ছুটে চলল। সশস্ত্র জনতা যখন চিৎকার করে বলে, 'রুখ যা ধুন্নী - রুখ যা-' উত্তরে বন্দুক উঁচিয়ে ধুন্নিলাল চেঁচায় – "হোঁশিয়ার, গোলি মারকে সিনা ফোঁড় দুঙ্গা-।"১৬

গল্পের শেষে এইভাবেই ধুন্নিলাল চাচা জমিরুদ্দিন ও তার নাতনি আসমাকে বাঁচিয়ে একদিকে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

দেশভাগকে কেন্দ্র করে তাঁর লেখা আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'রাজা যায় রাজা আসে'। গল্পটির মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, যার মুলে রয়েছে দেশভাগ। দেশভাগের কারণে ওপার বাংলা ছেড়ে যখন দলে দলে হিন্দুরা এপার বাংলায় চলে আসছে তখন ছিপাতিপুর গ্রামের বৈকুণ্ঠ সাহা তার ঘরবাড়ি সম্পত্তি সবকিছু দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে যায় রাজেককে। যাবার সময় বলে যায় যদি আর কোনদিন ফিরে না আসে তাহলে রাজেক তার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে। সেই অনুসারে নগণ্য গরীব মানুষ রাজেক বৈকুণ্ঠ সাহার সম্পত্তি পেয়ে গ্রামে গঞ্জে তার খাতির বেড়ে যায়। সেই গ্রামের সবচেয়ে ধনী ও ধূর্ত ব্যক্তি তরাব আলি বৈকুণ্ঠ সাহার সম্পত্তির উপর নজর ফেলে রাজেকের সঙ্গে তার মেয়ে বিয়ে দিয়ে সেই সম্পত্তির অংশীদার হতে চায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত বৈকুণ্ঠ সাহা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিনিময়ের করেন

এক আমিন সাহেবের সঙ্গে। তাই বৈকুণ্ঠ সাহা ও আমিন সাহেবের উপস্থিতিতে তোরাপের সেই স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। সঙ্গে তোরাপের মেয়েকে বিয়ে করার স্বপ্নও অধরাই থেকে যায় রাজেকের কাছে। শুধু বিয়ের স্বপ্ন নয় বৈকুণ্ঠ সাহার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হওয়ার স্বপ্নও ভেঙে যায় তার। সে ফিরে যায় তার পূর্বের সেই নগন্য দরিদ্র অবস্থার মধ্যে। গল্পের শেষে রাজেকের তাই খেদোক্তি - দ্যাশখান দু'ভাগ হয়, সাহারা – ভুইমালীরা যুগীরা গ্রাম ছাইড়া যায়, দ্যাশের এক রাজা যায়, আরেক রাজা আসে, তাতে তর কী রে, তর কী?"১৭ এই উক্তির মধ্য দিয়ে রাজেকের স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা প্রকট হয়ে উঠে।

দেশভাগের উপর লেখা তাঁর অনুপ্রবেশ' ও 'দেশ নেই' গল্পের বিষয়ভাবনা হিসেবে উঠে এসেছে মূলত বিহারী মুসলমানদের আইডেনটিটি সমস্যা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। "অনুপ্রবেশ' গল্পে দেখা যায় দেশভাগের সময় বেশিরভাগ বিহারী হিন্দিভাষী উর্দুভাষী মুসলমানরা তখনকার পূর্বপাকিস্তানে চলে আসে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা স্বপ্ন দেখতে থাকে 'লাহোর, করাচি বা ইসলামাবাদ থেকে যে কোনও দিন প্লেন এসে তাদের তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু বহু অপেক্ষার পরেও প্লেন না আসায় । গোপন পরামর্শ অনুসারে শওকত ফরিদরা ছোট ছোট দলে পূর্বপুরুষের ভিটেমাটির আশায় ভারতে প্রবেশ করে। অনেক আশা নিরাশার মধ্যে এরা পথ হাঁটতে থাকে,- " কয়েক জেনারেশান ধরে তখন তারা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার। প্রজা - ভারতীয় মুসলমান। দেশভাগের পর ঢাকায় গিয়ে তারা হয়ে যায় পাকিস্তানী। তারপর নিশ্চিতভাবে না হলেও বাংলাদেশে থাকার কারণে হয়তো বা বাংলাদেশী। আর এই মুহূর্তে ভোরের ঝাপসা আকাশের তলায় ইণ্ডিয়ার মাটির ওপর যখন পা। ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছে তখন তাদের কী আইডেনটিটি, সে জানে না।

ইতিহাসের সেই আদি যুগের দেশহীন পরিচয়হীন অভিযানকারীদের মতো তারা চলেছে একটি স্বদেশের জন্য, একটি সুনিশ্চিত আইডেনটিটির সন্ধানে। আদৌ তা পাওয়া যাবে কিনা, কে বলবে!"১৮

গল্পের শেষে দেখা ভোট স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে ভোটার কার্ড কিংবা রেশনকার্ডের মতো পরিচয়পত্র যোগাড় করতে সমর্থ হয়। সৃষ্টিছাড়া বসতিতে শওকতের সঙ্গে ফিরে যেতে যেতে ফরিদ ভাবতে থাকে –"ব্রিটিশ আমলে তারা ছিল ভারতীয়, তারপর পাকিস্তানী, তারও পর বাংলাদেশি। চুনাও-এর কারণে চল্লিশ বছর বাদে তারা নতুন আইডেনটিটি পেয়ে যায়। এখন তারা আবার ভারতীয়।"১৯

পরিশেষে একথায় বলা যেতে পারে, প্রফুল্ল রায় তাঁর ছোটগল্পে দেখিয়েছেন দেশভাগের ফলে অখণ্ড ভারতের সমস্ত ধর্মের মানুষ বহুমাত্রিক সমস্যা ও বেদনার

সম্মক্ষীণ হয়েছে, যার কোন শেষ নেই। অন্তহীন বেদনার পথ বেয়ে দেশান্তরী মানুষ এখনও পথ হাঁটছে, স্বপন দেখছে দেশভাগের যন্ত্রণা নিরসনের জন্য।

তথ্যসূত্র

১. প্রফুল্ল রায়, সেরা পঞ্চাশটি গল্প ; দে'জ পাবলিশিং; ২০১৯ ; গল্প প্রসঙ্গে
২. প্রফুল্ল রায়, শ্রেষ্ঠ গল্প ; দে'জ পাবলিশিং; ২০১১; পৃ;-৩৮৫
৩. তদেব, পৃ;-৩৮৫
৪. তদেব, পৃঃ-৩৮৬
৫. তদেব, পৃঃ-৩৮৬
৬. তদেব, পৃঃ-৩৮-৭
৭. তদেব, পুঃ-৩৮৭
৮. তদেব, পূ;-৩৮৮
৯. তদেব, পৃঃ-৩৮৯
১০. তবে , পৃঃ-৩৮৯
১১. প্রফুল্ল রায়, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং; ২০১৯, পূ;-৩১০
১২. তদেব; পূ;-৩১৫
১৩. তদেব; পূ;-৩১৬
১৪. তদেব; পূ;-৩১৬
১৫. 'তদেব; পৃঃ-৩১৮-১৯
১৬. তদেব; পৃ;-৩২৩
১৭. প্রফুল্ল রায়, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ২০১১, পৃ-২৪
১৮. প্রফুল্ল রায়, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ-২৯
১৯. তদেব, পৃঃ-৪১

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রফুল্ল রায়, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ২০১১
২. প্রফুল্ল রায়, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯

ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রেক্ষাপটে সমাসপ্রকরণে বৃত্তির তাৎপর্যালোচনা

সৌমিক পাল
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়
মল্লারপুর, বীরভূম

সারসংক্ষেপ :- বৃত্তির অপর নাম পদবিধি। দুই বা ততোধিক অর্থযুক্ত পদের সমন্বয়ের ফলে যদি একার্থীভাব হয় তবে সেই সমন্বয় সাধনের নাম বৃত্তি। যার প্রকৃত অর্থ হল সম্বন্ধ অর্থাৎ পদার্থের সহিত সম্বন্ধ হল বৃত্তি। 'বৃ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় যোগে বৃত্তি এই পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সুতরাং ব্যাকরণশাস্ত্রে বৃত্তি নামক এই পদটি বিদ্যমান অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। তাই এপ্রসঙ্গে প্রদীপ টিকায় কৈয়টাচার্য বলেছেন- 'অথ মে বৃত্তিং বর্ত্তয়ন্তীতি'। আবার, বৃত্তি বিষয়ে ভাষ্যকার বলেছেন-'পরার্থাভিধানং বৃত্তিরিত্যাহুঃ'। অর্থাৎ অন্যার্থের যে অভিধান তাই হল পরার্থ অভিধানরূপ বৃত্তি। ভাষ্যেস্থিত পরার্থ শব্দের অর্থ হল 'স্বার্থবিশিষ্ট অন্যার্থ'। সুতরাং সমস্যমান পদ ব্যতীত অন্যার্থে বা পৃথক অর্থে জ্ঞাপিত হওয়াকে বলা হয় বৃত্তি। পাণিনি প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণ বৃত্তির পঞ্চবিধত্বকে স্বীকার করেছেন। তাই এপ্রসঙ্গে সিদ্ধান্তকৌমুদীগ্রন্থে বলা হয়েছে- 'কৃত্তদ্ধিতসমাসৈকশেষসনাদ্যন্তধাতুরূপাঃ পঞ্চবৃত্তয়ঃ’। অর্থাৎ, কৃৎ -বৃত্তি, তদ্ধিতবৃত্তি, সমাসবৃত্তি, একশেষবৃত্তি ও সনাদ্যন্তধাতুরূপবৃত্তি। আবার, বৃত্তির অর্থ বিশ্লেষণ করার জন্য যে বাক্য ব্যবহৃত হয় তা হল বিগ্রহ। লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে বিগ্রহ দুই প্রকার। মহাবৈয়াকরণ ভট্টোজি দীক্ষিত তাঁর বিরোচিত সিদ্ধান্তকৌমুদীগ্রন্থে কারকপ্রকরণ বা বিভক্ত্যর্থের আলোচনার পর সমাসপ্রকরণের অবতাঁরণা করেছেন। তাঁর মতে সমাস হল চার প্রকার। যথা- ১.অব্যয়ীভাব সমাস ২.তৎপুরুষ সমাস ৩.দ্বন্দ্ব সমাস ও ৪.বহুব্রীহি সমাস। আর তৎপুরুষের অবান্তর ভেদ হল কর্মধারা এবং কর্মধারার অবান্তর ভেদ হল দ্বিগু। আবার, বাচ্যভেদে সমাস তিন প্রকার। যথা- ভেদ,সংসর্গ এবং উভয়। আবার, কোন কোন বৈয়াকরণের মতে জহৎস্বার্থা ও অজহৎস্বার্থা ভেদে সমাসবৃত্তি দ্বিবিধ। অতএব ব্যাকরণশাস্ত্রে বৃত্তি নামক এই পদটি 'অস্তি' এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার, নাগেশাচার্য তিন প্রকার বৃত্তির কথা বললেও অন্যান্য বৈয়াকরণরা দ্বিবিধ বৃত্তি স্বীকার করেছেন। যেমন- শক্তি এবং ব্যঞ্জনা, লক্ষনাকে তারা স্বীকার করেননি। সুতরাং সর্বসাকল্যে বলা যায় যে, ত্রিবিধ বৃত্তির (শক্তি,লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা) আশ্রয়স্থল হল শব্দ। আবার, ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত ও প্রবৃত্তিনিমিত ভেদে শব্দ দ্বিবিধ। 'শুশ্রুষা' ও 'রথান্তর' এই প্রাতিপদিক দুটি হল প্রবৃত্তিনিমিত্ত, আর

সমাস এই শব্দটি হল ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত। অতএব সমাসের ব্যুৎপত্তি হল= সম্-অস্+ঘঞ্। এখানে 'সম্' হল উপসর্গ, 'অস্' হল প্রকৃতি এবং 'ঘঞ্ 'হল প্রত্যয়। সুতরাং সমাস হল একপ্রকার বৃত্তি। আর বৃত্তি আমরা তাকেই বলব পদের সহিত পদার্থের সম্বন্ধ। তাই সমাসে বৃত্তি অবশ্যই কর্তব্য।

সূচক শব্দঃ- বৃত্তি, ব্যাকরণ, পতঞ্জলি, নাগেশাচার্য, ভট্টোজি দীক্ষিত, হেলরাজ, পাণিনি, শক্তি, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা, সমাস, বাসুদেবদীক্ষিত, জ্ঞানেন্দ্রসরস্বতী, জহৎস্বার্থা এবং অজহৎস্বার্থা।

মূল আলোচনাঃ

বৃত্তির অপর নাম পদবিধি। দুই বা ততোধিক অর্থযুক্ত পদের সমন্বয়ে বা মিলনের ফলে যদি একার্থীভাব হয়, তবে সেই সমন্বয় সাধনের নাম বৃত্তি। যার প্রকৃত অর্থ হল সম্বন্ধ, অর্থাৎ পদার্থের সহিত সম্বন্ধ হলো বৃত্তি। ‘বৃ’ ধাতুর উত্তর ‘ক্তিন্’ প্রত্যয় যোগে বৃত্তি এই পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। অতএব ব্যাকরণশাস্ত্রে বৃত্তি নামক এই পদটি বিদ্যমান বা বর্তমান অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। তাই এই প্রসঙ্গে মহাভাষ্যের টিকাকার কৈয়টাচার্য বলেছেন - 'অথ মে বৃত্তিং বর্ত্তয়ন্তীতি’[১]। আবার, বৃত্তি বিষয়ে মহাবৈয়াকরণ পতঞ্জলি তাঁর বিরোচিত মহাভাষ্যে বলেছেন- ‘পরার্থাভিধানং বৃত্তিরিত্যাহুঃ’[২]। অর্থাৎ, পদার্থের বা অন্যার্থের যে অভিধান তাই হলো পরার্থভিধানরূপ বৃত্তি। ভাষ্যেস্থিত 'পরার্থ' শব্দের অর্থ হল 'স্বার্থবিশিষ্ট অন্যার্থ'। সুতরাং সমস্যমানপদ ব্যতীত অন্য অর্থে বা পৃথক অর্থে জ্ঞাপিত হওয়াকে বলা হয় বৃত্তি। অনুরূপভাবে এই মতামতকে সমর্থন করে বিখ্যাত টিকাকার জ্ঞানেন্দ্রসরস্বতী তাঁর বিরোচিত তত্ত্ববোধিনী টিকাতে বলেছেন- 'পত্যায়ান্তর্ভাবেনাপরাপদার্থন্তর্ভাবেন বা যো বিশিষ্টোহর্থঃস পরার্থঃ।স চাভিধীয়তে যেন তৎপরার্থাভিধানম'।[৩] অর্থাৎ যখন কোন সুবন্ত পদ অথবা তিঙন্ত ভিন্ন ক্রিয়াপদ নির্দিষ্ট কোন প্রত্যয়ের সংযোগে ধাতু বা পদ নিস্পন্ন হয় তখন সেই পদ বা ধাতুর সাধারণ অর্থ হইতে পৃথক একটি বিশিষ্ট অর্থের সৃষ্টি হয় তাঁরই নাম পরার্থ। সুতরাং দুই বা ততোধিক পদ যখন পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে একীভূত বা বিজাড়িত হওয়ার ফলে প্রত্যেকের স্বকীয় অর্থ হইতে ভিন্ন অন্য যে একটি বিশিষ্টার্থ পাওয়া যায় তাঁর নাম পরার্থ। এইরূপ স্থলে অন্য পদের অর্থের ব্যাকরণসম্মত যে প্রক্রিয়ার ফলে পদার্থ অর্থাৎ উল্লেখিত দুই প্রকার বিশিষ্টার্থ অভিহিত হয় তাঁরই নাম বৃত্তি। আবার, বৃত্তি বিষয়ে বাসুদেব দীক্ষিত তাঁর বালমনোরমা টিকাতে বলেছেন-'বিগ্রহবাক্যাবয়বপদার্থেভ্যঃ পরঃ অন্যঃ যেহর্ং বিশিষ্টৈকার্থঃ তৎ পতিপাদিকা বৃত্তিরিত্যর্থ।'[৪] বৈয়াকরণ নাগেশাচার্য বৃত্তির লক্ষণ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন- 'পরার্থাভিধানং বৃত্তিরিত্যস্য ভাষ্যে এবেক্তত্বাৎ,পারস্য শব্দস্যেপসর্জনার্থস্য যত্র শব্দন্তরেন প্রধানার্থকপদেন অর্থাভিধানং বিশেষণত্বন গ্রহনং সা বৃত্তিরিতি তদর্থঃ যদ্ধা পরার্থস্য প্রধানার্থস্যাপ্রধানপদৈর্যত্র স্বার্থবিশেষ্যত্বেন গ্রহণং সা বৃত্তিরিত্যর্থঃ'।[৫] অর্থাৎ যেখানে উপসর্জনার্থক শব্দের

প্রধানর্থক পদের দ্বারা অর্থের অভিধানগত যে বিশেষণের গ্রহণ হয়, তা হল বৃত্তি। যেমন-'রাজ্ঞঃপুরুষঃ'= 'রাজপুরুষ'। 'রাজ্ঞঃপুরুষঃ' এই বিগ্রহ বাক্যটিতে 'রাজ্ঞঃ' হল ষষ্টী বিভক্ত্যন্ত পদ। 'পুরুষঃ' হল প্রথমা বিভক্ত্যন্ত পদ। বিগ্রহবাক্যস্থিত পুরুষঃ এই পদটির দ্বারা রাজ্ঞঃ পদের অর্থটি জ্ঞাপিত হয়েছে। সুতরাং এই স্থলে রাজ্ঞঃ পদটির সাথে পুরুষঃ এই পদটি সম্বন্ধ সাধিত হয়েছে। তাই এই সম্বন্ধের বাচকের হেতুবশত রাজ্ঞঃ এই ষষ্ঠী বিভক্তির লোপে 'রাজপুরুষঃ' প্রাতিপদিকটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এই কারণে বৃত্তিকে সম্বন্ধের দ্যোতক বা সম্বন্ধবিশেষ বলা হয়। পুনরায় বৃত্তি বিষয়ে প্রদীপটিকায় বলা হয়েছে-'পারস্য শব্দস্য যোর্থস্তস্যাভিধানং শব্দান্তরেণ যত্র সা বৃত্তিরিত্যর্থঃ যথা রাজপুরুষ ইত্যাত্র রাজশব্দেন বাক্যাবস্থায়ামনুক্তঃ পুরুষ্যথেহভিধায়তে'।[৬]

পানিনি প্রভৃতি (শব্দানুশাসনের) প্রাচীন আচার্যগণ বৃত্তির পঞ্চবিধত্বকে স্বীকার করেছেন। তাই এ প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তকৌমুদীগ্রন্থে বলা হয়েছে- 'কৃত্তদ্ধিতসমাসৈকশেষসনাদ্যন্তধাতুরুপাঃ পঞ্চবৃত্তয়ঃ'[৭] অর্থাৎ এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি কৃৎ-বৃত্তি, তদ্ধিতবৃত্তি, সমাসবৃত্তি, একশেষবৃত্তি, সনাদ্যন্ত- ধাতুরূপবৃত্তি। অনুরূপভাবে বিখ্যাত টিকাকার হেলরাজ তাঁর প্রকাশটীকায় বৃত্তির পঞ্চবিভাগের সমর্থনে বলেছেন- ‘অসমস্তপদগতানর্থন বিচার্য সমস্তপদবিষয়ান্ বিচারয়িতুং পঞ্চপ্রকারবৃত্তি পদবিচারঃ প্রস্তাব্যতে'।[৮]

১. কৃদ্বৃত্তি :- কৃৎপ্রত্যয়ের সঙ্গে ধাতুর সংযোগে অর্থের পরিবর্তন হয়। যেমন- ‘কুম্ভকারঃ’ ও ‘রামঃ’ এই দুই প্রাতিপাদিকের প্রকৃতি ‘কৃ’ ও 'রম' আর প্রত্যয় হল 'অন্' ও 'ঘঞ্'। 'কুম্ভকারঃ' ও 'রাম' এর বিগ্রহ বাক্য যথাক্রমে 'কুম্ভংকরোতি' ও 'রমন্তেযোগিনোহস্মিন্'। সুতরাং 'কৃ' ও 'রম্' ধাতুদ্বয়ের অর্থ এবং 'অন', 'ঘঞ' এই প্রত্যয়দয়ের অর্থ এখানে গ্রহণ করা হয়নি। এখানে উভয়ের সমন্বয়ের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সমন্বয়ের পর বৃত্তিতে 'কুম্ভকার' ঘটনির্মাতা, 'রামঃ'= যোগিগন যাতে রমন করেন উভয়ের এই বিশিষ্টার্থ অভিব্যক্ত হয়।

২. তদ্ধিতবৃত্তি :- ধাতুর সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয়ের সংযোগের ফলে অর্থের যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাকে তদ্ধিতবৃত্তি বলে। যেমন- 'দাশরথিঃ' (দশরথ + ইঞ) এর বিগ্রহ বাক্যটি হল- 'দশরথস্য অপত্যাং পুমান্'। এই স্থলে দশরথ শব্দের সহিত অপত্যার্থক তদ্ধিত 'ইঞ্' প্রত্যয়ের সমন্বয়। বিগ্রহবাক্যেস্থিত 'দশরথ' শব্দটির অর্থ এবং অপত্যার্থক'ইঞ' প্রত্যয়ের অর্থ গৃহীত হয়নি বরং বিশেষ অর্থযুক্ত দশরথের সন্তানকে বোঝানো হয়েছে।

৩. সমাসবৃত্তি :- 'বীণাপানী', 'রাজপুরুষঃ' ও 'পীতাম্বর'- এই সমাসযুক্ত পদগুলি হল সমাস বৃত্তির উদাহরণ। এদের বিগ্রহ বাক্য যথাক্রমে 'বীনা পানৌ যস্যাঃ সা', 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' ও 'পীতম অম্বরম যস্য।' কিন্তু এই বিগ্রহবাক্যে অন্তর্গত যে পদগুলি

বর্তমান যেমন- বীণা, পানৌ, যস্যা, সা, রাজ্ঞঃ, পুরুষঃ, পীতম, অম্বরম, এবং যস্য। তাদের অর্থ এখানে গৃহীত হয়নি। এই স্থলগুলিতে ভিন্ন অর্থ গৃহীত হয়েছে। যেমন- 'বীণা পাণৌ যস্যাঃ সা' এই বিগ্রহ বাক্যটিতে 'বীণা' পদের দ্বারা বীণারূপ বাদ্যযন্ত্রকে বোঝানো হয়নি। আবার, 'পাণৌ' পদের দ্বারা হস্তদ্বয়কেও বোঝানো হয়নি। বরং বোঝানো হয়েছে বীণা হাতে যার অর্থাৎ 'সরস্বতীকে' বোঝানো হয়েছে। আবার, 'পীতম্ অম্বরং য্স্য' এই বিগ্রহবাক্যটিতে পীতম ও অম্বর শব্দকে বোঝানো হয়নি। বোঝানো হয়েছে পীতবর্ণের বসন যার অর্থাৎ শিবকে বোঝানো হয়েছে।

৪. সনান্তধাতুরূপবৃত্তি :- 'সন্', 'ষঞ্'কাম্যচ্' প্রভৃতি প্রত্যয়ের সহিত কোন সন্নন্ত, যঙন্ত, নামধাতুর যে সমন্বয় সাধিত হয় তা হল সনাদ্যন্তধাতুরুপ বৃত্তি। যেমন- 'পিপঠিষ্যতি' (পট্+সন্+লট্ তি) এর বিগ্রহবাক্যটি হল 'পঠিতুম্ ইচ্ছতি'। এই স্থলে 'পট্' প্রকৃতি রূপ অর্থ এবং 'সন্ 'প্রত্যয় রূপ অর্থ গৃহীত হয়নি। বরং এই স্থলে ভিন্ন অর্থ অর্থাৎ পড়ার ইচ্ছা বা পড়তে ইচ্ছুক এইরূপ অর্থ জ্ঞাপিত হয়েছে।

৫. একশেষবৃত্তি :- একশেষবৃত্তির একটি উদাহরণ হল 'নরাঃ'। 'নরাঃ' এই বহুবচনান্ত পদটির বিগ্রহবাক্য হল নরশ্চ, নরশ্চ ও নরশ্চ। 'স্বরূপানাং একশেষঃ'[৯] এই সূত্রানুসারে স্বরূপ পদগুলির মধ্যে এখানে একটি পদের প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ এই স্থলে 'নরশ্চ,' 'নরশ্চ' ও 'নরশ্চ,' প্রত্যেকটি পদের অর্থ গ্রহণ না করে 'নরাঃ' এই একটি ভিন্ন পদের দ্বারা প্রত্যেকের অর্থই জ্ঞাপিত হয়েছে।

বৃত্তির অর্থ বিশ্লেষণ করার জন্য যে বাক্য ব্যবহৃত হয় তা হল বিগ্রহ। বিগ্রহ দুই প্রকার। যথা- লৌকিকবিগ্রহ ও অলৌকিকবিগ্রহ। যে বিগ্রহ পরিণিষ্ঠিত তাকে আমরা লৌকিকবিগ্রহ বলে থাকি। 'ভূতপূর্বঃ' এই উদাহরণটির লৌকিকবিগ্রহ হল 'পূর্বং ভূতঃ' অর্থাৎ এই স্থলে প্রকৃতি ও বিভক্তি প্রত্যয়ের মিলনে চূড়ান্তভাবে পরিণতপ্রাপ্ত। আবার, 'ভূতপূর্বঃ' এর অলৌকিকবিগ্রহ হল 'পূর্ব্ অম্ ভূত্ সু'। অর্থাৎ যে স্থলে প্রকৃতি থেকে বিভক্তি প্রত্যয়কে আলাদা করে 'বৃত্তির' বিশ্লেষণ করা হয় তা হল অলৌকিকবিগ্রহ। সুতরাং 'পূর্ব্ অম্ ভূত্ সু' এই অলৌকিকবিগ্রহের' পূর্ব্ ও ভুত্ এই প্রকৃতি হইতে দ্বিতীয়া বিভক্তি 'অম' ও প্রথমা বিভক্তি 'সু' প্রত্যয়কে আলাদা করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মহাবৈয়াকরণ ভট্টোজি দীক্ষিত তাঁর বিরোচিত সিদ্ধান্তকৌমুদীগ্রন্থে কারক প্রকরণ বা বিভক্ত্যর্থের আলোচনার পর সমাসের উপোদঘাত সূত্র রূপে 'সমর্থ পদবিধিঃ'[১০] এই সূত্রটির অবতাঁরণা করেছেন। সমাস শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল সংক্ষেপ। দুই বা ততোহধিক পদের পরস্পর মিলনকে বলা হয় সমাস। যেমন- 'নরানাং পতিঃ'= 'নরপতিঃ'। যার (সমাসের) ব্যুৎপত্তি হল সম্- অস্ +ঘঞ্= সমাস। সমাস হল একপ্রকার সংজ্ঞা। আর সংজ্ঞা হলেই আমাদের মনে সাধারণভাবে একটি প্রশ্ন জাগে এর সংজ্ঞী কিরূপ হবে? 'বৃদ্ধি' এবং 'গুণ' হল সংজ্ঞা, আর 'আদৈচ্' ও 'অদেঙ্' প্রভৃতি হল সংজ্ঞী। তাই ভগবান পাণিনি সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর নির্দেশের জন্য

'বৃদ্ধিরাদৈচ্' ও 'অদেঙ্ গুণঃ' এই সূত্র দুটি রচনা করেছেন। এখন প্রশ্ন হল যে সমাস যদি সংজ্ঞা হয় তাহলে এর সংজ্ঞী কি? সুতরাং, তাহলে কি পাণিনি কোন সূত্র রচনা করেছেন? এটাই প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের একটি আশয়। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম ভেদে সংজ্ঞা দুই প্রকার। 'টি' ও 'ঘি' প্রভৃতি হল কৃত্রিম সংজ্ঞা। আর 'সমাস' এবং 'কারক' প্রভৃতি হল অকৃত্রিম সংজ্ঞা। এই রূপ প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের আশয় উদঘাটনের জন্য ভাষ্যকার বলেছেন কারক, সমাস প্রভৃতি হল 'মহাসংঙ্গা'। আর মহাসংঙ্গার নাম অন্বর্থ সংজ্ঞা। অন্বর্থ সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলেছেন- 'প্রকৃতি প্রত্যয়ঃ বিভাগ পূর্বকং পশ্চাৎ আয়াতি অর্থ অন্বর্থঃ'।[১১] অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের বিভাজনের দ্বারা যে অর্থ জ্ঞাপিত হয় তা হল অন্বর্থ। যেমন- সমাস (সম্- অস্+ঘঞ্) এই পদটিতে' সম্' উপসর্গ, 'অস্' প্রকৃতি ও 'ঘঞ্' প্রত্যয়।

ব্যাকরণ শাস্ত্রে 'বৃত্তিঃ' এই পদটি কেবলমাত্র অস্তি বা আছে এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই 'বৃত্তি' সমাস বা সমাস ভিন্ন পদের সমন্বয়ের দ্যোতক। নাগেশাচার্য তিন প্রকার বৃত্তির কথা বললেও অন্যান্য বৈয়াকরণরা দ্বিবিধ বৃত্তি স্বীকার করেছেন। যেমন-শক্তি এবং ব্যঞ্জনা। আর লক্ষণাকে তাঁরা স্বীকার করেননি।

ক. শক্তিবৃত্তি :- পদ ও পদার্থের মধ্যে যে তাদাত্ম্যরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান তা হল শক্তি। তাই এপ্রসঙ্গে নাগেশাচার্য তাঁর বিরোচিত পরমলঘুমঞ্জুষাগ্রন্থে বলেছেন- 'তস্মাৎপদপদার্থয়োঃ সম্বন্ধান্তরমেব শক্তিঃ বাচ্যবাচক ভাবাপরপর্যায়া। তদ্গ্রাহকঞ্চেতরেতরাধ্যাসমুলকং তাদাত্ম্যং তদেব সম্বন্ধঃ।'[১২] যেমন- 'রাজপুরুষঃ'= 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ'। অতএব 'রাজপুরুষঃ' এই সমাসবদ্ধ পদটিতে রাজা ও পুরুষ পদের সঙ্গে রাজসম্বন্ধবিশিষ্ট পুরুষার্থের যে তাদাত্ম্যরূপ সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়, তা হল শক্তিরূপবৃত্তি। আবার, শক্তিরূপবৃত্তিতে বাচ্যবাচকভাবসম্বন্ধ বর্তমান থাকে। রূঢ়ি, যোগ ও যোগরূঢ়ি ভেদে শক্তিবৃত্তি তিন প্রকার। তাই এপ্রসঙ্গে নাগেশাচার্য বলেছেন- 'সা চ শক্তিস্ত্রধা, রুঢির্যোগোযোগরুঢিশ্চ'।[১৩] আবার, কৌণ্ডভট্ট শক্তিবৃত্তির স্বরূপ প্রসঙ্গে ভুষণসারগ্রন্থে বলেছেন-

'ইন্দ্রিয়াণাং স্ববিষয়েষবানাদির্যোগ্যতা যথা
অনাদিরর্থৈঃ শব্দানাং সম্বন্ধো যোগ্যতা তথা' [১৪]

খ. লক্ষণা :- নিজের শক্য অর্থের সহিত অন্য অর্থের সম্বন্ধই হল লক্ষনা বৃত্তি। তাই এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত বৈয়াকরণ তাঁর বিরোচিত পরমলঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে বলেছেন- 'স্বশক্যসম্বন্ধ লক্ষণা'।[১৫] যেমন- 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'। এই বাক্যটিতে গঙ্গায়াং পদের শকক্যার্থ হল গঙ্গাস্রোত বা গঙ্গা প্রবাহ। কিন্তু গঙ্গায়াম এই পদের দ্বারা এইরূপ বাচ্যার্থের গ্রহণ করলে বাক্যটির অর্থ গ্রহণে অসংগতি দেখা দেবে। সুতরাং গঙ্গায়াম বলতে গঙ্গা তীর এইরূপ লক্ষ্যার্থকে বুঝতে হবে। অতএব গঙ্গাতীর এই রূপ লক্ষ্যার্থের সঙ্গে গঙ্গা স্রোত এইরূপ বাচ্যার্থের যে সম্বন্ধ তা হল লক্ষণা। সুতরাং 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'

বলতে আমরা এখানে গঙ্গাতীরে ঘোষ পল্লী এরূপ লক্ষণা অর্থ বুঝে থাকি। গৌণী ও শুদ্ধা ভেদে লক্ষনা দ্বিবিধ। সাদৃশ্য সম্বন্ধযুক্তকে গৌণী লক্ষণা বলে এবং সাদৃশ্য ভিন্ন সম্বন্ধযুক্তকে শুদ্ধা লক্ষনা বলে। তাই এই প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ আচার্য তাঁর সাহিত্য দর্পণ গ্রন্থে বলেছেন-

'সাদৃশ্যেতর সম্বন্ধাঃশুদ্ধাস্তাঃ সকলা অপি।
সাদৃশ্যত্তুঃ মতা গৌণ্যস্তেন ষোড়শভেদিতাঃ।'[১৬]

আবার নাগেশাচার্য গৌণী লক্ষনার লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন- 'স্বনিরূপিতসাদৃশ্যাধিকরণত্বসম্বন্ধেন শক্যসম্বন্ধার্থপ্রাতিপাদিকা গৌণী'।[১৭] আর শুদ্ধা লক্ষণা বৃত্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন- 'তদতিরিক্তসম্বন্ধেন শক্যসম্বন্ধার্থপ্রাতিপাদিকা শুদ্ধা'।[১৮] লক্ষণার আশ্রয় হল শব্দ। শক্তি দুই প্রকার যথা- প্রসিদ্ধা শক্তি ও অপ্রসিদ্ধা শক্তি। প্রসিদ্ধা শক্তি হলো সকলের বোধগম্য। তাই পরমলঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে বলা হয়েছে - 'আমন্দবুদ্ধিবেদ্যাত্বং প্রসিদ্ধাত্বম্'।[১৯] সুতরাং প্রসিদ্ধা শক্তির দ্বারা 'গঙ্গায়ং ঘোষঃ' এই বাক্যে গঙ্গা প্রবাহে ঘোষ পল্লী এরূপ সকলের জ্ঞান হয়। আর অপ্রসিদ্ধা শক্তি বলতে আমরা বুঝি পন্ডিত বা জ্ঞানী বর্গের যে রূপ জ্ঞান। অতএব এই অপ্রসিদ্ধা শক্তির দ্বারা 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই রূপ একই বাক্যে পন্ডিত বর্গের গঙ্গা তীরে ঘোষ পল্লী এইরূপ বিশেষ জ্ঞান হয়। তাই এই প্রসঙ্গে নাগেশাচার্য বলেছেন- 'সহৃদয়মাত্রাহবেদ্যাত্বমপ্রসিদ্ধাত্বম্'।[২০] লক্ষণা বৃত্তির অপর নাম 'জঘন্যাবৃত্তি'। তাই এ প্রসঙ্গে পরম লঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে উক্ত হয়েছে- 'বৃত্তিদ্বয়াবচ্ছেদকদ্বয়কল্পেন গৌররাজ্জঘন্যবৃত্তিকল্পনায়া অন্যাম্যত্বাচ্চ'।[২১]

গ. ব্যঞ্জনা:- পরমলঘুমঞ্জুষাগ্রন্থে ব্যঞ্জনা বৃত্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে বৈয়াকরণ নাগেশাচার্য বলেছেন- 'মূখ্যার্থবাধনিরপেক্ষবোধজনকো মূখ্যার্থর্থসম্বন্ধসাধারণঃ প্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধার্থ বিষয়কো বক্রাদিবৈশিষ্ট্যজ্ঞান প্রতিভাদ্যুদ্বুদ্ধঃ সংস্কারবিশেষো ব্যঞ্জনা'।[২২] অর্থাৎ যা মুখ্যার্থের বাধকের নিরপেক্ষ বোধের জনক হয়, যা মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ - অসম্মন্ধ সাধারণ যা প্রসিদ্ধার্থ- অপ্রসিদ্ধার্থ বিষয়ক এবং যা বক্রাপ্রভৃতির বৈশিষ্ট্য জ্ঞান, প্রতিভা ইত্যাদি হতে উদ্বুদ্ধ সংস্কার বিশেষ কে ব্যঞ্জনা বৃত্তি বলে। আবার বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে ব্যঞ্জনবৃত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন-

'বিরতাস্বভিধাদ্যসু যয়ার্থো বোধ্যতেহপরঃ।
সা বৃত্তিব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ'।[২৩]

ব্যঞ্জনা বৃত্তির উদাহরণ হল 'সশঙ্খচক্রঃ হরিঃ'। অর্থাৎ শঙ্খচক্র হাতে যার আর এর দ্বারাই এখানে হরি শব্দ বিষ্ণু কে বোঝানো হয়েছে। অতএব এখানে শঙ্খচক্র হরি এইরূপ ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা অন্য অর্থরূপ বিষ্ণুকে বোঝানো হয়েছে।

ভট্টোজি দীক্ষিতের মতে সমাস চার প্রকার। তদ্বিষয়ে তিনি বলেছেন -'সমাসশ্চতুর্বিধ ইতি তু প্রায়োবাদঃ'।[২৪] যথা -

১. অব্যয়ীভাব সমাস ২. তৎপুরুষ সমাস ৩.বহুব্রীহি সমাস এবং ৪.দ্বন্দ্ব সমাস। এছাড়াও সিদ্ধান্ত কৌমুদীকার সহসুপা বা সুপসুপা নামে আরও একটি সমাসের কথা বলেছেন। তদ্বিষয়ে পানিনির সূত্রটি হল 'সহ সুপা'।(১|১|৪)।

১. যে সমাসের পূর্বপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যার ব্যুৎপত্তি 'অনব্যয়ং অব্যয়ং ভবতি ইতি অব্যয়ীভাবঃ'। উদাহরণ হল- 'অধিহরিঃ'।

২. যে সমাসের উত্তর পদের অর্থপ্রধান। তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন- 'রাজপুরুষঃ'।

৩. যে সমাসের অন্য পদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন- 'পীতাম্বর'।

৪. যে সমাসের উভয় পদের অর্থ প্রধান। তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন - 'দন্তোষ্টম্'।

আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। উত্তর পদ ও অন্য পদের অর্থ প্রধান হওয়া সত্বেও অব্যয়ীভাব সমাস হয়েছে। যথাক্রমে- 'সুপপ্রতি' 'উন্মত্তগজ্ঞম্'। আবার,'অতিমালম্' এই স্থলে পূর্ব পদের অর্থ প্রধান হলেও এখানে তৎপুরুষ সমাস হয়েছে। 'দ্বিত্রা' এখানে যদিও উভয় পদের অর্থ প্রধান তবুও এই স্থলে বহুব্রীহি সমাস হয়েছে। 'দন্তোষ্টম্' এই দ্বন্দ্ব সমাসে সমহার অর্থ প্রধান। অতএব তৎপুরুষের অবান্তরভেদ হল 'কর্মধারা' আর কর্মধারার অবান্তরভেদ 'দ্বিগু'। সাধারণত ১. প্রাতিপদিক বা নাম ২. ধাতু ৩. সুবন্ত ৪. তিঙন্ত এই চার প্রকার শব্দকে নিয়ে সমাস হয়।কিন্তু প্রয়োগে এই চতুর্বিধ শব্দের ষডবিধ সমন্বয়-ই লক্ষ্য করা যায়। অতএব দীক্ষিতের মতে সমাস হল ছয় প্রকার। এই বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ কারিকা হল-

'সুপাং সুপা তিঙা নাম্না ধাতুনাথতিঙাং তিঙা
সুবন্তেনেতি বিজ্ঞেয়ঃ সমাসঃ যড বিধো বুধৈঃ'।[২৫]

অর্থাৎ, ১. সুবন্তের সহিত সুবন্তের- 'রাজপুরুষঃ'।

২. সুবন্তের সহিত তিঙন্ত পদের- 'পর্যভূষয়ৎ'।

৩. সুবন্তের সহিত নাম পদের- 'কুম্ভকারঃ'।

৪. সুবন্তের সহিত ধাতুর- 'কটপ্রুঃ, 'অজস্রম্'।

৫. তিঙন্তের সঙ্গে তিঙন্তের- 'পিবতখাদতা'।

৬. তিঙন্তের সহিত সুবন্তের - 'কুন্তবিচক্ষণা'।

আবার, নিত্যানিত্যভেদে সমাসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। নিত্য সমাস দ্বিবিধ - ১. অবিগ্রহ নিত্য সমাস ২. অশ্বপদবিগ্রহ নিত্য সমাস। যে সমাসের বিগ্রহ বাক্য করলে অর্থের বিচ্যুতি ঘটে তাকে অবিগ্রহ নিত্য সমাস বলে। যেমন- 'কৃষ্ণসর্পঃ'। যে সমাসে স্বপদের থেকে ভিন্ন পদের সঙ্গে বিগ্রহ হলে তাকে অস্বপদ বিগ্রহ সমাস বলে। যেমন-

অন্যঃ দেশঃ = 'দেশান্তরম্'। আবার সমাস বৃত্তি দুই প্রকার। যেমন -১.জহৎস্বর্থা ২.অজহৎস্বার্থা।

জহৎস্বর্থা বৃত্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে কৌন্ডভট্ট বলেছেন- 'জহতি পদানী স্বার্থং যস্যাং সা জহৎস্বার্থা'।[২৬] অর্থাৎ স্বতন্ত্র অর্থ ত্যাগপূর্বক যে সমুদায়ার্থকে জ্ঞাপিত করে, তাকে জহৎস্বর্থা বৃত্তি বলে। অনুরূপ ভাবে পরমলঘুমঞ্জুষাগ্রন্থে এই বৃত্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে- অবয়বার্থনিরপেক্ষত্বে সতি সমুদায়ার্থবোধিকাত্বং জহৎস্বার্থাত্বম। রথন্তরং সামভেদঃ শুশ্রূষা সেবা ইতি পুর্বস্যদাহরণাম্'।[২৭] অর্থাৎ যেস্থলে অবয়বের অর্থ স্বাধীনভাবে সমুদায়ের অর্থ বোধিত হয়, তখন সেই স্থলে যে বৃত্তি সাধিত হয় তা হল জহৎস্বার্থা বৃত্তি। যেমন - 'রথান্তর' এই পদটিতে অবয়বের অর্থ গ্রহণ না করে সমুদায়ের অর্থ অর্থাৎ সামভেদরূপ অর্থ গৃহীত হয়েছে। ঠিক তেমনি আবার 'শশ্রূষা '(শ্রু+সন্)এই পদটিতেও শোনার ইচ্ছা এইরূপ নিজের অর্থ ত্যাগপূর্বক সেবারুপ সমুদায়ার্থ গৃহীত হয়েছে।আবার বৈয়াকরণ নাগেশের মতে অজহৎস্বার্থাবৃত্তির লক্ষণ হল- 'অবয়বার্থসংবলিতসমুদায়ার্থবোধিকাত্বমজহৎস্বার্থাত্বম্'।[২৮] অর্থাৎ, এই বৃত্তির দ্বারা পদগুলির অর্থকে সংযুক্ত করে সমুদায়ার্থকে জ্ঞাপিত করে। এই বৃত্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে বৈয়াকরণ কৌন্ডভট্ট তাঁর ভূষণসারগ্রন্থে বলেছেন- 'ন জহতি পদানি স্বার্থং যস্যাং সা অজহৎস্বার্থ'[২৯] যেমন 'রাজপুরুষঃ' এই সমাসবৃত্তি রূপ পদটির বিগ্রহ বাক্য হল - 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ'।এই বিগ্রহ বাক্যে উভয় পদের নিজ নিজ অর্থকে গ্রহণপূর্বক সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে রাজসম্বন্ধী পুরুষ এইরূপ সমুদায়ার্থ গ্রহণ করা হয়েছে। বাচ্যের ভিত্তিতে সমাস তিন প্রকার- ভেদ, সংসর্গ এবং উভয়। তাই কৌন্ডভট্ট বলেছেন-

'জহৎস্বার্থাজহৎস্বার্থে দ্বে বৃত্তী তে পুনস্ত্রিধা।
ভেদঃ,সংসর্গ,উভয়শ্চেতি বাচ্যব্যবস্থিতেঃ।'[৩০]

'রাজপুরুষঃ'- এই পদটিতে প্রথম ভেদ মূলক সমাসের অর্থ হল রাজা ভিন্ন পুরুষ বিশেষ। দ্বিতীয় সংসর্গমূলক সমাসের অর্থ হল- 'রাজসম্বন্ধবিশিষ্ট পুরুষ,'। তৃতীয় উভয়মূলক সমাসের অর্থ হল রাজা ভিন্ন পুরুষ বিশেষ রাজ সম্বন্ধবিশিষ্ট পুরুষ। সর্বসাকল্যে বলা যায় যে ত্রিবিধ বৃত্তির (শক্তি, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা) আশ্রয় স্থল হল শব্দ। আবার, ব্যুৎপত্তি নিমিত্ত ও প্রবৃত্তি নিমিত্ত ভেদে শব্দ দ্বিবিধ, 'শুশ্রূষা' ও 'রথান্তর' এই প্রাতিপদিক দুটি হল প্রবৃত্তিনিমিত্ত। আর সমাস এই শব্দটি হল ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত। অতএব সমাসের ব্যুৎপত্তি হল- সম্ - অস্+ঘঞ্। এখানে ‘সম্’ হল উপসর্গ, ‘অস্’ হল প্রকৃতি এবং ‘ঘঞ্’ হল প্রত্যয়। সুতরাং, সমাস হল একপ্রকার বৃত্তি। আর বৃত্তি আমরা তাকেই বলব পদের সহিত পদার্থের সম্বন্ধ। তাই সমাসে বৃত্তি অবশ্যই কর্তব্য।

তথ্যসূত্রঃ

১. মহাভাষ্যম্ (প্রদীপ টিকা)- পৃষ্ঠা-৩২৮
২. মহাভাষ্যম্- পৃষ্ঠা-৩২৮

৩. সিদ্ধান্তকৌমুদী (তত্ত্ববোধিনী টীকা)- পৃষ্ঠা-২১৫
৪. সিদ্ধান্তকৌমুদী (বালমনোরমা টীকা)- পৃষ্ঠা-২১৫
৫. বৈয়াকরণসিদ্ধান্তলঘুমঞ্জুষা- পৃষ্ঠা-১৩৯৯
৬. মহাভাষ্যম্(প্রদীপ টিকা)- পৃষ্ঠা-৩২৮
৭. সিদ্ধান্তকৌমুদী- পৃষ্ঠা-২১৫
৮. বাক্যপদীয়ম্ (প্রকাশ টীক)- পৃষ্ঠা-১
৯. পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-(৩/৪/৪৫)
১০. তদ্রুপ(২/১/১)
১১. মহাভাষ্যম্- পৃষ্ঠা- ৩৩৫
১২. পরমলঘুমঞ্জুষা- পৃষ্ঠা-২৮
১৩. বৈয়াকরণভূষণসার -পৃষ্ঠা-৪০০
১৪. পরমলঘুমঞ্জুষা- পৃষ্ঠা-২৩
১৫. তদ্রুপ- পৃষ্ঠা-৫৮
১৬. সাহিত্যদর্পণ,দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-৩৫, কারিকা-১৪
১৭. পরমলঘুমঞ্জুষা- পৃষ্ঠা-৫৮
১৮. তদ্রুপ - পৃষ্ঠা-৫৮
১৯. তদ্রুপ- পৃষ্ঠা-৭৩
২০. তদ্রুপ - পৃষ্ঠা-৭৩
২১. তদ্রূপ- পৃষ্ঠা-৭৩
২২. তদ্রূপ- পৃষ্ঠা-৭৭
২৩. সাহিত্যদর্পণ- পৃষ্ঠা-৪১
২৪. সিদ্ধান্তকৌমুদী- পৃষ্ঠা- ২১৭
২৫. তদ্রূপ- পৃষ্ঠা- ৩২০
২৬. বৈয়াকরণভুষণসার-পৃষ্ঠা-৩৪৬
২৭. পরমলঘুমঞ্জুষা- পৃষ্ঠা-৩০৫
২৮. তদ্রুপ- পৃষ্ঠা-৩০৫
২৯. বৈয়াকরণভূষণসার- পৃষ্ঠা-৩৪৭
৩০. তদ্রুপ- পৃষ্ঠা-৩৪৬

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ-

১. জয়াদিত্য ও বামন,কাশিকা, ন্যাসপদমঞ্জরীসমন্বিতা,১ম ও ২য় ভাগ, বারাণসী, সুধী প্রকাশন, ১৯৮৩ মুদ্রিত
২. পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ীসূত্রপাঠ, সম্পাদনা- ব্রহ্মদত্তজিজ্ঞাসু, হরিয়াণা, রামলালকর্পূরট্রাস্ট, ১৯৭৭, ১০ম সংস্করণ, মুদ্রিত।

৩. পতঞ্জলি, ব্যাকরণমহাভাষ্য, সম্পাদনা- ভার্গব শাস্ত্রী জোশি দিল্লি, চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০০৭ মুদ্রিত।

৪. দাহাল,লোকমানিক, পরমলঘুমঞ্জুষা, চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী।

৫. পতঞ্জলি, ব্যাকরণমহাভাষ্য, সম্পাদনা- হরিনারায়ণ তিবারী, বারাণসী, চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ২০০৯, মুদ্রিত।

৬. মুখোপাধ্যায়, ড. বিমলাকান্ত, সাহিত্যদর্পণ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা- ২০০৮।

৭. ভট্টোজি দীক্ষিত, বৈণয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী, দ্বিতীয় ভাগ, সম্পাদনা- গোপালদত্ত পাণ্ডে, বারাণসী, চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০১২, মুদ্রিত।

৮. শাস্ত্রী, পন্ডিত নন্দকিশোর ও শাস্ত্রী, শ্রী সীতারাম, বৈয়াকরণভূষণসার, চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, ২০০৯।

৯. Bhattacharya, Bhabani Prasad, Vedic Grammar, Calcatta, Sanskrit Pustak Bhandar, 1986.

১০. রঘুশর্মা, পন্ডিত, বাক্যপদীয়ম্, তৃতীয় ভাগ, সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী- ২০০০।

অন্তরমহল অন্বেষণে : রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন'

বনি দে
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ইতিহাসের বহমান ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বঙ্গীয় তথা ভারতের নারী সমাজ শুরু থেকেই অবস্থান করেছেন বিশেষ একটা গতির মধ্যে। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ শাসনের ফলে সমাজ ও শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের ঢেউ লাগে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে স্ত্রীশিক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু হয় ধীরগতিতে। রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গের বিরোধিতা এবং সমাজপতির রক্তচক্ষুর শাসানিকে উপেক্ষা করেই অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের চেষ্টা চলতে থাকে। সকল বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে নারীর অবরুদ্ধ জীবনে মুক্তির ছোঁয়া লাগে। কিন্তু এই মুক্তির পথ কতটা কঠিন ছিল; তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাসসুন্দরী দাসীর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে। উনিশ শতকে অন্তঃপুরকেন্দ্রিক স্ত্রীশিক্ষার বাইরে ইংরেজি শিক্ষার যে সমস্ত স্কুল প্রচলিত ছিল, সেখানে নারীর প্রবেশাধিকার ছিল নিষিদ্ধ। সে সময়ে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার সাধ থাকলেও অধিকার ছিল না। কিন্তু রাসসুন্দরী এই বিরোধিতাকে মানতে পারেননি। নীরবে-নিভৃতে তিনি সে চেষ্টায় রত হয়েছেন। গৃহবধূর কর্ম পালন, বৃহৎ সংসারের দায়, মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংসারের দহনচক্রে বন্দিনী হয়েও লেখাপড়া শেখবার জন্য তার আগ্রহ পাঠকদের অভিভূত করে। আত্মজীবনীর মধ্যে দিয়ে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন নিজের ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বকে। 'আমার জীবন' শুধুমাত্র রাসসুন্দরী দাসীর কথা নয়, এটি উনিশ শতকের সকল হিন্দু রমণীদের কথা। সেকালে নারীদের অন্তরমহল অন্বেষণে এই আত্মজীবনীটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

মূল শব্দ : নারীর আত্মস্বতন্ত্রতা, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, রাসসুন্দরীর অন্তরমহল, পুঁথি পাঠ, রচনাশৈলী, আধ্যাত্মিকতা, ব্যক্তিসত্তার বিকাশ

মূল প্রবন্ধ :

ইতিহাসের বহমান ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বঙ্গীয় তথা ভারতের নারী সমাজ দূর অতীত থেকে অবস্থান করছেন বিশেষ একটা গতির মধ্যে। পারিবারিক বৃত্তের চাপিয়ে দেওয়া দায়িত্ববোধের গণ্ডি অতিক্রম করে, যখনই নারী পেতে চেয়েছে আত্মস্বতন্ত্রের অধিকার; ক্ষমতার দীর্ঘলালিত সত্যের সঙ্গে সংঘাতে তার আত্মস্বতন্ত্র অনামও-ই থেকে গেছে। শাস্ত্রের নজিরই প্রমাণ করে নারীর অধিকার সংকোচনের কথা। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে—

"পিতার রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।।"[১]

কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীনস্থ হতে হয় নারীকে। এমনকি অবরোধে রাখার চেষ্টাও অব্যাহত ছিল বৈদিক যুগ থেকেই। কাজেই অন্তঃপুরবাসিনী নারী ক্রমেই বন্দিনী নারীতে পরিণত হতে থাকেন। সমাজে সুযোগসন্ধানী শ্রেণির স্বার্থরক্ষার তাগিদেই নারী শুধু অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন না, ভোগ্যবস্তু হিসেবে বিবেচিত হলেন। তার একমাত্র পরিচয় জায়া, জননী বা গৃহিণী। সামাজিক ও মানবিক মর্যাদার দিক থেকেও সে শুধুমাত্র স্বামীর ছায়ার অনুগামিনী। পাশাপাশি সমাজের কুটিল অনুশাসন নারীকে শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত করে রাখে। তদুপরি বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণ - মেয়েদের একেবারে সর্বনাশের অতল গহ্বরে নিয়ে যায়। উনিশ শতকে অন্তঃপুরকেন্দ্রিক স্ত্রীশিক্ষার বাইরে ইংরেজি শিক্ষার যে সকল স্কুল প্রচলিত ছিল, সেখানে নারীর প্রবেশাধিকার ছিল নিষিদ্ধ। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণকামিনী দাসী রচিত 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্য বাঙালি মহিলা রচিত প্রথম পুস্তক। এরপর নারীদের কণ্ঠ শোনা যায়, অন্তঃপুরচারিকাদের আত্মজীবনীতে। তবে সব মহিলারা নিজেদের আত্মকথা লিখে যেতে পারেননি। যারা লেখাপড়া শিখেছিলেন তাদের মধ্যে মাত্র জনাকয়েক মহিলাই নিজেদের অবদমিত মনোভাবকে আত্মকথা রূপে প্রকাশ করেছেন। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ শাসনের ফলে সমাজ ও শিক্ষা উভয়ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের ঢেউ লাগে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে স্ত্রীশিক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু হয় ধীরগতিতে। সমাজ পতিদের শাসনিকে উপেক্ষা করেই অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের চেষ্টা চলতে থাকে। সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে বাইরে বেরহবার সুযোগ আসে মেয়েদের জীবনে, নারীর অবরুদ্ধ জীবনে মুক্তির ছোঁয়া লাগে। আশাপূর্ণা দেবী কলকাতার মেয়েদের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

> "তাঁরা খাঁচার জীবন মুক্ত হয়েই খোলা আকাশে স্বাধীন উড়ানের স্বাদ পেয়ে গেছেন। পুরুষ জাতির যাবতীয় অহংকার চূর্ণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কর্মক্ষেত্রে; সদর এবং অন্দরকে পরিচালনা করছেন সুচারু দক্ষতায়। সভা-সমিতিতে অংশ নিচ্ছেন, ইউনিয়ন গড়ছেন, ঝাণ্ডা উড়িয়ে স্লোগান সহযোগে মিছিলের বাস্তবতাকে আপন করে নিচ্ছেন।"[২]

কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। উনিশ শতকের নারীদের কাছে এ ছিল স্বপ্নের মতো। তাদের মনন-চিন্তন সর্বদা এই ভ্রমে আচ্ছন্ন যে, উত্তম নারী সেই যিনি তার স্বামীকে সর্বদা সন্তুষ্ট করে, পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় এবং স্বামীর ওপর কথা বলে না। স্বামী এবং সন্তানদের মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যে ব্রত পালন করতে করতেই নিজের জীবন অতিবাহিত করেন।

প্রতিটি জীবনই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতা সমাজ ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। উনিশ শতকে রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' প্রথম

প্রকাশিত আত্মজীবনী। নারীরা আসলে যা লেখেন, যা লিখতে চান তা বিষয়ের দিক থেকে হোক কিংবা ভাষার দিক থেকে পুরুষের তুলনায় তা আলাদা হয়েই পড়ে। তাদের বয়ানে শুধু নারী নয় পুরুষরাও বড় একটা জায়গা জুড়ে থাকে। 'আমার জীবন' গ্রন্থটির ভূমিকা অংশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন—

> "ঐ গ্রন্থখানি একজন রমণীর লেখা। শুধু তাহা নহে, ৮৮ বৎসরের একজন বর্ষীয়সী প্রাচীনা রমণীর লেখা। তাই বিশেষ কৌতূহলী হইয়া আমি এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হই। মনে করিয়াছিল সেখানে কোন ভাল কথা পাইব সেইখানে পেন্সিলের দাগ দিব। পড়িতে পড়িতে দেখি, পেন্সিলের দাগে গ্রন্থ কলেবর ভরিয়া গেল। বস্তুতঃ ইহার জীবনের ঘটনাবলী এমন বিস্ময়জনক এবং ইহার লেখায় এমন একটি অকৃত্রিম সরল মাধুর্য আছে যে, গ্রন্থখানি পড়িতে বসিয়া শেষ না করিয়া থাকা যায় না।"[৩]

রাসসুন্দরীর জন্ম ১২১৬ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে। সংস্কার আন্দোলনের সূচনা পর্বেও আগের মহিলা তিনি; কলকাতায় তখন মেয়েদের স্কুল খোলার আয়োজন চললেও সেই শিক্ষা আদায়ের দাবি মেয়েদের কণ্ঠে শোনা যায়নি। অন্যদিকে মিশনারিদের উদ্যোগে পোতাজিয়ায় বাংলা মাধ্যমে ছেলেদের একটি পাঠশালা খোলা হয়েছিল। রাসসুন্দরীর পৈতৃক বাড়িতেই ছিল সেই পাঠশালা। প্রায় ৮ বছর বয়সে বাড়ির সেই পাঠশালায় মেমসাহেব শিক্ষিকার কাছে বিদ্যাভ্যাস শুরু করেন। কিন্তু ১২ বছর বয়সে ফরিদপুর জেলার জমিদান সীতানাথ সরকারের সঙ্গে বিয়ে হবার পর লেখাপড়া শেখার কোনো বিশেষ সুবিধা ঘটেনি। রাসসুন্দরী দেবীর বাসনা ছিল তিনি লেখাপড়া শিখে পুঁথি পড়বেন। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম দিকে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার সাধ্য থাকলেও অধিকার ছিল না। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতাই ছিল সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধক। কিন্তু রাসসুন্দরী নিজ চেষ্টায় এই প্রাবন্ধিকতাকে জয় করেছেন। নীরবে-নিভৃতে গভীর গোপনে সে চেষ্টায় রত হয়েছেন। সংসারের দহনচক্রে বন্দিনী হয়েও লেখাপড়া শিখবার জন্য তার আগ্রহ সমগ্র পাঠককে মুগ্ধ করে। তিনি শ্বশুরবাড়িতে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের চেষ্টায় চৈতন্য-ভাগবত পড়বেন বলে বাংলা অক্ষর চিনতে শিখেছিলেন। ১৮ থেকে ৪১ বৎসর পর্যন্ত রাসসুন্দরীর ১২ বার আঁতুড়ঘরে যাতায়াত। ১২ টি সন্তানের সন্তানের জন্মদাত্রী তিনি। গৃহবধূর কর্ম পালনের সঙ্গে যুক্ত ছিল সন্তান পালনের যাবতীয় কাজকর্ম, বৃহৎ সংসারের ভার, নিত্য ভোগ সহকারে প্রতিষ্ঠিত দেবতার সেবা, ঘর-গৃহস্থালির অন্যান্য কাজ, এছাড়াও বিধবা ননদিনীদের বিগ্রহতুল্য সেবা। তাঁর কাজের পরিধি এতই বিস্তৃত ছিল যে, কাজের গতিকে কোনো বেলা আহার করতে ভুলে যেতেন। মূলত এই ছিল উনিশ শতকের নারীদের অন্দরমহলের চিত্র। এ বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন 'আমার জীবন'-এর গ্রন্থ-পরিচয় অংশে বলেছেন—

> " 'আমার জীবন' পুস্তকখানি শুধু রাসসুন্দরীর কথা নহে, উহা সেকেলে হিন্দু রমণীগণের সকলের কথা; এই চিত্রের মত যথাযথ ও অকপট মহিলা - চিত্র আমাদের বাংলা সাহিত্যে আর নাই। এখন মনে হয়, এই পুস্তকখানি লিখিত না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।"[৪]

হিন্দু সমাজে এককালে অন্তঃপুরের নারীরা যে অবস্থানে ছিলেন এখন আর তারা সেই স্থানে নেই; সেই দিক থেকে এই গ্রন্থটি একটি অমূল্য সম্পদ। এই গ্রন্থটি না হলে সেকেলে রমণীদের ভয়, লজ্জা ও গ্রাম্য সংস্কারের মধ্যে ঠিক কি তার প্রকাশ পেত তার এমন সুস্পষ্ট ও জীবন্ত ছবি আমরা দেখতে পেতাম না। অমরকোষে রমণীর একটি প্রতিশব্দ হল ভীরু। আর এই নামটি যে বয়সেও তিনি এমন সকল কার্য করেছেন তা আমাদের মধ্যে হাস্যরসের উদ্রেক করে - সে সকল কথা তিনি অকপটে লিখেগেছেন-

> "ঐ বাটীতে একটা ঘোড়া ছিল, তাহার নাম জয়হরি। এক দিবস আমার বড় ছেলেটিকে ঘোড়ার উপর চড়াইয়া বাটীর মধ্যে আমাকে দেখাইতে আনিল। তখন সকল লোকে বলিল, এ ঘোড়াটি কর্তার; আমি ঘরে থাকিয়া জানিলাম ওটা কর্তার ঘোড়া, সুতরাং মনে মনে ভাবতে লাগিলাম যে, কর্তার ঘোড়ার সম্মুখে আমি কেমন করিয়া যাই, ঘোড়া যদি আমাকে দেখে - তবে বড় লজ্জার কথা।"[৫]

সেকালে কুসংস্কার কতটা মজ্জাগত ছিল সেটা অনুমান করা যায় রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' পাঠ করলে। সকল বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে পুঁথি পড়ার আগ্রহ থেকেই লেখাপড়া শিখতে চেয়েছিলেন তিনি। কারণ শিক্ষা এমন এক সম্পদ যা মানুষকে করে তোলে কুসংস্কারমুক্ত। বাড়িতে বাড়িতে পুরাণ পাঠ এবং সংকীর্তনের প্রচলন থাকলেও অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না, ফলে বাড়িতে থাকা পুঁথিই পাঠ করবেন বলে তিনি মনস্থির করেন। ক্রমে তার বই পড়ার আগ্রহ বাড়তে থাকলো বাড়িতে সে কয়টি ধর্মীয় গ্রন্থ ছিল, সবকয়টিই পড়লেন। একে একে শেষ করলেন, 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'জৈমিনিভারত', 'গোবিন্দলীলামৃত', 'বিদগ্ধমাধব', 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা', 'বাল্মীকি পুরাণ'। বাল্মীকি পুরাণের কেবল আদিকাণ্ড ছিল। পঞ্চম পুত্র দ্বারকানাথ থাকতেন কলকাতায়। তাঁর মাধ্যমেই বাড়িতে আনালেন সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। সপ্তম পুত্র কিশোরীলালের সহায়তায় তিনি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখতে শিখে গিয়েছিলেন।

'আমার জীবন'-এর প্রথম মুদ্রণ ১২৭৫ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে। মূলত স্বামী-সন্তান-সংসার— এসবের বাইরেও যে নারীর একটি নিজস্ব জগৎ থাকা প্রয়োজন এ ধারণা দীর্ঘকাল নারীও অনুভব করেনি। তাই 'আমার জীবন'-এ রাসসুন্দরী দেবীর নিজস্ব চাওয়া-পাওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায় না। নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হয়েছে কেবল সংসারের কাজে। তাই হয়তো স্বামীর মৃত্যুর পরই জীবনের শেষদিকে নিজেকে নিয়ে কিছুটা ভাবতে পেরেছিলেন। আত্মজীবনী কেবল জীবনের ধারাবাহিকতাকেই ধরে রাখে

না, একটি কালকেও বহন করে। সেদিক থেকে রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতেই আবদ্ধ। পুঁথি কিংবা ধর্মগ্রন্থ ছাড়া অন্য কোনো বই পড়েছেন বলে মনে হয় না। বাইরের কারো সঙ্গে মেলামেশার সুযোগও তিনি পাননি। জীবন যাপন করেছেন নিতান্তই গৃহবধূর মতো। আত্মজীবনী রচনার মতো কোনো দৃষ্টান্তও তার সামনে ছিল না। সে হিসেবে আত্মজীবনী রচনা মতো পদক্ষেপ নেওয়ায় তিনি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছেন। 'আমার জীবন'-এর একটি সূচিপত্র রয়েছে। সেখানে প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগে বেশকিছু রচনা রয়েছে। প্রথমভাগে সতেরোটি রচনা এবং দ্বিতীয় ভাগে ষোলটি রচনা রয়েছে। দ্বিতীয় ভাগ লেখা হয়েছে তাঁর ৮৮ বছর বয়সে এবং এই ভাগের রচনা শুরু হয়েছে কবিতার মধ্য দিয়ে। রাসসুন্দরী দাসীর কবিতা এবং গদ্য দুই পরিচ্ছন্ন এবং শিল্পগুণ সমৃদ্ধ। কোথাও কোনো অসঙ্গতি কিংবা অতিরঞ্জিত ভাব নেই, সম্পূর্ণ গ্রন্থটি লেখা হয়েছে সহজ-সরল ভাষায়। এটি একেবারে গাবনা জেলার পোতাজিয়া গ্রামের একজন সাধারণ মেয়ের আত্মকথন। এই গ্রন্থে লেখিকার জীবনের নানান বিচিত্র ঘটনার পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ে পাঠকদের নজর কাড়ে, 'আমার জীবন' আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ। রাসসুন্দরী নিজের সমস্ত ভার দয়াসাধনের ওপর অর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই সমর্পণ তাঁকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। তিনি একটি আশ্রয় কল্পনা করে সংসার ধর্ম করেছেন, সন্তানদের বড় করে তুলেছেন, আবার নীরব সংগ্রাম করে লেখাপড়া শিখেছেন। শুধুমাত্র তাই নয়, বাংলা আত্মজীবনী সাহিত্যের ইতিহাসে নিজের নাম প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শ্বশুরবাড়ির মদনগোপালকেই ছেলেবেলায় দয়ামাধব হিসেবে জানতেন রাসসুন্দরী। দয়ামাধবের উপস্থিতি বারবার অনুভূত হয়েছে রাসসুন্দরীর জীবনের বিভিন্ন পর্বে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, প্রাপ্তি কিংবা অপ্রাপ্তিতে। জীবনে সায়াহ্নে এসেও তাকেই একান্ত-আপন জন বলে মনে হয়েছে। রাসসুন্দরী দাসী শুধুমাত্র গৃহবধূই নন, মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ স্পষ্টভাবেই উদ্ভাসিত করেছে তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে। তাঁর এই আত্মজীবনী মুক্ত চিন্তা, মুক্ত ভাবনা, মুক্ত মানসিকতা ও মুক্ত আকাঙ্ক্ষার দলিল।

তথ্যসূত্র :

১. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মনুসংহিতা', আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯, কলকাতা, পৃ. ২৪৮

২. আশাপূর্ণা দেবী, 'কলকাতার মেয়েরা এখন তখন', দ্র. আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, মাঘ ১৪০১, পৃ. ৮৪

৩. রাসসুন্দরী দাসী, 'আমার জীবন', বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৭, নয়াদিল্লী-১১০০৭০, পৃ. Vii (প্রস্তাবনা অংশ)

৪. তদেব, পৃ. ix (গ্রন্থ পরিচয় অংশ)

৫. তদেব, পৃ. ৪২

সহায়ক গ্রন্থ :

১. নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব', দে'জ পাবলিশিং, ষোড়শ সংস্করণ- জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।

২. শিবরাম শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম মুদ্রণ- ২০১৮, ৮/১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-০৯।

৩. হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণগোপাল রায়, 'সাহিত্য প্রবন্ধ প্রবন্ধ সাহিত্য', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় সংস্করণ- দোলযাত্রা ২০০৯, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯।

ভূত নির্ভর বাংলা কথা সাহিত্যের ধারাপ্রবাহ

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ,
কান্দরা রাধাকান্ত কুণ্ডু মহাবিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসারঃ-এই বৈজ্ঞানিক যুগে ভূতের অস্তিত্ব না থাকলেও সাহিত্যে এর উপস্থিতি সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মানুষের মনই এদের বসবাসের সবচেয়ে উপযুক্ত ও পাকাপোক্ত জায়গা। একদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি অপরদিকে অবিজ্ঞানের সন্তান ভূতেদের বাড়বাড়ন্ত আমাদের ভাবিয়ে তোলে। শিশু-কিশোর সাহিত্য তো বটেই প্রাপ্ত মনস্ক সাহিত্যেও এর কমতি নেই। অতি সম্প্রতি বেশ কিছু নবীন সাহিত্যিক ভূতেদের মাথায় ভড় করে বেশ কিছু মাস্টারপিস লিখেছেন। কিন্তু এর সূত্রপাত যদি খুঁজি তাহলে আমাদের পিছু ফিরে তাকাতেই হয় এবং চলে যেতে হয় সেই মধ্যযুগের প্রাক্কালে। বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ থেকে ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গলকাব্য’ সকল জায়গাতেই তেঁনাদের স্থান পাক্কা। তাই ইতিহাস থেকে বর্তমান পর্যন্ত সাহিত্যে তেঁনাদের বিবর্তন একটু দেখে নেওয়া আবশ্যক।
সূচক শব্দঃ- বিজ্ঞানের যুগে ভূতের অস্তিত্ব, আসলে ভূত কী? কত রকমের ভূত, মানব মনে ভূতের অস্তিত্ব, মধ্যযুগীয় কাব্যে ভূতের উপস্থিতি,আধুনিক যুগ এবং অতিসম্প্রতি লেখকদের লেখা ভূতুড়ে কাহিনি, ভূত ও ভৌতিক মোহগ্রস্ত মানুষ।

মূল আলোচনা :
বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। জগতের সর্বত্র এমনকি সুদূর মহাশূণ্যেও মানুষের বিজ্ঞানকীর্তির পতাকা সসম্মানে উড্ডয়মান। যদিও সম্পূর্ণ বলা যায় না, তবুও বর্তমানের মানুষ কু-সংস্কার থেকে অনেকটাই মুক্ত। আর এই কু-সংস্কারের গর্ভ থেকেই জন্ম ভূতের। এই ‘ভূত’ জিনিসটা বড়ই অদ্ভুত। কেননা সারা পৃথিবীতে এর বাস। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতায় মানুষ এদের চেনে ভিন্ন ভিন্ন নামে। তবে কেউ এদের মানেন আবার কেউ মানেন না। যিনি মানেন না তিনি এদের না মেনেই ভালোবাসেন আর যিনি মানেন তার তো কোনো কথাই নেই। মোদ্দা কথা মানুষ ভূতে মানুক বা না মানুক ভালো এদের না বেসে থাকা যায় না। কথাটা শুনতে একটু অদ্ভুত লাগল তাই না? ভূতে আবার ভালোবাসা? হ্যাঁ মানুষ ভূতকে ভালোবাসে, সে মানুক চাই না মানুক। আসলে ‘ভয়’ জিনিসটা থেকেই ভূতের উৎপত্তি। আর ভয়শূণ্য মানুষ বোধহয় এই পৃথিবীতে নেই। মুখে সে যাই বলুক না কেন ভীতু সবাই। তবে সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে ভয় পাওয়ার উপকরণটা আলাদা। কেউ বাঘে ভয় পায়, কেউ সাপে, কেউ আরশোলায় ভয় পায় তো কেউ কেন্নো বা কেঁচোতে, আবার কেউ পায় আলোতে

বা কেউ অন্ধকারে। সুতরাং 'আমি ভয় পাই না'—এ কথাটা বোধহয় কেউ বুক ঠুকে বলতে পারবে বলে আমাদের মনে হয় না। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' ও 'ইন্দ্রনাথ'-এর মতো চরিত্র যদি ভয় পায় তবে পৃথিবীর সকলেই ভয় পায় বলে আমাদের বিশ্বাস। আসলে প্রাণ জিনিসটা সকল প্রানীর কাছেই প্রিয়, সে মানুষ হোক বা পশু। তাই শুধু মানুষ নয় ভয় পায় পশুও। তবে পশুরা ভূতে ভয় পায় বলে মনে হয় না। তাই বা জোর দিয়ে বলি কী করে? নিশুতি রাত্রে কুকুর-বিড়াল বা বাদুড়ের হাড় হিম করা কান্নার আওয়াজ তো আমরা সকলেই শুনেছি বা গল্পের বইতে পড়েছি। তাহলে সে কার ভয়াল উপস্থিতিতে এ রকম আওয়াজ করে? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোথাও নেই। তবে যাই হোক একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, ভয় থেকেই ভূতের জন্ম। আর সেই কারণেই ছেলেবেলায় বলতে শিখেছিলাম—"ভূত আমার পুত পেত্নী আমার ঝি/ রামলক্ষ্মণ সাথে আছে করবি আমার কী?"

প্রসঙ্গত, ভৌতিক সাহিত্য আলোচনার আগে ভূত সম্পর্কে আলোচনাটা আগে দরকার। এই যেমন ভূত কী, কতরকমের হয়, কী খায়, কোথায় থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। একথা আমরা সবাই জানি যে, 'ভূত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'অতীত'। অর্থাৎ যা গত হয়েছে তাই ভূত। কিন্তু বাঙালির কাছে ভূত বড় আবেগের জিনিস। কারণ গল্পবাগীশ বাঙালির জীবনের সূচনাই হয় দাদু-ঠাকুরমাদের কাছে ভূতের গল্প শুনে। অতিবড় দূরন্ত বা কাঁদুনে ছেলের মা ভূতের গল্প শুনিয়ে তার নিজের কাজ হাসিল করে নেয়। ভূতপ্রীতির এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর আছে নাকি? সেই যে ভূতের ছবি ছেলেবেলায় আমাদের মানসপটে এঁকে দেওয়া হয়েছিল তা আজও আমরা বহন করে নিয়ে চলেছি। তাই বাঙালির কাছে ঈশ্বরের চেয়ে ভূত অনেক বেশি আপনার।

ভূত আসলে কী? এ নিয়ে তো গবেষণার অন্ত নেই। কত তত্ত্ব কত তথ্য কত যন্ত্র আর কত কলম কচকচানি। অনেকে বলেন ভূত আবার কি? একরাশ বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে ভূতের অস্তিত্ব। কেউ বলেন ভূত হল সেইসব মানুষের অতৃপ্ত আত্মা যারা অপঘাতে মৃত্যুলাভ করেছেন। কেউ কেউ আবার এর সঙ্গে বিজ্ঞানকে জুড়ে দিয়ে বলেন যে, ভূত হচ্ছে একটা এনার্জি বা শক্তি। তবে সেটা পজিটিভ নয় নেগেটিভ এনার্জি। বিজ্ঞান বলে শক্তির ধ্বংস হয় না রূপান্তর ঘটে মাত্র। তাই মানুষের শরীরেও এমন কিছু আছে যা মানুষকে চালিত করে। জীবিত ও মৃত মানুষের মধ্যে পার্থক্য একটাই। জীবিত মানুষ শক্তি যুক্ত ও মৃত মানুষ শক্তিহীন। তাহলে শক্তিই হচ্ছে আসল জিনিস যা শরীরে প্রাণের লক্ষণ ফুটিয়ে তোলে। তাহলে মৃত্যুর পরে এই শক্তি যায় কোথায়? এই শক্তিই হচ্ছে 'ভূত'। যে মানুষ সারা জীবন কেবল অশুভ চিন্তা করেন, মানে যিনি মানুষ হিসেবে সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নন তিনিই মৃত্যুর পরে ভূতেদের দল ভারি করেন। এই ভূতেরা আবার নানা রকমের হয়। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'গল্পের ভূত' গ্রন্থে 'দেশবিদেশের ভূত' শীর্ষক অধ্যায়ে এমন অনেক ভূতের কথা এবং তাদের বৈশিষ্ট্য লিখেছেন এবং উক্ত গ্রন্থে ১৪ টি ভূতের ছবিও

তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে এগুলি সবই কিন্তু গল্পের ভূত—বাস্তবের নয়। এই গল্পের ভূতকে নিয়েই আমাদের যত আলোচনা, বাস্তবে ভূতের অস্তিত্ব আছে কি না আমি জানি না এবং মানতে চাইও না। কারণ তাতে উপকারের তুলনায় অপকারের সম্ভাবনাই প্রবল।

ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে মানুষ দ্বিধাবিভক্ত হলেও ভূতের গল্প নিয়ে বাঙালির আবেগ সেকাল থেকেই। বিশ্বসাহিত্যে ভূতের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটছে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৫০০ বছর আগে। 'ওরেস্টেডো' নামক একটি নাটকে ভূতের প্রথম আত্মপ্রকাশ। হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসিতেও ভূতের প্রসঙ্গ আছে। আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতে রাক্ষসের পরিচয় পাই। যদিও রাক্ষস ও ভূত দুটোকে মিলিয়ে দেওয়া চলে না। তবে সংস্কৃত সাহিত্যে বিক্রম বেতালের বেতাল চরিত্রটি ভৌতিক বটে, আসলে ভূত মানে যার মৃত্যু ঘটে গেছে। রাক্ষসেরা কোনো মৃত প্রাণী নয়। তাদের বধ বা মৃত্যু হয়েছিল। আর্যরাই অনার্যদের রাক্ষস নাম দিয়েছিল। তবুও এদের সঙ্গে নানা অতিপ্রাকৃত কাহিনি জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বেতাল কোনো জীবিত প্রাণী নয়। তাই অনায়াসেই তাকে ভূতেদের দলে ঠেলে দেওয়া যায়। পুরাণে আমরা দেখেছি দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গী সাথীরা হলেন ভূত। তাই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে 'শিবের হিমালয় যাত্রা' প্রসঙ্গে লিখেছেন---

"এরূপ করিয়া বর সাজাইয়া
হর লয়ে মুনি যায়।
প্রেত ভূতগণ ধায় অগণন
আন্ধার কৈল ধূলায়।।
ঝুপ ঝুপ ঝাপ দুপ দুপ দাপ
লম্ফ ঝম্প দিয়া চলে।
মহা ধূমধাম হাঁকে হুম হাম
জয় মহাদেব বলে।।" [১]

যদিও এই ভূতেদের তাণ্ডবলীলায় ভয় কম হাসিই বেশি পায়। বৈষ্ণব সাহিত্যেও আমরা ভূতেদের অনুষঙ্গ পাচ্ছি। বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের মধ্যখণ্ডে ২৫ তম অধ্যায়ে শ্রীবাসের মৃত পুত্রের সঙ্গে চৈতন্যদেবের কথোপকথনের বর্ণনা দিয়েছেন—

"মৃত শিশু প্রতি প্রভু বোলেন বচন।
শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি যাও কি কারণ।।
শিশু বোলে প্রভু যেন নির্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার।।
মৃত শিশু উত্তর করয়ে প্রভু সনে।
পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব-ভক্তগণে।।" [২]

শুধু বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' নয় কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থেও ভৌতিক আভাস আছে। ছোটো হরিদাসের অপঘাত মৃত্যুর পরে সবাই মনে করেছিল যে, সে ব্রহ্মরাক্ষস হয়েছে, কিন্তু পরে চৈতন্যদেব জানান যে, তিনি ব্রহ্মরাক্ষস নন 'গন্ধর্ব' হয়েছেন। গন্ধর্বও একরকমের ভূতই বটে যারা নৃত্য ও গীতে খুব পারঙ্গম হয়।

বাংলা কথাসাহিত্যে ভূতেদের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৮৭৫ সালে থিয়োসফিক্যাল সোয়াসাইটি প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে । শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে ***লিখেছেন—"...কর্ণেল অল্‌কট ও মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি আসিয়া বোম্বাই সহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।"*** [৩] এর পরে 'থিয়োসফিস্ট' পত্রিকায় বেশ কিছু ভূতের গল্প বাংলা ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। তখন থেকেই বাঙালির কথা সাহিত্যে ভূতপ্রীতি শুরু হয়।

বলা হয় গল্পের রাজা নাকি ভূতের গল্প। তাই কাহিনিপ্রিয় বাঙালি নিজেকে ভূতের গল্প রচনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। ব্যক্তিগতভাবে ভূতে অবিশ্বাসী হলেও অনেক কথাসাহিত্যিকই চমৎকার ভূতের গল্প উপহার দিয়ে গেছেন। এঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অন্যতম। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন কঠোর যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক। তাই তাঁর রচনায় অলৌকিকতা খুব কমই এসেছে। তাঁর 'আখ্যানমঞ্জরী' গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে 'অকুতোভয়তা' গল্পে ভৌতিক প্রতিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দেশুলিয়র নামে এক মহিলা কবি কৌণ্ট ও কৌণ্টেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর বাসস্থানে যান। সেখানে ভূতের উপদ্রবযুক্ত একটি গৃহ আছে শুনে দেশুলিয়র সেই গৃহেই থাকতে চান। কিন্তু কৌন্ট মহাশয় তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যান এবং তাঁকে এই গৃহে থাকতে নিষেধ করেন। অনেক বলার পরেও যখন দেশুলিয়র রাজি হন না তখন নিরুপায় জেনে তাঁরা নিরস্ত হন এবং দেশুলিয়রকে সেই ভৌতিক অপবাদযুক্ত গৃহে থাকতে দেন। রাত্রি যাপনকালে দেশুলিয়রের নানা অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু তিনি তাতে বিচলিত না হয়ে আসল সত্য উন্মোচন করেন। সকালে সকলে জানতে পারেন যে, কোনো ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ নয় বরং একটি কুকুর রোজ রাত্রে সেই গৃহে এসে শয্যায় শয়ন করে। এই ঘটনায় ভয় থাকলেও বিদ্যাসাগর ভূতকে কিন্তু প্রতিষ্ঠা দেননি বরং দেশুলিয়রের সাহসকে তিনি প্রশংসা জানিয়ে গল্পের শেষে তিনি লিখেছেন—***"যাহা হউক, কৌণ্ট এবং কৌণ্টেস এইরূপে ভৌতিক বৃত্তান্তের সিদ্ধান্ত হওয়াতে, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং দেশুলিয়রের সাহস, বুদ্ধিকৌশল ও অকুতোভয়তা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, মুক্ত কণ্ঠে তাঁহাতে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি স্ত্রীলোক হইয়া, সাহস ও অকুতোভয়তার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, পুরুষজাতির মধ্যেও সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।"***[৪]

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর রচয়িতা প্যারিচাঁদ মিত্র ১৮৯০ সালে স্ত্রীর মৃত্যুর পর অত্যন্ত শোকাকুল চিত্তে আধ্যাত্মিক ও

প্রেততত্ত্ব নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। অবশ্য তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই ঈশ্বরবাদী ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করতেন। পরবর্তীতে প্রেততত্ত্ব নিয়ে তাঁর অনেক রচনা লণ্ডনের 'স্পিরিচুয়ালিস্ট' এবং আমেরিকার 'ব্যানার অফ লাইট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি 'ব্রিটিশ ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ স্পিরিচুয়ালিস্টস্' সভার অনারারি মেম্বার ছিলেন। দেশ বিদেশের নানা স্পিরিচুয়ালিস্টদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট যোগাযোগও ছিল।তাঁর তিনখানি রচনায় প্রেততত্ত্বের কথা আছে। সেগুলি হল— 'যৎকিঞ্চিৎ'(১৮৬৫), 'অভেদী'(১৮৭১) ও 'আধ্যাত্মিকা'(১৮৮০)। 'যৎকিঞ্চিৎ'-এ যুদ্ধে মৃত এক সৈনিকের প্রেতাত্মা তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে। 'অভেদী' হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক-রূপক উপন্যাস। এখানেও প্রেতাত্মার প্রসঙ্গ আছে। এই উপন্যাসের নায়ক নায়িকা অণ্বেষচন্দ্র এবং পতিভাবিনী। অণ্বেষচন্দ্র অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে গোদাবরী তীরে যোগীদের কাছে এলেন এবং সেই যোগীদের কাছে যোগ শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেখানে অণ্বেষচন্দ্রের স্ত্রীর সঙ্গে তার আত্মায় আত্মায় মিলন হয়। 'আধ্যাত্মিকা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হরদেব তর্কালংকারের কন্যা আধ্যাত্মিকা। শৈশব থেকেই নানা প্রকার অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন এই আধ্যাত্মিকা। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তিরও বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। সে ব্রহ্মবাদিনীদের মতো কঠোর ব্রহ্মচর্য মেনে দিনপাত করতে থাকে। তার অলৌকিক শক্তির দ্বারা সে মানুষের মঙ্গলসাধন করে এবং একসময় সে নিজের ইচ্ছায় গঙ্গাতীরে মৃত্যুবরণ করে। এই রকম অলৌকিকতা তাঁর রচিত উক্ত তিনখানি গ্রন্থে বিরাজমান।

বাংলা সাহিত্যকে যিনি 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' দিয়েছিলেন সেই কালীপ্রসন্ন সিংহের গ্রন্থেও কিন্তু ভূতের কথা আছে। তবে, কালীপ্রসন্ন কিন্তু সচেতনভাবে কিছু ভূতের অনুষঙ্গ এনে বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি এসব কু-সংস্কার মানেন না। অর্থাৎ এসব বুজরুকি ছাড়া কিছুই নয়। তিনি ব্রাহ্মদের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন— "***...সেদিন কলকেতার ব্রাহ্মসমাজের একজন ডাইরেক্টরের স্ত্রীকে ডাইনে পায়—নানা দেশ দেশান্তর থেকে রোজা আনিয়ে কত ঝাড়ন-ঝোড়ন, সরষেপড়া, জলপাড়া ও লঙ্কাপড়া দিতে ভাল হয়। অনেক ব্রাহ্মের বাড়িতে ভূতচতুর্দশীর প্রদীপ দিতে দেখা যায়। এদিকে খানিকক্ষণ ডাকতে ডাকতে ভূতের আসবার পূর্বলক্ষণ হতে লাগলো। গোহাড়, ঢিল, ইঁট ও জুতো হাঁড়ি বাড়ীর চতুর্দিকে পড়তে লাগলো। ঘরের ভেতরে গুপ্ গুপ্ করে কে যেন নাচছে বোধ হতে লাগল; খানিকক্ষণ এইরকম ভূমিকার পর মড়াস্ করে একটা শব্দ হলো; ভূতের বসবার জন্য ঘরের ভিততে যে পিঁড়েখানা রাখা হয়েছিল, শব্দে বোধ হলো সেইখানি দুচীর হয়ে ভেঙ্গে গেল—রোজা সভয়ে বলে উঠলেন—শ্রীযুৎ এয়েচেন।***" [৫]এভাবে তিনি ভূতেদের অনুষঙ্গ এনেছেন, কিন্তু অধ্যায়ের শেষে তিনি লিখেছেন—"***এ সওয়ায় আমরা দু-চারি জায়গায় ভূত নাবানো দেখেছি, পাঠকরাও বিস্তর দেখেচেন, সুতরাং সে সকল এখানে উত্থাপন করা অনাবশ্যক, ভূত***

নাবানো ও 'হোসেন খাঁ' কেবল জুচ্চরী ও হুজুকের আনুষাঙ্গিক বলেই আমরা উল্লেখ কল্লেম।"[৬]

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর'-এ পিশাচের প্রসঙ্গ আছে। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'-এ অলৌকিকতা থাকলেও সেখানে হাস্যরসই প্রধান। ভয়কে সেখানে গৌণই রাখা হয়েছে। বঙ্কিম সমসাময়িক যুগের ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বেশ কিছু উপন্যাসে প্রেততত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তিনি প্রায় ৭০ টি উপন্যাস রচনা করেন। তার কিছু কিছু সে সময়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এগলির মধ্যে 'জন্মান্তর রহস্য', 'প্রেততত্ত্ব', 'ডাকিনীবিদ্যা', 'প্রেততর্পন', 'নরকোৎসব' ইত্যাদি গ্রন্থগুলিতে প্রেততত্ত্ব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ কিছু ভৌতিক গল্প রচনা করেছেন। তিনি শুধু ভৌতিক গল্পই রচনা করেননি, নিজে যেহেতু পরলৌকিকবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তাই বেশ কয়েকবার তিনি প্লানচেটও করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বৌঠান কাদম্বরী দেবী এবং স্ত্রী মৃণালিনী দেবী মারা যাবার পরে তিনি এই প্লানচেটগুলো করেছিলেন, এছাড়া ২৯ বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথের ভাইপো বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পরেও তিনি তাঁর আত্মার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাইঝি-হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা অভিজ্ঞার সঙ্গে, অপরিচিত হালদারমশাই, আরতি, সুকুমার রায়, মণিলাল প্রমুখ অনেক মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনের বর্ণনা পাওয়া যায়। যদিও এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ কিছুই নেই। তবে রবীন্দ্রনাথের কঙ্কাল, মণিহারা, ক্ষুধিতপাষাণ ইত্যাদি গল্পগুলিতে যে ভৌতিক প্লটগুলি আছে তা চমৎকার। রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' এবং 'জীবিত ও মৃত' গল্পগুলিও ভৌতিক, তবে এতে ভূতের সরাসরি দেখা নেই। এরকম আর একটি গল্প লেখেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। গল্পের নাম 'রসময়ীর রসিকতা'। সেখানেও ভূতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পূজার ভূত' ভূতের গল্পের একটি ভালো নিদর্শন। তাঁর 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২) উপন্যাসটিতে ভৌতিক ছায়া থাকলেও তা আসলে ভূত নয়। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভৌতিক চরিত্র হল 'লুল্লু ভূত'। এই লুল্লুকে নিয়ে তাঁর রচনা বেশ মজাদার ও জনপ্রিয়। সমকালে প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের ভৌতিক রচনা বেশ জনপ্রিয় ও মজাদার।

একালেও ভূতের গল্পের জনপ্রিয়তা কমেনি বরং বেড়েছে। বিশ শতকে অসংখ্য লেখক তাঁদের লেখনী দ্বারা ভূতের গল্পের পাল্লা ভারী করেছেন। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, শরৎচন্দ্র, প্রমথনাথ বিশী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, --প্রমুখ শক্তিমান লেখকেরা তাঁদের শক্তিশালী লেখনী দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন ভূতের গল্পের ভাণ্ডারকে। তবে এঁদের মধ্যে অনেকেই পুরোপুরি ভূতকে স্বীকার না করে কিছু কিছু গল্পে ভৌতিকতাকে স্থান দিয়েছেন। তবে পরশুরাম, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়—প্রমুখ সরাসরি

ভূতকে মাটিতে নামিয়ে এনেছেন। উপেন্দ্রকিশোরের ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’-এর ভুতের রাজাকে সিনেমার পর্দায় নিয়ে এসেছেন সত্যজিৎ রায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অসংখ্য ভৌতিক ছোটোগল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। *যেমন-বউচণ্ডীর মাঠ, ছায়াছবি, অভিশাপ, অশরীরী, তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, মেঘমল্লার, কবিরাজের বিপদ, রঙ্কিনীদেবীর খড়্গ, তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প, ভৌতিক পালঙ্ক, মশলা ভূত, পেয়ালা, পৈতৃক ভিটা, মেডেল, অভিশপ্ত, কাশী কবিরাজের গল্প, মায়া, গঙ্গাধরের বিপদ, বাঘের মন্তর* ইত্যাদি। তবে এর সবগুলিতে সরাসরি ভূতের উপস্থিতি না থাকলেও সবগুলি কিন্তু ভয়ের গল্প। ‘তারানাথ তান্ত্রিক’ নামক জনপ্রিয় চরিত্রটি তাঁর সৃষ্টি। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই চরিত্রটি নিয়ে অনেক গল্প লেখেন যা পাঠকসমাজে তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প নামে সমাদৃত।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৬-১৯৮১) বাংলা সাহিত্যকে অনেক ভৌতিক ছোটোগল্প উপহার দিয়েছেন। তাঁর লেখা অসংখ্য ছোটোগল্পের মধ্যে *অলৌকিক, পাঁচ মুণ্ডীর আসর, অমর ধাম, পিছনের জানলা, অবিশ্বাস্য, আমরা আছি, গোয়েন্দা ও প্রেতাত্মা, কুপার সাহেবের বাংলো, জনাব মঞ্জিল, গভীর রাতের কান্না, রাত্রি নিশীথে, টান, প্রতিহিংসা, মৃত্যুর পরে, ফাঁসির আসামী, আগন্তুক, ভূতচরিত, ভূতুড়ে কাণ্ড, বেনেটির জঙ্গলে, বিনোদ ডাক্তার, রূপে সে কুরূপা, সামন্তবাড়ি* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য গল্পগুলিতে তিনি সরাসরি ভূতকে এনে পাঠকদের ভয় দেখিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে হেমেন্দ্রকুমার রায় এমন একজন সাহিত্যিক যাঁর লেখা ভূতের গল্প বা উপন্যাস গুলি পড়লে সত্যিই মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত নেমে যায়। তাঁর রচিত বেশ কিছু উপন্যাস ও উপন্যাসিকা অসাধারন ও চমৎকার। তাঁর লেখা ‘অমাবস্যার রাত’-এ মানুষের বাঘে রূপান্তরের কাহিনি আছে। এক হিংস্র ডাকাত সর্দার বাঘে রূপান্তরিত হয়ে মানুষদের মারে কিন্তু কুমারের গুলিতে মারা যায় নিরাপরাধ পটলবাবু। ‘মানুষ পিশাচ’ এবং ‘বিশালগড়ের দুঃশাসন’ ব্রাম স্টকার রচিত ড্রাকুলার কাহিনি অবলম্বনে লিখিত। মানুষ ড্রাকুলা হয়ে কীভাবে রক্ত চুষে খায় তার ভয়াল ছবি এতে আছে। ‘মানুষের গড়া দৈত্য’-এর পটভূমিকা তিনি নিয়েছিলেন মোরি শেলীর লেখা ‘ফ্রাঙ্কেন্সটাইন’ উপন্যাস থেকে। ‘মানব দানব’ উপন্যাসিকার কাহিনি তিনি সংগ্রহ করেছেন লুই স্টিভেনসনের ড জেকিল এণ্ড মি হাইড’ উপন্যাস থেকে। আর্থার কেনান ডয়েল রচিত ‘লট নং ২৯’ থেকে তিনি কাহিনি সংগ্রহ করে লেখেন ‘মড়ার মৃত্যু’। ‘অদৃশ্য মানুষ’ তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্য উপন্যাস। জে সেরিডান লেফানুর ‘স্ক্যালকেন দ্য পেইন্টার’ গল্প অবলম্বনে তিনি লেখেন ‘মোহনপুরের শ্মশান’। ‘প্রেতাত্মার প্রতিশোধ’ তিনি রচনা করেন ফ্রেডারিক ম্যারিয়েটের ‘দ্য হওয়াইট উলফ অব দ্য হার্জ মাউন্টেন’-এর ঘটনা অনুসরণে। এরকম বিভিন্ন বিদেশি গল্প ও কাহিনি অবলম্বনে হেমেন্দ্রকুমার রায় বাংলায় অনেক বিখ্যাত কাহিনি উপহার দিয়েছেন।

মানুষের ভূত পিপাসা এই একুশ শতকেও ক্ষীণ হয়নি। তাই একালেও অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক এখনও বিশেষ বিশেষ ভৌতিক কাহিনি রচনা করছেন। তাঁদের মধ্যে দীপিকা মজুমদার, অভিষেক চট্টোপাধ্যায়, প্রচেত গুপ্ত, মঞ্জিল সেন, কৌশিক মজুমদার প্রমুখ স্মরণীয়। দীপিকা মজুমদারের 'চন্দ্রপ্রতাপগড়ের আতঙ্ক', 'মায়াবিনীর করোটি', 'নাগপাশ', 'পাতালকোট, 'পাতালজাতক' ইত্যাদি তার ভয়ের উপন্যাস। তার উপন্যাসগুলি ইতিহাস ও পুরাণকে মিশ্রিত করে লেখা যার ফলে পাঠকসমাজে তা অনেক বেশি উপভোগ্য। 'চন্দ্রপ্রতাপগড়ের আতঙ্ক' উপন্যাসের কাহিনি শঙ্খজিৎ বাগচিকে নিয়ে লেখা। ইতিহাসের কোল অন্ধকার করে যে ভয়ের কালো ছায়া লুকিয়ে ছিল ৭০০ বছরের পুরোনো চন্দ্রপ্রতাপগড়ের প্রাসাদে তার রহস্য উন্মোচন সত্যিই শিরায় রক্তের ঠাণ্ডা প্রবাহ ছোটায়। অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের 'তেরো নম্বর ফ্লোর' সাম্প্রতিককালের একটি অতি ভয়ের উপন্যাস। এই উপন্যাস দেখানো হয়েছে প্রেমের কফিনে মৃত্যুর পেরেক। আছে নানা তন্ত্র, মন্ত্র ও ষড়যন্ত্রের হাতছানি। সল্টলেকের অফিসপাড়ায় একটি ২৬-তলা বিল্ডিং-এ চ্যানেলের অফিস। সেখানে কাজ করে মিহির সরখেল। এই অফিসেরই তেরো নম্বর ফ্লোরে কয়েক বছর আগে ঘটে গেছে একটি হত্যা। ওই অফিসেরই কর্মচারী তিলোত্তমাকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করে বরেন রায়। তিলোত্তমার প্রেতাত্মা ফিরে আসে প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু প্রেতাত্মা জানে যে, তাকে হত্যা করেছে তার প্রেমিক মিহির চ্যাটার্জি। তাই মিহির নামের ওপর তিলোত্তমার আকর্ষণ জন্মায়, যার শিকার হয় মিহির সরখেল।এভাবে নানা কাহিনির মধ্যে দিয়ে প্যারানর্মাল রিসার্চার নীলাম্বর ব্যানার্জির সহায়তায় তিলোত্তমার মুক্তি ঘটে এবং মিহির সরখেল বেঁচে যায়। এই উপন্যাসে লৌকিকতা-অলৌকিকতা, বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান, ত্রিকোন প্রেমের মূর্ছনা সব মিলে মিশে এক অপূর্ব ভয়ানক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষকে ক্রমাগত অন্ধকার থেকে আলোর পথে এগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আলোর পথে চলতে চলতেও অন্ধকারের প্রতি মানুষের টান কমেনি। তাই ভূতের গল্প, অলৌকিকতা, প্রেততত্ত্ব। কু-সংস্কার—এসব থেকে মানুষ কিছুটা মুক্ত হলেও এসব নিয়ে লেখা গল্পের মোহ থেকে মানুষ মুক্ত নয়। ভূতের গল্পের রাজ্য আসলে এক অপূর্ব কল্পনা, মোহময় ও মায়াময় রাজ্য যা থেকে মানুষের মুক্তি নেই। তাই আজও মনে হয়-পিছন থেকে কেউ বুঝি দেখছে। সে ভূত না ভবিষ্যৎ তা আমাদের জানা নেই।

তথ্যসূত্র:

১. ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, সম্পাদনায় ড. আশিসকুমার দে, সাহিত্যসঙ্গী, ১লা জানুয়ারী, ২০০৯, মূলকাব্য পৃষ্ঠা-২২

২. বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য আকাদেমি, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৫ পৃষ্ঠা-২০০

৩. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৯, পৃষ্ঠা-২৫০
৪. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, এস.বি.এস পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশঃ ১৪২০, পৃষ্ঠা-৯৬
৫. হুতোম প্যাঁচার নক্সা, কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত, কামিনী প্রকাশালয়, ফাল্গুন ১৪২০, পৃষ্ঠা-৮০
৬. হুতোম প্যাঁচার নক্সা, কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত, কামিনী প্রকাশালয়, ফাল্গুন ১৪২০, পৃষ্ঠা-৮১

গ্রন্থপঞ্জি

- গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অখণ্ড সংস্করণ, অধ্যাপক শোভন সোম সম্পাদিত, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়, ফেব্রুয়ারি ২০১২
- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড-প্রথম পর্ব, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।
- গল্পের ভূত, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, এপ্রিল ১৯৯০
- বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন, আনন্দ, মে ২০১৫
- একত্রে রবীন্দ্রনাথ, অমিতাভ চৌধুরী, দে'জ পাবিলিশিং, ৯ মে ১৯৬০
- তারানাথ তান্ত্রিক, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, ফাল্গুন ১৪২২
- ভৌতিক উপন্যাস সমগ্র, হেমেন্দ্রকুমার রায়, পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, বুকফার্ম, ফেব্রুয়ারি ২০২২
- ভয় সমগ্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বুকফার্ম, অক্টোবর ২০১৯
- চন্দ্রপ্রতাপগড়ের আতঙ্ক, দীপিকা মজুমদার, বুকফার্ম, জানুয়ারি ২০২০
- তেরো নম্বর ফ্লোর, অভিষেক চট্টোপাধ্যায়, অভিযান পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০২১
- ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কঙ্কাবতী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৬৭

প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্বের সংকট ও যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের বহুমাত্রিক পাঠ : প্রসঙ্গ 'মদনভেরি' উপন্যাস

যাদব মুরারী
সহঃ শিক্ষক, নাটাগড় স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতি বিদ্যালয়(উঃমাঃ)
নাটাগড়, সোদপুর, উঃ ২৪ পরগণা।

সংক্ষিপ্তসারঃ একবিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য কথাকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন সৈকত রক্ষিত (১৯৫৪ খ্রিঃ)। বাংলাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার ভাব ও ভাবনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তাঁর সাহিত্যবাগিচাকে ভরিয়ে তুলেছেন। বিশেষত পুরুলিয়া-মানভূম অঞ্চলের লোকভাষার প্রয়োগ করে প্রান্তিক মানুষের যন্ত্রণাময় জীবনকে সাহিত্যের আঙ্গিনায় স্বমহিমায় তুলে ধরেছেন। তাঁর এরকমই একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'মদনভেরি'(২০২০)। পুরুলিয়া-মানভূম অঞ্চলের আদিম প্রজাতির মানুষ হল ঘাসি সম্প্রদায়। পূর্বপুরুষদের পেশাকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছে চোড়কু, গতিককিষ্ণ, বলিরাম, পান্ডু ঘাসিরা। পূর্বপুরুষদের জাত-বৃত্তি ছিল জন্ম-মৃত্যু-শ্রাদ্ধ ও বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠানে মদনভেরি বাজানো। পিতা-ঠাকুর্দার এই পেশাকে চোড়কু ঘাসি, লারাণ মাছুয়ার, বলিরাম ঘাসি, রাধেশ্যাম গড়াৎ, পান্ডু ঘাসি, ভভ ঘাসিরা সাদরে গ্রহণ করে একসময় অনায়াসে জীবন অতিবাহিত করতো। ঢাউস আদিম ফুঁকযন্ত্রটি উর্ধ্বমুখী বাজিয়ে স্বর্গের দেবতাদের আগাম জানান দেওয়ার রীতিতে ঘাসিদের দুমুঠো অন্নের জোগান হত। সময়ের স্রোতে সবকিছুই পরিবর্তনশীল। আধুনিক বিশ্বায়ন ও সংস্কারমুক্ত মানুষের মানসিকতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই নিরীহ উচ্চাশাহীন মানুষগুলির জীবনে ঘনিয়ে আসে জীবন ও জীবিকার প্রবল সংকট। এদের দুর্বিষহ জীবনের সূত্র ধরেই এসেছে যুগ যুগ ধরে চলে আসা রাঢ়ভূমি পুরুলিয়ার খরা, অজন্মা, আকালের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়; যাতে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি ঘাসিদের জীবন দুর্বিষহ, ভয়ংকর ও মর্মস্পর্শী আকার ধারণ করে।
সূচক শব্দঃ মদনভেরি, চোড়কু ঘাসি, রাঢ়ভূমি, জীবিকার সংকট, দুর্বিষহ জীবন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

মূল আলোচনাঃ

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলাসাহিত্যের আধুনিকতম ফসল কথাসাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছে। কালক্রমে বর্তমানে বাংলাসাহিত্যের জনপ্রিয়তম শাখায় পরিণত হয়েছে কথাসাহিত্য। এই শাখার উল্লেখযোগ্য ধারা হল উপন্যাস। এই ধারার মধ্যে 'নিম্নবর্গ' ধারণাটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠির দেশ' উপন্যাসে। তবে বিশ শতকের আটের দশক থেকে বাংলাসাহিত্যে 'নিম্নবর্গ'

চিন্তাচেতনার সূত্রপাত। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে 'Subaltern Studies' আটখণ্ডে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে নিম্নবর্গীয় ধারণাটি বাংলাসাহিত্যে চর্চার বৃহত্তর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। আধুনিক মার্ক্সবাদী দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামসি জীবনপ্রণালী চর্চার প্রথম পথপ্রদর্শক। এই ধারণাটিকে সমাজতত্ত্ববিদ রণজিৎ গুহ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ভদ্র, জ্ঞানেন্দ্র সিং, গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সবিস্তারে এর প্রাসঙ্গিকতাকে ব্যাখ্যা করেছেন।

সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যচর্চার অন্যতম বিষয় হল প্রান্তিক মানুষের জীবনকথা তুলে ধরা। সমাজসচেতন, বাস্তববাদী লেখক সৈকত রক্ষিত সাহিত্যচর্চার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন পুরুলিয়া-মানভূম অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনের বহু বিচিত্র কাহিনি। আর এই কাহিনিই তাঁর উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর এই শ্রেণির উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'জয়কাব্য', 'মদনভেরি', 'বৈশম্পায়ন কহিলেন', 'হাড়িক', 'স্তিমিত রণতূর্য', 'সিরকাবাদ', 'কুশকারাত' প্রভৃতি। সৈকত রক্ষিতের একেকটি উপন্যাসে একেক ধরণের পেশার মানুষের জীবনসংগ্রামের কাহিনি ভাষারূপ পেয়েছে। এই ধারারই তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'মদনভেরি'(২০২০) উপন্যাস। পুরুলিয়ার অচেনা-অজানা ভূখন্ডের বিলুপ্তপ্রায় জাতি ঘাসিদের জীবনকথা 'মদনভেরি' উপন্যাসে উপজীব্য হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন-----

"গ্রামীণ মানুষের লোকাচারের মধ্যে এই ভেরি বাজিয়ে ঘাসিদের একটা ভূমিকা রয়ে গেছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে ভূমিকা তাদের মদনভেরির। যে ভেরির সঙ্গে, ভেরির ধ্বনির সঙ্গে জন্ম ও মৃত্যুর অদৃশ্য সংযোগ রয়েছে বলে এবং বংশপরম্পরায় তারা এই বৃত্তিকে বহন করে চলেছে বলে, তাদের জীবনযাপন হয়ে উঠেছে সরল, মুগ্ধতাহীন এবং হীনম্মন্যতাপূর্ণ।"(১)

বংশপরম্পরায় ভেরি বাজিয়ে মানুষের জন্ম-মৃত্যু কিংবা আনন্দানুষ্ঠানের সময় স্বর্গের উদ্দেশ্যে দেবতাদের বার্তা দেওয়াই ঘাসিদের মূল কাজ। তাই তারা এ বিষয়ে অন্য কোন অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে না। আবির্ভাব ও তিরোধানের বার্তা দেওয়ার মাধ্যমেই নিজেদের জীবিকাকে টিকিয়ে রাখতে তারা বদ্ধপরিকর। আর এর বিনিময়ে গৃহস্বামীর কাছ থেকে সামান্য খাদ্যসামগ্রী অথবা একটি নতুন বস্ত্র পারিশ্রমিক হিসেবে পায়। ঘাসিদের এই জীবনসংগ্রামের কথাকে সৈকত রক্ষিত বাস্তবোচিত ভাব ও ভাষায় 'মদনভেরি' উপন্যাসে ভাষারূপ দিয়েছেন।

চোড়কু, বলিরাম, লারাণ, পান্ডু প্রমুখ ঘাসিদের ভেরি বাজানোর জীবিকা নিয়ে যতই নিজেদের গর্ব হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবন দুর্বিষহ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। অনেকসময় দারিদ্র্য ও অনাহারে তাদের জীবন নির্বাহের পথগুলি রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এই করুণ পরিণতি থেকে তারা সহজে মুক্তি পায় না। অভুক্ত স্ত্রী-সন্তানদের নির্লিপ্ত ও নির্জীব অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে চোড়কু ঘাসি দিশাহীন হয়ে

পড়ে। পারিবারিক এই অনটনের মধ্যেও চোড়কু নিজেকে ঝুমুর গানের শ্রেষ্ঠ গায়ক মনে করে। কিন্তু চোড়কুর প্রেমলীলার ঝুমুর গান স্ত্রী সমবারী সর্বসমক্ষে শুনতে সংকোচবোধ ও দ্বিধাবোধ করে। দুর্ভিক্ষপীড়িত সমবারী চোড়কুর ঝুমুর গানের শিল্পী সত্তা নিয়ে গর্ববোধ করে। চোড়কুর ঝুমুর গান শিক্ষা প্রসঙ্গে উপন্যাসে ঔপন্যাসিক দার্শনিকতার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন-----

" 'কালির আখর' বলতে বিদ্যা। সে বিদ্যা অবশ্য চোড়কুরও নেই। সে লেখাপড়া জানে না। অক্ষরের সঙ্গে তার কোন পরিচয় হয়নি। তাহলেও তার ঝুমুর শুনলে যে-কেউ বলতে পারে প্রকৃত বিদ্যার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে। বিদ্যা তো অক্ষরে থাকে না। যথার্থ বিদ্যা বা জ্ঞানের প্রকাশ হল মনের সংবেদনশীলতায়, মানুষ-পরিবেশ ও প্রকৃতিতে নিজেকে বিলীন করার মধ্যে। চোড়কুর মধ্যে এটা আছে বলে তার ঝুমুরে ভাব-রস-আবেগ ও বক্তব্যের গহিনতা রয়েছে।"(২)

মানুষের সৃজনশীলতাই আসল শিক্ষা বা বিদ্যা। চোড়কু একজন গ্রাম্য, অশিক্ষিত, সামান্য ভেরিবাদক হলেও তার সুরেলি ঝুমুর গানের ভাবাবেগ শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। এখানেই তার বিদ্যা-শিক্ষার উৎকর্ষতাকে লেখক উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। শত অভাব সত্ত্বেও চোড়কুর এই সুপ্ত প্রতিভার বিকাশকে সচেতন ও দার্শনিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ লেখক সৈকত রক্ষিত প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে উপন্যাসে ভাষাদান করেছেন।

আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে ঘাসিদের পেশা প্রায় বিলুপ্ত। কারণ সংস্কারাচ্ছন্ন জীবন থেকে মানুষ বর্তমানে বহুলাংশে বিজ্ঞান ভাবনায় ভাবিত। তাই অলৌকিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত মদনভেরি বাজানোর বিষয়টি বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে; সেই সঙ্গে এক প্রজাতির মানুষের জীবন ও জীবিকা ঘোর সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে। তাদের বহু প্রজন্মের পেশা নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। পারিবারিক দৈন্যদশা নির্মূলের জন্য অনেকেই কৃষিকাজ, ঘরামি, মুনিশের কাজ করে। কিন্তু এই দারিদ্র্যজনিত অভাব-অনটনের আবর্তে থাকলেও বিভিন্ন পরব-অনুষ্ঠানে ঘাসিদের দমিয়ে রাখা যায় না। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন-----

"মানভূম অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে চলে নানান পরব-তিহার। নানান আসর। গাজন-ভগতা তো আছেই, সেইসঙ্গে ছোনাচ, খেমটি নাচ, মুরুগ লড়াই। কোথাও আসর বসেছে, কোথাও মহলা চলছে। সন্ধ্যে হতে-না-হতে দূরবর্তী গ্রাম থেকে মহুয়ার গন্ধের মতো বাতাসের হেলকে হেলকে আসতে থাকে ডুম-ডুম-ডুম-ডুম বাজনার ধ্বনি।"(৩)

মাঠে-ময়দানে পলাশ ফুলের বাহারি সৌন্দর্যের সঙ্গে মানভূম-পুরুলিয়া অঞ্চলে বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠান ও পরবে সামিল হয় ঘাসিরা। সাংসারিক দুর্দশার কথা ভুলে গিয়ে মেতে ওঠে বিনোদনের আখড়াতে। সাময়িকভাবে খাদ্যাভাবের চিন্তা মাথা থেকে সরলেও উল্লাসমুখর জীবন তাদের জীবনের বহু যোজন দূরে থাকে।

পান্ডু ঘাসি, চোড়কু, গতিককিষ্ণ, বলিরামদের পেশাগত সংকট থেকে অন্য পেশায় যুক্ত হওয়ার ফলে সাংসারিক দৈন্যতা কিছুটা ঘুচলেও খরা, অজন্মা ও আকালের কারণে চাষবাষের অবস্থাও খুব শোচনীয়। প্রত্যেক মানুষ বৃষ্টির প্রার্থনায় বিধাতার দিকে তাকিয়ে থাকে। গ্রামের সাধারণ ছোট দোকানদারদের দোকানে ঝাঁপ পড়ে গেছে বিক্রি-বাটা না হওয়ার জন্য। ভভ ঘাসির ফরেস্ট মোড়ের কাজও চলে গেছে চারিদকে অনটনের জন্য। কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ের অনুষ্ঠান বা যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র দুমুঠো খাবারের আশায় ঘাসি সম্প্রদায়ের মানুষ যেকোনো কাজ করতে দ্বিধা করে না। অভাবের তাড়নায় নিজেদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য তারা সবকিছু করতে রাজি। এ প্রসঙ্গে অনিল ঘড়াই-এর 'অনন্ত দ্রাঘিমা'(২০০৯) উপন্যাসের এ মন্তব্য উল্লেখযোগ্য-----

"দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের দিকে তাকিয়ে মুখ হা হয়ে যায় রঘুনাথের, দুলালকে নাড়া দিয়ে সে বলে, কাকা, চারধারে এত জমিন অথচ আমাদের এককাটা চাষের জমিন নেই গো! সব জমিন বাবুরা দখল করে নিয়েছে। আমাদের জমিতে আমরা এখুন দিনমজুর। আমাদের দুবেলা মাড়ভাত জোটে না।"(৪)

দুলাল, রঘুনাথদের মতো মানুষদের জমি দখলের বিষয়টি চোড়কু, পাণ্ডুদের জীবনে আসেনি; কিন্তু প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে দুলালদের মতোই চোড়কুরা নিঃস্ব হয়ে প্রান্তিক বিলুপ্তপ্রায় জাতিতে পরিণত হয়েছে।

সৈকত রক্ষিত পুরুলিয়া জেলার ভূমিপুত্র হওয়ায় এ অঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার শরিক ছিলেন দীর্ঘদিন। তাই চাপাইটাঁড় অঞ্চলের ঘাসিদের জীবনযন্ত্রণার ছবির সঙ্গে মুদি, মাহাতো, ভূমিজ প্রভৃতি মানুষের জীবনকথাকেও 'মদনভেরি' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। ঝুমুর গান, টুসু গানের মতো বহু লোকিক গান ও লৌকিক প্রথা এ অঞ্চলে প্রচলিত। খাওয়া-দাওয়া, রান্না-বান্নাসহ নানান সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে লৌকিকতার পরিচয় মেলে। মুদি, ভূমিজ, মাহাতোদের সমাজে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'সাঙ্গা' অর্থাৎ জাঁকজমকহীন বিবাহ প্রথার প্রচলন রয়েছে। বর্তমানে এই আদিম প্রথাটি নিয়ে অনেকেই তামাশা করলেও সমাজ থেকে এটি লুপ্ত হয়ে যায়নি। এই 'সাঙ্গা' নিয়ে মানভূম-পুরুলিয়া অঞ্চলে বহু ঝুমুর গানের প্রচলন রয়েছে। যেমন---

"আলতা-সিদুরে রাঙা
বিহা ছাইড়ে করব সাঙা
দেখি কেমন খাটে কি না খাটে—
খাটে হে
বতরে পিরিতি-ফুল ফুটে......."(৫)

এই গানের মধ্য দিয়ে একটি সামাজিক রীতির বর্ণনা পাওয়া গেলেও দারিদ্র্যপীড়িত ঘাসিদের জীবন ও জীবিকার অনুষঙ্গ এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে শত অনটন সত্ত্বেও ঘাসিরা নিজেদেরকে সামাজিক বিনোদন থেকে কখনোই বঞ্চিত করেনি। এমনকি চোড়কুর ঝুমুর চর্চা প্রান্তিক সমাজে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য বহন করে।

রাঢ়বঙ্গের নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা খরা ও অজন্মা। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ দিশেহারা হয়ে দেশান্তরি হয়েছে অন্য জীবিকার সন্ধানে। চোড়কু ঘাসি এই বিপর্যয়ের হাত থেকে তার পরিবারকে মুক্তি দিতে পারেনি। তার নিজের জীবন যেখানে বিপন্ন; সেখানে চারটি সন্তানসহ স্ত্রীকে কিভাবে রক্ষা করবে এই দুর্ভিক্ষের দিনে। তাই সে সপরিবারে মদনভেরি হাতে নিয়ে গোয়াই নদীর তীর বেয়ে হরিজন গ্রামে রুটি-রুজির সন্ধানে গমন করে। তখন তার ঝুমুর গানের শিল্পীসত্তা, তার দুঃসাহসিকতা ও কল্পনার জগৎ মুহূর্তেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আর নতুন করে চোড়কুর মনে জন্ম নেয় নতুন আবেগের; যেখানে তার ক্ষুধার্ত সন্তানদের দুমুঠো অন্ন জোগানের সুগভীর চিন্তা। এ প্রসঙ্গে অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'লবণাক্ত'(২০২২) উপন্যাসের এ কথাগুলি উল্লেখযোগ্য----

"তল্পিতল্পা নিয়ে প্রতি বছর লবণের মরসুমের গোড়ায় তারা যখন লবণের খেতি করতে রণে চলে আসে, প্রথম কাজ হল, মাথার উপর যেমন-তেমন করে একটা ঝোপড়ি ঘর তোলা। ......বর্ষার মরসুম কখন আরম্ভ, কখন শেষ তার উপর অনেকটা নির্ভর করে আসার সময়, এবার দেরিতেই গিয়েছে বর্ষা। ঘর তুলে সংসারের জিনিস গুছিয়ে নিয়ে তারপর লবণজলের কূপ খোঁড়া।"(৬)

মালতী-বিষ্ণুরামরা নিজেদের পরিজন ছেড়ে অভাবগ্রস্ত অবস্থা থেকে পাওয়ার জন্য বছরের আটমাস লবণ শ্রমিক হিসেবে খারাগোড়া গ্রামে কাজ করে। চোড়কু ঘাসিও অভুক্ত পরিজনদের রক্ষার তাগিদে হরিজন গ্রামে কাজের সন্ধানে ছুটেছে। বহু প্রতিকূলতার মধ্যে মালতী-বিষ্ণুরামরা পারিবারিক স্বচ্ছলতা ফেরানোর জন্য মরিয়া প্রয়াস চালিয়ে গেছে গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহের মধ্যেও। ভেরি বাজানো পেশা থেকে বিচ্যুত হয়ে চোড়কুও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হলেও আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষপীড়িত ঘাসিরা জীবিকার সংকটের আবর্তে আটকে পড়ে। তাই জাত-বৃত্তি ছেড়ে তারা কৃষিকাজ বা ঘরামির কাজকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। অনেকে আবার কুলিমজুর ও দিনমজুরের কাজ করে দিনযাপন করে। ঘাসিরা মনে করে তাদের এমন শোচনীয় অবস্থার জন্য সমাজের মানুষের সংস্কারমুক্ত হওয়ার কারণে হয়নি; মানুষের প্রত্যাশায় প্রহর গোনা চোড়কুদের মনে হয়েছে যমরাজ হয়তো মানুষের মৃত্যু চাইছেন না, তাই মানুষের আয়ু ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এই অদ্ভুত যুক্তি ও বিশ্বাসের আড়ালে ঘাসি সমাজের অসহায়ত্ব ও নিঃস্বতার ছবি প্রকট হয়েছে উপন্যাসে। লেখকের কথায়-----

"যে মানুষ শয্যাগত মর-মর, দিনের পর দিন রোগে গোহৈলছে, তার শিয়রে খাতা কলম হাতে নিয়ে ধর্মরাজের দূত দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। সে যে কবে মরবে তার নিশ্চয়তা নেই। বাধ্য হয়ে সেই দূরে চোখে ঘুম আসায় এককেবার আলিসে ঢুলে পড়ছে। কি কাণ্ড! এদিকে ঘাসিরা হা-হুতাশ করছে। তারা ভয় পাচ্ছে। কি যে হবে! মানুষের আয়ু দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। সেইসঙ্গে ভাঙন ধরেছে তাদের ধর্মপ্রাণতায় এবং সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতায়।"(৭)

জন্ম-মৃত্যু বিধাতার লিখন----এমন বিশ্বাস ও সংস্কার হিন্দু সমাজে প্রচলিত। কিন্তু তবুও মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য তার পরিজনরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আর ঘাসিরা মানুষের প্রাণের বিনিময়ে তাদের প্রাণ বাঁচানোর রসদ খোঁজার চেষ্টা করে। তাই সংস্কারমুক্ত মানুষের জীবনপ্রবাহকে তারা ভালো চোখে দেখেনি। আর লেখক যমরাজ ও চিত্রগুপ্তের প্রসঙ্গ এনে কৌশলে পৌরাণিক ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সৈকত রক্ষিতের সমাজমনস্কতা ও বাস্তববাদীতার পরিচয় পাই এই অনুষঙ্গের মধ্যে।

দেশ-কালের গণ্ডিতে মানুষের সমগ্র জীবন, শিল্প ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়। সাহিত্য হল দেশ-কাল, সমাজের দর্পণ। এই দর্পণে সমাজের বিচিত্র রূপ প্রতিভাত হয়। ঊনিশ শতক থেকে পরিপূর্ণভবে কৃষক, শ্রমিক ও অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনচিত্র বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। যদিও এর পূর্বে চর্যাপদ ও মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারায় প্রান্তিক মানুষের জীবনকথা উপজীব্য হয়ে উঠেছে। একবিংশ শতকের আধুনিক মনস্ক লেখকদের লেখনীতেও ফুটে উঠেছে প্রান্তিক মানুষের জীবনালেখ্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘাসিদের বসতভূমি ও জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড খাদ্যাভাব থেকে নিষ্কৃতি পেতে তৃষ্ণার্ত আর্তপ্রাণ ঘাসিরা সপরিবারে ছুটে চলেছে দূরবর্তী কোনো ডিহির উদ্দেশ্যে; যেখানে গিয়ে মদনভেরি বাজালে তাদের একমুঠো অন্ন জুটবে। প্রচণ্ড আশা ও উদ্যম নিয়ে কাঁধে মদনভেরি ঝুলিয়ে অজানা অন্তহীন যাত্রায় সামিল হয়েছে চোড়কুরা। আধুনিক মনস্ক, নিম্নবর্গের কথাকার, পুরুলিয়ার লোকভাষার সমীক্ষক সৈকত রক্ষিত খরা, অজন্মা, আকাল কবলিত পুরুলিয়া জেলার বিলুপ্তপ্রায় বিপন্ন জাতি ঘাসিদের দুর্বিষহ, ভয়ংকর ও মর্মস্পর্শী জীবনসংকটকে 'মদনভেরি'(২০২০) উপন্যাসে সাহিত্যরূপ দিয়েছেন।

তথ্যসূত্রঃ

(১) সৈকত রক্ষিত, 'মদনভেরি', বিগ বুকস, ২৭ জি কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ ২০২০, পৃ- ১৪

(২) তদেব, পৃ- ৩১

(৩) তদেব, পৃ- ৪৬

(৪) অনিল ঘড়াই, 'অনন্ত দ্রাঘিমা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণঃ ডিসেম্বর ২০১৭, অগ্রহায়ণ ১৪২৪, পৃ- ৩৯০

(৫) সৈকত রক্ষিত, 'মদনভেরি', বিগ বুকস, ২৭ জি কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ ২০২০, পৃ- ১১৫

(৬) অনিতা অগ্নিহোত্রী, 'লবণাক্ত', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ফাল্গুন ১৪২৮, পৃ- ১০

(৭) সৈকত রক্ষিত, 'মদনভেরি', বিগ বুকস, ২৭ জি কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ ২০২০, পৃ- ১২৮

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাঃ

(১) ডঃ সুবোধ দেবসেন, 'বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্য সমাজ', পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা-৯, ১৪ এপ্রিল, ২০১২

(২) গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ২৬, দশম মুদ্রণঃ ফেব্রুয়ারি ২০২২

(৩) রাকেশ মন্ডল, 'সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে মানুষের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম', সমকালের জীয়নকাঠি প্রকাশন, জীবন মন্ডল হাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, প্রথম প্রকাশঃ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

(৪) শঙ্করী দাস সম্পাদিত, 'সময় তোমাকে', 'একটি বাৎসরিক চড়ুইপত্র', বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ ২, ১৩ তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৪২৭/২০২০

বৈষ্ণব পদাবলীর এক ভিন্ন স্বর : লোচনদাসের গৌরনাগরীভাবের পদাবলী

দেবাঞ্জনা দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মঞ্জরী ভাবের সাধনায় সাধককে যখন একান্ত ভাবেই রাগানুগা পথের অনুসরণ করতে বলা হয়েছিল, তখন শ্রীখণ্ডের গৌর নাগরবাদীদের রাগাত্মিকা দর্শন এই সম্প্রদায়ের যেন একটা অন্যতর পরিচিতি নির্মাণ করে দিয়েছিল। গৌর নাগরবাদের বিশিষ্টতা এই যে, সেখানে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসকে অগ্রাহ্য করে প্রধানত তাঁকেই একমাত্র পুরুষ এবং অন্যান্য সকলকে তাঁর প্রেম পিপাসু নারী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ---"পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কাঁদিয়া বিকল গো রমণী কেমনে প্রাণ বাঁধে"। বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যান্য পদকর্তাদের চেয়ে নাগরীভাবের পদকর্তা লোচনদাসের পদ তাই তাঁর সাধনার পদ্ধতি ও বিশেষ সাধন আঙ্গিকের জন্য এক ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর পদে সাধারণভাবে কেন্দ্রে রয়েছেন রাধা ও কৃষ্ণ। মঞ্জরী ভাবের সাধনায় উপাস্য ও উপাসকের সম্পর্কে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব। সেই দূরত্বের প্রভাব পড়েছে তাঁদের পদেও। লোচনদাসের পদে গৌরাঙ্গ হলেন স্বয়ং নাগর। তিনি নবদ্বীপের নারীদের কাছে প্রেমাস্পদ। তাই ঈশ্বর উপাসনার বা আরাধনার দূরত্বে নয়, চৈতন্য এখানে অনেক বেশি করে তাঁর মানব স্বভাব নিয়ে অভিব্যক্ত। পদগুলিও হয়ে উঠেছে অনেক বেশি মানবিক।

বৈষ্ণব পদাবলী যে বিষয়গত বৈচিত্রহীনতা ও একঘেয়েমি দোষে দুষ্ট, লোচনের গৌর নাগরী ভাবের পদগুলির নিবিড় বিশ্লেষণ সেই সমালোচনাকে অনেকটাই ভাঙতে সক্ষম। তাঁর পদের নায়িকা রাধার মতো কোনো একজন নির্দিষ্ট নারী নন। অসংখ্য নদীয়া নাগরীর অনুভূতির জগৎ উন্মুক্ত হয়েছে লোচনের পদে।

লোচনের পদগুলি ব্যতিক্রম এই কারণেও যে, মেয়েদের অনুভূতি প্রকাশের জন্য মাধ্যম হিসেবে তিনি ব্যবহার করলেন মেয়েদেরই মুখের ভাষা, 'মেয়েলি ছন্দ'ও। এই বিশিষ্ট আঙ্গিকের প্রচলন লোচনের পদে এনেছে এক ভিন্ন স্বাদ।

এসবের পাশাপাশি লোচনদাসের পদ অনেক সময়ই অশ্লীলতার দোষে অভিযুক্ত। তাঁর নাগরী ভাবের পদের বিষয়েই গৌরাঙ্গের প্রতি, অর্থাৎ একজন পুরুষের প্রতি অসংখ্য নারীর আকর্ষণ, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীভূত। এমন নিবিড় মানবিক অনুভূতির প্রকাশ এবং প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে লৌকিক আঙ্গিকের প্রচলন, তাঁর শব্দ চয়ন, ভাষা প্রয়োগ, ছন্দ চাপল্য যেমন তাঁর পদে যোগ করেছে স্বকীয়তা, তেমনই এনেছে অশ্লীলতার দায়ও। প্রস্তাবিত নিবন্ধে লোচনদাসের গৌর নাগরী ভাবের পদের

নিবিড় বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে, শ্লীলতা ও অশ্লীলতার সীমানা পেরিয়ে মানবিকতা ও প্রেম মনস্তত্ত্বের আধুনিক বয়ানে লোচনদাসের পদ শিল্প ও রসসম্মত হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা এবং পদাবলী সাহিত্যে কিভাবে তা হয়ে উঠেছে এক ভিন্নতর স্বর।

প্রস্তাবনা

চৈতন্যের সমকালে তাঁকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত তত্ত্ব তৈরি হয়েছিল, পরবর্তীকালে তার মধ্যে সব চেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছে 'গৌরনাগরবাদ'। বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্য ভাগবত' এ লিখেছেন...

" 'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণো না করিলা বিদিত সংসারে।।
অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গ-নাগর' হেন স্তব নাহি বোলে।।"[১]

রমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম' গ্রন্থে লিখেছেন "চৈতন্যের নামে যে কিরূপ অসামাজিক ভাবধারা প্রচলিত হয়েছিল, তা শ্রীখণ্ডের 'গৌরনাগরবাদ' সামান্যভাবে আলোচনা করলেও স্পষ্ট হয়।"[২] শ্রীখণ্ডের এই 'গৌরনাগরবাদ' তত্ত্বের প্রবক্তা চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলার পার্ষদ নরহরি সরকার। তবে বিস্ময়করভাবে তাঁর শিষ্য লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য ব্যতীত কোনো চৈতন্য জীবনীতেই নরহরি তেমন গুরুত্ব পাননি। এর পেছনে অবশ্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কারণের কথা উল্লেখ করেছেন চৈতন্য গবেষকেরা। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে "শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার চৈতন্যদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য লোচনদাস ভিন্ন অন্য চরিতকাররা তাঁকে একরকম উপেক্ষা করেছেন। তার কারণ তিনি অন্য ভক্তদের সাধন প্রণালী গ্রহণ না করে 'গৌরনাগরবাদে'র প্রবর্তন করেন।"[৩] শ্রীখণ্ডের এই ভিন্ন সাধন পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ করে ডঃ সত্যবতী গিরি লিখেছেন "বৈষ্ণবদের মধ্যে সুপরিচিত এই শ্রীখণ্ড সম্প্রদায় গোপাল মন্ত্রের পরিবর্তে গৌর মন্ত্রে শিষ্যদের দীক্ষা দিতেন।"[৪] শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব সম্প্রদায় বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত হলেও নরহরির শিষ্য লোচন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বহুল চর্চিত কবি নন। যেটুকু চর্চার আলোকে এসেছে তা তাঁর চৈতন্য জীবনী কাব্য 'চৈতন্যমঙ্গল'। কিন্তু পদাবলীর লোচনদাস সেই গৌরবের অধিকারী নন। লোচনের গৌরব 'চৈতন্যমঙ্গল'এর রচয়িতা হিসেবেই। তাই লোচনদাসের পদাবলী যে অন্যান্য পদকর্তাদের পদাবলী থেকে ভিন্ন খাতে বয়ে গেল তার যথার্থ মূল্যায়ন আজও বাকি রয়ে গেছে।

কবির নিজস্ব স্বর বা 'কবি ভাষা' নির্ভর করে কবি কি লিখছেন ও কেমনভাবে তা লিখছেন তার উপর। এই দুটি ক্ষেত্রেই লোচনের কবিস্বাতন্ত্র্য রয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের যে মূল ধারা সেই রাগানুগা সাধনের পদ্ধতিকে এড়িয়ে

গৌরাঙ্গকে নাগর ভেবে, তাকে প্রেমিক পুরুষ হিসেবে নির্মাণ করে কখনো কবি নিজেই হয়ে উঠলেন নাগরী। কখনো বা নদীয়ার রমণীদের মনের কথা ভাগ করে নেওয়ার সঙ্গিনী। নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে "নদীয়া-নাগর সাধন ধারার মধ্যে একটি বিশেষ সাহিত্যিক ও রোমান্টিক উপাদান ছিল।"এই যে 'বিশেষ সাহিত্যিক ও রোমাণ্টিক উপাদান" তা-ই লোচনের পদাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য, এই প্রবন্ধে তাকেই 'বৈষ্ণব পদাবলীর ভিন্ন স্বর' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর অতিরিক্ত লোচনের পদে যে বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ তাকে সেকালের 'মেয়েলী' বুলির সরসতা দান করেছে, তা পদাবলী সাহিত্যের আসরে বিরল না হলেও কিছুটা ব্যতিক্রমীতো বটেই। নারী কণ্ঠস্বরের এই বিশেষ উচ্চারণ লোচনের পদাবলীতে আক্ষরিক অর্থেই যোগ করেছে এক ভিন্ন স্বর।

১

বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস রাধার জবানীতে লেখা পদে সরল নারী মুখের বুলি ব্যবহার করেছেন। এই বুলির ব্যবহার পদাবলীর ভাবকে সরল এবং অনুভূতিপ্রবণ করে তুলেছে। কিন্তু সাহিত্যের তথাকথিত 'শ্লীলতা' এবং শিষ্ট রুচির বাঁধা নিয়ম ভেঙে কেবলমাত্র ভাব প্রকাশের স্বার্থে সেকালের নারীর মুখের বুলি এমন অসংকোচে উদার ও প্রত্যক্ষভাবে পদাবলীতে প্রয়োগ করার সাহস লোচনদাস ছাড়া আর কেউ দেখিয়েছেন বলে জানা নেই। এই বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখ করা চলে সুকুমার সেনের মন্তব্য "ত্রিপদীর বেষ্টনীতে ছড়ার নৃত্যচপলতা বাঁধা পড়িল। যেমন লোচনের 'ঢামালী'পদাবলীতে।... তবে এই ছন্দের মেয়েলি সুর ও খেয়ালি চাল বৈষ্ণব কবি সমাজের বাহিরে শিষ্ট রচনায় সমাদর পায় নাই।"[৫] বৈষ্ণব সমাজেও খুব স্বল্প পরিসরেই এই কাব্যভাষার প্রচলন ছিল।

লোচনদাসের পদাবলীর বিশিষ্ট উপস্থাপন শৈলী গড়ে উঠেছে একাধারে মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আত্মসাৎ করে, আবার সরাসরি মেয়েদের মুখের ভাষাকে ব্যবহার করে। যেমন...

"সইলো সইলো গোরা কেনে না যায় পাসরা।
গোরা রূপে মন মজিল বাউলিনীর পারা।।"[৬]

অথবা

"এলোচন বলে আলো দিদি শুন হিয়াটি কর লো দড়।
পরের নাগরে পরান সুঁপিলে কলঙ্ক হইবে বড়।।"[৭]

অথবা

"লোচন বলে হ্যাদে ওলো নদের নাগরী যত।
গৌর প্রেমে বাঁধা গেলে এ জনমের মত।।"[৮]

উপরের উদাহরণগুলোতে সম্বোধন, এবং বক্তব্যের সরস উপস্থাপন পদ্ধতি সহজেই নারী ব্যবহৃত বুলিকে মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া শব্দ দ্বিত্বের ব্যবহার বা দ্বিরুক্তি করার

প্রবণতা, শ্বাসাঘাতের অধিক প্রয়োগ বা কোনো কিছুর জোর দিয়ে বলার চেষ্টা লোচনের পদাবলীতে মেয়েলি বুলিকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। নিচের উদাহরণগুলো থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

"মনু মনু মনু গো সখী হেরিয়া গৌরাঙ্গ রূপে।
সাধ হয় হেন কনে হই পুনঃ এ বরে দি সব সুঁপে।।"[৯]

অথবা

"চাঁদ নয় ফাঁদ নয় হৃদয় কাটা ছুরি।
আকাশের চাঁদ কেন গো মন করিবে চুরি।
ডর আর নাই সই ডর আর নাই।
বুক স্থির করি সবে রহ এক ঠাঁই।।"[১০]

লোচনের পদাবলীতে লৌকিক ছন্দের ব্যবহার এবং কথ্য বুলির নিঃসংকোচ প্রয়োগ কি শুধুই লোচনের ভৌগোলিক পরিচয়কেই সূচিত করে, নাকি 'গৌরনাগরবাদ' দর্শনকে গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যাপকতা দানের প্রেরণা থেকেই তিনি সচেতন ভাবে এই কাব্য ভাষা ব্যবহার ও নির্মাণ করেছেন,এই প্রশ্নটি নিশ্চয়ই ভেবে দেখার মতো।

২

লোচনের কাব্যভাষা সরল, সহজবোধ্য ও সাবলীল হওয়া সত্ত্বেও মূল ধারার বৈষ্ণব সাহিত্যে তা যে স্থান করে নিতে পারল না তার অন্যতম প্রধান কারণ লোচন গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বৃন্দাবনী ভাষ্যের অনুসারী ছিলেন না। জ্ঞানদাস,গোবিন্দদাস, বলরামদাসের মত প্রথম সারির বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে লোচনদাসও উপস্থিত ছিলেন খেতুরির মহোৎসবে। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী এই তথ্য জানিয়েছেন।[১১] এই গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি সত্ত্বেও লোচনের পদাবলী মূল ধারার বৈষ্ণব সাহিত্যে অপ্রচলিত হয়েছে তার বিষয়বস্তু ও উপস্থাপন রীতির বিশিষ্টতার জন্যই।

একদিকে রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণ স্বরূপ গৌরাঙ্গ, অন্যদিকে রমণী মনোহর নদীয়া নাগর গোরা রায়। এই দুই বিপরীত ছবির দ্বিতীয়টি বেছে নিয়েছেন শ্রীখণ্ডের নাগরবাদীরা। তাই গৌরাঙ্গের প্রতীকে মঞ্জরী ভাবের সাধনার পথ যা রাধাকৃষ্ণের মিলন কুঞ্জদ্বারের বাইরেই এসে ফুরিয়ে গেছে। সেই স্বল্প পথে তাঁরা যাত্রা করেননি। তাঁদের যাত্রা সমাজের সব কলঙ্ক আর লাঞ্ছনাকে ভূষণ করে এক অন্তহীন অভিসারে, যে পথে নাগর গোরাচাঁদ চির অধরা, কিন্তু নদীয়া নাগরী তার গৌর নাগরকে প্রত্যক্ষভাবে কামনা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত নন। অনেকটা রাগাত্মিকা ভাবের সাধনা এই 'গৌরনাগরবাদ'এর সাধনা।আর সেই কারণেই লোচনের পদেও গৌরাঙ্গ আকাঙ্ক্ষার কথা নির্দ্বিধায় উচ্চারিত হয়েছে। কখনো লোচন নিজের জবানীতে তা ব্যক্ত করেছেন, কখনো আবার নদীয়ার নাগরীদের মুখে সেই আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে নায়কের প্রতি নায়িকার প্রত্যক্ষ অনুভূতির এমন দুঃসাহসিক এবং মানবিক উপস্থিতি খুবই বিরল। এ প্রসঙ্গে লোচনের কয়েকটি প্রাসঙ্গিক পদ মনে করা যাক,

১"ঘুচিল গৃহের বাস শুন ওগো মা।
গৌর বই নয়নে আমার কিছুই হেরে না।।"[১২]
২"মন তার করে চুরি দিয়ে অনুরাগের ডুরি আনন্দ রসের নিধি গোরা।
এমন করেছে হিয়ে এ দেহ গৌরাঙ্গে দিয়ে রসের ভিখারী হব মোরা।।"[১৩]
৩"এক নাগরী বলে দিদি নাইতে যখন যাই।
ঘোমটা খুলে বদন তুলে দেখেছিলাম তাই।।
জলের ঘাট আলো করেছে গৌর অঙ্গের ছটা।
রূপ দেখিতে হুড় পড়েছে নব যুবতীর ঘটা।।
...উড় উড় করে প্রাণ রইতে নারি ঘরে।
গৌর চাঁদকে না দেখিলে প্রাণ যে কেমন করে।।"[১৪]
৪গৌরাঙ্গ রতন করিয়ে যতন মোড়াঞা লইব কোলে।
তিলাঞ্জলি দিয়া সকলই ভাসানু এ দাস লোচন বলে।।"[১৫]

এই উদাহরণগুলো থেকে স্পষ্টতই সাধক নাগরীর সাধ্য গৌরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ মিলনের আকাঙ্ক্ষাটি ব্যক্ত হয়েছে। আর ঠিক এইখানটিতেই গৌরনাগরবাদীরা বৃন্দাবনের মঞ্জরী ভাবের সাধনার ঠিক বিপরীত পথে যাত্রা করেছেন। গোপী কিংবা মঞ্জরীর মধ্যস্থতায়, উপাস্যকে একান্ত করে লাভের এই বাসনাই গৌরনাগরবাদীদেরকে অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের থেকে পৃথক করেছে।

পদাবলী সাহিত্যে লোচনদাস কতটা প্রতিভাধর কবি, তা যাচাই করতে আমরা জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পদের সাদৃশ্য আছে এমন কয়েকটি লোচনদাসের পদের উদাহরণ নিতে পারি। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে লোচনদাস তাঁর কবিকৃতির স্বাক্ষর রাখছেন একটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাবপরিমণ্ডলে।

১ "কাঁখে হইতে খসে কলসি আউলাইল গা।
বাউরিনীর পারা হইলাম না চলয়ে পা.." [১৬] ইত্যাদি

(পদটি জ্ঞানদাসের 'দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা' এর সঙ্গে তুলনীয়।)

২"মনে করি নদে যুড়ি এ দেহ বিছাই।
হিয়ার মাঝারে গোরা চাঁদেরে নাচাই।।
মনে করি নদে যুড়ি হোক মোর হিয়া
তাহাতে গৌরাঙ্গ বেড়ান পদ পসারিয়া"[১৭] ইত্যাদি।

(পদটি গোবিন্দদাসের 'যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত' এর সঙ্গে তুলনীয়)

নারী জীবনের নানান তুচ্ছ অনুষঙ্গে গৌরাঙ্গ স্মরণের অপূর্ব স্মরণোপমা ফুটে উঠেছে লোচনের পদে। হলুদ বাটার সময় হলুদ বরণ গোরা রূপ মনে পড়া কিংবা নাইতে যাওয়ার সময় হরিদ্রাভ তেলের মধ্যে নাগরীর গোরারূপ দর্শন, এমনই সব

অকিঞ্চিৎকর অথচ মর্ত্য মাটির বাস্তব অনুভবের তীব্রতা আমরা অনুভব করি লোচনদাসের পদে।

"হলুদ বাটিতে গোরী বসিল যতনে।
হলুদ বরণ গোরা চাঁদ পড়্যা গেল মনে।।"[১৮]

৩

লোচনের পদাবলীর প্রেম নিছক 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' মূলক নয়। কামনার স্পর্শ বর্জিত তথাকথিত 'শুদ্ধ প্রেম' এর সাধনা তিনি করেননি। মানব হৃদয়ের বাস্তব অনুভূতি যা কামনার স্পর্শেও সমান ভাবে পবিত্র, লোচন তারই সাধক। তাই স্বপ্নে গৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলন কিংবা গৌরাঙ্গের দেহজ পার্থিব রূপের বর্ণনায় লোচনের পদ গীতিময় ও বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

লোচনের পদে স্বপ্ন মিলনের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা অনেক সময়ই তথাকথিত 'শ্লীলতা'র যে মাত্রা তা অতিক্রম করে গেছে। তার পিছনে একটি কারণ বোধহয় এই যে রাধা কৃষ্ণের স্বপ্ন মিলনের যে বর্ণনা তাতে দেবত্ব আরোপ করে তাকে অনেক বেশি সহনীয় করে তোলা যায়, বৈষ্ণব রসতত্ত্বেও বারংবার বিধি সম্মত সতর্কীকরণ রয়েছে যে রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ মানস সম্ভোগ। কিন্তু লোচনের পদাবলীতে যে গৌরাঙ্গ, তিনি রক্ত মাংসের মানুষ। তার সঙ্গে মিলিত হতে চায় নবদ্বীপের নাগরীরা। তাই এই মিলন বর্ণনা অনেক বেশি প্রত্যক্ষ, পাঠক অধিগম্য হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়। বৃন্দাবন দাসের "স্ত্রী হেন নাম" না শোনা গৌরাঙ্গ কিন্তু লোচনের পদাবলীতে নাগরীদের কটাক্ষে সাড়া দেন, প্রেমালিঙ্গন দানে তাঁদের সন্তুষ্ট করেন। আবার এই নবদ্বীপের নাগরীরা কেউ বা স্বামী সহবাসে, আবার কেউ শিশুর পাশে শুয়ে গৌরাঙ্গের মিলন কামনা করেন।

"চুম্বনে চেতন পেয়ে আশেপাশে দেখি চেয়ে
পতি কোলে দেখিয়ে স্বপন।" [১৯]

আবার কখনও

"চেতন হইয়ে হাত বুলাইয়ে দেখি শিশুর পাশে গো।
না দেখে তায় (গৌরাঙ্গ)হলাম প্রাণে সারা।।"[২০]

অন্য আরেকটি উদাহরণ...

"অতি সুকোমল বচন শীতল সবারই নবীন রাগ।
নবীন বয়সে নবীন মরমে লাগিল গৌরাঙ্গ দাগ।"[২১]

দেহানুভব মিশ্রিত প্রেমানুভূতির উদাহরণ হিসেবে লোচনের এই পদাংশটি উল্লেখ করা যেতে পারে...

"লোচনদাসের চিতে গো নাগরী লোচনদাসের চিতে।
সদা আলিঙ্গিয়া গৌরাঙ্গ নাগরের অধরের সুধা পিতে।।"[২২]

ষোড়শ শতকের এক কবির কাছে এ যথেষ্ট সাহসী উচ্চারণ। শিশু সন্তানের মায়ের পক্ষে চৈতন্য লিপ্সা বৈষ্ণব পদাবলীতে এক অভিনব সংযোজন। গৌরনাগরবাদীদের কাছে চৈতন্য কোনো নারী সঙ্গ পরিহারী, নারী নাম না শ্রবণকারী, মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী নন, তাঁর 'দীঘল দীঘল চাঁচড় চুল', 'চন্দন মাখা গোরা গা', 'সোনার দর্পণ জিনি বুক', 'সরুয়া কাঁকালি', 'গুরুয়া নিতম্ব', 'সরুয়া বসন'। তাই যখন

> "সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহরি এ ডোর কৌপিন পরি অকিঞ্চন বেশে গোরা রায়।
> ত্যাজিয়া সকল সুখে বিরলে বসিয়া থাকে ঘন ঘন ছাড়য়ে নিশ্বাস।।"[২৩]

তখন নাগরী লোচন গৌরাঙ্গের এমন বেশের, এমন রাধা ভাবের কোনো অর্থ খুঁজে পাননা।

উপসংহার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থের সপ্তম সংস্করণের ভূমিকায় সুকুমার সেন লিখেছেন, "মানুষের হৃদয়ের যে প্রবৃত্তি মৌলিক সেই ভালোলাগাকে চিরন্তন করিয়া ভালোবাসিবার ঈপ্সা বৈষ্ণব পদাবলীর মূল উৎস।"[২৪] তাঁর এই বক্তব্য সব থেকে সার্থক ভাবে প্রযোজ্য লোচনদাসের পদাবলীর ক্ষেত্রে। মূলধারার বৈষ্ণব পদাবলী যে কখনো কখনো বৈচিত্রহীনতা ও একঘেয়েমির অনুভূতি সৃষ্টি করে, লোচনের গৌর নাগরীভাবের পদ সেক্ষেত্রে একেবারেই ব্যতিক্রমী, বৈচিত্র্যময় এবং ভিন্ন স্বাদের। গৌরনাগরবাদের যে বিশেষ সাহিত্যিক ও রোমান্টিক উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন নির্মলেন্দু ভৌমিক,[২৫] লোচনদাসের নাগরী ভাবের পদাবলীর কাব্য ভাষায় , তার বিষয়বস্তু আর উপস্থাপনা রীতির মধ্যে দিয়ে সেই সাহিত্যিক ও রোমান্টিক উপাদান নিজেকে বিশেষ করে, স্বতন্ত্র করে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। লোচনদাসের পদাবলীও তাই হয়ে উঠেছে বৈষ্ণব পদাবলীর এক ভিন্নতর স্বর।

তথ্য সূত্র:

১. বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য ভাগবত ,বারীদ বরণ ঘোষ (সম্পাদিত), দেজ পাবলিশিং, ১৯৯৫ , পৃঃ ৮৩

২. রমাকান্ত চক্রবর্তী, বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৭ ,পৃঃ ৮৩

৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, চৈতন্যদেব জীবনী কালক্রম পরিমণ্ডল প্রিয়মণ্ডল, ডি এম লাইব্রেরী, ২০২১ ,পৃঃ ৭৩

৪. সত্যবতী গিরি, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ২৫৩

৫. সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাভেট লিমিটেড, ২০১৮, পৃঃ ২৮৯ এবং ২৯১

৬. লোচনদাস, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), নিউ বইপত্র, কলকাতা, ২০১৯ ,পৃঃ ৫২৩

৭. লোচনদাস, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), নিউ বইপত্র, কলকাতা ,২০১৯ ,পৃঃ ৫৬২

৮. লোচনদাস, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), নিউ বইপত্র, কলকাতা ,২০১৯, পৃঃ ৫৬৬

৯. লোচনদাস, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), নিউ বইপত্র, কলকাতা, ২০১৯ ,পৃঃ ৫৬২

১০. লোচনদাস, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), নিউ বইপত্র, কলকাতা ,২০১৯ ,পৃঃ ৫৭২

১১. শ্রীল নরহরি চক্রবর্তীঠাকুর বিরচিত, শ্রীশ্রী ভক্তিরত্নাকর, নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালংকার (সম্পাদিত), বরানগর পাঠবাড়ি গ্রন্থাগারে রক্ষিত, পৃঃ ৪১৯

১২. লোচনদাস, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), নিউ বইপত্র, কলকাতা, ২০১৯, পৃঃ ৫৩০

১৩. লোচনদাস, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), নিউ বইপত্র, কলকাতা, ২০১৯, পৃঃ ৫৩০

১৪. লোচনদাস, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), নিউ বইপত্র, কলকাতা, ২০১৯, পৃঃ ৫২৪

১৫. লোচনদাস, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), নিউ বইপত্র, কলকাতা, ২০১৯, পৃঃ ৫৬৩

১৬. লোচনদাস, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), নিউ বইপত্র, কলকাতা, ২০১৯, পৃঃ ৫২৪

১৭. লোচনদাস, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), নিউ বইপত্র, কলকাতা, ২০১৯ ,পৃঃ ৫৭৩

১৮. লোচনদাস, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), নিউ বইপত্র, কলকাতা ,২০১৯ ,পৃঃ ৫২৬

১৯. লোচনদাস, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), নিউ বইপত্র, কলকাতা ,২০১৯ ,পৃঃ ৫৭৬

২০. লোচনদাস, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), নিউ বইপত্র, কলকাতা, ২০১৯ ,পৃঃ ৫৭৪

২১. লোচনদাস, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), নিউ বইপত্র, কলকাতা, ২০১৯ ,পৃঃ ৫৭২

২২. লোচনদাস, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত) , নিউ বইপত্র, কলকাতা ,২০১৯ ,পৃঃ ৫৬৮

২৩. লোচনদাস, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত , নিউ বইপত্র, কলকাতা ,২০১৯ ,পৃঃ ৫৭৭

২৪. সুকুমার সেন ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র (সম্পাদিত), বৈষ্ণব পদাবলী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১১ ,পৃঃ ৬১

২৫. জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত),চৈতন্য প্রসঙ্গ, (শ্রীচৈতন্যদেব ও বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, লেখক নির্মলেন্দু ভৌমিক), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, মাঘ ১৪২১, পৃঃ ২২৪

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘শশাঙ্ক’: জাতীয়তাবোধের এক উজ্জ্বল নির্মাণ

তপন ঘোষ
সহকারী শিক্ষক, বালকী হাইস্কুল, উঃ ২৪ পরগনা

সারসংক্ষেপ: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসচর্চার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাতেও প্রত্নতত্ত্বকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠাকে তুলে ধরেছেন সদাসর্বদাই। পরাধীন দেশবাসীর স্বাধীনতাস্পৃহাকে পুষ্ট করার প্রয়াস তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে ক্রিয়াশীল। রাখালদাস ইংরেজ শক্তিকে বরাবর অপছন্দ করতেন। পরিবার থেকেই তিনি জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণায় দীক্ষিত হন। তাই দেশের জাতীয়বীর হিসাবে শশাঙ্কের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দক্ষ সমরকুশলতা ও অসম সাহসিকতায় স্বাধীন গৌড়ের উত্থানের মতো ভারতবর্ষেরও একই পরিণতি চেয়েছিলেন ঔপনিবেশিক শক্তির নাগপাশ থেকে। আলোচ্য উপন্যাসে রাখালদাস শশাঙ্ককে গুপ্তদের একজন উত্তরাধিকারী হিসাবে লুপ্তসাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছেন। শশাঙ্কের এই কীর্তিকে দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরে তাদেরকে দেশাত্মবোধে উদবুদ্ধ করার পাশাপাশি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদেরকে সামিল করতে চেয়েছেন। শশাঙ্ক উপন্যাসের ভিতর দিয়ে আসলে তিনি বাঙালীর সুপ্ত আত্মবিশ্বাস ও বাসনাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে রাখালদাসের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা ছিল মূলত ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ভারতীয় ইতিহাসচর্চার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াজনিত ফসল।

শব্দসূচক: প্রত্নতত্ত্ব, স্বাধীনতাস্পৃহা, লুপ্তসাম্রাজ্য, আত্মপরিচিতি, সার্বভৌম, ঔপনিবেশিক, সাম্রাজ্যবাদী, ক্ষাত্রধর্ম, ইতিহাসাশ্রয়ী, স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ।

মূল আলোচনা:

একজন প্রাজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাবে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস পুর্নগঠনের ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্বকে বিজ্ঞান হিসাবে দেখেছেন, তাই তাকে ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের আপোষহীন পক্ষপাতী ছিলেন। একজন ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি শুধু ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রাবলীর উপস্থাপনই করেননি, একই সঙ্গে তার ভিতরকার নিহিত সত্যকে প্রকাশ করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। ইতিহাসের নির্দিষ্ট ঘটনাকে ঔপন্যাসিক একান্ত সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত করতে বাধ্য- এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চাইতেও উল্লেখযোগ্য- বিগত যুগের রীতিনীতি, সুর ও মেজাজকে ঐতিহাসিক বা ঔপন্যাসিক তাঁর লেখায় জীবন্ত করে তুলবেন। ইতিহাসের জড় কঙ্কালকে সজীব ও সরস করে তোলবার জন্য যে ক্ষমতার প্রয়োজন সে শক্তিকে A.T. Sheppard বলেছেন- ‘Realistic imagination’, W.H. Hudson অভিহিত করেছেন

'Creative imagination' এবং প্রমথনাথ বিশী চিহ্নিত করেছেন- 'ঐতিহাসিক কল্পনা' বলে। এই ধরনের কল্পনা যে কত দুর্লভ শক্তি তা ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক মাত্রই উপলব্ধি করেন।[১]

রাখালদাসের যৌবনে স্বদেশী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সর্বগ্রাসী প্রভাব তথা স্বাধীনতার আদর্শ নতুন প্রজন্মের রাখালদাসকেও আচ্ছন্ন করেছিল পরিপূর্ণভাবে। সে যুগের অনেক ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটকের মত প্রাচীন জাতি ও ধর্মের সংঘাতের মাধ্যমে বর্তমানের স্বাধীনতাস্পৃহাকে পুষ্ট করার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস রাখালদাসের উপন্যাসেও দেখা যায়। শক, হুণ, পর্তুগীজ ও নাদির শাহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পিছনে ইংরেজবিরোধী মনোভাবের গোপন আভাস পাওয়া যায়।[২] তিনি ইংরেজ শক্তিকে বরাবরই অপছন্দ করতেন। এই অপছন্দই পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে অভিশাপ ডেকে এনেছিল। তাঁর আইনজীবী পিতা মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন গোঁড়া জাতীয়তাবাদী। পরবর্তীকালে দেশের প্রথম সারির জাতীয় নেতাদের সঙ্গে রাখালদাসের ব্যক্তিগত সখ্য গড়ে উঠেছিল। বাংলার ইতিহাস লেখার সময় তিনি ইংরাজী নন, বাংলাভাষাকেই যোগ্য ভাষা হিসাবে ভেবেছেন, যা তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবনারই প্রকাশ। এহেন রাখালদাস শশাঙ্ককে উপস্থাপিত করেছেন বাংলাদেশের একজন জাতীয়বীর হিসাবে, যার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দক্ষ সমরকুশলতা ও অসম সাহসিকতায় স্বাধীন গৌড়ের উত্থান ঘটে। স্বাভাবিকভাবে তাঁর 'শশাঙ্ক' উপন্যাসে ইতিহাসের দ্বৈত ভূমিকার কথা অনুভূত হয়। প্রথমত, গরিমাময় ও স্বাধীন অতীতের চেতনাকে উজ্জীবিত করা। দ্বিতীয়ত, এই চেতনা ও গরিমার দ্বারা আত্মপরিচিতি গঠন করে ঔপনিবেশিক প্রবল বিপদকে বিতাড়িত করা।[৩]

রাখালদাস তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রাচীনকাল থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত উত্তর ভারতের রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, সামাজিক ও শৈল্পিক ইতিহাসের প্রাঞ্জল বিবরণ দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে কালজয়ী উপন্যাস হল *'শশাঙ্ক'* (১৯১৫ বঙ্গাব্দ); যা সুচারুভাবে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর ভারতীয় রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সামাজিক চিত্র।[৪] *'শশাঙ্ক'* একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস, যা ইতিহাসের শশাঙ্ককে নিয়ে আবর্তিত হয়েছে। এই উপন্যাসে শশাঙ্ক একজন দুর্জ্ঞেয়, বিতর্কিত পুরুষ, যাঁর জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে কোন পাথুরে প্রমাণ নেই।[৫] গুপ্তসম্রাজ্যের পতনের পর এই সাম্রাজ্যেরই একটি অংশ পুনরুদ্ধার করেছিলেন 'পরবর্তী গুপ্ত বংশ' নামক বংশের গুপ্ত উপাধিধারী রাজারা। এই রাজারা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবাংলার কিছুটা অধিকার করেছিলেন; যা বাংলাদেশে 'গৌড়' নামে পরিচিতি লাভ করে। তখন বর্তমান যুক্তপ্রদেশে রাজত্বকারী মৌখরী বংশের পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন ঈষাণবর্মা। তিনি গৌড়গণকে পরাস্ত ও বিপর্যস্ত করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে মৌখরী ও পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাদের মধ্যে বংশানুক্রমিকভাবে বিবাদ চলছিল। গুপ্ত শিলালিপি অনুযায়ী

গুপ্তরাজ কুমারগুপ্ত ঈষাণবর্মাকে পরাজিত করেন। ঈষাণবর্মার পরবর্তী মৌখরীরাজা ছিলেন শর্ববর্মা ও অবন্তিবর্মা। মনে করা হয় যে, তাঁরা মগধের কিছুটা দখল করেছিলেন। অর্ধ-শতকব্যাপী চলেছিল এই সংঘাত; পাশাপাশি উত্তরে তিব্বতীয়দের এবং দক্ষিণে চালুক্যরাজ্যের আক্রমণে পরবর্তী গুপ্তরাজারা হীনবল হয়ে পড়লে গৌড়দেশে শশাঙ্ক এক স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যের পত্তন করেন। তাঁর বংশ বা বাল্যজীবন সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছুই জানা যায় না বা তেমন কোন পাথুরে প্রমাণ নেই। এক্ষেত্রে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, প্রাচীন রোহিতাশ্বের (রোটাসগড়) গিরিগাত্রে 'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক' এই নামটি ক্ষোদিত আছে। যদি এই শশাঙ্ক ও গৌড়রাজ শশাঙ্ককে অভিন্ন বলে গ্রহণ করা যায়, তাহলে স্বীকার করতে হয় যে, শশাঙ্ক প্রথমে একজন মহাসামন্ত ছিলেন। ...ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্ত মগধে ও গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। সুতরাং শশাঙ্ক এই মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন, এই মতই সঙ্গত বলে মনে হয়।[৬] কিন্তু রাখালদাস শশাঙ্ককে আলোচ্য উপন্যাসে আদি গুপ্তবংশের উত্তরপুরুষ ও মহাসেনগুপ্তের পুত্ররূপেই উপস্থাপিত করেছেন; যাঁকে মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের বীরগাথা শুনিয়ে লুপ্তসাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছেন। অথচ শশাঙ্কের প্রতিপক্ষ হর্ষবর্ধনের সভাসদ লেখক বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে 'গৌড়রাজ' বলে অভিহিত করেছেন। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে শশাঙ্ক একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার রাজধানী কর্ণসুবর্ণ, খুব সম্ভবত মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে রাঙামাটি নামক স্থানে অবস্থিত। দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর জেলা), উৎকল ও গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত কোঙ্গোদ রাজ্যও তিনি জয় করেন।

রাখালদাস সপ্তম শতকের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীন বাংলাকে উনিশ ও বিশ শতকের পরাধীন ঔপনিবেশিক যুগের প্রেক্ষিতে চিত্রিত করে জনচেতনা গড়ে তোলার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। বাংলার প্রাচীন ইতিহাসকে উপন্যাসাকারে পাঠকের চেতনায় ছড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। প্রাচীন বাঙালি বীর শশাঙ্কের কীর্তিকে দেশের মানুষের সামনে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ভারতের অন্যান্য প্রান্তের রাজাদের মতো (রাজপুত, মারাঠা, শিখ প্রভৃতি) শশাঙ্কও অমিত পরাক্রম দেখিয়েছেন এবং বাংলাদেশ তথা গৌড়কে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীন করেছিলেন। শশাঙ্ক যুবাবস্থায় হারিয়ে যাওয়া গুপ্তবংশের গৌরবে উজ্জীবিত হয়ে, একাধিক বিরুদ্ধ-শক্তির বিপক্ষে লড়াই করে গুপ্তবংশের গরিমাকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং একজন জাতীয় নায়কে পরিণত হয়েছিলেন। মাধবগুপ্ত, যশোধবল, নরসিংহ দত্ত, বসুমিত্র, অনন্তবর্মা, শত্রুসেন প্রমুখের সাহচর্যে স্থানীশ্বরের বিরুদ্ধে গুপ্তসাম্রাজ্য উদ্ধারের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজশক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয়দের লড়াইকেই মনে করায়। শশাঙ্কের চারপাশে এইসব স্বাধীনতাকামী বিশ্বস্ত অনুচরদের সান্নিধ্য যেন

রাখালদাসের ব্যক্তিগত জীবনে চিত্তরঞ্জন দাশ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, শরৎচন্দ্র বসুকেই উপস্থাপিত করে।

সমগ্র 'শশাঙ্ক' উপন্যাসটি প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে– প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে। 'প্রভাতে' অংশে রাখালদাস দেখিয়েছেন পাটলিপুত্র রাজপ্রাসাদে শশাঙ্কের শৈশব ও মানুষ হয়ে ওঠা। মাত্র আট বছর বয়স্ক শশাঙ্ককে নিয়ে উপন্যাসের সূত্রপাত। শশাঙ্কের শৈশবকাল পুরোপুরিভাবে রাখালদাসের এক অনন্য সৃষ্টি ও অসাধারণ কল্পনাশক্তির পরিচায়ক। রাখালদাস যশোধবলদেবের মুখ দিয়ে শশাঙ্কের উদ্দেশ্যে বলিয়েছেন– 'কুমার, তিন শত বৎসর পুর্বে গুপ্তবংশে তোমার ন্যায় আর একজন পিঙ্গলকেশ রাজপুত্র জন্মিয়াছিল, দূরদৃষ্ট তোমার ন্যায় আজীবন তাহাকেও অনুসরণ করিয়াছিল, তোমার ন্যায় সেও উদারচেতা, দয়াশীল ও বীর্যবান ছিল। তুমি যেমন লুপ্তগৌরব উদ্ধার করিবার চেষ্টায় জীবন বিসর্জন দিবে, সেও তাহাই করিয়াছিল,- তাহার নাম স্কন্দগুপ্ত। ...কুমার শশাঙ্ক! সমুদ্রগুপ্তের নাম শুনিয়াছ? সমুদ্রগুপ্তের সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্যন্ত দিগ্বিজয়কাহিনী শুনিয়াছ? কুমারগুপ্তের কথা শুনিয়াছ? স্কন্দগুপ্ত সেই কুমারগুপ্তের পুত্র। তোমার পিতার ক্ষুদ্ররাজ্যে সকলে যেমন তোমার পিঙ্গলকেশ দেখিলে যুবরাজ বলিয়া চিনিতে পারে, সেইরূপ স্কন্দগুপ্তের পিতার সাম্রাজ্যে তাহার পিঙ্গলকেশ দেখিলে সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্যন্ত, আর হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্যন্ত, সকলেই তাহাকেই কুমার বলিয়া চিনিতে পারিত'।[৭] উপন্যাসের স্বভাবধর্ম বজায় রেখে, তাঁকে আরও আকর্ষণীয় ও রোমহর্ষক করার তাগিদে রাখালদাস এখানে শশাঙ্ককে নায়ক বানিয়েছেন এবং সাম্রাজ্যের শত্রু হিসাবে দেখিয়েছেন রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনকে। জাতীয়তাবাদী ও চরমপন্থী নেতারা ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য যুবশক্তির ওপর নির্দ্বিধায় ভরসা করেছিলেন। রাখালদাসও তার ব্যতিক্রম নন। মগধ সাম্রাজ্যকে শত্রুমুক্ত করার জন্য তিনিও একই রকমভাবে যুবক শশাঙ্ককে ভরসা করেছেন। এমনকি শশাঙ্কের সহযোগী হিসাবে একদল নেতৃত্বগুণসম্পন্ন যুবক- অনন্তবর্মা, নরসিংহদত্ত, বসুমিত্র প্রভৃতিকে চিত্রিত করেছেন; যাঁরা প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক চরিত্র। মহাসেনগুপ্তের আমলে মগধের দুরবস্থা, প্রভাকরবর্ধনের ঔদ্ধত্য, মহাদেবীর অপরাজেয় ধীরতা ও দৃঢ়তা এবং কিশোর যুবরাজ শশাঙ্কের অপরাজেয় তেজোস্ফূর্তি প্রথম অংশকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে।[৮] পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদে একইসঙ্গে পালিত হওয়া তক্ষদত্তের কন্যা চিত্রা, যাকে শশাঙ্কের বাগদত্তা হিসাবে চিত্রিত করেছেন, তা কাল্পনিক হলেও ইতিহাসের সীমাকে কোনভাবে লঙ্ঘন করে না, বরং তা ইতিহাস হিসাবেই উপন্যাসে মানানসই হয়ে উঠেছে। কীর্তিধবলের হত্যার প্রতিশোধে রাখালদাস যুবরাজ শশাঙ্ককে কপোতিক সংঘারামে পাঠিয়েছেন বন্ধুগুপ্তকে হত্যার জন্যে। এই অভিযানের মধ্য দিয়ে শশাঙ্কের শত্রু দমনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

'মধ্যাহ্ন' অংশে প্রত্যক্ষ করি অস্তায়মান মগধ সাম্রাজ্যে নবজীবন সঞ্চার করার জন্য যশোধবল যুবরাজ শশাঙ্ককে নিয়ে পাটলিপুত্র থেকে যাত্রা করলেন। এই যাত্রা ছিল গৌড়াভিমুখী, কামরূপের ভাস্করবর্মার বিরুদ্ধে। শুরু হল শঙ্করনদের যুদ্ধ। পরবর্তীকালে মেঘনাদের তীরে যুদ্ধের সময় ভিক্ষু বন্ধুগুপ্তের খড়গাঘাতে শশাঙ্ক অচেতন হয়ে জলে পড়ে যান। বন্ধুগুপ্তের সহযোগী শক্রসেন শশাঙ্ককে উদ্ধার করে এক ধীবরগৃহের গোপন আস্তানায় রাখার ব্যবস্থা করেন। শশাঙ্ক নিরুদ্দেশ, তাঁর নিরুদ্দেশের খবরে প্রধান সেনাপতি যশোধবলদেব শোকে মুহ্যমান, বিলাপগ্রস্ত– 'শশাঙ্ককে হত্যা করিয়াছি। সে জানিত যে, যশোধবল জীবিত থাকিতে কেহ তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। সে অসীম বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া শঙ্করতীরে লক্ষ সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, একমুষ্টি সেনা লইয়া বঙ্গে বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়াছিল। সে জানিত যে, বিপদের সময় শত ক্রোশ দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া যশোধবল তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইবে; কিন্তু শশাঙ্ক নাই, আমি তাহাকে রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহাকে যুদ্ধ করিতে শিখাইয়া ছিলাম, আত্মরক্ষা করিতে শিখাই নাই'।[৯] শশাঙ্কের অর্ন্তধানে বৃদ্ধ যশোধবলের বিলাপ যেন পরাধীন ভারতে সুভাষচন্দ্রের অর্ন্তধানে গান্ধীজীর বিলাপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। শশাঙ্কের এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মগধ সাম্রাজ্যের হৃত অংশের পুনরুদ্ধার করা, পক্ষান্তরে ভারতবর্ষকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে রক্ষা করা। পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, ভাগ্য এবং মানব কর্তৃত্বের সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চরম বিফলতা এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর এই আপ্রাণ চেষ্টা শশাঙ্ক চরিত্রকেই আলোকিত ও মহিমান্বিত করেছে; সেই সঙ্গে অতি পরিচিত অভিযোগ থেকেও মুক্তি দিয়েছে।[১০]

হিউয়েন সাঙ, বাণভট্ট প্রমুখের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, হিন্দুরাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন এবং তিনি বৌদ্ধদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন, নিরস্ত্র রাজ্যবর্ধনকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেছিলেন, বুদ্ধগয়া থেকে বৌদ্ধমূর্তি সরিয়ে শিবমূর্তি স্থাপন করেছিলেন, পাটলিপুত্রে বুদ্ধের চরণচিহ্নযুক্ত শিলাখণ্ড নদীজলে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং পবিত্র বোধিবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কেটে উপড়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু রাখালদাস এই অভিযোগগুলোকে অতিরঞ্জন বলে মনে করেন। তাই তিনি এই উপন্যাসে শশাঙ্কের ওপর থেকে সেই সব দোষ খণ্ডন করে তাঁকে কলঙ্কমুক্ত করেছেন। প্রথমত, মূল বিষয় ছিল অ-বৌদ্ধরাজা শশাঙ্কের শাসন বৌদ্ধদের মেনে নিতে অনীহা। কারণ মধ্যপ্রদেশবাসী একজন দূত সম্রাট শশাঙ্ককে এই সংবাদ দিয়েছিল যে, 'বৌদ্ধচার্যগণ শিখাইয়াছেন, যে রাজা বৌদ্ধ নহে, সদধর্মিগণের তাহার আদেশ পালন করা উচিৎ নহে'।[১১] কেবল 'শশাঙ্ক' উপন্যাসে নয়, রাখালদাসের অন্যান্য বিভিন্ন উপন্যাসেও হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘর্ষের প্রবল ছায়াপাত দেখা যায়; যা শশাঙ্কের সময়ে একটি স্বাভাবিক ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানে যখন 'মর্যাদা রক্ষার জন্য' হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন 'হঠাৎ শশাঙ্কের তরবারি রাজ্যবর্ধনের অসির ফলক হইতে পিছলাইয়া গিয়া তাঁহার কণ্ঠ ছিন্ন করিল;

বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া শশাঙ্ক পড়িয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যবর্ধনের দেহ ধূলাবলুণ্ঠিত হইল'।[১২] অসাবধানতায় রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হল; এই ঘটনার কোন ঐতিহাসিক সত্যতা না থাকলেও শশাঙ্ক উপন্যাসে রাখালদাস যেভাবে কাহিনির বিন্যাস ঘটিয়েছেন, তা ঐতিহাসিক সত্য রক্ষার ক্ষেত্রে মোটেই বেমানান নয়। প্রখ্যাত বাঙালি ইতিহাসবিদ রমাপ্রসাদ চন্দ লিখেছেন, 'বন্দী শত্রুকে নিহত করা তখন আর্যাবর্ত্তের রাজন্যবর্গের মধ্যে নীতিবিরুদ্ধ বিবেচিত হইত না। বাণভট্ট এবং য়ুয়ান চোয়াঙ যাহাই বলুন, রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়া শশাঙ্ক যে তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না'।[১৩] তৃতীয়ত, শশাঙ্ক নিজে থানেশ্বর আক্রমণ করেননি, এমনকি সুযোগ আসা সত্ত্বেও নয়। প্রভাকরবর্ধণের মৃত্যুকালে রাজ্যবর্ধন যখন হুনদেশে যাত্রা করে আর ফেরেননি, সেই সময় হর্ষবর্ধনও শোকে মুহ্যমান। তখন মালবরাজ দূত মারফৎ শশাঙ্ককে স্থানীশ্বর আক্রমণের প্রস্তাব পাঠালে শশাঙ্কের ন্যায়ধর্ম ও মানবধর্ম জেগে ওঠে এবং তিনি মালবদূতকে বলেন, 'দূত, মালবরাজ কি উন্মাদ হইয়াছেন? তিনি কি বিস্মৃত হইয়াছেন যে, স্বর্গীয় প্রভাকরবর্ধন সম্রাট দামোদরগুপ্তের দৌহিত্র তাঁহাকে কহিও যে সাম্রাজ্যের সহিত স্থানীশ্বর রাজ্যের কোন বিবাদ নাই, অসহায় অবস্থায় পতিত চিরশত্রুকে আক্রমণ করাও ক্ষাত্রধর্মবিরুদ্ধ, হর্ষ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। তুমি সত্বর ফিরিয়া যাও, আমার নাম লইয়া দেবগুপ্তকে মালবে প্রত্যাবর্তন করিতে কহিও। অন্যায় আচরণে সমুদ্রগুপ্তের বিনষ্ট সাম্রাজ্য উদ্ধার হইবে না'।[১৪] চতুর্থত, বৌদ্ধানুরাগী পণ্ডিতরা অভিযোগ করেন যে, শশাঙ্ক গয়ার বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলেন এবং ওখানকার মন্দির হতে বুদ্ধমূর্তি সরিয়ে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু এই অভিযোগকে রাখালদাস গুরুত্বহীন বলে মনে করেন। রাষ্ট্রীয় কল্যাণে শত্রু বিনাশের জন্য ধর্মীয়বেড়া ভাঙা হলেও তা রাজধর্ম হিসাবে বিবেচিত। এই নীতি পরবর্তীকালে প্রাক-সুলতানি যুগ, সুলতানি যুগ ও মুঘল যুগেও দেখা গেছে। কীর্তিধবলের হত্যাকারী বন্ধুগুপ্ত প্রাণভয়ে বোধিবৃক্ষের তলদেশের এক সুড়ঙ্গপথ দিয়ে পালিয়েছিল। তাকে ধরার জন্য সম্রাট শশাঙ্ক বৃক্ষতলে সুড়ঙ্গপথের সন্ধানে বোধিবৃক্ষ কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাখালদাস লিখেছেন, 'সম্রাট কয়েকজন সৈন্যকে বোধিবৃক্ষ কর্তন করিতে আদেশ করিলেন। ভিক্ষুগণের রোদন ধ্বনির মধ্যে প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষের শাখা প্রশাখা ছিন্ন হইল, বৃক্ষকাণ্ডও সমূলে উৎপাটিত হইল, বজ্রাসনের গুরুভার পাষাণখণ্ড স্থানচ্যুত হইল। ভূগর্ভে দীর্ঘ রন্ধ্রপথ আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু বন্ধুগুপ্তকে দেখিতে পাওয়া গেল না। দিনান্তে সুড়ঙ্গের শেষভাগে লৌহদ্বার যখন ভঙ্গ হইল, বন্ধুগুপ্ত তখন বহুদূরে, গগণস্পর্শী ত্রিচূড় কুক্কুটপাদগিরির নিকটে। শশাঙ্ক ও যশোধবলদেব বিফল মনোরথ হইয়া পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন'।[১৫] এই ঘটনার পর হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালালেও হর্ষ যে সফল হননি, তা বলাই বাহুল্য। তাহলে ইতিহাসই তার প্রমাণ দিত। যাইহোক, এই ঘটনার ২৪ বছর পর হিউয়েন সাঙ নানা কল্পকাহিনি উপস্থাপন করে শশাঙ্কের চরিত্র

হননের চেষ্টা করেছেন এবং অদ্ভূত রূপকথার সাহায্যে বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থানের বর্ণনা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রাখালদাস বিস্ময়ের সঙ্গে লিখেছেন, 'অবশেষে অশোকের বংশধর পূর্ণবর্মার ভক্তি ও যত্নে, এক রাত্রির মধ্যে মহাবোধিদ্রুম পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। খণ্ডীকৃত, সমূলে উৎপাটিত মহীরুহ কিরূপে একরাত্রির মধ্যে যষ্টি হস্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বর্ণনা এই আখ্যায়িকার বিষয়ীভূত নহে, কিন্তু সরল ধর্মপ্রাণ চৈনিক পরিব্রাজক বিশ্বস্তচিত্তে এই কাহিনী তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন'।[১৬]

তবে শশাঙ্ক চরিত্রকে শেষ দিকে রাখালদাস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মেরেছেন এবং চিত্রার আত্মহত্যার পর তাঁর ব্যর্থ প্রেমিকা পুরুষবেশী লতিকাকে মরণাপন্ন প্রেমিকের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে একটি করুণ নাটকীয় পরিসমাপ্তি দান করেছেন। এই নিরিখে বলা যায় যে, রাখালদাস শেষপর্বে এসে শশাঙ্কের প্রতি মোটেই সুবিচার করেননি। অনেকটা যেন তাড়াহুড়ো করে শশাঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জাতীয়তাবাদের প্রকৃষ্ট লক্ষণ হল ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিজেদের সামগ্রিক ইতিহাস লেখার তাগিদ। গড়পরতা সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগরণের জন্যে নিজের দেশের প্রাচীন গরিমা ও ঐতিহ্যকেন্দ্রিক ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা সেই চেতনারই ভিন্ন প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি হিসাবে কল্পনা করা এবং সেই কল্পনাকে মূর্তরূপ দিতে একদিকে ঐতিহাসিকদের সমীক্ষিত বিবরণ- অন্যদিকে ঔপন্যাসিকের ইতিহাসাশ্রয়ী অথচ কল্পনামিশ্রিত উপাখ্যান- দুই-ই রাখালদাসের মধ্যে ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল ছিল।[১৭] রাখালদাসের শিক্ষাগুরু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিজে ছিলেন একজন বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসবিদ। পুঁথিসংগ্রহ, শিলালিপির পাঠোদ্ধার, লোকসংস্কৃতি ধারায় বিক্ষিপ্ত তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।[১৮] তাঁর যোগ্যশিষ্য হিসাবে রাখালদাসও সেই পথের পথিক হিসাবে বাংলাকে সমগ্র ভারতের জাতীয়চেতনার পাদপ্রদীপের আলোয় এনে দিয়েছিলেন এবং বাঙালির সুপ্ত আত্মবিশ্বাস ও বাসনাকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। লেখক তাঁর বিংশ শতকের চেতনা দিয়ে সপ্তম শতকের কাহিনির বয়ান তৈরী করেছেন। গান্ধীর আন্দোলনে সমগ্র ভারতবর্ষ যখন শিহরিত, তখন ঔপনিবেশিক শাসকের প্রতি ভারতবাসীর বিশেষত বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে শুরু করল। যে যুগে রাখালদাস এই গ্রন্থ লেখেন সে যুগে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বড়ো বেশী ছিল। কৃচ্ছতা সত্ত্বেও আদর্শকে রক্ষা করা জাতির অবশ্যম্ভাবী কর্তব্য ছিল। তার পরিচয় এই উপন্যাসে আছে। 'পিতা, আমাদের রক্ষা কর, পাটলিপুত্র আজ অনাথ, কেবল সাম্রাজ্য নয়, আজ ভারতবর্ষের প্রতি নগর তোমার আশায় পথ চাহিয়া আছে'।[১৯] উনিশ শতকের শেষদিকে হিন্দুত্বদর্শন জাতীয়তাবাদের যে একটি মুখ্য উপাদান হিসাবে গণ্য হচ্ছে, তা সপ্তম শতকের প্রেক্ষিতে রচিত 'শশাঙ্ক' উপন্যাসে ধর্মীয় সংঘাতের মধ্য দিয়ে সমার্থক হয়ে উঠেছে। মোটকথা, উপন্যাসের মধ্য দিয়ে শশাঙ্কের পৌরুষকে বীরত্বের প্রেরণা হিসাবে বাঙালি জাতির মধ্যে রাখালদাস সঞ্জীবিত করার চেষ্টা

করেছেন। শশাঙ্কের সামরিক মূল্যবোধ, বীরত্বের অনুশীলন ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করে ঔপনিবেশিক ইতিহাসকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতে এক গৌরবময় যুগের অস্তিত্বের ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। সর্বোপরি রাখালদাসের সার্বিক প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা নির্মাণ করে বাঙালি জাতির আত্মপরিচিতি দান করা; যে অভিনিবিষ্ট লক্ষ্যে তিনি সহজেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুদৃশ্যে আমরা দেখি, রোটাসগড় অভিযান কালে তরবারির আঘাতে শশাঙ্কের মৃত্যু আসন্ন। মাতৃভূমি রক্ষার্থে তথা সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে রণক্ষেত্রে নিজের শেষ রক্তবিন্দুর বিনিময়ে সাম্রাজ্য রক্ষাকে নিজ কর্তব্য বলে ভেবেছিলেন। এই মহানব্রত পালনে তিনি তাঁর জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। দেশ রক্ষার জন্য তাঁর এই আত্মত্যাগ ঔপনিবেশিক যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের যে ইঙ্গিতবাহী, তা অস্বীকার করা যায় না। বলাবাহুল্য গুপ্তসাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্নকরণ তাঁর কাছে ছিল যেন ১৯০৫ এর বঙ্গবিচ্ছেদের সামিল, তাই শশাঙ্কের শেষ রক্তবিন্দু দানের মধ্য দিয়ে রাখালদাস নিজেকেই যেন একাত্ম করে দেখেছিলেন।

ঔপন্যাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক বা ইতিহাসবিদ হিসাবে রাখালদাসের আন্তরিক উদ্দীপনা তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনার বিচ্ছুরণ ছাড়া অন্যকিছু নয়। সত্যিকারের স্বদেশপ্রেমের পরিচয় এখানেই। এই সূত্র ধরে বলতে পারি জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা ছিল মূলত ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ভারতীয় ইতিহাসচর্চার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াজনিত ফসল। এই প্রতিক্রিয়ার শক্তি ও উদ্দীপনা জাতীয় চেতনারূপে ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতীয় জনগণের মধ্যে। পরবর্তীকালে দেশব্যাপী বিক্ষোভের ভিতর দিয়ে ভারতীয় জনগণ নিজেদের রাজনৈতিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিল; যা ক্রমান্বয়ে ব্রিটিশ শক্তির হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল।[২০]

তথ্যসূত্র:

১. স্বপনকুমার দে, বাংলা উপন্যাসে ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যবহার (১৯৫০-১৯৭০), পরিমার্জিত সংস্করণ, আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৮।

২. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, “ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় রাখালদাস”, শতবর্ষের আলোয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎ সমিতি, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৫৫।

৩. Mayurika Chakravorty, “Skeletons of History: Facts and Fictions in Rakhaldas Bandyopadhay’s SASANKA”, South Asia Research, Vol. 24 No 2, SAGE Publications, London, November 2004, P. 175.

৪. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, ঐ, পৃ. ৫৮।

৫. ঐ, পৃ. ৫৮।
৬. শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ), দ্বিতীয় মুদ্রণ, দিব্য প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৪৩।
৭. বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪।
৮. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, “শশাঙ্ক”, শতবর্ষের আলোয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ৭৩।
৯. বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী, ঐ, পৃ. ১৮২।
১০. Mayurika Chakravorty, ibid, P. 179-180.
১১. বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী, ঐ, পৃ. ২৪৮।
১২. ঐ, পৃ. ২৩৭।
১৩. রমাপ্রসাদ চন্দ, ইতিহাসে বাঙালী, প্রান্তিকা, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ১০৫।
১৪. ঐ, পৃ. ২২৭।
১৫. ঐ, পৃ. ২২২।
১৬. ঐ, পৃ. ২২২।
১৭. মীণাক্ষী মুখোপাধ্যায়, উপন্যাসে অতীত: ইতিহাস ও কল্পইতিহাস, থীমা, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৮।
১৮. মীণাক্ষী মুখোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ১৩৭।
১৯. ড. বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২৭৭।
২০. Majumdar R. C., “Nationalist Historians” in C. H. Philips (ed.), Historians of India, Pakistan and Ceylon, London, 1961, P. 417. It is also used in the book named ‘From Banglar Itihasa to Bangalir Itihasa History in Making’ by Srikanta Roychowdhury, P. 32.

রবীন্দ্র বীক্ষণে শেকসপিয়র

রাজদীপ দত্ত
গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথ যে-সময়ে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়ে পেশাদারি রঙ্গালয় ও শিক্ষিত জনজীবনে শেকসপিয়র প্রবল মর্যাদায় আসীন। ঠাকুর পরিবারের মধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শেকসপিয়রের নাটক অনুবাদ করেন। বাল্যশিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ শেকসপিয়রকে গভীরভাবে পান 'ম্যাকবেথ' নাটক অনুবাদের মধ্যে দিয়ে। এই অনুবাদ সেকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসা লাভ করে। রবীন্দ্রজীবনে প্রথম পর্বে রচিত পঞ্চাঙ্কগুলিতে শেকসপিয়রের ট্রাজেডির গভীর প্রভাব আছে। বিশেষ করে 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' ও 'মালিনী' নাটকের প্লট ও চরিত্রাঙ্কনে শেকসপিয়রের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। বন্ধু লোকেন পালিতকে লেখা একাধিক চিঠিপত্রে শেকসপিয়রের চরিত্রচিত্রণের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বসাহিত্যে বিশ্বমানবের প্রতিফলন দেখেছেন শেকসপিয়রের সৃষ্টিতে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে রবীন্দ্রনাথ নাটকরচনার আদর্শে সম্পূর্ণ সরে এলেন শেকসপিয়র থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা মিরন্দা ও দেসদিমোনা' প্রবন্ধে শেকসপিয়র প্রশস্তির বিরোধিতা করে 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে শেকসপিয়র অপেক্ষা কালিদাসকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপে মূল্যায়ন করলেন। যদিও এর পেছনে সমসাময়িক উপনিবেশ-বিরোধী চেতনা ক্রিয়াশীল হয়ে থাকতে পারে। সাংকেতিক পর্যায়ের নাটকগুলিতে শেকসপিয়রকে প্রতিগ্রহণের সরাসরি কোনও পথ রইল না তবুও শেকসপিয়রের সৃষ্টির প্রতি তাঁর মুগ্ধতা অক্ষুণ্ণ ছিল। 'বলাকা' কাব্যের ৩৯ সংখ্যক কবিতাটি সরাসরি শেকসপিয়র-প্রশস্তি। সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধগুলিতে বিশেষত ট্রাজেডিতত্ত্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ শেকসপিয়রকে যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন। এইভাবে জীবনের উপান্ত পর্যন্ত গ্রহণে-বর্জনে রবীন্দ্রমননে শেকসপিয়র কেমনভাবে প্রতিগৃহীত হয়েছেন, সেই আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

সূচক শব্দ: ম্যাকবেথ অনুবাদ--Hecate প্রসঙ্গ--প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাটকে শেকসপিয়রের প্রভাব—লোকেন পালিতকে লেখা পত্রে শেকসপিয়র প্রসঙ্গ—Weltliteratur এর আদর্শে 'বিশ্বসাহিত্য'—শেকসপিয়র সৃষ্ট চরিত্রে 'বিশ্বমানবের' প্রতিফলন—'শকুন্তলা' প্রবন্ধে বঙ্কিম বিরোধ—টেম্পেস্টের সমালোচনা ও কালিদাস-শেকসপিয়রের প্রতিতুলনায় কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন—প্রাচ্য মূল্যবোধ ও

'জীবনস্মৃতি'তে সাহিত্য সমালোচনায় শেকসপিয়র প্রসঙ্গ—'বলাকা'য় শেকসপিয়র প্রশস্তি—ট্র্যাজেডিতত্ত্বের আলোচনায় শেকসপিয়র প্রসঙ্গ—গ্রহণে-বর্জনে মূল্যায়ন

মূল আলোচনা:

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতায় যখন রবীন্দ্রনাথ বড়ো হয়ে উঠছেন, তখন কলকাতার শিক্ষিত বাঙালি সমাজে শেকসপিয়র পরম আদরে গৃহীত। ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালির প্রথম পরিচয় যাঁর মাধ্যমে, সেই বঙ্কিমের লেখায় শেকসপিয়রের প্রশস্তি, কলকাতার রঙ্গমঞ্চগুলিতে শেকসপিয়রীর নাটকের সীমাহীন জনপ্রিয়তা, ঠাকুর পরিবারের নিজস্ব ভাবধারায় শেকসপিয়র অনুবাদ ও চর্চা বালক রবীন্দ্রনাথের মনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে। সত্যেন্দ্রনাথ শেকসপিয়রের Cymbeline নাটক অবলম্বন করে 'সুশীলা-বীরসিংহ' নাটক রচনা করেন ১৮৬৮ সালে, রবীন্দ্রনাথ তখন সাত বছরের বালক।[১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথও শেকসপিয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকটি সমনামে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। এই অনুবাদ সেই সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল বলে জানা যায়।[২]

রবীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষা পর্বে শেকসপিয়র ছিলেন অপরিহার্য। চোদ্দ বছর বয়সে অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ ম্যাকবেথ অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদের অংশবিশেষ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ও বিদ্যাসাগরের মতো গুণীজনের প্রশংসা লাভ করে। এই প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"তিনি(জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য) খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল।"[৩] হয়তো রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক জ্ঞানবাবুর মনে এই কথা ছিল যে, একজন বাঙালি ছেলে ম্যাকবেথ বাংলায় অনুবাদ করে নাটকটি যতখানি বুঝবে, বিজাতীয় ভাষায় রাশি রাশি সমালোচনা পড়েও ততখানি বুঝবে না। আমাদের দুর্ভাগ্য ম্যাকবেথ অনুবাদের সেই খাতাখানি হারিয়ে গেছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ যে একেবারে অপাংক্তেয় হয়নি, তার প্রমাণ 'জীবনস্মৃতি'তেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত শিক্ষক রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য 'ম্যাকবেথ' এর অনুবাদটি পড়ে খুশি হয়েছিলেন। "তিনি(রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য) একদিন আমার ম্যাকবেথের তর্জমা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন।...ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই—অতএব, এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম। মনে আছে, রাজকৃষ্ণবাবু আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, নাটকের অন্যান্য অংশের অপেক্ষা ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত।"[৪] ম্যাকবেথ নাটকে *Hecate* নামক ডাকিনীর সংলাপ অনুবাদের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ পরিহাসরসপ্রিয়তায় কাদম্বরী দেবীকে *Hecate*

Thacroon আখ্যা দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। অত অল্প বয়সে একখানি পুরো নাটক অনুবাদ করা, বিদ্যাসাগরকে তা পড়ে শোনানো, অনুবাদকার্য বিষয়ে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শ পাওয়া, এই সবকিছুই রবীন্দ্রনাথকে শেকসপিয়র সম্বন্ধে কতখানি উৎসাহিত করে তুলেছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ম্যাকবেথ অনুবাদ করলেও গীতিকাব্যের রসে মজে থাকা রবীন্দ্রনাথের মনে শেকসপিয়রকে প্রতিগ্রহণের পথ বড়ো সহজ ছিল না। এর কারণ প্রতিভার বৈপরীত্য। গীতিকাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম পক্ষপাত তাঁকে শেকসপিয়রীয় প্রতিভার সমধর্মিতা থেকে কিছুটা দূরে রেখেছিল কিন্তু সেই কিশোর বয়সেই অনুবাদের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রমনে শেকসপিয়রের নাট্যভাবনার যে ছাপ পড়েছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে লেখা নাটকগুলিতে সেই ছাপ আরও গভীরভাবে ধরা দিয়েছিল। পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট, উপকাহিনিযুক্ত, বিষাদকরুণ ট্র্যাজেডিনির্ভর রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের প্রধান দুটি নাটক 'রাজা ও রানী' ও 'বিসর্জন'এ শেকসপিয়রের প্রত্যক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট। 'রাজা ও রানী'(প্রকাশকাল ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ)তে রানী সুমিত্রার প্রতি রাজা বিক্রমদেবের সংযমহীন আসক্তি সচেতন পাঠককে 'এ্যান্টনি এন্ড ক্লিওপেট্রা' নাটকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রোমসম্রাট এন্টনি রাজ্যের কল্যাণ-কর্ম অপেক্ষা ক্লিওপেট্রার উষ্ণ সান্নিধ্যকেই অধিক মাত্রায় কামনা করেছেন। অনুরূপভাবে বিক্রমদেবও সুমিত্রার উদ্দেশে বলেছেন—"থাক গৃহ, গৃহকাজ।/সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি/অন্তরে তোমার গৃহ, আর গৃহ নাই—"[৫] এমনকি কঞ্চুকি রাজাকে গুরুতর রাজকার্যের বিষয়ে পরামর্শ প্রার্থনার কথা বলতে এলে বিক্রমদেব অস্বস্তির সঙ্গে বলেছেন—"ধিক তুমি! ধিক মন্ত্রী! ধিক রাজকার্য!/রাজ্য রসাতলে যাক মন্ত্রী লয়ে সাথে!"[৬]। প্রণয়-আসক্তির দিক থেকে বিক্রমদেব এন্টনির সঙ্গে তুলনীয় আবার অসংযত হৃদয়াবেগের দিক থেকে তার সঙ্গে ওথেলোর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। সুমিত্রা প্রাণত্যাগ করলে বিক্রম যে ভঙ্গিতে অনুশোচনা করেছে, যথা—

"দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির অপরাধী করে? ইহ জন্ম
নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহারো দিলে না অবকাশ?
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর—
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!"[৭]

এর সঙ্গে ডেসডিমোনার মৃত্যুতে ওথেলোর হাহাকার ও অনুতাপ যেন সমস্বরে গ্রথিত। বিক্রমদেব ছাড়াও এই নাটকের 'রেবতী' চরিত্রটির ওপর সুস্পষ্টভাবে 'ম্যাকবেথ' নাটকের 'লেডি ম্যাকবেথ' চরিত্রটির প্রভাব পড়েছে। দুটি চরিত্রই তীব্র উচ্চাভিলাষের

পর্দায় গাঁথা। ম্যাকবেথের মতোই চন্দ্রসেনও স্ত্রীর প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে পাপকার্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

'বিসর্জন' নাটকের প্লট ও চরিত্রসৃষ্টিতে রবীন্দ্রমনে শেকসপিয়রের প্রচ্ছন্ন প্রভাব কাজ করেছে, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। রঘুপতির তীব্র ব্রাহ্মণ্য-গর্বের সঙ্গে রাজশক্তির যে বিরোধ 'বিসর্জন' নাটকের মূল প্লট, তার সঙ্গে শেকসপিয়রীয় ট্রাজেডির প্রভূত সাদৃশ্য চোখে পড়ে। জয়সিংহের কথার উত্তরে রঘুপতি যখন বলেন—

"পাপপুণ্য কিছু নাই। কেবা ভ্রাতা, কেবা
আত্মপর। কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ।
এ জগত মহাহত্যাশালা..."[৮]

--রঘুপতির এই উক্তিতে শেকসপিয়রের ট্রাজেডির নায়ক যেমন ইয়াগো অথবা ম্যাকিয়াভেলির ছায়া লক্ষ করা যায়। রাজাকে হত্যা করে রাজ-ভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের রাজা হওয়ার ইচ্ছা 'ম্যাকবেথ' নাটকে লেডি ম্যাকবেথ ও ডাইনিদের কথায় ম্যাকবেথের মনে জেগে ওঠা উচ্চাভিলাষকে স্মরণ করায়। 'জয়সিংহ' চরিত্রের যে দ্বিধা ও দোলাচলতা, তার সঙ্গে 'হ্যামলেট' নাটকের হ্যামলেট চরিত্রের গভীর আনুরূপ্য আছে। রাজা হ্যামলেটের চরিত্রবৈশিষ্ট্য অনেকখানি প্রতিফলিত হয়েছে 'রাজা ও রানী'র কুমারসেন ও 'বিসর্জন'এর জয়সিংহ চরিত্রে। রাজা হ্যামলেটের উচ্চ মণীষা এদের নেই ঠিকই, কিন্তু হ্যামলেটের আবেগ এবং দুর্বলতা এই দুটি চরিত্রে সমানমাত্রায় আছে।

শুধু ট্র্যাজেডিই নয়, 'চিরকুমার সভা' বা 'শেষরক্ষা'র মতো কমেডিতে As you like It এবং 'গোড়ায় গলদ'এর মতো হাস্যরসাত্মক নাটকে The Comedy Of Errors এর ছায়া যেকোনো সচেতন পাঠকের চোখে ধরা দেবে। এই পর্বে নাট্যরচনায় তাঁর আদর্শ যে শেকসপিয়র, একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন 'মালিনী' নাটকের ভূমিকায়—"শেকস্‌পীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।"[৯]

১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ বন্ধু লোকেন পালিতকে লেখা একটি চিঠিতে শেকসপিয়রের মানবচিত্রচিত্রণ ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। মানুষ কাটাছেঁড়াভাবে নয়, যাবতীয় সামগ্রিকতা নিয়ে ধরা পড়েছে শেকসপিয়রের রচনায়। "ফল্‌স্টাফ ও ডগবেরি থেকে আরম্ভ করে লিয়র ও হ্যামলেট পর্যন্ত শেকস্‌পীয়র যে মানব-লোক সৃষ্টি করেছেন সেখানে মনুষ্যত্বের চিরস্থায়ী হাসি-অশ্রুর গভীর উৎসগুলি কারও অগোচর নেই"[১০]। তাঁর মতে, সোসাইটি নভেলগুলি হতে পারে বাস্তব জীবনের অবিকল চিত্রণ কিন্তু সাহিত্যের চিরকালীন সত্য শেকসপিয়রে আশ্রিত। আজকের সোসাইটি নভেলগুলি কাল মিথ্যা হয়ে যাবে কিন্তু শেকস্‌পিয়র কখনও মিথ্যা হবে না।[১১] ১৯০৬ সালে গ্যেটে সৃষ্ট *Weltliteratur* এর আদর্শে 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে "বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য" স্থির করেছেন এবং "প্রত্যেক

লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশচেষ্টার সম্বন্ধ" আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, লোকেন পালিতকে লেখা পূর্বোক্ত পত্রে শেকসপিয়রের চরিত্রচিত্রশালায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের সেই বিশ্বমানবকেই প্রত্যক্ষ করেছেন।

উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকে এসে রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনা পুরোপুরি বদলে যায়। 'শারদোৎসব' থেকেই রূপক-সাংকেতিক নাট্যধারার যে নতুন দিক খুলে যায়, সেখানে শেকসপিরিয়ান নাট্যভাবনার প্রভাব আর নেই বললেই চলে। শেকসপিয়রের জগৎ থেকে রবীন্দ্রসৃষ্টির জগৎ অনেক দূরবর্তী হয়ে পড়ে। ১৮৭৫ সালে যে 'শকুন্তলা মিরন্দা ও দেসদিমোনা' প্রবন্ধে বঙ্কিম প্রথম কালিদাস ও শেকসপিয়রের তুলনামূলক আলোচনা করে উভয়ের সাদৃশ্য দেখান ও শেকসপিয়রের প্রশস্তি করেন, রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'এ বঙ্কিমের নামোল্লেখ না করে ওই একই বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন এবং বঙ্কিমের মতের বিরোধীতা করে টেম্পেস্টের সঙ্গে শকুন্তলার বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে কালিদাসকে শেকসপিয়রের উচ্চে স্থান দেন। শেকসপিয়রের নাটকের মধ্যে তিনি দেখতে পান প্রবৃত্তির নিদারুণ অসংযম, বিপরীতে তাঁর মনে হয় "শকুন্তলার মতো এমন শান্ত গভীর, এমন সংযত সম্পূর্ণ নাটক শেকস্‌পিয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নাই।"[১২] এটা কি শুধুমাত্র সাহিত্যচিন্তার বদল নাকি প্রাচ্য তথা ভারতীয়ত্বের প্রতি অভিমান? কালিদাসের সঙ্গে প্রতিতুলনায় টেম্পেস্ট নাটকের প্রতি একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও কতটা যৌক্তিক, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। তবে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে সাময়িক নয়, স্থায়ী তার প্রমাণ আছে, ১৯১২ তে প্রকাশিত 'জীবনস্মৃতি'তে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বলছেন, তরুণ যৌবনে তাঁদের "সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়র, মিলটন ও বায়রন।"[১৩] কিন্তু তিনি এঁদের লেখা থেকে যে পরিমাণ মাদক পেয়েছেন, সে পরিমাণ খাদ্য পাননি। 'হৃদয়াবেগের একান্ত আতিশয্যই' সেই সাহিত্যের একটি স্বভাব বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে। রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের প্রলয়দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে একটা প্রবল অতিশয়তা আছে, তার তুলনায় প্রাচ্য সাহিত্যের শান্ত, গভীরতা অনেক বেশি স্বস্তিপ্রদ বলে পরিণত বয়সে মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের।

পরিণত বয়সে সাহিত্যাদর্শ বদলে গেলেও শেকসপিয়রকে অস্বীকার করেননি রবীন্দ্রনাথ। শেকসপিয়রের মৃত্যুর ত্রিশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লণ্ডনের Shakespeare Society-র উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ একটি ষোলো লাইনের কবিতা লেখেন। কবিতাটি নীচে উদ্ধৃত করা গেল—

"যেদিন উঠিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে,
ইংল্যাণ্ডের দিক্‌প্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে

আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিল বুঝি তারই তুমি
কেবল আপন ধন; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি
রেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অঞ্চল অন্তরালে
বনপুষ্প বিকশিত তৃণঘন শিশির-উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে। দ্বীপের নিকুঞ্জতল
তখনো ওঠে নি জেগে কবিসূর্য-বন্দনাসঙ্গীতে।
তার পরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছ দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের 'পরে;
নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া; তাই হেরো যুগান্তর-শেষে
ভারতসমুদ্রতীরে কম্পমান শাখা-পুঞ্জে আজি
নারিকেলকুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।[১৪]

কবিতাটি প্রশস্তি হিসেবে ভালো হলেও শেকসপিয়রের প্রতিভার গভীরতা এ কবিতায় ধরা পড়েনি। পরবর্তীকালে সাহিত্যতত্ত্ব বিশেষত ট্র্যাজেডির আলোচনায় শেকসপিয়রের প্রসঙ্গ বারবার এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। দুঃখের কাব্য, শোকের কাব্য কখন নান্দনিক ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে অর্থাৎ ট্র্যাজেডির সাহিত্যমূল্য আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন দুঃখকে যদি আমরা ব্যক্তিগত ক্ষতির আশঙ্কা বাঁচিয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখি, তবে সেই দুঃখকে বলা চলে সুন্দর।"ঘরের পাশে যদি খুন হয় অনিষ্টের আশঙ্কায় আমরা পুলিশ ডেকে বসি, কিন্তু ওথেলো যেখানে ডেসডিমোনার প্রাণ নিল সেখানে ব্যক্তিগত ক্ষতি নেই, বেদনার তীব্রতা সেখানে আমাদের প্রোজ্জ্বল অনুভূতির দীপ্ততেজে সমস্ত চৈতন্যকে উদ্‌ভাসিত করে তোলে।"[১৪] ওই একই কারণে হ্যামলেট নাটকের গভীর নৈরাশ্য-বেদনার মধ্যেই তার পূর্ণ সার্থকতা।

এইভাবে গ্রহণে-বর্জনে রবীন্দ্র বীক্ষণে শেকসপিয়র কেমনভাবে উন্মোচিত হয়েছেন, কেমন ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে শেকসপিয়র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি, সেইসঙ্গে রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে শেকসপিয়রের প্রতিগ্রহণের মাত্রাগুলি কীভাবে নির্ণীত হয়েছে, সেই সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রূপালেখ্য উপস্থাপন করা হল বক্ষ্যমান প্রবন্ধে।

তথ্যসূত্র:

১. পাল প্রশান্তকুমার, 'রবিজীবনী', খণ্ড-১, আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ১৮৮২, পৃষ্ঠা-৮৪।

২. মিত্র সনৎকুমার, 'শেকসপিয়র ও বাংলা নাটক', সাহিত্যপ্রকাশ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৫৬।

৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্র-রচনাবলী(সার্ধশতজন্মবর্ষ সংস্করণ), খণ্ড-১৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৭, পৃষ্ঠা-৬৪-৬৫।

৪. ঐ, পৃষ্ঠা-৬৫।

৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'রাজা ও রানী', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পূর্বোক্ত, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৮৮।

৬. ঐ, পৃষ্ঠা-১৯০।

৭. ঐ, পৃষ্ঠা-২৬৮।

৮. ঐ, পৃষ্ঠা-৩০৬।

৯. ঐ, পৃষ্ঠা-৪৮৪।

১০. লোকেন পালিতকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি [আষাঢ় ১২৯৯], 'সাহিত্য' গ্রন্থের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত, ওয়েবঠিকানা: https://www.tagoreweb.in/Essays/sahityo-51/potralap-228

১১. ঐ, ওয়েবঠিকানা পূর্বোক্ত।

১২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'শকুন্তলা', প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পূর্বোক্ত, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৫৬

১৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পূর্বোক্ত, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১০০।

১৪. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'বলাকা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পূর্বোক্ত, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৩৬।

১৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'রূপকার', সাহিত্যের পথে, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৪৩, পৃষ্ঠা-২২৯।

শতবর্ষের নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস : মুসলমান সাহিত্যিকদের সৃজনে

কাজী মুজিবর রহমান
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: শতবর্ষ পূর্বের বহু মুসলমান সাহিত্যিক তাঁদের উপন্যাসে নানা বিষয় বৈচিত্র্যের অবতারণা ঘটিয়েছিলেন । ঘটনার সাবলীল উপস্থাপনে সমকালীন যুগে উপন্যাসগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। কোন উপন্যাসের কাহিনিতে স্থান করে নিয়েছিল হিন্দু-মুসলমান যুবক-যুবতীর প্রেমের সম্পর্ক, কোনোটার বা বিষয়বস্তু মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীণ সংঘাত। আজহার আলি *হামিদা (১৯১৯)* উপন্যাসে মুসলমান নারীর অমুসলমান যুবকের প্রতি প্রেম নিবেদনের মধ্যে দিয়ে যেমন অসাম্প্রদায়িক উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, অপরদিকে রসিদ সিদ্দিকি *উপেন্দ্র নন্দিনী* (১৯১৯) উপন্যাসে প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতা দেখিয়ে হিন্দুনারীকে ইসলামে দীক্ষিত করে মুসলমান যুবকের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন। মোহাম্মদ ইয়াসিন *স্বর্গোদ্যান (১৯১৯)* উপন্যাসে ইসলামি সাম্যবাদের প্রচারে সচেষ্ট হয়েছেন। আশরাফ-আতরাফ-আরজল প্রভৃতি অসার ইসলামি জাত্যাভিমানকে অত্যন্ত কড়া সমালোচনা করেছেন লুৎফর রহমান তাঁর *রাইহান (১৯১৯)* উপন্যাসে। এখানে হিন্দু মুসলমানের মিলন প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। আশরাফ আলি *মোমেনা* উপন্যাসে মুসলমানের ভ্রাতৃত্ববোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি সমালোচনা করেছেন ইসলামের পর্দাপ্রথার বাড়াবাড়িকে। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হিন্দুনারীর চারিত্রিক স্খলনের চিত্র তুলে ধরেছেন ইবনে নুর তাঁর *হিন্দুনারী* (১৯২০) উপন্যাসে। হিন্দু সমাজের প্রতি বিষ উগরে দিয়েছেন নুরুল হক চৌধুরি *কালাপাহাড়* (১৯২০) উপন্যাসে। *ভাঙ্গাবুক* (১৯২১) উপন্যাসে গোলাম মোস্তাফা হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ভাবনাকে উপজীব্য করেছেন। ইসলামের শেরেক-বেদাত প্রসঙ্গ প্রকট হয়েছে বেলায়েত আলির *মিলন কুটির* (১৯২১) উপন্যাসে। শত বৎসর পূর্বে কাহিনির নানা অভিনবত্বে মুসলমান ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসগুলি সমকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

সূচকশব্দ : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মীয়অনুষঙ্গ, আন্তঃপ্রণয়, স্ত্রীশিক্ষা, জাত্যাভিমান।

মূল আলোচনা :

২০১৯-২০২১ সাল আন্তর্জাতিক ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতির এক সংকটকাল। কোভিদ নামক এক মারণব্যাধির করাল মূর্তি বিশ্বজুড়ে সৃষ্টি করে চলেছে মৃত্যুমিছিল’। অদৃশ্য অতিমারির কালেই বেশকিছু মুসলমান সাহিত্যিকদের দ্বারা সৃজিত উপন্যাস-শতবর্ষের কষ্ঠিপাথরে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। মুসলমান সাহিত্যিকেরাও যে রবীন্দ্রনাথ,

শরৎচন্দ্র প্রমুখের সমসাময়িককালে অজস্র উপন্যাস-কাহিনি সৃষ্টি করেছিলেন তা যেন কালের গর্ভে বিস্মৃতির চোরাস্রোত সৃষ্টি করে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে চলেছে। বাংলা সাহিত্য সমাজে শতবর্ষ পূর্বে রচিত মুসলমান ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসগুলি আজ আর খুব একটা পঠিত হয়না। অথচ সমকালে উপন্যাসগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল তাদের বিষয়বস্তুর সাবলীল উপস্থাপনে।

অমুসলমান এক নায়কের সঙ্গে মুসলমান কন্যার প্রণয় নিয়ে কাহিনির ঠাস বুননে এক দুঃসাহসিক ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন আজহার আলি খন্দকার। ১৯১৯ এ প্রকাশিত তাঁর *'হামিদা'* উপন্যাসে শিখ যুবক নেহাল সিং এবং আফ্রিদি-কন্যা হামিদার অসম প্রেম-ভাবনাকে তুলে এনেছেন আজহার আলি। প্রেম সম্পর্ক যেমন ভৌগোলিক সীমা মানেনা, তেমনি ধর্মীয় সীমাবদ্ধতাও জানেনা। আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে এমন এক কাহিনির বিস্তার ঘটিয়ে আজহার আলি অসাম্প্রদায়িক মানসিকতারই পরিচয় দান করেছেন। সমকালে এমন আন্তঃপ্রণয় কাহিনি নিঃসন্দেহে লেখকের দুঃসাহসিক মানসিকতাকে চিহ্নিত করে। যদিও এ উপন্যাসের একজন বাঙালি কথক কাহিনিটি বর্ণনা করেছে। আর তারই বন্ধু ছিল শিখ যুবক নেহাল সিং[১(খোন্দকার,পৃ.৩)]। উপন্যাসটির অভিনবত্ব হল, যেকালে মুসলমান লেখকেরা কাহিনি গ্রন্থনায় সাধারণত মুসলমান নায়কের নায়িকা উপস্থাপন করতেন অমুসলিম, সেখানে লেখক ব্যতিক্রমী মানসিকতার পরিচয় দিলেন।

'হামিদা' রচনার দুবছর পূর্বে ১৯১৭ সালে রচিত *'বঙ্কিমদুহিতা'* উপন্যাসে মোহাম্মদ ইদরিস আলি মুসলমান নায়িকা কুলসুমের বিপরীতে হিন্দু যুবক যদুকে উপস্থাপন করলেও, ধর্মান্তর ঘটিয়ে যদুকে জহিরুল হকএ পরিণত করেছেন। নায়ক-নায়িকার প্রেম ভালবাসার চেয়েও লেখকের কাছে ধর্মীয় পরিচয় প্রধান হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের প্রারম্ভে দেখা যায় একই গ্রামে পাশাপাশি বসবাসকারী হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান ছিল। লেখকের কথায় – সেখানে হিন্দুদের মধ্যেও যেমন মহা আড়ম্বরের সঙ্গে শারদীয় উৎসব হয়, তেমনি মুসলমানের মধ্যেও মহা আড়ম্বরের সঙ্গে ঈদ উৎসব সুসম্পন্ন হয়ে থকে।[২(আলি,পৃ.৬)]

কিন্তু ঘটনার আবর্তে এই গ্রামীণ শান্তি শেষপর্যন্ত ব্যহত হয়। উপন্যাসটিতে অত্যাচারিত একটি হিন্দু পরিবারের প্রতি মাসুদ নামের এক মুসলমান চরিত্র যে দরদ ও সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে ওঠে – তার পিছনে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যই মুখ্য ছিল বলেই মনে হয়। উপন্যাসে যতগুলো মুসলমান চরিত্র আছে তারা কেউই অসৎ কাজে লিপ্ত থাকেনি। অপরদিকে দেখা যায় হিন্দু দ্বিজেন তারই স্বগোত্রীয় বঙ্কিম পরিবারের প্রতি চরম অত্যাচারী। লেখক এ উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের প্রতি জোর দিয়েছেন । উপন্যাসের মামুদ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই সে ব্যবসায় প্রভূত সাফল্য পেয়েছে ।

সমমকালীন যুগ পরিবেশে বাঙালি মুসলমান সমাজ আধুনিক শিক্ষার প্রতি ততটা আগ্রহী ছিলনা । মীর মশাররফ হোসেন যেমন আধুনিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতেন , সেই মতেরই সমর্থক ছিলেন সফিউদ্দিন আহমেদ। '*সৈয়দ সাহেব*(১৯১৭) উপন্যাসে তিনি আকাঙ্খা পোষণ করেছেন যে, আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সকলের জন্য উন্মুক্ত হোক । উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র সৈয়দ সাহেব জ্যামিতি, গণিত, বায়ুবিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা -শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাণীতত্ব , রসায়ন, ইত্যাদি বিষয়ে মুসলমানদের প্রাথমিক অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন । ধর্মব্যবসায়ী পীরসাহেবদের আদর্শ চ্যুতির পাশাপাশি ইংরাজি শিক্ষার বিরোধিতাকেও তিনি কটাক্ষ করেছেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় হিন্দুদের মতো মুসলমানদেরও ব্যবসা- বানিজ্য এবং আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। এ উপন্যাসের এক জমিদার বিশ্বাস করে যে, চাষার ছেলেদের জন্য পড়াশোনা নয়, কারণ তাতে ভদ্রলোকদের অপমান হয়। মুসলমান সমাজে ইংরাজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সমর্থন মেলে আব্দুল হাকিমের '*পল্লীসংসার*' (১৯১৮) উপন্যাসে। দুজন মৌলবির কথোপকথনের মাধ্যমে লেখক ইংরাজি শিক্ষাকে সমর্থন জানান। ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনে শিক্ষার জন্য চীনে যেতে হবে। হাকিমও এই মতের একান্ত অনুরাগী। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আবুল ফজল নিজের আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে ইংরাজি শিক্ষার প্রতি সমর্থনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিজের গ্রাম আলিনগরে স্থাপন করে একটি ইসলামিয়া কলেজ।[৩(হাকিম,পৃ.৪৯০)] পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় ভাবনার সমন্বয় রক্ষা করেই ফজল কলেজটির এরূপ নামকরণ করেন।

১৯১৯ এ প্রকাশিত '*উপেন্দ্র নন্দিনী*' উপন্যাসে আব্দুর রশিদ সিদ্দিকি কিছুটা সংকীর্ণ ভাবনার পরিচয় দিলেন। তিনি আন্তঃপ্রণয় বিষয়ে মুসলমান যুবকের নায়িকা সৃষ্টি করলেন এক হিন্দু নারীকে। রশিদ সিদ্দিকি যেন এ উপন্যাসে প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার পরিচয় দিলেন মুসলমান নুর মহম্মদের সঙ্গে হিন্দু জমিদার উপেন্দ্রর কন্যা সুশীলার প্রণয় দেখিয়ে। সুশীলা জমিদার কন্যা বলেই বোধ হয় তাকে পাওয়ার জন্য নুর মহম্মদ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে বলে ওঠে-

> ইহারা হিন্দু আমি মোসলমান ; হিন্দু মোসলমানের পরিণয় সম্ভব কি? হাঁ, অসম্ভব হবে কেন? ঐতিহাসিক ঘটনায় মোসলমান নায়কের সহিত হিন্দু নায়িকার অনেক বিবাহ দেখেছি। ... সুতরাং আমিও চেষ্টা করিব। এই সুন্দরীকে লাভ করিবার জন্য সোনার সংসারে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় করিব, নরকের ভীষণ যাতনা সহ্য করিব। তবু আমি ইহার পাণি গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইবনা।[৪(সিদ্দিকি,পৃ.৯)]

কাহিনির অগ্রগতিতে দেখা যায় নুর মহম্মদ বিবাহের পূর্বেই সুশীলাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে। তার নতুন নাম হয় জাহানারা। অবশেষে জমিদার উপেন্দ্র সপুত্র মেয়ে-জামাইকে মেনে নেয়।

সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে বিধিবদ্ধ ভাবনার ও আর্থসামাজিক অবস্থার রূপান্তর ঘটানো যে সম্ভব তা মনে প্রাণে বিশ্বাস কররতেন মহাম্মদ ইয়াসিন। তিনি তাঁর '*স্বর্গোদ্যান*' (১৯১৯) উপন্যাসে এই মতের সঙ্গে সংযোগ করেন ইসলামের সাম্যবাদ। ইয়াসিন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় নিজের মতের সমর্থনে লেখেন –

> গল্প উপন্যাসকে কীরূপে আমরা সাহিত্যের অঙ্গ হইতে বাদ দিতে পারি? ... উপন্যাস দ্বারা রুষিয়ার জাতীয় জীবন সঞ্জীবিত হইয়াছে। উপন্যাস দ্বারা বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন স্রোত অন্যদিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।[৫(পত্রিকা)]

'*স্বর্গোদ্যান*' উপন্যাসের নায়ক হামিদ মনে করে আধুনিক অর্থকরী শিক্ষা ব্যবস্থা কোনো জাতির সার্বিক উন্নতির একমাত্র উপায় হতে পারেনা। হামিদের এই বিশ্বাস আসলে লেখকেরই ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা পোষণ। বিশ শতকের সন্ধি লগ্নে বাঙালি মুসলমান জীবনে আশরাফ-আতরাফ-আরজলের উচ্চ-নীচ বিভাজন যেমন ছিল, তেমনি দুষ্ট ক্ষতের মতো ধর্মীয় জীবনে শিকড় গেড়ে ছিল নানা মজাহাব আর সিলসিলা। '*স্বর্গোদ্যান*' উপন্যাসে ইয়াসিন যেমন হিন্দু সমাজের ভেদ বিষয়ক সংস্কারকে মূল উপজীব্য করেছিলেন, তেমনি মুসলমান সমাজে মজাহাব বিভাজনের জন্যও হিন্দু সমাজকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর মতে-

> বর্বর অনুমোদিত জাতিভেদ প্রথাই অত্র দেশবাসীর জাতীয় জীবনের মূলে সাংঘাতিক রূপে কুঠারাঘাত করিয়াছে। ... বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয় মুসলমান জাতিরও জাতীয় জীবনের অধঃপতনকাল সমাগত হইয়াছে। হায়! এই অভিশপ্ত জাতির অনুকরণ করিতে গিয়া আজ তাহারাও অভিশপ্ত,বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত।

হায়! এখন তাহাদিগের মধ্যেও নানারূপ মজাহাবের সৃষ্টি হইয়াছে।[৬(ইয়াসিন,পৃ.৪৮-৪৯)]

'*স্বর্গোদ্যান*' উপন্যাসের আরও একটি তাৎপর্য পূর্ণ বিষয় এই যে, সমকালে বসেও লেখক স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করতেন সুসন্তান গঠনে মাতৃশিক্ষা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। একইভাবে তিনি মুসলমান রমণীর অবরোধ প্রথারও তীব্র সমালোচনা করেছেন।

ইসলাম সাম্যবাদের ধর্ম। সেখানে বংশ মর্যাদা বা জাত্যাভিমানের কোন অবকাশ নেয়। তবুও সমকালে বংশগৌরবকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় দেখা হত। মোহাম্মদ লুৎফর রহমান উদার দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে '*রায়হান*' (১৯১৯) উপন্যাসে জাত্যাভিমানের কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন। উপন্যাসের নায়ক খোরসেদ নিজেকে উচ্চবংশজাত মনে করে অহংকার প্রকাশ করলে তার মা নাফিসা তাকে উদারতার শিক্ষা দিয়ে বলে-

> পুরনো লোকের মধ্যে যারা উচ্চশ্রেণীর দাবী করে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বহু নীচতা আছে। ...

আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা সেইসব পুরনো ভদ্রলোকের চেয়ে বড়।[৭(রহমান,পৃ২১১)] লেখক তাঁর উপন্যাসে সামাজিক অস্পৃশ্যতা বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছেন। খোরসেদ, গিরি, রমেশ প্রভৃতি চরিত্রের ভিন্ন অবস্থান এবং পারস্পরিক ছোঁয়াছুঁয়ির বালাইকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন।

'*রায়হান*' উপন্যাসে অন্যান্য অনেক বিষয়- যেমন পতিতাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদান, পুলিশের ঘুষ নেওয়ার প্রতি বীতরাগ, আধুনিক শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, স্ত্রী শিক্ষার প্রতি সমর্থন, হিন্দু মুসলমানের মিলন প্রসঙ্গ লেখকের মানবিক সমর্থন লাভ করেছে।

১৯২০ সালে মুহম্মদ আশরাফ আলি লেখেন '*মোমেনা*' উপন্যাসটি। এই গ্রন্থে লেখক মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব বোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইসলামের মূল আদর্শই হল পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঐক্যের বার্তা দান করা। উপন্যাসের চরিত্র দানেশ মিঞা লেখকেরই ভাবাদর্শ বহন করে মন্তব্য করে যে, মুসলমান যতদিন ইসলামকে কায়েম রাখবে ততদিন তারা জগতকে পরিচালনা করবে। উপন্যাসটির আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল যে, লেখক মুসলমান নারীর পর্দাপ্রথার কঠোরতার প্রতি খুব একটা বাড়াবাড়িকে আমল দেননি। কোরানের নির্দেশ অনুসারে পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্র সন্তানের পাশাপাশি কন্যাসন্তানকেও প্রাপ্য অধিকার দেওয়া হয়েছে। '*মোমেনা*'*র* নারীচরিত্র হামিদা তার ভাই নুরুল কর্তৃক চক্রান্তের শিকার হয় পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার জন্য। লেখক এই ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে স্বগতোক্তি করেন –

> এই ভুল বা শয়তানের জন্য মোছলমান আজ জাতিকে জাতি রসাতলে যাইতেছে।[৮(আলি,পৃ৫৮)]

হিন্দু সমাজ তথা হিন্দু নারীর স্খলনের চিত্র উপস্থাপনে যেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই এবনে নূর '*হিন্দুনারী*'(১৯২০) উপন্যাসটি রচনা করেন। উপন্যাসটিতে হিন্দু মুসলমানের আন্তঃপ্রণয়ের চিত্রের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে হিন্দু নারীর ব্যভিচারের দৃশ্য। অতি আক্রমনাত্বক ভঙ্গীতে লেখক হিন্দু সমাজের সমালোচনা করেছেন। মুসলমান যুবক ফারুকের উত্তম চারিত্রিক দৃঢ়তায় মুগ্ধ হয়ে হিন্দু নারী করুণা তাকে প্রেম নিবেদন করলে ফারুক জানায় –

> যে নারী মোসলেম নারীর ন্যায় সমগুণ ধারিণী নয়, সেরূপ নারীকে মোসলেম সহধর্মিণী রূপে গ্রহণ করেনা। আপনি যতদিন মোসলেম নারীর ন্যায় হতে না পারেন ততদিন ও আকাঙ্খা ত্যাগ করুন।[৯(নুর,পৃ১১২)]

পরে করুণা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রহমতবানু নাম নিয়ে ফারুককে বিয়ে করলেও আদর্শ মুসলিম নারী হতে নাপারার ধুয়ো তুলে ফারুক আরবে চলে যায়। আর ব্যর্থ মনোরথ করুণা আত্মদীর্ণতায় প্রাণ বিসর্জন দেয়। এক্ষেত্রে লেখকের পক্ষপাতমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবেই করুণার ইসলামত্বকে মান্যতা দেননি।

নুরুল হক চৌধুরীর ‘*কালাপাহাড়*’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। এ উপন্যাসে লেখক ইংরেজ-রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে মুসলমানদের পক্ষে মঙ্গলজনক বলেই অভিহিত করেন। তাঁর মতে –

> কার্যক্রমে যদি প্রবল ইংরাজ শক্তির আবির্ভাব না হইত, তবে মুসলমান রাজ্য অচিরে হিন্দু রাজ্যে পরিণত হইত।[১০(চৌধুরী,পৃ ৮০)]

এগ্রন্থে লেখক ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতি নরম মনোভাব প্রকাশ করেছেন। কাহিনি গ্রন্থনায় জানা যায় যে, হিন্দু ধর্ম বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করে কালীকৃষ্ণ বোঝে হিন্দু ধর্ম অসার মাত্র। তাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রেজা খাঁ ওরফে কালাপাহাড় নামে পরিচিত হয়। অন্যদিকে সে নিজের প্রেমিকা কমলকুমারীকেও ছকিনা খাতুন নাম দিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করে।

ধর্মের সঙ্গে সঙ্গীতের যে কোন সংঘাত নেই, এমন একটি বলিষ্ঠ মত প্রতিষ্ঠা করেন গোলাম মোস্তফা তাঁর ‘*ভাঙ্গাবুক*’ (১৯২১) উপন্যাসে। এ উপন্যাসে লেখকের মুসলমান নারীর মর্যাদা সম্পর্কে এক নির্ভেজাল শ্রদ্ধা লক্ষ্য করা যায়। তিনি মুসলমান ধর্মতাত্বিক এবং ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক যুবকদের পারস্পরিক তুলনা করে জানান যে, মৌলবিরা স্ত্রীদের দাসী গণ্য করলেও ইংরেজি শিক্ষিতরা তা কখনই ভাবেনা। উপন্যাসের নায়ক মোয়াজ্জেম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে –

> সমাজ যাকে বিবাহ আখ্যা দিয়েছে, সেটা বিবাহ নয়, সেটা কেবল অভিভাবকদিগের স্বার্থসিদ্ধি – সেটা ছেলেমেয়েদের বেচাকেনা! আর এই যে বেচাকেনা, তাও দেখে শুনে নয়, আন্দাজে আন্দাজে নসিবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।[১১(মোস্তফা,পৃ ১৩৮)]

‘*ভাঙ্গাবুক*’ উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ভাবনাকে বড় করে দেখা হয়েছে। নিজ নিজ আচরণ পদ্ধতি বজায় রেখেও হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সদ্ভাব বজায় রাখতে কোন অসুবিধা হতে পারেনা বলেই লেখকের অভিমত।

ইসলামের ‘শেরেক-বেদাত’ প্রসঙ্গ প্রকট হয় উঠেছে বেলায়েত আলির ‘*মিলন-কুটির*’ উপন্যাসে।উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়ে ছিল ১৯২১ সালে। গ্রন্থটিতে ধনী মনসুর আলির পাটের ব্যবসা করে অসৎ উপায়ে প্রচুর নগদ টাকা কামিয়ে ধনী হয়ে ওঠার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তার জামাতা তথা উপন্যাসের নায়ক ইস্কান্দার মনে করে প্রচুর নগদ অর্থই মনসুরকে ‘শেরেক-বেদাত’ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইস্কান্দার সমর্থন করতে পারেনি মনসুরের ইসলাম বিরুদ্ধ কাজকে।

শতবর্ষ পূর্বের বহু মুসলমান ঔপন্যাসিক অজস্র উপন্যাস রচনা করেছিলেন। অতিমারির মারনব্যাধি যেমন *নিঃশব্দে ২০১৯* থেকে *২০২১* পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে তাণ্ডবলীলায় মৃত্যু মিছিল দেখিয়ে গেল, তেমনি সাধারণ পাঠকগণও শতবর্ষ পূর্বের উপন্যাসগুলির

কথা নিঃশব্দে ভুলে গেছেন। কালের গভীর ঘুমে পাঠকেরও স্মৃতিরেখাগুলোই একটা চিরন্তন ঝাড়পোঁছ হয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র :

১. খোন্দকার.,আ.আ.-*হামিদা* , মেটকাফ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা, ১৯১৯, পৃ.৩

২. আলি.,ই. মো. সে. – *বঙ্কিম দুহিতা,* প্রকাশক- মুবারক আলি, কলকাতা, ১৯১৭, পৃ.৬

৩. হাকিম., আ. – *পল্লীসংসার,* প্রকাশক- মুহম্মদ ফাজেল, কলকাতা, ১৯১৮, পৃ. ৪৯০

৪. সিদ্দিকি., র. আ. - *উপেন্দ্র নন্দিনী,* প্রকাশক- আজিজুল খাঁ, কলকাতা, ১৯১৯, পৃ.৯

৫. *পত্রিকা.,* সা. মু. ব. বৈশাখ ১৩২৬

৬. ইয়াসিন., মো. – *স্বর্গোদ্যান* , মখদুমি লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯১৯, পৃ.৪৮-৪৯

৭. রহমান., লু. – *লুৎফর রহমান রচনাবলী,* ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ.২১১

৮. আলি., আ. মু. – *মোমেনা,* প্রকাশক- সুলেমান খান, কলকাতা, ১৯২০, পৃ.৫৮

৯. নুর., এ. – *হিন্দুনারী* , কোহিনুর লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯২০, পৃ.১১২

১০. চৌধুরী., নু. - *কালাপাহাড়* , মখদুমি লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯২০, পৃ.৮০

১১. মোস্তফা., গো. – *ভাঙ্গাবুক,* প্রকাশক - সিরাজুল ইসলাম, কলকাতা, ১৯২১, পৃ. ১৩৮

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের *দহন* : প্রতিবাদী নারী কণ্ঠ

তমা পাত্র
গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : *দহন* উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই নিহিত আছে উপন্যাসটির সার্থকতা অর্থাৎ সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে লেখিকার বার্তা। সংসার বৃত্তে রমিতার মতো গৃহবধূদের যেমন শারীরিক ও মানসিক দহন আছে, ঠিক তেমনি চাকুরীরতা মাধুরীর মতো গোঁড়া পরিবারের গৃহবধূদেরও এক অন্য রকম দহন-জ্বালা ভোগ করতে হয়। চাকরি করার সাথে সাথে মাধুরীকে ঘরের সমস্ত কাজ একা হাতে করতে হয় বলে সাধারণ গৃহবধূদের তুলনায় তার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম অনেক বেশি হয়। অপর দিকে ঝিনুক প্রতিবাদী প্রকৃতির নারী, তার প্রেমিক তূণীর বুঝতে পারেনি যে ঝিনুকের আনন্দ নিহিত রয়েছে অপরাধীদের শাস্তিতে, অন্যায়ের পরাজয়ে, ন্যায় এবং সত্যের প্রতিষ্ঠায়। প্রত্যেক নারীর আলাদা একটা ভাবনার জগত থাকে, সেই জগতে নিজের অন্তর্বেদনাকে চেপে রেখে সৃষ্টিশীল মানবজীবনের মন্ত্রে সে এগিয়ে চলে। মৃণালিনী চরিত্রের মধ্যে আমরা সেই অন্তর্বেদনাকে চেপে রেখে জীবন অতিবাহিত করার ক্ষমতা দেখতে পাই। রমিতা ভিতু, পরাধীনচেতা হলেও তার দিদি প্রমিতা আবার স্বাধীনচেতা, স্বামী-কন্যাকে নিয়ে তার সুখের সংসার। লেখিকা এই উপন্যাসে ঝিনুক, অপরদিকে রমিতা, প্রমিতা ও মৃণালিনী এই চার নারীকে ভিন্ন রূপে এঁকে রমণীদের পৃথক সত্তার এবং পৃথক অবস্থানকে চিত্রায়িত করেছেন। সমাজে নারীর সুখ-দুঃখ, ত্যাগ-যন্ত্রণা, আনন্দ এবং প্রতিবাদের দিকটাও এই উপন্যাসে বাদ যায়নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর দুরবস্থা ঘোচানোর ভার যে নারীকে নিজের কাঁধেই তুলে নিতে হবে সেই কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য এই উপন্যাসে। আজও নারী বাইরের জগতে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষা ও কর্মে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করছে কিন্তু সমাজের, মানুষের ও আইনের, সংশোধন বা প্রণয়ন আজও প্রয়োজন। প্রয়োজন নারীর অধিকার অর্জন ও ন্যায় পাওয়ার জন্য প্রতিবাদ এবং সংগ্রামের। সেই বার্তাগুলোই সুচিত্রা ভট্টাচার্যের *দহন* উপন্যাসে প্রতিবাদী নারীদের কণ্ঠে উঠে এসেছে।

সূচক শব্দ: নারীর যন্ত্রণা, শ্লীলতাহানি, বেটাছেলে, লিঙ্গ বৈষম্য, দ্বিতীয় লিঙ্গ, নারীবাদী, মূল্যবোধ, পুরুষতন্ত্র, প্রতিবাদ, সমাজ, দহনজ্বালা

প্রতিপাদ্য বিষয় :

লিঙ্গ বৈষম্য সমাজের ব্যাধি স্বরূপ। দ্বিতীয় লিঙ্গের ধারণা সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যকে তরান্বিত করে। প্রখ্যাত ফরাসী নারীবাদী লেখক সিমোন দ্য বোভোয়ার লেখা 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' (ফরাসী ভাষায়: 'Le Deuxieme Sexe') বইটিকে নারীবাদের গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি

হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পৃথিবীতে কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, তাকে নারী রূপে গড়ে তোলা হয়। ছোট থেকে বিভিন্ন ছড়া ও গল্পের মাধ্যমে এই গড়ে তোলা শুরু হয়। যেমন—

'দোল দোল দুলুনি
রাঙা মাথায় চিরুনি।
বর আসবে এখুনি
নিয়ে যাবে তক্ষুনি।' - (প্রচলিত ছড়া)

অথবা, 'এক রাজার তিন রাণী ছিল।....' (প্রচলিত গল্প)

কিশোরীরা এর বিপরীত গল্প কখনও কারও কাছে শুনতে পায় না, আর ভাবতেও শেখে না 'এক রাণীর তিন রাজা'। অর্থাৎ ছোট বয়স থেকেই নারী ও পুরুষের অবস্থানের পার্থক্যটি শিশুর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রাচীনকাল থেকেই নারী সম্পর্কে উচ্চতর ধারনা পোষণ করা হত না। পৃথিবীর বিখ্যাত বহু পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে নারী ছিল নগণ্য। শেক্সপিয়ার বলেছেন, নারী অসহায় ও দুর্বল; অনিশ্চয়তা পূর্ণ তার জীবন। অরিস্টটলের মতে, নারীর কিছু মৌলিক গুণাবলির অভাব-ই নারী হওয়ার মূল কারণ। রুশো মনে করতেন, নারী স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য নয়, অন্যের বশবর্তী হয়ে থাকাই তার পক্ষে বেশি সুবিধার। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এই ধ্যান-ধারণাগুলি এখন ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে এলেও তার শিকড় এখনও নির্মূল হয়নি।

যারা নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলেন, তাদের নারীবাদী বলা হয়ে থাকে। এই Feminism বা নারীবাদ হল সেই বিশ্বাস যার লক্ষ্য হল নারী ও পুরুষের সমান অধিকার, ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধার প্রাপ্তি। আধুনিক যুগে নারীর দুরবস্থা, অধিকার, অপমান, লাঞ্ছনা নিয়ে বহু মহান ব্যক্তি বিভিন্ন কথা বলে গেছেন, এখনও প্রতিনিয়ত বলে চলেছেন, তবু সমাজে নারীর অবস্থান আজও সংকটজনক। তাই নারীর এই দুরবস্থাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য কলম ধরল নারীরা নিজেই। বাংলা সাহিত্যে লেখিকাদের সংখ্যা স্বল্প হলেও তারা নিজ শাখায় যথেষ্ট বলিষ্ঠ ও সক্রিয়। বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) তাঁর *দীপনির্বাণ* উপন্যাসটির মাধ্যমে, এর পরে আসেন অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮), নিরুপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১) প্রমুখ। কিন্তু এই সব উপন্যাসগুলি ছিল ইতিহাসাশ্রয়ী বা সমাজস্বীকৃত মূল্যবোধের জয়জয়কারের কাহিনী। জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৬-১৯৮৮) প্রথম কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও প্রথম তাঁর উপন্যাসের নায়িকারাই প্রশ্ন তুলতে শুরু করে— শুধু পুরুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই কি মেয়েদের বেঁচে থাকা? যে স্ত্রীশিক্ষার অভাব তিনি নিজের জীবনে অনুভব করেছিলেন, তাঁর কথাসাহিত্যের নায়িকারা সেই শিক্ষাকেই ব্যবহার করেছিলেন আত্মপ্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসাবে। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র যখন বাঙালি মুসলমানদের চরিত্র চিত্রণে বিরত ছিলেন, ঠিক তখনি মাত্র কুড়ি বছর বয়সের তরুণী এক লেখিকা শৈলবালা ঘোষজায়া

(১৮৯৪-১৯৭৪) *শেখ আন্দু* উপন্যাসটি লেখেন (*প্রবাসী* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়)। এই উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন এক মুসলমান ছেলের প্রেমে নিমজ্জিত বিধবা ব্রাহ্মন রমণী। সেই সময় এই আখ্যান রচনার জন্য তাকে তিরস্কৃত ও বহু সমালোচিত হতে হয়। *শেখ আন্দু* উপন্যাসটি সেই সময়ের ধর্মান্ধ গোঁড়া সমাজের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। বিংশ শতকের শুরুর দিকে সমাজের প্রতি প্রতিবাদীমূলক উপন্যাসগুলি উঠে আসে নারীর কলমে।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মেয়েদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন শুরু হয়। পর্দানশিন থেকে ক্রমশ তারা শিক্ষার আলোতে আসে। এর প্রতিফলন পড়লো বাংলা সাহিত্যে। পুরুষ শাসিত সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে ধারণাগুলি বদলে যায় বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে— আশাপূর্ণা দেবী(১৯০৯-১৯৯৫), প্রতিভা বসু (১৯১৫-২০০৬), মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬) মত লেখিকাদের হাত ধরে। এই ধারার পরবর্তী যোগ্য উত্তরাধিকারী হলেন কথাসাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০-২০১৫)। বিশ শতকের শেষ দুটি দশক ও একবিংশ শতকের দেড় দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। এই সুদীর্ঘ সময়কালে তিনি প্রায় অর্ধশতাধিক উপন্যাস ও দ্বি-শতাধিক ছোটগল্প লিখেছেন। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি হল—*কাঁচের দেওয়াল, দহন, হেমন্তের পাখি, আমি রাইকিশোরী, গহিন হৃদয়, কাছের মানুষ* প্রভৃতি। তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্পগুলি হল— 'ময়না তদন্ত', 'নারী তান্ত্রিক', 'ইচ্ছের গাছ', 'বাজী' প্রভৃতি। *দহন* উপন্যাসের প্রতিবাদী নারী কণ্ঠকে এই প্রবন্ধের আলোকে নিয়ে আসাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৯৫০ সালে ভাগলপুরে মামার বাড়িতে সুচিত্রা ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করলেও কোলকাতাতেই তাঁর বেড়ে ওঠা। বাবার অনুপ্রেরণায় অল্প বয়সে তিনি কলম ধরেন, কিন্তু সেই লেখার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় জীবনের এক বিপর্যয়ে। লেডি ব্রেবন কলেজে কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াকালীন বাড়ীর অমতে নিজ পছন্দের পাত্র প্রদীপ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এর পর শুরু হয় তার প্রবল জীবন সংগ্রাম এবং আর্থিক অনটন। তিনি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন, ফলে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। সেই পরিচিতির ভিন্ন অভিজ্ঞতার স্বাদ তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থসংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য বেসরকারি চাকরির পাশাপাশি পড়াশোনা করতে হত। এক সাক্ষাতকার থেকে জানতে পারি, এই সময় তার একমাত্র কন্যা সন্তান জন্মগ্রহন করেন। কেমিস্ট্রি অনার্স সম্পূর্ণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পরে ফলে বাংলা সাহিত্যে সাম্মনিক নিয়ে স্নাতক উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৯ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম সরকারি চাকরিতে বহাল হন। এরপর জীবনের সংগ্রাম লঘু হওয়ায় তিনি লেখাতে মননিবেশ করেন। সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি এত মগ্ন থাকতে পছন্দ

করতেন যে ২০০৪ সালে স্বেচ্ছায় অবসর নেন চাকরি থাকে। এরপর শুরু হয় কেবলই সাহিত্য সাধনা।

গল্প লিখে তিনি প্রথম বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করলেও উপন্যাস, শিশু-সাহিত্য এবং 'মিতিন মাসি'র ডিটেকটিভ গল্পগুলিতেও তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'জীবনের রং' যা ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে *সিনেমাজগৎ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর আনন্দবাজার, *দেশ, বর্তমান, যুগান্তর* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু ছোটগল্প একে একে প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস *সূর্যাস্তের ময়ূর* ১৯৮৪ সালে *শারদীয়া সংখ্যা*-য় প্রকাশিত হয়, পরে গন্থাকারে প্রকাশের সময় নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় *যখন যুদ্ধ* (১৯৮৬)। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *আমি রাইকিশোরী* (১৯৮৯)। এই উপন্যাসের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। তাঁর তৃতীয় উপন্যাস *কাঁচের দেওয়াল* (১৯৯২), পড়ে পাঠক তাঁর লেখার প্রতি আকৃষ্ট হয়। *কাঁচের দেওয়াল* প্রকাশিত হওয়ার পরেই সুচিত্রা ভট্টাচার্য সু-লেখিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তখন থেকে তিনি লেখার প্রতি বেশি করে আকর্ষণ অনুভব করেন এবং পরপর *কাছের মানুষ* (১৯৯৮), *হেমন্তের পাখি* (১৯৯৭) ও *দহন* (১৯৯৪) লিখে জয়ের শিখরে ওঠেন।

দহন উপন্যাসটি ১৯৯৪ সালে শারদীয় *দেশ* পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ পায় ১৯৯৮ সালে 'আনন্দ পাবলিশার্স' থেকে। এই উপন্যাসটি ঋতুপর্ন ঘোষের পরিচালনায় চলচ্চিত্রায়িত হয় ১৯৯৬ সালে। যার মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র দুটিতে অভিনয় করেন শ্রবণা সরকার ওরফে ঝিনুক-এ ইন্দ্রাণী হালদার এবং রমিতা চৌধুরীতে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। 'দহন' চলচ্চিত্রটির জন্য ঋতুপর্ণ ঘোষ National Film Award for Best Screenplay-র সন্মানে সম্মানিত হন। এছাড়াও সুচিত্রা ভট্টাচার্যের বহু উপন্যাস চলচ্চিত্রের রূপ লাভ করে যেমন—*হেমন্তের পাখি, অলিক সুখ, গহিন হৃদয়, রঙিন পৃথিবী* প্রভৃতি। তাঁর লেখাগুলি এত স্পট লাইটে আসত কারণ সেগুলি ছিল বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে লেখা, মানুষের একদম মনের কথা। *দহন* উপন্যাসের পাঠক এবং দর্শকেরা তাকে এত জনপ্রিয় করে তুলেছিল যে প্রায় প্রতি আগ্রহী পাঠকের ঘরে ঘরেই সুচিত্রার লেখা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল, বিশেষ করে নারীর অন্দরমহলে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের বেশির ভাগ লেখাই নগর জীবন কেন্দ্রিক, যার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা, নীচতা, উদারতা, জটিলতা, ভালবাসা প্রভৃতি। তবে এদের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে মেয়েদের জীবন যন্ত্রণার কথা। তাদের দুঃখ-দুর্দশা, সুখ, সংকীর্ণতা, উদারতা, পেশাগত ও আশ্রয়গত জীবনযাপনের নানান সমস্যার প্রতিফলন এই *দহন* উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঝিনুক-কে সৎ এবং স্পষ্টবাদী, প্রতিবাদী নারী রূপে গড়ে তুলেছেন লেখিকা। উপন্যাসটি শুরু হয় দূরদর্শনে দৃশ্যমান এক অশ্লীল দৃশ্য দিয়ে—

> উত্তাল সমুদ্রের মতো ঢেউ ভাঙছিল দুটো শরীর। ঢেউয়ের বুকে ঢেউ। ঢেউয়ের পিঠে ঢেউ। অবিরাম ঢেউয়ের অভিঘাতে চলকে চলকে উঠছে আদিম রিপু। সুদর্শন ছেলেটা গানের কথা আর সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পিঠ বুক উদর নিতম্ব কোমর সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাঁটছে রূপসী মেয়েটাকে।[১]

যেই দৃশ্যটা ঝিনুকের একদমই ভাল লাগছিল না, কিন্তু বাকিরা সবাই উপভোগ করছিল। এর মধ্য দিয়ে লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন এযুগে বড়ো ও ছোটদের মাঝে পর্দার আড়ালটা ক্রমশ সরে যাচ্ছে। ছোটোরা খুব সহজেই বড়দের উন্মত্ত জীবন-যাপন প্রত্যক্ষ করছে। সতেরোটি পর্বে বিভক্ত *দহন* উপন্যাসটির জটিলতা শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বে, টালিগঞ্জের মেট্রো স্টেশনে এক বনেদি পরিবারের গৃহবধূ রমিতা চৌধুরীর শ্লীলতাহানিকে কেন্দ্র করে---

> হঠাৎ একটা জোর ঝাপটা এসে ভিজিয়ে দিয়ে গেল রমিতাকে। রমিতা নিজেকে আড়াল করার সময়ও পেল না। ঠিক তখনই পিঠের খোলা জায়গাতেও এক অচেনা হাতের স্পর্শ। চমকে তাকাতেই হাতের মালিকের চোখে চোখ।...কুৎসিত অশ্লীল চাহনি। রমিতা পলাশের দিকে ঘেঁষে এলো। আঁচল টেনে শরীরের অনাবৃত অংশগুলো ঢেকে নিল ভাল করে। পিঠ। কোমর। নাভিদেশ।[২]

এক কালবৈশাখীর ঝড়ের সন্ধ্যা রমিতার সুন্দর জীবনকে নিমেষে ওলট-পালট করে দিয়ে গেল। বহু জনসমক্ষে চারজন লম্পট মাতাল রমিতার শ্লীলতাহানি করেছে। কেউ তার প্রতিবাদ না করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে। তার স্বামী পলাশ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় বারংবার, এই সময় জনারণ্যের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা উদ্বিগ্ন, হতবাক ঝিনুক রমিতাকে উদ্ধার করে।—

> মুহূর্তে কী যেন হয়ে গেল ঝিনুকের। কাঁধের ব্যাগ দু'হাতে চেপে দৌড়ে এসেছে দৃশ্যের মাঝখানে। অ্যাই জানোয়ার, ছাড়ো, ছাড়ো, বলছি। চেহারাপত্র সব ভদ্রলোকের মতো...
>
> নীল জিনসের জ্যাকেট কাছে এগোতেই হাতের ভারী ব্যাগ প্রচণ্ড শক্তিতে চালিয়েছে ঝিনুক। উদভ্রান্তের মতো এলোপাথাড়ি ব্যাগ ঘুরিয়ে যাচ্ছে। কালো টিশার্টকে পিছন থেকে জোর টান মারায় রমিতা মুক্ত হয়েছে অনেকটা। লুটোনো আঁচল কোনওক্রমে গায়ে জড়াতে জড়াতে সে দেখল কালো টিশার্ট এগিয়ে যাচ্ছে তার রক্ষাকর্ত্রীর দিকে।[৩]

একজন মেয়ে আর একজন মেয়ের অপমান দেখে যে ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়, মেট্রস্টেশন ভর্তি মানুষের একজনও এগিয়ে আসে নি। পলাশ ও রমিতাকে ঝিনুকই পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গেছে, অতগুলো প্রত্যক্ষদর্শী থাকার সত্ত্বেও একজনও তাদের সাথে থানায় যায় নি। একজনের উপকারে অন্যজন এগিয়ে না আসা সমাজের

এই অবক্ষয়ের অনেক উদাহরণ সুচিত্রার লেখাতে আমরা পাই। ঝিনুকের এই সাহসিকতার জন্য সমাজ তাকে বাহবা দেয়, খবরের কাগজে তার নাম ওঠে— “বিক্রমশীলা মহাবিহারের তরুণী শিক্ষিকা শ্রবণা সরকার জীবন বিপন্ন করে সন্মান রক্ষা করলেন রমিতা চৌধুরী নামক জনৈক গৃহবধূর”। অথচ অন্য কোনও বিষয়ে ঝিনুক প্রতিবাদ করলে সেই সমাজ তাকে বলে ‘বড়ো বেটাছেলে হয়ে গেছে ঝিনুক’। এমনকি তার মা তাকে বলে ‘বেটা ছেলের বাপ’। ঝিনুককে কেউ বোঝে না, এমনকি তার প্রেমিক তূণীরও না। সমাজের তিরস্কারে ঝিনুক যখন নিঃসঙ্গতা অনুভব করেছে তখন তার মনের মানুষ তূণীরও সঙ্গ দেয় নি তাকে, অফিসের কাজ নিয়ে তখন সে ব্যস্ত কারণ কর্মের সামন্য গাফিলতিতে তার বিদেশ যাত্রা পণ্ড হতে পারে। তাই কর্মঠ তূণীর ঝিনুকের সহমর্মী হতে পারে নি।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য তার অনেক উপন্যাসে দেখিয়েছেন মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু, তার এক ঝলক এই উপন্যাসে দেখতে পাই। বিক্রমশীলা মহাবিহারের শিক্ষিকারা আলোচনা করে শ্লীলতাহানির সময় রমিতা কি পোশাক পরেছিল—

> রমা খাতার গোছা পাশে সরিয়ে রাখল, — বউটার ড্রেস কীরকম ছিল রে? সভ্য ভব্য না প্রোভোকেটিং? শাড়ি ব্লাউজ। ঝিনুক হাত ওলটাল, — ব্লাউজটার বুক পিঠ একটু বেশি কাটা ছিল ঠিকই, তা আমার তো তেমন বেখাপ্পা লাগেনি।
>
> তাই বল। এ কথা তো কাগজের লোকদের বলিসনি। লেখা এক টুকরো আপেল মুখে পুরল,— ঝড়বৃষ্টির রাত, ওরকম একটা ফাটাফাটি সুন্দরী, তার আবার ব্লাউজ লো কাট মুনিঋষিদেরই মতিভ্রম হতে পারে...[৪]

মেয়েদের সৌন্দর্য এবং পোশাক কি শ্লীলতাহানির মূল কারন? এই প্রসঙ্গে ভুসুকুপাদের একটা লাইন মনে পড়ে যায় ‘অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী’ অর্থাৎ রমিতার অতি সৌন্দর্যই যেন তার শত্রু হয়ে উঠেছে। সেই লম্পট ছেলেদের ক্রুরতাকে নগণ্য করে রনিতার পোশাকই যেন শ্লীলতাহানির মুখ্য কারন হয়ে উঠেছে। এই ঘটনা ঘটার পরে রমিতা এক ট্রমার মধ্যে চলে গেছে। তার শ্বশুর বাড়ির সবাই এমনকি তার স্বামী পলাশ পর্যন্ত এই বিষয়টি নিয়ে রমিতাকে কারোর কাছে মুখ খুলতে নিষেধ করেছে, যাতে তাদের পরিবারের সন্মান নষ্ট না হয়। গৃহবধূ রমিতার প্রতিবাদের তেমন জোর নেই। যেদিন সে পলাশকে তীব্র ভৎসনা করে সেদিন রমিতা নিজের স্বামীর কাছেই ধর্ষিত হয়—

> ছোঁবে না। একদম ছোঁবে না তুমি আমাকে। ছাড়ো বলছি। ছেড়ে দাও।
>
> এখনও বুঝি ছেলেগুলোর ছোঁয়া ভুলতে পারোনি? পলাশের কণ্ঠ ঘাতকের মতো নির্দয়। মত্ত হস্তির দাপটে চূর্ণ করছে রমিতার প্রতিরোধ। রমিতা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে এল। পোড়া কাঠের মতো পড়ে থাকা তার শরীরটার ওপর পৌরুষ বর্ষণ করে চলেছে পলাশ। উন্মাদের মতো বিড়বিড় করে চলেছে,— দেখি কোন শ্রবণা সরকার বাঁচাতে পারে তোমাকে। দেখি। দেখি।[৫]

দোষী কয়েকটি দুষ্টচরিত্রের ছেলে অথচ কলঙ্কিত হল রমিতা, কেবল নারী বলেই স্বামীর সন্দেহের আগুনে সে হল ধর্ষিত আর সেই ভালবাসার আস্তিত্বহীন রাতে রমিতার গর্ভে অঙ্কুরিত হল সন্তান, নেহাতই জৈবিক নিয়মে। এখানে ঔপন্যাসিক নারী মনের চরম ব্যর্থতা ও হতাশাকে তুলে ধরেছেন নিখুঁত ভাবে। নারীর অনিচ্ছার সত্ত্বেও ভালোবাসাহীন সঙ্গমে যে বীজ অঙ্কুরিত হয় সেই সন্তান নারীর কাম্য নয়, রমিতার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ঝিনুক আত্ম-সচেতন, মানবিক মূল্যবোধ এবং লিঙ্গ-বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন। প্রতিবাদী ঝিনুক বার বার প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাঁধা পায়। স্কুলে একটি বাচ্চাকে শাসন করলে তাকে স্কুলের প্রিন্সিপাল ‘সুনিতা আন্টির’ কাছে শুনতে হয় সে খুব ‘অ্যাগ্রেসিভ’। সহকর্মী গীতালি বলেন ঝিনুক কেমন যেন ‘রাফ হয়ে যাচ্ছে’। রমিতাকে যারা অপমান করেছে তারা যাতে শাস্তি পায় তাই ঝিনুক বারবার থানায় এবং আদালতে গিয়ে খোঁজ নেয় আসল অপরাধীরা ধরা পড়ল কিনা বা আদালতের রায় কোন দিকে। কিন্তু তার মা সুজাতা মেয়ের ঘনঘন থানায় যাওয়াকে ঠিক মেয়েলি কাজ বলে মনে করেন না, পুরুষালি কাজ বলেই ভাবেন। সমাজে নারীর স্থান যে পুরুষের নিচে, পুরুষ যে নারীর থেকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা বেশি পায় এবং পুরুষের মতামতের দাম যে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার নিদর্শন পাই এই উপন্যাসে ঝিনুকের মা সুজাতার ব্যবহারে। ঝিনুকের ভাই ছোটন, ছেলে বলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ কেবল সে পায়। সুজাতা ঝিনুকের থেকে তার হবু জামাই তূণীরের কথার বেশি গুরুত্ব দেন।—

> সুজাতা বলল, তোমার দিদি তো এমনিতেই ভিরমি খাওয়াচ্ছে ছেলেটাকে। হুট-হাট এমন তর্ক জুড়ে দেয়......
> ভুল বললে তর্ক জুড়ব না? ঝিনুক প্রতিবাদ জানাল, তূণীরের কথা কি বেদবাক্য নাকি? বেদবাক্য কিনা জানি না, তবে তোমার থেকে তূণীরের প্র্যাকটিক্যাল সেন্স অনেক বেশি। কীসে কী হয় ও অন্যের ভাল বোঝে।[৬]

কেবল তূণীর পুরুষ মানুষ বলেই তার সব কথা নির্বিবাদে মেনে নিতে হবে ঝিনুককে?, ঝিনুক স্বাবলম্বী, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা এবং সাহস দুটোই তার মধ্যে বর্তমান। সে রমিতার মত পরাধিনচেতা ও ভিতু নয়, ভুলকে ভুল এবং ঠিক কে ঠিক বলার ক্ষমতা তার আছে। তার আত্ম-বিশ্লেষণাত্মক শক্তি প্রবল আর এই খানেই ঝিনুক অন্য সব নারীর থেকে পৃথক।

প্রাচীনকাল থেকেই আমরা দেখে আসছি সমাজে যারা বিত্তশালী তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষী মেলে না, তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির জোরে তথ্য-প্রমাণ লোপাট করে নিশ্চিন্তে জীবন অতিবাহিত করে তারা। বিংশ শতকের শেষ দিকে যে এর কোনও পরিবর্তন ঘটেনি তা লেখিকা বুঝিয়ে দেন *দহন* উপন্যাসে রমিতার শ্লীলতাহানিকারিদের শাস্তি না পাওয়ার মধ্য দিয়ে। রমিতা চৌধুরীকে যে চারজন

শ্লীলতাহানি করেছিল তার মধ্যে তিন জন ছিল প্রভাবশালী বাড়ির সন্তান। থানার ওসি সহযোগিতা প্রবণ হওয়ার সত্ত্বেও অপরাধীরা ধরা পড়ছিল না। যখন অপরাধীরা ধরা পড়লো, তাদের বিচারের আগেই ওসিকে বদলি হয়ে যেতে হল প্রভাবশালীদের অঙ্গুলিহেলনে। এখানে লেখিকা বর্তমান সমাজের এক অতি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। সততার প্রেক্ষিতে মিথ্যার জয়জয়কার এক ঘুণধরা সমাজের নিদর্শন। এক প্রভাবশালী ব্যক্তির বন্ধুর কোম্পানিতে চাকরি করতো তূণীর। কর্তব্য পরায়ণ, কর্মনিষ্ঠ, জীবনের রেসে ছোটা তূণীর স্বপ্ন দেখত বিদেশ যাওয়ার কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। হঠাৎ করেই সহজলভ্য হয়ে ওঠে সেই সুযোগ। তূণীরের বসের বন্ধু সেই প্রভাবশালীর ছেলেকে ঝিনুক যাতে আদালতে গিয়ে শনাক্ত না করে তার প্রতিদান স্বরূপ তূণীরকে বিদেশে যাওয়ার প্রলোভন দেয় তার বস রজত। উচ্চাকাঙ্খী তূণীর সেই প্রস্তাব তার দিলে সে তা মানতে অস্বীকার করে ফলে দু'জনের মধ্য শুরু হয় মানসিক দূরত্ব। এর পর থেকে শুরু হয় ঝিনুক আর তূণীরের মধ্যে এক অলিখিত চুক্তি— ঝিনুক কোর্টে দোষীদের শনাক্ত না করলে তূণীরও ওই চাকরি ছেড়ে দেবে। একথা মানতে ঝিনুকের যন্ত্রণার সীমা থাকে না। সে ভাবে, যে তূণীর তাকে '৭৩ পাতার' চিঠি লিখত, ঝিনুকের জন্ডিসের সময় সারা দিন তার বাড়ি এসে বসে থাকতো, সেই তূণীর তার আসল রূপ বার করল নির্মম শর্তে। এরপর তাদের সম্পর্কের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়, কেবল ঝিনুককে কি এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য? তার প্রতিবাদী কণ্ঠকে রোধ করতে চায় তার পরিবার, সমাজ, তূণীর এমনকি যে রমিতার জন্য সে লড়ছে তার স্বামী পলাশ ও তার শশুরবাড়ির লোক। ঝিনুকের একমাত্র আশ্রয়স্থল তার ঠাকুমা মৃণালিনী দেবীও সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চায় তাকে। এত প্রতিকূলতার সত্ত্বেও দৃঢ়চেতা ঝিনুক আদালতে দোষীদের চিহ্নিত করল এবং সঠিক বয়ান দিল। কোর্টে রমিতা দোষীদের না চেনার ভান করল, কারণ তার গর্ভে তখন চার মাসের সন্তান। সমস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকতে তার হবু সন্তানের কথা ভেবে সে হেরে গেল। ঝিনুকের সত্য বয়ান কোনও কাজে লাগল না, বরং উকিলের অশ্লীল প্রশ্নে ও মন্তব্যে ঝিনুক ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল—

ওরা আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল, চোয়ালে ঘুষি মেরেছিল, হাত মুচড়ে ধরেছিল....

> আর কিছু?
>
> খারাপ গালাগাল দিচ্ছিল। আর কিছু? কোনও গোপন অঙ্গে হাত ফাত দেওয়া....মানে আপনিও তো নারী...[৭]

ঝিনুক হেরে যায় তার প্রিয় মানুষটির কাছে, মেনে নেয় অলিখিত চুক্তিকে। যদিও ঝিনুকের এই 'সমঝোতা' এক তরফা নয়, তূণীরও সেই আগের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, যাতে তার অফিসের বস রজত তাকে বিদেশ যাওয়ার টোপ দিয়ে ঝিনুককে আইনের কাছে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াতে না পারে। সেই চাকরি ছেড়ে, বিদেশ যাওয়ার

সুযোগকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তূণীরও ঝিনুকের ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দিয়েছে। এখানে লেখিকা পিতৃতন্ত্রের আধিপত্যকে অস্বীকার করে মানবিক মূল্যবোধের আধারে তাকে নির্মাণ করেছেন। সুচিত্রা ভট্টাচার্যকে অনেকেই নারীবাদী লেখক বলেছেন, কিন্তু এক সাক্ষাতকারে তিনি নিজে বলেছেন যে তিনি নারীবাদী নন। তিনি পূর্ণ মানবতাবাদে বিশ্বাসী। নারীকে কেবল দুর্বল, অবলা, পরনির্ভরশীল করে রাখা নয়, তিনি নারীকে একটা পূর্ণ মানুষ রূপে দেখাতে চেয়েছেন তাঁর রচনার পরতে পরতে।

দহন উপন্যাসে সুচিত্রা ভট্টাচার্য আর একটি নীরব প্রতিবাদী চরিত্র অঙ্কন করেছেন মৃণালিনী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। ছেলে, বৌ, মেয়ে, নাতি-নাতনি নিয়ে মৃণালিনীর ভরা সংসার হওয়ার সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় তিনি শান্তি-পারাবার নামক এক বৃদ্ধাশ্রমে বাস করেন। বৃদ্ধাশ্রমের নাম শান্তি-পারাবার হলেও সেখানকার বৃদ্ধারা থাকেন অশান্তিতে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। পরিবারের অশান্তির কারণের বশবর্তী হয়ে বৃদ্ধারা গৃহত্যাগ করে বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে বাধ্য হয়, কিন্তু মৃণালিনী স্বেচ্ছায় কেবল আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে, স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য বৃদ্ধাশ্রমে থাকেন। পারিবারিক গণ্ডী থেকে বেরিয়ে স্বেচ্ছায় তিনি শরৎবাবুর সাথে অসহায় মহিলা ও সন্তানদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারছেন, যা পরিবারের গন্ডিবদ্ধতায় অসম্ভব ছিল। মৃণালিনী ছিলেন ব্যক্তিত্ববান, মানসিক সংকীর্ণতামুক্ত, শিক্ষিত এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী। তাই বৃদ্ধাশ্রম তার বানপ্রস্থ নয়, মানসিক শান্তির জায়গা বলেই ছেলেদের বাড়ি তিনি বেড়াতে আসেন কিন্তু রাত্রিবাস করেন না। মৃণালিনী ব্যক্তিত্বময়ী বলেই প্রতিবাদী, স্বাধীনচেতা ঝিনুক কেবল তার কথাকেই যুক্তি-যুক্ত মনে করে। ঝিনুককে বোঝেতে গিয়ে বর্তমান নারীদের স্বাধীনতা নিয়ে তিনি বলেন—

> এখন ছেলেরা তোদের আরও খোলামেলা দেখতে চায়। তাই টিভিতে সিনেমায় বিজ্ঞাপনে তোদের খোলামেলা হয়ে নেচে বেড়াতে হচ্ছে। ছেলেদের মন খুশি রাখার জন্য। আর সেটাকেই তোরা স্বাধীনতা ভেবে ছাগলছানার মতো লাফাচ্ছিস। এটা স্বাধীনতা নয় রে দিদি, স্বাধীনতার মরীচিকা। স্বাধীনতা হল মনের অনুভূতি। তোদের সেই মনের স্বাধীনতাটাকে ছেলেরা কখনওই মানবে না।[৮]

দহনময় সমাজের পরিসরে মৃণালিনী ও ঝিনুকের নারী কথার অবস্থান নির্মাণ ও বিনির্মাণের দ্বি-বাচনিক যে আধুনিকতা সুচিত্রা ভট্টাচার্য এই উপন্যাসে দেখান তা মৃণালিনীর বক্তব্যে গ্রহণযোগ্যতা পায়।

সতেরোটি পর্বে বিভক্ত এই উপন্যাসে লেখিকা তিনটি প্রজন্মের শিক্ষাব্যবস্থাকে তুলে ধরেছেন সুন্দরভাবে। মৃণালিনীদের সময় কালে নারীশিক্ষায় বাঁধা ছিল বিস্তর, তার ক্ষেত্রেও এর কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। পিতার চাপে বুদ্ধিমতী মৃণালিনীকে মেট্রিক পরীক্ষার আগেই পিতৃগৃহের গণ্ডী পার হতে হয়। স্বামী সেকালের আধুনিক মানুষ

হওয়ায় স্ত্রীর অনুরোধে প্রাইভেটে মেট্রিক এবং আই. এ. পড়তে দিলেন, কিন্তু সংসারের দোহাই দিয়ে বি.এ. আর পড়তে দিলেন না। মৃণালিনী বোঝেন তার স্বামীর ভয়টা, যদি সে তার স্বামীর থেকে বেশি নম্বর পেয়ে পাশ করেন, স্বামীর সমান হয়ে যান। মনের আকাঙ্ক্ষাকে মেরে ফেলে মৃণালিনীকে যে 'অপমান'-টা করা হল তার প্রতিবাদ ছিল নীরব। এর পরও তিনি সংসার করেছেন, সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এবং স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির মানুষদের ভালবেসেছেন কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে এসেও সেই অপমানটা তিনি ভোলেন নি। তাই নাতনি ঝিনুকের কাছে তার মনের কথা বলার সময় পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক তির্যক কটাক্ষ ধরা পড়ে। আসলে মেয়েদের অবস্থা ঊনবিংশ শতকেও যেমন ছিল, একবিংশ শতকেও তেমন আছে, পরিবর্তন কেবল খোলসের, ভিতর এখনও অপরিবর্তিত, এই প্রসঙ্গে লেখিকা মৃণালিনীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

> আমাদের সময়ে তোদের সময়ে কতটা কী তফাত হয়েছে বুঝি না বাপু। হ্যাঁ, তোরা এখন অনেক বেশি স্বাধীন, মিলিটারিতে যাচ্ছিস, হিমালয়ে উঠছিস, ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লেখাপড়া শিখছিস, চাকরি করছিস! তবু বুকে হাত দিয়ে বল তো, সত্যি কতটা ছাড় পেয়েছিস তোরা? এটা বুঝিস না, ছেলেরা যতটা ছাড়বে ঠিক ততটাই জমি পাবি তোরা? তার বেশি এক চুল নয়। ছেলেরা সংসারের ভেতরে আটকে থাকা জবুথবু মেয়ে আর পছন্দ করছিল না, তাই তোদের পড়াশুনো করতে দিয়েছে। ছেলেরা একা সংসার চালাতে পারছিল না কিংবা বলা যায়, সংসারের প্রয়োজন হল, তাই তোরা চাকরি করতে বেরোলি।[৯]

দহন উপন্যাসে লেখিকা তিনটি সময়কালকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। একদিকে ঝিনুক-রমিতাদের যৌবনকালের সময়, তার আগের প্রজন্মের 'মা-মাসিদের' সাংসারিক নানা জটিলতা এবং মৃণালিনীদের সময়কালের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের যন্ত্রণা ও অসহায়তার বর্ণনায় সমাজের তিনকালের প্রতিফলন স্পষ্ট।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য নারীবাদের বিভিন্ন তত্ত্বের কথা *দহন* উপন্যাসের আখ্যানে ঝিনুকের উচ্চারণে বা ভাবনায় প্রকাশ করেছেন। ঝিনুক যুক্তিনিষ্ঠ নারীবাদী মন নিয়েই সমাজ তথা পরিবারের নারী-পুরুষের মধ্যে দেখেছে বৈষম্যমূলক আচরণে, আচার-ব্যবহারে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করা। নারীকে তার হৃদয় বা বুদ্ধি দিয়ে নয়, শরীর সর্বস্ব প্রাণী বলে ভাবা। বিশেষকরে দাম্পত্য সম্পর্কে অথবা তার আগেই পুরুষ বন্ধু বা স্বামীর আধিপত্য, পুরুষের ব্যক্তিত্বের সংঘাত এইসব বিভিন্ন বিষয়গুলো যেমন এসেছে তেমনি এসেছে ঝিনুকের সংবেদনশীল হৃদয়ের প্রমাণ। তার ঠাকুমার সাথে সম্পর্কে, রমিতাকে লম্পট ছেলেদের হাত থেকে রক্ষা করতে, রমিতার অবস্থাকে উপলব্ধি করে তার সহমর্মি হতে, ভাইকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে কিংবা শরৎবাবুর সংবেদনশীল ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশের মাধ্যমে ঝিনুকের মুক্তার মত এক শুভ্র সুন্দর মন লক্ষ্য করি আমরা। ঝিনুক যেমন কোমল, সমব্যথী তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে

প্রতিবাদী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে, নারীর দুঃখ-দুর্দশা চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে নারীকেই এগিয়ে আসতে হবে, রুখে দাঁড়াতে হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। একুশ শতকে দাঁড়িয়ে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের *দহন* সেই কথাটাই পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের।

তথ্যসূত্রঃ

১। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড)*, আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৫২১

২। তদেব, পৃ. ৫৩৫

৩। তদেব, পৃ. ৫৩৭

৪। তদেব, পৃ. ৫৪০

৫। তদেব, পৃ. ৫৫৯

৬। তদেব, পৃ. ৫৭৬

৭। তদেব, পৃ. ৬৩৬

৮। তদেব, পৃ. ৬৪৩

৯। তদেব, পৃ. ৬৪২-৬৪৩

সহায়ক গ্রন্থ :

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। *কালের প্রতিমা : বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর (১৯২৩-১৯৯৭)*। দে'জ পাবলিশিং। পঞ্চম সংস্করণ। কলকাতা। ফেব্রুয়ারি,২০১৬।

২। কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। (সম্পাঃ) *কথানদী সুচিত্রা*। পত্রভারতী। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০১৬।

৩। রাজশ্রী বসু। *নারীবাদ*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। নভেম্বর,২০১২।

৪। সুচিত্রা ভট্টাচার্য। *উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড)*। আনন্দ পাবলিশার্স। তৃতীয় মুদ্রণ। কলকাতা। জানুয়ারি ২০১৯।

৫। সৃজনী মন্ডল। (সম্পাঃ) *দক্ষিণের সাঁকো পত্রিকা।* 'ক্রোড়পত্র সুচিত্রা ভট্টাচার্য'। বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা। এপ্রিল-মে, ২০১৯।

৬। স্বপ্না নাথ। *বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে নারী পরিসর*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, ২০১৭।

সুন্দরবনের কাজের ভাষা, মেয়েদের ভাষা

প্রিয়াঙ্কা মিস্ত্রী
গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ (abstract): 'আঠারো ভাটি'র দেশ হল সুন্দরবন। ভারত-বাংলাদেশের মানচিত্রের সীমারেখাকে স্পর্শ করে রয়েছে এই সুন্দরবন। ভারতীয় সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিত। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা উনিশটি ব্লক জুড়ে সুন্দরবনের বিস্তৃতি। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মানুষ এখানে বসবাস করে। যার মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ আবাদ-কাল থেকে তাদের সীমাহীন প্রচেষ্টা দ্বারা পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে অভিযোজনের মধ্য দিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। বর্তমানে সুন্দরবনের বসবাসকারী এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে চতুর্বেদী-সঙ্গম ঘটেছে বলা যায়। তাই সুন্দরবন এক বিমিশ্র জনজাতির প্রাত্যহিক ইতিহাসকে বহন করছে। মেদিনীপুর থেকে আগত সম্প্রদায়, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত সম্প্রদায়, প্রান্তিক মুসলমান ও পৌন্ড্র সম্প্রদায় এবং আদিবাসী চার সম্প্রদায়ের মানুষ সুন্দরবনে এক মিশ্র সংস্কৃতিরও সৃষ্টি করেছে। যে সংস্কৃতি বাংলা লোকসাহিত্যের উপাদানগুলির পাশাপাশি সমাজ-ভাষা চর্চার ক্ষেত্রটিকেও সমৃদ্ধ করেছে।

যে কোনো জাতির ইতিহাস সৃষ্টি হয় তার অর্থনৈতিক মানদণ্ডকে কেন্দ্র করে। সুন্দরবনের অর্থনৈতিক মানদণ্ডটি নির্মাণ হয়েছে মূলত জল-জঙ্গলকে নির্ভর করে। জল-জঙ্গল অর্থাৎ নদী-অরণ্যের এই সহাবসস্থানকে ভিত্তি করেই অনেক মানুষের জীবিকার নির্ভিরতা গড়ে উঠেছে। তাই কৃষিকাজের সাথে সাথে সুন্দরবনবাসী এমন অনেক পেশার সাথে যুক্ত যেগুলি তাদের প্রাত্যহিক জীবনে বেঁচে থাকার সম্বল। সুন্দরবনে মিশ্র জন-জাতি বসবাসের সুবাদে এবং একাধিক পেশার প্রচলনের কারণে এখানে প্রচলিত ভাষার প্রকারভেদ ঘটেছে। যে ভাষাকে সমাজ-ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে সুন্দরবনে চারটি ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। এই চার গোষ্ঠর নিজস্ব কিছু প্রচলিত ভাষা আছে। তবে এই প্রকারভেদ কেবল উপভাষাগত কারণে নয়, পেশাগত কারণেও লক্ষ করা যায়। একাধিক পেশার অন্তর্গত একাধিক ভাষার প্রচলন আছে যেগুলি নির্দিষ্ট পেশার মানুষজন ছাড়া কেউ ব্যবহার করেন না। এই পেশা নির্ভর ভাষা চর্চার পরিমণ্ডলটিকে 'কাজের ভাষা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সুন্দরবনে পেশার ক্ষেত্রে কোনো লিঙ্গ বৈষম্য লক্ষ করা যায় না। এখানকার মহিলারা প্রাত্যহিক খেটে খাওয়া পুরুষদের থেকে জীবিকা অর্জনে কোনো অংশে পিছিয়ে নয়। তারাও নিত্যদিন পুরুষের মতো মাছ ধরা, মিন ধরা, বাগ্‌দা ধরা ইত্যাদি কাজে পুরুষের সমান পারদর্শী। তাই সেই পেশা নির্ভর ভাষা চর্চায় তাদের অবদানও

অবিস্মরণীয়। মেয়েরা তাদের নিত্য ব্যবহৃত কথার দ্বারা কীভাবে সমাজ-ভাষা চর্চার পরিসরটির বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে তা লক্ষণীয়।

মূল শব্দ (key word): সুন্দরবন, সংস্কৃতি, সমাজ-ভাষা, ভাষাগোষ্ঠী, উপভাষা, আঞ্চলিকতা, পেশা, লিঙ্গ।

মূল আলোচনা :

ভাষা হল মানুষের ভাব বিনিময়ের এবং যোগাযোগের মাধ্যম। নিজের মনের ভাবকে ব্যক্ত করতে মানুষ ভাষা ব্যবহার করে। যা তাকে সমাজের সাথে সংযোগসাধন ঘটায়। ব্যাকরণগতভাবে ভাষাকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করলে খানিক এমনটা দাঁড়ায়। “ভাষা হল মানুষের বাগযন্ত্র থেকে উদ্ভূত উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টি।”[১] তবে সংজ্ঞা নির্ধারণেও খানিকটা সংশয় থেকে যায়। তবে কি বাগযন্ত্র থেকে উচ্চারিত যে কোনও ধ্বনিসমষ্টি ভাষা? না। বাগযন্ত্র থেকে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ ও বোধগম্য, এমন ধ্বনিসমষ্টিকে ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা যায়। কারণ তা না হলে পৃথিবীতে যত পশুপাখি বা অন্যান্য প্রাণী রয়েছে তাদের উচ্চারিত অর্থহীন ধ্বনিও ভাষা বলে বিবেচ্য ও গ্রহণযোগ্য হত। কিন্তু “এই অর্থবহ ধ্বনি মানুষকে অন্য প্রাণীদের থেকে পৃথক করেছে। তাই ভাষা একমাত্র মানুষেরই আছে, অন্য কোনও প্রাণীর নেই।”[২] তবে ভাষার মধ্যে ভাব বিনিময়ের যে দিকটির কথা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যেও নানা মতান্তর রয়েছে। যেমন ডক্টর রামেশ্বর শ এর মতে-“ভাষা সৃষ্টির মূলে রয়েছে মানুষের দুটি দিক মানুষের মন ও চিন্তা, আর সমাজবদ্ধ মানুষের ভাব বিনিময়ের ইচ্ছা। অর্থাৎ ভাষার যেমন একটি ভাবগত উৎস আছে তেমনি আছে একটি সমাজগত চাহিদা।”[৩] ভাষার সমাজগত চাহিদার দিকটি সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের পরিসরকে সৃষ্টি করেছে। ভাষাকে এই প্রবন্ধে সমাজ সংস্কৃতির আঙ্গিক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বিষয়টি সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের নৃবৃত্ত-তত্ত্বের (Ethnography of Speaking) অভ্যন্তরীণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ “সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে ভাষার চর্চাই হল কথনের নৃ-বৃত্ততত্ত্বের কাজ।”[৪] যেহেতু ভাষাকে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিত থেকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তাই এই ভাষা চর্চা নৃ-বৃত্ত তত্ত্বের অভ্যন্তরীণ বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মানুষের জীবন-যাপন, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি নানা মাধ্যমগুলির মতো ভাষাও, সংস্কৃতির একটি মাধ্যম। সেই অর্থে সুন্দরবনের ভাষা ঐ অঞ্চলের সংস্কৃতিরও একটি অংশ। কিন্তু ভাষা ছাড়া সুন্দরবনের সংস্কৃতির আলোচনার পরিসর কখনোই বিস্তৃতি লাভ করতে পারে না। তাই ভাষা যেকোনও মানুষের মনের ভাব যেমন প্রকাশ করে, তেমনি যেকোনও স্থানের সংস্কৃতিকে প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে

কাজ করে। ভাষার মতো সাহিত্যেও, সংস্কৃতির একটি অংশ। যার মাধ্যমে ভাষা সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু কেবল ভাষা নয়, সংস্কৃতির প্রত্যেকটি শাখার পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ ও বিস্তার লাভ ঘটতে পারে ভাষার মাধ্যমে। তবে যে অঞ্চলে যে ভাষা প্রচলিত সেই অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে সেই আঞ্চলিক ভাষাই ব্যবহৃত হয়। কারণ "এক একটি ভাষা এক একটি জনসমষ্টির নিজস্ব প্রকাশ মাধ্যম।"[৫] তাই সুন্দরবনের সংস্কৃতি বর্নণায় আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ভাষাই প্রাধান্য পেয়েছে। সুন্দরবনের আঞ্চলিক ভাষার একটি নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র বলয় রয়েছে। কিন্তু এই ভাষা বলয়টি আজ বিপন্ন। কারণ যথাযথভাবে ভাষাগুলিকে যেমন সংগ্রহ করা হয়না, তেমন সংরক্ষণের কোনও তাগিদ বর্তমান সমাজে লক্ষ করা যায় না।

দুই.

সুন্দরবন হল একটি সক্রিয় বদ্বীপ। এই সক্রিয়তাকে বজায় রাখতে সুন্দরবনের আঞ্চলিক ভাষা উৎপাদনকারী গোষ্ঠীগুলির অপরিসীম অবদান রয়েছে। ভাষা হল অর্থপূর্ন নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টি। যে ধ্বনিসমষ্টি মানুষের মনের ভাবকে প্রকাশ করে। কিন্তু যখন 'নির্দিষ্ট' শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে, তখনই ধ্বনিসমষ্টির ব্যবহারের মধ্যে একটা সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। যে সীমা ভাষার অন্তর্গত, উপভাষা গুলিকে নির্ধারিত করে। কিন্তু গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রতিটি মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেটি তার কথ্যভাষা। কারণ "সাধারণভাবে ভাষার দুটি রূপ ধরা হয়ে থাকে। সেগুলি হল কথ্যভাষা ও লেখ্যভাষা।"[৬] লেখ্যভাষা হল কথ্যভাষারই সংস্করণ ও পরিমার্জিত রূপ। তাই লেখ্যভাষা কৃত্রিম অর্থাৎ লেখ্য ভাষা হল বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের দ্বারা তৈরি করা ভাষা। কিন্তু কথ্যভাষা গুলো এক অর্থে লোকভাষা। লোক মুখে যে ভাষার সৃষ্টি। "আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে 'Folk Language' এর বাংলা করা হয়েছে 'Rural Language', ড. পবিত্র সরকার 'Folk Language' এর বাংলা হিসাবে 'গ্রাম্যভাষা' কথাটির সুপারিশ করেছেন।"[৭] তবে লোকভাষাকে, কথ্যভাষা বলা যেতে পারে। কিন্তু গ্রাম্যভাষা বলা যায় না। কারণ সাধারণ অর্থে মুখ নিঃসৃত ভাষাকে কথ্যভাষা হিসাবে ধরলে শিক্ষিত, পরিশীলিত মানুষের মুখের ভাষাকেও কথ্যভাষা বলা যাবে।"[৮] অর্থাৎ কথ্যভাষা বলতে শহর ও গ্রাম উভয় স্থানের মানুষের ব্যবহৃত ভাষাকে বোঝায়। আর গ্রাম্য ভাষার সীমাবদ্ধতা কেবল গ্রামের মানুষের ব্যবহৃত ভাষাকে কেন্দ্র করে। এই কথ্যভাষা হল স্বতঃস্ফূর্ত, অকৃত্রিম ও আসল ভাষা। তবে এই কথ্যভাষা মুখের ভাষা হওয়ায় এর স্থায়িত্ব কম। এই ভাষা ক্ষনিক উচ্চারণেই শেষ হয়ে যায়। তাই এই ভাষার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। কারণ "তা উচ্চারিত হতে হতে নদীপ্রবাহের মত নিরন্তর বয়ে চলে এবং চলার পথে ক্রমাগত রূপ বদল করে।"[৯] তবে প্রত্যেকটি ভাষা ব্যবহারের নেপথ্যে নিজস্ব ভাষাগোষ্ঠী বিরাজ করে। যাদেরকে নির্দিষ্ট ভাষা সম্প্রদায় হিসেবে নির্ধারিত করা

হয়। এই ভাষা সম্প্রদায় আবার কোনও না কোনও সমাজের অন্তর্গত। যে সমাজ কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে আবদ্ধ। কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে জনজাতির দ্বারা ব্যবহৃত নির্দিষ্ট ভাষা ঐ অঞ্চলের ভাষা সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করে।

সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ তাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করে তা সুন্দরবনের ঐ অঞ্চলের ভাষাসম্প্রদায়কে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। সুন্দরবনে বসবাসকারী মনুষ্যজাতির জীবন খুব সুখকর বা স্বাচ্ছন্দ্যময় নয়। দরিদ্রতা তাদের জীবনের বারোমাস্যা রচনা করে। তাই বলে তাদের জীবনে আনন্দ-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মাতামাতির কোনও অভাব নেই। তাদের সংস্কৃতি তাদের জীবনে বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দেয়। তাই সংস্কৃতি নির্ভর জীবনযাত্রার সাথে তাদের ভাষা সঙ্গতিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

তিন.

প্রান্তিক সুন্দরবন চারটি জনজাতির সংমিশ্রণে গঠিত। এই চার গোষ্ঠীর চতুর্বেণী সঙ্গমেই সুন্দরবনে চার ভাষা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের ব্যবহৃত সেই ভাষা নানা জাতির প্রেক্ষিত থেকে এখানকার আঞ্চলিকতাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলেছে। এই চার গোষ্ঠীর ভাষা সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতিতে এনে দিয়েছে বহুমাত্রিক পরিসর। কারণ ভাষা ছাড়া সুন্দরবনের সংস্কৃতির কোনও দৃষ্টিকোণই প্রকাশ পেতে পারে না।

আবাদকাল থেকে সুন্দরবনের মানুষ জঙ্গল হাসিল করে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির বুকে নিজস্ব বাসস্থান তৈরি করেছিল, কোম্পানির আমলেই। তবে সুন্দরবনে বসবাসকারী মনুষ্যজাতির মধ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়কে শ্রমিক সংকট জনিত কারণে ছোটোনাগপুর মানভূম অঞ্চল থেকে আনা হয়েছিল। আর স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশ থেকে আসে বাঙাল সম্প্রদায়। তাই মোটা দাগে সুন্দরবনের ভাষা-গোষ্ঠীকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল-

১। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা ভাষা সম্প্রদায়। ২। মেদিনীপুর থেকে আগত ভাষা সম্প্রদায়। ৩। প্রাচীন মুসলমান ও পৌন্ড্রদের ভাষা সম্প্রদায়। ৪। বিহার থেকে আগত আদিবাসী ভাষা ব্যবহৃত সম্প্রদায়।

তবে সুন্দরবনে এই চার সম্প্রদায়ের জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে কেবল সংস্কৃতি নয়, ভাষারও সংমিশ্রণ ঘটেছে। তাই চার সম্প্রদায়ের ভাষাকে নিজ নিজ গোষ্ঠীর উপভাষা দ্বারা পৃথক করা ব্যতীত এদের ব্যবহৃত ভাষা মূলত একটি। সেটি হল বাংলা।

উপভাষাগত পৃথকীকরণ ব্যতীত, ভারতীয় সুন্দরবনের ভাষা 'সুন্দরী ভাষা' হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছে, তা সাহিত্যিকদের কলমে স্বীকৃত। "দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত, বিভাজিত এই সুন্দরবনের আঞ্চলিক কথ্যভাষাতেও রয়েছে অল্পবিস্তর পৃথক আঞ্চলিক রং এর ছোঁয়া।"[১০] সেই পার্থক্যের নিরিখে ভারতীয় সুন্দরবনের কথ্যভাষা

ইতিমধ্যে ‘সুন্দরী ভাষা’ নামে পরিচিতি পেয়েছে। তবে দুঃখের বিষয়, তাও সুন্দরবনবাসীদের নিজেদের মধ্যে কথ্যভাষা ব্যবহারে এক ধরনের জড়তা কাজ করে এবং তাই তারা বাংলা ভাষার প্রধান শ্রোতটির প্রতি বেশি আকর্ষিত। তাই তারা নিজেদের ভাষার প্রতি উদাসীন। এ বিষয়ে কল্যাণ মণ্ডল সময়কালের জিয়নকাঠি পত্রিকায় লিখেছেন- “এই বিপন্নতার কারণ, মান্য চলিত বাংলার প্রসার জনিত চাপ ও বাংলা ভাষার প্রধান শ্রোতটির (SCB) প্রতি সুন্দরবনবাসীর আকর্ষণ প্রবণতা।”[১১] তবে সুন্দরবনের ভাষার এই বিপন্নতার দিককে মাথায় রেখে বলা যায় ‘সুন্দরী ভাষা’ আজও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। সুন্দরবনের সমাজের আনাচে-কানাচে প্রত্যহ বয়ে চলা জীবনস্রোতের মধ্যে অসংখ্য সুন্দরী ভাষার সন্ধান আজও মেলে। যেগুলো মান্য ভাষা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য অভিধান গুলিতে যে শব্দগুলো স্থান পায়নি। তাই অনেক মান্য ভাষাভাষীদের কাছে এই ভাষার শব্দ অজ্ঞাত। তবে সুন্দরবনের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে আঞ্চলিক ভাষা। আর আঞ্চলিক ভাষার পরিসরকে আরো জীবন্ত করে তুলেছে এখানকার কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত খাঁটি শব্দ গুলি। সুন্দরবনে ব্যবহৃত ভাষাকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় তাদের ব্যবহৃত বাংলা ভাষার মধ্যেও স্পষ্ট ভাগ রয়েছে। এই ভাগ যতখানি জাতি বা গোষ্ঠীগত কারণে, ঠিক ততোখানি আবার বসবাসকারী মানুষের জীবনযাপন-জীবিকা অর্থাৎ সংস্কৃতিগত কারণেও। তাই এখানকার সাধারণ মানুষদের তাদের কাজে-কর্মে, গৃহস্থালী, উৎসব, আমোদ-প্রমোদে, ক্রোধ-কলহে এই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে থাকে। যে ভাষার জন্ম ও বিবর্তন সুন্দরবনের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে। তাই এইসব ভাষার সীমাবদ্ধতাও সুন্দরবনের নির্বাচিত অঞ্চলগুলিতে। তাই কবি বলেছেন- “আবাদ করে, বিবাদ করে, সুবাদ করে তারা।”[১২] কিন্তু সবটাই করে তারা এই আঞ্চলিক ভাষায়। সুন্দরবনের আঞ্চলিক ভাষার পরিসরটি সংস্কৃতিগত কারণেই তৈরি হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে সুন্দরবনবাসী সার্বিকভাবেই সংগ্রামী। তাদের এই সংগ্রামী সত্তার প্রকাশ মাধ্যম হিসাবেও প্রতিনিয়ত অনেক অজানা শব্দ তারা ব্যবহার করে। যে শব্দগুলো কেবল সুন্দরবনের ঐ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই ভাষা, তাদের অন্য কোনও মানুষের থেকে শোনা নয় বা পুঁথিগত কারণে শেখাও নয়। তাই “আঞ্চলিক ভাষা শনাক্তকরণের পালা যতদিন চলবে ততদিন মানুষ আপন ভাষার মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতির গন্ধ পাবে।”[১৩]

“পৃথিবীর যাবতীয় সবকিছুর সংজ্ঞা নির্ধারণ করে ভাষা। আর তাই ভাষার সম্পূর্ণ স্বাধীন জন্মস্থান উপভাষা, আর উপভাষার ক্ষেত্র অবশ্যই আঞ্চলিক অবস্থান থেকে।”[১৪] এই আঞ্চলিক অবস্থান ভাষায় বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করে। সুন্দরবনবাসী যে ভাষা ব্যবহার করে, তা তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীগত উপভাষা। তাই উপভাষা, আঞ্চলিক ভাষার পরিসরকে গড়ে তুলতে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে। উপভাষা হল আঞ্চলিক ভাষার প্রাণ। একই ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন উপভাষা লক্ষ করা যায়। যেমন বাংলা ভাষার

উপভাষা গুলি হল-বরেন্দ্রী, কামরূপী, ঝাড়খন্ডী, রাঢ়ী ও বঙ্গালী। এই উপভাষা গুলির প্রয়োগ নির্দিষ্ট স্থানের আঞ্চলিকতাকে নির্ধারিত করে। কিন্তু এই উপভাষা গুলির অধিক পার্থক্য আবার স্বতন্ত্র একটি ভাষার জন্ম দেয়। তাই উপভাষার সীমা কত দূর বা কোন সীমা অতিক্রম করলে তা উপভাষা থেকে ভাষা হিসাবে গণ্য হবে, তা ভাষাবিজ্ঞানী ও ভাষাতাত্ত্বিকদের গবেষণা সাধ্য বিষয়।

সুন্দরবনের উল্লেখ্য চার রকমের ভাষা সম্প্রদায়ের মানুষের গোষ্ঠীগত উপভাষা এই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার পরিসরকে সম্পূর্ণতা প্রদান করেছে। তাই উপভাষা ব্যতীত সুন্দরবনের আঞ্চলিক ভাষার পরিসরটি যথাযথভাবে পরিস্ফুট হয়না। উপভাষার সাথে আঞ্চলিকতার সংমিশ্রণ ঘটার ফলে সুন্দরবনের ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতিতে অন্যমাত্রা বহন করছে। সুন্দরবনের প্রচলিত চার ভাষা গোষ্ঠীর নিজ নিজ উপভাষাগুলি রূপতাত্ত্বিক, ধ্বনিতাত্ত্বিক ও নিজের গোষ্ঠীগত শব্দ ব্যবহারে পৃথক। সুন্দরবনের বাসিন্দাদের সকলের মাতৃভাষা বাংলা হলেও এই অঞ্চলে বাংলা ভাষার অন্তর্গত বরেন্দ্রী, কামরূপী, ঝাড়খন্ডী, বঙ্গালী ইত্যাদি উপভাষা লক্ষ করা যায়। তবে বস্তুত, বাংলার পূর্ব রাঢ়ী উপভাষা সুন্দরবনের সকল মানুষের উপরে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। কারণ এই অঞ্চলের বাসিন্দারা যাঁরা নিজ নিজ উপভাষায় বাড়িতে বা নিজেদের এলাকায় কথা বলে তারা কর্মসূত্রে সকলেই, পূর্বরাঢী উপভাষা ব্যবহার করে কর্মক্ষেত্রে।

চার.

সুন্দরবন বিষয়ক আলোচকদের মতে, সুন্দরবনে মোট যে চারটি ভাষাগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে, তাদের মধ্যে আবার আঞ্চলিক উপভাষাগত পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য মিশ্র সংস্কৃতির কারণে। তবে সমাজে আরোও অন্য কারনেও যেমন- লিঙ্গ, শিক্ষা, বয়স, পেশা ইত্যাদি ভেদেও এই ভাষা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। যে বৈচিত্র্যগুলিকে সমাজ উপভাষা বলে চিহ্নিত করা হয়। যে যে মাত্রার ভিত্তিতে সমাজ উপভাষা গড়ে ওঠে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে পেশা। সুন্দরবনে পেশাগত বৈচিত্র্য এখানকার সমাজভাষার মানদণ্ডটিকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে নির্মাণ করেছে। এই পেশা-ভিত্তিক ভাষাকেই প্রবন্ধে ‘কাজের ভাষা’ বলা হয়েছে। সুন্দরবনে মিশ্র সংস্কৃতি যতটা জাতিগত বা ভাষাগত কারণে ঠিক ততোটাই, পেশাগত কারণেও। সুন্দরবনে মোট প্রায় আটত্রিশ ধরণের আঞ্চলিক পেশাবৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। এগুলি সুন্দরবনবাসীর জীবিকা অর্জনে সামগ্রিকতা এনে দিয়েছে। সুন্দরবনবাসীর কর্মমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে যে যে পন্থা গুলিকে কেন্দ্র করে, সেই পন্থা গুলির বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য একাধিক পেশা নির্ভর ভাষা তারা ব্যবহার করে থাকে। যে ভাষাগুলি ওই পেশার সাথেই যুক্ত। নির্দিষ্ট পেশা ছাড়া শব্দগুলির প্রয়োগ স্থান অন্যত্র নেই। এই নির্দিষ্ট পেশা নির্ভর ব্যবহৃত ভাষা

গুলিকে 'কাজের ভাষা' বলা হয়েছে। কারণ ভাষাগুলি কর্মক্ষেত্রে বা জীবিকা ক্ষেত্রে প্রচলিত। প্রাত্যহিক জীবনের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

সুন্দরবনে কিছু মানুষ সম্পূর্ণভাবে কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। অন্যধারা হল কিছু মানুষ কায়িক শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পচর্চা করে কিংবা শিল্প তথা লোকশিল্পকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছে।"[১৫] তবে এই জীবিকা কেন্দ্রিক উভয় ধারা বংশগত বা জাতিগত বৃত্তির কারণে সুন্দরবনের সমাজে প্রচলিত। আর এই একাধিক জীবিকা মাধ্যমকে কেন্দ্র করে তাদের ভাষার পরিসর গড়ে উঠেছে। জীবিকার সাথে জীবনের সম্পর্ক, তাই সুন্দরবনের প্রচলিত জীবিকা অর্জনকারীদের পরিচয় একান্ত বাঞ্ছনীয়। ১। জেলে/মৎস্যজীবি-যারা মাছ ধরে। ২। চাষি-চাষ করে যারা। ৩। মাঝি-যারা নৌকায় মাঝিগিরি করে। ৪। মউলে-যারা মধু সংগ্রহ করে। ৫। বারুই-পানচাষি। ৬। গোয়ালা-যারা দুধ দুয়ে, দুধ বিক্রি করে। ৭। নাপিত-চুল, দাড়ি কাটে যারা। ৮। ঘরামী-ঘর ছায়। ৯। তেলি-তেল ও তামাক ব্যবসায়ী। ১০। নেয়ে/নাইয়া-যারা নৌকা চালায়, নাবিক অর্থে। ১১। ঢাকী-ঢাক বাজায়। ১২। বায়েন-বাদ্যযন্ত্র বাজায় যারা। ১৩। মেথর-যারা ময়লা পরিষ্কার করে। ১৪। রাজমিস্ত্রি-যারা ইটের ঘর বানায়। ১৫। শিউলি-যারা তাল বা খেজুরের রস সংগ্রহ করে পাটালি বানায়। ১৬। ডোম/হাড়ি-যারা শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করে। ১৭। ধোপা-কাপড় কাচে যারা। ১৮। বাজিকর-বাজি তৈরি করে। ১৯। দর্জি-জামা কাপড় বানায় ও সেলাই করে যারা। ২০। পাটুনী-খেয়া পারাপারের কাজ করে। ২১। ঘটক-যারা বিবাহ সম্পর্কিত যোগাযোগ ঘটিয়ে অর্থোপার্জন করে। ২২। বদ্যি/কবিরাজ-ভেষজ চিকিৎসার সাথে যারা যুক্ত। ২৩। বৈরাগী-বৈষ্ণব সম্প্রদায়, পূজা-আর্চা করেন। ২৪। কয়াল-যারা বাড়ি বাড়ি ধান-চাল মাপার কাজ করে। ২৫। কবিয়াল/টপ্পাদার-কবিগান বা টপ্পা গেয়ে অর্থোপার্জন করে। ২৬। কীর্তনীয়া-কীর্তন গান গেয়ে রোজগার করে। ২৭। বাগানী-বাগান চাষ করে। ২৮। ওঝা/গুনিন-মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুঁক দ্বারা রোগ নিরাময় করে। ২৯। করাতি-যারা করাত দিয়ে কাঠ চেরাই করে। ৩০। দেয়ালি-মাটির দেওয়াল নির্মাণের কাজ করে যারা। ৩১। ধাই-প্রসবকারিণী মহিলা। ৩২। ভানকি-যারা বাড়িতে বাড়িতে ধান ভানার কাজ করে। ৩৩। কাওরা/কাহার-ডুলি পাল্কী বহন করে যারা। ৩৪। জোংরাখুটা/চুনারী-শামুক সংগ্রহ করে ও চুন তৈরি করে। ৩৫। বায়েন-বাদ্যযন্ত্র বাজায়। ৩৬। গায়েন-গান গায় যারা। ৩৭। নাটুয়া-নর্তক, অভিনেতা যারা।

উপরে সাঁইত্রিশটি জীবিকার সাথে যুক্ত সুন্দরবনবাসীদের পরিচয় উল্লেখ করা হল। কিন্তু এই জীবিকার তালিকাটি বর্তমানে অনেকটাই সংকীর্ণ। কারণ এর মধ্যে অনেক জীবিকা মাধ্যম সুন্দরবনের আর প্রচলিত নেই, অতীতে ছিল। যেমন-কাহার, বদ্যি/কবিরাজ, ঘরামী ইত্যাদি পেশার প্রচলন এখন অনেকটাই কমেছে। এই নানা ধরনের পেশার সাথে যুক্ত মানুষদের ব্যবহৃত ভাষা আঞ্চলিক তো বটেই, তার সাথে

প্রাত্যহিক জীবন ব্যতীত কর্মক্ষেত্রে পৃথক হয়ে যায়। এদের ব্যবহৃত কিছু ভাষার পরিচয় এক্ষেত্রে আবশ্যক- চাষি, (ব্যবহৃত শব্দ- দামড়া-বলদ, আঁটি-ধান চারার বান্ডিল, চিটে- অপুষ্ট ধান, খামার-ধান তুলে যেখানে ঝাড়াই করা হয়) মউলে,(ব্যবহৃত শব্দ- আবাদ-জঙ্গল, কট্টা- মধু/প্রসাদ, হালচাল- মৌচাক, কুই দেওয়া-সাংকেতিক হাঁক, চকার- দানবের চিৎকার), জেলে বা মৎসজীবি, (ব্যবহৃত শব্দ ফোঁড়- নদীর সঙ্গমস্থল বা মোহনা, খটি/গোছা-মাছের আড়ত, আড়ফাঁড়ি- ছোট নদী হয়ে বড় নদীতে যাওয়া, জলকর- মাছের ভেড়ি, মেতা- চিংড়ি মাছের ডিম) কুম্ভকার,(ব্যবহৃত শব্দ- মেথলা- ধান ভেজানোর মাটির বড় পাত্র, পশুনি- ডেকচির মতো মাটির পাত্র, ঝাঁঝরি হাঁড়ি- চাল ধোয়ার হাঁড়ি, ডাবর- কলসি) শোলাশিল্পী (ব্যবহৃত শব্দ- কাতি-শোলা কাটার ছুরি, চটকা- শোলার তৈরি ফুল, পাটাশি- শোলার তৈরি কনের মাথার মুকুট, ঝারা- বনবিবির সাজ) মাঝি, (ব্যবহৃত শব্দ- ছই- নৌকার ছাউনি, লগি- নৌকা পারাপারের জন্য ব্যবহৃত লাঠি, গলুই- নৌকার সামনের অংশ) ওঝা/গুনিন (ব্যবহৃত শব্দ- গুনগান-মন্ত্রতন্ত্র, কালামের সাজন- মন্তর তন্তর, কুণ্ডলি- গুনিনের মন্ত্রের সাহায্যে জন্তু জানোয়ারদের বশে আনা, উপোসর্গ- ভুতের ভয়/নানা রোগ, আশাবাড়ি- গুনিনের মন্ত্রপূত লাঠি) ইত্যাদি। তবে সবটাই জীবিকার তাড়নার থেকে সৃষ্টি।

পাঁচ.

'মহিলাদের ভাষা বা মেয়েদের ভাষা' বলতে কেবলমাত্র মেয়েদের ব্যবহৃত ভাষা কিংবা মেয়েদের স্বতন্ত্র কোনো শব্দ ভাণ্ডারকে এখানে বোঝানো হয়নি। কারণ সুন্দরবনের এই পেশা-ভিত্তিক ভাষা সৃষ্টি বা নির্মাণের ক্ষেত্রে মহিলাদের অবদান কতোখানি তা এখানে স্বতন্ত্রভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তারও একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে। পেশার ক্ষেত্রে সুন্দরবনে নারী ও পুরুষের লিঙ্গগত ভেদাভেদ লক্ষ্য করা যায় না। এখানে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও নানান পেশার সাথে যুক্ত। পুরুষের পাশাপাশি মহিলারা যেহেতু এই আঞ্চলিক পেশাগুলির সাথে জড়িত তাই পেশাকেন্দ্রিক ভাষা সৃষ্টিতে মহিলাদেরও ভূমিকা একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। এমনকি সুন্দরবনের অধিকাংশ মহিলা অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজও করছে। সেক্ষেত্রে তাদের ভাষার পরিবর্তন ঘটছে। তাহলে তাদের মাধ্যমে পেশার বৈচিত্র্যও ঘটছে এবং ভাষা নির্মাণ তাদের অবদানের একটা দিক লক্ষ করা যাচ্ছে। এছাড়া পুরুষের থেকে তাদের ভাষার বিশেষত্ব রয়েছে। তাই সুন্দরবনের মহিলাদের ব্যবহৃত ভাষাও, ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করছে। পুরুষের থেকে মেয়েদের ভাষাকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কারণ মেয়েদের ভাষার নিজস্ব কিছু বিশেষত্ব রয়েছে যা পুরুষের ভাষায় নেই। তাই তাদের ব্যবহৃত ভাষাকে 'মেয়েলি ভাষা' হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মেয়েলি ভাষার প্রধান বিশেষত্ব হল তা পুরুষের ভাষা থেকে আলাদা। সুন্দরবনের মেয়েদের ব্যবহৃত ভাষার

মধ্যেও নির্দিষ্ট কিছু বিশেষত্ব আছে। যেমন-তাদের ব্যবহৃত ধ্বনির ব্যবহার, বাক্য ব্যবহারের ধাঁচ, আত্মীয়-বাচক শব্দ, সম্বোধনসূচক শব্দের ব্যবহার, শব্দজোড় বা যুগ্ম শব্দের প্রয়োগ ইত্যাদি। তবে তাদের ভাষায় এই বিশেষত্ব প্রদান করেছে স্থানগত আঞ্চলিকতা। মেয়েদের ভাষার মধ্যেও ধ্বনি ব্যবহারেও উচ্চারণে সূক্ষ্ম পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। বেশি বয়সী মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার কম। কিন্তু কম বয়সী মহিলাদের মধ্যে শিক্ষিত বেশি হয়।

১। মেয়েদের ভাষায় 'ল' ও 'ন' ধ্বনির বিপর্যয় ঘটেছে। যেমন- লাইট>নাইট, নৌকা>লৌকো, লোক>নোক, ল্যাজ>ন্যাজ ইত্যাদি।

২। বাক্যের শেষে 'খ' ধ্বনি ও 'ছ' ধ্বনির পরিবর্তে অগ্রবর্তী ধ্বনি 'ক' ও 'চ' এর ব্যবহার হয়। যেমন-দেখা>দেকা, চোখে>চোকে, গেছে>গেচে। উঠেছি>উঠেচি ইত্যাদি।

বাক্য ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য এর ক্ষেত্রে আমরা দুটি দিকের প্রতি দৃষ্টি রাখব। ১. বাক্যের দৈর্ঘ্য ২. বাক্যের গুণগত দিক। প্রথমে যদি বাক্যের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের দিকে লক্ষ্য করা যায় তবে সুন্দরবনের মহিলাদের কথায় বাক্য প্রয়োগে অনেক জড়তা লক্ষ করা যায়। তাই তারা থেমে থেমে বাক্য প্রয়োগ করে। অর্থাৎ তাদের ব্যবহৃত বাক্যের দৈর্ঘ্য কম। এর কারণ তারা প্রথমত শিক্ষিত নয়। অঞ্চলগুলিতে শিক্ষার আলো না পৌঁছানোয় মহিলাদের বাক্জড়তা সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়ত তারা ঘরবন্দী, সমাজের সব স্থানে তাদের অবাধ চলাচল নেই। তাই বাক্য প্রয়োগে তাদের আড়ষ্টতা কাটেনি সম্পূর্ণভাবে। সুন্দরবনের মহিলাদের ভাষা বেশি গুণগত দিক থেকে আঞ্চলিক উপাদানে ভরপুর। কারণ এই ভাষায় বেশি সম্বোধন সূচক শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। কারণ তারা কোনও অপরিচিত ব্যক্তির প্রতিও শ্রদ্ধাশীল। তাছাড়া আত্মীয়সূচক শব্দ, শব্দজোড়, নির্দেশক অব্যয় ইত্যাদি ব্যবহার করে। মহিলারা যে সব আত্মীয়বাচক শব্দ ও সম্বোধনসূচক শব্দ প্রয়োগ করেছে সেগুলি হল– আত্মীয়বাচক শব্দ গুলি হল- শৌড়ো, শাউড়ি(শ্বাশুড়ি), ভাসুর, দেওর, ঠাকুরঝি, জা, ভাজ ইত্যাদি। যে সম্বোধনসূচক শব্দগুলি তারা ব্যবহার করে তা হল-কচির বাপ, ওগো, হ্যাগো, মনির বাপ, ইত্যাদি।

সুন্দরবনের মেয়েলি ভাষায় সবথেকে বেশি যে দুটি প্রবণতা লক্ষ করা গেছে সেগুলি হল-শব্দজোড় বা যুগ্ম শব্দের প্রয়োগ এবং তাদের ভাষায় অধিক পরিমাণে একই শব্দের পাশাপাশি পুনরাবৃত্তি ঘটেছে তাদের ব্যবহৃত যুগ্ম শব্দ গুলি হল- ক্ষতি-বিতি, চাষ-বাস, মাঠ-টাঠ, চাবালি-টাবালি, চাল-ডাল, হাঁড়ি-কুড়ি, পুজা-টুজা, মুখ-টুক, খেয়ে-টেয়ে, গোঁড়া-টোড়া, বিপদ-আপদ, মাইল-টাইল, রোয়া-টয়া, কাঁকড়া-টাঁকড়া, হরিণ-টরিন, গামছা- টামছা, ভাজ-টাছ, দামন-টামন, মন্তর-তন্তর, জঙ্গল-টঙ্গল, খোয়া-দাওয়া, বাচ্চা-কাচ্চা, কাঁকড়া-ফাঁকড়া, জল-টল ইত্যাদি।

যে শব্দের পাশাপাশি পুনরাবৃত্তি ঘটেছে তাদের ভাষায় সেগুলি হল– আস্তে-আস্তে, ডুবা-ডুবা, মেরে-মেরে, বয়ে-বয়ে, যেতি-যেতি, কচি-কচি, সাথে-সাথে, টেনে-

টেনে, ডেকে-ডেকে, ভাসতি-ভাসতি, টানতি-টানতি, খপ-খপ, চোবাতি-চোবাতি, খেয়ে-খেয়ে, গুড়োতে-গুড়োতে, টেনে-টেনে, পচে-পচে, আস্তে-আস্তে, ডুবে-ডুবে, ফিকতে-ফিকতে, হেঁটে-হেঁটে, সিকেন্‌দে-সিকেন্‌দে ইত্যাদি।

এছাড়াও মহিলাদের মাধ্যমে এই অঞ্চলের ভাষায় 'কোড মিক্সিং', 'কোড সুইচিং', 'দ্বি-ভাষিকতা' ইত্যাদি লক্ষ করা যায়।

তথ্যসূত্র

১. ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী, ড.নীলিমা চক্রবর্তী, *ভাষাবিজ্ঞান,* দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্টিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, পৃ-১৪

২. তদেব, পৃ—১৩

৩. ড. রামেশ্বর শ, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,* পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ- ৪

৪. মৃনাল নাথ, *ভাষা ও সমাজ,* নয়া উদ্যোগ, ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০৬৭, পৃ- ১৭

৫. ড. রামেশ্বর শ, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,* পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ-৬৪৫

৬. *পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সংখ্যা* ১৪০৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১২, পৃ-৩৭১

৭. ড. পবিত্র সরকার, *লোকভাষা ও গ্রাম্যভাষা,* বাংলা লোক ভাষাবিজ্ঞান, সম্পা- শ্রী সনৎ কুমার মিত্র, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা- ২০০১, পৃ- ২৯

৮. *পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সংখ্যা* ১৪০৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১২, পৃ-৩৭১

৯. তদেব, পৃ-৩৭১

১০. নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পাদক), *সমকালের জিয়নকাঠি,* সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১২, পৃ- ১২০

১১. তদেব, পৃ-১২০

১২. *পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সংখ্যা* ১৪০৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১২, পৃ-৩৫৭

১৩. নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পাদক), *সমকালের জিয়নকাঠি*, সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১২, পৃ-২৮৪

১৪. তদেব, পৃ-২৭৪

১৫. *পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সংখ্যা* ১৪০৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০, পৃ-৩৭৬

সুফিবাদ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ

সেখ নূর আপসার
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়
মল্লারপুর, বীরভূম

সংক্ষিপ্তসার: সুফিবাদ একটি ইসলামীক অতীন্দ্রিয়বাদ। ইসলামে সুফিবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুফিবাদকে সাধারণত ইসলামিক রহস্যবাদ বলা হয়। রহস্যবাদ, বাস্তবতা সম্পর্কে একটি অপরিহার্য বিষয়।সুফিবাদ হল এক ধরণের আধ্যাত্মিক মতবাদ যা মানুষের অভূতপূর্ব, মহাজাগতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলিকে একীভূত করে এবং একই সাথে সুফিরা এই মহাবিশ্বের ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে খুব নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বোঝার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী। মূলত, এটি ছিল গোঁড়া ইসলামী জনগণ এবং স্বৈরাচারী খলিফাদের পরম কঠোর মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। সুফিরা শুধু আল্লাহ্‌র প্রেমিকই নন, তাঁরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবাসেন। অবিচ্ছিন্ন প্রেমের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহ্‌ এবং সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসেন। তাই আমরা বলতে পারি যে, সুফিবাদ মূলত প্রেমের দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাঁদের মূলমন্ত্র হল সর্বোচ্চ সত্য (হক) এবং মানবতার সেবা (খিদমত-ই-খালক) অর্জন করা। তাঁরা মনে করেন সৎ চরিত্র, শুদ্ধ জীবন এবং দায়িত্ব পালন সব সময় সব বয়সের সব শ্রেণির মানুষকে আকৃষ্ট করে। সুফিবাদ তার যোগসূত্র খুঁজে পায় হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনাদর্শনের মধ্যে। মানবজাতির প্রতি সেবা সুফিদের অন্যতম আদর্শের পাশাপাশি অন্যতম কর্তব্য। বর্তমান অতি-আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক যুগে মারাত্মক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সুফিদের এই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও প্রেমময় মনোভাবের ব্যাপক সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। সুফিবাদে যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা আমরা পাই এবং আমাদের সমাজ জীবনে তা কতখানিপ্রভাব বিস্তার করেছে তা-ই আমার আলোচনার মুখ্য বিষয়।

সূচকশব্দ:সুফি, সুফ, সাফা, সুফ্‌ফা, তাসাউফ,সুফিবাদ, আল্লাহ্‌, ইসলাম, হজরত মোহাম্মদ (সাঃ), খানকাহ, অতীন্দ্রিয়বাদ, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ,বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ।

মুখ্য আলোচনা:

সুফিবাদ হল এক ধরণের আধ্যাত্মিক মতবাদ যা মানুষের অভূতপূর্ব, মহাজাগতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলিকে একীভূত করে এবং একই সাথে সুফিরা এই মহাবিশ্বের ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে খুব নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বোঝার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সুফিবাদ

হল একটি ইসলামীক অতীন্দ্রিয়বাদ। মূলত, এটি ছিল গোঁড়া ইসলামী জনগণ এবং স্বৈরাচারী খলিফাদের পরম কঠোর মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। ইসলামের শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর দৈহিক মৃত্যুর পর, খলিফারা কেবল রাজনীতির প্রধানই ছিলেন না, ধর্মেরও প্রধান ছিলেন। সুফিরা ইসলামের সমতাবাদী বিভাগ, তারা ঐশ্বরিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি সমাজের উন্নতির জন্য তাদের জীবনে ইসলামী নীতিগুলিকে ব্যবহার করেছিল। সুতরাং, একদিকে সুফিরা হলেন ইসলাম অনুসরণকারী বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিকারী, যা সমস্ত ধর্মের অন্তর্নিহিত মূল কথা। সুফিবাদ আধ্যাত্মিকভাবে মানবজাতির ইতিহাসে একটি অবিচ্ছিন্ন আন্দোলন। সুফিবাদ অনুসারে, সসীম আত্মা সর্বদা অসীম সত্তার সাথে একত্রিত হতে চায়। এটি একজন সাধক এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে সরাসরি মিলন। আনন্দময় মুহূর্তে যা দেখা, শোনা এবং অনুভূত হয় তা সরাসরি অন্তর্জীবনের অতল গহ্বরে প্রবেশ করে। এখানে সাধক ঐশ্বরিক অমৃতে মত্ত হয়ে যায় এবং সর্বত্র একজন আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাউকে দেখতে পান না। অন্যদিকে, সুফিরা শুধু আল্লাহ্‌র প্রেমিকই নন, তাঁরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবাসেন। অবিচ্ছিন্ন প্রেমের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহ্‌এবংসমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসেন। তাই আমরা বলতে পারি যে, সুফিবাদ মূলত প্রেমের দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাঁদের মূলমন্ত্র হল সর্বোচ্চ সত্য (হক) এবং মানবতার সেবা (খিদমত-ই-খালক) অর্জন করা। তাঁরা মনে করেন সৎচরিত্র, শুদ্ধ জীবন এবং দায়িত্ব পালন সব সময় সব বয়সের সব শ্রেণির মানুষকে আকৃষ্ট করে। সুফিবাদ তার যোগসূত্র খুঁজে পায় হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)এর জীবনাদর্শনেরমধ্যে। ঐতিহাসিকভাবে এটা স্পষ্ট যে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)সুফি জীবনযাপন করেছিলেন এবং মোটা পশমী পোশাক পরিধান করেছিলেন। অধ্যাপক এ.জে. আরবেরি তার বই 'রিলিজিয়ন ইন দ্য মিডল ইস্ট'-এও ঘোষণা করেছেন, "এটা সত্য যে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)নিজে পশমী পোশাক পরে মারা গেছেন"[১]। ইসলাম অনুসরণকারীদের কাছে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)ছিলেন সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য আদর্শ। সেই সময়ে তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক নেতা এবং সামাজিক প্রধান, তাই তিনি 'আল ইনসানে আল-কামিল' (নিখুঁত মানুষ) হিসাবেও যোগ্য।

ইসলামে সুফিবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুফিবাদকে সাধারণত ইসলামিক রহস্যবাদ বলা হয়। রহস্যবাদ বাস্তবতা সম্পর্কে একটি অপরিহার্য বিষয়। রহস্যবাদ হল তাইযা ভক্তের মধ্যে সুপ্ত বা সুপ্ত আকারে বিদ্যমান। এখানে ভক্ত আল্লাহ্‌র সাথে পরম সান্নিধ্য লাভের জন্য আকাঙ্খিত থাকেন।সেইসময় মানব আত্মা এবং ঐশ্বরিক আত্মা একত্রিত হয়ে যায়।একজন সাধক সুফির অনুমান এই যে, সাধনাকালেসুফির আত্মা এবং অতীন্দ্রিয় আত্মার মধ্যে একটি বাস্তব সম্পর্ক রয়েছে। আরবি ভাষায় ইসলামিক অতীন্দ্রিয় দর্শনে সাধারণত ‘তাসাউউফ’শব্দটি ব্যবহিত হয়, যা ‘সুফিবাদ’ নামে

পরিচিত। সুফিরা বিশ্বাস করেন যে, গুরু বা পথপ্রদর্শক ছাড়া পৃথিবীতে কেউ কখনোই সফল হতে পারে না; গুরুর উপর নির্ভর করেমানুষের ঈমান এবং মানুষের হেদায়েত।তাঁরা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বিশ্বাসী। একজন সুফি সাধক ভক্তির সময়কালে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হন, যিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁর অভিভাবক আল্লাহ্‌এবং তিনি সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নির্দেশ পান। সুফি অতীন্দ্রিয়বাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য অন্যান্য ধর্মের অতীন্দ্রিয়বাদের মতোই। সুফিরাআল্লাহ্‌কে এক ও অদ্বিতীয়হিসাবে মান্যকরেন এবং ইসলামে আল্লাহ্‌ হলেনএমন একজন অতীন্দ্রিয় সত্ত্বা যিনি মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন।পবিত্র কোরআন শরিফ 'সূরা এখলাস' এ বলা হয়েছে-''কুলহু আল্লাহু আহাদ্‌, আল্লাহুস সামাদ্‌। লাম ইয়ালিদ্‌ ওয়ালাম ইউলাদ্‌। ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।"[২] অর্থাৎ, আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, আল্লাহ কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেননি এবং আল্লাহের সমতুল্য কেউ নেই। সকল মানুষকে তাঁরসেবক (আব্দ) বলা হয়। তাই সুফিরা মনে করেন, অসীম প্রেমই ঐশ্বরিক জীবনের একমাত্র সারাংশ। রহস্যময় পথ হল প্রেমের পথ যা বাস্তবতার সাথে পরম একীকরণের উপলব্ধির মাধ্যমে শেষ হয়।

সুফিবাদের উৎপত্তি একটি অন্তহীন বিতর্কের বিষয়, সেখানে বহু মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন সুফি শব্দটি আরবি শব্দ 'সাফা' (শুদ্ধ) থেকে এসেছে, যার অর্থ হল, সুফি তিনিই, যার অন্তর আল্লাহ্‌র প্রতি আন্তরিক। তাই তাকে 'মুতাসাউফ' হিসেবে গণ্য করা হয়।কিন্তু সুফী শব্দটি যদি 'সাফা' থেকে উদ্ভূত হয়, তাহলে এর সঠিক রূপটি হবে 'সাফাভী', সুফী নয়। অন্যান্য সুফিদের মতে, সুফী শব্দটি'সাফ' থেকে উদ্ভূত হয়েছে,যার অর্থহল, যারা আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্নথাকেন। কিন্তু সুফী শব্দের উৎপত্তি যদি 'সাফ' থেকে হয় তবে তা হবে সাফ, সুফী নয়। সুফীদের আরেক শ্রেণীর দাবি, সুফী শব্দটি 'সুফ্ফা'থেকে এসেছে। হজরতমোহাম্মদ(সাঃ) এর সময়ে তাঁর কিছু সাহাবী 'আশহাবি সুফ্ফা' উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন দরিদ্র,অখ্যাত, গৃহহীনযারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত সমস্ত আদেশমেনে চলতেন এবং নিজেদের সুরক্ষার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতেন। এইভাবেই মসজিদের বারান্দাটি তাদের প্রাসাদে পরিণত হত এবং তাঁরা তখন তাদের কাম্যবস্তু লাভ করতেন।[৩]কেউ কেউবলে থাকেন যে, সুফি শব্দটি গ্রীক শব্দ'সোফিয়া' (জ্ঞান) থেকে এসেছে। কিন্তু এই মতও গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা দার্শনিকভাবে অসম্ভব;কারণ, প্রাথমিক পর্যায়ে সুফিবাদ ছিল রহস্যময় আকারে এবং স্বাভাবিকভাবেই গ্রীক শব্দ সোফিয়র সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। অতএব, এটা স্পষ্ট যে এই দুটি শব্দের মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই। তবে যে যুক্তিটি সবথেকেগ্রহনযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় তা হল, সুফি শব্দের উৎপত্তিআরবি শব্দ'সুফ' (উল) থেকে হয়েছেএবং 'সুফ'শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত এবং অভিধানিকভাবে সুফি

শব্দের সাথে অনেক বেশি সম্পর্কিত।আরবি অভিধানে ‘তাসাউফ’ শব্দের অর্থ হল, যিনি পশমের পোশাক পরিধান করতেন। ‘তাসাউফ’ শব্দটি যদি সুফী শব্দের উৎপত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয় তবে আরবী অভিধান অনুসারে এটি আরও উপযুক্ত ও যুক্তিযুক্ত হবে।কোন সন্দেহ নেই যে ব্যুৎপত্তিগত এবং অভিধানগত দৃষ্টিকোণ থেকে সুফী শব্দটি ‘সুফ’ শব্দের মূল থেকে এসেছে। সুফী শব্দের প্রকৃত ও অভ্যন্তরীণ অর্থকে গভীরভাবে চিন্তা করলে এটিকে অনেকবেশি শুদ্ধ বা সঠিক বলে মনে হয়।

অন্যদিকে, সুফিবাদের সারমর্ম হল মারিফাত অর্জন করা, যা গ্রীক শব্দ সোফিয়ারসাথে অনেক বেশি সম্পর্কিত। সুতরাং, সোফিয়ার ধারণাটিসুফি চিন্তা ও দর্শনের ধারণার সাথে জড়িত। প্রখ্যাত সুফি আবু নসর আল সররাজ ঘোষণা করেছেন যে, সুফী শব্দটি সুফ থেকে এসেছে, কারণ পশমী পোশাক ছিল হজরতমোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রিয় পোশাক,যা তিনি নিয়মিত পরিধান করতেন।[৪]ইসলামের প্রথম দুই শতাব্দীতে সাধারণ মানুষ পশমের পোশাক ব্যবহার করতেবেশিপছন্দ করতেন, বিশেষ করে যাঁরা তপস্বী জীবনযাপন করতেন। হজরতমোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদের আমলে প্যাঁচযুক্ত ফ্রক (মুরাক্কা) পরিধান করা প্রচলিত ছিল। সেই সময় তাঁরা বলতেন, পশমী পোশাক পরিধান করুন দেখবেন আপনি আপনার হৃদয়ে ঈমানের মাধুর্য অনুভব করতে পারবেন।ফার্সি ভাষাতেও, সাধককে‘পশমিনাপুসো’(পশমী পোশাক পরিধানকারী) বলা হয়, যা সাধারণত ইসলামের পূর্ববর্তীতপস্বীরা ব্যবহার করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে এটি ধার্মিক ভক্তদের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। ইসলামের অনমনীয় একেশ্বরবাদ এবং আনুষ্ঠানিকতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে পারস্যের মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাস ছিলযে, তারা তাদের নগ্নতাকে আড়াল করার জন্য রুক্ষ চুলের কাপড় এবং মোটা উল দিয়ে নিজেদের পোশাক পরিধান করতো।[৫]

সুফিরা কোনো ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ছিলেন না, প্রকৃতপক্ষে, তারা ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির ওপর বেশি জোর দিয়েছেন।তাঁরা মনে করতেন, ভক্তের মন শুদ্ধ না হলে আচার-অনুষ্ঠান মূল্যহীন হবে। এমনকি সুফিরা বলেন যে‘লাসালাতা ইল্লা বি হুজরিল কাইব’ অর্থাৎ একাগ্রতা ছাড়া কোনো নামাজ বা প্রার্থনাগণ্য হবে না। অতএব, আমরা বলতে পারি যে সুফী তিনিই, যিনি কেবল উলের পোশাকই পরিধান করেন না, একই সাথে তাঁর হৃদয় পবিত্র এবং আল্লাহ্‌র প্রেমে পরিপূর্ণ।এই পরিপ্রেক্ষীর উপর ভিত্তি করে এটাই প্রতীয়মান হয় যে আদি পিতা হযরত আদম (আ.) প্রথম সুফি ছিলেন, আল্লাহ্‌তাঁকে আত্মা প্রদান করার আগে তিনি চল্লিশ দিন নির্জনে ছিলেন। তারপর আল্লাহ্‌তাঁর হৃদয়ে যুক্তির প্রদীপ ও তাঁর জিহ্বায় জ্ঞানের আলো জ্বালিয়েছিলেন এবং তিনি পৃথিবীর মধ্যে আবির্ভূত হন। অন্তত এটা স্পষ্ট যে, যদিও ইসলামের প্রাথমিক যুগে সুফি শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি তবুও এটা অনস্বীকার্য যে সেখানে সুফি চর্চা ছিল। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ড'ওহসান তার

বিখ্যাত রচনা 'দ্য অটোমান এম্পায়ার' গ্রন্থে সুফিবাদের উত্থান সম্পর্কেবলেছেন: "হিজরতের প্রথম বছরে (৬২২ খ্রিস্টাব্দের অনুরূপ)মক্কার পঁয়তাল্লিশ জন নাগরিক নিজেদের মধ্যে যোগ দেন, মদিনার অন্যরা বিশ্বস্ততার শপথ নেন যে তারা তাদের নবীর মতবাদ মেনে চলবেন; ভ্রাতৃত্বের একটি সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করাএবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট কর্মের অনুশোচনা এবং দুঃখের চেতনায় ধর্মীয় অনুশীলন করতেন।তারা নিজেদেরকেমোহাম্মদের থেকে আলাদা করে সূফি নাম নিলেন"।[৬]অতএব, এটা স্পষ্ট যে সুফি শব্দটি পরবর্তী সময়ে প্রচলিত হয়েছিল। যারা ধার্মিক ও তপস্বী জীবনযাপন করতেন তারা আল্লাহ্‌র স্মরণ ও ধ্যানের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। এই ব্যক্তিরা পরবর্তীতে সুফি নামে আবির্ভূত হয়েছিলেন।[৭] এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কোরান ও হাদীসের সাথে সুফির সম্পর্ক কতটুকু? এটা স্পষ্ট যে, সুফি শব্দটি পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায় না যার দ্বারা আমরা অনুমান করতে পারি যে এটি হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর যুগে প্রচলিত ছিল। যদিও সুফি শব্দটি পবিত্র কুরআনে আসেনি কিন্তু অনেক সমার্থক শব্দ রয়েছে, যেমন মুকাররাবুন (আল্লাহ্‌র কাছে); সাবিরিন (ধৈয্যশীলব্যক্তি),সালেহীন (ধার্মিক ব্যক্তি)আবরার (গুণী ব্যক্তি),জুহাদ (ধার্মিক ব্যক্তি), মুত্তাকিন (আল্লাহ্‌ ভীরু ব্যক্তি) ইত্যাদি।

পবিত্র কোরআনেরবহু জায়গায় ইসলামের রহস্যময় এবং রহস্যময় ধারণাগুলিকে রূপকভাবে প্রকাশ করে।শুধুমাত্র পবিত্র কোরআনেই নয়, হাদিসেও হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) নিজেই রহস্যময় ধারণা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন যখন তিনি হেরা গুহায় ভালো সময় কাটান। এর পাশাপাশি, তিনি নিজে রাত জাগরণ, উচ্চতর প্রার্থনা অনুশীলন পছন্দ করতেন, তাই তাকে আল-ইনসান-আল-কামিল (নিখুঁত মানুষ) হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এক হাদিসে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, আপনি আপনার আল্লাহ্‌র ইবাদত করুন যেভাবে আপনি তাকে দেখছেন, যদি আপনি তা করতে সক্ষম না হন তবে আপনি মনে করেন যে তিনি আপনাকে দেখছেন। সুফিবাদ ইসলামে কোনো অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নয়, বরং এটি অনাদিকাল থেকেই ইসলামের সাথে নিহিত রয়েছে। চারজন ধর্মপ্রাণ খলিফার জীবনেও এই সুফি ধারণা প্রাণবন্তভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। মূলত হযরত আবু বকর ও হযরত আলীর নাম তপস্বী সুফি অতীন্দ্রিয়বাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে স্বীকৃত এবং সুফিরা তাদের নামের সাথে তাদের শৃঙ্খলা (সিলসিলাহ্‌) প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে অনেক প্রবীণ সুফী ইসলামী রহস্যবাদের একজন উপাসক হিসাবে আবির্ভূত হন যারা সুফিবাদের ইতিহাসে তাদের জায়গার চিহ্ন তৈরি করেছিলেন।যেমন, হাসান আল বাসরি, ইব্রাহিম বিন আদহাম, বাইয়াজিদ আল বিস্তামি, মারুফ আল কারখি, মালিক বিন দিনার, জালাল আলদীন

রুমি, হারিস আল মুহাসিবি, ধুন নুন মিসরি, আল হাল্লাজ, রাবিয়া আল বসরী সহ আরও অনেকে।

একদিকে সুফিবাদ হল একটি অভ্যন্তরীণ আন্দোলন এবং বিশেষ করেএটি আত্মার একটি আন্দোলন যার দ্বারা সাধকের আত্মা পরমসত্তার অতুলনীয় ভালবাসার মাধ্যমে শুদ্ধ ও নিখুঁত হয়ে ওঠে এবং তিনি আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত যন্ত্রণা ও আনন্দ উপভোগ করতে ভালবাসেন। তিনি বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস ও ভালবাসার আগ্রহ পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ তার উপর তাঁর মহিমা দেখান। এর অর্থ হল আল্লাহ্‌র আদেশ এবং আইন অনুযায়ী কাজ করা, যা তাদের বাহ্যিক রূপে নয় তা তাদের গভীরতম আধ্যাত্মিক ভাবে উপলব্ধী করতে হয়। এই জীবনযাত্রা কেবলমাত্রআল্লাহ্এবং সমস্ত সৃস্টির প্রতি প্রেমময় ভক্তির মাধ্যমেই সম্ভব। এ প্রসঙ্গে একজন শ্রদ্ধেয় সুফি আলী আল হুজভিরি বলেছেন "সুফীবাদে অন্তর বা আত্মা বিভেদ থেকে শুদ্ধ হয়"[৮] কারণ, ভালোবাসাইহল একমাত্র শুদ্ধিকরণেরউপায়। সুফিবাদের তিনটি উল্লেখযোগ্য স্তর রয়েছে, যথা, শরীয়ত (আইন), তরিকত (পথ) এবং হাকিকত (সত্য)। এগুলি কেবলমাত্র সুফিসাধকদের পরিশুদ্ধিমূলক স্তর, প্রথমে নিম্ন গুণাবলী এবং আত্মার নিচু স্তর থেকে, তারপর মানবিক গুণাবলীর বন্ধন থেকে এবং অবশেষে একটি সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধি ঘটে। কিন্তু এই সব স্তরে প্রেমই অপরিহার্য মাপকাঠি।মুহাব্বাৎ বা ইশক (সীমাহীন প্রেম) হল সুফি সাধকদের একটি অবস্থা (মাকাম)। এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত থেকেঅতিন্দ্রিয়জগতের প্রতি যাত্রা। স্রষ্টার সাথে সুফিদের সম্পর্ক ঠিক প্রেমিক ও প্রেয়সীর (আশিক ওয়া মাশুক) সম্পর্কের মতো। তাই, একজন স্বনামধন্য সুফি খাজাহ বন্দ-ই-নওয়াস ঘোষণা করেছেন,'যার ভালোবাসা নেই তার ঈমান নেই'।[৯]সুফিগন অনুশীলনের সারমর্ম মেনে চলেনতাই তারা জাত-পাত-ধর্মের ভেদাভেদ ছাড়াই সকলকে ভালোবাসেন। একজন সত্যিকারের সুফি সম্পূর্ণরূপে মত্ত থাকেন, সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রেমে মগ্ন থাকেন এবং তিনি আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুই দেখেন না;আল্লাহ্ ছাড়া কিছু মনে করেন না এবং তিনি আমার এবং আপনার মধ্যে কোনও বৈষম্য করেন না। তাই, তিনি ঘোষণা করেন: "ইশকাশিক হ্যায়, ইশক হ্যায় মাশূক, খুদ কে আপর খুদ ফিদা হ্যায় ইশহক", অর্থাৎ, প্রেম হল প্রেমিক এবং প্রেমই হল প্রিয়, এখানে প্রেম হল নিজের সাথে নিজে প্রেম করা।[১০]সুফিদের দৃষ্টিতে সকল সৃষ্টি এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং সকল মানুষ এক পিতা অর্থাৎ আদমের বংশধর। এ প্রসঙ্গে শিরাজের একজন বিখ্যাত কবি হাফিজ ঘোষণা করেছেন, "যে প্রেমে জীবিত থাকে সে কখনও মরে না, আমাদের মধ্যে অনন্তকাল জীবিত থাকেএবং সেই প্রেমীকচির অমর থাকে"।[১১]

যদিও সুফিগণ সসীম আত্মাকে অসীম সত্তার সাথে একত্রিত করার চেষ্টা করেন, যাকে সুফি পরিভাষায় বলা হয় ফানা-ফি-আল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র মধ্যে নিজেকে বিলীন করা), তাসত্বেও তারা সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে না বরং প্রসারিত করে।

সকলের প্রতি তাদের প্রেমময় মনোভাব, যাকে বলা হয় “আররুজু ইলাল খালক বা আসায়েরো ইলাল খাইক” অর্থাৎ সকল জীবের প্রতি ফিরে আসা বা ভ্রমণ করা। তাই তারা ঘোষণা করেনভালোবাসা হল এমন, যা বিনিময়ে পৃথিবীর সর্বত্রই ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয়।[১২]

মানবজাতির প্রতি সেবা সুফিদের অন্যতম আদর্শের পাশাপাশি অন্যতম কর্তব্য। সুফিরা যে নীতিবাক্যে বিশ্বাস করে তা হলবিশ্বস্ততা। বিশ্বস্ততা হল বিশ্বস্তদের আয়না, যা পবিত্র হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর একটি জনপ্রিয় ঐতিহ্যও, যেটিকে সুফিরা সামাজিক মিলন বা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের জন্যও একটি উৎকৃষ্ট নীতিবাক্য বলে মনে করতেন। সুফিরা নিজেদেরকে বিশ্বভ্রাতৃত্ব হিসাবেপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁদের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মনোভাব অনেকেরমধ্যে প্রসারিত, যখন একজন ব্যক্তিঅন্যব্যক্তির দোষ খোঁজেন, তখন সর্বদা নিজের মধ্যে দোষটি সংশোধন করা উচিত বলে সুফীরা মনে করেন; এভাবে তার হৃদয়ের আয়না ধীরে ধীরে পবিত্র হতে থাকে। একজন প্রকৃত সুফী মনে করেন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষেসকলের প্রতি সাহায্যের হাত সম্প্রসারণ করা সমস্ত মানুষের কর্তব্য,বর্ণ, ধর্মে বিভেদ করা অমূলক। সুফিদের এইরূপ মনোভাব সাধারণ মানুষের আচরণ থেকে একেবারেই আলাদা। কারন,সাধারণ মানুষ কঠোর মনোভাব এবং ধর্মকে উচ্চতর কর্মের মাধ্যম হিসাবে ব্যক্তিগত পরিত্রাণের জন্যচেষ্টা করে। কিন্তু ইসলামের সুফিরা তাঁদের সকল অনুসারী ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে জীবন উৎসর্গ করেছেন। এমনকি একজন প্রকৃত সুফি তার উপবাস পর্যন্ত ভঙ্গ করতে পারেন যদি তার প্রতিবেশী বা সহকর্মী সদস্য তার সাথে খেতে পছন্দ করেন, যেহেতু তারা মনে করে প্রতিবেশী বা সহকর্মীর হৃদয়ের আনন্দ রোজার প্রতিদানের চেয়ে বেশি মূল্যবান।[১৩]তাঁরা মনে করেন, হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বস্তদের একজনকে খুশি করা নবীহজরত মোহাম্মদকে (সাঃ) খুশি করার সমান, এবং সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ও খুশি হবেন যদি তাঁর প্রিয় বন্ধুহজরত মোহাম্মদ (সাঃ) খুশি হন।[১৪]সমগ্র বিশ্বের মানুষ বা অন্যান্য জীব যাই হোক না কেন সকলের সর্বদা সেবা করা সুফিরা অন্যতম কর্তব্যবলে মনে করেন। একজন সত্যিকারের সুফী কখনো অসুস্থদের পরিচর্যা ও সেবা করা থেকে দূরে থাকতে পারে না, এমনকি যদি কখনও সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েও পড়েন। সুফিরা বলেন যে, আপনি যদি আপনার মানব সঙ্গীদের সঠিকভাবে সেবা করতে না পারেন তবে আপনি কীভাবে আল্লাহ্র সেবা করবেন? একজন সুফী অন্যান্য মানুষের শান্তি ও উপকারের বিষয়ে কতটা সচেতন তা আমরা সহজেই লক্ষ্য করতে পারি।

এমনকি সুফি সাধক কখন কারোর ক্ষতি চাইতে পারেন না।এমন কি তাঁর নিজের যত ক্ষতি হয়ে যাক না কেন। একজন সুফি কখনই বলে না যে এটি আমার সম্পত্তি বা এটি শুধুমাত্র আমার। তাঁরা সর্বদা মনে করেন তার কোনও “ব্যক্তিগত

সম্পত্তি থাকা উচিত নয়”।[১৫]তাঁর কাছে যদি কোনো জিনিস থাকে, তাহলে তার উচিত কোনো প্রকার লোভ না করে বা বিলম্ব না করে সেই জিনিস বা সম্পত্তি তার সহকর্মী বা ভাইদের মধ্যে বণ্টন করা, অন্যথায় তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে দূরে সরে যাবেন। তাঁরাতাঁদের নিজেদের পরিত্রাণের জন্য তাদের পার্থিব সম্পদগুলি অন্যান্য মানুষের সাথে ভাগ করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, যা তাঁদের জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত করবে। এছাড়াও, সুফিরা তাঁদেরসাধনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং তাঁরা খানকাহকে (ধর্মশালা) একটি সাংস্কৃতিক ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আত্তীকরণের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ কোনও বৈষম্য ছাড়াই জাতি, ধর্ম , বর্ণ নির্বিশেষে কিছু সময়ের জন্য থাকতে পারবেন। তাঁদের সমতাবাদী মনোভাব, বিস্তৃত মানসিকতা এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য ধর্মের মানুষকেও অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল এবং সমস্ত ধরণের বাধা ভেঙে দিয়েছিল। কোনো জাতিগত ভেদাভেদ ছাড়াই সব মানুষ থাকা-খাওয়া একসঙ্গে করতেন। পবিত্র যেকোন গ্রন্থ এবং ধর্মগ্রন্থ সকলের জন্য উন্মুক্ত এবং ব্যবহারযোগ্য ছিল, এমনকি নারীরাও পুরুষদের মতো একই অধিকার এবং সুবিধা ভোগ করতেন। তাঁরাতাঁদেরবন্ধুত্যপূর্ণএবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মনোভাবকে কতটা প্রসারিত করেছিলেন তা ভারতের বিখ্যাত সুফি সাধক হজরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহঃ)’র এই বাণী দ্বারা উল্লেখিত হয়েছেঃ “আউয়াল সাখাওয়াতি চুন সেখাওয়াত-ই-দারিয়া দোয়াম শাফকাইত চুন সেফকাত-ই-আফতাবসেওয়াম তওয়াজুই চুন তেওয়াজু-ই-জামীন” অর্থাৎ প্রথমত উদারতাসমুদ্রের মতো,দ্বিতীয়ত, মৃদুতাসূর্যের মতো;এবং তৃতীয়ত, বিনয় পৃথিবীর মতো।[১৬]

সুফিগণ সকলকে প্রশান্ত ও অহিংস দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা উচিৎ বলে বিশ্বাস করতেন।তাই তাঁরাতাঁদের অনুসারীদেরও ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে প্রচার করেছিলেন, "ক্রোধকে দমন করা উচিত, পাপীদের ক্ষমা করে আমাদের সকলের নমনীয় হওয়া উচিত"।[১৭]যেহেতু, সুফিরা বিশ্বের সমস্ত মানুষের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এবং প্রেমময় সম্পর্ক বজায় রাখতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন।বর্তমান অতি-আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক যুগে মারাত্মক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সুফি সাধকদের এই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও প্রেমময় মনোভাবের ব্যাপক সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। বেশীরভাগ গোষ্ঠী, সংস্কৃতি, ধর্ম, সৃজনশীল ব্যক্তি, দর্শন, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি সমস্ত কিছুই প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের দ্বারা পরিপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি অতি ভয়ানক। প্রতিটি মুহুর্তে আমরা আণবিক উত্তেজনা এবং আসন্ন যুদ্ধের মধ্য দিয়েবসবাস করছি, এক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিশ্বব্যাপী সুফিদের দ্বারা নির্দেশিত প্রেমময় এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মনোভাবই এটি রক্ষা করতে সক্ষম। বিশ্বের প্রত্যেকে যদি সুফিদের প্রচারিত এবং আচরণের মতো বিশ্বব্যাপী প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের চর্চা করে, তবে সমগ্র বিশ্ব আনন্দ ও সুখে

পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং সমগ্র সমাজ চির শান্তি ও নিখুঁত শৃঙ্খলা ভোগ করবে। সুফিরা শিক্ষা দিয়েছেন, যদি আমরা ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি এবং সমস্ত প্রাণীর সেবা করার জন্য মানসিক ভাবে তৈরি থাকি; তবে সমগ্র বিশ্বে বৈষম্যমূলক সম্পর্ক দূর করে নৈতিকতা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। সুতরাং, সুফিবাদে যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা আমরা পেলাম তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অতন্ত্য গুরুত্বপূর্ণ।

সূত্রনির্দেশ:

১। আরবেরি, এ জে, রিলিজিয়ন ইন দ্যা মিডল ইস্ট, দ্বিতীয় খণ্ড, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা. ২৫৩।

২। আল- কোরআন, সূরা এখলাস- ১১২:১

৩। সিরদার, ইকবাল আলী, ইসলামীক সুফিইজম, (ইদারহ-ই-আদাবিয়াত-ই-দেল্লি, দিল্লি, পৃষ্ঠা. ৩৪-৩৫।

৪। আল সররাজ, কিতাব আল লুমা, অনুবাদক- আর.এ. নিকলসন,তাজ কোম্পানি, দিল্লি, ১৯১৬, পৃষ্ঠা. ১০।

৫। শরীফ, জাফর, ইসলাম ইন ইন্ডিয়া বা কানুন-ই-ইসলাম, অনুবাদক- জি.এ.হারকোল্টস,অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা. ২৮৩।

৬। পাল, হরেন্দ্র চন্দ্র, জালুদ্দিন রুমি অ্যান্ড হিজ তাসাউউফ, এম আই জি হাউজিং এস্টেট, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা. ১১০-১১১।

৭। ভলিউদ্দীন, মীর, কুরানিক সুফিইজম, মতিলাল বেনারসি দাস, দিল্লি, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা. ২-৩।

৮। অ্যান্যামারি, শিম্মেল,মিষ্টিক্যাল ডাইমেনশনস্ অফ ইসলাম, দ্যা ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা প্রেস, চ্যাপেল হিল, ১৯৭৫, পৃ. ১৫

৯। ইসলাম, মোহাম্মদ সিরাজুল, দ্যা প্লেস অফ লাভ ইন সুফি এন্ড চৈতন্য ফিলোসফি এন্ড ইটস ইউনিভার্সেল অ্যাপ্রোচ,খণ্ড-৩২, সংখ্যা-২, সম্পাদনা- এ এস ডি শর্মা, কোয়াটারলি জার্নাল অফ দ্যা ডিপার্টমেন্ট অফ ফিলজফি এন্ড রিলিজিয়ান, বিশ্বভারতী, আগস্ট, ১৯৯৬- ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭,পৃষ্ঠা. ৩

১০। তদেব, পৃষ্ঠা. ৪

১১। তদেব, পৃষ্ঠা. ৫

১২। ইসলাম, মোহাম্মদ সিরাজুল, ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন ইন দ্যা লাইট অফ সুফিইজম, জার্নাল- ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন প্রবলেমস ইন পার্সপেক্টিভ, বিশ্বভারতী, সম্পাদনা- পি যশ, বিশ্বভারতী, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা. ৭৬-৭৭।

১৩। অ্যান্যামারি, শিম্মেল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২২৮-২২৯।

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা. ২২৯।

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা. ২২৯।

১৬। কে.এ. নিজামী, সাম আসপেক্টস অফ রিলিজিয়ন এন্ড পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া, আলিগড়, ১৯৬১, পৃষ্ঠা.১৮৫।

১৭। ইসলাম, মোহাম্মদ সিরাজুল, ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন ইন দ্যা লাইট অফ সুফিইজম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৭৯।

প্রান্তজনের জীবিকার টানাপোড়েন ও বিপন্ন জীবনের রোজনামচা : প্রসঙ্গ 'সমুদ্র দুয়ার' উপন্যাস

রীতা মুরারী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপঃ দক্ষিণ বাংলার সমুদ্রের বুকে ছোট ছোট নতুন বা পুরাতন দ্বীপগুলি বাবলা, ঝাউ, গরাণ, সুন্দরি গাছ, ঝোপ-ঝাড় প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। সেখানে চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, ময়ুরভঞ্জ প্রভৃতি স্থান থেকে জীবিকার সন্ধানে মানুষ এসে বসবাস করছে। জমিদার, জোতদার, লাটদাররা প্রান্তিক মানুষগুলিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে উদ্বাস্তু করে দ্বীপে এনেছিল। জঙ্গলে সরল নিরীহ মানুষগুলি প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে না পেরে শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে অহরহ। শুধুমাত্র পুঁজিবাদী শক্তির দ্বারাই নয়; সরকারের কিছু মুনাফালোভী কর্মচারীর অপব্যবহারে মেহনতি মানুষগুলির জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হাসেম তার পিতৃদখলি সম্পত্তি হারানোর ভয়ে বিপর্যস্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সমুদ্রের নোনাভূমিতে বসবাস করে ব্রিটিশ আমল থেকেই শোষিত হতে থাকে তারা। তাই নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য তারা স্বদেশী আন্দোলন, তে-ভাগা আন্দোলন ও জলদস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের অস্তিত্বকে কোনো রকমে টিকিয়ে রেখেছে। কঠোর বাস্তববাদী, সমাজসচেতন, নিম্নবর্গের কথাসাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৮) এই বিপন্ন, শোষিত মানুষের যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনের আর্তনাদকে নির্মম বাস্তবতায় 'সমুদ্র দুয়ার'(২০১০) উপন্যাসে ভাষারূপ দিয়েছেন।
সূচক শব্দঃ নোনাভূমি, জোতদার, জুলুমবাজ, পুঁজিবাদী, প্রান্তিক মানুষ, দ্বীপ।

মূল আলোচনাঃ

সমাজকাঠামোয় ক্ষমতা ও আধিপত্যের কেন্দ্র থেকে সর্বাপেক্ষা দূরে অবস্থানরত মানুষদের আমরা নিম্নবর্গের আওতায় ফেলতে পারি। বৈদিক যুগে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা ছিল বৈষম্য বা ভেদাভেদযুক্ত। প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থায় বর্ণগত, বৃত্তিগত ও জাতিগত বিভাজন প্রকট ছিল। এর পরবর্তীতে সামাজিক বর্গীকরণের ফলে বৈষম্য, অত্যাচার, বঞ্চনা, মানুষকে নানা ছুতোয় শোষণ এবং নিপীড়ন ইত্যাদির চিত্র যা তৎকালীন শ্রেণিবিভক্ত সমাজের চিত্ররূপেই চিত্রিত। এর ফলস্বরূপ যার অর্থ আছে, আর যার অর্থ নেই তা জাতিভেদের মতোই দাঁড়াচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতিতে নিম্নবর্গের যে ধারণা প্রকাশিত, তারই প্রতিরূপ হিসেবে চন্ডাল, শূদ্র, শবর, সাঁওতাল, মুন্ডা, কোল, ভীল প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ সাহিত্যাঙ্গনকে ভরিয়ে

তুলেছে। এই মানুষগুলি কৃষিজীবী হোক বা অরণ্যচারী হোক; সমাজের উচ্চকোটির মানুষের বিলাসিতার সোপান গড়তে গিয়ে তথাকথিত নিচুতলার মানুষগুলির জীবন-যাপন, সংগ্রাম, লড়াই-এর পরেও দৈন্যদশাগ্রস্ত জীবন থেকে মুক্তি না পেয়ে পদদলিত, নিষ্পেষিত হয়ে প্রান্তিক হয়ে পড়েছে।

'নিম্নবর্গ' ধারণাটিকে বাংলায় আলোচনার পূর্বে ইংরেজি 'Subaltern' শব্দটির প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। Subaltern' শব্দটির উৎস ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ আন্তনিও গ্রামসির 'Selection from the Prison Notebook'। তবে শব্দটির সাধারন অর্থ হল অধস্তন বা নিয়ন্ত্রিত। ইংরেজিতে এর সমার্থক শব্দ হল 'Subordinate'। 'Subaltern' শব্দটি আন্তনিও গ্রামসি ব্যবহার করেছেন দুটি অর্থে----পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় 'Subaltern' শ্রেণি হল শ্রমিক শ্রেণি। গ্রামসির মতে, সামাজিক ক্ষমতার বিন্যাসে শাসিত ও শোষিত হয়। যারা নিয়ত হেগেমনিক শ্রেণি বা পুঁজিমালিক বা বুর্জোয়াদের দ্বারা শোষিত হয় তারা ডমিন্যান্ট বা শাসক শ্রেণির অপর প্রান্তে অবস্থান করে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অন্যান্য পর্বেও গ্রামসি 'Subaltern' শ্রেণির কথা বলেছেন। তাঁর মতে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত থাকে প্রভূত্বকারী শ্রেণির হাতে। প্রভুশক্তি যুগে যুগে, কালে কালে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেছে নিম্নবর্গের ওপর। এই শ্রেণির মানুষের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক চিত্র রূপায়ণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রামসির তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে সমাজতত্ত্ববিদ ও বিশিষ্ট সমালোচক রণজিৎ গুহ 'Subaltern' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে 'নিম্নবর্গ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'Subaltern Studies' প্রবন্ধ সংকলনটি ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হওয়ার পর দেশীয় সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্গের রূপরেখাটি প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে।

বাংলাসাহিত্যে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বর্তমান সময়ে বহুল জনপ্রিয় দক্ষিণ বাংলার প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৮) পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ডায়মন্ড হারবার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করেছেন। তারপর কলকাতা বিদ্যালয় অধীনস্ত ডায়মন্ড হারবার ফকিরচাঁদ কলেজ থেকে কলাবিভাগে স্নাতক হন। এরপর সরকারি চাকরি দিয়ে কর্মজীবন শুরু। বিশেষ করে বিংশ শতকের সাতের দশক থেকে ঝড়েশ্বর প্রথম কথাসাহিত্যের ধারায় উত্তরসূরি হিসেবে সাহিত্যাঙ্গনে আবির্ভাব। ছাত্রজীবনেই লেখালেখির হাতেখড়ি এবং তা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। তেভাগা আন্দোলনের বিপ্লবী কংসারী হালদারের ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিশেষত সুন্দরবন বাদা অঞ্চল, দ্বীপ বা সমুদ্র সংলগ্ন চরে বসবাসকারী মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। স্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক কাজে যুক্ত থাকার কারণে মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, পরিচয় আদান-প্রদান প্রভৃতির ফলে নিম্নবর্গীয় মানুষদের খুব কাছে থেকে জেনেছেন ও বুঝেছেন। এরপর সরকারি চাকরি দিয়ে কর্মজীবন শুরু। বিশেষ করে বিংশ শতকের সাতের দশক থেকে ঝড়েশ্বর প্রথম সাহিত্যজগতে পদার্পন

করেন। তাঁর রচিত প্রথম গল্প 'মগ্নচর'। এছাড়াও 'বন্দর'(১৯৯২), 'চরপূর্ণিমা'(১৯৯৫), 'স্বজনভূমি'(১৯৯৪), 'সহিস'(২০০৩), 'সমুদ্র দুয়ার'(২০১০) প্রভৃতি উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে আবর্তিত হয়েছে দক্ষিণ বাংলার বাদা, আবাদী, নদী-নালা, চরভূমি, গাঙ সমুদ্র সংলগ্নকেই কেন্দ্র করে।

সুন্দরবন অঞ্চলের নোনামাটি, নোনাজল, জলজঙ্গল এবং একমাত্র জলকে নির্ভর করে তাদের জীবিকার অন্বেষণে মৎস্যজীবী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী এই প্রান্তিক মানুষগুলি জীবন ও জীবিকার তাগিদে নিজবাস থেকে বিচ্যুত হয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের ভূমিহীন, আশ্রয়হীন, ভ্রাম্যমান জীবনের যে অভিঘাত এনেছে ক্ষমতাশালীর শোষণ, দুর্নীতি, সরকারের অনিষ্টকারী রূপ তার বাস্তবোচিত রূপ দিয়েছেন ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

'সমুদ্র দুয়ার' উপন্যাসে সমুদ্র উপকূলে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা দ্বীপগুলির মানুষের জীবনযন্ত্রণার চিত্র তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হাসেম ও তার স্ত্রী সালেয়া বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে সংসার বেঁধেছিল। সমুদ্রের চরভূমিতে ফাঁকা গাঙের বাতাসে নোনাগন্ধ, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের আঘাতে ধস নামতে নামতে তার পাঁচ বিঘে জমিটুকু হারাতে বসেছে। একসময় হাসেমের পিতার প্রচুর জমি ছিল; কিন্তু সমুদ্র গ্রাস করেছে। অবশিষ্ট জমিটুকু এখন মুনাফালোভীরা তাদের স্বার্থে এনার্জি প্রজেক্ট, বিদ্যুৎ প্রজেক্ট, বায়ু বিদ্যুৎ, হোটেল, পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করার চেষ্টা করছে। হাসেমের পিতৃদখলি সম্পত্তি, শৈশবের অতীত স্মৃতি জন্ম ভিটে-মাটি পৈতৃক ভূমির সঙ্গে তার নাড়ির টান। শ্বশুরের সর্বস্ব খোয়ানোর আখ্যান শুনে সালেয়ার বুকে ব্যাথা জাগে। এ প্রসঙ্গে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় বলেছেন---

"সে গুলো মৌজা মাটি ভাঙতে ভাঙতে গোটা লক্ষ্মীপুরটাকে খেয়ে নিল সমুদ্র। কত মানুষ যে ভূমিহারা.......বাস্তুহারা......বাস্তুহারা...! বর্ণকটা নোনামাটি ঘাসের বড় চাঙড় হয়ে ধ্বসে পড়ল কান বাজিয়ে। আচমকা মনে হল তার.....বাস্তুহারা কথাখানা নারায়নীতলার গাঙ পাড়ে বাঙাল জেলে বউরা দিনে কতবার যে বলে......।"(১)

একদিকে জোতদার ও জমিদারদের লুণ্ঠন প্রক্রিয়া, বহু বছর বসবাসকারী প্রান্তবাসী মানুষগুলিকে উদবাস্তুতে পরিণত করেছে। অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এ অঞ্চলের মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে।

সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে রক্ত হিম করা শিহরণ বার বার দাগা দেয় পরিচয়রিক্ত মানুষগুলির। তারা মনে মনে হৃদয়ের সম্মিলন খুঁজে সমতা বজায় রেখে পথ চলার স্বপ্ন দেখে। ওপার বাংলা, মেদিনীপুর, ময়ুরভঞ্জ থেকে বিভিন্ন জনজাতির মানুষ এসেছিল জীবন ও জীবিকার টানে। জনার্দন হেমব্রমের বাপ পিতামহদের তো লাটদার ও জোতদাররা এনেছিল নোনা গাঙ সমুদ্রের বুকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের ফায়দা তোলার জন্য। ক্ষুধার তাড়নায় এখানকার মানুষ অস্তিত্বের জন্য লড়াই

করে। জীবন-যাপনের পথে প্রকৃতিও এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাঘ ও সাপের উপদ্রুত এ অঞ্চলের মানুষ যাযাবর জীবনকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। চারিদিকে বালি আর ধূ ধূ সমুদ্র, বুনো গাছপালা, ঝোপ-ঝাপ, অন্তরীন নুড়িপাথর তো বনবিবি; পরেরটা মা গঙ্গাদেবী, বিশালাক্ষী, মনসাদেবীই তাদের ভরসা। চরভূমির মানুষগুলির রোজগারের পথে হানা দেয় বহু প্রতিবন্ধকতা। তারা বেকারত্ব ও মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে হতদরিদ্রে পরিণত হয়েছে ও বেঁচে থাকার অধিকার হারিয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের তুলনায় মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে প্রান্তিক মানুষগুলির অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়েছে। একথায় দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার; যা 'সমুদ্র দুয়ার' উপন্যাসে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রাঞ্জল করে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন------

"আর আমাদের দেশীয় মৎস্যজীবীরা ভারতের সমুদ্র উপকূলে ২৭ লক্ষ টন মাছ ধরে সাধারণ মোটরাইজড ফিশ বোট দ্বারা। আর বাকী ১৩ লক্ষ টন মাছ দেশীয় জেলেরা ধরতে পারছে না, এই মিছে অজুহাতে বিদেশী অতি যন্ত্রশক্তিসম্পন্ন ভেসেলগুলোকে লাইসেন্স দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার.......এভাবে জয়েন্ট ভেঞ্চার ঢুকছে সমুদ্র বেয়ে দেশের মাটিতে, ব্যবসায়......."(২)

মৎস্যজীবী মানুষদের বিদেশী শোষক, মালিকদের হাতে সমুদ্রের জলের নিচের সম্পদ বিদেশী আধুনিক যন্ত্র দিয়ে জলের তলার সমস্ত মাছ ধরে নেয়; আর দেশীয় জেলেরা মাছ ধরার জন্য বুক বাঁধে কিন্তু মাছ পায় না। মালিকের ঘরে দেনা বাড়লে বেকারত্বে ক্ষতবিক্ষত নিরন্ন মানুষগুলি্র মনের মধ্যে কৃষক আন্দোলনের দানা বাঁধে। এর ফলে মৎস্যজীবীদের ওপর খাজনার জুলুম, শারীরিক নির্যাতন দিনের পর দিন বেড়ে চলায় তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সুন্দরবন অঞ্চলের লোহাচড়া, ঘোড়ামারা দ্বীপ ও মজা গাঙে নোনা ঢেউ-এর ছোবলে দ্বীপগুলির পাড় ভাঙতে ভাঙতে প্রায় নিশ্চহ্ন হয়ে যাচ্ছে। দ্বীপের মানুষজন নিয়ত এই পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে পরাজিত হয়ে অন্য দ্বীপে স্থানান্তর হতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়াও সমুদ্রের ভয়ঙ্কর গর্জনে মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। এরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশি ঔপন্যাসিক হরিশংকর জল দাস বলেছেন----

"সে রাতে জলোচ্ছ্বাস হল, গোটা সমুদ্র উপকূল নোনা জলের নিচে চলে গেল। প্রবল বৃষ্টি চারদিক আঁধার করে রাখল সমস্ত রাত। বাতাসের প্রচন্ড তান্ডবে জেলেপাড়ার প্রায় প্রতিটি ঘরের চাল উড়ে গেল। মাথা হারিয়ে প্রতিটি গাছ কবন্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। জলপুত্ররা কেউ কেউ গাছে চড়ে কেউ ভাইজ্যাবাশ ধরে, কেউ ঘরের চালে চড়ে জান বাঁচাল।(৩)

নোনা অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষগুলি ফি বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়। 'দহনকাল' উপন্যাসে বর্ণিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতোই 'সমুদ্র দুয়ার' উপন্যাসে বিধ্বস্ত জনজীবনের বাস্তব চিত্র পাই। ধূ ধূ সমুদ্র, নোনাবালি এখানকার মানুষের বুকের ভেতর সর্বত আতঙ্ক জাগায়।

দক্ষিণ বাংলার সমুদ্রজীবী মানুষগুলি নোনাজলের বুকে বিচরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা পনেরো-কুড়ি দিন ধরে সমুদ্রের দূরদূরান্তরের গভীর স্রোতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মৎস্য শিকার করে। এই প্রান্তিক মানুষগুলির নুন আনতে পান্তা ফুরোয় । তাদের মুখের ভাত কেড়ে নেয় পুঁজিবাদীদের চালাকি, জোচ্চরির মত নির্মম কর্মকান্ড। আর জলদস্যুদের কবলে পড়ে তাদের জীবনে চরমতম দুর্যোগের ঝড় বয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে অমর মিত্রের 'ধনপতির চর' উপন্যাসের এ মন্তব্য উল্লেখযোগ্য-----

"বনের সিংহকে ভোজ্য প্রাণী ভেট দেওয়ার মতো করে জলদস্যুদের যুবতী নারী দিতে হয়। সিজিনে মাঝে মধ্যেই নেয়। শেষের জন পড়ে থাকে দ্বীপে। এমন হতে পারে জলদস্যু সর্দারের রুচিই হল না নতুন নারীতে। তখন সেই নারী দ্বীপে না খেয়ে মরে। জলে ঝাঁপ দিয়ে হাঙর, কুমিরের পেটে যায়।"(৪)

মিতা মান্ডি, বিরোজা দেবী ও জনার্দন হেমব্রমের মতো বহু মানুষ রুজি-রোজগারের টানে দেশ-দেশান্তর থেকে ছুটে এসেছে চরভূমিতে নিজেদের বাস্তুভিটে ত্যাগ করে। জন্ম-জন্মান্তর লালিত ভূমি থেকে বিচ্যুত হয়ে মাতৃত্বের ঘ্রাণ স্মৃতিপটে আগলে রেখে বেঁচে থাকার রসদ খোঁজার চেষ্টা করেছে এখানে। কিন্তু সরকারের উদাসীনতায় বিপন্ন মানুষগুলির নিত্য চলার পথে অবিরাম আতঙ্কের স্রোত বয়ে যায়। বনবিভাগের বিনা অনুমতিতে পরিত্যক্ত কাঠ সংগ্রহ করাও নিষিদ্ধ কিংবা লাইসেন্স ছাড়া প্রান্তিক জেলেদের মাছ ধরাও বেআইনি করেছে সরকার। জমিদার, লাটদারদের নৃশংস আচরণ প্রান্তিক মানুষগুলিকে আরো বেশি নিঃস্ব করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে 'স্বজনভূমি' উপন্যাসের এ কথাগুলি উল্লেখযোগ্য-----

"মহেন্দ্র বিজলীদের রক্তের নাতি......লাটব্যাপী তে-ভাগা...... ফসলের তিন ভাগ সাব্যস্তের আন্দোলনে.......যার মধ্যে কত কাহিনি......কত ইতিহাস....পুলিশের আক্রমণ......চকদার লাটদারদের দুর্দান্ত দাপট.....সেই ঘটনার অংশীদার মানুষের নাতি হয়ে ধীরেন্দ্র নিজেকে খানিক মর্যাদায় সমৃদ্ধ করে তোলে। একদম গায়ের কাছে অন্ধ কমরেডের ছেলে যে বাপের ইতিহাস বহন করে এখনও কিছু মূল্য পায় তার কাছে নিজেকে ছোট করতে বাধে।"(৫)

'স্বজনভূমি' উপন্যাসে কৃষি আন্দোলন এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল। বহু মানুষ ন্যায্য অধিকার পাওয়ার জন্য এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। 'সমুদ্র দুয়ার' উপন্যাসেও মিতা, বিরোজা, জনার্দনরা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনে সামিল না হলেও তারা বিপর্যস্ত জীবন থেকে মুক্তি পায়নি।

সুন্দরবন বাদা অঞ্চলের বিভিন্ন নতুন নতুন দ্বীপে রোজগারের টানে ছন্নছাড়া খেটে-খাওয়া ক্ষুধার্ত মানুষগুলি জীবনযন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকে। সমুদ্র তীরের জলে-জঙ্গলে প্রতিনিয়ত তারা লড়াই করে বেঁচে থাকে। বিপন্ন মানুষগুলির শোচনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে কেউ কেউ অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এ দ্বীপগুলিতে

তারা ডাকাতি লুঠ ও পাচার কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই ধরণের জাতীয় ক্রিয়াকলাপ দেশের নিরাপত্তা ও জনকল্যাণের পক্ষে বিপদজ্জনক। সেই কারণে জনসাধারণের মঙ্গল কামনায় সরকারি তরফে এই জাতীয় স্থান থেকে বিপ্লবী বন্দুকধারী মানুষগুলির জেলবন্দি করার ঘটনার চিত্রও পাওয়া যায়। লেখকের কথায়----

"....ব্রিটিশ আমলে স্বদেশী বিপ্লবীরা অস্ত্র দেওয়া নেওয়া করতো .....। গাঙ ডাকাইতরা ঘাঁটি গাড়তো। কোন ফেরার দেশপ্রেমিক লুকাইত ! তে-ভাগার কৃষক নেতারা লুকাতো, সেই সময়ের গরমেন্ট নেতাদের নামে হুলিয়া দেয়। জীবন্ত বা মৃত ধইরা দিলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার!"(৬)

সুন্দরবনে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী মানুষ জলদস্যু দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে তাদের সামগ্রিক মনুষ্যত্ববোধকে আঘাত করে মৃত্যুর মুখে ফেলে দেয়। দস্যুরা নারী অপহরণ করে ও ধর্ষণ করে পাচার কিংবা হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। সমাজসচেতন লেখক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় নারী সমাজের অবমাননার ঘৃণ্য চিত্রকে বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গিতে 'সমুদ্র দুয়ার' উপন্যাসে ব্যাখ্যা করেছেন।

সুন্দরবন চরবাসীদের জীবনযাপনের বিভিন্ন ধরণের পেশার মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় 'সমুদ্র দুয়ার' উপন্যাসে। মৌয়াল, বাওয়ালী, মৎস্যজীবী, কাঁকড়া শিকারি, কৃষিজীবী, সাইদার, মাঝি-মল্লা প্রভৃতি শ্রেণির মানুষ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করে চলেছে নিয়ত। জল-জঙ্গলে অতি বিপদজ্জনক পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষের সাপ, বাঘ ও কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে জীবন ও জীবিকা টিকিয়ে রাখতে হয়। ঔপন্যাসিকের কথায় এই চিত্র আরও বেশি প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে-----

"ভাবে.....যদি সেদিন কাঁকড়া ধরতে বাসা খালের পলি কাদা বরাবর অত জঙ্গলে না সেধোত নিজের লোকটা......! মা মনসা মাগো....গাছের ডাল বেয়ে অমন ছোবলটা মারে--- পেছন উরুতে....! একপ্রস্থ ঝাড়ফুঁক দিয়ে দ্বীপের মেছোদের ভুটভুটি রেডি। সমুদ্রটুকু পারিয়ে বকখালির হাসপাতালে লে যাবার সময় দিলে নি......"(৭)

দুর্গম জঙ্গলে প্রান্তিক মানুষগুলি বসবাস করার ফলে তাদের কাছে খুব একটা শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। তাই তারা কুসংস্কারের অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে তারা এখনও দূরে অবস্থান করে। এই বিপদসংকুল মানুষরা সাপে কামড়ানো কিংবা সাধারণ রোগব্যাধিতে ঝাড়ফুঁক দিয়ে নিরাময়ের চেষ্টা করে এবং অজান্তেই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে।

দক্ষিণ বাংলার উদ্বাস্তু মানুষের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া এই মানুষরা অহরহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শোষিত হচ্ছে। জোতদার ও জমিদারের কাছে দাদন নিয়ে কাজ করতে বাধ্য থাকে। কিন্তু এরপরেও অসহায় মানুষগুলির মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় কিছু দেশি-বিদেশি মানুষের অর্থলোলুপতা। আর সরকারি বনদপ্তরের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত

নজরদারিতে সামান্য বনজ উপকরণ সংগ্রহ করাও তাদের দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়-----

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ বন বিভাগ
সংরক্ষিত বন
বিনা অনুমতিতে আইনত দন্ডনীয়।
অনুমত্যানুসারে"(৮)

জঙ্গলনির্ভর মানুষগুলিকে জঙ্গলে প্রবেশ ও জঙ্গলের উপকরণ সংগ্রহে নিষেধাজ্ঞা জারি করলে তাদের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তারা বিকল্প পেশার সন্ধান করতে গিয়ে জমিদার- জোতদারদের দ্বারা প্রতিনিয়ত শোষিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। বিকল্প পেশা হিসেবে কিছু প্রান্তিক মানুষ মৎস্য শিকার, আড়তে কাজের মতো সামান্য উপার্জনে তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা লাঘব করার চেষ্টা করে। অথচ প্রশাসকের আড়ালে রেঞ্জার সাহেবের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া নিঃশব্দে মহামারির মতো নিপীড়ন করে চলে তাদের। ঝড়েশ্বরের দৃষ্টিতে------

"চলা ফেরার বালি চরে উপদ্রপ! পরে মনে হল মিতার...... কত প্রলয় ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। ঘর চালা ভেঙ্গে তছনছ ফি-সন। তখন তো কেউ আসেনি.....। ক্ষুধায় কত জন যে দানা দেখে না! তখন এই কোটপ্যান্ট বন্দুক তো আইসে না গো....!"(৯)

ভাগ্যের হাতে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষরা বনদেবী, বিশালাক্ষী, মনসা দেবীর শরণাপন্ন হয়েছে। উদ্বাস্তু জীবনে লড়াই করে এবং শাসকের ঘাত-প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত হয়েও বিকল্প উপায়ে বাঁচার চেষ্টা করে তারা। কিন্তু সেই পথেও 'পথের কাঁটা' হয়ে দাঁড়ায় অর্থবান ও ধনবান কিছু লোভী মানুষ। ফলে নিম্নবর্গ শ্রেণির শান্তিতে বসবাস করা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তাদের উপর বনরক্ষীদের অত্যাচার ও জোর-জুলুম করে উচ্ছেদ করিয়ে নিঃস্ব করে তোলে। তাই দ্বীপে টিকে থাকার জন্য তাদের রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয়েছে; এভাবেই তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে সামিল হয়েছে।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় 'সমুদ্র দুয়ার' উপন্যাসে প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রামের উপকথাকে সুন্দররূপে ভাষাদান করেছেন। দ্বীপ অঞ্চলের মানুষের জীবন প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেমন ভয়াবহ আকার ধারণ করে তেমনি মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ে নিরন্ন মানুষগুলি নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। জমিদার, জোতদারের লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় শান্তিপ্রিয় প্রান্তবাসীদের চরম দুর্ভোগে হাসেম, মহেন্দ্র, হিরু, শিশির, দিলীপ, সুকুমার, জনার্দনদের জীবন ও জীবিকা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। বনদেবী, মা মনসা, শীতলা ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়ে বিপদগ্রস্ত মানুষগুলি বেঁচে থাকার পথ খোঁজে। বাদা অঞ্চলের শ্রমজীবী নিরন্ন, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের কথাকার ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় 'সমুদ্র দুয়ার'(২০১০) উপন্যাসে সর্বগ্রাসী

রক্তশোষণকারী পুঁজিবাদী শ্রেণির অত্যাচারে জর্জরিত দুর্দশাগ্রস্ত বিপন্ন মানুষের জীবনসংকটের চিত্রকে ভাষারূপ দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

(১) ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, 'সমুদ্র দুয়ার', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬, পৃ- ১১

(২) তদেব, পৃ- ৪৪

(৩) হরিশঙ্কর জলদাস, 'দহনকাল', মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট, ২০১৪, পৃ- ১০২

(৪) অমর মিত্র, 'ধনপতির চর', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, চতুর্থ সংস্করণঃ সেপ্টেম্বর ২০০৭, মাঘ ১৪১৩, পৃ- ৩১৬

(৫) ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, 'স্বজনভূমি', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পুনমুদ্রণঃ জুন ২০১৬, আষাঢ় ১৪২৩, পৃ- ৯৫

(৬) ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, 'সমুদ্র দুয়ার', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬, পৃ- ৩১

(৭) তদেব, পৃ- ৯৭

(৮) তদেব, পৃ- ১৩০

(৯) তদেব, পৃ- ১৯১

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা:

(১) রাকেশ মন্ডল, 'সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে মানুষের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম', সমকালের জীয়নকাঠি প্রকাশন, জীবন মন্ডল হাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, প্রথম প্রকাশঃ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

(২) জগদীশচন্দ্র সরদার সম্পাদিত, 'নিষ্পলক', দলিত জীবন ও সংগ্রাম, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১

(৩) জহর সেনমজুমদার, 'নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন', পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ৭০০০০৯, দ্বিতীয় মুদ্রণঃ এপ্রিল ২০১৭

হংসোপনিষদে প্রতিপাদিত হংসোপাসনা : ব্রহ্মবিদ্যালাভের এক অনন্য উপায়

ব্রততী চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়, মল্লারপুর, বীরভূম

সারসংক্ষেপ: ভারতবর্ষীয় জ্ঞানচর্চার পরাকাষ্ঠা উপনিষদ্‌সাহিত্য। বৈদিক আচারসর্বস্ব যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের আড়ালে ঋষিমনের অন্তরালে যে জ্ঞানপিপাসা উৎপন্ন হয়েছিল, সেটি চরিতার্থ হয় বেদের শ্রেষ্ঠাংশ উপনিষদে। শরীরপ্রকোষ্ঠে আবদ্ধ 'আমি'র প্রকৃত স্বরূপোদ্ঘাটন উপনিষদের মূল আলোচ্য বিষয়। আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদনান্তর সেই পরমপদে পৌঁছোনোর পথের সন্ধান দেয় উপনিষদ্। এই প্রধান আলোচ্য বিষয়ের পাশাপাশি আলোচিত হয় এমন অনেক বিষয় যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আলোকবর্তিকার মতো দিকদর্শন করায়। প্রাচীন-অর্বাচীন বা প্রধান-অপ্রধানভেদে শতাধিক উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে একটি হল 'হংসোপনিষদ্'। এটি শুক্ল যজুর্বেদীয়, মতান্তরে অথর্ববেদীয় একটি উপনিষদ্। উপনিষদ্‌টির প্রারম্ভিক অংশ শ্লোকাকারে রচিত হলেও মূলত গদ্যাশ্রয়ী। স্বল্পকলেবর এই উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায় বর্ণিত হয়েছে। উপনিষদের নাম থেকেই প্রতীত হয় যে এর উপজীব্য হল 'হংস'। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত হংসমন্ত্রের স্বরূপ, সেই মন্ত্রের জপবিধি, হংসমন্ত্রের ধ্যানবিধি সমস্তই বর্ণিত হয়েছে ব্রহ্মবিদ্ সনৎসুজাতের মাধ্যমে। তিনি আত্মজিজ্ঞাসু গৌতমের অনুরোধে হংসের উপাসনা দ্বারা কিভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব অধিগত করে ব্রহ্মভাব লাভ করা যায় সে সমস্ত তত্ত্ব সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্রহ্মতত্ত্ব অধিগমের এ যেন এক অনন্য উপায়। কোনওরকম বাহ্যাড়ম্বর ব্যতীত নিজের মধ্যেই এই উপাসনা সাধনার এক নতুন পথকে উন্মোচিত করে। বর্তমান নিবন্ধে হংসোপনিষদে বর্ণিত হংসের উপাসনা পদ্ধতি ও তার মাধ্যমে ব্রহ্মাবগতি আলোচিত হয়েছে।

সূচকশব্দ:
অপ্রধান উপনিষদ্, হংস, পরমহংস, হংসমন্ত্রের জপ, ধ্যানবিধি, উন্মনন, নাদশ্রবণ, ব্রহ্মাবগতি।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

'পূর্ণতা' পদটি আমাদের সকলের জীবনের কাঙ্ক্ষিত এক অবস্থা। তবে বিষয়টি আপেক্ষিক। কেউ ভোগবিলাসাদি চরিতার্থকারী ঐহিক বিষয়সমূহের দ্বারা জীবনকে

পূর্ণতাদানে মগ্ন, কেউ আবার যশের দ্বারা জীবনকে পরিপূর্ণ করার জন্য লোকহিতার্থে নিবেদিতচিত্ত। কেউ ঈশ্বরসেবায় নিমগ্ন, কেউ বা ধনসম্পত্তির প্রাচুর্যে বিভোর। প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রেক্ষিতে জীবনের পূর্ণতার সন্ধানে ব্যাকুল। কিন্তু কোন সসীম বিষয় কখনও কি প্রকৃত অর্থে পূর্ণতার মাপকাঠি হতে পারে? এর উত্তর—'না'। যাবতীয় ঐহিক ও পারত্রিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রকৃত পূর্ণতার স্বাদের আস্বাদন কখনই সম্ভব নয়। যা প্রকৃতার্থে পূর্ণ, যার থেকে অধিক পূর্ণের অস্তিত্ব অসম্ভব, সেই অসীম সত্তাই পারে সকলকে পূর্ণতা দিতে। এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ। তাই তাঁরা আয়ু, যশ, পুত্র, বিবিধ ঐশ্বর্য ইত্যাদিকে উপেক্ষা করে সেই পূর্ণতাকে খুঁজেছেন, যা অসীম, যাকে পেলে আর পাওয়ার কিছু অবশিষ্ট থাকে না, যার খোঁজ একবার পেলে তাকে হারানোর ভয়ও থাকে না। বৈদিক জ্ঞানচর্চার সারাৎসার উপনিষদের ছত্রে ছত্রে প্রতিধ্বনিত হয় এই পূর্ণতার জয়গান। উপনিষদ্ যে শুধুমাত্র সংসারত্যাগী মুমুক্ষু সন্ন্যাসীদের অনুসরণীয় এমন নয়, উপনিষদে প্রতিপাদিত বিষয়গুলিকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলে জানা যায় আমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিজ্ঞাসার উত্তর। সেই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় উপনিষদ্ যেমন সংসারানলে দগ্ধ মুমুক্ষুকে আত্যন্তিক মুক্তির আস্বাদ দিয়ে তার জীবনকে পূর্ণ করে তোলে, ঠিক তেমনি সংসারে আবদ্ধ আপামর জনগণকে কর্তব্যাকর্তব্য, ঠিক-বেঠিকের পথনির্দেশ করে তাদের জীবনযাত্রাকে পূর্ণ করে তোলে।

ভারতবর্ষীয় প্রজ্ঞার পূর্ণ প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় এই উপনিষদ্সাহিত্যে। ক্রান্তদর্শী ঋষিদের মননঋদ্ধ চিন্তনের ফসল উপনিষদ্সমূহ। উপনিষদের মূল বক্তব্যবিষয় আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যা। উপনিষদের ঋষিকবি শরীরপিঞ্জরে আবদ্ধ 'আমি'র স্বরূপ উপলব্ধি করে 'আমি'কে চেনার ও জানার পথের সন্ধান দিয়েছেন। লক্ষ্য এক হলেও সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার বিভিন্ন পথের সন্ধান দিয়েছেন ঋষিকবিরা। অধিকারীভেদেই এই পথের বৈচিত্র্য। তবে নদীর গতিপথ যেদিকেই যাক না কেন মিশতে হয় তাকে মোহানায়। ব্রহ্মোপলব্ধিই সেই মিলনস্থল, যেখানে 'জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ' অনুভূতি উদিত হয়। বর্তমান নিবন্ধে ব্রহ্মোপলব্ধির বা আত্মোপলব্ধির এক সাধনমার্গই আলোচ্য।

উপনিষদের স্বরূপ বিষয়টি বহুচর্চিত। তাই তার পুনর্ব্যাখ্যান নিবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির নামান্তর। কিন্তু কিছু না বললে নিবন্ধের বক্তব্যের ক্রমবিন্যাস বিঘ্নিত হবে। তাই উপনিষদের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যকে অনুসরণ করে বলা যায়—বৈরাগ্যসম্পন্ন মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তিগণ যে বিদ্যার আশ্রয় নিয়ে তদ্গতভাবে নিঃসংশয়চিত্তে অনুশীলন করেন, যে বিদ্যা তাদের সংসারবীজ অর্থাৎ জন্মমরণকারণভূত অবিদ্যাকে শিথিল বা বিনষ্ট করে, সেই বিদ্যাই উপনিষদ্। সেই সাথে সেই বিদ্যা প্রতিপাদক গ্রন্থাদিও উপনিষদ্ পদবাচ্য।[১] এই উপনিষদের সংখ্যা নিয়ে মতবৈসাদৃশ্যের অন্ত্য নেই। সংস্কৃত ভাষার কল্পতরু 'শব্দকল্পদ্রুম' গ্রন্থে বলা হয়েছে—'তত্র চতুর্ণাং বেদানাং

অশীতিসহিতশতাধিকসহস্রসংখ্যক উপনিষদঃ'[২] অর্থাৎ চারটি বেদে মোট উপনিষদের সংখ্যা ১১৮০। বেদজ্ঞ অনির্বাণ প্রমুখের মতে উপনিষদের সংখ্যা ২০০ এর বেশি। 'মুক্তিকোপনিষদ্' এ ১০৮ টি উপনিষদের নাম উপলব্ধ। এদের মধ্যে ঈশাদি ১০ টি উপনিষদ্ প্রধান পদবাচ্য। অবশিষ্টগুলিকে অপ্রধান আখ্যা দেওয়া হয়। অপ্রধান উপনিষদ্গুলির মধ্যে একটি হল 'হংসোপনিষদ্', যার আলোকে বর্তমান নিবন্ধের বিষয়টি আলোকিত।

'শব্দকল্পদ্রুম' গ্রন্থে প্রাপ্ত উপনিষদের তালিকা অনুযায়ি হংসোপনিষদ্ শুক্লযজুর্বেদীয়। কিন্তু 'উপনিষদ্সংগ্রহঃ' গ্রন্থে এটিকে অথর্ববেদীয় বলা হয়েছে।[৩] স্বল্পকায় এই উপনিষদ্টি গূঢ়ার্থের প্রকাশক। উপনিষদের বক্তব্য উপস্থাপনের ধারাকে অনুসরণ করে উপনিষদের প্রারম্ভে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপনিষদ্টির বক্তব্যবিষয় বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞানলিপ্সু গৌতম এখানে প্রশ্নকর্তা এবং সর্বশাস্ত্রবিশারদ সনৎসুজাত মতান্তরে সনৎকুমার[৪] উত্তরদাতা। 'ব্রহ্মবিদ্যাপ্রবোধো হি কেনোপায়েন জায়তে'— গৌতমের এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মজ্ঞ সনৎকুমার বলেন—

অনাখ্যেয়মিদং গুহ্যং যোগিণাং কোশসংনিভং।
হংসস্য গতিবিস্তারং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্।। (হংস,৩)

অনাখ্যেয় অর্থাৎ সকলের কাছে অপ্রকাশ্য, অত্যন্ত গোপনীয়, যোগীসংবেদ্য 'হংস'র জ্ঞান ও তার উপাসনা পদ্ধতি ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপায়রূপে উপনিষদ্টিতে বিবৃত। হংসোপাসনা পদ্ধতি ও তার মাধ্যমে পরমপদপ্রাপ্তির আলোচনার পূর্বে উপনিষদ্শীর্ষক 'হংস' পদটি বিচার্য। এখানে 'হংস' পদটি মন্ত্রার্থে গ্রহণীয়। তন্ত্রসারে বলা হয়েছে—

"হঙ্কারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংসেতি পরমং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা"।।[৫]

গ্রন্থানুসারে জীব সবসময় সর্বাবস্থায় হংসমন্ত্রের জপ করে। সেটি ঘটে আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে। 'হং' শব্দের দ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু বাইরে যাওয়ার মাধ্যমে এবং 'সঃ' শব্দের দ্বারা বাহ্যবায়ু গ্রহণের মাধ্যমে জীব হংসমন্ত্রের জপ করে প্রতিনিয়ত। আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া যেমন অনায়াসসাধ্য, কোনওরকম বাহ্যিক প্রয়াস সেখানে অপেক্ষিত নয় সেইরকম হংসমন্ত্রের জপের জন্যও বাহ্যিক কোন আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় না। এই মন্ত্রজপের জন্য কোন আয়াসের প্রয়োজন হয়না বলেই একে 'অজপা' আখ্যায় ভূষিত করা হয়। আমাদের শরীরে এই হংসমন্ত্রের ব্যাপ্তি খুব সুন্দর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ঋষিকবি বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে—কাঠের মধ্যে যেমন আগুন বিদ্যমান, তিলের মধ্যে যেমন তেল, সেইরকম মানুষের শরীরের সর্বাংশ জুড়ে বিরাজমান এই হংস। আমাদের শরীর হংসের অভিব্যাপক আধার। জন্মলগ্ন থেকেই সেই মন্ত্র আমাদের সাথে সম্পৃক্ত। প্রয়োজন শুধুমাত্র তার তত্ত্বাধিগম এবং সাধনপদ্ধতির অবিকৃত অভ্যাস। ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক এই মন্ত্রের সম্যক্ জ্ঞান সেই

পরমপদে পৌঁছোনোর সহায় বলে উপনিষদের ঋষি সেই হংসোপাসনার উপদেশ দিয়েছেন।

হংসোপাসনা ব্যাখ্যার প্রারম্ভিক লগ্নে উপদেষ্টা সনৎসুজাত শ্রোতার বোধার্থে হংস ও পরমহংসের স্বরূপনির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। ভাষ্যকার শঙ্করানন্দ বলেছেন—'হন্তি গচ্ছন্তি সংসারকাসারমিতি হংসঃ'। এই মন্ত্রের সাধনার মাধ্যমে সংসাররূপ অজ্ঞানের বিনাশে পরব্রহ্মের স্বরূপাধিগম হওয়ায় এর নাম হংস। সংসারমোহ ছিন্ন করে স্বস্বরূপের জ্ঞানোদয়ের কারণে 'হংস' নামে এইমন্ত্র পরিচিত। এই হংসের যথার্থজ্ঞান হলে সেই উৎকৃষ্ট জ্ঞানজন্য বা তার সংস্কারজন্য যে অবশিষ্ট জ্ঞান তা যখন বিনষ্ট হয় তখন তাকে বলে 'পরমহংস'।[৬] হংসের পরিণতরূপই পরমহংস, যেখানে সমস্ত ভেদ তিরোহিত হয়ে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ব্রহ্মানুভূতির উন্মেষ হয়। এই উপলব্ধিই সাধকের কাঙ্খিত ফল, তার সাধনার লক্ষ্য। উপনিষদ্‌টিতে ঋষি সংসারমোহভঙ্গকারী এই হংসমন্ত্রের ধ্যান ও জপবিধি, হংস থেকে পরমহংসে উত্তরণের প্রক্রিয়া, হংসোপাসনার ফল সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

উপনিষদে সর্বত ব্যাপ্ত এই হংসকে পক্ষীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। হংসমন্ত্রের ধ্যানের প্রারম্ভিক অবস্থায় সাধকের মানসপটে হংসের এই প্রতিকৃতি তৈরি করার জন্যই এই আকৃতিদান। যেহেতু 'হংস' শব্দোচ্চারণের পরক্ষণেই হংসপক্ষীর অবয়ব সাধারণের মনে জেগে ওঠে তাই হংসমন্ত্রকেও পাখিরূপে কল্পনা করে তার সর্বাংশের গুরুত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। বলা হয়েছে—"অগ্নিষোমৌ পক্ষাবোংকারঃ শিরো বিন্দুস্তু নেত্রং মুখং রুদ্রো রুদ্রাণী চরণৌ বাহূ কালশ্চাগ্নিশ্চোভে পার্শ্বে ভবতঃ।" অগ্নি এবং সোম হল সেই হংসের পক্ষদ্বয়। ওংকার বা প্রণব হল তার মস্তকস্বরূপ। শরীরের মধ্যে মাথা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মন্ত্রসমূহের মধ্যে ঈশ্বরবাচক প্রণবের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে মস্তকরূপে প্রণবের কল্পনা। 'বিন্দু' হল হংসের নেত্র, 'রুদ্র' হলেন মুখস্বরূপ, 'রুদ্রাণী' চরণযুগল, 'কাল' হল তার বাহুস্বরূপ। 'বিন্দু' প্রণবমন্ত্রের পঞ্চম মাত্রা[৭] এবং তা প্রকাশস্বরূপ হওয়ায় 'বিন্দু' নেত্ররূপে কল্পিত। বক্রত্বহেতু রুদ্র মুখস্বরূপ। সর্বাধারত্বহেতু রুদ্রাণী চরণযুগল। সর্বদাতৃত্বহেতু কাল বাহুরূপে কল্পিত। এই হংসের উভয়পার্শ্বে অগ্নি বিদ্যমান। সাধনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে নিরাকারে চিত্তস্থৈর্য্য সম্ভব না হওয়ায় মন্ত্রটিকে সাকার করে তোলা হয়েছে। উক্ত মন্ত্রের জপবিধানও দৃষ্ট হয়। অন্যান্য মন্ত্রের মতো হংসমন্ত্রেরও ঋষি, দেবতা, ছন্দ বর্ণিত। বলা হয়েছে—"অথ হংস ঋষিঃ। অব্যক্তগায়ত্রী ছন্দঃ, পরমহংসো দেবতা। হমিতি বীজম্। স ইতি শক্তিঃ। সোঽহমিতি কীলকম্"। হংসমন্ত্রের ঋষি হলেন 'হংস'। অব্যক্তগায়ত্রী হল ছন্দ। পরমহংস দেবতারূপে প্রতিপাদিত। মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বা প্রাপ্য বিষয়ই মন্ত্রের দেবতা, হংসমন্ত্রের লক্ষ্য যেহেতু পরমহংস, তাই তিনিই দেবতা। মন্ত্রের বীজ হল 'হং', 'স' শক্তি এবং 'সোঽহম্' হল কীলক। 'সোঽহং সোঽহং'—এইরূপে হংস দৃঢ় হওয়ায় তা কীলক। ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, শক্তি, কীলক যুক্ত এই হংসমন্ত্রের ২১৬০০ বার জপের বিধান দিয়ে বলা হয়েছে—"ষট্‌সংখ্যক

অহোরাত্রয়োরেকবিংশতি সহস্রাণি ষট্‌শতান্যধিকানি ভবন্তি”।[৮] যেহেতু হংসমন্ত্র আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বরূপ সুতরাং অহোরাত্রি শ্বাসপ্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তার জপ নিষ্পন্ন হয়।

হংসের সঙ্গে সাধকের পরিচয় দৃঢ় হলে হংসের ধ্যান করণীয়। মালিন্যহীন ও প্রত্যাহৃত চিত্ত যখন কোন বিষয়ে একাগ্রতাপূর্বক স্থির হয়, তখন সেই অবস্থাকে যোগের ভাষায় বলে ‘ধারণা’।[৯] তদনন্তর চিত্তে ধ্যেয় বিষয়ের যে একাকার নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যয়প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাকে ধ্যান[১০] বলা হয়। এই ধ্যান সর্বদা ধ্যেয়সাপেক্ষ। ধ্যানের প্রারম্ভিক পর্যায়ে কোন স্থূল সাবয়ব বিষয়ে চিত্তকে স্থির করতে হয়। ধ্যান পরিণতির সাথে সাথে সেই ধ্যেয় বস্তুর সূক্ষ্মতাপ্রাপ্তি ঘটে এবং শেষে আলম্বনহীন অবস্থাতেই ধ্যানস্থ হওয়া যায়। ধ্যানের এই ক্রমিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে আলোচ্য উপনিষদেও। হংসমন্ত্রকে শরীরাভ্যন্তরস্থ হৃদ্‌পদ্মে ধারণার মাধ্যমে ধ্যানবিধি উচ্চারিত হয়েছে ঋষিকণ্ঠে। প্রথমে স্থূল আলম্বনে ধ্যানবিধি বর্ণিত হয়েছে। হৃদয়স্থিত অষ্টদল পদ্মের প্রতি পত্রে হংসের বা পরমহংসের, যা প্রকৃতপক্ষে পরমহংস থেকে অভিন্ন, তাকে স্থাপনের দ্বারা ধ্যানের উপদেশ দিয়েছেন ঋষি। অষ্টসংখ্যক পত্রে অবস্থানহেতু এর আটটি বৃত্তি ও তাদের ফল উপনিষদে আলোচিত হয়ছে। বলা হয়েছে— ‘পূর্বদলে পূণ্যে মতিঃ আগ্নেয়ে নিদ্রালস্যাদয়ো ভবন্তি যাম্যে ক্রূরে মতিঃ নৈঋত্যে পাপে মনীষা বারুণ্যাং ক্রীড়া বায়ব্যে গমনাদৌ বুদ্ধিঃ সৌম্যে রতিপ্রীতিঃ ঈশানে দ্রব্যদানং...’। হৃদয়পদ্মের পূর্বদিকে অবস্থিত পত্রে যখন হংসের অবস্থান হয় তখন পুণ্যকর্মে বা শুভকর্মসমূহে মতি হয়। আগ্নেয় বা অগ্নি নামক দক্ষিণ-পূর্ব দিকস্থ পত্রে বৃত্তিকালে নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতি বুদ্ধি হয়। ‘আদি’ পদের দ্বারা বৈচিত্র্য, ক্রোধ, মূর্চ্ছা ইত্যাদি বোধ্য। যদি পদ্মের ‘যাম’ বা দক্ষিণস্থ দলে হংসের স্থিতি হয়, তাহলে তা ক্রূরতাবুদ্ধির জনক হয়। নৈঋত বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত পত্রে হংসের স্থিতি হলে পরদ্রব্যহরণ, পরস্ত্রীগমন ইত্যাদি পাপবুদ্ধির উদয় হয়। হংসের স্থিতি যখন বরুণে বা পশ্চিমস্থ দলে হয় তখন ক্রীড়ার উদয় হয়। বায়ু নামক উওর-পশ্চিম দিকে স্থিত যে পত্র তাতে স্থিতি হলে গমনের বা দেশান্তর গমনের বুদ্ধি হয়। ‘সৌম্য’ নামক উত্তরস্থিত দলে স্থিতি হলে স্রক্‌চন্দনাদি সেবনে এবং যোষিৎগমনে প্রীতি জন্মায়। এবং ঈশান বা উত্তর-পূর্বস্থ দলে হংসের স্থিতি বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা দ্রব্যদানে মতি উদিত হয়।

স্থূল আলম্বনে ধ্যানের পর সূক্ষ্মের ধ্যান করণীয়। হৃদয়স্থিত অষ্টদলপদ্মের মধ্যবর্তী স্থানে হংসের স্থিতি হলে বৈরাগ্য প্রাপ্তি ঘটে। বলা হয়েছে—‘মধ্যে বৈরাগ্যং’। ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সমস্তবিষয়ে বিতৃষ্ণাকে বৈরাগ্য বলে। হৃদ্‌পদ্মের মধ্যস্থলে হংসের ধ্যান করলে এই বৈরাগ্য লব্ধ হয়। পদ্মের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত কেশর, কর্ণিকা ও লিঙ্গ— এই তিনটি স্থানে হংসের ধ্যানের ফলে যথাক্রমে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির প্রাপ্তি ঘটে। যে অবস্থাতে সমনস্ক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বিষয়াদির গ্রহণ হয়

তাকে জাগ্রৎ অবস্থা বলে। যেখানে মনোবাসনা প্রদর্শিত বিষয়ভোগ ঘটে সেটি স্বপ্নাবস্থা। এবং বাহ্যন্তর বিষয়ে অনুপলম্ভাবস্থা হল সুষুপ্তি।

যেমন যেমন সাধক তার সাধনাতে সিদ্ধি লাভ করেন সেই অনুসারে তার সামনে উন্মোচিত হয় পরবর্তী সাধ্যের স্বরূপ। আলম্বনযুক্ত ধ্যানে আভ্যস্ত হলে নিরালম্ব ধ্যান অনুসরণীয়। ঋষি বলেছেন - "পদ্মত্যাগে তুরীয়ং যদা হংসো নাদে লীনো ভবতি তদা তুর্যাতীতমুন্মননমজপোপসংহারমিত্যভিধীয়তে"। 'পদ্মত্যাগে' অর্থাৎ পত্রাদি আলম্বনযুক্ত ধ্যানে অভ্যস্ত হলে পদ্মত্যাগ বা আলম্বন ত্যাগ করে নিরালম্বের ধ্যান কর্তব্য। ভাষ্যকার শংকরানন্দ বলেছেন—'নাহং অত্রাস্মি' বা 'আমি এখানে নেই'— এইভাবে নিজেকে সর্বত্র সর্বাত্মক দেশকালবস্তু পরিচ্ছেদরহিত স্বয়ংপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ আত্মার সাথে একাত্মবুদ্ধির দ্বারা ক্রমানুযায়ী ত্যাগ করণীয়। পদ্মত্যাগরূপ তুরীয় অবস্থার পর হংস নাদে লীন হয়। 'নাদ' হল অব্যক্ত পরা বাক্ যা নাভিস্থানে থেকে ক্রমশঃ উত্থিত হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছে মুখবিবরের মাধ্যমে শব্দরূপে নির্গত হয় অথবা সুষুম্নাপথে শরীরমধ্যে মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্রের মাঝে সঞ্চরণ করে। এই নাদে হংস লীন হলে বা একীভূত হলে সেই অবস্থাবিশেষকে তুরীয়াতীত অবস্থা বলা হয়। এই অবস্থায় উপনীত হলে 'উন্মনা' বা 'উন্মনন' ঘটে অর্থাৎ মনের নাশ হয়। এই মনোলয় জপের সমাপ্তিকাল। এর পূর্ব পর্যন্ত অজপা হংসমন্ত্র অনুষ্ঠেয়।

জপসহযোগে হংসের ধ্যানকালে যোগী বা সাধক নিজমধ্যে কি অনুভব করেন সে বর্ণনাও করেছেন বক্তা। বলা হয়েছে যে জপের ফলে সাধক নিজমধ্যে বিভিন্ন নাদ বা ধ্বনি অনুভব করেন। অনুভূত নাদের প্রকার দশ। বলা হয়েছে—"চীনিতি প্রথমঃ। চিঞ্চিনীতি দ্বিতীয়ঃ। ঘন্টানাদস্তৃতীয়ঃ। শঙ্খনাদশ্চতুর্থম্। পঞ্চমস্তন্ত্রীনাদম্। ষষ্ঠস্তালনাদঃ। সপ্তমো বেণুনাদঃ। অষ্টমো মৃদঙ্গনাদঃ। নবমো ভেরীনাদঃ। দশমো মেঘনাদঃ ।" প্রতিটি নাদের অনুভবের সময় সাধক কিছু শারীরিক পরিবর্তন ও বিশেষ ক্ষমতার আস্বাদ পান, যেগুলিকে আমরা সাধনমার্গে ঐশ্বর্যরূপে বর্ণনা করতে পারি। প্রথম অনুভূত 'চিন্' নাদের অনুভবে সাধকের শরীরে চিঞ্চিনীর মতো অনুভব হয়। দ্বিতীয় নাদ 'চিন্ চিন্' এর ফল হল গাত্রভঙ্গ। ঘন্টাধ্বনিতুল্য তৃতীয় নাদের অনুভবে শরীরে খেদ উৎপন্ন হয়। চতুর্থ নাদের অনুভবে মস্তকে কম্পন অনুভূত হয়। তন্ত্রী বা বীণার ধ্বনিস্বরূপ পঞ্চম নাদের অনুভবে তালুপ্রদেশ আর্দ্র হয়। অমৃতের আস্বাদন ঘটলে যেরূপ অনুভব হয় তদনুরূপ অনুভব ষষ্ঠনাদের মাধ্যমে ঘটে। বেণুর ধ্বনির ন্যায় বেণুনাদ বা সপ্তমনাদ অনুভবে গূঢ়তত্ত্বের জ্ঞান হয়। ভেরীনাদ বা অষ্টমনাদ অনুভূত হলে পরাবাক্ শ্রুত হয়। মৃদঙ্গের ধ্বনিসদৃশ নবমনাদের দ্বারা দেহ অদৃশ্য হয় এবং দিব্যচক্ষু উদিত হয়। নাদশ্রবণের চরমবস্থা দশমনাদ, যা মেঘধ্বনিতুল্য। যিনি এই নাদের অভ্যাস করেন বা এই নাদ যার অনুভূত হয়েছে তিনি পরমব্রহ্ম হয়ে যান। যোগমার্গে ঐশ্বর্যগুলি যেমন যোগের চরমপ্রাপ্তিতে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয় সেইরকম নাদশ্রবণে জাত ক্ষমতাগুলিও পরমব্রহ্মপদলাভে অন্তরায়। তাই উপনিষদ্ বলে—"নবমং পরিত্যজ্য দশমমেবাভ্যসেৎ"।

দশমনাদে মন বিলীন হয়। সংকল্প বিকল্পাত্মক কারণস্বরূপ মনের নাশে তৎকার্য পাপপুণ্যাদি বিনষ্ট হলে তদজাত সুখদুঃখ সমূহেরও বিনাশ ঘটে। সুতরাং অবশিষ্ট থাকে একমাত্র—'সদাশিবঃ শক্ত্যাত্মা সর্বত্রাবস্থিতঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ শুদ্ধো বুদ্ধো নিত্যো নিরঞ্জনঃ শান্তঃ' রূপ। হংসোপাসক সদাশিবের ন্যায়, স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদশূন্যরূপে বিরাজ করে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশিত হয়।

সর্বশাস্ত্রবিশারদ ব্রহ্মবিদ্ সনৎসুজাত আত্মজিজ্ঞাসু গৌতমের সামনে এমন এক সাধনমার্গ উন্মোচন করেছেন যার জন্য বাইরের আড়ম্বরের, উপকরণের প্রয়োজন হয় না। যে হংসমন্ত্র সদা আমাদের দেহাভ্যন্তরে বিরাজমান সেই মন্ত্রের যথার্থপ্রজ্ঞা ও যথোচিত ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের দেহকে অবলম্বন করে দেহাতীত পরমসত্ত্বাকে কিভাবে লাভ করা যায় সেই কৌশল হংসোপনিষদে প্রদর্শিত হয়েছে। উপনিষদের ঋষিগণ তাদের উপলব্ধিগুলিকে বার বার মনুষ্যলোকের হিতার্থে বহুযত্নে উপনিষদের পাতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু যথার্থ অবোধের কারণে তা সাধারণের কাছে অধরাই থেকে গেছে। সেই তত্ত্বজ্ঞান থেকে গেছে শাস্ত্রের পাতায় আর কিছু যোগীপুরুষের সাধনার অভ্যন্তরে। আমাদের উচিত ঋষিপ্রোক্ত তত্ত্বসমূহকে উপলব্ধি করে জীবনচর্যায় সেগুলিকে প্রযুক্ত করার চেষ্টা করা।

তথ্যসূচী:

১. দ্রষ্টব্য কঠোপনিষদ্ ভাষ্যভূমিকা।

২. দ্রষ্টব্য শব্দকল্পদ্রুমঃ, প্রথমখণ্ড, পৃ ২৫৬।

৩. উপনিষদের শেষাংসে 'ইত্যথর্ববেদে হংসোপনিষদ্‌সমাপ্তা' অংশটি উপলব্ধ।

৪. 'Thirty Minor Upanisads', পরিমল প্রকাশন, দিল্লী, গ্রন্থে সনৎসুজাত নামের পরিবর্তে সনৎকুমার নাম বিদ্যমান।

৫. দ্রষ্টব্য 'বাংলাবিশ্বকোষ', খণ্ড ২২, পৃ ৪৫১।

৬. পরম্ উৎকৃষ্টজ্ঞানং স্বকার্যং সসংস্কারং হংসস্য স্বাত্মতাদাত্ম্যজ্ঞানাদ্ধন্তি বিনাশয়তীতি পরমহংসঃ।

৭. 'অ' প্রথম মাত্রা, 'উ' দ্বিতীয় মাত্রা, 'ম' তৃতীয় মাত্রা, 'অর্ধস্বর' চতুর্থ মাত্রা, 'বিন্দু' পঞ্চম মাত্রা, 'নাদ' ষষ্ঠ মাত্রা।

৮. কারও কারও মতে ৬০ সংখ্যক শ্বাস নিয়ে গঠিত একটি প্রাণ। ছয়টি প্রাণের সমাহারে একটি নাড়ি এবং ৬০ টি নাড়ির দ্বারা গঠিত একটি দিন ও রাত। সুতরাং এক দিনে মোট ২১৬০০ (দিন ও রাত) সংখ্যক শ্বাস বিদ্যমান।

৯. দেশবন্ধচিত্তস্যধারণা—যোগসূত্র, ৩/১।

১০. তত্রপ্রত্যয়ৈকতানতাধ্যানম্ --ঐ, ৩/২।

গ্রন্থপঞ্জী:

১।*উপনিষৎ সংগ্রহঃ*(সম্পাদকঃ)জগদীশ শাস্ত্রী - , মোতিলাল বনারসীদাস২০১১ ,দিল্লী ,

২।*উপনিষদ্* (সম্পাদক)অতুলচন্দ্র সেন আদি - *(অখণ্ড সংস্করণ)*, হরফ প্রকাশনী , ২০১০ ,কলকাতা।

৩।*পাতঞ্জলদর্শন*(অনুবাদক)স্বামী ভর্গানন্দ - , উদ্বোধন কার্যালয় ১৪১৪ ,কলকাতা , (২০০৭)।

৪। ভট্টাচার্য্য – রবীন্দ্রকুমার ,*শব্দতত্ত্ব*।২০০৮ ,কোলকাতা ,সদেশ ,

৫। মুখোপাধ্যায় – গোবিন্দগোপাল ,*উপনিষদের অমৃত* ,কলকাতা ,শ্রী সারদা মঠ , ।২০১৩

৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক কুমার – *সংস্কৃত বাংলা আভিধান,* সদেশ, কলকাতা, ১৪১১।

৭। বসু – অমরেন্দ্রনাথ ,*ভারতীয় দর্শনের খোঁজে,* ১ম পর্বঃ বেদ ও উপনিষদ্শ্রীভূমি , ২০০২ ,কোলকাতা ,পাবলিশিং কোম্পানী।

৮। বসু, নাগেন্দ্রনাথ (সম্পাদক) - *বাংলা বিশ্বকোষ*তম খ ২২,গু, প্রথম প্রাকাশনের (১৮৮৬-১৯১১) পুনর্মুদ্রণ, বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন১৯৮৮ ,দিল্লী ,।

৯। *শব্দকল্পদ্রুমঃ*(সম্পাদকঃ)বাহাদুরঃ -রাধাকান্তদেব - , ১মকাণ্ড ,হিতবাদী মেশিনাখো , শকাব্দ ১৮৫০ ,কলকাতা।

১০। Aiyer, K. Narayanasvami (Trans.) - *Thirty Minor Upanisads*, Parimal Sanskrit Series no.35, Parimal Publication, Delhi, 2009.

রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ : অন্বিত সত্ত্বার সন্ধানে

কৌশিক চক্রবর্ত্তী
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
খড়্গপুর কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দ-আমাদের অস্তিত্বের চিহ্ন ও প্রকাশ স্বরূপ দুই ব্যক্তিত্ব বয়সের হিসেবে মাত্র এক বছর আট মাস পাঁচদিনের ছোট-বড় ছিলেন। কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে উভয়ের জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা, তৎকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে উভয়ের সচেতনতা, উভয়ের উপর নবজাগরণের প্রভাব ও উভয় কর্তৃক বাংলার নবজাগরণ তরান্বিত হওয়া, ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক সাংস্কৃতিক ভাবের কেন্দ্রে যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, তার সাথে নরেনের যোগাযোগ-এ সবটাই সত্য, অথচ, কৈশোর- যৌবনের রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের পারস্পরিক যোগাযোগ, আলাপ চারিতার মত সব বিষয়েই ইতিহাস কৃপন ও খামখেয়ালীপনায় অভ্যস্ত। এটা অনস্বীকার্য যে, উভয়ের মনের গঠন ছিল পৃথক, দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আলাদা, বৈশ্বিক রহস্যের ব্যাখ্যা উভয়ে করতে চেয়েছেন পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে। কিন্তু দিনের শেষে তাঁদের ভাবের মিলন ঘটেছে-বিবেকানন্দ ভারতকে নিয়েছেন বিশ্বে আর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে এনেছেন ভারতে ; এবং এ কারণেই ইতিহাসের খামখেয়ালিপনা অপ্রত্যাশিতই শুধু নয়, অবাঞ্ছিতও। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় একটা সময় পর্যন্ত অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ বক্তব্যই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন যে, বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাতই হয়নি, অথবা, তুহিন শুভ্র ভট্টাচার্য্য তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেননি' নামক গ্রন্থে (কারিগর প্রকাশনী) দেখাতে চেয়েছেন যে বিবেকানন্দ রবীন্দ্র সংগীত সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব দেখাননি। কিন্তু মজা হলো, যে ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচনাকারগণের সিদ্ধান্তসমূহ, সেই ইতিহাসই তাদেরকে অভ্রান্ত বলেনি শেষ পর্যন্ত। তাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমত, ইতিহাস যেভাবে রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ সম্পর্ককে দেখাতে চেয়েছে, বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেখান থেকে সত্যাসত্য বোঝার চেষ্টা করা; এবং দ্বিতীয়তঃ দর্শনগতভাবে, চিন্তক হিসেবে উভয়ের সাযুজ্যতা অনুসন্ধান করা।

সূচক শব্দ : নবজাগরণ, সামাজিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ঊনবিংশ শতক, ধর্ম, আধ্যত্মিকতা, বিশ্ববীক্ষা।

মূলপাঠ :

মহর্ষির পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের সূত্রে ঠাকুরবাড়িতে নরেন্দ্রনাথের যাতায়াত ছিল। তখন তাঁরা মেট্রোপলিটন স্কুলের সহপাঠী। এমন তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাঁদের প্রতিদিন ধ্যানশিক্ষা দিতেন।[১] ১৮৯৩ সালে চিকাগোতে বিবেকানন্দের সাফল্যের খবরে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বাড়িতে অভিনন্দন বার্তা পাঠান, এমনকি, ১৮৯৯ এর ১৪ ফেব্রুয়ারী নিবেদিতা-মহর্ষির সাক্ষাৎকারে মহর্ষি নিবেদিতার কাছে বিবেকানন্দকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিবেকানন্দ এ সংবাদে অত্যন্ত উৎসাহিত হন এবং দ্রুততার সাথে একটি দিন স্থির করার জন্য নিবেদিতাকে বলেন। সম্পূর্ণ ঘটনা পাওয়া যাচ্ছে ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ১৫ ফেব্রুয়ারীর চিঠি থেকে।[২] অন্যদিকে আবার দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী হেমলতা দেবী 'পুরানো কথা'য় লিখেছেন-"সন্ন্যাস ধর্ম নেওয়ার আগে তিনি প্রায়ই আমার স্বামীর কাছে আসতেন, কিন্তু পরে দেখা সাক্ষাৎ হত মধ্যে মধ্যে"।[৩] টুকরো টুকরো এই ঘটনা সমূহ ঠাকুরবাড়ি-বিবেকানন্দের যোগাযোগের বিষয়ে প্রমাণ তুলে দিলেও, এই সময়কালে রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের যোগাযোগের প্রশ্নে ইতিহাস তথ্যাদি সরবরাহে অনিচ্ছুক বলেই চিহ্নিত হয়েছে । বস্তুতঃ এ কারণেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্যাদির ভিত্তিতে রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ গবেষক তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ তাঁর 'বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ : সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে' শীর্ষক এক আলোচনায় লিখেছেন-"সত্যই যদি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে নরেন্দ্রনাথের প্রায়ই যাওয়া হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই সেই সূত্রে এই কালেই রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর পরিচয় ও আলাপাদি হয়েছিল। মধুসূদন, শেক্সপীয়ার, মিল্টন, দান্তে, শেলী প্রমুখদের পাঠক, সাহিত্যরসের তত্ত্ববেত্তা তরুণ নরেন্দ্রনাথ উদীয়মান এই বঙ্গকবির কোন সৃষ্টিই তখন পাঠ করেন নি, তা হতেই পারে না। আর তাঁরই বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে একবারও তাঁর আলাপ হয় নি, তাও অসম্ভব"।[৪]

১৮৮১ সালে অবশ্য বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি আসার বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। রাজনারায়ণ বসুর চতুর্থ কন্যা লীলাবতী দেবীর বিয়েতে রবীন্দ্রনাথ তিনটি গান লিখেছিলেন যা গাইবার জন্য অনেকের সাথে নরেন্দ্রনাথও আহূত হন। তিনটি গান ছিল-'দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি', 'জগতের পুরোহিত তুমি', 'শুভদিনে এসেছ দোঁহে', যেগুলো রবীন্দ্রনাথ নিজে নরেন্দ্রনাথকে শিখিয়েছিলেন এবং নিজেও গলা মিলিয়েছিলেন। ডঃ কালিদাস নাগ লীলাবতী মিত্রের ডায়েরী থেকে যে তথ্য দিয়েছেন, সেই একই তথ্য শ্রী প্রবোধ চন্দ্র সেন 'লীলাবতী মিত্র' গ্রন্থ থেকে সরবরাহ করেছেন। এ প্রসঙ্গে লীলাবতী মিত্র গ্রন্থে যা পাওয়া যাচ্ছে তা হলো- "১৮৮১ সালের ১৫ শ্রাবণ শুক্রবার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহিত লীলাবতী দেবীর বিবাহ হয়। ...পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিবাহের আচার্য ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুন্দরীমোহন দাস, কেদারনাথ মিত্র, অন্ধ চুনিলাল ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়গণ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।"[৫] যৌবনে নরেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিশেষ সখ্যের প্রমাণ যদি এটা হয় তবে প্রতিষ্ঠা করা কষ্টসাধ্য নয় যে, বিবেকানন্দ রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতনই শুধু ছিলেন না, সে সময় তাঁর যথেষ্ট দুর্বলতাও জন্মে ছিল রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিতে। ছিল অশেষ শ্রদ্ধাবোধ। 'দিবা নিশি করিয়া যতন' গানটি ১৮৮৪

সালের সেপ্টেম্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে শোনান নরেন্দ্রনাথ ; 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে' গানটি ১৮৮৩র এপ্রিল ও ১৮৮৫রে মে মাসে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে গীত হয় নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে; 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গানটি নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে শোনান ১৮৮৫ সালের জুলাই ও অক্টোবরে; 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ' গানটি ১৮৮৫রে অক্টোবরে ঠাকুরের সামনে নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে গীত হয়; 'দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে' গানটি ১৮৮৫রে মার্চ এবং ১৮৮৬র এপ্রিলে ঠাকুরকে গেয়ে শোনান নরেন্দ্রনাথ।[৬] স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ তাঁর পূর্ব উল্লিখিত লেখনীতে একটি গবেষণালব্ধ তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত 'শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত' এবং ২০০২ সালে প্রকাশিত সর্বানন্দ চৌধুরী সম্পাদিত 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থ দুটির সাহায্যে স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ দেখিয়েছেন যে, ১৮৮২ র ৫ই মার্চ থেকে ১৮৮৬ র ২২শে এপ্রিল কমবেশি এই চার বছরে মোট ২২ দিনে ৫১ (একান্ন) টি গান ঠাকুরকে শুনিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। এই সময়কালে ন'দিনে মোট ছ'টি রবীন্দ্র সংগীত ঠাকুরকে শোনান তিনি। আরো চমকপ্রদ হলো বাংলার বাইরে নরেন্দ্রকণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতের সাথে সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম পরিচয়ের ঘটনা। ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের উদ্বোধন পত্রিকায় 'বিবেকানন্দের কণ্ঠে রবীন্দ্র সংগীত' শীর্ষক রচনায় লিখেছিলেন-"আমার ভাগ্য এমন যে, প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পাই কাশীতে....গানটি কাশীতে গেয়েছিলেন বিবেকানন্দ....স্বামী বিবেকানন্দ অপূর্ব গাইয়ে ছিলেন। কাশীতে আর দুটি গান বিবেকানন্দের কণ্ঠে শোনা গিয়েছিলো। সব ক'টি গানই রবীন্দ্রনাথের"।[৭] আলোচনার এ পর্যায়ে ১৮৮১ সালের বিবাহ অনুষ্ঠানের ঘটনাটি স্মরণে রাখা জরুরী যেখানে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গানগুলি নরেন্দ্রনাথকে শিখিয়েছিলেন। পরবর্তীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে যে গানগুলি নরেন্দ্রনাথ গেয়ে শোনান, বা অন্যত্র তাঁর কণ্ঠে গীত হয়, সেক্ষেত্রে যে একই শিক্ষা প্রণালীর পুনরাবৃত্তি ঘটেনি- তার প্রমাণ কোথায়? ফলতঃ রবীন্দ্র সঙ্গীতে বরাবর শ্রদ্ধাশীল বিবেকানন্দের সাথে রবীন্দ্রনাথের, আর কোনো বিষয়ে না হোক, অন্ততঃ সঙ্গীতের প্রয়োজনে যে যোগাযোগ হয়নি, তা মেনে নেওয়া সহজসাধ্য হয় না যদি উল্লিখিত সাল-তারিখের দিকে নজর দেওয়া যায় ।

প্রসঙ্গতঃ, বিবেকানন্দ তাঁর 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থে নয়টি রবীন্দ্রসঙ্গীত স্থান দিয়েছেন। এগুলি হল- (১) অয়ি বিষাদিনী বীণা, (২) কোথায় সে উষাময়ী, (৩) একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, (৪) কালী কালী বলো রে আজ, (৫) গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে, (৬) তোমার তরে মা সঁপিনু, (৭) দুই হৃদয়ের নদী, (৮) বল, গোলাপ মোরে বল, (৯) ভারত রে তোর কলঙ্কিত।[৮] রবীন্দ্র সৃষ্টি বিষয়ে তাঁর সচেতনতা লক্ষ্য করার মত। প্রকৃতি গত ভাবেই বিবেকানন্দ পরখ না করে, নিঃসন্দিগ্ধ না হয়ে, কোন কিছুই গ্রহন করেন নি জীবনে। ফলতঃ এই নরেন্দ্রনাথই যখন কবির কাছে গান

শিখছেন এবং গাইছেন, মনের যাবতীয় অস্থিরতা- সংশয়-সন্ধিগ্ধতা যিনি দূর করে দিয়েছেন, সেই প্রাণের ঠাকুরকে কবির গান শোনাচ্ছেন বা স্বরলিপি সহ যখন স্বামীজীর গানের খাতাতে একাধিক রবীন্দ্র সঙ্গীত পাওয়া যাচ্ছে তখন তা আর কিছু না হোক অন্ততঃ এটা প্রমাণ করে যে, নরেন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে বিদ্বেষ পরায়ণ ছিলেন প্রমাণ করতে যে গবেষকগণ পরিশ্রম করে চলেছেন তারা শুধু ভ্রান্তই নন, দিক ভ্রষ্টও। লক্ষ্য রাখতে হবে, নরেন্দ্রনাথ যখন প্রায়শইঃ রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছেন, কবি প্রতিভাকে সম্মান জানাচ্ছেন তার চর্চার মধ্য দিয়ে, তখনও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্রনাথ' হয়ে ওঠেন নি। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে ক্রমাগতভাবে এ ঘটনা ঘটা সম্ভব নয় ।

বিবেকানন্দ বিশ্বজয় করেছেন চিকাগো ধর্মসভায়। ভারতের পাঁচ হাজার বছরের সংস্কৃতির কথা গর্বের সাথে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় পাশ্চাত্যকে জানিয়েছেন তিনি। সেই ১৮৯৩ সালেই তাঁর সাফল্যের খবর পেয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলেন বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রমে। মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতি কথায় পাওয়া যাচ্ছে-'আমেরিকার চিকাগোর সংবাদ যখন কলিকাতা শহরে প্রকাশিত হইল এবং সেই বিষয় লইয়া যখন সকলে আলোচনা করিতে লাগিলেন, সেই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বহস্তে একখানি দীর্ঘপত্র লিখিয়ে তাঁহার দারোয়ান মারফৎ ৩নং গৌর মোহন মুখার্জ্জীর গলির বাড়িতে পাঠাইয়া দেন।"[৯] এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ অদ্ভূত ভাবেই নীরব। এমনকি, দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৯৯ এর ২০ ফেব্রুয়ারী মহর্ষি- বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার এর দিনেও রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত। পরবর্তীকালেও এ বিষয়ে রবীন্দ্র মনোভাব সংক্রান্ত তথ্য ইতিহাস সরবরাহ করেনি। এই তালিকায় আরেকটি ঘটনা যোগ করা যায়। ১৮৯৭-এর ১৯ ফেব্রুয়ারী, বিবেকানন্দের কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের দিনটিতেও কলকাতায় রবীন্দ্র উপস্থিতি নিয়ে সংশয় রয়েছে। প্রশান্তপালের ভাষ্য অনুযায়ী ১১ই ফাল্গুন অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রনাথ জমিদারির কাজে সাজাদপুরে ছিলেন।[১০] স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ তাঁর সংশ্লিষ্ট লেখনীতে এ তথ্যের ভিত্তিতেই প্রশ্ন তুলেছেন- "১৯ এবং ২১ এই দু'দিনের ব্যবধানটা কি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার মত? ১৯ এ কলকাতায় থেকে ২১-এ সাজাদপুরে থাকা অসম্ভব?"[১১] একইভাবে ২৮শে ফেব্রুয়ারী শোভাবাজার রাজবাড়িতে স্বামীজীকে যে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয় সেখানেও রবীন্দ্র উপস্থিত নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, রবীন্দ্রনাথ এই সভায় উপস্থিতি ছিলেন।[১২] অথচ ৩রা মার্চ এর ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকায়, ঐ সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের যে তালিকা প্রকাশ হয় তাতে রবীন্দ্রনাথের নাম ছিল না। প্রশান্ত পাল এ বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[১৩] এই সময়কালে ইতিহাস কর্তৃক পর্যাপ্ত পরিমানে সহযোগিতা না পাবার ফলশ্রুতিতে রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ সম্পর্কের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া সম্ভবপর হয় না। লক্ষ্য রাখতে হবে, পর্যাপ্ত তথ্যাদির অভাব কিন্তু এটা প্রমাণ করে না যে, এই সময়ে উভয়ের সম্পর্কের অবনমন ঘটেছিল।

বরং উল্টোটাই যুক্তিযুক্ত-রবীন্দ্রসংগীত কেন্দ্রীক তাদের যৌবনের সখ্য একদিকে, অন্যদিকে ১৮৯৯ এর ২৮ জানুয়ারী চা চক্রে উভয়ের সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি যদি স্মরণ রাখা যায় তবে এর মধ্যবর্তী সময়ে উভয়ের একেবারেই যে যোগাযোগ ছিল না-তা মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না ।

এই চা চক্রের আয়োজন করার জন্য প্রথম থেকেই স্বামীজী যে নিবেদিতাকে তাড়া দিচ্ছিলেন তা ম্যাকলাউড কে লেখা নিবেদিতার চিঠিতেই পরিষ্কার হয়-".....any way, he told me to get up a tea party and invite all my Brahmo friends and he would come to talk"।[১৪] টি পার্টির পর, ৩০ জানুয়ারী নিবেদিতা, ম্যাকলাউডকে জানাচ্ছেন-"It was quite a brilliant little gathering for Mr. Tagore Sang three of his own compositions in a lovely tenor and Swami was lovely....It is the hour that they call 'Candlelight - the honour of worship. I cannot forget the lovely poem 'Come O Peace' (Escho Shanti) with its plaintive minor air, that Mr. Tagore composed and sang for us the other day at this time".[১৫]

১৮৯৯-এর ২০ জুন, স্বামীজী দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রা করেন। এই সময়কালে উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে যে পত্রাবলী পাঠিয়েছিলেন স্বামীজী, তার একটি জায়গায় তিনি লিখেছেন- 'ঐ যে একদল দেশে উঠেছে, মেয়ে মানুষের মত বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ট হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় হাসান- হোসেন করেন"[১৬]- যদিও চিঠিটির কোথাও রবীন্দ্রনাথই এ কথার লক্ষ্য তার স্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই তবুও এটাকে অনেক আলোচক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিবেকানন্দের কটাক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করতেই পছন্দ করেছেন। চিঠিটির মূল বিষয় ছিল দুর্বলতাকে অতিক্রম করা, নিজের দৈবশক্তিকে বিশ্বাস করার মধ্যদিয়ে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়া। লক্ষ্য রাখতে হবে পরাধীনতার গ্লানি ও জাত-পাতের অভিশাপকে চ্যালেঞ্জ করেই বিবেকানন্দ মানুষের ভেতর অনন্ত ঐশ্বরিকশক্তির সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন, আত্মশক্তি বিস্মৃতদের স্বরূপ চেনাতে চেয়েছিলেন বলেই তিনি সর্বদা শক্তির আরাধনা করেছেন। শক্তিব্যতীত যে গতি নেই তা বুঝেছিলেন বলেই চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণে রাবণ হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রিয় চরিত্র। যা কিছু পৌরুষ সৃষ্টির অনুকূলে নয় তাই তো নেতিবাচক রূপে ধরা দিয়েছে বিবেকানন্দের চোখে। অন্যদিকে কবি সৃষ্টি, কবি প্রতিভা তো বরাবরই বিবেকানন্দের কাছে শ্রদ্ধার, প্রেমের। কবির কথা যদি মনের খোরাক না জোগাবে তবে কেনই বা বিবেকানন্দ কবির কথায় বিভোর হবেন, কেনই বা কবির সুরে সুর মেলাবেন? আবার এটা ভেবে অবাক হতে হয়, মাত্র পাঁচ মাস পূর্বেই তিনি চা-চক্রের জন্য নিবেদিতাকে

একাধিকবার তাড়া দিয়েছেন, যেখানে কিনা ব্রাহ্মবন্ধুদের নিমন্ত্রণের বিষয়েও নির্দেশ দিয়েছেন, যদিও সে নির্দেশে রবীন্দ্রনাথের নাম করেন নি স্বামীজী। তবুও এ উক্তির লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ-একটু খটকা এখানে থেকেই যায়। ফলতঃ এই সময়কালের যে অল্প বিস্তর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তার ভিত্তিতে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ককে বহুভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

স্বামীজী ভারতে ফেরেন ১৯০০ সালের ৬ই ডিসেম্বর। সে সময় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ ঘটেছে। তখন চিত্রা-চৈতালীর সময় । এ সময়কালে 'সোনারতরী', 'কল্পনা', 'মানসী'–র হাত ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত কথা কাহিনীর কবি। নিবেদিতা কবির বহুগল্প অনুবাদ করছেন এ সময়-অথচ বিবেকানন্দের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে না! এটা কি বিবেকানন্দের উদাসীনতা, নাকি, তথ্যের সরবরাহের প্রশ্নে ইতিহাসের দুর্বলতা- সে বিষয়ে আলোচনা চলতেই পারে। দ্বিতীয়বার দেশে ফিরে স্বামীজী সংঘ গঠনে আত্মনিয়োগ করেছেন, ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে অসমাপ্ত কাজ করে চলেছেন দ্রুততার সাথে-এটা স্বীকার করে নিলেও তা সে সময়ে রবীন্দ্র প্রতিভার প্রতি বিবেকানন্দের প্রতিক্রিয়াহীনতার যথার্থ উত্তর হতে পারে না। এখানে প্রশ্ন হলো, স্বামীজী আদৌ প্রতিক্রিয়াহীন ছিলেন কি না? এই সময়কালেই তো স্বামীজীর বাংলা রচনার প্রতি নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশিষ্ট লেখক কুমুদবন্ধু সেন তাঁর 'উদ্বোধনের জয়যাত্রা' প্রবন্ধে যা উল্লেখ করেছেন তা এরই পরিচায়ক- "দ্বিতীয় পর্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশের (১৯০১) কিছুদিন পরে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি আটটার সময় আসিয়া 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানি চাহিয়া বলিলেন "আমি এই মাত্র রবি বাবুর নিকট থেকে তোমার নিকট এসেছি। আজ রবিবাবু বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানির অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন' । আমি উহা পড়ি নাই শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন 'আপনি এখনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলতি বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময় রূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পড়লে বুঝবেন'। যেমন ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়"।[১৭] এই উক্তির পর অন্য যে সত্যটির বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা জরুরী তা হল, বিবেকানন্দের জীবদ্দশায়, বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোন উক্তি, তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যাই হোক না কেন, নেই। অথচ ইতিমধ্যেই বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা হয়েছে, যার একাধিক ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথকে মুখোমুখি দেখা গেছে। এবার যদি বলা হয়, যেহেতু বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের (বিবেকানন্দের জীবদ্দশায়) কোন মন্তব্য নেই, সেহেতু ১৮৮১-এর বিবাহ অনুষ্ঠান বা ১৮৯৯-এর জানুয়ারীর চা চক্রের মত কোন ঘটনাই ঘটেনি (কারণ পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতে কিছু না কিছু মন্তব্য তো পাওয়াই যেত)-তা কি সমর্থন যোগ্য? আসলে বিবেকানন্দ-প্রয়ানকালের খ্যাতিমান রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিবেকানন্দের কোন উক্তি না পাওয়াটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক, কিন্তু সেজন্য বিবেকানন্দকে দায়ী

করাটা অনুচিত হবে। ইতিহাসের অসহযোগিতার কারণে একইভাবে এটা বলাও অনুচিত যে, বিবেকানন্দের জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে উদাসীন থেকেছেন। সর্বপরি, কুমুদবন্ধু সেনের লেখনী এটা প্রমাণ করতে পেরেছে যে, বিবেকানন্দের দেহাবসানের পর রবীন্দ্রনাথের যে বক্তব্য সমূহ ও অনুভূতি বিবেকানন্দ সম্পর্কে, তা স্বামীজীর জীবদ্দশাতেই সূচীত হয়েছিল।

স্বামীজী দেহ রাখেন ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই। এ পর্যায়ে অবশ্য ইতিহাসের কৃপাদৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সাবার্বান স্কুলের হলে মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র স্মৃতি' থেকে পাওয়া যাচ্ছে-"....স্থির হলো সে সভায় স্বামীজী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়বেন ভগ্নি নিবেদিতা এবং সভাপতি করবার জন্য মনিলাল এবং আমি গেলুম রবীন্দ্রনাথের কাছে। তাঁকে ধরলুম সভাপতি হতে হবে। তিনি সম্মত হলেন।"[১৮] ১৯০২-এর ১৫জুলাই 'বেঙ্গলি' সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী "...The President having summe up the Swamiji's work and teachings on much the same lines in Bengali, the meeting was brought to a Close."[১৯]

১৯০৮ এর ১২ আগষ্ট একটি সভাতে বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,"অল্প কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"[২০] ১৯২৮ এর ৯ এপ্রিল ড. সরেসীলাল সরকারকে প্রেরিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "আধুনিক কালে বিবেকানন্দই একটি মহৎবানী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোন আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্র্যের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাঁর এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্র ভাবে, বিচিত্র ত্যাগে ফলেচে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে, তখনি শক্তি দিয়েছে....বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যাবসায়ের পরিচয় পাই, তার মূলে আছে বিবেকানন্দের বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে আঙুলকে নয়"।[২১] ১৯১৩ সালে শিকাগোর সেই বিখ্যাত ফুলেরটন হল এ রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রা' পাঠ করেছিলেন। তারও কুড়ি বছর আগে এ মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে সন্ন্যাসী

ভারতের মর্মকথা শুনিয়েছিলেন বিশ্বকে সেই মঞ্চেই রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছিলেন তাকে, জানিয়েছিলেন শ্রদ্ধা ।

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে, বিশ্বভারতীই হলো সেই বিশ্ববিদ্যালয় যা সর্বপ্রথম 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'বইটিকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করে। কবিগুরুর এই উদ্যোগের পাশ্চাতে যে মানসিকতা কাজ করেছিলো বোধ হয় সে মানসিক ভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে জালিয়ানওয়ালাবাগের অব্যবহিত পরে, ১৯২০ সালে লন্ডনে দিলীপ কুমার রায় এর সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতায়-"দিলীপ, আমরা এ স্বাধীন দেশে এসেও কি আমাদের জাতীয় অগৌরব লজ্জাহীনতা, ভীরুতা প্রচার করে এদের আদর কাড়তে ছুটবো? এ হয় কখনো? এরা আর যাই পারুক না কেন, কাপুরুষকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না-নিশ্চয় জেনো। এখানে এসে যদি ভারতের কথা বলতে হয়, তবে আমরা যেন কেবল সেই গুন, সেই সম্পদ, সেই সাধনার কথাই বলি যাদের দৌলতে ভারত বড় হয়েছিল- যেমন বিবেকানন্দ বলেছিলেন। তাইতো তিনি এদের শ্রদ্ধাও পেয়েছিলেন।... একবারও বলেন নি-আমরা বড় আর্ত, দীন হীন, কৃপার পাত্র...আমেরিকার সামনে তিনি মাথা উঁচু করেই বলেছিলেন ভারতের ধর্মতত্ত্বের মহিমার কথা—যদি কেঁদে ভাসাতেন 'দুটি ভিক্ষে পাই গো' বলে, তাহলে না পেতেন ভিক্ষা, না সমাদার।[২২]

বক্তা রবীন্দ্রনাথের ন্যায়, বিবেকানন্দের আলোচনায়, শ্রোতা রবীন্দ্রনাথকেও একাধিক স্থানে পাওয়া গেছে। ১৯০৪ এর অক্টোবরে, গয়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনী সভায় নিবেদিতার বক্তব্য মন দিয়ে শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[২৩] একইভাবে ১৯০৫ এর ফেব্রুয়ারীতে স্বামীজীর জন্মোৎসবেও রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। এরই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'রাজাপ্রজা' গ্রন্থের 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধ, সমাজ গ্রন্থের 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধের (যেখানে রামমোহন, রানাডের সঙ্গে বিবেকানন্দের নাম করেন কবিগুরু) কথা উল্লেখ করতে হয় যেখানে রবীন্দ্রনাথের মননে শাশ্বত, চিরস্মরণীয় হয়ে দেখা দিয়েছেন বিবেকানন্দ, দেখা দিয়েছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সাধনার কুশীলব হিসেবে, ভারতবর্ষের হৃতগৌরব উদ্ধারের কুশীলব হিসেবে, আত্মপ্রকাশ করেছেন ভারতের ঘনিভূত রূপ হিসেবে। এই উপলব্ধিতেই রোমা রোঁল্যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন- "If you want to know India, study Vivekananda. In him everything is positive, nothing negative"[২৪] অমিতাভ চৌধুরীর 'কবি ও সন্ন্যাসী' গ্রন্থ অনুসারে রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছিলেন ওকাকুরাকে। অন্যদিকে World Thinkers on Ramakrishna - Vivekananda (স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত) গ্রন্থ অনুসারে রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছিলেন রোমাঁ রোঁল্যাকে। বিদ্যামন্দির প্রকাশিত Colloquium Proceedings (Vol. I) এ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ তাঁর 'বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ : সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে' শীর্ষক লেখনীতে এই উভয় তথ্যের বিশ্লেষণে লিখেছেন-'ওকাকুরাকে এই বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের

সন্দেহ আছে । কারণ, বিবেকানন্দ সম্পর্কে ওকাকুরা ভালই জানতেন। ১৯০২ এর ৬ই জানুয়ারী সোমবার বেলুড় মঠে ওকাকুরা স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওকাকুরার পরিচয় এরও অন্ততঃ দুই মাস পরে এবং ঘনিষ্ঠতার সূচনা মার্চের শেষে ওকাকুরার শান্তিনিকেতন বাসে। তাই ওকাকুরাকে বিবেকানন্দ সম্পর্কে একথা বলার সম্ভবনা কম। পক্ষান্তরে রোমাঁ রোঁল্যা কখনও বিবেকানন্দকে দেখেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলাপ হয়েছিল। সে আলাপ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই এসেছিল আর তাতেই এই উক্তি তিনি করেছিলেন বলে মনে হয়।

এই বিশ্ব চরাচর, এ সৃষ্টি ও স্রষ্টা-উভয়ের মননে অপার বিস্ময়ের উদ্রেক ঘটিয়েছে, জন্ম দিয়েছে অকৃত্রিম ভাবের। উভয়ের দার্শনিক সত্ত্বা পৃথক পৃথক পন্থায় যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে। সন্ধান করেছে এ সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনের পথ। শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধ সত্যসমূহ বিবেকানন্দের জীবনে বিশিষ্টতা দান করেছিলো, শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি সমূহ বিবেকানন্দের প্রকৃতিকে বিশেষভাবে গড়ে তুলেছিল এবং এ কারণেই বিবেকানন্দের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর প্রভাব অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম একক কোন ব্যক্তির প্রবল উপস্থিতি দেখা যায় নি। অথবা আরও আগে, নরেন্দ্রনাথ যখন জীবনযুদ্ধরত, জীবন জিজ্ঞাসার দুর্বোধ্য সব তত্ত্ব তাকে যে মাত্রায় দিশাহীন করে তুলেছিলো, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেদিক থেকে অনেকটাই স্বস্তির জায়গায় ছিলেন। বস্তুতঃ একারণেই নিজেদের ভবিষ্যত নির্দেশের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ সে সময় নরেন্দ্রনাথ থেকে অনেকটাই এগিয়ে।[২৫] নরেন্দ্রনাথ তখন কেবলই ছুটে বেড়াচ্ছেন আর্থিক অনটনকে সাথী করে মনের অতৃপ্তি নিয়ে, প্রশ্ন নিয়ে, যাবতীয় সংশয় নিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সে অতৃপ্তমন তৃপ্ত হলো, সে তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণ হলো। বোঝা গেল, ধর্ম, জীবন-বিবিক্ত কোন বায়বীয় ধারণা নয়-তা উপলব্ধি জাত আর আধ্যাত্মিকতার অর্থ শুধু ধর্মগ্রন্থ পাঠ নয়, শাস্ত্র সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্কও নয়-তা বাস্তব অনুভূতি জাত । সংসার তাঁর কাছে ধরা পড়লো ক্ষণস্থায়ী রূপে, অনিত্য রূপে, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ সংসারী, গৃহী, মুক্তির আস্বাদের জন্য সংসারকেই বেছে নিয়েছেন তিনি-"অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়, লভিব মুক্তির সাধ"।[২৫ক] স্বামীজী 'জ্ঞান যোগ'এ পরিষ্কার ব্যাখ্যা করলেন তাঁর বিশ্ববীক্ষা-

"একমাত্র মুক্ত জ্ঞাতা আত্মা হয়
অনাম, অরূপ, অক্লেদ, নিশ্চয়
তাঁহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া,
দেখিছে এ সব স্বপ্নের ছায়া।"[২৫খ]

অন্যদিকে 'দুই মনীষী-রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ' শীর্ষক এক লেখনীতে সুবিমল মিশ্র অদ্বৈত বেদান্ত সম্বন্ধে কবির ভাবনা প্রকাশ করেছেন কবির ভাষাতেই-

"বোলো না সকলি স্বপ্ন, সকলি মায়ার ছলন
বিশ্বযদি স্বপ্ন দেখে, সে স্বপ্ন কাহার স্বপন
সে কি এই প্রাণহীন, প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার?"[২৫গ]

সোনারতরীর মায়াবাদকেও এ প্রসঙ্গে স্মরণে আনা জরুরী। জীবনকে দেখার ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য তো ছিল রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দে। ইতিহাসকে দেখা ও বিশ্লেষণের প্রশ্নেও দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গি গত পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। তবুও উভয়ের ভাবগত মিলন, উপলব্ধির সম্পৃক্ততাকে স্বীকার করা ব্যততী কোন পথ থাকে না ।

রবীন্দ্রনাথ তো পৃথিবীর কবি। এ বিশ্ব সংসারের যাবতীয় সৌন্দর্য্য আকণ্ঠ পান করেছেন তিনি। এখানে দুঃখ রয়েছে-কবি তাকে স্বীকার করেই পরম আদরে আপন করেছেন পৃথিবীকে। এ জগতের অপার সৌন্দর্য্যে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, সৃষ্টি লীলার বৈচিত্রে ভাবের ঘরে হয়েছে লীন। এখানেই তিনি অনুভব করতে চেয়েছেন পরম সত্ত্বার প্রকাশ-এখানেই চেয়েছেন মুক্তি। এখানেই খুঁজে পেয়েছেন তাঁর 'বিশ্বদেবতাকে', যিনি পরবর্তীতে দেখা দিয়েছেন 'জীবন দেবতা' রূপে। প্রিয় এখানেই দেবতা হয়েছেন, দেবতা হয়েছেন প্রিয়। অন্য দিকে বিবেকানন্দ? কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিলেন মানুষকে পাবার জন্য---- বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়, জগদ্বিতায়। এ মানব সংসার তো তার কাছেও পরিত্যাজ্য নয়-কারণ এই সংসার, বৈচিত্র্যময় বিশ্বতো পরম সত্ত্বাকেই একাকার হয়ে রয়েছে। সেই এক ও অখন্ড অস্তিত্বশীল সত্ত্বার প্রতিভাস এই মানব সংসার। বহুরূপে ছড়িয়ে থাকা অসীম ঐশ্বরিক সত্ত্বা সমূহ কাছে পাবার লক্ষ্যেই তো দু'একজনের সংসার ত্যাগ করে বিশ্বের সাথে সম্পৃক্ততার মানসে সন্ন্যাস গ্রহণ, ত্যাগের প্রতি আবাল্য প্রীতি তাঁর। স্বামীজীর ভাবনায়- "... to gain this infinite universal individuality, this miserable little prison-individuality must go." [২৫ঘ] বৈরাগ্য সাধনায় মুক্তি তিনিও তো চাননি। বৈরাগ্য সাধনায় তিনি যদি মুক্তি চাইতেন তবে কি প্রয়োজন ছিল ইট-কাঠ-পাথরের প্রতিমার পরিবর্তে দুঃখে শোকে মুহ্যমান মানুষগুলোকে দেবতা বানানোর; কি দরকার ছিল অন্নহীন, বস্ত্রহীন, অজ্ঞান, দুর্দশাক্লান্ত, মৃতপ্রায় অশিক্ষিত ভারতবাসীর জন্য অশ্রুমোচন করার? এটাই তো ব্যবহারিক বেদান্তের গর্ভগৃহ যে সূত্রে সকলের মধ্যে একই ঈশ্বর, একই শক্তির বিশ্বাসে শিবজ্ঞানে জীব সেবাই পরম সৌভাগ্য বলে বিবেচিত হলো। সাধন, ভজন, পূজা, পাঠ সব ঐ এক কাজে---- আর্তের সেবা মানব সেবা। উপায় একটাই, 'আমি'টাকে বুঝতে পারলে, 'তুমি'র তো কোন অস্তিত্বই আর থাকে না। এই অভিন্নতার মধ্য দিয়ে সব সেবার লক্ষ্যই এক-

নহে দ্বৈত, নহে বহু-অদ্বৈতের ভূমি,
একত্বে মিলিত তাই সকলি আমায়।
ভেদ ঘৃণা নাহি মোর, নাহি ভিন্ন আমি,
থাকি আমি মগ্ন মাত্র প্রেমের চিন্তায়।

ভাঙো মায়া, মুক্ত হও বন্ধন হইতে,
ভীত নাহি হও-বুঝ রহস্য পরম
নিজ প্রতিবিম্ব মোরে নারে সন্ত্রাসিতে
জেনো স্থির-আমি সেই 'সোহহম্, সোহহম্'"[২৫ঙ]

যা সত্য, যা অদ্বিতীয়-মানুষই তাই। সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি। সন্দেহ নেই, এ লক্ষ্য পূরণের জন্যই তিনি সতর্ক করেছেন-রামকৃষ্ণ সংঘটা যেন বাবাজীদের আখড়া না হয়। অদ্বৈতবাদের এই নব্য অভিমুখ সন্ন্যাসের ধারনাই পাল্টে দিল-শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নির্বিকল্প সমাধিলাভের ইচ্ছে প্রকাশ করে তিরষ্কৃত বিবেকানন্দ, ঠাকুর নির্দেশিত পন্থায় নিজেকে প্রস্তুত করেছেন, তৈরী হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য।

অন্যদিকে গীতালী, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথ তো একইভআবে রিক্ত, অবহেলিত, বঞ্চিতদের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ দেখেছেন। গীতাঞ্জলিতে কবি যখন লিখছেন-

"যেথায় থাকে সবার অধম,
দীনের হতে দীন,
সেইখানে যে চরণ তোমায় রাজে,
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব হারাদের মাঝে..."[২৫চ]

তখন এই দুই দার্শনিক সত্ত্বাকে কোন পার্থক্য করা আদৌ সম্ভব হয় কি? মানবসেবাকে ঈশ্বর সেবা ও মানবসেবাকে অবলম্বন করেই পরম সত্ত্বাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন উভয়েই। বিবেকানন্দ দেখেছেন ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে এক প্রেমময়ের অবস্থান। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন সবখানেই তাঁর চরণ পাতা রয়েছে। এক অনন্ত, অসীম, অরূপের (প্রতিটি বিশেষনই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত) প্রকাশ যেমন ঘটে চলেছে রূপের সীমায়, 'অন্যদিকে রূপের ব্যাকুলতাও চলেছে সেই অরূপের উপলব্ধির জন্য, তাঁকে ধ্যানে পাবার জন্য। এই পারস্পরিক অভিমুখীনতাকে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই মর্মস্পর্শীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন'।[২৬] বহুরূপে উপস্থিত এবং প্রতিফলিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই অনন্ত, অসীম সত্ত্বা (infinite Universal individuality) কে উপলব্ধির জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ সর্বস্বতার কারাগারে আবদ্ধ আমিত্বকে যতটা নির্দয়ের সাথে বিবেকানন্দ ছুঁড়ে ফেলেছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ ভঙ্গিমা অবশ্যই অনেক শান্ত, অনেক ধীর। ভাব কিন্তু অভিন্ন। কবির কথায়- 'লুকায়ে আছেন যিনি জগতের মাঝে, আমি তাঁরে প্রকাশিব সংসারের কাজে।"[২৭] বিবেকানন্দের কাছে যিনি 'Infinite Universal individuaity', কবির কাছে তাই হলো 'Supreme Person', 'Greatest Master', 'The Eternal Player'. কবির 'Personality' বা 'Religion

of Man' লেখনী সমূহের বিবিধ প্রবন্ধ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা জরুরী।[২৮] এই অসীম সত্ত্বাই কবির চোখে যখন 'Self conscience Personality' হিসেবে ধরা পরেছে, স্বামীজীর কাছে এ অনন্ত সত্ত্বা তখন 'Ever Active Providence' বা 'চির সক্রিয় শক্তি'।[২৯] ফলতঃ ভাষার ও প্রকাশ ভঙ্গিমার পার্থক্য স্বীকার করে এটা মানতে হয় যে, এই কবি ও সন্ন্যাসী ভাবের প্রশ্নে এক পথেরই পথিক ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ, উভয়ই ঈশ্বরকে দেখেছেন মানুষের মধ্যে এবং এই ঐশ্বরিক সত্ত্বা সেখানে সুপ্ত যেখানে তার প্রকাশ সাধনে সহায়তা করাকেই কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। স্বামীজী মনে করেছেন, প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি বিদ্যমান- সে শক্তি অপ্রকাশিত হতে পারে, অনুপস্থিত হতে পারে না। এই অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধিত হতে পারে, নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে ব্যক্তি জ্ঞাত হতে পারে অজ্ঞানতার আবরণ দূরীভূত করণের মাধ্যমে। এই অজ্ঞানতার আবরণ দূর করতে পারে একমাত্র শিক্ষা, প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার। মানুষের যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান তারই প্রকাশ সাধনকে, অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধনকে বিবেকানন্দ শিক্ষা বলেছেন। স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস, যে বিশ্বাস প্রত্যেকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে তিনি চেয়েছেন, অমৃতের সন্তানেরা হীনবীর্য ও নিষ্ফলা হতে পারে না, তারা মহাশক্তির আঁধার। ব্রহ্মস্বরূপ এই নিষ্পেষিত, পদদলিত মানুষেরা আত্মবিস্মৃত। সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত শক্তি তারই মধ্যে অনন্তকাল ধরে অথচ সে নিজেকে 'আমি কিছু নই' বলে তুচ্ছ জ্ঞান করতে অভ্যস্ত। শিক্ষা এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। বিবেকানন্দের ভাবনায়-মানুষের মধ্যে পূর্ব হতে যে ঈশ্বরত্ব রয়েছে তার প্রকাশ সাধনাই শিক্ষা । একই সুরে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, .সুশিক্ষার লক্ষনই এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তি দান করে।...আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে। আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব, ইহাই শিক্ষার ফল।"[৩০]

বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ-দু'জনেই বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে সমস্যা চিহ্নিত করেছেন, দিক্ নিদের্শ করেছেন উত্তরণের পন্থার। অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবে যুক্তি দিয়ে উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্যপূরণের পথ নির্দিষ্ট করেছেন। একজন সন্ন্যাসী অনুভব করেছেন সত্যিকারের জাতি- সেই সব দরিদ্রনারায়ণ, যারা প্রান্তিক, অবহেলিত-তাদের শিক্ষিত করা প্রয়োজন। এরা চিরকালের বঞ্চিত। কারণ দেখালেন কবি-"...শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে, তারাই হল এনলাইটেনড্, আলোকিত। সেই আলোর পেছনে বাকী দেশটাতে লাগলো পূর্ণ গ্রহণ।"[৩১] বিবেকানন্দ তো তাদেরকেই বিশ্বাসঘাতক বলেছেন যারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত মানুষের বুকের রক্তে অর্জিত পয়সায় শিক্ষিত হয়ে তাদেরকেই হেয় জ্ঞান করে, তারাই তো দেশদ্রোহী বিবেকানন্দের কাছে যারা অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে থাকা কোটি কোটি দরিদ্রের পয়সায় শিক্ষিত হয়ে তাদের অবস্থার পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট হয় না। কবির যন্ত্রনাও অত্যন্ত তীব্র এ বিষয়ে---- "ইংরিজী শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাদের মনের মিল

হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড় জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা”।[৩২] স্বামীজীর ভাবনায় যারা স্পষ্টতঃ দেশদ্রোহী, যারা বিশ্বাসঘাতক, রবীন্দ্রনাথ তো বিদ্রুপের সুরে তাদেরকেই ‘এনলাইটেনড্' বলে চিহ্নিত করেছেন। কেবল শব্দ পৃথক, পথ পৃথক, প্রকাশের সময় ও ধরণ পৃথক, তবুও এঁরা যন্ত্রণায় এক, উপলব্ধিতে এক, ভাবে এক, পরিকল্পনায় এক এবং উদ্দেশ্যে অভিন্ন। ‘আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ' হিসেবে স্বামীজী যে আচরণকে চিহ্নিত করেছিলেন, কবির কাছেও তো তা সমান গ্লানির, লজ্জার---- “মানুষের অধিকারে, বঞ্চিত করেছ যারে, সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান”... সমষ্টির কল্যাণার্থে বিবেকানন্দের কথাতেও একই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটছে-‘হৃৎপিন্ডে রুধির সঞ্চয় আবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালনা না হইলেই মৃত্যু । কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত । যদি তাহা না হইতে পায় সে সমাজ-শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়-”[৩৩] এই দুর্ভাগাদেশ যাদের বঞ্চিত করে রেখেছে, যাদের অপমান করে আসছে বলে কবি মনে করেছেন বিবেকানন্দ তো তাঁদেরই প্রতীক্ষায়-”...নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে-মালা-মুচি- মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে।... বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোড়-জঙ্গল থেকে, পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা....তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি....এরা রক্তবীজের প্রাণ সম্পন্ন”।[৩৪] এই সব ‘মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে’ তো কবিও ভাষা দিতে চেয়েছেন। যারা সভ্যতার ধাত্রী স্বরূপ, দৈনন্দিন জীবনের প্রাণস্পন্দনকে যারা যেকোন অবস্থাতেই টিকিয়ে রাখছে সেই সব উপেক্ষিত শ্রমজীবীদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ-উভয়ই নিবেদন করেছেন শ্রদ্ধার্ঘ্য। এমনকি বর্তমান ভারত গ্রন্থে স্বামীজীর জাতীয়তার যে আলোচনা সেখানে তো প্রতিফলিত হয়েছে, ‘লড়াইয়ের মূল’ এর রবীন্দ্রনাথ, ‘নেশন ও ন্যাশানালিজম’-এর রবীন্দ্রনাথ, প্রতিফলিত হয়েছে ‘পার্সোনালিটি’র রবীন্দ্রনাথ। যদিও ১৯০৫ সালে প্রকাশিত ‘আত্মশক্তি' বইয়ে আলোচিত ‘নেশন কী’ প্রবন্ধ এর আলোচনার সাথে ‘ন্যাশনালিজম' গ্রন্থের নেশন সম্বন্ধীয় বক্তব্যের পার্থক্য চোখে পরে তবুও মূল নির্যাসের নিরিখে বিবেকানন্দ সেখানে অস্বীকৃত হয় নি। একই কথা নবপর্যায় ‘বঙ্গদর্শন’ এ ‘বিরোধমূলক আদর্শ’ শীর্ষক প্রবন্ধের বিষয়েও সমান সত্য, যেখানে রবীন্দ্রনাথ নেশন এবং ন্যাশানালিজমের মৌলিক ধারণা প্রকাশের বিষয়ে পূর্বেই চেয়ে অনেক বেশি সচেতন রূপেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। যাই হোক, যে প্রসঙ্গে এই বিষয়ের অবতারণা, কবি ও সন্ন্যাসীর চিন্তাগত সাদৃশ্য অনুধাবনের প্রচেষ্টায়, তা এক্ষেত্রেও আবিষ্কার করা খুব একটা কষ্টকর নয় ।

রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ, উভয়েই উভয়ের উদ্দেশ্যে সাধনের পন্থা হিসেবে জীবনের ব্রতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। উভয়েই স্বদেশপ্রেমে একনিষ্ঠ, উভয়েই বিশ্ব প্রেমে অকপট যেখানে দেশ-কালের সংকীর্ণ ভেদরেখা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। দুই বরনীয় মনীষী আমাদের অস্তিত্বই শুধু নয়, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের হাজার হাজার বছরের উপলব্ধির প্রমাণ স্বরূপ, বোধের সংশাপত্র। ভারতকে জানার জন্য বিবেকানন্দকে জানা প্রয়োজন-কবির এই প্রজ্ঞা ব্যতীত, এপথ অনুসরণ ব্যতীত, একজন সন্ন্যাসীকে আর কোন পথেই বা আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা যেতে পারে? আর কবি স্বয়ং? 'তীর্থ পথিক' এর নজরুল এক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক হোন, তার সাথেই কণ্ঠ মেলাতে হবে আমাদের-

"হে কবি, হে ঋষি অন্তর্যামী,
আমারে করিও ক্ষমা
পর্বত-সম শত দোষ-ত্রুটি ও চরণে হল জমা।
আমি জানি, তুমি অজর, অমর, তুমি অনন্ত প্রাণ-
মহাকালও নাহি জানে, কবি, তব আয়ুর সে পরিমাণ
তুমি নন্দন-কল্পতরু যে, তুমি অক্ষয় বট,
বিশ্ব জড়ায়ে রয়েছে তোমার শত কীর্তির জট
প্রার্থনা মোর, যদি আর বার জন্মি এ ধরণীতে
আসি যেন শুধু গাহন করিতে তোমার কাব্য গীতে।"[৩৬]

তথ্যসূত্র:

১) বসু প্রমথনাথ : স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম খন্ড, উদ্বোধন **১৩৫৬**, পৃঃ **৩৩**
২) Letters of Sister Nivedita, Vol. I, Nababharat, P. 538
৩) Colloquium Proceedings, Vol.-I, R. K. Mission Vidyamandira, 2007, p. 225
৪) Ibid, p. 25
৫) বিশ্ববিবেক ; সম্পাদনা : বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার ; বসু, শঙ্করী প্রসাদ ; শংকর, বাক্ সাহিত্য, জুন **১৯৬৩**, পৃঃ **১৮০-১৮১**
৬) পাল, প্রশান্ত কুমার ; রবি জীবনী, দ্বিতীয় খন্ড **(১২৮৫-৯১)** : ভূর্জপত্র, শ্রাবণ **১৩৯১**, পৃঃ **৯৫**
৭) বিশ্ববিবেক ; সম্পাদনা : অসিত, শঙ্করী, শঙ্কর, বাকসাহিত্য, জুন **১৯৬৩**, পৃঃ **১৮১**
৮) তথ্যসূত্র ; সম্পাদনা : রায়চৌধুরী, সুব্রত, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা **১৪১৫**, রক্তকরবী **২০০৯**, পৃঃ **২৯**
৯) Colloquium Proceedings, Vol.-I, R. K. Mission Vidyamandira, 2007, p. 23

১০) পাল, প্রশান্ত কুমার ; রবি জীবনী, চতুর্থ খন্ড (১৩০১-১৩০৭), আনন্দ, ১৩৯৫ পৃঃ ১২৮
১১) Colloquium Proceedings, Vol.-I, R. K. Mission Vidyamandira, 2007, p. 30
১২) মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার ; রবি জীবনী, চতুর্থ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ, কলকাতা, ১৩৬৩, পৃঃ ৭
১৩) পাল, প্রশান্ত কুমার ; রবিজীবনী, চতুর্থখন্ড (১৩০১-১৩০৭), আনন্দ, ১৩৯৫ পৃঃ ১২৮
১৪) Letters of Sister Nivedita, Vol-I, Nababharat, P : 31
১৫) Ibid: P-43
১৬) বাণী ও রচনা, ষষ্ঠখন্ড, উদ্বোধন, ১৯৬১, পৃঃ ৬৯
১৭) বিশ্ববিবেক ; সম্পাদনা : অসিত, শঙ্করী, শঙ্কর, বাকসাহিত্য, ১৯৬৩, পৃঃ ১৮১
১৮) মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন ; রবীন্দ্রস্মৃতি, পৃঃ ৪৫-৪৬
১৯) Vivekananda in Indian Newspapers, 1893–1902, Edited by Basu, Sankari Prasad & Ghosh, Sunil Behari, The R.K.M. Institute of Culture, 1997, P.P. 269-270.
২০) রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯, পৃঃ ৫৫
২১) বসু, শঙ্করী প্রসাদ ; বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, সপ্তম খন্ড, মন্ডল বুক হাউস, ১৩৯৪, পৃ. ৫৩৬
২২) Colloquium Proceedings, Vol.-I, R. K. Mission Vidyamandira, 2007, P: 38
২৩) বসু, শঙ্করী প্রসাদ ; বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, চতুর্থ খন্ড, মন্ডল বুক হাউস, ১৩৮৭, পৃঃ ২০৬
২৪) World Thinkers on Ramakrishna Vivekananda, Edited by Swami Lokeswarananda, R.K.M. Institute of Culture, 1983, P-34
২৫) দ্য সানডে ইন্ডিয়ান, সম্পাদক : চৌধুরী, অরিন্দম, জানুয়ারী ২০১২, পৃঃ ২৮-৩০
২৫ক) রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯, পৃ. ১৮৯
২৫খ) জ্ঞান যোগ, উদ্বোধন, ১৯৩৩, পৃ. ৬৯
২৫গ) Colloquium Proceedings, Vol. I, R.K.M. Vidyamandira, 2007, p. 40
২৫ঘ) দাশগুপ্ত, সান্ত্বনা, ‘‘স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণ সমূহে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি প্রসঙ্গ’, মহিমা তব উদ্ভাসিত, ধর্মমহাসভা স্মারক গ্রন্থ, শ্রীসারদা মঠ, ১৯৯৪, পৃ. ২৬

২৫ঙ) তদেব, পৃ. ১৭৬
২৫চ) গীতাঞ্জলী, রুপা পাবলিকেশন, ২০০২, পৃ. ৫৬
২৬) মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার ; ধর্মের মানুষ-মানুষের ধর্ম : বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ, মহিমা তব উদ্ভাসিত-ধর্মমহাসভা শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদিকা : প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা, শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর, ১৯৯৪, পৃঃ ২১৪
২৭) স্ফুলিঙ্গ, পত্রভারতী, ১৪১৭, কবিতা সংখ্যা-১৭১, পৃঃ ১৭৫
২৮) মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার ; ধর্মের মানুষ-মানুষের ধর্ম : বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ, মহিমা এব উদ্ভাসিত-ধর্মমহাসভা শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদিকা : প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা, শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর, ১৯৯৪, পৃঃ ২১৫
২৯) তদেব, পৃঃ ২১৫
৩০) বিশ্ববিবেক, সম্পাদনা : অসিত, শঙ্করী, শঙ্কর, বাকসাহিত্য ১৯৬৩, পৃঃ ৩৪৮
৩১) বিশ্ববিবেক, সম্পাদনা : অসিত, শঙ্করী, শঙ্কর, বাক্‌সাহিত্য ১৯৬৩, পৃঃ ৩৫০
৩২) বিশ্ববিবেক, সম্পাদনা : অসিত, শঙ্করী, শঙ্কর, বাক্‌সাহিত্য ১৯৬৩, পৃঃ
৩৩) বর্তমান ভারত, উদ্বোধন, ১৯৬২, পৃঃ ১৬
৩৪) পরিব্রাজক, উদ্বোধন, পৃঃ ৪২-৪৩
৩৫) বিস্তারিত বিবরণের জন্য, সান্যাল, আশিষ, রবীন্দ্রনাথ ও ন্যাশানালিজম, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স, ২০০৪ পৃঃ ৭-১০ এবং বিশ্ববিবেক, সম্পাদনা-অসিত, শঙ্করী, শঙ্কর, বাক্‌সাহিত্য, পৃঃ ২৬৪
৩৬) কাজী কল্যাণী, কাজী নজরুলের রবি পরিক্রমা, সাহিত্য ভারতী, জানুয়ারী ২০১২, পৃঃ ৮১-৮৩

আধুনিক সংবাদপত্রের প্রারম্ভিক পর্ব ও রামমোহন

ফিরোজ আলম
সহ- অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সীতারাম মাহাত মেমোরিয়াল কলেজ, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপঃ ভারতবর্ষে ইংরেজশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাজার দূত, গুপ্তচর এবং বনিকদের মাধ্যমে দেশের খবরাখবর জানা যেত। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হলে সংবাদপত্র প্রকাশের দিকে নজর পড়ে। তাছাড়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ দেখা দেয় তার একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সংবাদপত্র প্রকাশ। ভারতবর্ষে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ গ্রহন করে ইউরোপীয়রা। জেমস অগাস্টাস হিকির সম্পাদনায় ১৭৮০ সালে ইংরেজি ভাষায় সর্বপ্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'The Bengal Gazette' প্রকাশিত হলে ভারতবর্ষে সংবাদপত্র প্রকাশের শুভ সূচনা হয়। ১৭৮০ থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত ইংরেজি পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। তবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হলে খ্রিষ্টান মিশনারিরা বাংলা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করে। বাঙালি কর্তৃক বা বাঙালিদের সম্পাদনায় ঐ সময়কালে সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাঙালি হিন্দু সমাজে আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটলে সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বাংলাভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করলেও রামমোহনের সময় থেকে সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটতে থাকে। রামমোহন ইংরেজি ভাষায় 'ব্রাহ্মন সেবধি, বাংলা ভাষায় 'সংবাদ কৌমুদী' এবং ফার্সি ভাষায় 'মীরাৎ-উল-আখবার' প্রকাশের মাধ্যমে খ্রিষ্টান মিশনারিদের বিরোধীতা, ভারতীয়দের ধর্মান্তরিতকরন রোধ, বাঙালিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং রাজনীতি সচেতনতার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিতে নানাবিধ সংস্কার সাধনের পাশাপাশি সংবাদপত্র প্রকাশের মাধ্যমে রামমোহন জনগনের মধ্যে জাগরন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মূল শব্দঃ মুদ্রাযন্ত্র, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, খ্রিস্টান মিশনারি, সংবাদপত্র, রামমোহন, নবজাগরণ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে সংবাদ জানার জন্য বিশেষ একটি রীতি প্রচলিত ছিল। রাজারা দূত পাঠাতেন সংবাদ পৌঁছে দিতে এবং নিয়ে আসার জন্য। রাজা-বাদশা, আমির- ওমরাহরা 'চর' নিয়োগ করতেন দেশের বিভিন্ন খবর জানার জন্য। অনেক সময় বিভিন্ন স্থানে যে সব প্রতিনিধি থাকতেন তাঁরাই প্রয়োজনমত সংবাদ পাঠাতেন। সে সংবাদ কখনো ছিল গুপ্ততথ্য আবার কখনো ছিল প্রকাশ্য সংবাদ। আবার বনিকদের মাধ্যমেও বিভিন্ন

দেশের খবরাখবর জানা যেত। অর্থাৎ আধুনিক যুগের পূর্বে ভারতবর্ষে সংবাদপত্র সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারনা ছিল না। আধুনিক যুগে নিয়মিতভাবে নানা বিষয়ের সংবাদ একই সঙ্গে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংবাদপত্রের প্রচলন ঘটে। তবে প্রথমদিকে সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য ছাপাখানার অভাব, হরফের সংস্কার ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা ছিল।[১] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। এর ফলে জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নবজাগরণ দেখা দেয়। পারলৌকিক জগৎ নয়-ইহলোক, স্বর্গ-নরকের বিভিন্ন বিষয় নয়- ঘরের কাছাকাছি বা বাইরের মানুষের সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় জানার আগ্রহ দেখা দিলে আধুনিক সংবাদপত্রের প্রচলন শুরু হয়।

ইউরোপীয়দের পৃষ্টপোষকতায় ভারতবর্ষের বাংলা অঞ্চলে আধুনিক সংবাদপত্রের উদ্ভব ঘটে। ভারতবর্ষে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ গ্রহন করেন উইলিয়াম বোল্টস। বোল্টস ছিলেন ওলন্দাজ বনিক, কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি ১৭৬৮ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট একটি ছাপাখানা স্থাপনের অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কোম্পানি বোল্টসের আবেদন মঞ্জুর করেনি। কারন কোম্পানির দুর্নীতি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ উইলিয়াম বোল্টসকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন।[২] সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম উদ্যোগটি সরকারী রোষানলে পড়ে ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়। উইলিয়াম বোল্টসের পর সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেন জেমস অগাস্টাস হিকি। তাঁর সঙ্গে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষের প্রথমদিকে সম্পর্ক ভালো থাকায় তাঁর সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ সফল হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৭৮০ সালে ২৭ শে জানুয়ারী কলকাতা থেকে ইংরেজি ভাষায় সর্বপ্রথম সাপ্তাহিক 'The Bengal Gezette' প্রকাশিত হয়।[৩] 'Bengal Gezette' এর উপর লেখা থাকত, 'A Weekly Political and Commercial Paper open to all Parties but influenced by none'. এই সংবাদপত্রে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারী ও সাহেবদের নানাধরনের দুর্নীতিমূলক কীর্তিকলাপ তুলে ধরা হত। আসলে কোম্পানির বিঘোষিত নীতি ও শাসন পদ্ধতি এবং কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিদের কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছিল বলে জেমস অগাস্টাস হিকির সাথেও গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরোধ দেখা দেয়। ক্ষুব্ধ ওয়ারেন হেস্টিংস Bengal Gezette এর প্রেস বাজেয়াপ্ত করেন। ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্রটিও সরকারী দমন পীড়নের শিকার হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। হিকির পত্রিকার সুত্রধরে অল্পকালের মধ্যে প্রকাশিত হয় The Bengal Journal (1785), 'The Calcutta Monthly Journal(1794). The Bengal Hurkaru(1795), The Telegraph(1796) ইত্যাদি।

ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত এবং ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত পত্রিকাগুলি ইউরোপীয় সমাজের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করেছিল।

ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নি। বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৮১৮ সাল থেকে। বাংলা ভাষায় লিখিত গদ্যরুপের অভাবই এরুপ দীর্ঘ বিলম্বের মুল কারন।[৪] ১৮০০ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির উদ্যোগে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলা গদ্যচর্চার পথ সুগম হয়। তাছাড়া উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। উইলিয়াম কেরির তত্ত্বাবধানে এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যরীতির যে উন্নতি সাধিত হয় তা অবশ্য স্বীকৃতিযোগ্য।[৫] তৎকালীন বাংলাদেশের তথা পূর্ব ভারতের প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্য চর্চার এবং পুস্তক মুদ্রন ও প্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হয়ে ওঠে শ্রীরামপুর। বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কর্মকর্তাদের প্রচেষ্টায়। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে ১৮১৮ সালে এপ্রিল মাসে মার্শম্যানের সম্পাদনায় বাংলা ভাষায় মাসিক 'দিগদর্শন' প্রকাশিত হয়।[৬] মার্শম্যানের সম্পাদনায় বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রের ওপরে ছাপা থাকতঃ-

দর্পনে মূখ সৌন্দর্যমিক কার্য্যবিচক্ষনা :
বৃত্তান্তনিহ জানস্থ সমাচারস্য দর্পনে।

[দর্পণে বা আয়নায় যেমন চেহারা সুন্দর দেখায় তেমনি বুদ্ধির দ্বারা কাজের পরিমাপ এবং খবরের দ্বারা ইতিহাসকে জানা যায়।]

মিশনারিদের বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্টানধর্ম প্রচার করা এবং হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম সম্পর্কে নিন্দা করা। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় বিষয়, আমেরিকা আবিস্কার, ভারতের ব্যবসা বানিজ্য ও উৎপন্ন দ্রব্য, প্রাচীন ইতিহাস, ইংল্যান্ডের বিবরনাদি, প্রাকৃতিক ইতিহাস ইত্যাদি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত। 'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকাটি গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। খ্রিষ্টান মিশনারির উদ্যোগে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পুস্তক ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হলে স্থানীয় একটি পাঠক শ্রেনির সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে বসবাসকারী ইউরোপীয়রাই ১৭৮০ সাল থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করে। বাঙালি কর্তৃক বা বাঙালির সম্পাদনায় ঐ সময়কালে সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় নি। একথা অনস্বীকার্য বাংলা গদ্যরুপের অভাব এবং বাঙালিদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার অনুপস্থিতিজনিত কারনে সংবাদপত্র চর্চা সম্ভব হয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বাঙালি হিন্দু সমাজে আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে। ১৮১৮ সালের জুন মাসে কলকাতায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বাংলা ভাষায় প্রথম

সংবাদপত্র সাপ্তাহিক ‘বাঙ্গালা গেজেট’ প্রকাশিত হয়। বাঙালি সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্রের গৌরব তাঁরই প্রাপ্য।[৭] বাঙ্গালা গেজেট পত্রিকাটি সমসাময়িককালে রামমোহন পরিচালিত সমাজসংস্কার আন্দোলনের মুখপাত্রের ভুমিকা পালন করেছিল।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাজনৈতিক , ধর্মীয়, ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ সংকট দেখা দেয়। খ্রিষ্টান মিশনারিরা হিন্দু অধিবাসীদের সামাজিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ইহকালের আর্থিক ও রাজনৈতিক সুবিধার্থে অনেক হিন্দু খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহন করে। এই সময় বাঙালি তথা হিন্দুর জীবনে ধর্মান্তরিতকরন একটা সংকটের সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া সে সময় ভারতীয় সমাজে জাতপাতের বিচার ছিল প্রবল, ধর্ম ছিল কুসংস্কারে ভরা এবং ধর্মের নামে অশিক্ষিত ও দুর্নীতিপরায়ণ পুরোহিত শ্রেনির প্রবল আধিপত্য ছিল। উচ্চশ্রেণির মানুষ ছিল স্বার্থপর এবং নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেও তারা কুণ্ঠিত হত না। এই সামাজিক পটভূমিকায় বাংলা তথা ভারতে রামমোহনের আগমন ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতীয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের অগ্রদূত। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রতি রামমোহনের প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল সুগভীর এবং দেশবাসীর সামাজিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। প্রাচ্যের ঐতিহ্যময় দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি রামমোহনের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতীয় সমাজের পুনরুজ্জীবনের জন্য পাশ্চাত্যের আধুনিক সংস্কৃতি গ্রহন করার প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেছিলেন। ভারতবাসী যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও মানবতাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হোক এই ছিল রামমোহনের কাম্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার ফলে রামমোহনের চরিত্রে বহুত্বের সমন্বয় ঘটে। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের পর সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে রামমোহনের অবদান অনস্বীকার্য । রামমোহন হিন্দু ধর্মে, সংস্কৃতিতে এবং জাতীয় জীবনধারায় নানা প্রকার সংস্কার সাধনের পাশাপাশি সংবাদপত্র প্রকাশের মাধ্যমে বাঙালিদের মধ্যে সচেতনতার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। রামমোহন ইংরেজি ভাষায় ‘ব্রাহ্মন সেবধি’ (সেপ্টেম্বর,১৮২১), বাংলা ভাষায় ‘সংবাদ কৌমুদী’(ডিসেম্বর,১৮২১) এবং ফার্সি ভাষায় ‘মীরাৎ-উল-আখবার’(এপ্রিল ১৮২২) পত্রিকা প্রকাশ করেন।

‘ব্রাহ্মন সেবধি’ পত্রিকা প্রকাশ করে রামমোহন হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান মিশনারিদের আক্রমনের প্রতিবাদ করেন। রামমোহন ‘ব্রাহ্মন সেবধি’ পত্রিকায় খ্রিষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধচারন করে লেখেন-“ শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিক কাল এ-দেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে কাহারো ধর্মের সহিত বিচক্ষতাচারন করেন না......... কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাহারা মিশনারি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তিরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন”।[৮]

রামমোহন প্রকাশিত সংবাদ কৌমুদী ছিল খুব উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক পত্রিকা। এর পূর্বে বাংলা ভাষায় ঐ শ্রেণির পত্রিকা আর প্রকাশিত হয়নি । এতে ইতিহাস, রাজনীতি, বিজ্ঞান, ধর্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী প্রাকাশিত হত । লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র প্রকাশের প্রধান লক্ষ্য ছিল। দেশবাসীর অভাব-অভিযোগের কথাও সংবাদপত্রে আলোচিত হত। সংবাদপত্রে আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনার্থে গভর্নমেন্টের নিকট প্রার্থনা, সংবাদপত্র দ্বারা বাঙালির উপকারিতা প্রদর্শন, জুরিপ্রথা সম্প্রসারের জন্য আবেদন, কৃপণ ও অদক্ষ ব্যক্তিদের পারলৌকিক কার্যে যে অজস্র ব্যয়িত হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা, নদীতীরে হিন্দুদের শ্মশান স্থাপনের জন্য আবেদন, বাংলাদেশ থেকে বিদেশে চাল রপ্তানি বন্ধ করার জন্য আবেদন, দরিদ্রদের সাহায্যার্থে বিনামূল্যে ডাক্তারি চিকিৎসার জন্য রাজপুরুষের কাছে প্রার্থনা, কুলিনদের বিয়ে ইত্যাদি। রামমোহনের নানান সংস্কার প্রস্তাব ‘সংবাদ কৌমুদী’ পত্রিকায় ছাপা হওয়ায় গোঁড়া হিন্দুদের একাংশ এর বিরোধিতা করে। বাঙালি সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা পায় নি বলে ১৮২৩ সালে রামমোহন ‘সংবাদ কৌমুদী’ পত্রিকা প্রকাশ করা বন্ধ করে দেন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য ‘সংবাদ কৌমুদী’ পত্রিকা একদিকে যেমন জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছিল আপরদিকে তেমনি জনসাধারণকে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা দিতে সক্ষম হয়েছিল । রামমোহনের সময় থেকেই সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা সংবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৯] বাংলা গদ্যের বিকাশে, সাহিত্যের নতুন আঙ্গিক প্রবর্তনে, সামাজিক ভাব আন্দোলনের সৃষ্টিতে, রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারে এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত রুচিনির্মানেও সংবাদপত্রের দান অপরিসীম। মীরাৎ-উল-আখবারে প্রকাশিত হত আয়ারল্যান্ডের দুর্ভিক্ষ, ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি, দেশীয় জনগন সম্পর্কে ব্রিটিশদের উদাসীনতা।

রামমোহন সংবাদ পত্র প্রকাশের পাশাপাশি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষপাতি ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্বকারী আইন পাশ করলে রামমোহনই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের কাছে এক স্মারকলিপিতে রামমোহন বলেছিলেন, “ প্রত্যেক সুশাসকই একান্তভাবে চাইবেন তার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে এমন সব বিষয়ই তার নজরে আসুক। আর তার জন্যে প্রত্যেক মানুষের হাতেই যেন একটা হাতিয়ার থাকে । এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতাকেই একমাত্র কার্যকর উপায় হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে।”[১০] কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি রামমোহনের আবেদন নাকচ করেন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্বকারী আইন বহাল রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুপ্রিমকোর্টে রামমোহনের পক্ষের ব্যারিস্টার মিঃ টারটন রামমোহন সম্পর্কে বলেছিলেন-

"A very short time after my arrival in the Country an Act was Passed by the Government which met with the general reprobation of those who were governed, but no one came forward with the manliness and boldness that Rammohan did to express his sentiment in the odious measure. A man born and brought up in Britain could not have come forward more completely heart and soul in support of that which was the cause of his Country; than what Rammohan did in 1823".[১১]

রামমোহন তাঁর আবেদনে সাড়া না পাওয়াই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্বকারী আইনকে নিষ্প্রয়োজন ও অপমানজনক মনে করে 'মীরাৎ-উল-আখবার' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেন।

রামমোহন পাশ্চাত্যের জ্ঞান, রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতীয় জ্ঞান,রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সমন্বয়ের পথ নির্দেশ করে অসাধারন পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন।তিনি বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।তিনি আধুনিকতাকে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। সেইজন্য সংবাদপত্রের মধ্যেও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার এবং বিচিত্র কার্যোদ্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্রঃ

১) নূরি,সানাউল্লাহ .১৯৯৯. সভ্যতার বিবর্তন এবং বাংলা সংবাদপত্র বিকাশের যুগ, ঢাকা. পৃঃ-২৩
২) Barns,Margarity.1940.The Indian Press, London. P-45
৩) Chanda, Mrinal Kanti .1987. History of the English Press in Bengal, 1780-1857, Calcutta. P-1
৪) নূরি, সানাউল্লাহ, পূর্বোক্ত পৃঃ-২১
৫) Roebuck, Thomas. 1819.The Annals of the fort Willain College, Calcutta.
৬) ভট্টাচার্য দেবেশ . ১৯৯০ . উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিকতা,কলকাতা . পৃঃ-৭৭
৭) আনিসুজ্জামান . ১৯৬৯ . মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, ঢাকা . পৃঃ-২২
৮) গুপ্ত, ক্ষেত্র. 2000. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস. কলকাতা, পৃঃ-২৩১
৯) আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১
১০) Natrajon, J . 1955 . History of Indian Journalism, New Delhi . P-15
১১) Collet,Sophia Dobson. 1914.The Life and Letters of Raja Rammohun Roy,Calcutta. P-103

স্বদেশী সঙ্গীত ও ঠাকুর পরিবারের প্রভাব : একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

দেবলীনা ভট্টাচার্য্য
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে যে নতুন রাষ্ট্রনৈতিক জাতীয় চেতনার সূত্রপাত হয়েছিল তার বৈশিষ্ট্য ছিল স্বাদেশিকতার স্ফূরণ ও রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধন এই জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক আন্দোলন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। (উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতবর্ষে বিশেষত কতগুলি কারণে এই জাতীয়তাবাদের স্ফূরণ ও প্রসার ঘটতে থাকে। ইংরেজ ভারতবর্ষের বংশভিত্তিক বৃত্তিগত অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে দিয়ে সামাজিক ব্যবস্থার যে বিপর্যয় নিয়ে আসে তাতে জীবিকার নতুন শর্তেই জাতীয় চেতনার বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে। বিভিন্ন প্রজা বিদ্রোহ ও ইংরেজের নিপীড়ণ যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিবাদী ঐক্য গড়ে তোলে তেমনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অবদমনের বিরুদ্ধে জাতীয়তার উন্মেষ ঘটতে থাকে। বস্তুত, সাঁওতাল বিদ্রোহ (1855), সিপাহী বিদ্রোহ (1857), নীল বিদ্রোহ পর থেকে বুদ্ধিজীবি মহলে এক ধরনের জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। এই সময়কাল থেকে জাতীয়বাদের প্রসার দেখা যায় ক্রমশ। রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের ব্রতকে নিজেদের জীবনের ব্রত করেছিলেন শিক্ষিত নব্য তরুণদল, ইয়ংবেঙ্গল। বাংলাদেশে এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে অন্যতম রাজনারায়ণ বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৬ খ্রীঃ তিনি ‘স্বজাতীয়ভাব ও স্বদেশানুরাগ সঞ্চারিণী সভা’ (A Society of the Promotion of National Feeling among the Educated Nations of Bengal) প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরবর্তীতে প্রবর্তিত হয় ‘হিন্দুমেলা’। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ২৮ বছর পূর্বে তৎকালীন বাঙালী সমাজ এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এক সর্বভারতীয় ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। এই শতকের ষষ্ঠ ও সপ্তম দশক থেকে জাতীয় আন্দোলনের ভাবধারা রূপ নিতে শুরু করে। রঙ্গলাল বসু ও মধুসূদন দত্ত’র কাব্য নাটকে তার প্রকাশ ঘটেছিল। কবি রঙ্গলাল বসুর ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ (১৮৫৮) কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে –

> “স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
> কে বাঁচিতে চায়।” [১]

স্বাদেশিকতার জোয়ার লেগেছিল দীনবন্ধু মিত্র’র নাটকে। তাঁর ‘নীলদর্পণ’ নাটক বিদেশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, যা এক অসম সাহসিকতার পরিচয় বহন করেছিল। সমসাময়িক যুগে অভিজাত সম্প্রদায় তথা সাধারণ বাঙালী সমাজের মধ্যে যে

জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত হচ্ছিল, রঙ্গালয়ের উন্নতির প্রচেষ্টা তারই প্রমাণস্বরূপ। ১৮৭০ – ১৮৮৭ খ্রীঃ মধ্যে অস্ত্র আইন, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, বিচার বৈষম্য নিয়ে কুলি আইনের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। ১৮৭২-এ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৮২-তে তাঁর 'আনন্দমঠ' বিশেষভাবে স্বাদেশিকতার স্ফূরণে সাহায্য করেছিল। এতে রচিত 'বন্দেমাতরম্' গানটি মানুষকে একাত্ম করেছিল।

পরবর্তীতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গভঙ্গ'কে কেন্দ্র করে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে প্রথম ব্যাপক রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল । বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রথম গৃহীত হয়েছিল লর্ড কার্জনের শাসনকালে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। জেলায় জেলায় সভা সমিতি করে সরকারি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছিল। ১৯০৫ খ্রীঃ জুলাই মাসে অর্থাৎ পরের বছরই লর্ড কার্জন বাংলার অঙ্গচ্ছেদ ঘোষণা করেছিলেন। ১৩ই জুলাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'বয়কট' যুদ্ধ ঘোষিত হয়। 'বয়কটমন্ত্র' প্রচারে মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন নিজেদের পত্রিকার মাধ্যমে। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গবিভাগের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৭ই আগস্ট কলকাতার টাউন হলে এক ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রনাথ নন্দীর পৌরহিত্যে অবিসংবাদিতভাবে 'বয়কট' প্রস্তাব গৃহীত হয়। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৬ই অক্টোবর বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। বাঙালীজাতির নবজাগ্রত স্বদেশপ্রেম এই অপমানজনক পরিস্থিতি রোধ করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে এগিয়ে এসেছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন, ১৩১২) বঙ্গচ্ছেদ ঘোষণার দিন রাখীবন্ধন উৎসবে বাঙালি ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিল। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের হাতে রাখী পরানো হয়েছিল। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি। বস্তুত, ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ছিল জাতীয় আন্দোলন। বিশেষত কোনো শ্রেণীকে সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পূর্ব-বাংলা, আসাম, বিহার, ওড়িশা ছাড়াও পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি অঞ্চলেও এই আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করেছিল। এই আন্দোলন কঠিন হাতে দমন করার জন্য ১৯০৫ খ্রীঃ 'কার্লাইল সার্কুলার' জারি করে ছাত্রদের রাজনীতি যোগদান নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ধারাকে জাতীয় স্বাধীনতার রূপ দিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল। প্রথমদিকে বয়কটের প্রধান সংকল্প ছিল বিদেশী পণ্য বর্জন, বিদেশী বিচারালয় বর্জন, বিদেশী স্কুল-কলেজ বর্জন ও বিদেশী শাসন বর্জন। জাতীয় শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' ও 'ইন্ডিয়ান স্টোর্স'-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

বাংলার স্বদেশ চেতনায় ঠাকুর পরিবারের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। এই দেশাত্মবোধের পথিকৃৎ ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। বাঙালী সমাজে অগ্রগতির মূলে তাঁর অবদান অবশ্য স্মরণীয়। সম্পূর্ণ নিজের কর্মকুশলতার সাহায্যে তিনি 'Union Bank'

স্থাপন করেন ও পরে 'Tagore Comapny' সহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠা করে ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালীর নবীন উদ্যোগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ১৮৩৮ খ্রীঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠা করেন, ১৮৪৩ খ্রীঃ তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দেশাত্মবোধে তিনি প্রথম জীবন থেকেই উদ্বুদ্ধ ছিলেন।
রবীন্দ্রনাথের কথায় : -

> " আমাদের পিতৃদেব যখন স্বদেশের প্রচলিত পূজাবিধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখনো তিনি স্বদেশী-শাস্ত্রকে ত্যাগ করেন নাই ও স্বদেশী সমাজকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন।" [২]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, আচারে-আচরণে, পোষাকে-পরিচ্ছদে এক কথায় সকল ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাদেশিক। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্পর্কে তিনি ছিলেন সদাজাগ্রত। বাঙালী জাতিকে এই প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী সম্পর্কে সচেতন করার শুভচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেন (১৮৪৩ খ্রীঃ)। তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান খুব স্বল্পকালের জন্য করলেও উৎসাহ ও উপদেশ দ্বারা তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মীদের যথোচিত সাহায্য ও প্রেরণা দিয়ে গিয়েছেন। তিনি মনে করতেন ধর্ম বিষয়ক ঐক্যই জাতীয় সংহতির কারণ হবে ও স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করবে। দেবেন্দ্রনাথ এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় এবং অর্থানুকুল্যে নবগোপাল মিত্র ১৮৬২ খ্রীঃ 'National Paper' নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন, ১৮৬৭ খ্রীঃ দেবেন্দ্রনাথের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায় নবগোপাল মিত্র 'হিন্দুমেলা' নামে একটি স্বদেশী মেলার প্রবর্তন করেন। হিন্দুমেলার অন্তর্গত ন্যাশানাল সোসাইটি বা জাতীয় সভার কাজেও দেবেন্দ্রনাথের সহানুভূতি ছিল যথেষ্ট। কমপক্ষে দুটি অধিবেশনে তিনি পৌরহিত্য করেন। এই মেলা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ইংরাজী শিক্ষার ফলে যুগযুগান্তের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল ঠিক কথা, কিন্তু নতুন একটা মোহাচ্ছন্ন অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছিল। এই অবস্থা থেকে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার মূলে রাজনারায়ণের ভাবধারা বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। জাতীয় মেলা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগীদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিলেন নবগোপাল মিত্র মহাশয়। তাঁর এই কাজে প্রথম থেকেই সহায় ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই মেলা উপলক্ষে তিনি রচনা করেছিলেন একটি স্বদেশী সংগীত 'মলিন মুখ চন্দ্রমা'। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন –

> " নবগোপাল একটা ন্যাশানাল ধুয়া তুলিল, আমি আগাগোড়া তার মধ্যেই ছিলাম। ... নবগোপালের সময় থেকেই 'ন্যাশানাল' শব্দটি দাঁড়াইয়া গেল। ন্যাশানাল সংগীত রচিত হইতে আরম্ভ হইল।" [৩]

সত্যেন্দ্রনাথ লিখলেন – " নিশ্চল যবে ভারত সন্তান / একতান মনপ্রাণ /

গাও ভারতেরি যশোগান।।" [৪]

সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন –

"এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম-কর্মের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য – ইহা ভারতভূমির জন্য।" [৫]

পরবর্তী মেলাগুলিতে ঠাকুরবাড়ী বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেনি। অষ্টম অধিবেশনে (১৮৭৪) দ্বিজেন্দ্রলাল ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রচনা করেছিলেন 'পুরুবিক্রম' নাটক (১৮৭৪)। এতে জাতীয় আত্ম-সচেতনতার প্রকাশ ঘটেছে, ও সাথে জাতীয় আত্মসচেতনতার প্রকাশ দেখা গেছে।

" এত স্পর্ধা যবনের স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিবে হরণ
তারা কি করিছে মনে সমস্ত ভারতভূমে
পুরুষ নাহিক একজন?" [৬]

'সরোজিনী' (১৮৭৫) নাটকের মাধ্যমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালী জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন তেজোদৃপ্ত কয়েকটি হৃদয়স্পর্শী কবিতা। বস্তুত দেশানুরাগের প্রেরণাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। 'হিন্দুমেলা' সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন –

"বঙ্গ সমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা; কারণ সেই যে বাঙালির মনে জাতীয় উন্নতি স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।" [৭]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল্য বিচারে বলা যায় যে, এগুলি ছিল মূলত ধনী অভিজাত সম্প্রদায় ও উচ্চ সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত অর্ধ রাজনৈতিক সংগঠন। স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল মুখ্যত রাজনারায়ণ বসুর উদ্যোগে ও প্রধানত ঠাকুর পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায়। ১৮৬৫ খ্রীঃ ঠাকুর পরিবারের দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নবগোপাল মিত্রকে নিয়ে রাজনারায়ণের উদ্যমে সংগঠিত হয় প্রথম 'স্বাদেশিকদের সভা'। আপাত দৃষ্টিতে ঠাকুর পরিবারকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বাহক মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে এই পরিবারটির স্বদেশচেতনা ও স্বাজাত্যবোধই সমগ্র জাতিকে পথ দেখিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই পরিবারের সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান ধারণারই পূর্ণ পরিণত রূপ। 'হিন্দুমেলা'র সময় থেকেই নতুন সৃষ্টি 'জাতীয় সংগীত' বা 'স্বদেশী গান'। এই সংগীত সৃষ্টিতে ঠাকুর পরিবারের কৃতিত্ব ছিল সর্বাধিক। বিশেষত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র কন্যাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী ও রবীন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীতে স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত -

"মলিন-মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচনবারি
চন্দ্রজিনি কান্তি নিরখিয়ে,
ভাসিতাম আনন্দে,
আছি এ মলিনমুখ কেমনে নেহারি;
এ দুঃখ তোমার হায় সহিতে না পারি।" [৮]

গণেন্দ্রনাথ ছিলেন শক্তিশালী লেখক, সংগীত রচনায় নিপুণ ও একান্ত দেশসেবক। তাঁর রচিত সংগীত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

"লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কি করে,
লুঠিতেছে পরে এই রত্নের আকরে।
...দেশান্তর জনগণ ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন হয় বিদেশীর তরে।
আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে।" [৯]

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত স্বদেশ সংগীত সেকালে বহুল সমাদৃত ছিল। গানগুলি তখন বহু দেশপ্রেমিকের চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও গানটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

" মিলে সবে ভারত সন্তান / একতান মনপ্রাণ।
গাও ভারতের যশোগান।। [১০]

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'এ মন্তব্য করেছিলেন –

> "এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। এই বিংশতিকোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বহিতে থাকুক।" [১১]

হিন্দুমেলার প্রত্যেকটি অধিবেশনের প্রারম্ভে এই সংগীত সমবেতভাবে গাওয়া হত বলে জানা যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলায় ও নাটকে। হিন্দুমেলা ও রাখীবন্ধন উৎসবের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন তিনি। বহু স্বদেশী কবিতা ও সংগীত রচনা করেছেন তিনি। স্ত্রী স্বাধীনতার নব আন্দোলনেরও অন্যতম অগ্রণী ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাঁরই উদ্যোগে জোড়াসাঁকোয় একটি নাটকাভিনয়ের দল গঠিত হয়। বিদেশী সুরের সঙ্গে দেশী সুরের সংমিশ্রণে নতুন সুর সৃষ্টি তাঁরই অবদান। প্রাচীন রীতিকে অনুকরণ করে সংগীতের ক্ষেত্রে বিরাট সংস্কার সাধন করেছিলেন তিনি। তিনি লিখেছেন –

"জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান !

মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান ?
ভারতের পূর্বকীর্তি করহ স্মরণ –
রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন ?” [১২]

স্বদেশ প্রেমের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ তাঁর রচনার মাধ্যমে বারবার প্রকাশিত হয়ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, স্বদেশের প্রতি তাঁর পিতৃদেবের যে শ্রদ্ধা ‘সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যে অক্ষুণ্ণ ছিল’ – তাই ঠাকুর পরিবারের সকলের মধ্যে একটা প্রবল স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করেছিল। রাজনারায়ণ স্থাপন করলেন ‘জাতীয় গৌরব সম্পাদনী’ যার পরিণাম এই হিন্দুমেলা এবং যার থাকাস্বরূপ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে কার্যকরভাবে স্বাদেশিকতার আবির্ভাব ও চর্চা। এই স্বদেশচিন্তা থেকেই স্থাপিত হয় ‘গুপ্তসভা’, নাম দেন ‘সঞ্জীবনী সভা’ (১৮৭৭)। কার্যবিবরণী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উদ্ভাবিত এক গুপ্তভাষায় লেখা হত। এই সভা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর মৃতকল্প প্রাণে জীবনীশক্তি বৃদ্ধির যে উদ্যোগ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন তা অবিস্মরণীয়। এই সময়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ স্বদেশী সংগীত ছিল :-

“ চলরে চল সবে ভারত সন্তান, / মাতৃভূমি করে আহ্বান।” [১৩]

এই সময় স্বর্ণকুমারী দেবীও একাধিক স্বদেশী সংগীত রচনা করেন। যেমন –

“ শত কণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম,
মায়ের রাখিব মান – লয়েছি এ মহাব্রত।
নমো নমো বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি,
তোমার চরণে নমি, নরনারী মোরা যত।।” [১৪]

সরলাদেবী স্বদেশের সাহিত্য ও সংগীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ‘মাতৃভাণ্ডার’ নামে একটি যুব আন্দোলন সংগঠন তিনি পরিচালনা করেন। তিনি একসময়ে ‘ভারতী’ পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। তাঁর সময়ে পত্রিকার একটি নতুন বিভাগের সংযোজন হয় – ‘খেয়াল খাতা’। স্বাদেশিকতামূলক রচনা এই বিভাগটিতে স্থান পেয়েছিল। জাতীয় উন্নতি সাধনের চেষ্টায় ঠাকুড়বাড়ীর মহিলারা পুরুষের সঙ্গে সমান পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিলেন। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর অবস্থা সম্পর্কে নারী সমাজকে সচেতন না করলে আন্দোলন সাফল্য লাভ করতে পারেনা। এই বিচার বোধের সঙ্গে অসামান্য এক তেজস্বিতার সমন্বয় ঘটেছিল সরলাদেবীর মধ্যে। তাঁর রচিত সংগীত বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল : -

“ অতীত গৌরব কহিনি মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !
মহাসভা উন্মাদিনী মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !
..... হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে, ‘নমো হিন্দুস্তান’ !” [১৫]

‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত গানটির পাদটীকায় আছে –

“ এই সংগীতটি জাতীয় মহাসমিতির সপ্তদশ অধিবেশনে ১৯০১ খ্রীঃ

বাংলা, বিহার, আসাম, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, গুজরাট প্রভৃতি ও ভারতবর্ষের নানা প্রদেশস্থ হিন্দু, পার্সি, জৈন, খ্রীশ্চান ও মুসলমান সকল ধর্মাবলম্বী ৫৬ সংখ্যক গায়কগণ কর্তৃক সমস্বরে গীত হয়।” [১৬]

এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের গান ছাড়া আর কোন বাঙালী সংগীতকারের গান বোধ হয় সর্বভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা সমবেত কণ্ঠে জাতীয় কংগ্রেসে গীত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত মানসের উৎস সন্ধানে রবীন্দ্রপূর্ব এবং রবীন্দ্র সমকালীন বাংলাদেশের সংগীত ধারার বিবরণ আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সে সময়ের বাংলার সাধারণ সমাজ, রাষ্ট্রজীবন, সাহিত্যচর্চা, নাটক, কাব্য, দর্শন, সংগীত, শিল্প, ধর্ম এমনকি আধ্যাত্ম ভাবধারা রবীন্দ্রনাথের জীবনকে প্রভূত প্রভাবিত করেছিল। হিন্দুমেলার সমসাময়িক স্বদেশী সংগীতগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের স্বদেশী সংগীতগুলির তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় সমকালীন স্বদেশ প্রেরণাই তাঁর এই সংগীত সৃষ্টির মূল উৎস। হিন্দুমেলার সাথে ঠাকুর পরিবারের ছিল এক আত্মিক যোগ। ঠাকুর পরিবারের রবীন্দ্র পূর্ববর্তী সংগীত স্রষ্টাগণ তাঁদের রচিত সংগীতের বিষয়, ভাব, সুর প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ই রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। ফলে ঠাকুরবাড়ীর অন্যান্য স্বদেশী সংগীতের রূপ, রীতি, এমনকি অনেকক্ষেত্রে সুরের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের গানের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। হিন্দুমেলাতে ভারতবর্ষের শিক্ষিত বাঙালী সমাজের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছিল, যা ছিল নিতান্তই বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। তবুও প্রথম থেকেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাঙালীর স্বদেশচিন্তায় জাতীয় সংহতি ও অখণ্ড ভারত সংস্কৃতি ও ভারতীয় স্বাধীনতার কথা উদ্‌গীত হয়েছিল।

১৯০৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত স্বদেশী সংগীত রচয়িতাগণ মূলত সমগ্র ভারতের ঐক্যকেই তাঁদের রচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের স্বদেশী সংগীতগুলিও এই একই ভাবের অনুসঙ্গী। কিন্তু, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতি নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হন। বাংলাদেশ সম্পর্কে এক নতুন স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেন বাঙালী শিক্ষিত সমাজ। ঠাকুর পরিবারেও এর প্রভাব পড়েছিল। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন রচিত প্রায় সবকটি স্বদেশ-সংগীতে এর প্রকাশ দেখা যায়। ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’, ‘আমার সোনার বাংলা’, ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’, ‘ও আমার দেশের মাটি’ প্রভৃতি সংগীতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন -

“স্বদেশী যুগের এই গানগুলির অধিকাংশ হইতেছে বাউল সুরে বাঁধা। . . . . সর্বসাধারণের কাছে ইহাদের বাণী সহজে পৌঁছায়। গানের সুরও সহজে মর্মকে স্পর্শ করে। . . . স্বদেশী গানের অধিকাংশই হইল দেশী লৌকিক সুরে বাঁধা।” [১৭] বিষয়, বৈচিত্র্য, ভাব, ভাষা এবং সুরের দিক থেকে বাংলাদেশের পল্লী সংগীতগুলি অত্যন্ত সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ নিজেই একথা স্বীকার করেছেন। বঙ্গভঙ্গ সমকালীন গানগুলির মধ্যে

'আমার সোনার বাংলা' গানটি সম্ভবত সার্থকনামা রচনা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ খ্রীঃ ৭ই আগস্ট এই গানটি টাউন হলে গীত হয়েছিল। শিলাইদহ অঞ্চলের এক বাউল গগন হরকরা'র একটি গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ গানটির সুরগত সারূপ্য ইতিপূর্বে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরা লক্ষ করেছেন। মূল গানটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন –

"কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।" [১৮] বাউল গানের এই মূল আবেগটুকুকে তিনি আরোপ করার চেষ্টা করেছেন তাঁর স্বদেশীগানে। ১৩১২ বঙ্গাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিবাদে ৩০শে আশ্বিন রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে রাখীবন্ধন উৎসব পালিত হয়। জাতিধর্ম নির্বিশেষে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সকলকে রাখি পরিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে রচিত 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে', 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' ইত্যাদি স্বদেশমূলক গানগুলির জনপ্রিয়তা আজও অক্ষুণ্ণ। বঙ্গভঙ্গের পরে বেশ কয়েকটি স্বদেশ সংগীত রচিত হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯১১ খ্রীঃ কলকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন উদ্বোধন করা হয় এই গানটি গেয়ে। বাংলা ১৩১৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারত বিধাতা' নামে। ১৯১৪ খ্রীঃ 'ধর্ম সংগীত' নামক গ্রন্থে গানটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়। 'ব্রহ্মসংগীত' হিসাবেও এটি মূল্যবান। ঐ দিনের কংগ্রেস মঞ্চ থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস গানটির উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। 'It is a song of the glory and victory of India'. [১৯]

পরবর্তীতে এই সংগীত জাতীয় সংগীত হিসাবে নির্বাচিত হয়। উনিশ শতকের শেষভাগে স্বদেশী আন্দোলন ও তার পূর্ব থেকে ঠাকুরবাড়ী ও পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতে তার প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এই মূল্যায়ন স্বভাবতই একান্তভাবে সাংগীতিক উপাদানের বিশ্লেষণ নয়, স্বদেশী সংগীতের প্রতিফলন স্বাদেশিক চেতনার সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণ করার একটি প্রচেষ্টা। এই স্বদেশী গান বাংলা সংগীতের একটি ঐতিহ্যাশ্রিত ধারা মাত্রই নয়; বরং সদ্য পরাধীন ভারতে উনিশ শতকের শেষ দিকে এর আবির্ভাব ছিল অপ্রত্যাশিত। বিশেষ দেশকালের প্রভাবে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার বিকাশের মধ্যেই এর গতিপথটি নিরূপিত হয়।

Endnote

১) হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ, পৃষ্ঠা – ৫৯, কলকাতা।

২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, পৃষ্ঠা – ৩৬, বিশ্বভারতী।

৩) বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা -২৯৮।

৪) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস, পৃষ্ঠা – ৩৬

৫) যোগেশচন্দ্র বাগল, হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, পৃষ্ঠা – ৪২।

৬) তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৭

৭) শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (২য় খণ্ড), পৃষ্ঠা – ২৫৭

৮) যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃষ্ঠা – ১০২ – ১০৩

৯) তদেব, পৃষ্ঠা – ১০৮

১০) তদেব, পৃষ্ঠা – ১১০

১১) কালীচরণ ঘোষ, মাতৃমন্ত্র, ভূমিকা, ১৯৬২।

১২) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃষ্ঠা – ১৩১

১৩) তদেব, পৃষ্ঠা – ১৪০

১৪) ভারতী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৩১২

১৫) „ , মাঘ, ১৩০৮

১৬) তদেব

১৭) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী – ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা – ১৬৫।

১৮) তদেব, পৃষ্ঠা – ১৮৫।

১৯) প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত, পৃষ্ঠা – ৩০।

পাশ্চাত্য সাহিত্যচর্চায় বীতশোক ভট্টাচার্য

চম্পা মণ্ডল
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কবি বীতশোক (১৯৫১ – ২০১২) ছিলেন সত্তরের দশকের এক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও সম্পাদক। চলচ্চিত্র সমালোচক হিসাবেও তিনি তাঁর নিজস্বতার পরিচয় রেখেছেন। প্রাবন্ধিক হিসাবে তো তিনি এক বিরল কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর চর্চার ব্যাপ্তি, তাঁর পাঠ পরিধির বিস্তৃতি আমাদের অভিভূত করে। প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর বিপুল সম্ভার আমাদের বিস্মিত করে। তিনি তাঁর সাহিত্য এবং সাহিত্য সমালোচনার মধ্য দিয়ে ভারতের ঐতিহ্য–সংস্কৃতির এক আধুনিক ভাবুকরূপে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন । শুধু ভারতীয় নয় প্রাচ্যের সংস্কৃতি, পাশ্চাত্যের সাহিত্যতত্ত্ব ও দর্শনের সারবত্তাও তাঁর রচনায় বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্য শাখার এলিয়ট, গ্যোয়েটে, নীৎসে, বোদলেয়ার, সার্ত্র, কিয়ের্কেগাদ প্রভৃতি কী নেই তাঁর বহুমুখী পাঠ অভিজ্ঞানের আওতায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের বেশ কিছু লেখক-শিল্পী, সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে সারগর্ভ একটি আলোচনা সংকলন তাঁর 'পূর্বাপর' গ্রন্থটি। আন্তর্জাতিকতার অনুকূল অবস্থান থেকে বাংলার সাহিত্য আর সমালোচনাকে দেখবার প্রায় বিরল এক সুযোগ করে দিতে চেয়েছে এই গ্রন্থটি। তুলনার ভর কেন্দ্রে রেখে এ–সব রচনা মূলত বিদেশের এবং স্বদেশেরও সাহিত্যের পরিধি নানাভাবে স্পর্শ করে এসেছে। প্রাচী ও প্রতীচীর নবীন এবং প্রাচীন কিছু সাহিত্য কর্মের অভিঘাত মিল অনুবাদ ও অনুকরণের প্রসঙ্গ অধিক–অংশে এর আলোচনার বিষয়। সংকলনের অভিপ্রায় সম্পর্কে তিনি স্বয়ং গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন :

> "পূর্বাপর সংকলনটির আলোচনার মূল বিষয় প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য, অগ্রবর্তী ও পরবর্তী কালের কিছু রচনার বিবেচনা এ-সংগ্রহে ধরা থাকল। " [১]

এ সংগ্রহের একটি মূল্যবান আলোচনা 'অনাসক্তিযোগ ও হ্যামলেট'। শেক্সপীয়রের সর্বাধিক আলোচিত গ্রন্থটিকে নিয়ে রচিত এই প্রবন্ধে রয়েছে হ্যামলেটের স্টোইক মনোভাব এবং প্রাতিস্বিক ট্র্যাজিডির কথা। পাশ্চাত্যের সভ্যতার মহত্বপূর্ণ ও সমুন্নত শিখরে একসময় অবস্থান ছিল এই স্টোইক(stoic) নামক গ্রিক ও রোমান দর্শনের। স্টোইক শব্দের অর্থ হল নির্বিকার, বিষয়বিমুখ। বীতশোক হ্যামলেট চরিত্রটিকে এই Stoic দর্শনের দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন। হ্যামলেটের জীবনদৃষ্টির সঙ্গে এই বিশ্ববীক্ষার মিলনকে এক ধ্রুবপদের মিল হিসাবে দেখেছেন। স্টোইকদের মতো হ্যামলেটের

'আরও আরো নিশ্চয়তা অর্জনের প্রয়াস'কে তাঁর প্রাতিস্বিক ট্র্যাজেডির জন্য দায়ী করেছেন বীতশোক। তাঁর বিচারে হ্যামলেটের মানসিকতা স্টোইকদের মতোই কঠিন। সে স্কেপটিক বা সিনিক নয়। হ্যামলেট চরিত্রে একই সঙ্গে ক্রিশ্চান ও স্টোইক ভাবের এই উভযোজ্যতা সম্ভব করে দেখিয়েছেন শেক্সপীয়র :

> " ক্রিশ্চান ও স্টোইক দুটি আলাদা পরম্পরার সন্ততি, কিন্তু শেকস্পিঅর তাঁর হ্যামলেটের বিশ্ববীক্ষায় এই দুটি ধারা একত্র করে এক রূপলোক নির্মাণ করতে পেরেছিলেন। " [২]

মধ্যযুগে স্টোইক মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা বোয়েথিউস শেক্সপীয়রের পছন্দের পাত্র ছিলেন কিনা সে ব্যাপারে বীতশোক নিশ্চিত না হয়েও বলেন যে বোয়েথিউসের নীতিবোধ ও মানবিক আদর্শের অভিঘাত হ্যামলেট চরিত্রে প্রায়-সপ্রমাণ রয়েছে। 'বস্তুস্বভাবের অনুকম্পন' যাকে স্টোইকবাদীরা Sumpatheia নামে চিহ্নিত করেছিলেন তা হ্যামলেটের সংলাপের একাধিক অংশে সাংঘাতিকভাবে লক্ষ্য করেছেন তিনি। এই নাটকটিকে কেন্দ্রে রেখে তিনি স্টোইক লেখকদের মধ্যে অন্যতম সেনেকা'র রচনার আলোচনাকে ও পসিডোনিয়াস প্রসঙ্গকে উত্থাপন করেছেন পাঠকের দরবারে। তিনি তাঁর এই আলোচনায় গীতার প্রসঙ্গকেও নিয়ে আসেন। তাঁর আত্মোপলব্ধি এই যে গীতাতে দুঃখে অনুদ্বিগ্ন ও সুখে বিগত স্পৃহ বীতভয়, বীতকাম যে মানবিক আদর্শের কথা গীত হয়েছে তা কিছুটা এই স্টোইক বা অনাসক্ত। গীতায় গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত যোদ্ধার ধ্যানের সঙ্গে তিনি হ্যামলেটের অতীত রোমন্থন, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্বলিত বিলম্বের তুলনা করেছেন। তাঁর মতে হ্যামলেটের অনুধ্যান ও ধ্যান ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য পরিত্যাগ করে দ্রুত রণ বিজয়ের কৌশল। বীতশোকের এই গীতা'র প্রসঙ্গ উত্থাপনের অনুরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন নলিনীকান্ত গুপ্ত'র আলোচনাতেও দৃষ্ট হয় :

> " হ্যামলেটে সঙ্কটটিকে আমাদের অনুরূপ অন্য কিছুকে মনে করায়, সেটা হল ভিত্তি ও মহাভারতে মহান উপাখ্যানের আরম্ভটি — গীতা। অর্জুন, আদর্শ নায়ক, কর্মী মানুষ, সম্পূর্ণ আত্ম-বিশ্বাসী ও সন্দেহাতীত . . . বিজয় ধনুক শক্তিধর যোদ্ধার হাত থেকে খসে পড়ে, এবং সকল স্নায়ু ও শিহরণ, ডুবে যায় বিষাদে, নৈরাশ্যে এর সম্পূর্ণ দ্বিধা দ্বন্দ্বে। অর্জুন সঙ্কটটি কাটিয়ে ওঠে যেমন সে বেরিয়ে আসার জ্ঞান পেতে সক্ষম হয়েছিল এবং পেতে সক্ষম হয়েছিল প্রয়োজনীয় সাহায্য, পেয়েছিল অলৌকিক উপদেশ(Divine Guide)। " [৩]

প্রাবন্ধিকের মতেও গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের উপদেশ অর্জুনের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল কিন্তু হ্যামলেটের স্টোইক সান্ত্বনা বাক্যে শোকের উপশম হয়নি। হ্যামলেট তাঁর চোখে দ্বিধান্বিত অর্জুন ও দ্বিধাহীন কৃষ্ণের নিহিত স্ববিরোধ সত্তা। বীতশোকের অভিমত হ্যামলেট তাঁর নিজস্ব রীতিতে স্টোইক তবু ভারতীয় অনাসক্তিযোগের সঙ্গে তার

অনতিদূরত্ব ও পরিমাপের যোগ্য। এই জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় হ্যামলেট ভাবনা ব্যাপ্তি পায়।

'গ্যোয়েটের উপন্যাস পাঠের ভূমিকা' প্রবন্ধে তাঁর তিনটি উপন্যাস (তরুণ ভের্থরের যন্ত্রণা, উইলহেল্ম মেইস্তার, ও ঐচ্ছিক মিল)-এর মহত্ত্ব, সীমাবদ্ধতা, উৎস, অভিঘাত বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বীতশোকের দাবি জার্মানিতে ক্ষুদ্র উপন্যাস লেখার যে শিল্পায়াস, তার বাস্তবিক সূচনা 'তরুণ ভের্থরের যন্ত্রণা' ও 'ঐচ্ছিক মিল' - এই দুটি রচনার মধ্যে দিয়েই। ঐতিহাহিক নাটক সৃষ্টিকারী গ্যোয়েটের সামাজিক উপন্যাস রচনাতেই ঝোঁক বেশি। বীতশোকের ধারণায় গ্যোয়েটের উপন্যাস ইতিহাসবাদের আলোয় নতুন ভাবে পাঠের যোগ্য হতে পারে। ১৭৭২ সালের ৩০শে অক্টোবর জার্মানীর ওয়েৎস্লার শহরে গ্যোয়েটের বন্ধু কার্ল উইলহেল্ম জেরুসালেম তাঁর বন্ধু কেস্টানারের পিস্তলের সাহায্যে আত্মহত্যা করেন। এরপর ১৭৭৪ সালে গ্যোয়েটে "Die Leiden des jungen Werthers", ইংরেজি বয়ানে The Sufferings of young werther অথবা 'তরুণ ভের্থরের যন্ত্রণা' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস রচনা করলেন। এই ঘটনা এই উপন্যাসের ছাঁচ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে বলে তিনি জানান। সেই সঙ্গে ভের্থর ও গ্যোয়েটের জন্মদিন এক এ তথ্য উল্লেখ করে বলেন যে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এভাবে মিলিয়ে দেখানোর একটি সরল পদ্ধতি এই উপন্যাসে রয়েছে। ভের্থরের মধ্যে সেই সময়কার গ্যোয়েটের মুক্তমতি, নিসর্গপ্রিয়, প্রণয়প্রবণ, আত্মহনন ভাবনায় আচ্ছন্ন যুবকের ছায়া লক্ষ করেছেন তিনি। বীতশোক খুব সংক্ষেপে ও সংযত বাক্যে এই উপন্যাসের ধরণকে চিহ্নিত করেছেন :

> " তবু এই বাস্তব উপাদান ও আত্মজীবনীর বীজ বহন করেও ভের্থর এক স্বতন্ত্র ধরণের উপন্যাস : পত্র-উপন্যাসের ছক, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের ছক কোনওটাতেই তা পুরোপুরি বাঁধা পড়ে না। ভের্থর প্রতিবাদী উপন্যাসও কিছুটা, জেরুসালেমের প্রতি সমাজ যে অপরাধ করেছে, অথবা ভুল বিচার করেছে, তার সারস্বত পুনর্বিবেচনা আছে যেন এ উপন্যাসে। গ্যোয়েটে এ উপন্যাসে আত্মহত্যার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, ভের্থরের আত্মহনন বুরজোআ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি ধরন, এবং এই অর্থে সে অস্তিত্ববাদী, আধুনিক। ভের্থরের আত্মহত্যা গ্যোয়েটেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল একথা যেমন সত্য, তেমনি এ আত্মহত্যা অব্যবহিত পরবর্তীকালে পশ্চিমি তরুণদের নিরবচ্ছিন্ন আত্মহত্যার প্রবণতার উৎস খুলে দিয়েছিল, এ উৎসাহের ঘটনাও মিথ্যা নয়। "[৪]

এ উপন্যাস উদ্ভট, কিম্ভুতকিমাকার, আধুনিক রুচির অনুপযোগী বলে সমালোচিত হওয়ার বিষয়টিকে উল্লেখ করেও এই উপন্যাসের রচনাশৈলী দুর্বল নয় বলেই তিনি মন্তব্য করেন :

> " এর এক অন্তরঙ্গ প্রমাণ মেলে ভের্থরের রচনার শৈলীতে। মনে হতে পারে এতে আছে অকারণ বাগবাহুল্য, কিন্তু ভের্থরের আবহ ঘনিয়ে আনার জন্যে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় ছিল ঐ উচ্ছ্বসিত অতিশায়ন, কিছু কিছু অসংলগ্ন উচ্চারণ, পদক্রমের শিথিলতা, সহসা সাহসী ভাবনার অপ্রস্তুত যতিপতন, বিস্ময়চিহ্নের বিরতিহীন ব্যবহার, ড্যাশের অবিরল প্রয়োগ — এই সমস্তই এ কাহিনীর আবহরচনার অবশ্যমান্য শর্ত, শক্তিহীনের মুদ্রাদোষ বলে একে চিহ্নিত করা চলে না। " [৫]

বীতশোক মনে করেন 'Wilhelm meister's Apprenticeship' বা উইলহেল্ম মেইস্তার এর অভিঘাত গ্যোয়েটে যুগের পরবর্তী জার্মানির কথাসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে মেইস্তার জীবনশিল্পী হলেও কোনো শিল্পী চরিত্রের উদ্ভব ও অভ্যুদ্বয়ের ইতিহাস নয় এই বই। এই উপন্যাসের বিশেষত্ব বিষয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত ও সুবিন্যস্ত মন্তব্য পাঠককে ঋদ্ধ করে :

> "মেইস্তারএ বাস্তবতা ও রোম্যানটিকতা, জ্ঞানদীপ্তি ও সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মপ্রাণতা, শ্লেষ ও অলৌকিকতা, পিকারেস্ক ও বিলডুংসরোম্যানএর নানা ধারার সঙ্গম ঘটেছে। " [৬]

ইতালিও কথাসাহিত্যিক আলেসান্দ্রো মানজোনি, কাফকা, রবার্ট ম্যুসিল, হেরম্যান হেস ও গুনটার গ্রাস গ্যোয়েটের উপন্যাসে অনুপ্রাণিত হয়েছেন – এই তথ্যেও ভরপুর আলোচ্য প্রবন্ধটি। গ্যোয়েটের জন্মের আড়াইশো বছর পরেও গ্যোয়েটে চর্চায় এই প্রবন্ধ একটি শক্তিশালী স্তম্ভস্বরূপ।

'তাসের দুই দেশের গল্প' নামক চমৎকার নিবন্ধে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সাহিত্যের তুলনায় ব্রতী হয়েছেন। রূপকথার জাদুকর নামে অভিহিত ডেনীয় কবি ও লেখক হান্স ক্রিশ্চিয়ান আন্দেরসেন এর 'দি কোর্ট কার্ডস' ও বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একটি আষাঢ়ে গল্প' নামক গল্পটির তুলনামূলক আলোচনায় সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্যকে লিপিবদ্ধ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে দুটো আখ্যানের মধ্যে তাস ছাড়া আর কোন মিল নেই বলে মনে হলেও বীতশোকের বিচারে :

> " কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই শিল্পের সঙ্গে জীবনের যোগ, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগ, মায়ার সঙ্গে বাস্তবের যোগ, এবং সমাজের সঙ্গে রাজনীতির যোগ এক সুনির্দিষ্ট ফলে এসে পৌঁছেছে। মূল্যবোধ, সংজ্ঞার্থ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও

> পাশ্চাত্যভেদে যে প্রতিযোগ চলেছে তাতে এই দুটি গল্প কীভাবে যোগ দিয়েছে তা বিবেচনার বিষয়।”[৭]

রবীন্দ্রসময়ে প্রচলিত প্রেমারা, কোরেন্তা, তেরেন্তা, বিন্তি ও হরতন, রুইতন, ইস্কাপন ইত্যাদি তাসখেলা সংক্রান্ত শব্দগুলির উৎস যথাক্রমে পর্তুগিজ ও দাচ বা ওলন্দাজ – এই তথ্যের সাহায্যে তিনি দেখাতে চেয়েছেন এই শব্দগুলি তাস খেলাকে রাজনৈতিক আবহে দেখবার সুযোগ করে দিয়েছে এবং এই উল্লেখ প্রাবন্ধিকের শব্দভান্ডার সম্পর্কিত বিপুল পাণ্ডিত্যকেও আভাসিত করে। প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিতে কিছু বিন্যাস বিপর্যস্ত হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে শ্বেত দ্বীপ ও জম্বুদ্বীপ অর্থাৎ আধুনিক বিলেত ও সনাতন ভারতের আবহ আনতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্যের মানসে তাসের রাজা-রানিরা ইউরোপের নানা সম্রাট সম্রাজ্ঞী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুষঙ্গে জড়িত — এই সূত্রেও তিনি গল্পটিকে নৈতিক ও রাজনৈতিক বিড়ম্বনার মধ্যে প্রবেশ করতে দেখেছেন। তাঁর বিচারে আন্দেরসেন এর ‘আগ্নেয় অশ্ব’ পশ্চিমী মিথ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ‘আহুতি’ শব্দটি ভারতীয় পুরাণের যোগ বহন করে আনে। আন্দেরসেন মধ্যযুগের পটভূমিতে তাঁর তাসের দেশের ভূমিকা নির্ধারণ করেছেন অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ এক চিরকালীন পটপ্রেক্ষিতে এই রূপকথা অঙ্কন করতে চেয়েছেন। এই বৈসাদৃশ্য থাকলেও রূপকথার মধ্যে রূপকথার গল্প, ক্যাসেলের মধ্যে ক্যাসেলের ভাঙাগড়ার গল্প দুটি রচনাতেই চিরন্তনতার স্পর্শ নিয়ে আসে তা তাঁর উপলব্ধিতে ধরা দিয়েছে। আন্দেরসেন এর গল্প সম্পর্কে তাঁর এক মূল্যবান কথা এই যে আন্দেরসেন এর ক্যাসল কাফকার ক্যাসল মনে করায়, কিন্তু মেজাজে ভিন্ন দুই লেখক — একজন প্রসন্ন ও বিষণ্ণ আর একজন নির্বেদময়। দুই দেশের দুই সাহিত্যের এই তুলনা পাঠককে শুধু সমৃদ্ধই করে না বিস্মিতও করে।

‘জেন ও কিয়েৰ্কেগার্দ’ প্রবন্ধে তিনি জেন ধর্মমত ও কিয়েৰ্কেগার্দ এর দর্শন চিন্তার এক তুলনামূলক আলোচনার অনুগামী করেছেন পাঠককে। তিনি দেখিয়েছেন জেন ও কিয়েৰ্কেগার্দ দুই চিন্তাধারাই ধর্মীয় অস্তিবাদে আস্থাবাদী এবং দুজনেই বোধ ও বোধিকে সম্বল করে পরম সত্যের দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছে। তিনি মনে করেন জেন সাধনা ও কিয়েৰ্কেগার্দ এর ভাবনায় বৌদ্ধ-তাওধর্ম ও ক্রিশ্চানধর্ম যে ভাবাদর্শের প্রেরণা ও সমাজ সংযুক্তির প্রণোদনা সঞ্চারিত করেছে তার তুলনা দেওয়া যেতে পারে ধর্মীয় সমাজতত্ত্বের দিক থেকে। বৌদ্ধ ও ক্রিশ্চান উভয়ের মধ্যেই শূন্যতার ধারণা থাকলেও তিনি বলেন কিয়েৰ্কেগার্দের এই শূন্যতা বিচ্ছিন্নতার, প্রিয় বিরহের শূন্যতা আর জেনবাদীর শূন্যতা করুণার মুখাপেক্ষী।

‘নীৎশে পাঠের নতুন ভূমিকা’য় তিনি বলেছেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীদের দ্বারা, মার্কসবাদের দ্বারা সমালোচিত হলেও জার্মানীর অন্যতম ধ্রুপদী চিন্তাবিদ্ দার্শনিক ও সংস্কৃতিবেত্তা ফ্রেডরিখ নীৎসের যথাযথ স্থান নিরূপণ করা এক অসাধ্যসাধন ব্যাপার। নীতিবিদ্যা মনোবিদ্যা ধর্মতত্ত্ব নন্দনতত্ত্ব ও ভাষাদর্শনের নানা শাখায় নীৎশের স্বচ্ছন্দ ও অধিকারী পদক্ষেপ — এইসব মিলিয়ে তাঁর দার্শনিক ক্ষেত্র চিহ্নিত করা মুশকিল। প্রাবন্ধিকের বিচারে, নীৎশের আশ্চর্য গদ্য, তাঁর শৈলী, সত্য ও বাস্তবতার সন্ধানে জীবন

সংগ্রাম ধারণা, চূড়ান্ত সত্য ও বস্তুনির্ভর জ্ঞানের নশ্বরতা প্রভৃতির কারণে তিনি একুশ শতকেও পুনঃপাঠযোগ্য। বীতশোক ভট্টাচার্য নীৎশেকে 'অধুনাকালের সেরা গদ্য-লিখিয়েদের একজন' বলে অভিহিত করেন। 'মানুষের অধিবিদ্যার প্রয়োজন রয়েছে' — একথার সব থেকে বড়ো সমালোচক হিসাবে প্রাবন্ধিক নীৎশেকে দেখেছেন। তাঁর মতে দর্শনের কেন্দ্রে ভাষাকে স্থান করে দিতে চেয়েছেন যে সব জার্মান দার্শনিক তাঁদের মধ্যে নীৎশে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। নীৎশের রচনার বিষয় সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা :

> " নীৎশের রচনায় সমকাম এক পুনরাবৃত্ত মোটিফ মনে হতে পারে, কেননা পুরুষ-বন্ধুতাকে রচনায় প্রতিষ্ঠা দিতে তিনি উদগ্রীব, বিশেষত তাঁর জরথুশত্র রচনায় সমযৌনতানির্ভর কল্পচিত্রের আয়োজন উত্তপ্ত সংরক্ত অবিরল। " [৮]

এরপর তিনি নীৎশের 'সমুচ্চশিখর থেকে' কবিতার আলোচনা করেছেন। এই কবিতার চমৎকার অনুবাদও করেছেন তিনি। নীৎশে স্বয়ং তাঁর এ কবিতাকে এপোড আখ্যা দিয়েছে। আর প্রাবন্ধিকের মতে 'হোরেসের এপোডের মতো এ কবিতা ব্যক্তিগত ও ভাবনা নির্ভর'। তিনি আরও বলেন 'এ রচনা এপোডের বিশিষ্ট নিদর্শন'। এই কবিতার পাঠ-বিশ্লেষণ, কবিতার প্রসঙ্গ নীৎশের মহৎব্যক্তিত্ব — এসবই জড়িয়ে গিয়েছে এই কবিতার সূত্র ধরে। প্রাবন্ধিক নীৎশের সম্পর্কে বলেন :

> "ভেতরে ভেতরে রোম্যান্টিক হয়েও তিনি রোম্যান্টিকতার কঠোর সমালোচক, তাঁর সমকালীন প্রধান নৈতিক ও রাজনীতিক ধারার সচেতন বিরোধিতা করেছেন তিনি। " [৯]

আর এই কবিতা সম্পর্কে বলেন :

> " প্রথাসিদ্ধ পাঠে অভ্যস্ত পাঠককে চমকে দেয় নীৎশের এ রচনা, . . . ভালো মন্দের দ্বন্দ্বের ধারণা পেরিয়ে পাঠককে তিনি এমন এক চূড়ান্তে নিয়ে যান, সে পর্যাবরণের মধ্যে ভালো মন্দের রকমফের। দুপ্রস্ত মূল্যবোধকে তিনি এখানে মেলাতে চান : একদিকে নির্মমতা, যুদ্ধ, অভিজ্ঞতাসুলভ অহংকার ; অন্যদিকে দর্শন শিল্প সাহিত্য সংগীতের প্রতি ভালোবাসা। " [১০]

প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন, দার্শনিক নীৎশের আত্মগত অনুভবের ধারা এ কবিতার দুকূল ছাপিয়ে গেছে, ব্যক্তিগত ক্রিশ্চান বিবেককে ছাড়িয়ে এখানে বড়ো হয়ে উঠেছে ইন্দ্রিয়ময়তা।

'বোদলেআর : মধুসূদন' নিবন্ধের আদিতেই পাই উনিশ ও বিশ শতকে বাঙালির বোদলেয়ার চর্চা ও বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের বোদলেয়ার এর প্রতি অননুরাগ এবং বোদলেয়ার ও মধুসূদনের মিল-এর প্রসঙ্গ। সমকালীন প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্যের দুইজন কবি (মধুসূদন ও বোদলেয়ার) তাঁদের জীবনে ও রচনায়, প্রসঙ্গে ও প্রকরণে কতটা অনুরক্ত তার লক্ষ্যভেদ করার প্রয়াসী হয়েছেন। তবে তুলনামূলক আলোচনায় মিলের পাশাপাশি অমিলও যে খুঁজে বার করা দরকার সে বিষয়েও তিনি সচেতন। বীতশোক আলোকপাত করেছেন যে, বোদলেয়ার ও মধুসূদন দুজনের হাত ধরে ফরাসি ও বাংলা কবিতায় এক নতুন যুগের সূচনা, দুজনের কবিতাতেই জন্মভূমির এক নিবিড় ছায়াঘন ছবি। পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনে, মেধা-মননে, উচ্চাকাঙ্খায়, জীবনাচরণে, আবেগ ও উচ্ছ্বাসতাড়িত প্রেম জীবনে দুই কবিই আশ্লিষ্ট। দুই কবির মধ্যেই এক বিরোধাভাস স্বভাব লক্ষ করেছেন :

> " বোদলেআর ও মধুসূদন দুজনের চরিত্রে উভযোজী স্বভাব লক্ষ করা যায়। রচনার ক্ষেত্রে তাঁরা একই সঙ্গে রোম্যানটিক ও ক্ল্যাসিক , প্রেমের ক্ষেত্রেও তাঁরা আবেগ ও সংযম, উচ্ছ্বাস আর প্রশান্তির টানাপোড়েনে ছিন্নভিন্ন। " [১১]

'কাচের দরজা : সার্ত্র ও নিজান' রচনাটি হল জাঁ–পল সার্ত্র ও নিজান সম্পর্কের, তাঁদের চিন্তাভাবনার প্রসঙ্গায়ন। সার্ত্র নিজানের আয়নায় নিজেকে দেখেন। ১৯৩৯ এ নিজান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করেন ও সার্ত্রর মার্কসিস্ট রূপ প্রগাঢ় হয়ে ফুটে ওঠে। ১৯৬০ এ সার্ত্র শুধু অপরিচিত নিজানকে পরিচিত জনতার সামনে আনলেন তা নয়, নিজেকেও নতুন করে উপস্থাপিত করলেন। বীতশোকের চিন্তাধারায় :

> " সার্ত্রর বিচ্ছিন্নতার বোধ এবং সার্ত্রর ক্রোধ, ভরা যৌবনের বিচ্ছিন্নতাবোধের সংরক্ত স্মৃতিচারণ এবং বুরজোআ সমাজ ও ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে প্রায়-অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ, এখানে নতুন করে চিহ্নিত করল নিজানকে, সার্ত্রকেও।" [১২]

মার্কসবাদ ও অস্তিবাদী দর্শন মিলিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন বীতশোক সার্ত্রর লেখায়। আর সার্ত্র ও নিজান – দুইজনেরই চিন্তাভাবনার সারাৎসার হল 'দ্রোহ এবং মুক্তি'।

'একা দ্বারের পাশে সিমোনওয়েইল'-এ সিমোন ওয়েইল এর একটি ছিন্ন লিপিকে আশ্রয় করে প্রাবন্ধিক বাঙালী পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এই মনস্বী মহিলার। প্রাবন্ধিকের অন্বেষণে ওয়েইলের মরমিয়াবাদ ও বিপ্লবভাবনার মধ্যে সেতুবন্ধন সম্ভব হয়নি এখনো। বীতশোকের বিচারে অনাড়ম্বর বক্তব্য আর নিরাভরণ রচনারীতি, লেখার ঝোঁক, চিরায়ত সাহিত্যের প্রতি আসক্তি, ক্রিশ্চান গসপেল, হিন্দুদের উপনিষদ, চীনের তাওধর্ম গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রতি প্রীতি — এই সবকিছু নিয়ে তাঁর মধ্যে এক বিচিত্রের সম্মেলন।প্রাবন্ধিকের উপলব্ধিতে উগ্র বামপন্থী, ইহুদী কৃষকদের জীবন সম্পর্কে আগ্রহী, কিশোরী বয়সে স্পেনের গৃহযুদ্ধ শিবিরে পাচিকার কর্মে রত, প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব পত্রিকায় নিয়মিত লেখা — সব মিলিয়ে ওয়েইল বর্তমানে ইউরোপের অনুধ্যানের সামগ্রী।

বিশ্ববিখ্যাত জার্মান কবি, নাট্যকার ও মঞ্চ পরিচালক বের্টোল্ট ব্রেখটকে নিয়ে লেখা সন্দর্ভ 'ব্রেশট ও তাঁর কাব্যতত্ত্ব' ঠিক তাঁর কবিতা বা কবিতা বিষয়ক আলোচনা নয়। এখানে প্রাবন্ধিক সম্পূর্ণ অন্য এক দিশা দেখিয়েছেন। এখানে ব্রেখট এর কাব্য বিষয়ক ধারণাগুলিকে একত্রিত করে একটা সংহত রূপদানের প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর মতে :

> " প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে স্তালিনের মৃত্যু পর্যন্ত জার্মানির
> বিপর্যস্ত ইতিহাসকে আত্মস্থ করে গড়ে উঠেছে ব্রেশটের
> কাব্যতত্ত্ব : আর্ত, শক্তিমান এবং ট্র্যাজিক। " [১৩]

বীতশোক ব্রেশট এর কবিতায় শুনতে পেয়েছেন বিতর্কে সবচেয়ে কর্কশ এক শিল্পীর সব থেকে কোমল কবিকণ্ঠ। নাট্যকাররূপে ব্রেশটের পসারই ক্রমে তাঁকে কবিরূপে জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে — এই অভিমতে প্রাবন্ধিক সহমত নন। নাটক লেখার আগে থেকে ব্রেশট কবিতা লেখা শুরু করেছেন, তবে নাট্যকার ব্রেশটের কবিরূপে গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের ঘটনা বলে তিনি স্বীকার করেন। ব্রেশটের কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে আলোচকের ধারণা :

> " তাঁর কাব্যতত্ত্ব অবশ্য তাঁর নাট্যতত্ত্বের মতো বিস্ফোরক
> নয় এবং হয়তো সেজন্যই তাঁর নাটকে অনুরাগী আধুনিক
> জনেরা যেভাবে তাঁর নাট্যতত্ত্ব অধ্যয়নের পর তাঁর নাট্য
> উপভোগে মনোনিবেশ করেন তেমন বিপরীত বিহারের
> রুচিও এক্ষেত্রে লক্ষ্যগোচর হচ্ছে না। " [১৪]

তাঁর প্রথম আবির্ভাব কবিরূপে, হাজারখানেক কবিতাও পাওয়া গেছে কিন্তু তাঁর কবিপরিচয় গৌণ থেকে গেছে। তবে এরপরও বীতশোক স্বীকার করে নেন ব্রেশটকে কবি ও কবিতার তাত্ত্বিকরূপে প্রতিষ্ঠা দেবার পথে অন্তরায় এই নাট্যকার-কবি স্বয়ং। বীতশোক বুঝেছেন ব্রেশটের কাব্যতত্ত্ব অলোচনার প্রধান অসুবিধা এটাই যে তিনি নিজে কখনোই কাব্যতাত্ত্বিকরূপে নিজের কল্পনা প্রতিভার পূর্ণ নিয়োগ চাননি। তাঁর রচিত কবিতার একটি বৃহৎ অংশ মঞ্চে উপস্থাপনের দিকে লক্ষ রেখে রচনা করা ও গদ্যে পদ্যে নাটকীয় বক্তব্য প্রকাশ করতে ব্রেশট তাঁর আবিষ্কৃত গেসটিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছনে বলে বীতশোক জানান। কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট কিছু মতামত বীতশোক তুলে ধরেছেন তাঁর কলমে :

> "তিনি মুক্ত নৈর্ব্যক্তিক পরিবেশনের পক্ষে, ... তিনি
> আশা করেন তাঁর কবিতা পাঠের আগে আবৃত্তিকার
> তাঁর কবিতা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করবে" [১৫]

ব্রেশট পছন্দ করতেন আট ও চার পঙক্তির তীক্ষ্ণ প্রৌঢ়োক্তি, চীনা কবিতার ক্ষেত্রে প্রেরণা দান, ভিঁয়োর নৈরাশ্যবাদী অসামাজিক কবিতা তাঁর আদর্শ, র‍্যাঁবোর প্রতীকবাদী ফরাসি গদ্যকবিতার প্রকরণ তাঁর আত্মস্থ, সনেটের পুরোনো রূপবন্ধ তাঁকে নিয়ে গেছে

রেনাসেন্সের ইতালিতে, কবি স্তেফান গেয়র্গকে ভর্ৎসনা করে কবিতা রচনা, নিজের জন্য এপিটাফ রচনা — ব্রেশট সম্পর্কে নানান তথ্যে সমৃদ্ধ এই আলোচনা পাঠককে ঋদ্ধ করে। শুধু এই আলোচনা নয় প্রাচ্য এই কবি প্রাবন্ধিকের পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্পর্কে এই অগাধ পাণ্ডিত্য পাঠককে সমৃদ্ধ করে।

তথ্যসূত্র :

১) বীতশোক ভট্টাচার্য, “পূর্বাপর বিষয়ে”, ভূমিকা অংশ, ‘পূর্বাপর’, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, বাণীশিল্প, কলকাতা।
২) বীতশোক ভট্টাচার্য, “অনাসক্তিযোগ ও হ্যামলেট”, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ৬২
৩) নলিনীকান্ত গুপ্ত, “হ্যামলেট : মুক্তোন্মুখ আত্মার সঙ্কট”, বীতশোক ভট্টাচার্য ও সুবল সামন্ত(সম্পা.), ‘হ্যামলেট’, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৭, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ১১
৪) বীতশোক ভট্টাচার্য, “গ্যোয়েটের উপন্যাস পাঠের ভূমিকা”, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ৭১ -৭২
৫) তদেব, পৃষ্ঠা : ৭৩
৬) তদেব, পৃষ্ঠা : ৭৯
৭) বীতশোক ভট্টাচার্য, “তাসের দুই দেশের গল্প”, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ৮৫
৮) বীতশোক ভট্টাচার্য, “নীৎশে পাঠের নতুন ভূমিকা”, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ১০১
৯) বীতশোক ভট্টাচার্য, “সমুচ্চ শিখর থেকে : নীৎশে”, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ১০৯
১০) তদেব, পৃষ্ঠা : ১১০
১১) বীতশোক ভট্টাচার্য, “বোদলেআর : মধুসূদন”, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ১২৩
১২) বীতশোক ভট্টাচার্য, “কাচের দরজা : সার্ত্র ও নিজান”, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ১৬০
১৩) বীতশোক ভট্টাচার্য, “ব্রেশট ও তাঁর কাব্যতত্ত্ব”, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ১৪৬
১৪) তদেব, পৃষ্ঠা : ১৪৭
১৫) তদেব, পৃষ্ঠা : ১৫৬

রাজর্ষি থেকে বিসর্জন : সংরূপের একটি ভিন্ন পাঠ

ছোটন মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: প্রত্যেক কলায় আছে সংরূপ। যেমন-অঙ্কন যার মধ্যে আছে দৃশ্যের ছবি, স্থির ছবি, মুখচিত্র। সংগীতে আছে সোনাটা, সিমফনি, সংগীত। চলচ্চিত্রে পাওয়া যায় গার্হস্থ্য কমেডি, ভীতি বা রহস্য রোমাঞ্চ প্রভৃতি। সংরূপ সম্বন্ধে অধ্যায়ন অপরিহার্যভাবে প্রথারই অধ্যায়ন করা। অন্যান্য কলার মত সাহিত্যে সংরূপ প্রথার সঙ্গে পরিচিতি যথেষ্ট সমালোচনামূলক কিছু নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশকে আরও সমৃদ্ধ করে। কোনও রচনা বা পাঠ্যাংশের সংরূপ উপলব্ধি সেই রচনা বা পাঠ্যাংশের সামগ্রিক পঠন এবং বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা দেয়। সর্বোপরি, একটি সংরূপ দৃষ্টিভঙ্গি যে-কোনও একটি মূল রচনার বা পাঠ্যাংশের মূল্যবোধ আরও গভীরতর করে।
সূচকশব্দ : সংরূপ, সাহিত্য-কলা,কবিতা,নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প।

মূলআলোচনা :

ফরাসি শব্দ 'জঁর' (Genre)-এর বাংলা প্রতিশব্দ হল সংরূপ; যার অর্থ আদর্শ উদাহরণ, শ্রেণী/বর্গ অথবা প্রজাতি/প্রকার। বিষয় অনুসারে, গঠন অনুসারে বা রূপ অনুসারে সাহিত্যের যে বিন্যাস বা শ্রেণীবিভাজন—একে সাহিত্যের সংরূপ বলা হয়।

সংরূপের অধ্যায়ন সাহিত্যকর্মের শ্রেণীবিভাগ সুশৃঙ্খলভাবে তুলে ধরে। কেনও রচনা বা পাঠ্যাংশের সংরূপ উপলব্ধি সেই রচনা বা পাঠ্যাংশের সামগ্রিক পঠন এবং বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আরও বেশি ধারণা লাভ করতে পারে। একটি সংরূপ দৃষ্টিভঙ্গি যে-কোনো একটি মূল রচনার বা পাঠ্যাংশের মূল্যবোধকে আরও গভীরতর করে।

সংরূপ নির্ভর করে লেখক, পাঠক ও প্রকাশক—এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। লেখক তাঁর নিজের ইচ্ছা ও দর্শন অনুযায়ী সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপের আশ্রয় গ্রহণ করেন, আবার পাঠক কি চাইছেন সেই অনুযায়ী সংরূপ পাল্টে যেতে পারে, আবার প্রকাশকের মতানুযায়ীও সংরূপ বদলাতে পারে।সংরূপের সূচনা ঘটে গ্রিক দেশে। তারা অনুভব করল নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক নির্দিষ্ট ধরনের কবিতা লিখছে, বলছে। তারা আরও প্রত্যক্ষ করল নির্দিষ্ট সংরূপের জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম বা প্রকার আছে। পরে অ্যারিস্টটল বললেন, মানুষের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক প্রবণতা আছে–সুর ও ছন্দ সহযোগে প্রকাশ করা। এই সুর ও ছন্দকে সামনে রেখে গ্রীক সাহিত্যেই প্রথম কবিতার একটা ফর্ম তৈরি হল 'Poetry'।

পরবর্তীতে এই 'Poetry' বা কবিতার আবার দুটি ফর্ম আমরা পাই—

Poetry
|

|　　　　|
Satire　　　　Eulogic

কবিদের পছন্দ, ভিন্ন মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে কবিরা আবার দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় — একদিকে যাঁরা সিরিয়াস, মহানকার্য, মহানব্যক্তিত্ব তাঁরা 'Satire'। অপরদিকে যাঁরা অপেক্ষাকৃত কম মহান তাঁরা 'Eulogic'-এর পর্যায়ে ভুক্ত হল। এইভাবে ভাগ করা শুরু হয়ে যায়।

অ্যারিস্টটল আরও এক ধাপ এগিয়ে এসে বললেন — **Epic** বা মহাকাব্যের কথা। তিনি প্লেটোর অনুকরণ তত্ত্বকে না মেনে 'ইলিয়াড'-এর কথা বললেন, এটি মহান কিন্তু এতে ট্রাজেডি আছে। আবার এতে সুর আছে, চরিত্রের মহত্ব আছে, এটি মিশ্র সংরূপ।

কাব্যের পরে এল **নাটকের** ধারা। গ্রিক দেশের পর রোমদেশ । ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৈপ্লবের সাড়া পড়ে এদেশে। মুদ্রণ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং এই যন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পরে লেখক যা লিখেছেন তা পৌঁছে যাচ্ছে সকলের কাছে। ফলত, অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া মানুষ শিক্ষিত হল, তারা তাদের মতো করে মত প্রকাশ করতে থাকল । উচ্চ ও উচ্চ থেকে কম মেধা সম্পন্ন লেখকেরাও উঠে এল প্রতিযোগিতার বাজারে। যার ফলশ্রুতিরূপে সৃষ্টি হল **উপন্যাস** নামক একটি নতুন ফর্ম বা সংরূপের।

উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত উপন্যাসের ফর্ম আসেনি; প্রথমে ছিল **কাব্য**—>**নাটক**—>**উপন্যাস**। এর পরে আসে — >**প্রবন্ধ**—>**ছোটগল্প** ইত্যাদি নানান সংরূপ। তবে পত্রগুলোকে কোন সংরূপের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়, তা নিয়ে বিস্তর গবেষণার প্রয়োজন আছে।

'জঁর' বা সংরূপকে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভাজন করা যেতে পারে। যেমন—নন্দনতত্ত্বগত ভাবে আবার সংস্কৃতিমূলক দিক দিয়ে ইত্যাদি। সংরূপের বিভিন্ন শ্রেণিগুলিকে নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে তুলে ধরা হল :

Genre
|

|　　|　　|
Fiction　Non Fiction　Poetry

কোনও রচনার স্বরূপ জানা থাকলে বলে দেওয়া যেতে পারে সেটি কি ধরনের সংরূপ। সেই অনুযায়ী বিভিন্ন আর্কিটাইপের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে খুঁজে বার করে সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। এখন রবীন্দ্রনাথের **'রাজর্ষি'** (১৮৮৭) উপন্যাস ও **'বিসর্জন'** (১৮৯০) নাটকের মধ্যে কিভাবে সংরূপ ধরা পড়েছে তা পর্যালোচনা করা যাক :

'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমাংশকে বিসর্জন নাটকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। উপন্যাসের পরবর্তী অংশের সুজা ইত্যাদির কাহিনী অনুপস্থিত। একটিমাত্র কেন্দ্রগত বিষয়কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠায় নাটকটি এমন এক ঘনীভূত ঐক্য ও সংহতি লাভ করেছে যে বিস্মিত হতে হয়। উপন্যাসে এই ঐক্য ও সংহতি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই রাজর্ষির সূচনায় বলেছেন, উপন্যাসের প্রেরণাস্বরূপ স্বপ্নলব্ধ কাহিনীটির -

"আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজার বিরোধ। কিন্তু মাসিক পত্রের পেটুক দাবি সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না। ব্যঞ্জনের পদসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হল।"[১]

উপন্যাসের দ্বিতীয়াংশের সুজা প্রভৃতির কাহিনী যেমন নাটকে প্রশ্রয় পায়নি, তেমনি নাটকে হাসি নেই, কেদারেশ্বর নেই। উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্র জয়সিংহ হয়েছে নাটকের নায়ক। বিসর্জনে নতুন চরিত্র চাঁদপাল, নয়ন রায় এবং এদের চেয়েও উল্লেখযোগ্য হল গুণবতী এবং অর্পনা চরিত্র। গুণবতী ও অর্পনা এই দুটি নবাগত নারী চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে দুটি নতুন নাটকীয় উপকরণ।

গুণবতীর প্রেম গোবিন্দমাণিক্যের সংকল্পের পথে, বিবেকসঙ্গত সিদ্ধান্তের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আর অপর্ণার প্রেম জয়সিংহকে অনুপ্রাণিত করেছে সেই বিবেকসঙ্গত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। অপর্ণা চরিত্রের সঙ্গে শুধু অপর্ণা আসেনি, এই নামকরণের মধ্য দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে অপর্ণাই দেবী ত্রিপুরেশ্বরী। গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে যখন বিবেকবোধ অপর্ণার কথাই জাগ্রত হয়ে উঠেছে তখন গোবিন্দমাণিক্যের বিশ্বাস হয়েছে এই সত্যবাণী কোন ভিখারিনী বালিকার নয়, এই বাণী স্বয়ং জগৎ মাতার। জয়সিংহের মনে নতুন জিজ্ঞাসা জাগাতে সাহায্য করেছে অপর্ণার প্রতি জয়সিংহের নবজাগ্রত প্রেম। এই প্রেমও নূতন উপকরণ–উপন্যাসে স্বভাবতই এই ভাবাবেক অনুপস্থিত ছিল। গুরুদেবের প্রতি আস্থা এবং অপর্ণার প্রতি ভালোবাসার বিরোধের সুযোগে রবীন্দ্রনাথ নাটকে দীর্ঘ দীর্ঘ স্বগতোক্তির মাধ্যমে জয়সিংহের দ্বিধাগ্রস্ত সংশয় আন্দোলিত মানসিক অবস্থা চিহ্নিত করেছেন। জয়সিংহের প্রেম নাটকেই প্রথম রূপায়িত হয়েছে; কিন্তু জয়সিংহের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যদিও নাটকেই এই প্রথম স্থান পায়নি, কিন্তু নাটকে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। রাজশক্তি এবং যাজকশক্তির মধ্যে ঐতিহাসিক বিরোধের যে কথা উপন্যাসে অনতিস্পষ্ট ছিল, নাটকে তা অতি তীব্র স্পষ্টতায় নানা জনের সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে। রঘুপতি সবচেয়ে তীব্রভাবে বলেছে—

এই বড়ো সর্বনাশ, রাজদর্প

ক্রমে স্ফীত হয়ে, করিতেছে অতিক্রম
পৃথিবীর রাজত্বের সীমা, বসিয়াছে
দেবতার দ্বার রোদ করি...। (১। ৪)

কাহিনী-চরিত্র-বিষয়গত পরিবর্তন ছাড়াও আছে ভাষাগত রূপান্তর এবং এই রূপান্তর কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। এই ভাষাগত পরিবর্তন দুই জাতীয়। প্রথমত, যেখানে রাজর্ষির গদ্য সংলাপকে বিসর্জনেও গদ্যে রাখা হয়েছে, যেমন- প্রজাবৃন্দের কথোপকথনে অথবা প্রজাবৃন্দের সঙ্গে অন্য চরিত্র গুলির কথোপকথনে। দ্বিতীয়ত, যেখানে রাজর্ষির গদ্য-সংলাপকে বিসর্জনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিবদ্ধ করা হয়েছে। রূপান্তরের বা সংরূপের বৈশিষ্ট্য নিদর্শন এর সাহায্যে দেখানো যেতে পারে :

প্রথমে গদ্য থেকে গদ্য সংলাপের রূপান্তরের একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

রাজর্ষি

রঘুপতি মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তবে তোরা দেখবি! আয়, আমার সঙ্গে আয়, অনেক দূর হতে অনেক আশা করিয়া তোরা ঠাকুরুনকে দর্শন করিতে আসিয়াছিস—চল একবার মন্দিরে চল।" (১৩)

বিসর্জন

রঘুপতি || তবে তোরা দেখবি? এইখানে আয়। অনেক দূর থেকে অনেক আশা করে ঠাকরুনকে দেখতে এসেছিস, তবে একবার চেয়ে দেখ। (৩। ১)

এই কথোপকথনে ক্রিয়াপদ পরিবর্তন ব্যতীত সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে উপন্যাস থেকে নাটকে গৃহীত হয়েছে। আবার যেখানে রাজর্ষির গদ্য সংলাপ বিসর্জনে পদ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে সংলাপের ভাষাগত আলোচনার ক্ষেত্রে সেই উদাহরণগুলি আরও বেশি কৌতুহলোদ্দীপক। যেমন—

রাজর্ষি

রাজা বলিলেন, “এ বৎসর হইতে মন্দিরে জীববলি আর হইবে না ।"

সভাশুদ্ধ লোক অবাক হইয়া গেল। রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের মাথার চুল দাঁড়াইয়া উঠিল। চোন্তাই (পুরোহিত) রঘুপতি বলিলেন, "আমি এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি !"

রাজা বলিলেন," না ঠাকুর, এতদিন আমরা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আজ আমাদের চেতনা হইয়াছে। একটি বালিকার মূর্তি ধরিয়া মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গেছেন, করুণাময়ী জননী হইয়া মা তাঁহার জীবের রক্ত আর দেখিতে পারেন না।"

বিসর্জন

গোবিন্দমাণিক্য || মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে
হইল নিষেধ।

নয়ন রায় || বলি নিষেধ ?

মন্ত্রী || নিষেধ !

নক্ষত্র রায় || তাই তো ! বলি নিষেধ !

রঘুপতি || এ কি স্বপ্নে শুনি ?
গোবিন্দমাণিক্য || স্বপ্ন নহে প্রভু। এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধরে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন
জীবরক্ত সহে না তাঁহার। (১। ২)

প্রথম রূপের তুলনায় দ্বিতীয় রূপ ভাষাগুনে, ছন্দোবদ্ধতার দরুন অধিকতর আবেগাধিক্য, শ্রেয়তর তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উপন্যাস শুরুর পূর্বে সাধারণত লেখকের একটা সূচনা বা ভূমিকা অংশ থাকে। 'রাজর্ষি' উপন্যাসেও প্রথমেই রয়েছে এই 'সূচনা' নামক অংশটি। কিন্তু নাটকে লেখক কিছু বলেন না, চরিত্রের উপরেই দায়িত্ব থাকে সব। 'বিসর্জন' নাটকে কোনও 'সূচনা' অংশ নেই সরাসরি চরিত্রনাম বা পাত্রগণের নাম দিয়ে শুরু হয়েছে। আবার উপন্যাস বিভাজিত থাকে খন্ড বা পরিচ্ছেদ দিয়ে। যেমন 'রাজর্ষি' উপন্যাসটি মোট ৪৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। কিন্তু নাটক যেমন বিভক্ত থাকে অংক বা গর্ভাঙ্ক দিয়ে ঠিক তেমনভাবেই 'বিসর্জন' নাটকটি মোট পাঁচটি অংকে ২০ টি দৃশ্যে বিভক্ত।

উপন্যাসের মধ্যে লেখক থাকেন। লেখকই উপন্যাসটিকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান। 'রাজর্ষি' উপন্যাসটির মধ্যেও তাই ঘটেছে। কিন্তু নাটকের মধ্যে লেখক থাকেন না। বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথন এর মাধ্যমে নাটকের শুরু, বিস্তার ও সমাপ্তি ঘটে; রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকটির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। উপন্যাসের ক্ষেত্রে চরিত্র বা সংলাপগুলি লেখক এর বিবৃতি দ্বারা পরিবেশিত হয়। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে গোবিন্দমাণিক্য, রঘুপতি, জয়সিংহ প্রভৃতি চরিত্র ও তাঁদের সংলাপগুলি লেখক এর বিবৃতিরই দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে চরিত্রই স্রষ্টা; লেখক এখানে অনুপস্থিত। 'বিসর্জন' নাটকে 'রাজর্ষি' উপন্যাসের একই চরিত্র একই কথা বলেছে; কিন্তু এখানে চরিত্রের সংলাপগুলি তাঁর নিজস্ব, আগে থেকেই সেই সম্পর্কে লেখক কিছু বলেন না। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের তুলনায় 'বিসর্জন' নাটকের মধ্যে অনেক চরিত্র কম আছে। উপন্যাসটির ক্ষেত্রে অতিস্বাধীনতা বা অতিবিস্তার আছে; মঞ্চের সঙ্গে এর কোনও যোগ নাই। অতিরঞ্জন বা অতিবিস্তার নাটকটির মধ্যে নেই সরাসরি মঞ্চের সঙ্গে যোগ আছে। আবার উপন্যাসটির মধ্যে অতিবিবৃতি বা অতিবিবরণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নাটকে কোনও বিবৃতি বা বিবরণ পরিলক্ষিত হয় না; শুধু সংলাপ। উপন্যাসে কোনও দীর্ঘ সংলাপ নেই ; কিন্তু 'বিসর্জন' নাটকটিতে দেখা যায় তুলনামূলকভাবে সংলাপগুলো দীর্ঘ।

'রাজর্ষি' উপন্যাসটিতে কোনও গান নেই । যদিও কোনও কোনও উপন্যাসে গান থাকে ; কিন্তু সেগুলি শ্লোক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। নাটকের মধ্যে গান একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বা সংরূপ। বিসর্জন নাটকটির মধ্যেও গানের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজর্ষি

উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে একটি 'উপসংহার' দিয়ে; কিন্তু 'বিসর্জন' নাটকটিতে কোনও উপসংহার নেই। নাটকটি মোট পাঁচটি অংকে কুড়িটি দৃশ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও 'বিসর্জন' নাটকের মধ্যে এইসব ভিন্ন ভিন্ন সংরূপ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হলেও যেক্ষেত্রে এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে তা হল —কাহিনী বা প্লট। প্লট বা কাহিনীই দুটো বিষয়কে একত্রে মালার মতো গ্রথিত করেছে।

তথ্যসূত্র :

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৃ. ১১৪
২) বিশী, প্রমথনাথ,রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ (পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ), ১৯৬৬, পৃ. ৩৫১
৩) সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৬, পৃ. ২৫৯
৪) গঙ্গোপাধ্যায়, অভীক, সাহিত্যের সংরূপ : পাশ্চাত্য প্রেক্ষিত, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৬১৮
৫) মণ্ডল, সঞ্জিৎ, সাহিত্যের নানাদিক, কবিতিকা, মেদিনীপুর, প্রথম প্রকাশ : ২০১৫, পৃ.২২

মধ্যযুগের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে নৌকা প্রসঙ্গ : পাঠভিত্তিক অন্বেষণ

রবিন রক্ষিত
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ : মধ্যযুগের প্রায় প্রত্যেক কবিই গ্রামীণ জনজীবনকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করায় তাঁদের কাব্য-কাহিনীর প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নিয়েছেন সেই গ্রামীণ জনজীবনকেই। ফলে তাঁদের লেখনীতে ধরা পড়েছে তৎকালীন নর-নারীদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপকরণ ও তাদের প্রয়োগ।কাহিনী প্রসঙ্গক্রমে এসেছে নদ-নদী, ডিঙি-নৌকা, মাঝি-মাল্লা, বৈঠা-পালের বৃত্তান্ত। মধ্যযুগের সাহিত্যে খাদ্য, পোশাক,বাসস্থানইত্যাদি প্রাকৃতিক উপকরণের পাশাপাশি নৌকা তথা জলযান সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য কবিরা সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন।বাংলার জলজ সমভূমিতে এক অঞ্চলের মানুষজনের অন্য অঞ্চলের মানুষজনের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এসব জলজ উপকরণের ব্যবহার অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কাব্যে এসব জলযান ও মাঝি-মাল্লার বারংবার উল্লেখ থেকে বোঝা যায় নৌ-বিহারে তৎকালীন বাঙালিরা যথেষ্ট দক্ষ ছিল।তবে শুধুমাত্র মধ্যযুগেই নয়, প্রাচীন যুগেও এই জলজ উপকরণের প্রসঙ্গ অল্পবিস্তর উঠে এসেছে।মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছরের সময় পর্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, পদাবলী সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, লোক সাহিত্য ধারায় প্রচুর সাহিত্য রচিত হয়েছে।' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'নৌকা খন্ডে,' মনসামঙ্গলে' চাঁদ সদাগর প্রসঙ্গে, 'চন্ডীমঙ্গলে'ধনপতি ও শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রায়, শিবায়নে শিব প্রসঙ্গে, আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যের তিনটি খন্ডে এছাড়া 'মৈমনসিংহ' গীতিকাতেও অল্পবিস্তর নৌকা তথা জলজ উপকরণের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। আবার প্রাচীন ও মধ্যযুগে যেমন তেমনি আধুনিক যুগের লেখকরাও নৌকা কেন্দ্রিক গল্প, উপন্যাস, কবিতা রচনা করেছেন।

সূচকশব্দ : জনজীবন, নদ-নদী, ডিঙি-নৌকা, ভেলা, হাল, বৈঠা-পাল, মাঝি-মাল্লা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ হল দেববাদের ঘোষণা ও ভক্তিরসের প্রচার।দেব-দেবীর মহিমা প্রচারের জন্য মধ্যযুগের সাহিত্য রচিত হলেও ধর্মের পাশাপাশি এখানে জায়গা করে নিয়েছিল মানুষ।ফলে স্বর্গের দেব-দেবীরা মর্ত্যের নর-নারী রূপে তাঁদের প্রেম-প্রীত, সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, অভাব-অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন ও সাধারণ নর-নারীর মতো আচরণ করেছেন। কবিদের লেখনীতে ধরা পড়েছে সেইসব নর-নারীর দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপকরণ ও তার

প্রয়োগ বৈচিত্র্য। অধিকাংশক্ষেত্রে কবিরা গ্রামীণ জনজীবনকে কাব্য-কাহিনীর প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নিয়েছেন।কাহিনীর প্রসঙ্গ হিসেবে এসেছে নদ-নদী, ডিঙি-নৌকা, মাঝি-মাল্লা, বৈঠা-পালের বৃত্তান্ত। নদীমাতৃক বাংলার জলজ সমভূমিতে এগুলো সেকালের লোকায়ত জীবনের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিল।নদ-নদী, খাল-বিল সন্নিহিত অঞ্চলের মানুষজনের কাছে পৌঁছানোর জন্য এসব উপকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এসব প্রত্যক্ষ উপকরণকে সাহিত্যে ব্যবহার করতে কবিদের কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি।কাব্যে এই জলযান ও মাঝি-মাল্লা-আরোহীদের বারংবার উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে নৌ-বিহারে বাঙালিরা যথেষ্ট দক্ষ ছিল। "আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার চূড়ান্ত যুগে মানুষ যেখানে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটে চলেছে, রেলপথ সড়কপথের ব্যাপক বিস্তার তথা বিজ্ঞানের চরমবিকাশে পৃথিবী যেখানে হাতের মুঠোয় বন্দি, সেই সময় দাঁড়িয়ে প্রায় প্রাচীনকালের মানুষবাহিত জলযান অর্থাৎ নৌকার প্রসঙ্গ উত্থাপন আপাতভাবে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হলেও যে দেশে তাম্রলিপ্তের মতন বন্দর ছিল,যার প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য সর্বত্র নৌযানের উল্লেখ বর্তমান, যে দেশে মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে রীতিমতো মিথে পরিণত হওয়া বেহুলা স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে স্বর্গযাত্রার একমাত্র মাধ্যমরূপে বেছে নেয় ভেলাকে, সেই দেশে বোধ হয় নৌযান তথা নৌশিল্পের ঐতিহ্যকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনে, দর্শনে, এমনকী সাহিত্যে, আধ্যাত্মিক চিন্তাতেও নৌযানের অবস্থান প্রত্যক্ষ করা যায়।"[১] জলযান ও যাত্রাকে কবিরা কেবল উপকরণ হিসেবেই নয়, কখনো কখনো আলংকারিক তাৎপর্যেও ব্যবহার করেছেন।মধ্যযুগের পূর্বে প্রাচীন যুগে চর্যাকাররা বিভিন্ন পদে এই নৌযাত্রাকে প্রতীকী হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পদকর্তা ডোম্বীপা 'গঙ্গা জউণা মাঝেরে বহই নাই'[২]-১৪ নং চর্যার এই পদটিতেগঙ্গা-যমুনার মাঝে এক নৌকা বাহিত হয় তাতে চড়ে ডোমনী মেয়ে অবলীলায় পার করে।বস্তুত এই পদটিতে সহজানন্দরূপিণী নৈরাত্তাকে মাতঙ্গকন্যা খেয়া-পাটনী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। "মরমী গীতগুলির বহিরঙ্গ বর্ণনায় পূর্বভারতীয় প্রাকৃতিক বর্ণনা এবং তৎকালীন নর -নারীর জীবনের ও এই অঞ্চলের মানবসমাজের নানা চিত্র ফুটে উঠেছে। মনে হয়, তখনো গ্রামীণ সমাজ ছিল মুখ্যত কৃষিভিত্তিক। গ্রামগুলি অধিকাংশ নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল।যাতায়াতের মুখ্য বাহন ছিল নৌকা। এই নৌকার হাল, লগি, গলুই, পাল, গুণ, নোঙর প্রভৃতি নানা অংশের বর্ণনা চর্যাগীতে পাওয়া যায়। নৌকা চালানোর কিছু পদ্ধতিও বর্ণিত হয়েছে।"[৩] মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছরের সময় পর্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, পদাবলী সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, লোক সাহিত্য ধারায় প্রচুর সাহিত্য রচিত হয়েছে।উল্লিখিত রচনাগুলির প্রায় প্রত্যেক ধারাতেই কম-বেশি নৌকা তথা জলজ উপকরণের প্রসঙ্গ অল্পবিস্তর উঠে এসেছে।

আদি-মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' আলোচ্য প্রসঙ্গটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাক প্রথমে।পুরাণের পটভূমিকায় কৃষ্ণ চরিত্র রচিত হলেও এখানে পুরাণ ও লৌকিক ভাবধারার সমন্বয় ঘটিয়েছেন কবি বড়ু চণ্ডীদাস।দেবতা কৃষ্ণকে তিনি করে

তুলেছেন গ্রামীণ যুবক। কাহিনী বয়ন, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, রচনা প্রকরণ, পরিবেশন পদ্ধতি সবকিছুর মধ্যেই যেন কবির লোকরুচির প্রতি আনুগত্য চোখে পড়ে। আলোচ্য নৌকার প্রসঙ্গ 'দানখন্ডে' সামান্য থাকলেও তা ব্যাপকতা পেয়েছে কিন্তু 'নৌকাখন্ডে'। কৃষ্ণের অসংস্কৃত মনোভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাঙালি কবি বড়ু চণ্ডীদাস নৌকাখন্ডের কাহিনীকে রচনা করেছেন। কাব্যের প্রথম থেকেই কামুক কৃষ্ণ বিবাহিতা রাধার প্রতি লুব্ধ।গোয়ালিনী রাধা যেহেতু দুধ-দই বিক্রয়ের জন্য সখীদের সঙ্গে মথুরায় যায় তাই কৃষ্ণ যমুনার জলমধ্যে রাধার সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হবার জন্য নিজের পছন্দমতো নৌকা বানিয়ে ঘাটে মাঝি হয়ে অপেক্ষা করে। কবি এ খন্ডে কৃষ্ণের নৌকা নির্মাণ কৌশল অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।কবি জানিয়েছেন -

"নাঅ গঢ়ায়িল কাহ্নাঞি গুণিআ হৃদয়ে।
দুঈ ছাড়ী তীন জন জাত নাহি জাএ।।"[৪]

তবে কৃষ্ণ এর সঙ্গে আর একটি বড় নৌকাও নির্মাণ করে।সেটিকে সে সবার অলক্ষে যমুনার জলে ডুবিয়ে রাখে। "নৌকাখন্ডে নৌনির্মানের সবখানি দায় নিজেই নিয়েছেন কৃষ্ণ। সাধারণত সূত্রধরদের কাজ এটি। বাংলায় নমঃশূদ্র 'বাড়ৈ'পদবিধারী মানুষরা নৌনির্মানের দায়িত্ব নিতেন। পশ্চিমবঙ্গে সূত্রধরের বৃত্তি নিয়ে থাকেন বাগদি ও অন্যান্য নিম্নবর্গের শ্রমজীবীরা। কখনো তারা মুসলমান।গেওখালি-নুরপুরের নৌ-নির্মাণ শিল্পে যুক্ত থাকেন মুসলমান বা হিন্দু ভাবাপন্ন পর্তুগিজরা। শেষোক্তজনগোষ্ঠী ছিলেন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী - এখনো কেউ কেউ গির্জায় যান।তবে অধিকাংশই মাহিষ্য বলে আত্মপরিচয় দেন। এরা নৌকা তৈরি করেন। এ থেকে মনে হয় এই শ্রমসাধ্য শিল্পকর্মটি ব্যক্তিগত ছিল না - ছিল গোষ্ঠীর বৃত্তি। বড়ু চন্ডীদাস এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় রাখতেন বলে মনে করার কারণ আছে।তিনি কৃষ্ণকে দিয়ে নৌকা নির্মাণে গোষ্ঠীর সমবেত কাজটিকে একক কৃত্যে পরিণত করেছেন।"[৫]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের ধারা একটি বিশিষ্ট ও বলিষ্ঠ ধারা। বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ, এখানকার মানুষজন, তাদের জীবনযাত্রা মঙ্গলকাব্যে যতটা নিখুঁতভাবে জায়গা পেয়েছে বাংলা সাহিত্যের আর কোনো শাখাতে তার তুলনা চোখে পড়ে না। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলোও পল্লীবাংলার নদী-মাঠ-ঘাট কেন্দ্রিক। বিশেষ করে এজন্যই মঙ্গলকাব্যে আলোচ্য নৌকা-মাঝি-ঘাটের প্রসঙ্গ তুলনামূলকভাবে বেশি চোখে পড়েপ্রধানত মনসামঙ্গলে ও চন্ডীমঙ্গলে। এ দুই মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে নৌবহর সাজিয়ে দূরে সমুদ্রে পাড়ি জমানোর ক্ষেত্রে বণিক জাতিকে ঘটনার কেন্দ্র বিন্দুতে রাখা হয়েছে। বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের 'মনসা জন্ম পালায়' দেখা যায় নারদের পরামর্শে শিব সরযূর দক্ষিণ কূলে রম্য স্থান দেখতে যাবে চণ্ডীকে না জানিয়ে। নন্দীকে সঙ্গে করে শিব বৃষে চড়ে সরযূর কূলে এসে খেয়ানীকে উচ্চস্বরে ডাকে। কবির বর্ণনায় -

" কালুয়া ডোমের নারী গৌরী নাম তার।

খেয়া নাও পাতিয়া শিবের করে পার ।।"[৬]

ডোম নারীর খেয়া পারাপারের মধ্য দিয়ে কবি সেকালের নারীদের বলিষ্ঠতা তথা আত্মনির্ভরতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। আবার এ কাব্যে নায়ক চাঁদ সদাগর চৌদ্দ ডিঙা সাজিয়ে চলেছেন বাণিজ্যে। তাঁর লক্ষ্যস্থল দক্ষিণ পাটন।কবি চাঁদের চৌদ্দ ডিঙার নাম ও তাদের বর্ণনা দিয়েছেন আকর্ষণীয়ভাবে। সবার আগে চলেছে মধুকর,যে নৌকার আরোহী স্বয়ং চাঁদ সদাগর। কবি লিখেছেন -

" প্রথমে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
সেই নায় চলিল লক্ষের সদাগর ।।"[৭]

তারপর একে একে বিজু-সিজু, গুয়া রেখি, ভারাড়-পাটুয়া, শঙ্খচূড় এমনি করে সবশেষে রয়েছে আজেলা-কাজেলা। কাব্যের 'বস্তুবদল' পালায়দেখা যায় এই চৌদ্দ ডিঙাতে সদাগর বিভিন্ন দ্রব্য সমূহ ভরেছিল -

"একে একে চোদ্দ ডিঙ্গা সকল ভরিল।
মনে মনে সদাগর আনন্দে ভাসিল ।।"[৮]

আবার বেহুলা তার মৃত স্বামীর প্রাণ ফেরানোর জন্য কলার মান্দাস ব্যবহার করে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা জয় করতে।

কবি মুকুন্দের 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের ‘বণিক খন্ডে’ সমুদ্রযাত্রার দুটি প্রসঙ্গ রয়েছে। একটির যাত্রী ধনপতি, অন্যটির শ্রীপতি বা শ্রীমন্ত।ধনপতির বাণিজ্যতরীগুলি নিমজ্জিত আছে ভ্রমরার জলে। দক্ষ ডুবুরি দিয়ে সেগুলি তুলিয়ে আনেন ধনপতি।এখানে ধনপতির সাতটি ডিঙার কথা জানা যায়, এগুলি হল- মধুকর, দূর্গাবর, শঙ্খচূড়, চন্দ্রপাল, ছোটমুটি, গুয়ারেখী ও নাটশালা। এদের আবার আলাদা আলাদা বিশেষত্ব রয়েছে। কবির বর্ণনায় -

"সাত খান ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে।
গোঁজে বান্ধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে।।"[৯]

ধনপতিভ্রমরার ঘাটে এসে আরাধ্য দেব শিবকে স্মরণ করে নৌকায় আরোহণ করেন।

"ছৈঘর চাপিয়া বসিলা সদাগর।
হাতে দণ্ড কেরোয়াল বসিল গাগর।।"[১০]

কিন্তু চণ্ডীর নির্দেশে হনুমান ধনপতির মধুকর ছাড়া বাকি ছয় ডিঙ্গা মগরার জলে ডুবিয়ে দেয়। ফলস্বরূপ ধনপতিকে প্রচন্ড বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়। আবার শ্রীমন্তের কোনো পুরনো নৌকা ছিল না। সে তার মাকে সিংহল গমনের কথা বলেন -

"বাপের উদ্দেশ্য আশে   চলিব সিংহল দেশে
সাত ডিঙ্গা করিয়া সাজন।"[১১]

তাই তার নৌকা যাত্রার কথা শুনে দেবী চণ্ডী পদ্মার সঙ্গে যুক্তি করে বিশ্বকর্মাকে ডিঙ্গা নির্মাণ করতে আদেশ দিলেন। একাজে বিশ্বকর্মার সহায় হন তাঁর পুত্র ও বীর হনুমান। তাঁরা চার প্রহর রাত্রির মধ্যে ডিঙ্গা নির্মাণ করেন। ডিঙ্গাগুলি হল - মধুকর,

সিংহমুখী, গুয়ারেখী, রণজয়, রণভীমা, সর্বধরা, নাটশালা।শ্রীমন্ত সিংহলরাজের কাছে এসে কালিদহে কমলে কামিনী দর্শনের কথা বলেন। ফলে সিংহলরাজ তা দেখার জন্য কালীদহে উপনীত হন। শ্রীমন্তর কথা মতো রাজা সাক্ষ্যস্বরূপ কর্ণধারের কাছ থেকে এ বিষয়ের সত্যতা যাচাই করতে চাই। কিন্তু কর্ণধার রাজার কথায় ধর্মের ভয়ে বলেন সে কমলে কামিনী চোখে দেখেনি তবে কানে শুনেছেন। এরপর রাজার কথা মতো শ্রীমন্তকে বেঁধে তার ডিঙ্গা লুঠ করা হয়। এরপর অসহায় নাবিকেরা রোদন শুরু করে দেয় -

"কান্দেরে বাঙ্গাল সব বাফোই বাফোই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই ।।"[১২]

মধ্যযুগের কবিরা কৈলাসবাসী শিবকে মর্ত্যের মাটিতে এনে তাঁকে দিয়ে অনেক লৌকিক কর্ম করিয়েছেন।যার মধ্যে অন্যতম নৌকার হাল টানা।'শিবায়ন'কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যে দেখালেন কৃষক শিবের সঙ্গে মাঝি শিবকে।একাব্যের 'শঙ্খ পরিধান' পালাতে দেখা যায় দেবী পার্বতী শাঁখা পরতে চাইলে শিব ভর্ৎসনা করেন।ক্রুদ্ধা পার্বতী এরপর পিত্রালয়ে চলে যান। শিব নারদের পরামর্শে পার্বতীকে ছলনা করতে মায়ানদী সৃষ্টি করে বৃদ্ধ মাঝির ছদ্মবেশে ধারণ করেন। কবি রামেশ্বর লিখেছেন -

" ঈশ্বরী আসন কইরা বসিলেন নায়।
ত্রিলোচন বায় তরি তর তর যায়।।"[১৩]

কিন্তু কর্ণধার শিব যে নৌকা তৈরি করেন তা নতুন নয়।কবির বর্ণনায় -

"ভয় হয় ভাঙ্গা নায় ভইরা আল্য জল।
ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা যায় রসাতল।।"[১৪]

আবার 'অন্নদামঙ্গলে' পাওয়া যায় ঈশ্বরী পাটনির কথা।দেবী অন্নদা যার সাহায্য নিয়ে গঙ্গা পেরোতে চায়।দেবীকে কাছে পেয়ে মনোনীত বর চাওয়ার সুযোগ পেয়েও ঈশ্বরী পাটনি চেয়ে বসলেন নিরন্ন বাঙালির আকাঙ্খা দুধ-ভাত।

কৃত্তিবাসী 'রামায়ণে'পাওয়া যায় অরণ্যবাসী রাম-সীতা-লক্ষণের গুহক চণ্ডালের সোনার নৌকায় চড়ে গঙ্গা নদী পেরিয়ে চিত্রকূট পৌঁছানোর কথা।আবার বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে'পাওয়া যায় শ্রীচৈতন্যের সাগর পাড়ি। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র উপকূল থেকে নৌকায় উঠে নেমেছিলেন উড়িষ্যার শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে।

আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যের রত্নসেন বিদায়, দেশযাত্রা ও পদ্মা-সমুদ্র খন্ড তিনটিতে জলযান ও জলযাত্রার স্বল্প কিছু বিবরণ মেলে।চিতোরের রাণা রত্নসেন সিংহলে গিয়ে রূপসী পদ্মাবতীকে লাভ করার পর স্ত্রী ও তার সখীদের সঙ্গে করে সমুদ্র পথে নৌকাযোগে ফিরছিলেন।সেসময় সমুদ্র ব্রাহ্মণবেশে তার কাছে দানভিক্ষা করলে রাজা না জেনে উদ্ধতভাবে ব্রাহ্মণরূপী সমুদ্রকে অপমান করেন। ক্ষিপ্ত সমুদ্র ঝড় তুফানের সৃষ্টি করেন। রাজা তখন নিরঞ্জনের শরণ নেন। অবশেষে মাঞ্জসের সাহায্যে

বিপন্ন রত্নসেন, পদ্মাবতী ও তার সখীরা রক্ষা পাই।সমুদ্ররাজা ও সমুদ্রকন্যার কাছ থেকে তারা বিদায় নিয়ে নৌকা করে ফিরে আসে।কবি আলাওলের বর্ণনায় -

" সমুদ্ররাজারে নৃপ করিয়া ভকতি।
হরষিতে নৌকাতে চলিলা নরপতি।।
গলাগলি দুই সই কান্দিলা বিস্তর।
পদ্মাবতী উঠিলেক নৌকার উপর।।"[১৫]

'মৈমনসিংহ' গীতিকা গুলিতেও অল্পবিস্তর নৌকা প্রসঙ্গ এসেছে। 'দেওয়ান ভাবনা পালাতে' দেখা যায় সুনাইয়ের বিপদের কথা দূতীর মাধ্যমে জানতে পেরে মাধব তাকে সন্ধ্যাবেলা জলের ঘাটে আসতে বলে। যাতে নৌকায় করে তাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে।এদিকে আবার দেখা যায় কেয়াবনের আড়ালে দেওয়ান ভাবনার নৌকা আগে থেকেই বাঁধা ছিল। সুনাইকে সেই নৌকায় জোর করে তুলে নেওয়া হয়।সুনাই দেওয়ান ভাবনার নৌকায় বসে উচ্চস্বরে বিলাপ করতে থাকে। ওদিকে মাধবও নৌকা নিয়ে আসছিলেন-

"কিসের লাগ্যা কান্দ কন্যা পানসীতে বসিয়া।
নৌকা হইতে মাধব তারে কয় ডাক দিয়া।।"[১৬]

সুনাইয়ের বিলাপ শুনে সে দেওয়ান ভাবনার নৌকা আক্রমণ করে এবং মাঝি-মাল্লাকে মেরে সুনাইকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। আবার মাধব যখন শোনে তার বাবাকে দেওয়ান ভাবনা বেঁধে নিয় গেছে তখন সে নৌকা সাজিয়ে বাবাকে উদ্ধার করতে যায়।-

"আষাঢ় মাসেতে নদী কূলে কূলে পানি।
বাপেরে আনিতে মাধব সাজায় পানসী খানি।।"[১৭]

এভাবেই মধ্যযুগের সাহিত্যে বিভিন্ন শাখাতে নৌকা তথা জলযান প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। কিন্তু আদি বা মধ্যযুগেই শুধু নয়, বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগেও নৌকা কেন্দ্রিক বিভিন্ন কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচিত হয়েছে কখনো রূপকার্থে, কখনোবা প্রকৃত অর্থে।যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ, 'নৌকা ডুবি' উপন্যাস। রয়েছে মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস, অদ্বৈত মল্লবর্মণের মালোদের জীবনকেন্দ্রিক 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস। এ উপন্যাসে দেখা যায় মালো সম্প্রদায়ের কাছে মাছ ধরার সামগ্রী হিসেবে জালের পাশাপাশি সমান গুরুত্ব রয়েছে নৌকারও। "নৌকা এখানে কেবলমাত্র মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়নি। নৌকা ব্যবসার মালপত্র বহনের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। ... নৌকা আবার এ উপন্যাসে চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। নৌকাবাইচ লোকায়ত জীবনের অন্যতম আনন্দানুষ্ঠান।"[১৮]

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, লোকজ শিল্প, পারুল, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১১, পৃ:

২. দাশ, ড.নির্মল, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ জুন ২০১৭, পৃ. ১৫৬
৩. সেন, নীলরতন, চর্যাগীতিকোষ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ: ৪৬
৪. রায়, বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ৫৫
৫. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যকথা, বিদ্যা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪২১, পৃ: ৫৭০
৬. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বই পত্র, কলকাতা, আগস্ট ২০১৭, পৃ. ৯৮
৭. তদেব , পৃ. ২২৫
৮. তদেব, পৃ. ২৩৮
৯. আচার্য্য, দেবেশকুমার, কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ৭৫
১০. তদেব, পৃ. ৭৮
১১. তদেব, পৃ. ১০১
১২. তদেব, পৃ. ১৩১
১৩. হালদার, শ্রীযোগিলাল, রামেশ্বরের শিব-সংকীর্তন বা শিবায়ান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ২০১২, পৃ.২৯৫
১৪. তদেব
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, পদ্মাবতী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ.২৫৫
১৬. সেন, দীনেশ চন্দ্র, মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২, পৃ.২৪৪
১৭. তদেব
১৮. বিশ্বাস, মিলনকান্তি, অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪ পৃ: ৯৯

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত তৃতীয় খন্ড, কলকাতা, সংস্করণ ২০১৮ - ২০১৯
২. চৌধুরী, শ্রীভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা প্রথম পর্যায়, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, সংস্করণ ২০১৫
৩. ভট্টাচার্য, শ্রীআশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জি অ্যান্ড কং প্রা লি, কলকাতা, সংস্করণ ২০০৯

৪. রায়, কবিশেখর কালিদাস, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটরস, কলকাতা, সংস্করণ ২০১৬

৫. মুখোপাধ্যায়,সুখময়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ভারতী পাবলিশার্স, কলকাতা

৬. করণ, সুধীরকুমার, সীমান্ত বাংলার লোকযান, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৩

৭. মজুমদার, নীহার, এবং বাংলার লৌকিক জলযান, আত্মজা পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭

৮. দাশ, ড.নির্মল, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ জুন ২০১৭

৯. গোস্বামী, ড.কৃষ্ণপদ, চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, সংস্করণ ২০০২

১০. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বই পত্র, কলকাতা, সংস্করণ ২০১৭

১১. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, শ্রীকৃষ্ণীর্তন কাব্যকথা, বিদ্যা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১৪

১২. হালদার, শ্রীযোগিলাল, রামেশ্বরের শিব-সংকীর্তন বা শিবায়ান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, সংস্করণ ২০১২

১৩. বন্দোপাধ্যায়, দেবনাথ, পদ্মাবতী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০২

১৪. আচার্য্য, ড.দেবেশকুমার, কবি মুকুন্দের চন্ডীমঙ্গল দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৪

১৫. সেন, দীনেশচন্দ্র, মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৯

১৬. মুখোপাধ্যায়, শ্রী নির্মলেন্দু,ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, সংস্করণ ২০১৩ - ২০১৪

হুগলী জেলার মগরা অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সুকৃতি চক্রবর্তী
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার একটি গ্রাম পঞ্চায়েত মগরা। এখানে হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের একটি রেলস্টেশন আছে, যেটি হাওড়া স্টেশন থেকে ৪৭ কিমি ও ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে ৭ কিমি দূরে অবস্থিত। এই মগরার একটি ইতিহাস আছে, যা এই প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

সূচকশব্দ : মগরা, কুন্তীনদী, গোলাঘর, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে, শিক্ষা, মগরা সাধারন পাঠাগার, মগরার সরস্বতী পূজা।

প্রাক্ স্বাধীনতা বা স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও আমাদের দেশের অসংখ্য গ্রামগঞ্জ কেউবা শহরের রূপ পরিগ্রহ করেছে, কেউবা এখনও বিস্মৃতপ্রায় স্বল্পগৌরব বুকে নিয়ে স্থানীয় মানুষের কাছে বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষনিকের দীপ্তি সৃষ্টি করে। "আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে, / দেখা দেয়, মিলায় পলকে।" মগরা'র অবস্থান বাংলার অসংখ্য জনপদের মধ্যে 'সিন্ধুতে বিন্দু মাত্র'। তা সত্ত্বেও মগরার একটি গুরুত্ব আছে। এর উত্তরদিকে সপ্তগ্রাম, পূর্বে ত্রিবেণী। পাল বংশের আদি পুরুষদের বাসস্থান 'পোলবা' এবং 'মহানাদ' মগরার কাছেই অবস্থিত।

সাধারণত কোন একটি স্থানের নামকরণ জনশ্রুতি, অবস্থান ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। মগরার নামকরণের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আরাকান রাজ্যের মগ দস্যুরা বাংলার গ্রামগুলিতে হানা দিয়ে নারী-পুরুষদের চট্টগ্রাম, হুগলী, পিপলির দাস বাজারে বিক্রি করত। এখানে এদের আস্তানা ছিল জি.টি.রোডের পশ্চিম পাড়ে। সেই থেকেই 'মগরা' নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। আরেকটি মতানুসারে, গঙ্গাবাহিনীর আরেকনাম হল মকরবাহিনী। এই অঞ্চলটি যেহেতু গঙ্গা বা ভাগীরথীর সাথে সম্পর্কিত তাই 'মকর' থেকে 'মগর', পরে হয় 'মগরা'। আবার অন্য আরেকটি মতানুসারে, বর্ধমানের একজন দয়াশীলা রাণী মগরা নাম্নী ব্যবসাবানিজ্যের সুবিধার্থে 'মগরা খাল' কাটেন। যার তীরেই গড়ে উঠেছে 'মগরা'। *কবিকঙ্কন চন্ডী* তে বর্ণনা আছে শ্রীমন্ত সওদাগর যেখানে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পড়েছিল সেখানে "নদী জলে বৃষ্টি জলে উথলে মগরা / কুল জুড়ে বহে জল একাকার ধরা।[১] আবার কবি বলেছেন "চারিদিকে জল, হইয়া ধবল, / মগরা জুড়িয়া ফেনা।"[২] স্বদেশ যাত্রা করে ফেরবার সময় শোকে বিহ্বল ধনপতি মগরার জলেই প্রাণ বিসর্জন দেন-"এত বলি সদাগর করে আত্মঘাতী / মগরার জলে ঝাঁপ দিল ধনপতি।"[৩] অনেকে মনে করেন এই মগরা থেকেই এই অঞ্চলের

নামকরন হয়েছে। কিন্তু তখন মগরায় এত জল ছিল বলে মনে হয় না। এই মগরা মোহনার কাছাকাছি কোন স্থান হবে।

দামোদরের শাখানদী কুন্তী মগরার ইতিহাস রচনা করেছে। জামালপুরের সেলিমাবাদের কাছে ইডেন খাল অঞ্চল থেকে দামোদরের তিনটি প্রবাহ ছিল-দক্ষিণ পূর্বে কানা দামোদর, পূর্বে কানা নদী ও ঘিয়া। এই কানা নদী পরবর্তীকালে কুন্তী নাম নিয়ে কুন্তীঘাটে গঙ্গার সাথে মিশেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দামোদর আবার দিক পরিবর্তন করে ঘিয়া-কুন্তী-কানা দামোদর দিয়ে বহমান হয়। ছোট ছোট জাহাজ আবার মগরা ঘাটে এসে নোঙর করতে শুরু করে। কুন্তীর এই পুনরুত্থান মগরার ইতিহাসের সূচনা করে। ৮০ কিমি দীর্ঘ নদীটি উৎসমুখ থেকে গোপালনগর পর্যন্ত 'কানানদী', সপ্তগ্রামের কাছাকাছি পর্যন্ত 'কুন্তী', তারপর ভাগীরথী পর্যন্ত 'মগরা খাল' নামে পরিচিত। সুকুমার সেনের মতে "ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলার নিরুদ্দেশ-যাত্রা পথে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে সেগুলি সবই আধুনিক বর্ধমান জেলার মধ্যে পড়ে এবং সেসবই দামোদরের পূর্বতন প্রবাহপথের-যখন আঁকিয়া বাঁকিয়া দামোদরের প্রধান প্রবাহ বর্ধমান হইতে উত্তর-পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়া মগরা-ত্রিবেণী-কালনা অঞ্চলে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত-যে প্রবাহপথের চিহ্নাবশেষ বাঁকা-বেহুলা-বল্লুকা-গাঙুরের তীরে অবস্থিত।"[৪]

মগরার অধিকাংশ স্থানগুলি এক সময়ে নদীবক্ষ, নদীখাত ও নদীর বাঁধ ছিল। যেমন: মগরা স্টেশনের ওপারে অবস্থিত জাঙ্গালপাড়া- 'জাঙ্গাল' শব্দের অর্থ হল বাঁধ, বাড়োল- যার অর্থ বালুকাময় নদীর উঁচু তীর, ছিনে আকনা বা ছিন্নঙ্কনা- যেখানে গ্রাম তীরবর্তী কোন উঁচু বাঁধ বা রাস্তা ভেঙে পড়েছিল, জামাই জাঙ্গাল- জামাইয়ের জন্য বাঁধ। মগরায় জয়পুর, বাগাটি, কোলা, গজঘন্টা গ্রামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রামগোপাল ঘোষের পিতৃভূমি বাগাটি। পদবী 'বাগ' থেকে বাগাটী, আবার বাঘ আসতো বলে 'বাঘাটি', পরে উচ্চারণ ভেদে 'বাগাটি'। রাজনারায়ন বসু নিজে এই গ্রামে এসেছিলেন এবং তাঁর আত্মচরিতে লেখা আছে 'বাঘাটি'।[৫] বাগাটীর নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং দুর্গাদাস ভট্টাচার্য রামগোপাল ঘোষের জন্মভিটে বাগাটীতে তাঁর স্মৃতিফলক নির্মাণের জন্য জমি দান করেন এবং ১৯৫৩ সালে স্মৃতিফলক নির্মিত হয়।

কোম্পানির সাহেবরা বাংলার তাঁতের কাপড় রপ্তানি করতো মগরা ঘাট দিয়ে। পরে কাপড় ছাড়াও এখান থেকে পিতল, ধান, পাট ইত্যাদি রপ্তানি হবার দরুণ আড়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। গড়ে ওঠে হুগলীতে কোম্পানীর বানিজ্য কুঠি-গোলাঘর (মগরা) এবং হরিপালে। গোলাঘরে কোম্পানির গোমস্তারা তাঁতিদের অগ্রিম দাদন দিয়ে তসর, গরদ ও সুতোর কাপড় বুনিয়ে নিতো। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েকটি অঞ্চলের উচ্চতার ফলে বড়বড় নৌকাগুলো কুন্তী দিয়ে মগরায় আসতো। যেমন: ধনিয়াখালি-৪২.৫ ফুট, হরিপাল- ৩০.৫ ফুট, চুঁচুড়া-২৮.৫ ফুট, মগরা-২৬.৫ ফুট।[৬] ফলে নাবিকদের আনাগোনায় মগরাগঞ্জ গমগম করতো। মগরাতে ১৮৩৫ সালে গোলাঘর উঠে যায়। এর দরুণ বাড়োল গ্রামে ফেরিস, ব্যাপারীদের মাধ্যমে ধানের আড়তগুলো থেকে পণ্য

আদান-প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৮৫৬ সালে বাড়োলে ভয়ঙ্কর ডাকাতি হলে এবং নদী আগের থেকে ছোট হয়ে যাওয়ায় বড় নৌকা চলাচলে অসুবিধা হওয়ায় ব্যবসায়ীরা বাড়োল থেকে উঠে এসে জি.টি.রোডের ধারে আশ্রয় নেয়। জি.টি.রোডের উপর লোহার সেতু থাকায় যোগাযোগের কোন অসুবিধা ছিল না এবং এখানে পুলিশ ফাঁড়ি থাকায় জায়গাটি ছিল নিরাপদ। ধীরে ধীরে মগরাগঞ্জে ব্যবসায়ীরা বসবাস করতে শুরু করে এবং রাইস মিল গড়ে ওঠে। মগরায় মন্মথ ঘোষ, পঞ্চানন দাসের পূর্বপুরুষরা আসেন গজঘন্টা থেকে, বিজয়কৃষ্ণ দে, জয়দেব শো'র পূর্বপুরুষরা আসেন কোলা, জামাগ্রাম থেকে।[৭]

হুগলীতে স্বদেশী জাগরণের প্রথম সুরটি শোনা যায় ভারতীয় মূলধনে তৈরী বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এই রেলপথের প্রথম পরিকল্পনা করেন অন্নদাপ্রসাদ সিংহ। তাঁর পরিকল্পনায় উৎসাহিত হয়ে যোগদান করেন অমৃতলাল রায়, রামচন্দ্র বসু। ১৮৮৯ সালের ৩রা জুন প্রথম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয় বি.পি.আরের প্রস্তাবক অন্নদাপ্রসাদ সিংহরায় এবং এজেন্ট অমৃতলাল রায়ের নামে। এই রেলপথ তৈরির জন্য একটি যৌথ স্টক কোম্পানি 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কোম্পানি লিমিটেড' খোলা হয়। ১৮৯৫ সালের ২রা এপ্রিল মগরা-তারকেশ্বর রেলপথের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ছোটলাট চার্লস ইলিয়ট। সারাদিনে মোট তিনটি ট্রেন যেত, আবার ফিরে আসতো। ইঞ্জিনের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ১২ মাইল। এর লোগোটা ভীষণ সুন্দর। তিনটি বড়ো বৃত্তের মধ্যে একটি হাতি শুঁড় তুলে আছে। তার ঠিক তলায় একটি পানের ভিতর লেখা আছে '১৮৯০'। হাতিটাকে ঘিরে থাকা বৃত্তের বাইরে দুদিকেই বেড় দিয়ে সোনালী ধানের শিষ। আর বৃত্তের মাথায় রত্নখচিত মুকুট। এই বি.পি.আর-এর প্রধান কার্যালয় ছিল প্রথমে তারকেশ্বর। পরে ১৮৯৭ সালে তা মগরায় স্থানান্তরিত হয়। সমগ্র রেললাইনে মোট চারটি সেতুর মধ্যে সবথেকে বড় সেতু ছিল মগরা ও মগরাগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে এবং মগরা সেতুর উপর ৫২টি রেলের স্লিপার ছিল।[৮] ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বি.পি.আর-এর ট্রেনে চেপে ত্রিবেণী বেড়াতে গিয়েছিলেন।[৯] ১৯০৪ সালে মগরা থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত আরেকটি লাইন পাতা হয়। বি.পি.আরের ওয়াগনে করেই তারকেশ্বর-দশঘরা থেকে ধান-আলু মগরায় আসতে থাকায় চালকল, গুদামের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সৈন্য চলাচলের জন্য মগরায় লোহার ব্রীজটা সরিয়ে তৈরী হয় পাকা ব্রীজ। রেলপথ, সড়কপথ, জলপথের বিকাশে মগরার তখন স্বর্ণময় যুগ।

মগরায় বাঙালি, বিহারী, পাঞ্জাবী ও মুসলমানদের বাস। সবথেকে প্রাচীনতম সম্প্রদায় সাঁধুখা, ঘোষ, বাগদি। দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধের পর অনেক বাংলাদেশী মানুষ সুকান্তপল্লী, কৃষ্ণদাস কলোনীতে বসবাস করতে শুরু করে। মগরা, পান্ডুয়ায় অসংখ্য

চালকল গড়ে ওঠায় সাঁওতাল, বাউরিরাও বসবাস করতে শুরু করে। মগরায় অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা বেশি হওয়ায় প্রতিবছর মগরার জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

বছর	মোট জনসংখ্যা	তফশিলী জাতি	তফশিলী উপজাতি
১৯৭১	১১৫৬৬৪	১৯৪৬৯	৪৩১৪
১৯৮১	১৫০১১২	৩১০৫৬	৪৯২২
১৯৯১	১৬৬৭৭৯	৪৯১১৩	৬৪৮৮
২০০১	২১১০৪৯	৫৮৫৮৯	৮০১৮
২০১১	২৪৪৩৮৩	৭২৮৫১	৮৯৭৮[১০]

মোটামুটি ভাবে ১৯০০ সালের প্রথম দিকে মগরায় ব্যবসায়ী পরিবারবর্গ বসবাস শুরু করলেও কোনও নির্দিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি হয়নি। কারণ মগরা থানার শিল্পায়িত শহরগুলোতে বসবাসকারী মিলের মালিকশ্রেনী উচ্চ শিক্ষায় তেমন কোন আগ্রহই ছিল না। সেইসময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলতে মগরা বারোয়ারী তলায় কালী মন্দিরের রোয়াকে একমাত্র গগন পন্ডিতের অধ্যাপনায় শিশু শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পাঠশালা। তবে তার পূর্বে বাগাটী রামগোপাল ঘোষ উচ্চ (উচ্চতর) বিদ্যালয় স্বল্পসংখ্যক মানুষদের শিক্ষিত করার যে কাজটা শুরু করে দিয়েছিল, তা আরও বেশি বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে পড়েছিল মগরা উত্তমচন্দ্র উচ্চ (উচ্চতর) বিদ্যালয়, শ্রীগোপাল ব্যানার্জী মহাবিদ্যালয়ের হাত ধরে।

বাগাটী রামগোপাল ঘোষ উচ্চ (উচ্চতর) বিদ্যালয়ঃ ঊনিশ শতকে ইংরাজী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার জন্য সব রকম সাহায্য করতে ইংরেজরা প্রস্তুত ছিল। এই পটভূমিকায় ডিরোজিও-র শিষ্য রামগোপাল ঘোষ ৪০ বছর বয়সে ১৮৫৩ সালে মগরার বাগাটীতে স্থাপন করেন বর্তমানে বিদ্্যালয়ের মাঠের একেবারে পূর্ব প্রান্তে, রেলগেট সংলগ্ন অঞ্চলে খড়ের চালা এবং মাটির ঘর সম্বন্বিত একটি চালাঘরে বিদ্যালয় ভবনটি। ১৮৫৬ সালে বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্্যালয় স্তরে উত্তীর্ণ হয়। ১৮৬৮ সালে রামগোপাল ঘোষের জীবনাবসান হলে বিদ্্যালয় ভবনটি উপযুক্ত সংস্কারকার্য ও রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অব্্যবহার্য হয়ে পড়লে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্্যক্তিবর্গ যেমন: মগরার অবিনাশচন্দ্র সাঁধুখা, বাগাটী নিবাসী রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের সাহায্যে মোট আট বিঘা জমিতে বিদ্্যালয়ের মূল ভবনটি নির্মিত হয় ১৮৮৫ সালে। মূল ভবনটি হল বর্তমানের অফিসঘর। ১৮৮০ সালে যে বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিনত হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে ১৯৪৩ সালের ১৫ই আগষ্ট ‘রামগোপাল ঘোষ উচ্চ বিদ্্যালয়’ নাম রাখা হয়।

মগরা উত্তমচন্দ্র উচ্চ (উচ্চতর) বিদ্যালয়ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক ভয়াল অধ্যায়ে বিজয়কৃষ্ণ দের প্রতিষ্ঠিত মগরায় প্রাথমিক স্কুলের দোতলার কক্ষে ১৯৫৩ সালের ২রা জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় 'উত্তমচন্দ্র জুনিয়ার হাই স্কুল'। ১৯৫৫ সালে বিজয়কৃষ্ণ দে-র অর্থে উত্তমচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন (এখনকার বিদ্যালয় ভবন) গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে ১৯৫৫ সালেই বিজয়কৃষ্ণ দে নিজ অর্থানুকুল্যে তাঁর কাকীমা প্রভাবতী দেবী-র নাম অনুসারে গড়ে তোলেন 'মগরা প্রভাবতী বালিকা বিদ্যালয়'। যা মগরায় নারী শিক্ষার বিস্তারের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ক্রমশ উত্তমচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকায় বিজয়কৃষ্ণ দে এবং শ্যামসুন্দর দে-র সাহায্যে 'বিজয় ভবন' তৈরী হয়। এছাড়াও মগরার 'দয়ার সাগর', 'দানবীর' বিজয়কৃষ্ণ দে গড়ে তোলেন 'আনন্দকানন' নামক নামমঞ্চ, দিগসুই মঞ্চ, চিতোর মার আড্ডার আশ্রম, সুদূর পুরীধামে নীলাচল আশ্রম, কুন্তী নদীর ভাঙাঘাটে স্নানার্থীদের জন্য মগরা বাজারে ও আশ্রমের পাশে দুটি ঘাট, বারোয়ারি তলায় কালীমাতার পাকা ঘর এবং চন্ডীমাতার ভোগের ঘর। শ্রীগোপাল ব্যানার্জী মহাবিদ্যালয়ঃ বাগাটী গ্রামের কৃতি সন্তান শিবচন্দ্র ব্যানার্জী তাঁর বাবা শ্রীগোপাল ব্যানার্জীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালের ২১শে জুলাই এই কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। যে জায়গাটির উপর কলেজ গড়ে উঠেছে সেখানে অতীতে সুজন পন্ডিতের পাঠশালা ছিল বলে মনে করা হয়। ১৯৬০ সালের ১৫ই জুন মাননীয় রাজ্যপাল কর্তৃক ২৪০০ ইডিএন নং বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে এই কলেজ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এছাড়াও মগরা অঞ্চলে বিমলাবালা হিন্দি উচ্চ বিদ্যালয়, শিবচন্দ্র ব্যানার্জী বালিকা বিদ্যালয়, তরিণী সাঁতরা উচ্চ বিদ্যালয় এবং অ্যাবাকাস ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেশ উল্লেখের দাবি রাখে। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলেই মগরায় শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নীচের পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যাবে।

বছর	মোট শিক্ষিত মানুষ	শিক্ষিত পুরুষ	শিক্ষিতা মহিলা
১৯৭১	৫২৫৭১	৩৪০৮১	১৮৪৯০
১৯৮১	৮০৩০৮	৫০২২৮	৩০০৮০
১৯৯১	৯৪৫৯৬	৫৬৪৭০	৩৮১২৬
২০০১	১৪৩১২১	৮১৪১৭	৬১৭০৪
২০১১	১৮৩৪০০	৯৯৫৭৭	৮৩৮২৩[১১]

মগরাতে এক সমৃদ্ধশালী সাংস্কৃতিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে মোটামুটি ১৯৩০-এর দশক থেকে মন্মথ ঘোষ, ডাঃ দীনবন্ধু ঘোষ ও বিমল দত্ত-এর হাত ধরে। এদের প্রযোজিত নাটকগুলো হল গৈরিক পতাকা, ত্রিবেণী, পথের শেষে।

শেষোক্তটিতে প্রথম নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেন অন্নপূর্ণা রায়। মগরায় 'মাটির ঘর' নাটকটিতে অভিনয় করেন বিখ্যাত অভিনেতা ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৫৬ সালের শেষের দিকে শ্যামসুন্দর দে, ধীরেন্দ্রকুমার দত্ত প্রমুখদের উদ্যোগে 'আর্ট অ্যান্ড কালচার'-এর ব্যানারে 'অগ্নিসম্ভবা' ছবিটিতে অভিনয় করেন ছবি বিশ্বাস, কালী ব্যানার্জ্জী, সুপ্রিয়া দেবী প্রমুখরা। তবে ১৮৯০ সালে নিবারণ চন্দ্র দত্তের উদ্যোগে মগরা বারোয়ারী তলাকে কেন্দ্র করে নানা যাত্রাপালা, নাটক, পুতুল নাচের আসর বসতো। বর্তমানে দেবযান কার্যালয়ের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয় নহবতের ঘর। এখন যেখানে সকালে মাছের আড়ত বসে, ওখান থেকেই ভেসে আসত নহবতের সুর। বর্তমানে 'ছটপূজা' উপলক্ষ্যে মগরা বারোয়ারী চত্বর ফুল দিয়ে সাজানো হয়।

মগরার সাংস্কৃতিক জগতে এক বিরাট স্থানাধিকার করে আছে 'মগরা সাধারণ পাঠাগার'। ১৯৩৯ সালের ১৪ই জুন জগবন্ধু দে'র ঘরে রতনমণি শেঠ, মন্মথ ঘোষ প্রমুখদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে মগরা সম্মিলনী পাঠাগার। এর কয়েকবছর পর স্কুল পড়ুয়ারা গড়ে তোলে বালক সমিতি। পরে বিমলকৃষ্ণ দত্তের প্রচেষ্টায় এই দুই পাঠাগার মিলে তৈরী হয় মগরা সাধারণ পাঠাগার। ১৯৪৯ সালের ১৫ই জুলাই অজিতকুমার সেন, বিজয়কৃষ্ণ দে প্রমুখদের প্রচেষ্টায় পাঠাগারের নবনির্মিত ভবন হরিপদ স্মৃতি সৌধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের সদস্য প্রতুল চৌধুরী কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে পাঠাগারের দোতলায় প্রতিষ্ঠা করেন প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের একটি শাখা। ১৯৮০র দশকের শুরুতে পীযূষ দত্ত, অমিতাভ বটব্যালের যৌথ পরিচালনায় মগরা সাধারণ পাঠাগারের সাহচার্যে রামকৃষ্ণ সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয় -'কালমৃগয়া', 'কবিকাহিনী' এবং 'সেই মানব তুমি' গীতিনাট্য। এই লাইব্রেরির দোতলায় 'নিউস্টার' নাট্যসংস্থার রিহার্সাল হতো। ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক এই পাঠাগারে আসেন 'বিষ্ণুপ্রিয়া' ছবিটির জন্য বইপত্তরের সন্ধানে।[১২] ১৯৫৬ সালে 'মগরা সাধারণ পাঠাগার'-এর প্রথম বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিনয়চন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে আয়োজিত হয় সাঁতারু প্রফুল্ল কুমার ঘোষের দ্বারা দুবার সাঁতারের চ্যারিটি শো, ৭টি ম্যাজিক শো, বুদ্ধদেব বসুর 'কৈলাস ও মানস সরোবর' নামক চলচ্চিত্র। ১৯৭৪ সালে লাইব্রেরির দোতালায় মগরার প্রথম সাহিত্য পত্রিকা *সাম্পান*-এর উদ্বোধন করেন হুগলী ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক অনিলকুমার দত্ত। *সাম্পান* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় লেখেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা। ১৯৯০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'মগরা সাধারণ পাঠাগার' 'শহর গ্রন্থাগার' হিসাবে ঘোষিত হলে মগরাবাসীর আনন্দের সীমা ছিল না। পাঠাগারে আয়োজিত ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে পাঠাগারের দোতলায় 'ভগিনী নিবেদিতা মঞ্চ' নির্মাণ করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অদ্বৈত আশ্রমের পরিচালক স্বামী বিভাত্মানন্দজী মহারাজ। ২০১৮ সালে

পাঠাগারে বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রধান বক্তা ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী পরিমলানন্দ।

বর্তমানে মগরা বলতে সবার আগে মনে আসবে মগরার ঐতিহ্যবাহী সরস্বতী পূজার কথা। মগরায় কোলা বান্ধব সম্মিলনী, জয়পুর সবুজ সংঘের মধ্যে দ্বিতীয়টিতে প্রথম সরস্বতী পূজা শুরু হয় ১৯২১ সালে। ১৯৪০-এর দশকে মগরা পাঠাগারেই প্রথম সার্বজনীন সরস্বতী পূজা হয়। এরপর আরও কয়েকটি ক্লাব নানা সামাজিক কাজকর্ম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সরস্বতী পূজা করতে শুরু করে। যেমন: মগরার নতুন গ্রামে সন্তান সংঘ, মগরাগঞ্জে ইউনাইটেড ক্লাব ইত্যাদি। এরপর মোটামুটি ষাটের দশকে সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে মগরা হসপিটাল রোডে গড়ে ওঠে ক্রীড়া সমিতি। সেইসময়ে এই সমিতির প্রচেষ্টায় মগরার বুকে গান গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, আরতি মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুবীর সেন, বনশ্রী সেনগুপ্ত, পিন্টু ভট্টাচার্য প্রমুখ সংগীতজ্ঞ মানুষরা এবং মগরা নতুনগ্রামে সন্তান সংঘের আয়োজনে তখন শান্তিগোপাল, স্বপনকুমার প্রমুখ অভিনীত কয়েকটি যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।[১৩] ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো জয়পুর-বাগাটী অঞ্চলে জাগরনী সংঘ, বন্ধুমহল ক্লাব, ডি.জি.এফ.সি ক্লাব, কোলায় ঐক্য সম্মিলনী, নতুন গ্রামে সোনালী সংঘ ইত্যাদি। এইভাবে মগরাবাসীর রক্তে প্রবেশ করে সরস্বতী পূজা। বর্তমানে মগরা থানা এলাকায় কমপক্ষে ৪০-৪৫টি ছোট-বড় সরস্বতী পূজা হয়। ক্লাবগুলোর আলোকসজ্জা, মন্ডপসজ্জা, প্রতিমা চোখে পড়ার মতো। গত কয়েকবছর ধরেই অনেকজায়গায় থিমের পুজো শুরু হয়েছে। কোথাও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নারীর যন্ত্রণা, আবার কোথাও বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধ, আবার কোথাও জল সংরক্ষণের বর্তা। বিদ্যার দেবীকে কেন্দ্র করে পুজোর চারটি দিন মগরার জনপদ আলোর বন্যায় ভাসে। আর ভাসানের দিন জেনারেটের আলোকে এক অপরূপ আলোকসজ্জার সাথে থাকে ব্যান্ড পার্টি।

বি.পি.আর রেলপথ, কুন্তীর প্রবাহমান ধারা, মাঝি মোল্লার কোলাহলে সূচনালগ্ন থেকেই মগরায় ব্যাপক জনসমাগম হতো। সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে নৌকাগুলো মগরাঘাটে এসে ভিড়তো। মগরায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র ছাড়াও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস এবং নিজস্ব থানা আছে। ধীরে ধীরে শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিমন্ডলে মগরার একটা নিজস্ব পরিচয় গড়ে ওঠে। সর্বশেষে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে একথাই বলবো- "হে দেশ, হে আমার জননী-/ কেমন করে তোমাকে আমি বলি! / যে মাটিতে ভর দিয়ে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি-/ আমার দুহাতের / দশ আঙ্গুলে / তার স্মৃতি। / আমি যা কিছু স্পর্শ করি/ সেখানেই, হে জননী, তুমি। / আমার হৃদয়বাণী / তোমারই হাতে বাজে।"

তথ্যসূত্র:

১) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *সচিত্র কবিকঙ্কন চন্ডী,* ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ, ১৯২১, পৃষ্ঠাঃ ২০৩।

২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠাঃ ২৩৬।

৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠাঃ ২৯৭।

৪) সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* দ্বিতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠাঃ ২২৭।

৫) *রাজনারায়ান বসুর আত্মচরিত,* কুন্তলীন প্রেস, কলকাতা, ১৯০৯, পৃষ্ঠাঃ ৩১।

৬) অমিয়কুমার ব্যানার্জী, *West Bnengal District Gazetteers,* Hooghly, Calcuta, 1972, পৃষ্ঠাঃ ১০।

৭) অমিতাভ বটব্যাল, "মগরা" এবং "উত্তমচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়", শিবশঙ্কর রায় সম্পাদিত, *সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারকঃ মগরা উত্তমচন্দ্র উচ্চ (উচ্চতর) বিদ্যালয়,* ২১শে সেপ্টম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৩।

৮) সম্পাদকঃ অমিতাভ বটব্যাল, *মগরা সাধারন পাঠাগার ৭৫ বর্ষ জয়ন্তী স্মারক পত্রিকা,* অক্ষয় প্রেস, মগরা, পৃষ্ঠাঃ ৩৬।

৯) অমিতাভ বটব্যাল, "মগরা" এবং "উত্তমচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়", শিবশঙ্কর রায় সম্পাদিত, *সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারকঃ মগরা উত্তমচন্দ্র উচ্চ (উচ্চতর) বিদ্যালয়,* ২১শে সেপ্টম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৫।

১০) *District Census Handbook Hooghly* ১৯৭১-২০১১। পৃষ্ঠাঃ ২-৩, ২৪-২৫, ২৬০-২৬১, ৪৩, ৬৫।

১১) *District Census Handbook Hooghly* ১৯৭১-২০১১। পৃষ্ঠাঃ ৩, ২৫, ২৬১, ৪৯, ৭১।

১২) সম্পাদকঃ অমিতাভ বটব্যাল, *মগরা সাধারন পাঠাগার ৭৫ বর্ষ জয়ন্তী স্মারক পত্রিকা,* অক্ষয় প্রেস, মগরা, পৃষ্ঠাঃ ১৫।

১৩) সম্পাদকঃ ইন্দ্রাণী পালিত, *মগরা গোস্বামী বাড়ির দুর্গোৎসব স্মারক পত্রিকা, পঞ্চম সংখ্যা,* ১৪২২, অক্ষয় প্রেস, মগরা, পৃষ্ঠা: ২২-২৩।

সমাজ বাস্তবতার আলোকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

মাধুরী বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর

সারসংক্ষেপ: আলোচ্য প্রবন্ধে উনিশ শতকের মধ্যভাগে সাহিত্যে প্রথম বাস্তবতা শব্দটির ব্যবহার সাহিত্যিক আন্দোলন রূপে। যদিও এর প্রভাব সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় দেখা যায়, তবুও উপন্যাসে এই বাস্তববাদী ধারাই ছিল কথাসাহিত্যের মূল প্রবাহ। সমাজের রূপায়ণ সমাজ বাস্তবতা নয়, সমাজের পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত সাহিত্যে বর্তমান তাই সমাজ বাস্তবতার বিষয়। এই নিরিখে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প আলোচনা করে, দেখাতে চেষ্টা করেছি বাংলাদেশ ও বাঙালির জাতির সামাজিক বাস্তবতা তাঁর কাছে, তাঁর গল্পে কিভাবে ধরা দিয়েছে। তিনি যে সময়ের লেখক সেই সময়টা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। কালজনিত বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি , অবক্ষয়িত মানব জীবন, মূল্যবোধহীন মনুষ্যত্বের পরিচয় আছে আমার আলোচিত গল্পগুলিতে। এই প্রবন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুঃশাসন, হাড় , নীলা ,পুষ্করা, নক্র চরিত্র প্রভৃতি গল্প গুলোকে বেছে নিয়ে সেখানে বাস্তবতার আলোকে সামাজিক অবস্থান, লেখকের সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করার প্রয়াসী হয়েছি।
সূচক শব্দ: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাস্তবতা, সমাজ-বাস্তবতা, ছোটগল্প, মন্বন্তর,যুদ্ধ ,দাঙ্গা, সমাজ, ইতিহাস, মূল্যবোধ, কালোবাজারি,গল্প, গোত্র ,নির্বাচন প্রভৃতি।

১

প্রতিপাদ্য বিষয়:

কথাসাহিত্যে 'সমাজ বাস্তবতা'র (Social Realism) ক্ষেত্রটি 'বাস্তবতা'(Realism)থেকে স্বতন্ত্র। উনিশ শতকের মধ্যভাগে 'বাস্তবতা'(Realism) আন্দোলনের শুরু। ফরাসি দেশে ১৮৫০ এর দশকে 'realism' শব্দটি প্রথম সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় জীবনের রূঢ় ও কঠিন বাস্তবতার বিশ্বস্ত চিত্রন বোঝাতে । ফরাসি দেশে এর সূচনা হলেও ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপে নানা অঞ্চলে এই বাস্তবতা আন্দোলনের বিভিন্ন শাখা যেমন ------ কাব্য- নাট্যাদিতে বিস্তৃতি লাভ করলেও এর প্রধানত ও প্রথমত আশ্রয় ক্ষেত্র কথাসাহিত্য। সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বের পন্ডিতেরা 'Naturalism' , 'Socialist realism', ' Critical realism', 'Democratic realism' - প্রভৃতি নানা ধরনের বাস্তবতা বিচিত্র স্বভাব বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার নিদর্শন খুঁজেছেন কথাসাহিত্যে। কারণ উনিশ শতকের ফরাসি তথা ইউরোপীয় উপন্যাসে এই বাস্তববাদী ধারায় ছিল কথাসাহিত্যের মানুষের

দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাসঙ্কুল বাস্তবতাকে গভীর আগ্রহে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ফুটিয়ে তোলাই ছিল 'রিয়ালেস্টিক'দের কাজ।বর্তমান প্রবন্ধে বাস্তবতার ইতিহাস বা বিভিন্ন ধরনের বাস্তবতার স্বরূপ নির্ণয় আমাদের মূল লক্ষ্য নয়। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে শুধু অবতরণিকা রূপে কথাসাহিত্যে বাস্তবতা আন্দোলন কিভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল তার উল্লেখ করলাম মাত্র।

প্রাচ্যে বাস্তবতা আন্দোলন উনিশ শতকের মধ্যভাগে তো নয়ই, বিশ শতকের দ্বিতীয় - তৃতীয় দশকেও তেমনভাবে কোন আলোড়ন বাস্তবায়িত হয়নি বললেই চলে। কিন্তু সাহিত্যতত্ত্ববিদগণ লক্ষ্য করেছিলেন এই আন্দোলনের অনেক আগে থেকে বহু শিল্পী ব্যক্তিগতভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আয়ত্ত করে তাদের রচনার স্বভাব বৈশিষ্ট্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি দেশীয় ও বিদেশী উভয় সাহিত্যে লক্ষণীয়। যেমন- আমাদের দেশীয় সাহিত্য মুকুন্দরামের 'চন্ডীমঙ্গল' কাহিনীতেও এই সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি লক্ষিত হয়। একইভাবে চর্যাপদ ,শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, জীবনীসাহিত্য প্রভৃতির মধ্যেও প্রতিফলিত তৎকালীন সমাজ বাস্তবতা ।কেননা বাস্তবতা একটি বিশেষ জীবন চেতনা তথা শিল্পবোধ ।কোন বিশেষ কাল বা বিশেষ আন্দোলনের উপর পুরো নির্ভর করে না। আবার বাস্তবতা ঘটনা স্রোতের নিছক প্রতিবিম্ব নয়। এই ধরনের বাস্তবতার মধ্যে জীবনের বিশ্বাস্য চিত্রই শুধু ফুটে ওঠেনি, ফুটেছে লেখকের সমাজদৃষ্টি। তাই সমাজ বাস্তবতা কথাটি বাস্তবতার ধারণার থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। এখানে সমাজের রূপায়ণই সমাজ বাস্তবতা নয়, সমাজের পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত সাহিত্যে বর্তমান তাই সমাজ বাস্তবতার (Social Realism) বিষয়।

২

ত্রিশের দশকের একজন বিশিষ্ট ব্যতিক্রমী স্রষ্টা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। যিনি একাধারে গল্পকার, উপন্যাসিক, কবি, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, ছাত্র - প্রিয় অধ্যাপক, টেনিদার অবিস্মরণীয় স্রষ্টা, সুনন্দের জার্নালের সুনন্দ, যিনি সব ভূমিকাতেই অবিস্মরণীয় স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং বলা হয় সময়ের অভিঘাত পেরিয়ে তা আরও তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে। এসেছে তাতে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা। তাই তাঁকে নিয়ে কিছু বলতে গেলে দ্বিধা জাগে কোন জায়গা থেকে তাঁর আলোচনা আরম্ভ করব, তাঁর কোন বিষয়টি বা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত কোরবো। তাঁর ভাবনা তাঁর সমকালকে সঙ্গে নিয়ে সর্বকালের, দেশীয় ঘটনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিত হয়েও সব দেশের এবং সব শ্রেণীর মানুষই নিজেকে খুঁজে পাবে তাঁররচনার মধ্যে । তাঁর গদ্যের অবারিত গতি , অনবদ্য উপস্থাপনা , একেবারে অচেনা নয়, কিন্তু ব্যতিক্রমী বিষয় নির্বাচন, ইতিহাস চেতনা, সমাজ চেতনা, বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস, সাহিত্যের প্রকরণ রীতি সম্পর্কে অশেষ জ্ঞান তাঁকে একজন ব্যতিক্রমী শিল্পী করে তুলেছে।

তিনি যে সময়ের লেখক সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যুদ্ধকালীন বিপর্যয়, মন্বন্তর, দাঙ্গা, গন-বিক্ষোভ, রক্তাক্ত খন্ডিত স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তুস্রোত, মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারের রমরমা, খাদ্য ও নিত্যদ্রব্য সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, বুভুক্ষ নরনারীর হাহাকার, মুনাফবাজদের পৈশাচিক উল্লাস এই সবই ছিল- যুগবৈশিষ্ট্য । এইসব নিয়েই রচিত হয়েছে তার অগণিত ছোটগল্প। এই অগণিত ছোটগল্পের মধ্যে থেকে নির্বাচিত কয়েকটি গল্প নিয়ে একটি ছোট পরিক্রমার প্রয়াস এই প্রবন্ধটি। আলোচনার পরিসর যেখানে অনেক বড় তাকে সংক্ষিপ্ত নির্বাচিত গণ্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলা সত্যিই খুব কঠিন। কারণ কোনটি কারোর মত নয়। স্রষ্টা এক হলেও তাঁর সৃষ্টি বহু বৈচিত্র্যময়। তবে নিবিড় পাঠে একটা জিনিস উপলব্ধি করা যায় যে কাহিনী নির্বাচন যেমনই হোক মানবিক মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সেগুলির জন্ম। এদের পটভূমি বাস্তব সমাজ , চরিত্ররাও উঠে এসেছে চেনা জগৎ থেকেই এবং দাঁড়িয়ে আছে সেই বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিভূমিতেই যা সর্বকালেই প্রযোজ্য।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সূচনা লগ্ন থেকে বহু বহু সফল ছোটগল্পকার এসেছেন ।এদের মধ্যে কোন কোন একজন স্রষ্টার কোন কোন শিল্পকর্ম আমাদের এতটাই মুগ্ধ করে যে তাতে আমরা বিবশ হয়ে পড়ি। এবং এই মুগ্ধতার সঙ্গে এক ধরনের স্তব্ধতাও আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। আমাদের মনের মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তেমনি একজন গল্পকার। যিনি শুধু পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করেন না, পাঠককে চমকিত করেন পাঠকের চোখের সামনে খুলে দেন জীবনের এক একটি দিক, এক একটি অধ্যায়। পাঠকের গল্প পাঠের সব সংস্কারকে ভেঙে, জীবনের অবিশ্বাস্য চূড়ান্ত সত্যের মুখে দাঁড় করিয়ে দেন।অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের কথায়, 'মহাযুদ্ধ এবং মন্বন্তরের পটভূমিতে'ই[১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিকাশ। তাঁরকথায়, "সেদিন সর্বগ্রাসী যুদ্ধের তাণ্ডবে ভেঙে পড়েছে জীবনের খেলাঘর। ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস উঠেছে; সঙ্গে সঙ্গে শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্ধ্বস্বর বীভৎস চিৎকারে মুখরিত হয়ে উঠেছে আকাশ - বাতাস; একদিকে যুদ্ধের জুয়াখেলায় কাগজিমুদ্রার ছিনিমিনি, অন্যদিকে চোরাকারবার আর কালোবাজারে নারকীয় অনাচারে পযুদস্ত দিনযাত্রা; সারা বাংলা জুড়ে নিরান্ন বিবস্ত্র নরনারীর গগনভেদী হাহাকার, আর তারই বুকে বসে মুনাফাশিকাররী মজুদদার ও ব্যবসায়ীদের দানবীয় অট্টহাসি। মহাপ্রলয়ের সন্ধিলগ্নে যেন নরক গুলজার!"[২]-এটাই তার গল্পের প্রেক্ষাপট। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি সাহিত্য শিল্পের যদি নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রেক্ষাপট থাকে, তাহলে কালের অতল তলে কিছুদিনের মধ্যেই হারিয়ে যায়। স্বাভাবিক নিয়মেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে তাহলে কি শিল্পী সমকালের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না? উত্তরে বলা যায়- নিশ্চয় হবেন। তবে সেই সব সমকালিনতার প্রেক্ষিতে, সেগুলো সমকালীন আবার

চিরকালেরও বটে। আপাত বিচারে বিন্যাসটা হয়তো পাল্টে পাল্টে যায় কিন্তু মূল সুর ও স্বরটা একই থাকে।

সর্বগ্রাসী যুদ্ধ, মন্বন্তর কেড়ে নিয়েছে মানুষের সাজানো সংসার, জীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আধিপত্য, লোভীদের প্রবল অর্থলিপ্সা, চোরাকারবারী আর কালোবাজারে যুগপৎ আক্রমণে বিষিয়ে উঠেছে 'চির মনোরম চির মধুর' বাংলার আকাশ- বাতাস, শান্তিপ্রিয় বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনযাপন। সেই সময়ের জীবন ভাষ্যই নারায়ণের সাহিত্য রচনা কেন্দ্রীয় সুর। বহু সমালোচক তাঁর মধ্যে পূর্বতন সাহিত্য ধারার লক্ষণ চিহ্ন প্রত্যক্ষ করে তাঁকে মানিক ও জগদীশ - এর উত্তরসুরী মনে করেন। কিন্তু পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করলেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বকীয়, স্বতন্ত্র। কেননা "১৯৪২- ৪৫ সালের বিক্ষুব্ধ ভারত সেদিন লেখকের সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।"[৩] সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গোত্র বিচার করে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন, " শিল্পী মাত্রেই অবশ্য সমাজের প্রতিনিধি। সমাজমানসের ভাববেদনা তাদের রচনায় বাণীবিগ্রহ লাভ করে এ কথা স্বীকার করেও শিল্পীপ্রতিভাকে প্রধানত দুভাবে বিভক্ত করা যায় । এক যাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনের একটা নূতন মূল্যবোধ রচিত হয়, বহু পরীক্ষিত সত্য নবনিরীক্ষায় নূতন অর্থ পরিগ্রহ করে। আর যাদের ব্যক্তি সত্তা বিগলিত হয়ে যুব চেতনাকেই বিশেষভাবে মুক্তিদান করে। তাঁদের ব্যক্তিকণ্ঠে যেন সমগ্র যুগটাই কথা কয়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত দিতে হলে বার্নাডশ'কে প্রথম জাতের এবং গোর্কিকে দ্বিতীয় জাতের প্রতিভা বলে ধরা যেতে পারে।"[৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দ্বিতীয় গোত্রভুক্ত সাহিত্যিক। এবার আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি তাঁর বাস্তব সমাজচেতনা মূলক গল্প নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হব।

৩

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যুগসন্ধি লগ্নের সাহিত্যিক ফসল "দুঃশাসন"(১৯৫২)। গল্পটিতে রয়েছে যুদ্ধের বাজারে বস্ত্র সংকটের নির্মম বাণীরূপ। স্বভাবতই মনে পড়ে, একই বিষয় নিয়েই রচিত মানিকের 'দুঃশাসনীয়' বা অচিন্ত্যকুমারের 'বস্ত্র' গল্পের কথা। বস্ত্র ব্যবসায়ী দেবীদাসের কাছে,"অনেকক্ষণ ধরে তীর্থের কাকের মতো বসে আছে লোকটা।"[৫] চাহিদা সামান্যই-এক জোড়া কাপড়। বিরক্তিতে শিরশির করে উঠলো, কাপড়ের গদির মালিক দেবীদাসের শরীর। সহানুভূতি ঝরে পড়া স্বরে জানালো ". ... সবই ভগবানের মার। কেন যে এই যুদ্ধ বাঁধলো আর আকাল দেখা দিল এক ভগবানই বলতে পারেন সে কথা।"[৬] দেবীদাস ঝানু ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে বুঝেছে যে,"ওকে একখানা কাপড় দিলে দু'ঘণ্টার মধ্যেই দেরগোড়ায় উল্টোচন্ডীর মেলা বসে যেত।"[৭] কাপড় না দিয়ে গ্রামের অসহায় মানুষটিকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছে দেবীদাস, ভাইপো গৌরদাসের মধ্যে নীতির প্রশ্ন জাগলে তাকেও চুপ করিয়ে দিতে পেরেছে করা প্রতিক্রিয়ায়, কিন্তু এড়িয়ে যেতে পারা গেল না এল.সি. কানাই দে কে। যুদ্ধ আর কালোবাজারীর নৈরাজ্যে সামান্য কনস্টেবলও রোয়াবীতে এস.পি - র সমতুল্য। ৫০ টাকা চাঁদা নিতে এসেছে সে

দারোগা শচীকান্তর পক্ষ থেকে। ৫০ টাকা? দেবীদাস চমকে উঠলেও নির্বিকার কানাই। দেবীদাস অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই টাকা দিতে বাধ্য হয়।

ভাইপো গৌড়দাসকে নিয়ে দেবীদাস "দুঃশাসনের রক্তপাত" যাত্রাপালার অভিনয় দেখার জন্য সন্ধ্যা বেলায় যাত্রার আসরে যায়। চার - পাঁচ টা ডে-লাইটে আলোর প্লাবন তুলে যে যাত্রার আসরের সূচনা হয়েছিল, তারই সমাপ্তি হলো ভোরের ঝলমলে আলোয়। কিন্তু এত আলোর আয়োজনেও আলোকিত হয় না বাংলাদেশের মানুষের দুর্ভাগ্যের অন্ধকার। মুচিপাড়ায় রাতের মতই নিরন্তর কেঁদে চলেছে পুত্রহারা মা, সামান্য একটুও আলো না থাকায় যার শিশুকে টেনে নিয়ে খেয়েছে শিয়াল। আবার সূর্যের অকৃপণ আলোতেই দেবদাস, গৌরদাস আবিষ্কার করে লক্ষণের বাড়ির ষোড়শী মেয়েটিকে। ঘাটের থেকে জল নিয়ে আসা মেয়েটি মুহূর্তে মিলিয়ে গেল মানুষের গলা শুনে। তার গায়ে একফোটা সুতো নেই, সম্পূর্ণ নগ্ন সে। সূর্যের আলোর কঠোর বাস্তবতায়, যুগের দুঃশাসনের হাতে বস্ত্রহারা মেয়েটির অপমানের প্রতিশোধ নেবে কে? লোলুপ পৃথিবীর লোভী দৃষ্টি থেকে এইসব অসহায় দ্রৌপদীদের একমাত্র আড়াল বোধ হয় অন্ধকার। সূর্যের আলোর পথে চললেও গৌরদাসের মনে ঘনিয়া আসে অন্ধকার - পাপ বোধ। প্রশ্ন জাগে মনে- "যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্র করেছে, তারেও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে?"[৮] পাপ আর প্রায়শ্চিত্তের দুশ্চিন্তা যে বীজ গৌরদাসের চেতনে- মননে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল দুঃশাসনের রক্তপাতের অভিনয়ের আসরে মুচিপাড়ার ছেলেহারা মায়ের কান্না, লক্ষণের মেয়ের উলঙ্গ দেহ সেই ভয়কে আরো বিকশিত করেছে। চাষীদের হাতের ধারালো হেঁসোর শানিত ঔজ্জ্বল্য দেখে গৌরদাসকে যেন আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরেছে এক অসম্ভব ভয়। নক্রচরিত্র চালের আড়তদার নিশিকান্ত কর্মকার ভয় পেয়েছিল। অন্ধকারে বাঁশঝড়ের পথ পেরোতে গিয়ে তার মনে হয়েছিল-" সমস্ত বাঁশবনে অসংখ্য মড়া ছড়িয়ে রয়েছে- তাদের কালো শুকনো পাগুলো যেন ভুতের পা। আর বাঁশের আগায় গলায় কাপড়ের ফাঁস পরিয়ে ঝুলে রয়েছে অগণ্য নারীদেহ-তাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেহগুলো একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন।"[৯] এই"ভয়ানক দুঃস্বপ্ন"দেবীদাসের মতো ধুরন্ধর, হৃদয়হীন, ব্যবসায়ীর মনকেও পাপবোধের গ্লানির আলিঙ্গনে আড়ষ্ট করে "…. অকারনে অত্যন্ত অকারনে বড় বেশি ভয় করতে লাগলো দেবীদাসের। অমন ঝকঝকে করে কেন হেঁসোতে শান দেয় ওরা?"[১০] রক্ত দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্তের যে চিন্তা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল গৌরদাসকে, চাষীদের হাতে হেঁসোর ঝকঝকে ধারালো প্রতীতি সেই চিন্তাকেই রূপান্তরিত করেছে অকারণ, অসম্ভব ভয়ে। তাছাড়া 'দুঃশাসন' তো যুগে যুগেই থাকে। যুদ্ধ বা কালোবাজারী না হোক,'দুঃশাসনে'র মতোই আজকের যুগ। আজকের সমাজ, আজকের সংস্কার কী বে-আব্রু করে না নারীকে, থাবা বসায় না তাঁর শ্লীলতা বা দেহ মনের শুচিতার ওপর? এই প্রশ্ন যেন যুগ যুগান্তরের। একটু লক্ষ্য

করলে দেখব 'দুঃশাসন' গল্পের দুর্ভিক্ষের জন্য যে বস্ত্রসংকট ও খাদ্যাভাব তা সমগ্র বাংলাদেশের আপামার জনসাধারণের বাস্তব সমাজজীবন চিত্র।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বামপন্থী মতাদর্শের প্রেরণাতেই "নীলা" গল্পে বাংলাদেশের সীতাগঞ্জ অঞ্চলের আঁখচাষীদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। সুগার মিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চাষীদের গুর তৈরির কারখানায় কেবল বন্ধ হয়ে যায়নি, গ্রাম থেকে যারা মিলে আঁখ নিয়ে আসতো গাড়ির ওজন বাদ দিয়ে তাদের টাকা দেবার পরিবর্তে আঁখর অর্ধেক ওজন বাদ দিয়ে আঁখচাষীদের ওপর বড়ই অবিচার করা হতো। আঁখচাষীরা এইজন্য আন্দোলন করলে কান্তি সান্যাল তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য ছাঁটাই হয়েছিল। পরে অবশ্য ম্যানেজার ভাস্কর নটরাজনের পার্সোনাল সেক্রেটারি নীলা কৌশলে কান্তি স্যান্যালকে কাজে বহাল করার অনুমতি ম্যানেজারের কাছ থেকে আদায় করে নেন। এই গল্পও বাংলার বাস্তব জীবনের বিপর্যয়ের কথা বলে। ট্যাগোরের রেড অলিন্ডার্স, লভার্স গিফ্ট আর গীতাঞ্জলি পড়ে সুগার মিলের ম্যানেজার ভাস্কর নটরাজন কুন্তলার সাথে গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়েছিল, অঞ্জনা নদীর ধারে খঞ্জনা গ্রামের প্রান্তে খুঁজে ফিরবে কোন এক রঞ্জনাকে, সবুজ ধানের ক্ষেতে খুঁজে পাবে কৃষ্ণকলির কালো হরিণ চোখ। কিন্তু ভাস্কর সেদিন যে গ্রাম দেখেছে সে গ্রামে ছড়িয়েছিল দুঃসহ দারিদ্র্য।

পচা, গলাডোবা, জঙ্গলে ঘেরা বাংলার গ্রামে হাড় বের করা বলদ, ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আর দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের অসহায় জীবনযাত্রা বাংলার সমাজ জীবনের করুণ রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তীর্থযাত্রা' গল্পে ধরা পড়েছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার বীভৎসরূপ। পরিত্যক্ত চন্ডীমন্ডপে সাপ ও শেয়ালের বাসা, বোধন তলার যত্রতত্র ছড়িয়ে নরমুণ্ড। শ্রী সরোজ দত্ত এ প্রসঙ্গে বলেছেন "পঞ্চাশের মন্বন্তর বাংলাদেশের পক্ষে শতাব্দীর অন্যতম প্রধান কালিমালিপ্ত সূচনীয় বেদনাতুর ঘটনা।"

গল্পটি এই সময় রচিত হয়েছিল।"বাংলার ঘরে ঘরে মঙ্গল প্রদীপের শিখা নিভে গেছে, ছায়া কুঞ্জের নিচে সোনার পল্লীতে কল্যাণী গৃহবধুর কাঁকন আজ আর ছলভরে বেজে উঠছে না। ব্ল্যাক আউটের দিনেও নিভে যাওয়া তুলসী তলায় প্রদীপ সহস্র ছটায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে মহানগরীর গণিকা পল্লীতে।"[১১] এমন পরিস্থিতিতে গ্রামের ১৩ থেকে ৩০ বছর বয়সের মেয়েদের কালীঘাটের মন্দির দর্শনের অজুহাতে অর্থ পিশাচ নরোত্তম ঠাকুর পাঠাবাহী নৌকায় করে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। হয়তো বা গল্পকারের চাওয়াতেই মাঝি ফরিদের শুভবোধের উন্মেষে ব্যর্থ হয়ে গেছে তার পৈশাচিকতা এবং যোগ্য শাস্তিও পেয়েছে। অর্থপিশাচ নরোত্তম যখন নৌকো থেকে নেমে সুখী কে ছেড়ে দেবার নাম করে গোলাম মোহাম্মাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিক্রি করে ফিরে আসে তখন এই ঘটনায় নৌকার ধৈর্যহারা মাঝির (ফরিদের) লাঠির ঘায়ে নরোত্তম বালি আর কাঁদায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। ফরিদের এই প্রতিবাদ আসলে নরোত্তমের উদ্দেশ্যে নয়। সেই সমস্ত মানুষের

উদ্দেশ্যে যারা নরোত্তমের মতো ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়, ভন্ডামির মুখোশ পড়ে অসহায় দরিদ্র মানুষজনদের ওপর অত্যাচার করে। আসলে শাসক শক্তিকে প্রতিহত করার জন্যই লেখকের এই বিপ্লব।

"হাড়" গল্পে দেখি রায়বাহাদুরের কাছে উমেদারীতে এসেছে তার একদা বন্ধু প্রমথ'র ছেলে। সে শিক্ষিত বেকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় এ গল্পটিকে একটি ঐতিহাসিক দলিলও বলা যায়। রায়বাহাদুর -এর কাছে চাকরির সহায়তা পেতে আসা ছেলেটিকে তার (রায়বাহাদুর) সখের হাড় সংগ্রহের গল্প শোনাতে শুরু করেন। সেসব হাড় - এ আছে অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা। গল্পের ফ্লাক্সব্যাকে বর্ণিত হয়ে চলেছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত নিরন্ন বুভুক্ষ মানুষের না খেতে পেয়ে তিলে তিলে আকস্মিক পরিণতির করুন বিবরণ। রায়বাহাদুর ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া মানুষের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র ।যারা নিজ স্বার্থ ও আত্মগরিমা ও আত্মম্ভরিতা নিয়েই সমাজে এক চক্ষু হরিণের মতন। "হাড় " গল্পে অসহায় নির্যাতিত দরিদ্র মানুষের জীবন বলিদানের প্রতীকী ব্যঞ্জনা রূপে উঠে এসেছে। তাহিতি দ্বীপের বলি হওয়া কুমারী মেয়ে আর কলকাতার বুকে দুর্ভিক্ষ কবলিত ছোট্ট শিশুর 'হাড়' চোষার মধ্যে রয়েছে বঞ্চনার গভীর দীর্ঘশ্বাস। 'হাড় 'এক অর্থে ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থারই নগ্নতার প্রতীক।

"নক্রচরিত" গল্পে বাংলার ১৩৫০ এর মন্বন্তরের বিভীষিকা চিত্রায়িত হলেও গল্পে কালোবাজারী মহজনের ভয়ংকর চিত্রটি মুখ্যত স্থান পেয়েছে, নিশিকান্ত নামক প্রধান চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে। বিধ্বস্ত সমাজ ব্যবস্থায় কালোবাজারী মহাজনরা সমাজ ও আইনি ব্যবস্থাকে নিজেস্বার্থে কুক্ষিগত করার জন্য কেমন ভাবে সমাজের প্রতিনিধিসুলভ তকমাটি লাগিয়ে দিব্যি ভালোমানুষের মতন স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন করেন। নিশিকান্ত কর্মকারের তকমা অনেক, যেমন- তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি, ব্যবসায়ী, অর্থলিপ্সু আবার চোরাকারবারিও। এখানে ব্যবসায়ী বলতে আড়তদারের কথা বলা হয়েছে। মানুষটি নির্দয়, ধূর্ত ও অসৎ। নানান কারবারের সঙ্গে যুক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ও ব্যবসায়ী মানুষটির ধনদৌলতও নিশিকান্তর ঘরে স্ফীতকায়। বিগত যৌবন বৈষ্ণবকুলতিলক নিশিকান্ত ডাকাতের মালই শুধু কেনে না; ডাকাতদের রক্ষাও করে। ইব্রাহিম দারোগাকে মোটা টাকা ঘুষ দেবার পাশাপাশি বিশাখা নামে মেয়েটিকে নিয়োগ করেছে দারোগার জন্য। বিধ্বস্ত সমাজ সভ্যতায় অন্ধকার পথে দেবদাসী বিশখার হারিয়ে যাওয়া এক অর্থে অবক্ষয়িত সমাজ ও অবমূল্যায়নের পথকেই নির্দেশ করে। এদিক থেকে গল্পটি বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের বাস্তব অবক্ষয়িত সমাজের দলিল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প "পুষ্করা"। মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে যে মহামারী একসময় গ্রামবাংলায় চেপে বসে তারই এক বীভৎসটা ধরা পড়েছে এই গল্পে। এক কথায় এ গল্পে ধরা পড়েছে মহামারীর এক অমানবিক প্রেক্ষাপট। ১৩৫০ এর মন্বন্তরের সময় মজুদদারেরা সুযোগ বুঝে অধিক মুনাফার

আশায় গ্রাম বাংলাকে যেভাবে শোষণ করেছেন- তাকেই এ গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। মারি ও মড়ক নিয়েই যে নীলকণ্ঠের বিষপানের মতন দুর্বিষহ জীবন নিয়ে সাধারণ জনসাধারণকে সময়স্রোতের টানে চলতে হয় তা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন লেখক। শুক্লা চতুর্দশীর রাতে মহাশ্মশানের বুকে দেবী কালী কে প্রসন্ন করতে পন্ডিত পুরোহিত তর্করত্ন পুজোয় বসে। কলেরার মড়ক থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষা করতেই দেবীকে আহ্বান জানিয়েছেন তর্করত্ন। যত রাত বাড়ে ততই উদ্বিগ্ন বাড়তে থাকে। দেবী যদি শিবা ভোগ গ্রহণ না করে তাহলে অনিবার্য পুষ্করা গ্রাম নয় সমস্ত দেশ শ্মশানকালীর কোপে শ্মশান হয়ে যাবে। পরম আনন্দে তর্করত্ন লক্ষ্য করেন "অন্ধকারের মধ্যেদৃষ্টি নিশাচরের মতো তীক্ষ্ণতা পেয়েছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একমাথা ঝাঁকড়া চুল, কুচকুচে কালোগায়ের রঙ , অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি তার দাঁতের চাপে হাড়গুলো মড়মড় করে ভেঙে যাচ্ছে"-.[১২]...গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেন তর্করত্ন "ওরে বাজা ,বাজা! আর ভয় নেই, দেবী নিজে এসেছিলেন, তাঁর ভোগ নিজেই গ্রহণ করে গেছেন।"[১৩] এর করুণ পরিনিতি আমরা দেখতে পাই লেখকের নিজের কথায়-"তাঁর শ্মশানকালী এসেছিল ওই জন্যডোমপাড়ার পাগলীটার রূপ ধরেই.... কালীর মত জিভ মেলে হাপাচ্ছে একফোটা জলের ।"[১৪]

মানুষের মুনাফার অধিক প্রত্যাশী মজুতদারদের কারণেই সাধারণ ভুখা থেকে রাক্ষসী ক্ষুধার জ্বালায় অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে যে মারী ও মোড়কের কবলে পড়ে বেঘোরে মরতে হয় তা এ গল্পে "শিবভোগ" গ্রহণের ভেতর দিয়ে পাগলী ডোমবধুর আসন্ন মৃত্যুর ছায়া চিত্রে লেখক তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। এ গল্পে আছে একদিকে মানুষের অন্ধ কুসংস্কার অন্যদিকে রূপায়িত হয়েছে যুদ্ধের সময়কার মানুষের খাদ্যহীনতার চরম রূপ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প "ভাঙা চশমা"। এটিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধ মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত অবক্ষয়িত মূল্যবোধের বিপর্যয়ের কাহিনী। এ গল্পের নায়ক উচ্চশিক্ষিত। প্রথম শ্রেণীর এম.এ পাশ। বিবাহিত। স্ত্রী অনু। জীবিকার তাগিদে মফস্বলের এক শহরে ৬০টাকা বেতনের স্কুল মাস্টার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা কন্ট্রোল আর কালো বাজার। ইমফ্লেশন । উচ্চশিক্ষিত যুবকের ভাগ্যে ভাগ্যের উন্নতি দেখা দিল। যুদ্ধের বাজারে গ্রামে গ্রামে রিলিফের কাজের জন্য সরকার শিক্ষিতদের মধ্য থেকে সাবডেপুটি গ্রেডের অফিসার নিয়োগ করেন। যদিও চাকরিটা অস্থায়ী। স্কুলের চাকরি ছেড়ে নতুন কাজে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেন একদা স্কুল শিক্ষক যুবক। গর্ব আর অহংকারে বুঁদ হয়ে যুবক অনুভব করেন "প্রভুত্বের আস্বাদ নতুন রক্ত খাওয়া বাঘের মত।"[১৫] মাঝে মাঝে অতীতে ফিরে যান। স্কুল মাস্টারের নিরীহ সত্যসন্ধ মনটি নিজেকে 'বিরাট প্রহসনের বিদূষক'ভাবতে থাকে। হঠাৎই গল্পের পট পরিবর্তন ঘটে। ছেঁড়া পাঞ্জাবি পরনে এক অপ্রকৃতস্থ ভদ্রলোক যুবকের বোধয় ঘটান। তার দুচোখট আঁটা ভাঙা চশমা। যুবককে উদভ্রান্ত মানুষটির

প্রশ্ন "প্রিপোজিশন না পড়লে কি ইংরাজী শেখা যায়।"[১৬] খোঁড়া আটচালার পচা খড় আর গোবরের ভ্যপসা গন্ধে নায়কের শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করে। অথচ এই আটচালা ঘরটি ছিল জনৈক ভদ্রলোকের একদা স্কুলবাড়ি। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে ছাত্ররা পালিয়েছে, না খেতে পেয়ে মরে গেছে। নিজের কাছেই নিজের প্রশ্ন "আমার সারা জীবনের সব স্বপ্ন এমন করে কে শেষ করে দিলে বলতে পারেন?"[১৭] ভাঙা, চশমা এই শব্দ দুটি দিয়ে লেখক অবক্ষয়িত মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে দৃষ্টি বিভ্রমের কথায় আমাদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন। জনৈক স্কুল মাস্টারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিক্ষিত এম এ পাশ যুবক ফেলে আসা অতীত শিক্ষক জীবনের স্মরণের মধ্য দিয়ে মানসিক দ্বন্দ্ব ও আত্মসমালোচনা ও ধিক্কার জানিয়েছে।

এবারে শেষ কয়েকটি কথা। সমাজ বাস্তবতার নিরিখে সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যযয়ের গল্পের স্বল্প পরিসরের মধ্যে আরো অনেক গল্পের পর্যালোচনা করা সম্ভব হলো না। তবুও কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প বেছে নেবার চেষ্টা করেছি কারণ তাঁর প্রতিটি গল্পকেই বলা যায় সামান্যের মধ্যে অসামান্যের ব্যঞ্জনা। প্রতিটি গল্পই যেন তাঁকে আলাদা আলাদা ভাবে আমাদের চিনিয়ে দেয়। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন- "সাহিত্য জাতির মুখপাত্র। জাতিকে যদি জাগাতে হয় তাহলে সে দায়িত্ব তাঁর সাহিত্য গ্রহণ করবে বিশেষভাবে কথাসাহিত্য।"[১৮] কাজেই অন্ন- বস্ত্র আলোহীন বাংলাদেশে মৃত্যুর উদ্ধত পদচারণা আর অসহায় মানুষের হাহাকার কে তাঁর সাহিত্যের চৌহদ্দি থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে জাতিকে জাগানোর মহৎ দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হতেন তিনি। দেশ ও সমাজ গঠনের আদর্শ তো তাঁর পেশার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। ফলে কথাকোবিদ, সাহিত্য - গবেষক এবং অধ্যাপক সত্তার ত্রিবেণী সঙ্গমেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন সার্থক যুগ-সাহিত্যিক। সেভাবে দেখতে গেলে সমস্যা বা সংকট হয়তো একটা নির্দিষ্টকালের সময়সীমার কিন্তু লেখকের ভাষায় তাঁর পরিচয় জীবনের মধ্যে সবটুকু খুঁজে পাওয়া যাবে না পাওয়া যাবে তাঁর গল্পে। প্রসঙ্গত বলাই যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্টির ভুবন শিল্পী সত্তাকে যথাযথভাবে বুঝতে গেলে কিন্তু তাঁর যুগ সমস্যা নির্ভর গল্পগুলি আজও স্বতন্ত্র অভিনিবেসের দাবি করতে পারে। এক্ষেত্রে আরো একটি দাবিও অনিবার্য ভাবে উঠে আসে".... যুদ্ধ মন্বন্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশে মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রকট হয়ে উঠলেও উচ্চবিত্ত মানুষের লোভ ও নীচতা দুর্গত মানুষের অসহায়তা আগেও ছিল কিন্তু এইভাবে ছোট গল্পকারের জিজ্ঞাসু অঙ্গুলি নির্দেশের সম্মুখীন হয়নি, এভাবে ছোটগল্পের অঙ্গ ও অঙ্গীরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।"[১৯] আর এখানেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অনবদ্য, অতুলনীয়, অনন্য।

তথ্যসূত্র:

১. আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী/জগদীশ ভট্টাচার্য/ভারবি /কলকাতা ৭৩/পৃষ্ঠা-২০৯।
২. ঐ,
৩. বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা/ অরুনকুমার মুখোপাধ্যায়/ দেশ পাবলিশিং/ কলকাতা ২০০৪/ পৃষ্টা-৫৪৭।
৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প/ সম্পাদনা জগদীশ ভট্টাচার্য/ প্রকাশভবন ১৪২০/ পৃষ্ঠা -৭।
৫. দুঃশাসন/ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প/ ১৪২০ব. /পৃষ্ঠা -৫১।
৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৫১।
৭. ঐ, পৃষ্ঠা-৫১।
৮. ঐ, পৃষ্ঠা -৫৮।
৯. ঐ, পৃষ্ঠা-৫৩।
১০. ঐ, পৃষ্ঠা-৫৮।
১১. তীর্থ যাত্রা/ গল্প সমগ্র/ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়/ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স/ পৃষ্ঠা-৬৮৯।
১২. পুষ্করা/ ঐ /পৃষ্ঠা-৭৮১।
১৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৭৮১।
১৪, ঐ, পৃষ্ঠা-৭৮৫।
১৫. ভাঙা চশমা/ঐ/পৃষ্ঠা-৭৫১।
১৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৭৫২।
১৭, ঐ, পৃষ্ঠা-৭৫৪।
১৮, সাহিত্য ও আদর্শ / কোরক /তৃতীয় পর্ব/ পৃষ্ঠা - ৯ - ১৫।
১৯. ছোট গল্পে স্বদেশ স্বজন/ আলোক রায়/ অক্ষর প্রকাশনী/ ২০১০/ পৃষ্ঠা -১৮৫।

জীবন ও নৈতিকতার কৃষ্ণরূপ : প্রসঙ্গ শম্ভু মিত্রের 'অতুলনীয় সম্বাদ'

অঙ্কিতা মুখার্জী
সহ অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার

সারসংক্ষেপ : নাটককার শম্ভু মিত্র মানব সমাজ ও জীবনের এক নির্মম বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন 'অতুলনীয় সম্বাদ' নামক একাঙ্ক নাটকটিতে। আধুনিক সময় ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন এবং সামাজিক অবক্ষয়ের প্রকৃত স্বরূপটিও উঠে এসেছে চরিত্র ও সংলাপের সূত্রবন্ধে। নাটককার মানবজীবনের সমস্যা ও সংকটের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও তার রূপায়ণে ব্রতী হয়েছেন। আধুনিক সময় ও মানবজীবনের নানাবিধ সম্পর্কের গভীর ক্ষতকে নাটককার অপূর্ব দক্ষতায় অঙ্কন করেছেন। সমাজের স্বার্থপর এবং স্ফীত রূপটির পাশাপাশি প্রেমহীন প্রথাসর্বস্ব বিবাহের রূপটিও এক লহমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এই নাটকে। কৃত্রিম ও স্বার্থপর সমাজব্যবস্থার স্থুল রূপটিকে নাটককার অন্ধকারের ব্যঞ্জনায় উদ্ধৃত করেছেন।
সূচক শব্দ : 'অতুলনীয় সম্বাদ' - 'কৃষ্ণকৌতুকীয় নাটিকা' - মানবজীবন - ভঙ্গুর রূপ – দু'জন পুরুষ - দু'জন মহিলা - কুশল বিনিময় – আত্মআস্ফালন - দুই যুবক - শিক্ষা - আভিজাত্যের স্ফীতি – মধ্যবয়সী মানুষ – অর্থলীপ্সা – বিত্তবান মহিলা – নরনারী – জৈবিক চাহিদা - প্রেম সম্পর্ক - অন্তঃসারশূন্যতা – অন্ধকার - ব্যঞ্জনা।

আধুনিক বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে শম্ভু মিত্র এক উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি নিজেই বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে স্বতন্ত্র ঘরানা নির্মাণ করেছেন। শিল্প ও সাহিত্যের অঙ্গনে রেখেছেন নাট্যচর্চার স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান। নাটককার হিসেবে রচনা করেছেন বেশ কিছু মৌলিক নাটক যেগুলি বাংলা নাটকের অতুলনীয় সম্পদ। তাঁর রচিত নাটক বিষয়ে ও বক্তব্যে কখনোই একঘেয়ে নয়।নাট্যকাহিনির মধ্যে দিয়ে তিনি সময় ও সমাজের ক্রমবিবর্তমান পটভূমিতে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের নানাবিধ সংকটকে চিত্রায়িত করেছেন। আর তাই তাঁর রচিত নাটকের আঙ্গিকেরও বদল ঘটেছে বারবার। বিশ শতকের ছয়ের দশকে রচিত শম্ভু মিত্রের 'অতুলনীয় সম্বাদ'একাঙ্কিকা নাটকটি তেমনই একটি মৌলিক সৃষ্টি। এই নাটকটিকে তিনি স্বয়ং 'কৃষ্ণকৌতুকীয় নাটিকা' বলে উল্লেখ করেছেন এবং মুখ্য কথাবস্তুর অভ্যন্তরে নিবিষ্ট রেখেছেন সমাজজীবনের এক গূঢ় অন্ধকারের সর্পিল আগ্রাসন। নাট্যকাহিনির ভেতরে আপাত সুখকর ও কৌতুকময় জীবনরূপের আড়ালে সেখানে উঁকি দিয়েছে সমকালের জটিল

আবর্তের অশুভ ইঙ্গিত।অসামান্য কুশলতায় শম্ভু মিত্র নাটকটিতে সমকালের আবহে সমাজ জীবনের যাবতীয় অনাচারকে চাপা দিয়ে এবং মানবজীবনের সহজ প্রবাহকে বজায় রেখে বাহ্যিক ভাবে নৈতিকতার মহিমা কীর্তনের ভঙ্গুর রূপটি ব্যঞ্জিত করেছেন।

'অতুলনীয় সম্বাদ' একাঙ্ক নাটকটি রচিত হয় ১৯৬৫ সালে। নাটকটি প্রথম পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বহুরূপী' পত্রিকার ২৩ সংখ্যায়, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ সালে। পত্রিকায় প্রকাশের সময় নাটককার সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। বৈশাখ, ১৪০০ বঙ্গাব্দে নাটকটি 'পাঁচ দুই' নামক গ্রন্থে পাঁচটি গল্প ও দুটি নাটকের সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। শম্ভু মিত্র মানব সমাজ ও জীবনের এক নির্মম বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন 'অতুলনীয় সম্বাদ' নামক একাঙ্ক নাটকটিতে। সেখানে স্তরবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন এবং সামাজিক অবক্ষয়ের প্রকৃত স্বরূপ উঠে এসেছে। আবার এরই পাশাপাশি মানবজীবনের বিবিধ সম্পর্কের নগ্ন বাস্তব রূপটিও চিত্রিত হয়েছে সামাজিক পটভূমিতে। চরিত্রগুলি অধিকাংশই নামহীন। কেননা বিশেষ কোন চরিত্র নাটককারের উদ্দেশ্য নয়, তিনি সমাজ ও মানবসম্পর্কের এক চিরন্তন সত্যকেই উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন এই নাটকে। এই একাঙ্ক নাটকটিতে নাটককার মানুষের চারিত্রিক দ্বিচারিতা ও নৈতিক স্খলন সত্ত্বেও দুর্নীতি আর ব্যভিচারকে আড়াল করে নীতিকথা উচ্চারণ করার বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে অন্য সবাইকে খারাপ ও অসৎ হিসেবে দোষারোপ করে কেবলমাত্র নিজেকে সৎ প্রমাণের চেষ্টার মধ্যে দিয়ে কিছু সংখ্যক মানুষের আত্মআস্ফালনের যে চিরকালীন প্রবণতা তাকেও চিত্রিত করেছেন। নাট্য কাহিনিতে প্রথমেই দেখা যায় নাটককার বাস্তব সমাজজীবন থেকে আহরিত দুজন যুবক (উঠতি অফিসার),মধ্যবয়সী দুজন পুরুষ এবং দুজন মহিলার মধ্যেকার অনিচ্ছাকৃত সৌজন্যমূলক কুশল বিনিময়ের বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করেছেন। তারা প্রত্যেকেই উচ্চমধ্যবিত্ত ও কর্মমুখরতায় বাঁধা তাদের জীবন। একে অপরের সঙ্গে দেখা হলে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলবার মত অবকাশ মুহূর্ত তাদের জীবনে নেই। তাই অনিচ্ছাকৃত কুশল বিনিময়টুকুই তারা করে থাকেন। এই নাটকে সমাজ বাস্তবের নিখুঁত প্রতিফলন চোখে পড়ে। দুই যুবকের পারস্পরিক আলাপে উঠে আসে তাদের শিক্ষা ও আভিজাত্যের স্ফীতি, দেশের অবস্থা সম্পর্কে বিরূপ মানসিকতা এবং নিজেকে উৎকৃষ্ট প্রমাণের চেষ্টা–

"১ম : কী রকম চলছে?
২য় (অনির্দিষ্ট অর্থে) এই–। তোমার কি রকম ?
১ম: (অনিদিষ্ট অর্থে) এই–। এ যা দেশ হয়েছে বাঁচা যায় না।
২য় : রিয়েলি। একটা জিনিস পাওয়া যায় না। (পকেট থেকে
বিদেশী সিগারেট বের করে) নাও।
১ম : আরে, এ ব্র্যান্ড পেলে কোত্থেকে ? অ্যাঁ ?

২য় : (সতৃপ্তে) আমার ভগ্নীপতির – এমব্যাসির সঙ্গে একটু মাখামাখি আছে কিনা–

[দূতাবাসের নামটা একটু কানের কাছে ঝুঁকে। একটু চেপে বলার কারণে আমাদের কর্ণগোচর হয় না]

[১ম পকেট থেকে একটি জ্বালক বের ক'রে অপরের মুখের সামনে জ্বালায়। ২য়
সিগারেট না ধরিয়ে জ্বালকটা দ্যাখে]

২য় : বিউটিফুল ! কোত্থেকে পেলে ? অ্যাঁ ?

১ম : (সতৃপ্তে) আমার ভায়রাভাই–এর কানেকশনজ আছে কিনা–। হংকং থেকে।

উভয়ে : (সখেদে) রিয়েলি, আমাদের এখানে যেন গুডলিভিং–এর কোনো ট্র্যাডিশন নেই–। ১ম : থাকবে কী করে? এখানে তা নেতার ট্র্যাডিশন হোল হাঁটু অবধি কৌপীন, আর ক্যাবলার মতো—ভাইয়োঁ—। থিংক অফ দি ল্যাংগুয়েজ, – ভাইয়োঁ – ! অফুল !"[১]

তারপর নাটককার দুজন মধ্যবয়সী মানুষের আলাপচারিতায় উপস্থাপিত করেছেন তাদের অসৎ অর্থলীপ্সা, সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক অসততাকে চাপ দিয়ে নিজেকে নীতিবান হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস–

"১ম : সাড়ে ছয়! মানে, তিন হাজার হোয়াইট করতে দেড় হাজার টাকা। এরা ভেবেছে কী? ন্যায়নীতি ব'লে কিছু নেই ? (হঠাৎ স্বর পাল্টে ফেলে) বলো, ছয় দেবো।

কর্মচারী : (মাথা নেড়ে) নেবে না স্যার।

১ম: (বিরক্তভাবে) দাও তবে সাড়ে ছয়ই দাও। (ফিরে আসতে আসতে দ্বিতীয়কে) এ দেশ–যে কী ক'রে চলবে! কারুর ওপরে বিশ্বাস করা যায় না মশাই!

২য় : এই। আমি তাই খাতাপত্তর সব ক্লীন রাখি। নো ঘুষ, নো ব্ল্যাকমানি।

১ম : আমারও মটো তাই। অনেস্ট বিজনেস। নো ঘুষ, নো ব্ল্যাকমানি। আমরা হলাম, বুলেন, পুরোহিত বংশ। আমাদের রক্তে কোনো লাভ নেই।

২য় : (ভালো ক'রে তাকিয়ে থেকে) অ। (তারপর গলা পাল্টে বলেন) আমরা হ'লাম আপনার শূদ্রবংশ। মানে, ভারতবর্ষের অরিজিনাল সভ্যতা। আর্য ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়রা এসে যাদের

রেড ইন্ডিয়ানদের মতো মারলে আর কি! আমাদের তো আরো প্রাচীনতরো সভ্যতা।”[২]

এরপর দুজন বিত্তবান মহিলার কথোপকথনে উঠে এসেছে আধুনিক জীবনযাপন ও সাজসজ্জা বিষয়ে অন্য মহিলার প্রতি বিদ্রুপ এবং নিজেদের সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার –

> “১ম : (অনর্গল বলে যান) না ভাই, আমি তোমার ওপরে ভীষণ রাগ করেছি। এতো ক’রে বললাম, তুমি একদিনও আমাদের বাড়ীতে আসতে পারলে না, না ? এসো না একদিন মিস্টারকে নিয়ে। জানি, জানি, দু’জনে খুব লাভার্স পেয়ার হয়ে বেড়াতে যাও রাত্তিরে, দেখিছি, দেখিছি। বাব্বা, সেদিন দেখি নমিতা—ঐ যে নমিতা কুণ্ডু – রাত্তিরে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেছে শুধু একটা ব্রা প’রে। প্যারিসে গিয়েছিল কিনা। আমার মিস্টার আবার এমন অসভ্য ভাই, বলছে ওটাই বা আর কেন, একেবারে অজন্তা আর্ট হ’লেই হোত। আমি বললাম, কী করে হবে? ছেলে মেয়ে তো দুটো তিনটে হয়ে গেছে। [দুজনে মিলে হিহি হুহু ক’রে গড়িয়ে পড়ার মতো। তারপরে দ্বিতীয় ধরলেন]
> ২য় : যাই বলো ভাই, তোমার ওপর আমি খুব রাগ করিছি। তোমরা ভাই একদিনও এলে না। এসো না একদিন মিস্টারকে নিয়ে। সেদিন ফুল্লরারা এসেছিল—ঐ যে ফুল্লরা চ্যাটার্জি–কাপড়ের কুঁচিটা পেটের সামনে যে কোথায় নামিয়েছে না–।ওর মিস্টার যে দিল্লীতে পোস্টেড ছিল। আমার মিস্টার তাই এমন অসভ্য, বলছে–”[৩]

এই দুই যুবক, মধ্যবয়সী পুরুষ এবং মহিলারা পারস্পারিক কুশল বিনিময় করলেও প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ। তারপরেই নাটককার রাস্তার পাশে একটি প্রতীক্ষালয়ে বেশ কয়েকজন তরুণ তরুণী ও বিভিন্ন বয়সী নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ, নিভৃতে ঘনিষ্ঠ হবার বাসনার মত একাধিক মুহূর্ত রচনা করেছেন যা বাস্তব জীবনে নরনারীর সম্পর্কের সাধারণ কদর্য জৈবিক তাগিদকে তুলে ধরে। এই আকর্ষণ তাদের আধুনিক প্রেম সম্পর্কের চিত্র উদ্ঘাটিত করে। এরই মাঝে দুই তরুণ প্রেমিক প্রেমিকার জীবনের একটি অধ্যায় তুলে ধরেছেন নাটককার। এই দুই প্রেমিক প্রেমিকা হলেন অতুল ও অতুলনা। নাটককার সচেতন ভাবেই তাদের নামকরণ করেছেন। পরস্পরের প্রতি তাদের উপলব্ধি প্রসঙ্গে নাটককার লিখেছেন–

> “মেয়েটি : (দর্শকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে) এই একটি মাত্র ছেলেই একটু সীরিয়াসলি প্রেম করে, বাকি সবাই একেবারে মৌমাছি, – আমি খুব জানি। তাছাড়া, এর কথা শুনে মনে হয়

এরা খুব বড়োলোক। কী করি আমি ? উঃ, এ আমার জীবনের কিরকম প্রব্লেম এলো ! কী করি ।

[প্রচণ্ড সমস্যায় উদ্ভ্রান্ত নায়িকার মুদ্রা করে অঙ্গাভিনয় করে]

ছেলেটি : এই একটি মাত্র মেয়েই একটু ভালো ক'রে প্রেম করতে দ্যায়, বাকি সবাই কেবল খরচ করায়। তাছাড়া, এর কথা শুনে মনে হয় এরা খুব বড়োলোক। উঃ, কী করি আমি ! কী ক'রে এ প্রব্লেম সলভ করি ?"[৪]

তারপর তাদের সম্পর্কের অন্দরের মান অভিমানের পালা, ঘনিষ্ঠতা ও বিবাহ সম্পন্ন হতে দেখা যায়। ইতিমধ্যে অতুল ও অতুলনার অভিভাবকবৃন্দের মধ্যে বিবাহে যৌতুক প্রদান বিষয়েও কথাবার্তা হয়। দুই নব দম্পতি নিজেদের গোপন আলাপচারিতায় উচ্চারণ করে –

"ছেলেটি : (মেয়েটির পিছু পিছু যেতে যেতে তার কবে হাত রেখে বলে) অতুলনা, আমি তোমায় খুব ভালোবাসি,

মেয়েটি : (একটা ছোট আয়নায় দেখে নাকে পাউডার লাগাতে লাগাতে) আমিও তোমাকে খুব ভালোবাসি অতুল–"[৫]

নাটককার এরপরেই ঘনিয়ে তুলেছেন এক অসামান্য নাট্যদ্বন্দ্ব। তাদের জীবনের নগ্ন জৈবিকতার চিত্র এবং পারস্পরিক ভালবাসাহীন দাম্পত্য সম্পর্কের স্বরূপ তুলে ধরে নাটককার সমাজ বাস্তবতা ও আধুনিক জীবনের সত্যরূপ চিত্রিত করেছেন। যে চিত্রে উঠে এসেছে বিবাহিত নরনারীর হৃদয়হীন জৈবিক জীবন অতিবাহন, সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতা এবং নারী – পুরুষের চিরন্তন লোলুপ আকর্ষণ। তাই অতুলনাকে স্ত্রী হিসেবে বারবার জৈবিক আকর্ষণে কাছে টেনে নিয়েও অন্য নারীর প্রতি অতুলকে আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। অতুলনা একাধিক সন্তানের জন্ম দিতে থাকে স্বামীর সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত সহাবস্থানে। নাটককার লিখেছেন–

"ছেলেটি : অতুলনা তোমায় আমি খুব ভালোবাসি–

মেয়েটি : (বিরক্তভাবে) ভাল লাগে না বাপু – উঃ–

[নিজের কোমরের কাছ থেকে আর একটা পুতুল বের করে স্বামীর কোলে দেয়। স্বামী হতাশভাবে সেটিও নিয়ে স্ত্রীর পিছনে চলতে গিয়েই আবার সেই নবাগতা মেয়েটির দিকে তাকায়। দাঁত বের করে ইশারা করার চেষ্টা করে লুকিয়ে, মেয়েটি ক্রুদ্ধভাবে ব'লে ওঠে – সোয়াইন। ছেলেটি আবার স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে, চলতে চলতে বলে—]

ছেলেটি : অতুলনা, তোমায় আমি–

মেয়েটি : (বিরক্তভাবে) ধুত্তুরি—উঃ–

[নিজের কোমর থেকে আর একটা পুতুল বের করে স্বামীর কোলে দেয়। সেটি নিয়ে আবার নবাগত মেয়েটির দিকে দাঁত বের ক'রে ইশারা করে টাকা দেখায়। মেয়েটি ক্রুদ্ধভাবে বলে– সোয়াইন। ছেলেটি আবার স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে বলে–]

ছেলেটি : অতুলনা –

মেয়েটি : জ্বালাতন – উঃ –"[৬]

আসলে কোমর থেকে পুতুল বার করে স্বামীর কোলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে নাটককার হৃদয়হীন সম্পর্কের যান্ত্রিক অসাড়তাকেই উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। অতুল ও অতুলনার এই সম্পর্কের অতুলনীয় এবং স্বতন্ত্র পরিণতিই নাটকটির নামকরণে ব্যঞ্জিত হয়েছে। আধুনিক সময় ও মানবজীবনের নানাবিধ সম্পর্কের গভীর ক্ষতকে নাটককার অপূর্ব দক্ষতায় অঙ্কন করেছেন। সমাজের স্বার্থপর এবং স্ফীত রূপটির পাশাপাশি প্রেমহীন প্রথাসর্বস্ব বিবাহের রূপটিও এক লহমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এই নাটকে। কৃত্রিম ও স্বার্থপর সমাজব্যবস্থার স্থুল রূপটিকে নাটককার অন্ধকারের ব্যঞ্জনায় উদ্ধৃত করেছেন। সুস্থ জীবনবোধ বিচ্যুত মানুষের জীবনের রূপটি এখানে কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ অন্ধকারের সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। এই অন্ধকার, মানব সমাজ ও মানব জীবনের নৈতিক স্খলন, মূল্যবোধহীনতা, দায়বদ্ধতাহীন সম্পর্ক, নীতিভ্রষ্টতা ও সামাজিক অবক্ষয়কেই ব্যঞ্জিত করে। আপাতসুখী, শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য ও প্রেম সম্পর্কের অভ্যন্তরে নাটককার যেভাবে ভালবাসাহীন, স্ফীত ও অন্তঃসারশূন্য সম্পর্কের ক্ষত ও যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের উদ্ভাস ঘটিয়েছেন তাতে কৌতুকের আবহে জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. শম্ভু মিত্র, 'পাঁচটি গল্প দুটি নাটিকা', এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১২৯

২. তদেব, পৃষ্ঠা ১৩১

৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১৩২

৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৫

৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৭

৬. তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৮

আকর ও সহায়ক গ্রন্থ এবং সহায়ক পত্রপত্রিকা

১। মিত্র শম্ভু, 'পাঁচটি গল্প দুটি নাটিকা', এমসরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট .সি. লিমিটেড, কোলকাতা৭৩-, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০০।

২। মিত্র শম্ভু, 'সন্মার্গ সপর্যা', এমসরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড .সি., কোলকাতা৭৩-, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০২।

৩। মজুমদার স্বপন, – ১৯৪৮বহুরূপী '১৯৮৮', বহুরূপী, কোলকাতা৭৩ –, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮।

৪। মিত্র শাঁওলী (সম্পাদিত-সহ) ও রায় অনিত (সম্পাদিত), ধ্যানে ও : শম্ভু মিত্র' 'অন্তর্ধানে, নান্দনিক, কলকাতা৯ -, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

৫। মিত্র শাঁওলী, 'তর্পন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা৯ -, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৮।

৬। মিত্র শাঁওলী, 'ত্রস্ত সময় ধ্বস্ত সংস্কৃতি', এমসরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট .সি. লিমিটেড, কোলকাতা৭৩ -, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৬।

৭। মিত্র শাঁওলী, - ১৯১৫শম্ভু মিত্র '১৯৯৭ বিচিত্র জীবনপর-িক্রমা', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, প্রথম প্রকাশ, ২০১০।

৮। 'নাট্যচিন্তা', সম্পাদকরথীন চক্রবর্তী -, শম্ভু মিত্র স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৭।

৯। '৩নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ', পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, জানুয়ারি ১৯৯৩।

১০। '৬পত্রিকা নাট্য আকাদেমি', পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, স্বাধীনতার উত্তরাধিকার বাংলা থিয়েটার সংখ্যা, ১৯৯৯।

১১। 'বহুরূপী পত্রিকা', ১ থেকে ১০২ সংকলন, ১৯৫৫ ।২০০৪ –

১২। 'পশ্চিমবঙ্গ', শম্ভু মিত্র স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৭, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কোলকাতা১-, বর্ষ ৩৪, সেপ্টেম্বর ২০০০।

১৩। 'দেশ', ৬৪ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ১৩ আষাঢ় ১৪০৪, ২৮ জুন ১৯৯৭।

অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাদর্শ : একটি পর্যালোচনা

বাসুদেব হালদার
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেন

সারসংক্ষেপ: বর্তমানের একুশ শতকের যে সময়ে আমরা প্রবেশ করেছি, এই সময়ে বাংলা তথা বাঙালির চিন্তাসংস্কার, কর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি এমনকি সামাজিক সচেতনতাবোধ অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের যে সকল বাঙালী মনিষীদের ভাবনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনিই ছিলেন বাঙলার প্রথম সমাজবিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান মনস্কতার আদর্শনিষ্ঠ পথিকৃত। তিনি মাতৃভাষা নির্ভর সময়ের প্রেক্ষিতে যে উন্নত চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলে তা পরবর্তী সময়ের আধুনিকদের থেকেও আধুনিক। সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর জীবনব্যাপী কর্মের যে বিস্তার তা অধিকাংশ বাঙালির কাছে অজ্ঞাত। তিনি শিক্ষা সম্পর্কে যে আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।
সূচক শব্দ : মাতৃভাষা, শিক্ষাব্যবস্থা, আত্মপরিচয়, ব্যক্তিত্ব বিকাশ।

ভূমিকা: বর্তমানের একুশ শতকের যে সময়ে আমরা প্রবেশ করেছি, এই সময়ে বাংলা তথা বাঙালির চিন্তাসংস্কার, কর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি এমনকি সামাজিক সচেতনতাবোধ অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের যে সকল বাঙালী মনিষীদের ভাবনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৫ই জুলাই ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার চুপী গ্রামে এবং তিনি অমৃতলোকে গমন করেন ২৭শে মে ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে, বালিগ্রামে গঙ্গা-তীরে তাঁর নিজের হাতে তৈরি বাড়ি 'শোভনোদ্যান'-এ। অক্ষয়কুমার দত্ত এমন এক ব্যক্তিত্ব যার কর্ম, সামাজিক চেতনাবোধ, আধুনিক মানসিকতার কাছে বাঙালি ঋণী। তাই বাঙালির কাছে তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য, একথা স্বয়ং বিদ্যাসাগর নিজে লিখেছেন 'অক্ষয়কুমার দত্তের কাছে বাঙালির ঋণ' প্রবন্ধে। তিনিই ছিলেন বাঙলার প্রথম সমাজবিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান মনস্কতার আদর্শনিষ্ঠ পথিকৃত। সময়ের প্রেক্ষিতে তিনি যে উন্নত চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলে তা পরবর্তী সময়ের আধুনিকদের থেকেও আধুনিক। উনিশ শতকে তিনিই প্রথম বাঙালি মনীষী, যিনি শ্রেণীহীন মানুষ ছিলেন এবং শ্রেণীহীন সমাজের কথা গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন।তাঁর জীবনব্যাপী কর্মের যে বিস্তার তা অধিকাংশ বাঙালির কাছে অজ্ঞাত। তিনি শিক্ষা সম্পর্কে যে আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা আলোচনা করাই

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধে শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনার চেষ্টা করব। প্রথমতঃ প্রাচীনকালে শিক্ষা কেমন ছিল। দ্বিতীয়তঃ ঊনবিংশ শতকের দাঁড়িয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের আধুনিক শিক্ষা চিন্তা কি প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার ফলশ্রুতি। তৃতীয়তঃ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় তার প্রাসঙ্গিকতা বিচার।

এক

জীবন প্রবাহমান – এ বিষয়ে কোন মত বিরোধ নেই। প্রবাহমান জীবনকে সুশৃঙ্খল, সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে ব্যক্তি জীবনকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে - ব্রক্ষ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। একজন ব্যক্তির জীবনের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ ব্রক্ষ্মচর্যকাল যদি যথার্থ ভাবে পালিত হয় তাহলে পরবর্তী পর্যায় গুলি সুন্দরভাবে অতিবাহিত হওয়া সম্ভব। কারণ ব্রক্ষ্মচর্যের উপর নির্ভর করে পরবর্তী পর্যায়ের ভালোত্ব বা মন্দত্ব। এই ব্রক্ষ্মচর্যকালই শিক্ষা লাভের প্রাথমিক পর্যায়। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা বিশ্বাস করতেন সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের সর্ব শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য সাধনে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা কেবল শিক্ষাই যোগাতে পারে। তাই তাঁরা বলেছেন 'স বিদ্যা যা বিমুক্তেয়' অর্থাৎ বিদ্যাই দেয় মানুষের মুক্তির সন্ধান। এই প্রসঙ্গে তাঁরা আরও বলেছেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্বম" অর্থাৎ যার দ্বারা আমি অমৃত লাভ করতে পারি না, তা নিয়ে আমি কি করব। কিন্তু একমাত্র শিক্ষাই দিতে পারে অমৃতের সন্ধান। তাই প্রাচীন থেকে বর্তমান জীবনের প্রথম পর্যায়কে কেন শিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে? কারণ এই পর্যায়ের উদ্দেশ্য কেবল বিদ্যার্থীর গ্রন্থ পাঠে উৎসাহিত করা নয়, আত্মসংযম ও ইন্দ্রিয়সংযমের মধ্য দিয়ে চরিত্র গঠনের শিক্ষা প্রদান এই পর্যায়ের প্রাথমিক লক্ষ্য। শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে মহাভারতে বলা হয়েছে "নাস্তি বিদ্যা সমং চক্ষুঃ নাস্তি সত্য সম্যং তপঃ" অর্থাৎ বিদ্যা চক্ষুর ন্যায় সমান সত্য তপস্যার সমান। বিদ্যা মানুষের দৃষ্টি শক্তি প্রদান করে আর সত্যকে অনুশীলন করাই তপস্যা। জ্ঞান হল মানুষের তৃতীয় চক্ষুর ন্যায়, এই দৃষ্টির সাহায্যে আমরা সব কিছুর গভীরে প্রবেশ করতে পারি। তাই শিক্ষা মানুষের মনুষত্ব বিকাশের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। 'ব্রক্ষ্মচর্য'-কাল যথার্থভাবে পালনের উপর নির্ভর করে জীবনের পরবর্তী পর্যায় তথা সমাজের ভালোত্ব বা মন্দত্ব। তাই এই পর্যায়ে একজন বিদ্যার্থীর প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য বিদ্যার্জন, এই বিষয়ে একটি প্রবাদ প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আছে "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ"।

শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ। সেই উদ্দেশ্যে বেদে পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার কথা বলা হয়েছে। পরাবিদ্যা বলতে যার দ্বারা মানুষ ব্রক্ষ্মজ্ঞান লাভ করে। তাই ব্রক্ষ্মজ্ঞানকে পরাবিদ্যা বলা হয়। অপরাবিদ্যা হল ব্যবহারিক বস্তু জগত সম্পর্কে জ্ঞান। জ্ঞানের পূর্ণতা সাধনের জন্য কোন একটি বিদ্যা যথার্থ নয়। প্রাচীনকালে কেবল বুদ্ধির

উৎকর্ষসাধনই উচ্চতম আদর্শরূপে গণ্য হত না, বরং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধনই উচ্চতম আদর্শরূপে গণ্য হত। মনের উন্নতি সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। এই প্রসঙ্গে হার্বার্ট স্পেনসার বলেছেন, 'জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য মনের উন্নতি সাধনই প্রকৃত শিক্ষা'। একটি বীজ যেমন জল, আলো, বাতাসের সংস্পর্শে অঙ্কুরিত হয় তেমনি প্রকৃত শিক্ষার দ্বারাই মনের আন্তরে নিহিত যে অনন্ত শক্তির ক্রমবিকাশ ঘটে । বাইরে থেকে জ্ঞানের কিছুই প্রবেশ করে না, বরং অন্তর থেকে বাইরে বিকশিত হয়।[১] প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিবেকানন্দ বলেছেন "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে দেবত্ব প্রথম থেকে বিদ্যমান তারই প্রকাশ"।[২] স্বামীজীর মতে প্রত্যেক কাজের শেষে সংস্কারসমূহই অবশিষ্ট থাকে এবং সেগুলো মনের মধ্যে জমা হতে থাকে। এইভাবে সংস্কারসমূহ জমা হতে হতে সেগুলো একত্রিত হয়ে অভ্যাসে পরিণত হয়। মানুষের স্বভাব ঐ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। যদি আমাদের বর্তমান স্বভাব কেবল অভ্যাসবশতই হয়ে থাকে তাহলে আমরা যখন ইচ্ছা ঐ অভ্যাস দূর করতে পারি। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন কায়িক বাচিক মানসিক ভাবে সৎ হওয়া। কারণ আমরা যে কাজ করি, যা বলে থাকি এবং যা ভাবি - সেগুলো আমাদের মনের মধ্যে একটা ছাপ (Impession) রেখে যায়, সংস্কারগুলো তাদেরই সমষ্টি। আমাদের চরিত্র সেই অভ্যাস জনিত সংস্কারের সমষ্টিস্বরূপ। আমাদের মনের মধ্যে যে অসৎ অভ্যাসের সংস্কার সমষ্টিবদ্ধ হয়ে আছে সেগুলোকে সৎ অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রন করতে হবে। এইভাবে নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে অসৎ সংস্কার দূরীভূত হয়ে সৎ অভ্যাসের সংস্কার সমষ্টিবদ্ধ হয়ে সৎ চরিত্র গঠিত হবে এবং ক্রমশ মানুষের ভিতর যে দেবত্ব পূর্ব থেকে বর্তমান তার পূর্ণবিকাশের পথ প্রসস্থ হবে। যদিও অনেকের মতে এটি সম্ভব নয়, কারণ মানুষ হিসাবে আমরা দেবত্বের চরম অবস্থায় নিজেদের উন্নীত করতে পারি না। আবার কেউ কেউ মনে করেন এটি সম্ভব, কারণ আমরা মূলত পরমাত্মার আদলেই সৃষ্ট, আমরা একই অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। দেবত্বই হল মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। প্রতিভার উৎকর্ষ সাধন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, বরং শিক্ষার উদ্দেশ্য হল জ্ঞানের সমস্ত বিভাগেই আমাদের আধ্যাত্মিক পরিনতি ও বিকাশসাধন।

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে সেই দেশের বা অঞ্চলের সংস্কৃতি, ধর্মীয় চেতনা, সামাজিক ও বাস্তব প্রয়োজনীয়তাকে বিচার করে। এই বিষয়ে ভারতবর্ষ তথা বাঙালি সমাজ পিছিয়ে নেই। ভারতবর্ষের ভূমিতে চিরকাল ধর্মীয় প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ভারতীয় তথা বাঙালি মনীষী ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতাকে উপেক্ষা করে কেবল আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষায় গুরুত্ব দেননি, যদিও তাঁরা বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন নি। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান চেতনার সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চেতনার সমন্বয়ে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের পক্ষপাতি ছিলেন।কারণ তিনি জানতেন যে, ভারতবর্ষের নিরিখে ধর্মকে বাদ

দিয়ে, আধ্যাত্মিক চেতনাকে দূরে সরিয়ে রেখে কেবল পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান চেতনার উপর নির্ভর করে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করলে তার সাফল্য সুদূর প্রসারিত হবে না। তাঁর মতে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা মানুষকে যুক্তিবাদী আত্মনির্ভর করে তোলে, আর ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষা মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ সাধনের মধ্যে দিয়ে মূল্যবোধ, নৈতিকতার শিক্ষা প্রদান করে। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান ভিত্তিক যন্ত্রচালিত আধুনিক শিক্ষা ব্যক্তিকে যুগোপযোগী করে তুললেও মূল্যবোধ, নৈতিকতাকে অবলুপ্ত করে ব্যক্তিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে এবং ব্যক্তির পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাঁধার সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ তিনি এমন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা পরিকল্পনা করেছিলেন যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুগোপযোগী করে তোলার সাথে সাথে ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন হবে। একইভাবে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের মুখে, এমনকি পরবর্তী অনেক বিখ্যাত বাঙালির কাছে থেকে শুনতে পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি অক্ষয়কুমার দত্ত এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার কথা পরিকল্পনা করে ছিলেন যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুগোপযোগী করে তুলবে, অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা থেকে সমাজকে মুক্ত করবে।

দুই

ঊনবিংশ শতকে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবাসী ইংরেজ শাসনের অধীনে থেকে নিজেদের আত্মপরিচয়ের অভাব উপলব্ধি করতে লাগলেন তখন একদল ভারতবাসী তথা বাঙালী যুবক নিজেদের আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে মুক্ত করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল **পরবর্ত**নের পরিকল্পনা করেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। শিক্ষা ব্যতীত এমন কোন উপায় নেই যা নিজেকে বিশ্বের মাঝে তুলে ধরতে পারে, পরিচয় ঘটাতে পারে; আর তার জন্য চাই আমাদের চেতন স্তরে যে শিথিলতা ও ঘুমন্ত অবস্থাকে সপ্রাণ ও জাগিয়ে তোলা, চিন্তার সংস্কারসাধন করা। চিন্তা সংস্কার ছাড়া যে পরিত্রানের কোন উপায় নেই – একথা যে সকল তরুণ বাঙালী অনুভব করতে পেরেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, যাকে নিয়ে বাঙালী শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আলোচিত হয়নি। কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর চিন্তাভাবনা যে কতটা আধুনিক ছিল যা চর্চার অভাবে বাঙালী যুবসমাজের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে মূলত ধর্মীয় নীতি কঠোরভাবে পালনের মধ্য দিয়ে জনমানস পুরোহিততন্ত্রের দ্বারা অত্যাচারিত ছিলেন, যার একটি কারণ ছিল হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস। এই অন্ধ বিশ্বাস থেকে জনমানসকে মুক্ত করা সম্ভব যদি চিন্তার সংস্কার সাধন করা সম্ভব হয়। কিন্তু শিক্ষা

ব্যাতীত এই সংস্কার কোন ভাবেই সম্ভব নয়। তাই শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার স্বার্থক উন্মেষ সাধনের জন্য রামমোহন রায় সমাজ সংস্কারের সাথে সাথে ১৮২৮ শতকে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাক্ষ্মসমাজ, বেদান্ত ছিল যার ধর্ম সাধনার মূল ভিত্তি। ১৮৩৩ শতকে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাক্ষ্মসমাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাক্ষ্মসমাজই পরবর্তীকালে আদি ব্রাক্ষ্মসমাজ নামে পরিচিত হয়[৩]। একেশ্বরবাদী হলেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন যে, ব্রাক্ষ্মধর্ম হিন্দু ধর্মই, বরং হিন্দু ধর্মের বিশুদ্ধতম রূপ। রামমোহন রায়ের আদর্শেই তিনি ও তার অনুগামীরা ধর্মীয় সংস্কারে ব্রতী হন[৪]।

রামমোহন রায়ের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই কারণে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্যকালে রামমোহনের সাহচর্যে এসেছিলেন। ১৮৩৯-৪২-র মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ যখন উপনিষদের ধর্ম-চিন্তায় নিবিষ্ট তখন রামমোহনের ধর্ম-চিন্তার সঙ্গে তাঁর নিজের ধর্ম-জিজ্ঞাসার ঐক্য খুঁজে পান এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মিলন প্রস্তাব করেন। ওই বৎসর (১৮৪২) মে-জুন মাসেই এই প্রস্তাব কার্যকরী হয়[৫]।

'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠার পর ওই সভায় যোগদান করে অক্ষয়কুমার দত্ত যুবসমাজের চিন্তাসংস্কারের জন্য আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেন। আর এই প্রবর্তিত শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে মাতৃভাষা। তিনি যেহেতু বাঙালী ছিলেন তাই তাঁর কাছে মাতৃভাষার গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। তাঁর কাছে মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা ছিল স্বর্গের ছেয়ে দামি কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এক ছাত্র যদি তার মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে পারে, এই কথার উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর লেখা 'ভারতবর্ষীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষানুশীলন' প্রবন্ধে[৬]। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর (১৮৯৮) সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বলেন, 'তত্ত্ববোধিনী সভা'য় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কমার দত্তের যোগ দেওয়াটা ছিল একটি স্মরণযোগ্য ঘটনা। কারণ এর থেকে 'উত্তরকালে অনেক গুরুতর ফল' উৎপন্ন হয়[৭]। কর্ম-নিপুণ আর জ্ঞান-উদ্দীপ্ত অক্ষয়কুমারকে পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' (১৮৪০) প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল নিজ ধর্মে অনুগত থেকে যাতে ঈশ্বর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তার জন্যে এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠা[৮]। অক্ষয়কুমার চেয়েছিলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও বৈষয়িক বিষয়ে শিক্ষাদান[৯]। অক্ষয়কুমার এই পাঠশালার অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হলেন এবং শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্যে বাংলা ভাষায় ভূগোল (১৮৪১) ও পদার্থবিদ্যার (১৮৫৬) বই রচনা করেন। জীবনের শুরুতেই তিনি নিজের আগ্রহের এক প্রধান লক্ষ্য স্থির করে ফেললেন। মাতৃভাষার উন্নতিই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য।[১০]

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে অক্ষয়কুমারের বক্তব্য ছিল খুবই স্পষ্ট, যার নিদর্শন পাওয়া যায় 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' নামক বক্তৃতায়; সেখানে তিনি বলেন, "আমরা আর কোন বিষয়ে আপনাদিগের প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। আমরা

পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি, এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম্ম এদেশের জাতীয় ধর্ম হয়। অতএব এক্ষণে আমাদিগের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা আর কিয়ৎকাল গৌণে ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবেক না। তাঁহাদিগের ভাষাই এদেশের জাতীয় ভাষা হইবেক এবং তাঁহাদিগের ধর্মই এদেশের জাতীয় ধর্ম হইবে"।[১১] অর্থাৎ এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি যেমন আপামর ভারতবাসীর আত্মপরিচয় ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন তেমনি মাতৃভাষার প্রতি তাঁর যে আবেগ, সহানুভূতি – তা যুবসমাজের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

অক্ষয়কুমার বাঙালির শিক্ষাদাতা হিসেবে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার উদ্দেশ্যে কিশোরদের জন্য তিনটি খণ্ডে 'চারুপাঠ' রচনা করেন। উনিশ শতকে এই বইটি ছিল বাঙালির মানসিক শিক্ষার প্রথম ভিত্তি এবং মাতৃভাষা ছিল যার মাধ্যম। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উদ্দেশ্য তিনি বলেন, 'শিশুর রসনা মাতৃদুগ্ধ পানের সহিত যে ভাষার অনুশীলন করে, বিদ্যারম্ভের পূর্বকালেই যে ভাষার অর্ধভাগ তাহার কণ্ঠগত হয়, এবং তরুণ বা প্রৌঢ়কালে সাধ্যপর যত্নেও যাহা বিস্মৃত হইতে লোক অসমর্থ হয়', সেই ভাষায় শিক্ষা অর্জন করা দরকার। কারণ, এই প্রসঙ্গে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, 'পরদেশীয় ভাষামাত্র অভ্যাসে যে কাল ব্যয় হয়, সে কাল মধ্যে স্বদেশীয় ভাষায় বিবিধ বিদ্যার সংস্কার হইতে পারে'।[১২] শুধু তাই নয়, তৎকালীন বাংলা তথা ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিচার করে তিনি বলেন যে, 'দেশময় যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র সন্তান অন্নভাবে শীর্ণ, বা যে সকল মধ্যবর্তী গৃহস্থ বালকেরা দুরবস্থা হইয়া ক্ষুণ্নভাবে কাল যাপন করে, যাহাদিগের পিতা মাতা কেবল আপন পুত্রদিগের ভাবী উপার্জনের প্রত্যাশায় প্রাণ ধারণ করেন, সে সকল বালকের পরের ব্যুৎপন্ন হইয়া বিদ্যালাভের সময় নাই, তাদৃশ বহু মূল্যে জ্ঞানার্জন করিবার উপায়ও নাই। সকল দেশেরই এই প্রকার ভাব, এ নিমিত্তে ইংলণ্ড দেশে উপায়ক্ষম ব্যক্তিদিগের নানা ভাষা শিক্ষার জন্য নগর বিশেষে যেরূপ মহা মহা বিদ্যাগার বর্তমান আছে, তদ্রূপ সর্বসাধারণের বিদ্যাভ্যাস নিমিত্তে গ্রাম মধ্যে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল স্থাপিত আছে। এদেশের বিষয়ও রাজ পুরুষদিগের সেই নিয়মের অনুবর্তী হওয়া আবশ্যক'।[১৩] তিনি আরো বলেন যে,"যে স্থানের নদী পর্বত মৃত্তিকা পর্যন্ত আমাদিগের প্রীতি পাত্র, সে স্থানের ভাষা, যে ভাষাতে আমরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া শৈশব কালের অর্ধস্ফুট মধুর বাক্য ভাষণে মাতা পিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম, সে ভাষার প্রতি প্রীতি না হওয়া মনুষ্য স্বভাবের যোগ্য নহে। জননীর স্তন দুগ্ধ যদ্রূপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ জন্মভূমির ভাষা

অন্য ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য প্রকাশ করে।[১৪] অক্ষয়কুমার মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বলেন যে, যে সকল জনজাতি যত বেশি মূল্যবান গ্রন্থ বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়ে জ্ঞান জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে - তা তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যাণ্ডে দিকে তাকালে সে কথাই প্রমাণ করে।[১৫] এমনকি আমরা যদি আমাদের বাংলার ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে যে নবদ্বীপ শহরকে বাংলার অক্সফোর্ড বলা হতো। কারণ এই শহর ছিল (সেন রাজাদের আমলে) প্রাচীন বাংলা তথা ভারতের শিক্ষাদানের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান, অর্থাৎ নবদ্বীপ ছিল সেই সময়ে বিদ্যালাভের পিঠস্থান। তাই তিনি বলেন যে, 'আমাদের উচিত যে সর্বস্থানে সমস্ত বিদ্যা আপন ভাষাতে সংগ্রহ করি ....., যাহাতে অতি উৎকৃষ্ট গুরুতম বিদ্যা সকলও স্বদেশীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা করা যায়'[১৫]।

অক্ষয়কুমার দত্ত সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনার আলোকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্বটি দুই থেকে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। তিনি মনে করেন ছেলেমেয়েদের দু'বছর বয়স থেকেই স্কুলে পাঠাতে হবে। এই পর্বে বিদ্যালয় হবে তাদের খেলার স্থান। এ বয়সে তারা হাতে কলমে শরীর ও স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রারম্ভিক শিক্ষা গ্রহণ করবে। এ পর্বেই তারা আরো পাঁচ জনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার রীতি-নীতি শিখবে; প্রাকৃতিক বস্তু ও মানব তৈরি বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে শিখবে। এ পর্বেই শিক্ষকদের আলাপ-আলোচনা ও আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিশুদের সহজাত শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটবে। শিশুরা অন্যায় করলে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে, তবে মার-ধর নয়। শিক্ষকের পরিচালনায় পঞ্চায়েত ডেকে দোষী শিশুর বিচার ও শাস্তি হবে। এ পর্বে বিদ্যালয়ে যন্ত্রবৎ কিছু বানান শেখানোর পরিবর্তে কারিগরি শিক্ষা ও গণিত শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে ছয় বৎসর বয়সে এবং তা ব্যপ্ত থাকবে পনের বৎসর বয়স পর্যন্ত। এই পর্বে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রাকৃতিক পরিবেশে বসে লেখাপড়া করবে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিবেষ্টিত বসার কক্ষটিতে দেশে-বিদেশের মনীষীদের আবক্ষমূর্তি থাকবে। অল্প ব্যবধানে স্থাপিত কাঠের তক্তায় নানা উপদেশ ও নীতিকথা লেখা থাকবে। এই পর্বে শিক্ষার্থীরা ভাষা, ইতিহাস, সাহিতা, গণিত, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা লাভ করবে। ইতিহাস পড়ানোর সময় ছাত্রদের মানসপটে যুদ্ধবাজ বীর পুরুষদের আদর্শ তুলে না ধরার জন্য তিনি শিক্ষকদের অনুরোধ করেছেন। তাঁযর বিবেচনায় এসব চরিত্র ছাত্রদের কৈশোরকালেই ঈর্ষা, লোভ, হিংসা, যুদ্ধ ইত্যাদি অহিতকারী বিষয়ে আকৃষ্ট করে তুলতে পারে। তাই এসব কল্প কাহিনী পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না। এ পর্বে তিনি ব্যায়াম ও শারীরিক শিক্ষার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ব্যায়াম ও শারীরিক শিক্ষার

মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বলশালী হতে পারে এবং ফলে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে।

তৃতীয় পর্ব হচ্ছে উচ্চশিক্ষার স্তর। ষোল থেকে কুড়ি বা বাইশ বছর পর্যন্ত এই স্তরের পরিধি ব্যাপ্ত। এই পর্বে কেবল নির্ধারিত মেধাবী কিছু ছাত্রই পড়াশোনার সুযোগ পাবে। অবশিষ্ট সাধারণ মেধার শিক্ষার্থীরা কারিগরি ও পেশার-উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করবে। অক্ষয়কুমার দত্তের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত তাত্ত্বিক শিক্ষা তাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। এই পর্বে তিনি গ্রামে গ্রামে কৃষিবিদ্যালয় ও শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শিক্ষাগ্রহণ করে যাতে শিক্ষার্থীরা পরবর্তীকালে উপযুক্ত কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারে, সরকারকে খেয়াল রাখতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সঙ্গতি রাখার জন্য, অর্থাৎ কর্মজীবনে গিয়ে যাতে মানুষ শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পারে সেজন্য তিনি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার ওগর গুরুত্ব আরোপ করেন। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে অক্ষয়কুমারই সর্বপ্রথম এদেশে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেন।[১৭] তিনি সর্বস্তরের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেবার কথা বলেছেন, এমনকি মাতৃভাষাতেই কারিগরি শিক্ষার কথা বলেছেন এবং তার জন্য পর্যাপ্ত বই বাংলা ভাষাতেই অনুবাদের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন যাতে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া যায়।

তিন

সমাজ সংস্কারের কথা ভাবতে গিয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতি যে আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা সময়ের প্রেক্ষিতে অভাবনীয় পরিকল্পনা, যার দ্বারা পরবর্তিকালে অনেক বাঙালি মনিষীকে অনুপ্রাণিত হতে দেখা যায়। এমনকি ধর্মনীতি পুস্তকে 'মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থা' সম্পর্কে তিনি যে আদর্শের কথা বলেছেন তা আজকের বৈজ্ঞানিক যুগেও সমানভাবে প্রযোজ্য। শিক্ষা ব্যতীত কোন মানুষ নিজেকে জানতে পারে না, উপলব্ধি করতে পারেনা। সময়ের প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তির ভাবনা চিন্তা, আদর্শ গুরুত্বহীন বলে মনে হলেও, একথা অস্বীকার করা যাবে না যে যদি আমরা আমাদের আত্মপরিচয়কে টিকিয়ে রাখতে চাই তাহলে অতীত সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে বর্তমান ভাবধারা গঠন করতে হবে এবং এটাই একটি জাতির আত্মপরিচয়। এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গি বলে মনে হয়। তিনি মনে করেন যে, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান চেতনার সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চেতনার সমন্বয়ে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করা দরকার। কারণ তিনি জানতেন যে, ভারতবর্ষের নিরিখে ধর্মকে বাদ দিয়ে, আধ্যাত্মিক চেতনাকে দূরে সরিয়ে রেখে কেবল পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান চেতনার উপর নির্ভর করে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করলে তার সাফল্য

সুদূর প্রসারিত হবে না। তাঁর মতে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা মানুষকে যুক্তিবাদী আত্মনির্ভর করে তোলে, আর ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষা মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ সাধনের মধ্যে দিয়ে মূল্যবোধ, নৈতিকতার শিক্ষা প্রদান করে। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান ভিত্তিক যন্ত্রচালিত আধুনিক শিক্ষা ব্যক্তিকে যুগোপযোগী করে তুললেও মূল্যবোধ, নৈতিকতাকে অবলুপ্ত করে ব্যক্তিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে এবং ব্যক্তির পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাঁধার সৃষ্টি করেছে। প্রকৃত শিক্ষার দ্বারাই প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে এই দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করে পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব।

তথ্যসূত্র :

১। স্বামী অভেদানন্দ, শিক্ষার আদর্শ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা-৬, পৃষ্ঠাঃ ১৬।

২। Complete work of Swami Vivekananda, Advata Ashram, Calcutta, 1986. Vol.I, P – 124

৩। “ব্রাহ্ম আন্দীলন–বিবর্তন, বিভাজন, বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা” www.bengalstudents.com

৪। ‘ব্রাহ্মসমাজ’ onushilon.ong.

৫। ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ (১৯৬২) : আত্মজীবনী, সম্পাদনা : সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।

৬। দত্ত, অক্ষয়কুমার, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ (সম্পাদক, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ‘মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব কিসে হয়?’ দ্রষ্টব্য, ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠাঃ ৮৩।

৭। ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ, আত্মজীবনী (সম্পাদক, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী), কলকাতা, বিশ্বভারতীয় গ্রন্থালয়, ১৯৬২, পৃঃ ২৯৭

৮। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪৭

৯। মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, ভাষা ও শিক্ষা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত (প্রবন্ধ),সম্পাদনা,বাসুদেব হালদার ও সঙ্ঘমিত্রা বসাক, চিন্তা ও চিন্তনে বাঙালি মনীষা, কগনিশন পাবলিকেশন, ২০২২, পৃষ্ঠাঃ ৬৯।

১০। ঐ, পৃষ্ঠাঃ ৬৯

১১। অক্ষয়কুমার দত্ত, শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী (সম্পাদক, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম) ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, মে ২০০৭, পৃষ্ঠাঃ ৬০- ৬১।

১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ (সম্পাদক, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব কিসে হয়?' দ্রষ্টব্য, ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৮৫।

১৩। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, পৃঃ ৮৫-৮৬।

১৪। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, পৃঃ ৯০।

১৫। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, পৃঃ ৯০-৯১।

১৬। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, পৃঃ ৯১।

১৭। এম মতিউর রহমান, অক্ষয়কুমার দত্তঃ জীবনবেদ ও দর্শন (প্রবন্ধ), সম্পাদনা, বাসুদেব হালদার ও সঙ্ঘমিত্রা বসাক, চিন্তা ও চিন্তনে বাঙালি মনীষা, কগনিশন পাবলিকেশন, ২০২২, পৃষ্ঠাঃ ৬৯

অরুণেশ ঘোষের কবিতায় পতিতা-প্রসঙ্গ: নারী স্বাধীনতার বিকল্প পাঠ

সৌরভ মজুমদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক অঞ্চলের কবি অরুণেশ ঘোষ বাল্যকাল থেকেই নানাভাবে বেশ্যা-বারাঙ্গনাদের সংস্পর্শে এসেছেন। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন যে মানসিকভাবে তিনি নিজেকে বেশ্যালয়ের একজন বাসিন্দা বলেই মনে করেন। একটি গ্রাম্য প্রতিবেশে বেড়ে ওঠায় চারপাশে বহু ব্যভিচারের সাক্ষ্যও পেয়েছেন যেগুলি নাগরিক মধ্যবিত্ত ঠুনকো ভদ্রতার মাপকাঠিতে অপরাধ বলে গণ্য হলেও গ্রামজীবনের পক্ষে সাধারণ ঘটনা হিসেবেই পরিগণিত হয়। নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারে বীতশ্রদ্ধ এই কবি প্রকৃত স্বচ্ছন্দ জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন সমাজের প্রান্তে অবস্থানকারী এই গণিকাবৃত্তিধারিণীদের মধ্যে আর যৌনজীবনে স্বাধীনচেতা অন্যান্য সাধারণ রমণীদের মধ্যেই। নিজের কবিতায় তিনি তাঁর এই পরিপার্শ্বস্থিত, দৈনন্দিন যাপনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ যে জগৎ তাকেই তার অন্ধকার ও উজ্জ্বলতাসহ তুলে ধরেছেন। বর্তমান নিবন্ধে অরুণেশ ঘোষের কবিতায় প্রতিফলিত পতিতা-জগতের বিভিন্ন দিকগুলির মাধ্যমে নারীস্বাধীনতার একটি বিকল্প পাঠ কীভাবে উঠে এসেছে তার একটি অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

সূচক শব্দ: অরুণেশ ঘোষ, কবিতা, পতিতা, গণিকাপল্লী, বেশ্যাপুত্র, ব্যাভিচারিণী, পিতৃতন্ত্র, নারীস্বাধীনতা

প্রতিপাদ্য বিষয়:

'পতিতা' শব্দটি 'পতিত' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ, এবং শব্দটি ঔপনিবেশিক পটভূমিকায় বিনির্মিত—সংস্কৃত বা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে শব্দটির কোনো ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। এর উদ্ভব সম্পর্কে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, মূলত "উচ্চকুলোদ্ভবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত গৃহত্যাগী মহিলা"[১]-দের বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্য এই শব্দের প্রচলন হয় সাধারণভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর(১৭৭০ খ্রি.)-এর সমসময়ে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও নতুন সংস্কৃতির ধারক বিদেশি শাসকের সামাজিক-রাজনৈতিক চাপে বর্ণহিন্দু সমাজের কঠোর নৈতিক আচ্ছাদনে ফাটল ধরায় কুলীন গৃহের 'প্রোষিতভর্তৃকা, অবিবাহিত কন্যা ও বালবিধবা'-রা লম্পট প্রেমিক বা কুটনীবৃত্তিধারিণীর আবাহনে কুলবন্ধন মুক্ত করে গৃহত্যাগ করেন এবং পরিণামে গণিকালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। "তাঁদের গৃহত্যাগ ও জাত, কুল, শীলের অবস্থান থেকে স্খলন যেহেতু অধঃপতন বলে সমাজে বিবেচিত হত, তাই 'পতিতা' নামে এই

অভিধা প্রচলিত হল এই মহিলাদের চিহ্নিত করার জন্য।”[২] কুলীন মহিলারা ছাড়াও যাঁরা ‘পতিতা’ আখ্যার মধ্যে চলে আসেন ক্রমে তাঁরা হলেন নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বহিরাগত শক্তির দ্বারা গৃহচ্যুত নিম্নবর্গীয় নারী, ‘খেমটা’ বা ‘ঝুমুর’ গায়িকা, নর্তকী, ভ্রাম্যমাণ বৈষ্ণবী, মুসলমান বাইজি সম্প্রদায় প্রমুখ। কালক্রমে ‘পতিতা’ ও ‘বেশ্যা’ তথা ‘যৌনকর্মী’ এক ও অভিন্ন বলে প্রতিভাত হলেও উৎসগতভাবে দুটি অভিধার মধ্যে তফাৎ রয়েছে। ‘পতিতা’ শব্দের প্রাথমিক আভিধানিক অর্থ “ভ্রষ্টা, কুলটা, কুচরিত্রা”[৩]—পরবর্তীতে এর দ্বিতীয় অর্থরূপে সংযুক্ত হয়েছে ‘বেশ্যা’ শব্দটি। বেশ্যা তথা দেহোপজীবিনীর সংজ্ঞা নির্দেশ করে সুকুমারী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন—

> বিবাহ সম্পর্কের বাইরে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা নারী যখন বিবাহিত পুরুষের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধানের ‘মূল্য’ রূপে অর্থ বা উপহার গ্রহণ করে তখন সেইটিই গণিকাত্বের লক্ষণ, সে মূল্যগ্রহণ মধ্যে মধ্যেই হোক অথবা নিয়মিত বৃত্তিরূপেই হোক। কাজেই গণিকাবৃত্তি ‘বিবাহবন্ধনের বাইরে’ একটি নিয়ামক লক্ষণ এবং ‘মূল্যগ্রহণ’—এ দুটির দ্বারা চিহ্নিত। ঋগ্বেদ-এর জার বা জারিণী, উপপতি বা উপপত্নী কিংবা অবৈধ প্রণয়ী বা প্রণয়িনী, মূল্য দান বা গ্রহণ অনুপস্থিত বলেই এই সম্পর্কে গণিকাবৃত্তির অন্তর্গত নয়।[৪]

স্পষ্টত, বিবাহবন্ধনাতিশায়ী যে ইন্দ্রিয়সম্পর্কে মূল্যগ্রহণ বিষয়টি সংযুক্ত থাকে না, সেটি বেশ্যাবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও সামাজিক তথা নৈতিক অবস্থান থেকে বিচ্যুতি ঘটে, ফলে সেই সম্পর্কে সংযুক্তা নারীকে ‘পতিতা’ অভিধার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে বলেই মনে হয়। বিবাহবহির্ভূত যৌন-সংসর্গের এই সামাজিক ও ধর্মীয় অনুমোদনহীন ক্ষেত্রগুলিকে প্রাচীন হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রে ‘ব্যভিচার’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর ক্ষেত্রটি হল গুরুপত্নীগমন, এছাড়া “প্রতিপালিতা, বন্ধুপত্নী, সগোত্রা, পরিব্রাজিকা ও কুমারী”[৫]প্রভৃতি ‘অবাঞ্ছিত’ নারীগমনের ক্ষেত্রেও ব্যভিচার ঘটেছে বলে ধরা হত। বস্তুত ‘ব্যভিচার’ হলো দণ্ডযোগ্য যৌন-সংসর্গ, যার আওতার বাইরে ছিল গণিকা ও ব্রাহ্মণ-ভিন্ন অন্য বর্ণের স্বৈরিণী, স্বামী-পরিত্যক্তা নিষ্কলঙ্কা স্ত্রী, নপুংসক বা ক্ষয়রোগাক্রান্ত স্বামীর পত্নী প্রমুখেরা। আভিধানিকভাবে ‘ব্যভিচার’-এর একটি অর্থ ‘স্খলন’[৬] বা ‘স্খালিত্য’[৭], ‘পতিত’-এর অর্থও ‘ভ্রষ্ট, চ্যুত, স্খলিত’[৮]। সুতরাং এ-দুটি শব্দ অনেকাংশে একই অভিমুখ নির্দেশ করে বলে ধরে নেওয়া যায়। সুতরাং বর্তমান নিবন্ধে ‘পতিতা’ অভিধার মধ্যে সামগ্রিকভাবে বিবাহবহির্ভূত ইন্দ্রিয়সম্পর্কে সংযুক্ত নারী—যিনি অর্থের বিনিময়ে অথবা বিনাঅর্থে দেহদান করেন—অর্থাৎ যুগপৎ বেশ্যা ও ব্যভিচারিণী উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং কবি অরুণেশ ঘোষের কবিতায় সেই নারীদের অবস্থান কেমন তা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

অরুণেশ ঘোষ(১৯৪১-২০১১ খ্রি.)-এর জন্ম কুচবিহার শহর থেকে আরও প্রত্যন্তে ‘হাওয়ার গাড়ি’ নামক একটি গ্রামে, যেখানে আদি বাসিন্দা ছিলেন রাজবংশি জনগোষ্ঠীর মানুষ। চিকিৎসক হওয়ায় জীবনদাতা রূপে ধর্মপিতা বা কিছু ক্ষেত্রে ঈশ্বরপ্রতিম ভক্তির অধিকারী ছিলেন তাঁর পিতা গঙ্গেশ ঘোষ, যে ভক্তির অর্পিত ভার তাঁর উপরেও প্রযুক্ত হতো অনায়াসেই। ধর্মসম্পর্কে আত্মীয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় সমগ্র গ্রামসমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন কবি, যার ফলে তাঁর কাছে গ্রামজীবনের গোপনতম রহস্যগুলিও উন্মুক্ত হয়ে যেত বাল্যকাল থেকেই। নিজের গ্রামের বিশিষ্টতা নিয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল—“গ্রামবাসীদের ভাষা, জীবনধারা, আচার-আচরণ ছিল সরল, আনন্দময়, আন্তরিক, খোলামেলা আর আদিমপ্রায়। যৌনতা নিয়ে তাদের কোনো রাখ-ঢাক ছিল না।”[৯] এই উভয়ত অনুকূল পরিবেশে গ্রামজীবনে সংঘটিত যুগপৎ বৈধ ও অবৈধ যৌনতা সম্পর্কে কবি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন প্রায় শৈশবাবস্থা থেকেই। গ্রামে প্রথাগত বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় তাঁকে পাড়ি জমাতে হয় নিকটস্থ শহরে। শহরে হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে তিনি যে বাড়িতে আশ্রয় নেন তার অবস্থান ছিল গণিকা পল্লীর ঠিক পাশেই। ফলত ক্রমে এই পল্লীর মহিলারাই হয়ে ওঠেন তাঁর অতিপরিচিত, কখনো-বা আত্মীয়সমা। এঁদেরই কাউকে উদ্দেশ করে তিনি লিখে যান “উত্তরের বুড়ি বেশ্যার দিকে আমার এই বন্দনাগান”, যে কবিতায় বিগতযৌবনা মৃত্যুসম্মুখীন বেশ্যার প্রতি কবির স্নেহমিশ্রিত শ্রদ্ধা সামগ্রিকভাবেই যেন বারাঙ্গনা-সমাজের প্রতি তাঁর মনোভাবকে সুস্পষ্ট করে তোলে—

প্রায় এই শহরের সমবয়সী তুমি
তোমার হলদে-সাদা হাড় থেকে ঝুলে পড়েছে ফিকে মাংস
ঝুলে পড়েছে লোভ-জাগানিয়া সেই উজ্জ্বল মসৃণ ত্বক
রসুন খোসার মতন যা তোমাকে জড়িয়ে, আটকে এখেছে তোমাকে...
তোমার অনেক দিন আগেকার অনেক অনেক পুরনো
নীল ও বেগুনি রক্তস্রোত

তোমার দিকে আমার এই বন্দনাগান
এই শহরের পচে ওঠার মধ্যে থেকে আমার মুখের গরম ভাপ
তোমার দিকে, প্রথম শহরের থেকে বয়ে আনা কাঁচা ও সবুজ বাতাস
আর জঙ্গলের মধ্যে আলোড়নময় বাঁকাচোরা হাওয়া
....
তোমার উরু ও স্তনের স্মৃতি ও বিস্মৃতির মধ্যে দিয়ে রোদ ও বাতাস
তোমার শরীরের মধ্যে দিয়ে রোদ ও বাতাস চলে আসে
একমুঠি শুভ্রতার মধ্যে ঘুরপাক খায় হাওয়া, খেলা করে
খেলা করে আর খেলা করে আর সুড়সুড়ি দেয়

রোদ ছড়িয়ে পড়ে আর প্রসারিত হয় আর ঝুঁকে পড়ে
ছোট্ট ঢিবির মতন রোমশ যৌনাঙ্গে তোমার...

(“উত্তরের বুড়ি বেশ্যার দিকে আমার এই বন্দনাগান”/ ‘শব ও সন্ন্যাসী’)[১০]

এই ‘বুড়ি বেশ্যা’ যেন উত্তরের এক ছোটো শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন এ কবিতায়, যাঁর মধ্যে কবি এখনো শহরের প্রতিষ্ঠাপর্বের উষ্ণতা আর সারল্য খুঁজে নিতে চান, খুঁজে পেতে চান রোদ-বাতাসের মতো প্রাকৃতিক সম্পর্কের ওম। বেশ্যাপল্লী আর বিশাল চূড়াওঠা সজ্জিত শহর—এই দুইই যেন এই বৃদ্ধার দুই যমজ সন্তান—শহর তার কাছে যে ‘কালো ধূসর গান’ পাঠায়, তাও যেন এই বৃদ্ধার কাছে আদরের সম্ভাষণ হয়ে ওঠে। নাগরিক সমাজের উত্থানে আর বিস্তারে পণ্যাঙ্গনার ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই কবিতায়। কবির আত্মজৈবনিক বিবৃতির সাক্ষ্যে জানা যায়, উচ্চশিক্ষার্থে শহরবাসকালেই তাঁর পরিচয় হয় ‘বিভামাসী’ তথা বিভাবতী নাম্নী এক বয়স্কা দেহোপজীবিনীর সঙ্গে, যিনি অল্পবয়সে বেশ্যাবৃত্তি করলেও প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে একটি খাবারের দোকান খুলে বসেছিলেন। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন কিন্তু লিখতে না জানা এই নারীর জয়পুরপ্রবাসী পুত্রের জন্য চিঠি লিখে দিতেন কবি, কিন্তু বিনিময়ে কোনও চিঠি আসেনি কখনো। চারিত্রিক গরিমায়, স্নেহপ্রাচুর্যে ও জীবনবীক্ষার মহিমায় এই নারী হয়ে উঠেছিলেন কবির মাতৃসমা—সামাজিক অবস্থানের বিভেদ সেই আত্মিক সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এই নারীর প্রসঙ্গই উঠে এসেছে তাঁর ‘শব ও সন্ন্যাসী’ কাব্যগ্রন্থের “মাকে” কবিতায়, যেখানে তিনি বিভাবতীর যোগাযোগবিচ্ছিন্ন পুত্রের বয়ানে লিখে রাখেন একটি পত্রকবিতা—

এক সরাইখানা থেকে আরেক সরাইখানায় হেঁটে যাবার পথে
আমার সঙ্গে আলাপ হল বেশ্যাদের
ক্লান্ত ঘুম জড়ানো তাদের চোখ, চোখ কচলে হাই তুলে
শায়া ও ব্লাউজ পরা মেয়েরা বেরিয়ে এল আমার গলা শুনে
আমাকে ছুঁয়ে দেখল, ওদের উরুসন্ধিতে দুই বুকের মধ্যিখানে
মুখ ডুবিয়ে আমি আমার অজান্তে খুঁজে বেড়ালাম
খুঁজে বেড়ালাম ছেলেবেলা
মা আমার, চিঠি শুঁকে দ্যাখো তুমি—সেই গন্ধ
সেই পুরনো গন্ধ—যা তোমারই, তোমার গর্ভের
চোলাইয়ের গ্লাসে আমার সাদাটে ঠোঁট নড়ে ওঠে
চোখ ও চশমাসুদ্ধ আমার মুখের ছায়া
নাথুয়া শালবাড়ির নেপালি মেয়েদের হো হো হাসির মধ্যে
আমার দাড়ি ধূসর হয়ে আসে আর আমার চুল

(“মাকে”/ঐ)[১১]

সমাজের প্রান্তিক অবস্থানে থাকা মা-কে পিছনে ফেলে আর্থ-সামাজিকভাবে নিজেকে মধ্যবিত্ত-সুরক্ষায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল যে সন্তান, তার এক ধরনের আত্মসমীক্ষণ প্রত্যক্ষ করা যায় এ কবিতায়—যেখানে সে নিজের অস্তিত্বের উৎসমূল খুঁজে পায় বেশ্যাদের মধ্যেই, আর চোলাইয়ের গ্লাসে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বে গলে যেতে দেখে নিজের মেকি, ক্ষয়াটে চেহারা। এ শুধু একটি চরিত্রের বয়ানে রচিত মনোভাব নয়, এখানে কবির নিজস্ব চেতনাধারাও মিশে থাকে অন্তঃস্রোতা হয়ে। বস্তুত, বেশ্যাপুত্রের উল্লেখ অরুণেশের কবিতায় বারেবারেই পাওয়া যায় এবং সেখানে তাদের মনোজগতের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও অসহায়তার প্রকাশও যথেষ্ট পরিস্ফূট হয়েছে। এদের অবহেলিত আর বিপন্ন শৈশবের এক বাস্তবানুগ বর্ণনা পাওয়া যায় 'পিতৃসত্য' কবিতায়—

ওরা খেলনা ছিপ ফেলে বসে থাকে থিকথিকে ড্রেনের পাশে
মদ এনে দেয় বাবুদের, দেশলাই আর সিগারেট
গাদাগাদি করে জেগে থাকে বারান্দায়, দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে
সিঁড়ি টপকে টপকে মায়ের চলে যাওয়া অচেনা পুরুষের সাথে
ঘরে ঢোকা—ঘরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দেওয়ার শব্দ শোনে
আবার দরোজা খোলার শব্দে চমকে ফিরে তাকায় দুই চোখে
ঘুম নিয়ে অপেক্ষা করে না-ঘুমিয়ে, জেগে থাকে মায়েদের
অবসর না-হওয়া পর্যন্ত, হাই তোলে আর ধমক খায় ডাইনি বুড়ির...

("পিতৃসত্য: ১"/ঐ)[১২]

জীবনের প্রতি একাধারে যে তীব্র একঘেয়েমি ও ভীতির মনোভাব কাজ করে এই বেশ্যাসন্তানদের মধ্যে, তাকে বারবার নিজের কবিতায় তুলে এনেছেন লেখক। কখনো-বা বেশ্যাপুত্রের বয়ানে লিখেছেন কবিতা, যেখানে সন্ধান মেলে তাদের মনোগহনের নিবিড়তায় মিশে থাকা অস্তিত্বের সংকট—তার পিতৃপরিচয়ের অভাবের কথা— "এটা তো ঠিক আমরা কেউই পাগলের ঔরসজাত নই অথবা/ কেউই নয় বেজন্মা, কেবল সেই লোকটাকে ঠিকমতন/ চিনে রাখতে পারেনি আমাদের মা..."("আমাদের ভয় ও সাহস"/ঐ)[১৩]। আবার এরই সঙ্গে পুত্র সম্পর্কে বেশ্যাজননীর আবেগ ও উৎকণ্ঠার পরিচয়ও অরুণেশের কবিতায় পাওয়া যায়, যখন দেখা যায় ভাটিখানার বেঞ্চির তলায় বেশ্যা আর মাতালের হুল্লোড়ের মাঝে স্বপ্নবুনোট ঘুমে 'পশুর মতন' ঘুমিয়ে পড়া শিশুটির মা "শেষ খদ্দেরটাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে/ কুপি হাতে শায়া পরা খোলা স্তন খুঁজতে বেরুবে/ নাম ধরে ডেকে যাবে মাঝরাতে—"("ভ্রমণ: ১"/ঐ)[১৪]। সেই মাতার সন্তান হওয়া যে যথেষ্ট অহংকারের বিষয়, তাও জানিয়ে দেন কবি। কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজ যে বেশ্যা বা তার সন্তানের আবেগের কোনো মর্যাদা দেবে না—সেই সমাজের কাছে বেশ্যা যে কেবল পুরুষেরই যৌন-বুভুক্ষা চরিতার্থতার একটি

মাধ্যমমাত্র, তাও এক ধরনের আত্মব্যঙ্গ ও করুণার সংমিশ্রণে কবি তুলে ধরেছেন নিজের কবিতায়—

এই না-ঘুমিয়ে পড়া মধ্যরাত্রির মাতাল শহরে
বেশ্যা তুই, তোকে ডিঙিয়ে আসতে হবে ঘুম ও স্বপ্ন
বাচ্চার কঁকিয়ে ওঠা, পাশ ফেরা, খালি পেট ও হাইতোলা
বেশ্যা তুই, তোরই অপেক্ষায় সেই ছেলে
বাবুদের বাড়ির সেই রোগা পট্‌কা ছেলে

("শহর, বেশ্যা ও বাবুদের বাড়ির ছেলে"/ঐ)[১৫]

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিতায় অরুণেশ একটি 'আমি' চরিত্র ব্যবহার করেছেন, যা কবিতার কথক হিসেবে পৃথক কোনো চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছে কখনো, আবার কখনো তাঁর নিজের বয়ানেও কথা বলেছে—যার মধ্যে দিয়ে কবির নিজস্ব দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রটি পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে। "জয়ন্তী ও নক্ষত্র" কবিতাগুচ্ছটিতে এভাবেই কবির নিজস্ব দায়বদ্ধতার পরিসরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ম্যাজিক রিয়ালিজমের উপাদানে নির্মিত এই কবিতায় দেখা যায় নক্ষত্রলোক থেকে নেমে আসা দুই ঘাতক কবির টেবিলে নিজেদের ডানা ও মুকুট খুলে রেখে পরে নেয় মানুষী পোশাক, পুরনো জুতো—জেনে নেয় মানবীয় হাসির রহস্য, জানতে চায় জয়ন্তী নামের এক বারাঙ্গনার কাছে যাওয়ার পথ ও উপায়। যে কানাকড়িটি তারা চেয়ে নিয়ে যায় কবিরই কাছ থেকে, তাই যেন জয়ন্তীর মৃত্যু পরোয়ানা হয়ে ওঠে, কারণ—

দরোজা বন্ধ করেই টাকার জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়া জয়ন্তীর
মুখজোড়া হাসি
তারা হাতে তুলে দেয় ভিক্ষে করা সেই একটি কানাকড়ি
আতঙ্কে নীল হয়ে ওঠে জয়ন্তীর মুখ, 'মা' একবারই সে ডাকে
একজন একটানে খুলে ফেলে তার শায়া ও শাড়ি, অন্য জন
চেপে বসে বুকে
ছদ্মবেশে একটিই খুঁত: মানুষের লিঙ্গের জায়গায় গুটিয়ে রাখা
দীর্ঘ ও স্বাভাবিক একেকটি তরবারি

যে নক্ষত্রদের মধ্যে ফুটে থাকে
নিঃশব্দে হেসে ওঠে হত্যাকারীদের বুকের মধ্যে যে মুখ
এই যে দলাপাকানো জমে ওঠা স্তূপ
শহরের পাশে গ্রাম, গ্রামের পাশে শহর
যার উপর নেংটো আর দপদপ করে জ্বলছে শূন্যে থেকে ছিটকে
আসা একটি ফুল

একই স্তন থেকে রক্ত ও ক্ষীরের ধারা
একই ঊরুর মধ্যে মৃত্যু-উপত্যকার তলায়, ভ্রূণ ও আত্মার স্তব্ধ কলরব
সেই ফুল, সেই খোলা শরীর, সেই নেংটো নক্ষত্র
আকাশ থেকে নামিয়ে আনে তার হত্যাকারীদের...

("জয়ন্তী ও নক্ষত্র ১"/ ঐ)[১৬]

যে স্তন থেকে শিশুর জীবনদায়ী ক্ষীরধারা নির্গত হয়, ধর্ষকের আঁচড়ে-কামড়ে ছিন্নভিন্ন সেই স্তন থেকেই নির্গত হয় মৃত্যুগন্ধী রক্তধারা। জীবনের উৎসরূপ যে ত্রিকোণ জমি ভ্রূণ ও আত্মার জন্মক্ষেত্র—তাই ধর্ষকের অত্যাচারে মৃত্যু-উপত্যকার স্তব্ধতা পায়। আর এই ধর্ষক মিশে থাকে প্রতিটি পুরুষে—শহুরে অথবা গ্রাম্য নির্বিশেষে—কবিও তাদেরই একজন। ভিক্ষে করে নেওয়া কানাকড়িটি তাই সাধারণ্যের প্রতীক হয়ে ওঠে—যে জনতা উর্বরতার স্থাপনায় অক্ষম, কিন্তু সক্ষম নারীর অবমাননায়, তার আত্মিক হত্যাকর্মে সে অত্যন্ত দক্ষ ও নিপুণ। আকাশচারী দেবদূতসম প্রতিটি ভদ্র মধ্যবিত্ত-সন্তানই তাই বেশ্যালয়ে পৌঁছয় ওই আততায়ীর ছদ্মবেশ নিয়ে, যার লিঙ্গ যেন নির্যাতনকারী একেকটি সুদীর্ঘ তরবারির মতোই কর্তিত করে চলে নারীর দেহ ও আত্মাকে—তার অস্তিত্বকে করে খণ্ডিত।

বস্তুত, নিজস্ব শ্রেণি অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মেরুদণ্ডহীনতায়, দালাল-সুলভ সুবিধাবাদী মানসিকতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ কবি যেন এই তথাকথিত নিচুতলার মানুষগুলির মধ্যেই মানবিকতার প্রকৃত রূপটি পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলেন, দেখতে পেয়েছিলেন মিথ্যা ও ভণ্ডামির মুখোশহীন স্বতস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক মুখাবয়ব। তাঁর নিজের বক্তব্যে—

> আমি ছিটকে পড়লাম অপরাধ জগতে। আমার যাত্রার শুরু কিংবা যা শুরু হয়েছিল মাতৃগর্ভেই। আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল ভাটিখানা, বেশ্যাপাড়া, ছোট ছোট চাটের দোকান, দরিদ্র দোকানীর পরিবার, মাতাল, পাগল, বেশ্যা, দালাল, বাড়িউলি ও অপরাধীরা। যাদেরসঙ্গে আমার যোগাযোগ গড়ে ওঠে সেই কৈশোরেই, স্কুলে পড়তে পড়তেই। আমি স্বপ্নতাড়িত। আমার স্বপ্ন আমাকে সেই জায়গায় নিয়ে আসে, যেখানে এসে পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থাটা বোঝা যায়। যে অংশ উত্তপ্ত, বিশৃঙ্খল ও প্রেরণাদায়ক। যেখানে বধ্যভূমি ও জন্মভূমি মিলেমিশে আছে। বাকি পৃথিবী মৃত, ভণ্ড ও নির্বোধ। এখানে বহমান ধারা।[১৭]

শৈশবাবধিই তিনি সান্নিধ্যে এসেছেন এমন বহু নারীর যাঁরা প্রচলিত সামাজিক বিধি-নিষেধের শিকল কেটে নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে নিয়েছেন। সমাজ তাঁদের মেনে নেয় নি, কিন্তু আত্মসচেতন ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করেছেন, এঁরাই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন। তাঁর মাতামহীর আত্মীয়া চারুশশী—যিনি বিধবাবস্থায় সন্তানবতী হয়েছিলেন; তাঁর প্রমাতামহের রক্ষিতা অভয়া—যিনি ধনী পরিবারের কন্যা হয়েও বারংবার মামা কিংবা কাকাদের কাছে ধর্ষিতা হতে হতে বাড়ি থেকে পালিয়ে বেশ্যাপল্লীতে আশ্রয়

নিয়েছিলেন; তাঁর পাড়ার মেয়ে বালবিধবা সরমাপিসি যাঁকে ভ্রষ্ট চরিত্রের অজুহাতে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হলে বড়লোক ব্যবসায়ীর রক্ষিতা হয়ে জীবিকানির্বাহ করেন; তাঁর পাড়ায় উদ্বাস্তু হয়ে পূর্বপাকিস্তান থেকে কিশোরী মেয়েকে নিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে আসা বিধবা 'ছায়াদি'—যাঁর উল্লেখ বারবার পাই তাঁর উপন্যাসে বা কবিতায়—

অস্পৃশ্য নদীর জলে একদিন গোধূলিবেলায়
নত হয়ে ধুয়ে নেব খড়্গ আমার
তুমি সেইদিন
ঝোপের আড়াল থেকে হেঁটে এসে একা
বিকেলের নদীর আলোয় মুখোমুখি একান্ত দাঁড়াবে?
অথবা পোশাক ছেড়ে ধীরপায়ে নেমে যাবে জলে
আমি খড়্গ তুলে নেব, আমি দুঃখ তুলে নেব বুকে

তুমি নগ্ন
তোমার পোশাক আমি দু-হাতে ভাসিয়ে দিয়ে যাব
তুমি একা খেলা করো জলে
("আমি ও ছায়াদি"/ 'শব ও সন্ন্যাসীর আগে ও পরে লেখা অগ্রন্থিত কবিতা')[১৮]

ছায়াদির এই পোশাক আসলে তাঁর লোকলজ্জা, তাঁর অপরাধবোধ, তাঁর নিজের শর্তে বেঁচে থাকার ইচ্ছার প্রতি সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বিধিনিষেধের বোঝা—তা জানা যায় লেখকের 'জীবনের জার্নাল' উপন্যাসটি থেকে। এখানে সদ্যযুবক অরুণেশের সঙ্গে শিক্ষিতা আসঙ্গলিপ্সু ছায়াদির লোকচক্ষুরহিত সম্মিলন এবং অরুণেশের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ছায়াদির এই স্বেচ্ছারোপিত সংস্কার-বন্ধন থেকে মুক্তির বিবরণ রেখে গেছেন লেখক। ছায়াদি চরিত্রটিকে মুখ্যত একজন ব্যভিচারিণী নারী রূপেই অঙ্কন করেছেন লেখক তাঁর উপন্যাসটিতে, কিন্তু কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে তার চরিত্রের অন্তর্নিহিত মূলকথাটি সংহত আকারে—যেখানে সে নিজেকে প্রকাশ্য আলোকে সম্পূর্ণতায় উন্মুক্ত করে দিতে ভয় পায়। তার কামপ্রবৃত্তির অতিপ্রাবল্যের জন্য তার যে গ্লানিবোধ, সেই গ্লানিবোধেই ঢেকে যায় তার চরিত্রের যাবতীয় সদ্‌গুণ। এই গ্লানিবোধ থেকে উত্তরণের জন্যে লেখকের যে যুক্তি, তা প্রকাশিত হয়েছে অন্য একটি কাব্যাংশে—

কোথাও পাপ ও ঋণ বলে কিছুই নেই
দেখো বুক-মুখ-নাভি থেকে ফুটে উঠেছে একটিমাত্র জবা...
("কালো অভিযান: ২"/ 'শব ও সন্ন্যাসী')[১৯]

বস্তুত যাবতীয় সামাজিক অবদমনের বিরুদ্ধেই কবি প্রতিবাদ রেখেছেন নিজের সমগ্র রচনা জুড়ে। 'জীবনের জার্নাল' উপন্যাসে লেখক তাঁর বাল্যসঙ্গিনী রুমার নিজেরই কাকার কাছে ধর্ষিতা হওয়ার বিবরণ দিয়ে তার সূত্রেই জানান, শারীরিকভাবে না হলেও মানসিকভাবে শৈশব থেকেই প্রতিটি শিশু—লিঙ্গ-নির্বিশেষে—ধর্ষিত হয়, অবদমিত হয়—কারণ তাকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। রুমা যেমন ধর্ষিত হয়েও তা কাউকে বলতে পারে না, তেমনি অরুণেশও কাউকে জানাতে পারে না তার বই পড়ার অনুভূতির কথা, তার 'আবেগের, উচ্ছ্বাসের অভিপ্রকাশ'-কে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেওয়া হয় বারবার। তাই,

> তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমাকেও সিদ্ধান্ত নিতে হবে খুন করার। এক এক করে প্রত্যেকটা ধর্ষককে আমরা খুন করতে পারব না—আমাদের খুন করতে হবে সামগ্রিক ভাবে। খুন করতে হবে গোটা সভ্যতা-চক্রকে...[২০]

"হেমন্তকাল" কবিতায় দেখা যায়, ঘরের বাইরের দড়িতে মেলে দেওয়া শাড়ি হেমন্তকালের দুপুরের শীতল হাওয়ায় ফুলে উঠে উড়তে থাকে—একই সঙ্গে যেমন ভদ্র গেরস্থদের বাড়িতে, তেমনি বেশ্যাবাড়িতেও। লাল শায়া পরা কিশোরীর শরীরময় রোদেলা দুপুর, পাটাতনে ঘুমন্ত মাতাল, সদ্যযুবতীর পায়ের কাছে আনন্দময় শিশু—কবির প্রশ্ন, কোথায় তফাত? তফাত খুঁজে পান সভ্যতারই অতল গহ্বরে, যেখানকার কালো কুয়াশার মধ্যে থেকে উঠে আসে 'হু হু গাঢ় বাতাস', যে বাতাস বিভাজনরেখা টেনে দিয়ে যায় ভদ্র আর অভদ্র পল্লীর সীমানায়, যেখানে শায়া আর ব্রেসিয়ারে শোভিত মেয়েরা বেরিয়ে এসে ছিঁড়ে দেয় হেমন্তের মায়াভরা দুপুর; সভ্যতারই রক্তের গহিন থেকে তীব্র হাতে—

> তুলে আনে মুঠো মুঠো সিফিলিস জীবাণু
> ছড়িয়ে দেয় হেমন্তকালের রৌদ্রে—আকাশে, হাওয়ায়
> অনন্তকালের মানুষী ফসলে"("হেমন্তকাল"/ 'শব ও সন্ন্যাসী')[২১]

এ যেন লেখকের সেই প্রতিটি ধর্ষককে সমগ্রতায় নিধনের ইচ্ছারই আরেকটি রূপ—যেখানে আবহমানের বিভেদের, অবমাননার, অবদমনের প্রতিদানে ছড়িয়ে দেওয়া হয় মারণবীজ প্রতিটি বিধিস্থাপনকারী পুরুষের রক্তে। হেমন্ত এখানে ধ্বংসের আগের শেষ আলোকরেখারই বার্তা বয়ে আনে যেন, যার অন্তে কালো রাত্রির ছায়াপথে কোনো এক নগ্নিকা ঈশ্বরীর বিষাদিত 'আধিভৌতিক শাড়ি'-র নিচে ঢেকে যাবে অবদমনকারী এই মানবসমাজ। কিন্তু যে পাপে তারা মগ্ন, সেই আদি পাপের জন্য, তথা ঈশ্বর বা সমাজশাসকের অনুমোদিত বিধিনিষেধের লঙ্ঘনের জন্য তারা দায়ী করে সেই নারীকেই। "নারীকে—ক্রুশকাঠের দিকে" কবিতায় কবি যখন এক বেশ্যাকে প্রণাম করেন, তখন সেই বেশ্যা ক্রমশ তাঁকে পরাবাস্তবিক স্তরপরম্পরায় নিয়ে চলে আদিমাতৃকাদের কাছে। একালের এক 'সুন্দরী, বয়স্কা' বেশ্যার মা 'তরুণী, রূপসী'—

“আঁটো পাজামা ও ব্রেসিয়ার পরে নেচেছিল সে”(“নারীকে—ক্রুশকাঠের দিকে”/ঐ)[২২]। তার মাতামহী সদ্যতরুণী, বুকে-কোমরে নামমাত্র কাপড় নিয়ে বসে সে আপেলে কামড় বসায়—যেন কবি ইঙ্গিত করেন আব্রাহামীয় মিথের আদিনারী ইভের প্রতি, যাকে ‘আদিপাপ’-এর উৎসরূপে চিহ্নিত করে সমগ্রতায় নারীলিঙ্গটিকেই অবদমিত ও অন্যায়ভারে-অবনত রাখার চেষ্টা করে গেছে পুরুষশাসিত সমাজ যুগ-যুগান্তর ধরে। তার মাতামহী ‘পোশাকহীন, বিবসনা কিশোরী’, যার সঙ্গে সংগমে লিপ্ত হয়েছেন কবি। তাদের বংশাধিপতির কাছে পৌঁছতে পারেন নি কবি—

> ‘তিনি মানুষ নন,
> তিনি কুকুর, বড় মহৎ ও দুঃখী তিনি, বুকে পাপের পাহাড়, পাহাড়ে কালো কালো বৃক্ষ, তিনি আছেন, গলায় শেকল, বের করা জিভ, দেখা হলে প্রণাম কোরো তাকে’ (ঐ)[২৩]

নানা চিহ্নে ভূষিত করে, ‘দুঃখের গণিত’-এ শিক্ষিত করে কবির হাতে তুলে দেওয়া হয় কাগজে মোড়া উরুর মাংস—গাঁ-গঞ্জে বিতরণের জন্যে। প্রত্যক্ষতায় ক্রুশকাঠে বিদ্ধ করার পরিবর্তে নারীকে কীভাবে প্রতিটি বয়সে ধর্ষিত হতে হয়, বহন করতে হয় তথাকথিত সভ্যতার মূলীভূত পাপের পাহাড়, মনুষ্যেতর জীবের মতো শিকলে বদ্ধ থাকতে হয় আপাত স্বর্গীয় এক মহানতার আড়ালে—এক অসাধারণ রহস্যময়তার বাতাবরণ সৃষ্টি করে কবি তার বিবরণ দিয়ে যান, আর সেই সঙ্গে পুরুষ-শাসিত সভ্যতার একজন প্রতিনিধি হিসেবে যেন কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্তও করে যান তীব্র আত্মব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে।

ভূমেন্দ্র গুহ অরুণেশকে নিয়ে রচিত একটি প্রবন্ধে যথার্থতই জানিয়েছিলেন,

> অরুণেশ’ এর সাহিত্যে প্রতিবাদের উপায় হচ্ছে মূলত বেশ্যারা—সামাজিক অথবা অসামাজিক—যদিও তাবৎ ‘নীচের তলার মানুষ’ নিয়ে তাঁর আগ্রহ অপরিসীম। ... অরুণেশ, ... বেশ্যাবৃত্তিকে যৌনমুক্তির তথা ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন, যৌনতা যেহেতু মানুষের প্রকৃতিদত্ত চারিত্র্য হিসেবে একান্তই তার নিজস্ব, অর্জন করতে হয় না, এবং নিজের সেই যৌনতার ব্যাপারে আচার-আচরণেও তার স্বাধীনতা থাকতে পারে অথবা থাকা উচিত।[২৪]

বস্তুত, অরুণেশ সামগ্রিকভাবে পতিতা-জগতের একটি বিশ্বস্ত চিত্র তাঁর কবিতায় অঙ্কন করেন শুধু না, তাদের প্রতি তথাকথিত ভদ্র মধ্যবিত্তের আচরণের মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের ভণ্ডামির মুখোশটিও উদ্ঘাটন করে দেন, আর সেই সঙ্গে চিহ্নিত করে যান এই ভদ্র সভ্যতার মসৃণ ত্বকশোভায় কীভাবে লেগে আছে এই বেশ্যাপল্লীর প্রতিটি বাসিন্দার ঘাম-রক্ত-জল। সর্বোপরি, তিনি সামগ্রিকভাবেই নারী যৌনতার পরিসরটিকে আলোকিত করে তুলতে চান যেখানে লজ্জা বা গ্লানিবোধ থেকে মুক্ত হয়ে যথার্থত

নিজের জীবন নিজের ইচ্ছামতো গড়ে তোলার স্বাধীনতা তারা ভোগ করতে পারবে। ‘গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ: যুদ্ধ ও যৌনতা’ প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টতই নিজের জেলাকে ‘কাম’-এর দেশ এবং যৌন স্বাধীনতা ও সেইসূত্রে নারী-স্বাধীনতার দেশ বলেও চিহ্নিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য—

> যৌন-স্বাধীনতার অর্থ পুরুষের যথেচ্ছাচার নয়, নারীর স্বাধীনতাকে সমাজের মাথা পেতে নেওয়াতেই যে যৌন স্বাধীনতার বড় একটা দিক সূচিত হয়, এটা আমাকে বই পড়ে বোঝার আগেই জীবনের পাঠ নিয়ে সৌভাগ্যক্রমে বোঝা হয়ে গিয়েছিল, সে জন্যে তথাকথিত সভ্যতার মধ্যে যে ন্যাকামি, মিথ্যা ও ভণ্ডামির ঘৃণ্য ধারাটি রয়েছে তাকে আমি বর্জন করতে পেরেছি, জীবনের ও লেখালেখির শুরু থেকেই।[২৫]

সুতরাং, ব্যক্তিগত চেতনায় ও কাব্যশরীরেও যৌনস্বাধীনতা তথা নারীস্বাধীনতার বক্তব্যকে অরুণেশ যে পতিতা-সমাজের নিবিড় অভিজ্ঞতার আলোকে তুলে ধরতে পেরেছেন, সে বিষয়ে প্রায় নিঃসন্দেহ হওয়া যায় বোধহয়।

তথ্যসূত্র:

১. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘অশ্রুত কণ্ঠস্বর’, সুবর্ণরেখা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৮।

২. ঐ

৩. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত, ‘সংসদ বাঙ্গালা অভিধান’, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, মে ১৯৭৩, পৃ. ৪৮৯।

৪. সুকুমারী ভট্টাচার্য, ‘প্রবন্ধসংগ্রহ ১’, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২৭০।

৫. অতুল সুর, ‘ভারতে বিবাহের ইতিহাস’, শঙ্খ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৬৭, পৃ. ১১১।

৬. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত, ‘সংসদ বাঙ্গালা অভিধান’, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, মে ১৯৭৩, পৃ. ৬৪৮।

৭. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত, ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, নিউ দিল্লি, ১৩৪০-১৩৫৩, পৃ. ১৬৩৬।

৮. ঐ, পৃ. ১২৬১।

৯. কমলকুমার দত্ত সম্পাদিত, ‘দহন ক্রিয়ার পত্ররূপ দাহপত্র’, সংখ্যা ২৫, বর্ষ ১৭, জুন-ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ৬।

১০. অরুণেশ ঘোষ, ‘কবিতা সংগ্রহ ১’, কবিতীর্থ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ২০।

১১. ঐ, পৃ. ৩৫।

১২. ঐ, পৃ. ৪৮।
১৩. ঐ, পৃ. ৫০।
১৪. ঐ, পৃ. ৪৩।
১৫. ঐ, পৃ. ১৬।
১৬. ঐ, পৃ. ৫৭।
১৭. কমলকুমার দত্ত সম্পাদিত, ‘দহন ক্রিয়ার পত্ররূপ দাহপত্র’, সংখ্যা ২৫, বর্ষ ১৭, জুন-ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ২৩।
১৮. অরুণেশ ঘোষ, ‘কবিতা সংগ্রহ ১’, কবিতীর্থ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৬৮।
১৯. ঐ, পৃ. ২৯।
২০. অরুণেশ ঘোষ, ‘জীবনের জার্নাল’, কবিতীর্থ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩৭।
২১. ঐ, পৃ. ১৫।
২২. ঐ, পৃ. ২২।
২৩. ঐ।
২৪. অমলকুমার মণ্ডল, “অরুণেশ ঘোষের কবিতায় যৌনতার মুক্তি”, উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ‘কবিতীর্থ’ ৮৭, ৩০তম বর্ষ, মাঘ ১৪১৮, পৃ. ৫৪।
২৫. ভূমেন্দ্র গুহ, “গোঁয়ারগোবিন্দ অরুণেশ ঘোষ”, কমলকুমার দত্ত সম্পাদিত, ‘দহন ক্রিয়ার পত্ররূপ দাহপত্র’, সংখ্যা ২৫, বর্ষ ১৭, জুন-ডিসেম্বর ২০১২, পৃ.১৮৩।

নারীর আত্মপরিচয়-সংকট ও উত্তরণ : প্রসঙ্গ তিলোত্তমা মজুমদারের 'আজও কন্যা'

সাধনকুমার সাহা
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
পূজা রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদহ

সারসংক্ষেপ : পুরুষতান্ত্রিকতার ঘেরাটোপে আবদ্ধ নারীর বৈষম্যমূলক পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানটি তিলোত্তমা মজুমদার দেখিয়েছেন তাঁর 'আজও কন্যা' উপন্যাসে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অজন্তা আত্মপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও লিঙ্গবৈষম্যের কারণে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে নিরালম্ব অবস্থানে। ভাই অঙ্কনের প্রতি মায়ের মাত্রাতিরিক্ত পক্ষপাত তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। মা হয়েও অচলা কখনো বোঝার চেষ্টা করেননি অজন্তাকে। ছেলের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে গিয়ে মেয়েকে ব্যবহার করেছেন তিনি। সমস্ত সম্পত্তি মেয়ের অজ্ঞাতে অচলা লিখে দিয়েছেন ছেলেকে। নিজের বাড়িতেই অজন্তা হয়েছে লিঙ্গবৈষম্যের শিকার। নিখুঁতভাবে সাংসারিক দায়িত্ব পালনের পরও তাকে শুনতে হয়েছে সে 'ছেলের কাজ' করেছে। এই উপন্যাস জটিল সমাজ মানসেরই এক মর্মছোঁয়া উদঘাটন।

সূচক শব্দ : অজন্তা, অচলা, অঙ্কন, লিঙ্গবৈষম্য, নিরালম্ব অবস্থান, ছেলের কাজ, আত্মমর্যাদা বোধ, আত্মপরিচয়ের সংকট

মূল প্রবন্ধ :

"নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ কেউ নারী হয়ে ওঠে।"[১]

একবিংশ শতকে দাঁড়িয়েও আজও আমাদের সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়নি। নারী মুক্তি পায়নি তার 'দ্বিতীয় লিঙ্গ'-এর অবস্থান থেকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আবর্তে তাকে প্রতি পদে পদে হতে হয়েছে লিঙ্গবৈষম্যের শিকার। যার সূচনা হয়েছে তার জন্মলগ্ন থেকেই। জৈবিকভাবে একটি শিশু স্ত্রীঅঙ্গ নিয়ে জন্মায় একথা সত্য, কিন্তু তার মধ্যে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ গড়ে তোলে এই সমাজ। সামাজিক নানান বিধি নিষেদের আরোপে একটি শিশুকে ধীরে ধীরে পরিণত করা হয় নারীতে। মল্লিকা সেনগুপ্ত তার 'স্ত্রীলিঙ্গ'-গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "তাকে টিপ পরিয়ে, ঝুঁটি বেঁধে, পুতুল খেলিয়ে, রান্না বাটি ধরিয়ে দিয়ে, বাইরে ঘোরা বন্ধ করে..... সামাজিক ভাবে তাকে মেয়েলি করে তোলা

> হয়। তার সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কোড অভ কন্ডাক্টের বিধি নিষেধ। লিঙ্গের কৃত্রিম ধারণা ও বিভাজন আরোপ করে সমাজ।”[২]

তবে প্রাথমিকভাবে নারী পুরুষের এই বিভাজন গড়ে তোলে পরিবার। জন্মের পরে পরিবার থেকেই লিঙ্গবৈষম্যের কারণে নারীর ভবিষ্যতের চলার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়। ফলত পরিবারের ছেলেদের তুলনায় পিছিয়ে পড়তে থাকে মেয়েরা, তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। ক্রমশ হীনমন্যতা গ্রাস করে তাদের, তৈরি হয় অস্তিত্বের সংকট। আলোচ্য ‘আজও কন্যা’ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তিলোত্তমা মজুমদার (১৯৬৬ -) আমাদের সমাজে তথা পরিবারে যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। মা ও মেয়ের বৈপরীত্যময় সম্পর্কের আলোকে তিনি নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানটিকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন।

 ‘আজও কন্যা’ হার না মানা এক নারীর জীবনের উপাখ্যান। ঘরে-বাইরে যে সমানতালে লড়াই করে চলেছে সমস্তরকম প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে। তবে এই লড়াই শুধুমাত্র তার কর্মক্ষেত্র কিংবা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এ লড়াই অনেকটা মানসিক যেখানে সে প্রতিনিয়ত যুজছে নিজের সঙ্গে নিজেই। এই উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে অজন্তা। শৈশবেই পিতৃহীন অজন্তা পরিবারের প্রধান উপার্জনশীল। অল্প বয়স থেকেই সে কাঁধে তুলে নিয়েছে মা (অচলা) আর ভাই (অঙ্কন) এর দায়িত্ব। আত্মপ্রতিষ্ঠার দীর্ঘ লড়াই তার চরিত্রকে করেছে ঋজু ও স্পষ্টভাষী। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে চলা তার ধাতে নেই। প্রয়োজনে মা ভাইকেও সে ছেড়ে কথা বলেনি। কাজের প্রতি অঙ্কনের নির্লিপ্ততা, পরিবারের সমস্ত রকম দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে চলার প্রবণতা পছন্দ করেনি অজন্তা, অথচ অচলা সব সময় চেষ্টা করেছে অঙ্কনের সমস্ত দোষগুলিকে আড়াল করে রাখতে। ভাইয়ের প্রতি মায়ের এই পক্ষপাত কষ্ট দেয় অজন্তাকে কিন্তু নিজের কষ্টগুলিকে সে প্রকাশ করে উঠতে পারেনা। নিজের ভিতরেই সে গুমড়ে গুমড়ে মরে। চাকরি পাওয়ার পর অজন্তা তার সাধ্যমত চেষ্টা করেছে মা আর ভাইকে খুশি করার। মায়ের ইচ্ছে মত সে কিনেছে টিভি, ফ্রিজ ভাইয়ের পড়াশোনার জন্যও দিয়েছে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা। নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও পরিবারের প্রতিটি দায়িত্ব সে নিখুঁতভাবে পালন করেছে। কিন্তু তার ভালোলাগা-মন্দলাগার কথা কেউ ভাবেনি। সারাদিন অফিসে খাটাখাটনির পর সে যখন অবসরযাপনের জন্য টিভির সামনে এসেছে বসেছে তখন অচলার কাছে তাকে শুনতে হয়েছে কটু কথা –

> “সারাদিন খাটাখাটনি করে একটু দেখতে বসি, তোদের জন্য সেটুকুও পারিনা রে জিজি। আমার কাজ তো শুধু রেঁধে-বেড়ে খাওয়ানো !”[৩]

অথচ অজন্তা লক্ষ্য করে দেখছে ভাই টিভি দেখতে বসলে মা কিছুই বলে না। অঙ্কন যদি কাজকর্ম ফেলে সারাদিন টিভির রিমোট নিয়েও বসে থাকে তাতেও মা কোন অভিযোগ করবে না, যত সমস্যা তাঁর অজন্তার বেলাতেই। অজন্তার শখ-আহ্লাদ মূল্য পায়নি অচলার কাছে। যতটা তিনি ছেলের কথা ভেবেছেন ততটা ভাবেননি মেয়ের কথা। প্রতিদিনের রান্নার ক্ষেত্রেও অঙ্কুর পছন্দই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর কাছে। শুধুমাত্র টাকার প্রয়োজন পড়লেই অচলা তোয়াজ করে চলেছেন মেয়েকে। টাকায় নির্ধারণ করেছে মা ও মেয়ের সম্পর্ক। মায়ের এমন বৈষম্যমূলক আচরণের কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছে অজন্তা। বোঝার চেষ্টা করেছে তার দোষ ঠিক কোথায় –

> "অচলা চিরকাল অঙ্কনের প্রতি দুর্বল।.... অঙ্কন পেটরোগা, অক্ষম, অপারগ। যেন অজন্তার জন্ডিস টাইফয়েড হয়নি, অজন্তা ডুবে যেতে যেতে বাঁচেনি, অজন্তার ফ্লু ছাড়া অসুখ-বিসুখ নেই, এ এক অপরাধ।.... কিংবা আত্মনির্ভরশীল উপার্জনক্ষম হওয়ার প্রবল তাগিদ তার, এও অপরাধ নিশ্চয়ই। নইলে এরকম হয় কেন ?"[৪]

আসলে অজন্তার প্রধান অপরাধই হলো সে একজন মেয়ে। বর্তমানে আইনত নারী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হলেও, আমাদের সমাজে তথা পরিবারে আজও একজন নারীর থেকে একজন পুরুষ অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। প্রায় প্রতিটি পরিবারেই লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যা কিছু ভালো তা গচ্ছিত রাখা হয় বাড়ির ছেলেদের জন্যই। বড় মাছের মুড়ো থেকে শুরু করে ভালো ঘর, ভালো বিছানা, সবেতেই অগ্রাধিকার পায় ছেলেরা। আর ছেলেদের উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের ভাগ পায় মেয়েরা। এই অলিখিত চিরাচরিত নিয়ম যুগ যুগ ধরে বলবৎ রয়েছে আমাদের সমাজে। যার ভিত্তি পাকা করে তুলেছে মেয়েরাই। পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসনের ঘেরাটোপ থেকে তারা মুক্ত হতে পারেননি। অচলাও তার ব্যতিক্রম নন। তাই অজন্তার থেকে অঙ্কুই বেশি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে তাঁর কাছে। লিঙ্গবৈষম্য নিয়ে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন –

> "বস্তুত লিঙ্গবৈষম্য আধিপত্যবাদের প্রশ্রয় ও প্রবর্তনায় সমাজ ও সংস্কৃতির কোষে-কোষে এমন ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যে সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণা গুলি কোথাও প্রতি প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে না। শৈশব থেকেই লৈঙ্গিক ভিন্নতার অভিজ্ঞান প্রতিটি অনুষঙ্গে অনপনেয় ছায়া বিস্তার করেছে।.... 'স্বাভাবিক' নারীর ভাবমূর্তি পিতৃতন্ত্র দ্বারা নির্মিত হলেও তাকে বিশ্বস্ত ভাবে অনুসরণ করার জন্য মেয়েদের আগ্রহ সাধারণত দুর্নিবার। পুরুষের তৈরি লৈঙ্গিক জলবিভাজিকা এতখানি মান্যতা পেয়ে গেছে মেয়েদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে।"[৫]

 ভাই-বোনের মধ্যবর্তী এই বিভাজন নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে অজন্তার মানসলোকে। নিজের অজান্তেই সে ক্রমশ দূরে সরে গিয়েছে মা ও ভাইয়ের থেকে। ফলত একই বাড়িতে গড়ে উঠেছে দুই ভিন্ন জগৎ। যার একদিকে রয়েছে অজন্তা আর অপরদিকে রয়েছে অচলা ও অঙ্কন। একাকিত্বতায় ভুগেছে অজন্তা। নিজের উপার্জনের সবটুকু সংসারের জন্য বিলিয়ে দিয়েও অজন্তা পায়নি তার প্রাপ্য সম্মান। অজন্তারও যে নিজস্ব কিছু চাওয়া- পাওয়া থাকতে পারে, মা হিসেবে তা একবারও মনে হয়নি অচলার। অফিসের কাজের সুবিধার জন্য সামান্য একটি সেলফোন কিনলেও অজন্তাকে জবাবদিহি করতে হয়েছে অচলার কাছে। অঙ্কনকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নিজের জন্য ফোন কেনায় মেয়ের খুশিতে সামিল হননি তিনি। একবারের জন্যও বোঝার চেষ্টা করেননি এই সামান্য পনেরশো টাকা দামের সেলফোনটা কেনার জন্য অজন্তাকে কতটা পরিশ্রম করতে হয়েছে। দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে ছোট্ট একটি শখ পূরণের জন্য। অপরদিকে অঙ্কন না চাইতেও অচলা তার সমস্ত শখ আহ্লাদ পূরণ করেছেন । অফিস থেকে ফিরে এসে অজন্তা দেখেছে অঙ্কনের জন্য এসেছে নতুন সেলফোন। অথচ এত বছর অচলার একবারও মনে হয়নি মেয়েটা বাইরে যায় তার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য একটি ফোন প্রয়োজন। মা হয়েও ছেলে মেয়েকে সমান চোখে দেখার মতো মানসিকতা তৈরি হয়নি অচলার মধ্যে। মায়ের স্নেহ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত অজন্তা নীরবে কেঁদেছে। কিন্তু একবারের জন্যও কোন অভিযোগ সে করেনি। কারণ –

> "সে জানে অচলার নিজস্ব অর্থানুকুল্য আছে, স্বাধীনতা আছে ইচ্ছেমতো কোন কিছু কিনে আনার। কিন্তু এতদিনে একবারও তার মনে হয়নি আহা, মেয়েটা একা একা কোথায় যায়,বাসে-ট্রামে চাপে,ওকে একটা ফোন কিনে দিই ! যেহেতু সে রোজগার করছে এখন,.... তার ওপর দায় বর্তায় সংসারের সকল বইবার, সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সাজিয়ে তোলবার, সে দেবে কেবল,তাকে কেউ কোন কিছু হাতে তুলে বলবে না, এইটুকু তোমার জন্য। তোমাকে দিলাম।"[৬]

তবে শুধু মা আর ভাই নয়, ভালোবাসার মানুষটিও অচেনা হয়ে উঠেছে অজন্তার কাছে। তাদের সম্পর্কের মধ্যেও এসে গেছে টাকার হিসেব। একসাথে কোথাও ঘুরতে গেলে বা খেতে গেলে সে লক্ষ্য করেছে তপোব্রত যদি বিল মেটায় তবে পরের বার বিল মেটানোর সময় কোন না কোন বাহানায় সে সরে যায়,বিল মেটানো হয়ে গেলে সে ফিরে আসে। তপোব্রতর এই চাতুর্য,পর্যায়ক্রমে বিল মেটাবার এই পর্ব আহত করেছে অজন্তাকে। সে সবসময় চেয়েছে তাদের দুজনের সম্পর্ক হবে স্বচ্ছ। সেখানে কোন গোপনীয়তা থাকবে না,আড়াল থাকবে না,থাকবে না কোন অভাব-অভিযোগ এবং সেটি হবে একটি সম্পর্কের আদর্শ অবস্থা। কিন্তু দীর্ঘ সাত বছরেও তারা সেই আদর্শের

কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি। এখনো তাদের সম্পর্ক, 'কত বাঁক,কত গলি,কত চতুরি ও ছলনায় ভরে আছে।' সময়ের সাথে সাথে তারা শারীরিকভাবে একে-অপরের কাছে এলেও মানসিক দূরত্ব তারা অতিক্রম করতে পারেনি। একসময় অজন্তা মনে করতো –

> "নর নারীর পক্ষে চূড়ান্ত অন্তরঙ্গ সম্ভব ঘটনা পরস্পরের কাছাকাছি নগ্ন হয়ে দাঁড়ানো। এখন সে জানে,অন্তরঙ্গের যাত্রা এক দুরহ প্রক্রিয়া। বিবসন হতে পারা তার একটি ধাপ মাত্র,সহায় নয়। যার ফলে কোনদিন অসুবিধে থাকলেও সে প্রাণ খুলে বলতে পারে না 'তপো, আজ একটু অসুবিধা আছে আমার,তুই দিয়ে দে।' বরং নিজেও হিসেব রাখে আজকাল, কার পালা পড়বে।"[৭]

মাত্রাতিরিক্ত হিসেবের কারণে তাদের সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছে ভালোবাসার মাধুর্য। দু-চারদিনের শারীরিক ঝড় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। দৈহিক চাহিদার বশবর্তী হয়ে তারা বন্ধু অংশুর ফ্ল্যাটে লুকিয়ে মিলিত হয়েছে। দিনের পর দিন এই চৌর্যবৃত্তি ভালো লাগেনি অজন্তার। সে চেয়েছে সামাজিকভাবে তাদের এই সম্পর্ক স্বীকৃতি পাক। কিন্তু পরিবারের দোহাই দিয়ে তপোব্রত বারবার বিয়ের কথা এড়িয়ে গেছে। সম্পর্কের এই অনিশ্চয়তায় মানসিক ভাবে বিপন্ন বোধ করেছে অজন্তা। তবে তপোব্রতর কাছে নিজেকে আর বিলিয়ে দেয়নি।স্পষ্টভাবেই জানিয়েছে –

> "বন্ধুর ফাঁকা ফ্ল্যাটের সুযোগে...! তপো আমাকে এখানে আর ডাকিস না তুই।"[৮]

আত্মসম্মানবোধ নিয়ে অজন্তা সরে এসেছে তপোব্রতর কাছ থেকে। ঠিক যেমন সে সরে গিয়েছে মা ও ভাইয়ের থেকেও। অঙ্কনের জন্য সেলফোন আসার দিন থেকেই স্থির করেছিল, সে তার উপার্জনের মূল অঙ্ক বাড়িতে আর জানাবে না। দায়িত্ব পালন করবে ঠিকই তবে নিজেকে নিঃস্ব করে নয়,নিজের জন্যও রাখবে কিছু। কিন্তু অজন্তার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার সুযোগ পায়নি। সংসারের ভার বহন করতে গিয়ে নিজের দিকে তাকানো সম্ভব হয়নি। চাকরি করা সত্ত্বেও বাকি বন্ধুদের মতো দামি ব্যাগ, জুতো, কিংবা ঘড়ি সে কিনতে পারেনি। আসলে ছোট থেকে তার জীবন তাকে শিখিয়েছে মিতব্যয়ী হতে। তবে প্রতিনিয়ত এইভাবে সংগ্রাম করে বাঁচতে গিয়ে কখনো কখনো মেজাজ হারিয়ে ফেলেছে। রেগে গিয়ে বন্ধু মঞ্জিরা কে বলেছে –

> "আনন্দ শুকিয়ে গেলে যাবে। তোদের আর কি ! তোদের মাস মাইনের জন্য বাড়িতে কেউ হাঁ করে বসে নেই।.... মেয়ে হিসেবে তোদের রোজগার হলো বোনাস, আর আমার ওনাস।"[৯]

কিন্তু, মেয়ের এই কৃচ্ছসাধন মূল্য পায়নি অচলার কাছে। বিপদের দিনে একসময় যে আত্মীয় স্বজনেরা পাশে দাঁড়ায়নি, অচলা তাদের সাথেই পুনরায় সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছেন দামি উপহারের বিনিময়ে। যার ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে অজন্তাকেই। প্রবল আত্মাভিমানী অজন্তা মায়ের এই আচরণ সমর্থন করতে পারেনি। ফলত

পারস্পরিক মতানৈক্যের কারণে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। অঙ্কু চাকরি পাওয়ার পর যা আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। ছেলের গর্বে গর্বিত অচলা আত্মীয়-স্বজনদের সামনেই নিজের মেয়ের নামে বসিয়েছে নিন্দের আসর –

> " সংসার খরচ দেয় বলে মেয়ের হাতে তোলা হয়ে থাকতে হয় সারাক্ষণ! পেটের মেয়ে হলে কি হয়, সারাক্ষণ পিষছে!.... আমার কপাল নইলে মেয়ের অন্ন খেতে হয়?.... আর খালি ভাইয়ের সঙ্গে হিংসে।"[১০]

জন্মদাত্রী মা হয়েও অচলা মেয়ের জীবন সংগ্রামে সামিল হতে পারেননি। বরং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন প্রতি পদে পদে। তিনি যতটা ছেলের মা হয়ে উঠেছেন, ততটা পারেননি মেয়ের মা হয়ে উঠতে। এই বিষয়ে মল্লিকা সেনগুপ্তের মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য –

> "পিতৃতন্ত্র বা পুরুষের শাসন ব্যবস্থা পুরুষের মাথা থেকে বেরলেও নারী ও পুরুষ উভয়েই তার ভিত্তি পাকা করেছে। সেই নারীরা বোঝেনি যে এই ব্যবস্থা তাদেরই বিরুদ্ধে সক্রিয়, এখনো অধিকাংশ মেয়ে তা বোঝে না।"[১১]

অচলাও তা বোঝেননি, কিন্তু যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তখন তার ছেলে নয় বরং মেয়েই সবার আগে এগিয়ে এসেছে। অ্যানজিওপ্লাস্টির বিপুল খরচ যোগাতে হিমসিম খেয়েছে অজন্তা। তবে এই সময় তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে ছয় বছর আগে হারিয়ে যাওয়া বন্ধু শিবেন্দু। নির্দ্বিধায় সে অজন্তার হাতে তুলে দিয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা। অপরদিকে তপোব্রত টাকা দেওয়ার ভয়ে অজন্তাকে এড়িয়ে চলেছে। মায়ের অসুস্থতার কথা জানাতেই বলেছে 'আমাকে বলে কি হবে? আমি কি ডাক্তার? মা অসুস্থ, টক টু ডক্টরস দেন।' তপোব্রতর ভালো মানুষির মুখোশ খুলে গেছে অজন্তার কাছে। তা সত্ত্বেও বন্ধুদের কাছে তপোব্রতর প্রকৃত স্বরূপ সে উন্মোচন করতে দ্বিধাবোধ করেছে। তপোব্রতকে আড়াল করতে সে মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে –

> "ভেবে পাইনা কিছুতেই সত্যিটা বলতে পারল না কেন! তপোব্রতকে আড়াল করেছে সে। বন্ধুদের কাছেও তাকে আগলে রাখার কি মানে হয়? না কি সে আড়াল করছে নিজেকেই! তপোব্রত তাকে যথোচিত গুরুত্ব দিচ্ছে না, অংশ নিচ্ছে না তার সমস্ত বিপর্যয়ে, এই প্রচারে তারও তো অবমাননা ঘটে।"[১২]

 তপোব্রতর মত নিজের মাকেও অজন্তা চিনেছে নতুন ভাবে। অচলাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়ার পর সেখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া অচলার গলার হার, চুরি, আংটি আলমারির লকারে তুলে রাখতে গিয়ে পেয়েছে গোপন সত্যের হদিশ। সে লক্ষ্য করেছে লকারে রয়েছে প্রায় চার লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট সার্টিফিকেট এবং সেভিংস রেকারিং মিলিয়ে আরো এক লক্ষ টাকা। যার সবগুলিতেই নমিনি করা হয়েছে

অঙ্কনকে। এমনকি বাড়ির দলিলে পর্যন্ত রয়েছে অঙ্কন নাম। কিন্তু কোথাও নেই অজন্তার নাম। ছেলের ভালো চাইতে গিয়ে মেয়েকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করেছেন অচলা। মায়ের বিশ্বাসঘাতকতায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে অজন্তা। রাগে-দুঃখে-অপমানে কখনো সে কেঁদে ফেলেছে, আবার কখনো বা তীব্র প্রতিহিংসায় উন্মাদের মতোই অস্থির হয়ে উঠেছে –

> "কেন এরকম করল মা?.... সে তার মাইনের টাকা উপুর করে দিচ্ছে সংসারে, নির্দ্বিধায় খরচ করছেন। কেন? কেন? অস্থির লাগে। উন্মাদের মতো গড়াগড়ি খায়।.....আবার মনে হয় মা বাড়ি ফিরে এলেই সে কড়া ভাবে তিরস্কার করবে হাটে।.... হাটে হাড়ি ভেঙে ছাড়বে।...কষ্টে বুক ফেটে যায় তার।"[১৩]

বিশ্বাসভঙ্গের আঘাতে, মায়ের অকৃতজ্ঞতায়, দুঃখে-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছে অজন্তা। এই সময় সে একান্তভাবেই কাছে পেতে চেয়েছে শিবেন্দুকে। কিন্তু তপোব্রতর সাথে সম্পর্ক থাকাকালীন শিবেন্দুর সান্নিধ্য পেতে চাওয়ায়, অপরাধবোধ ঘিরে ধরেছে তাকে। মা, ভাই, প্রেমিক থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অজন্তা এসে পৌঁছেছে নিরালম্ব অবস্থানে।

 অজন্তার একান্ত চেষ্টায় অচলা সুস্থ হয়ে ফিরে এলেও, মায়ের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি তার। মনের মধ্যে জমে থাকা অভিমান সরিয়ে মাকে ক্ষমা করে উঠতে পারেনি আর। প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হতে হতে সে নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছে সংসার সম্পর্কে। সমস্তরকম সাংসারিক দায়িত্ব পালনের পরও তাকে শুনতে হয়েছে সে 'ছেলের কাজ' করেছে। অঙ্কনের অক্ষমতার দায় বহন করতে হয়েছে তাকে।আর তার সমস্ত কৃতিত্ব অচলা ঢেলে দিয়েছেন অঙ্কনের ঝুলিতে। এমনকি অঙ্কন বাড়ির সম্মানের কথা না ভেবে পালিয়ে বিয়ে করে এলেও, অচলা ছেলের কোন দোষ দেখতে পাননি। অজন্তার সাথে কোন রূপ পরামর্শ না করেই ছেলে-ছেলের বউকে ঘরে তুলে নিয়েছেন। অজন্তাকে যেন বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, এই সংসারের কোন সিদ্ধান্তই তার মতামতের অপেক্ষা করে না। অথচ বৌভাতের অনুষ্ঠানের জন্য যখনই টাকার প্রয়োজন হয়েছে অচলা অঙ্কনকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন মেয়ের কাছে। কিন্তু সংসারের খরচের কথা ভেবে অজন্তা টাকা দিতে অস্বীকৃত হলে, অচলা অকথ্য ভাষায় অপমান করেছেন নিজের মেয়েকেই –

> "হ্যাঁ, তোর টাকা আমি উড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছি তো!.... তোর এত কথা কিসের জন্য আমি জানি না? তোর বিয়ে হলো না, আর অঙ্কু বউ নিয়ে চলে এল এতে হিংসেই জ্বলে পুড়ে মরছিস।... মা ভাইয়ের জন্য খরচ করতে তোর গায়ে লাগে। কারো ভালো তুই দেখতে পারিস না।"[১৪]

অঙ্কনের মত অজন্তাও যে তাঁরই সন্তান, তা ভুলে গিয়েছেন অচলা। যে মেয়ের জন্য আজ তিনি মৃত্যু মুখ থেকে ঘুরে এসেছেন, সেই মেয়েকেই তিনি আঘাতে আঘাতে

জর্জরিত করে তুলেছেন। মায়ের বলা প্রতিটি কথা ধারালো ছুরির মতই বিঁধেছে অজন্তার অন্তরে। তীব্র অভিমানে বুক চেপে এসেছে তার –

> "আমাকে এরকম বলতে পারলে তুমি? আমি এত খারাপ? এত বাজে? আমি তোমাদের জন্য খরচ করতে চাই না? এই বাড়ি সংসার আমার নিজের নয়? তার মাথা ঝিমঝিম করে,... সমস্ত শরীর নিংড়ে জল বেরোতে চায়, অথচ গলা দিয়ে, নাক দিয়ে, চোখ দিয়েও বেরোয় কেবল বিশুষ্ক বাতাস। কিছুতেই আরাম দেয় না তাকে বিশ্বাসঘাতক চোখের জল।"[১৫]

আসলে একটা বয়সের পর অবিবাহিত মেয়ে নিজের বাড়িতেও অনাকাঙ্ক্ষিত হয়ে যায়। সংসার তার সেবা নেয়, অবদান গ্রহণ করে কিন্তু কখনো বুকে টেনে নেয় না। টাকা দিয়েই বিচার হয় তার গুরুত্ব। টাকায় নির্ধারণ করে সম্পর্কের মানদন্ড। সেই কারণেই পারিবারিক দায়ভার বহন করতে গিয়ে ব্যাংক ব্যালান্স শূন্য অজন্তাকে বাড়ির বউ করতে সম্মত হয়নি তপোব্রত। এত বছরের সম্পর্কের এই ভাঙ্গন এলোমেলো করে দিয়েছে অজন্তার জীবন। মানসিক দিক থেকে লড়াই করার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে। জীবনের এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে অজন্তাকে ভালোবেসে বুকে আগলে নিয়েছে শিবেন্দু। নতুনভাবে বাঁচার শক্তি যুগিয়েছে অজন্তাকে। শিবেন্দুর ভালবাসার মধ্যে দিয়েই অজন্তা পেয়েছে তার কাঙ্খিত জীবন।

 পরিশেষে বলতে পারি যে, 'আজও কন্যা' উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে সমাজে প্রচলিত লৈঙ্গিক বিভাজনের বিরুদ্ধেই তীব্র প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক তিলোত্তমা। কেন্দ্রীয় চরিত্র অজন্তার মতোই হাজারো মেয়ে ঘরে-বাইরে প্রতিনিয়ত লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হয়ে চলেছে। শুধুমাত্র মেয়ে বলেই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে তারা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। আবার কখনো বা তাদের আবদ্ধ করা হয়েছে বিয়ে নামক সামাজিক শৃঙ্খলে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর একমাত্র পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে –

> "নারী হচ্ছে জরায়ু, ডিম্ব কোষ ; নারী হচ্ছে স্ত্রীলোক।"[১৬]

এর বাইরে নারীর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে নেই। তাই আত্মপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও নারী পায়নি স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার। নারীর সমস্ত কৃতিত্ব হরণ করেছে পুরুষ। তাই বিরাট মূল্যে সাংসারিক দায়িত্ব পালনের পর ও অজন্তার মত মেয়েদের শুনতে হয়েছে যে 'ছেলের কাজ' করেছে। ছেলের সঙ্গে তুলনার মধ্য দিয়েই তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে সে আজও নারীই রয়েছে। সে কখনোই চাইলেও একজন ছেলের সমকক্ষ হতে পারবে না। নারী পুরুষের এই বৈষম্যের মধ্যে দিয়ে জটিল সমাজমানস স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে তিলোত্তমা মজুমদারের 'আজও কন্যা' উপন্যাসে।

উৎসের সন্ধানে :

১. মল্লিকা সেনগুপ্ত, স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ : মার্চ ২০২০, পৃষ্ঠা - ১৩
২. তদেব, ঐ
৩. তিলোত্তমা মজুমদার, আজও কন্যা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০১৬, পৃষ্ঠা - ৩২
৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৩
৫. তপোধীর ভট্টাচার্য, লিঙ্গ রাজনীতি ও নারী বিশ্ব,বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চদশ সংকলন ২০০৮, পৃষ্ঠা - ১০
৬. তিলোত্তমা মজুমদার, আজও কন্যা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০১৬, পৃষ্ঠা - ১৯
৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ২০
৮. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৯
৯. তদেব, পৃষ্ঠা - ১০
১০. তদেব, পৃষ্ঠা - ৭১
১১. মল্লিকা সেনগুপ্ত, স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ : মার্চ ২০২০, পৃষ্ঠা - ২৮
১২. তিলোত্তমা মজুমদার, আজও কন্যা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০১৬, পৃষ্ঠা - ৭৯
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ১০৮
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৩
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৪
১৬. হুমায়ুন আজাদ, নারী ,কাকলি প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ দ্বাবিংশ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, পৃষ্ঠা - ১৯

তথ্যের সন্ধানে :

আকর গ্রন্থ :

১. মজুমদার তিলোত্তমা, আজও কন্যা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ : মার্চ, ২০১৬
২. সেনগুপ্ত মল্লিকা স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ : মার্চ, ২০২০
৩. হুমায়ুন আজাদ, নারী, কাকলি প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, দ্বাবিংশ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, কুড়ি একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৪
২. চক্রবর্তী সুধীর, মেয়েদের কথা কল্প, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০১০
৩. ভট্টাচার্য সুতপা, মেয়েলি আলাপ, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১২
৪. চক্রবর্তী বাসবি, (সম্পাদিত) নারী পৃথিবী বহুস্বর, পূর্বী প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১১
৫. ভট্টাচার্য সুতপা, মেয়েদের লেখালেখি, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৪
৬. ভট্টাচার্য তপোধীর, লিঙ্গ রাজনীতি ও নারী বিশ্ব, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চদশ সংকলন ২০০৮, পৃষ্ঠা – ১০

উত্তরবঙ্গের কৃষক জীবনের দলিল : দেবেশ রায়ের ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’

তারকনাথ সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদহ

সারসংক্ষেপ : নিঃস্ব ভাগচাষি কৃষক জীবনের এক অনন্য দলিল দেবেশ রায়ের ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’। ভাগচাষি বা আধিয়ার খেতখেতু ও তার পরিবারের জীবন যুদ্ধের এই ভাষ্য দেবেশ রায়ের স্বদেশ আবিষ্কারেরই এক ভিন্ন আয়োজন। খেতখেতুর পারিবারিক সূত্রে তার সহধর্মিনী টুলটুলি সহ তিন সন্তান (বেঙ্গু, বৈশাখু, খেতেশ্বরী) ও ভ্রাতুষ্পুত্র চ্যারকেটুর অস্তিত্ত্বের সংগ্রামের কথা এসেছে। জলপাইগুড়ি ডিভিশনের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং এবং মালদা ডিভিশনের উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ এবং বিহারের কিছুটা অংশ মিলিয়ে ভারতের উত্তরবঙ্গ এলাকা। দেবেশ রায়ের ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’- এ এই উত্তরবঙ্গ এলাকার কৃষক জীবনের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। যেখানে উৎপাদন কাঠামোর রূপ-রূপান্তরের বাস্তবতাও বিবৃত হয়েছে সূক্ষ্ম ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে।

সূচক শব্দ : চ্যারকেটু, খেতখেতু, আধিয়ার, গিরি, কর্জ, ক্ষুধা, রেশন, মফস্বলি, দলিল, পুরচি, সনাতন পৃথিবী

মূল প্রবন্ধ :

‘আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক’ – কবি শঙ্খ ঘোষ কথাটি বলেছিলেন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক, ছকভাঙা ঔপন্যাসিক এবং কথোয়ালির বাদশা দেবেশ রায় (১৯৩৬ - ২০২০) সম্পর্কে। দেবেশ রায়ের সাহিত্যচর্চায় উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি ও জনজীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বলা বাহুল্য, ১৯৬২ - ৭২ পর্যন্ত সময়পর্বে উত্তরবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে কাজ করার সুবাদে বিভিন্ন গ্রাম ও মানুষের জীবনচর্যা ও ভাষার সঙ্গে নিবিড় ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন দেবেশবাবু। উত্তরবঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন অভিজ্ঞতার অভিঘাত হিসেবে দেবেশ রায় যেসব গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলো ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’ (১৯৮০)।

 নিঃস্ব ভাগচাষি কৃষক জীবনের অনন্য দলিল ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’। ধান গাছের রোয়া থেকে পেকে ওঠার প্রতিটি পর্বের সঙ্গে কৃষক জীবনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ককে দেবেশ রায় বর্ণনার গভীরতায় ব্যাপকতা দান করেছেন। জলপাইগুড়ি ডিভিশনের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং এবং মালদা

ডিভিশনের উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ এছাড়া বিহারের কিছুটা অংশ মিলিয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষের যে উত্তরবঙ্গ এলাকা সেই এলাকার কৃষক জীবনের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে আলোচ্য 'মফস্বলি বৃত্তান্ত'- তে। এই উপন্যাসের মূল ইতিহাস ক্ষুধা। আধিয়ার খেতখেতু, তার বউ টুলটুলি, তার তিন সন্তান (বেঙ্গু, বৈশাখু, খেতেশ্বরী) এবং ভাতুষ্পুত্র চ্যারকেটু –এক একটি অধ্যায় এক একজনের বৃত্তান্ত। ক্ষুধার ইতিহাসে এক একটি বৃত্তান্ত আলাদা। সমালোচকের ভাষায় –

> "আমাদের দেশের ও কালের অভিজ্ঞতায় উত্তরবঙ্গের নিঃস্ব কৃষকের বাস্তবেই তা সবচেয়ে তীব্রতা পেতে পারে। উত্তরবঙ্গের কৃষকজীবনের সঙ্গে নিবিড় ও প্রত্যক্ষ সংলগ্নতায় এবং কৃষি ও কৃষকজীবনের বিষয়জ্ঞানে তিনি সে বাস্তবকে সত্য করে তোলেন, এতই নিশ্চয়তা শিল্পের পর্যবেক্ষণে।"[১]

কেবল স্বদেশ নয় প্রকৃতি ও মানব জীবনের মৌল স্বরূপকে স্বদেশেরই আঙিনায় ধরার এক চেষ্টা আছে এই বৃত্তান্তে। এক কথায় 'মফস্বলি বৃত্তান্তে'র মূল প্রতিপাদ্য বিষয় উত্তর বঙ্গের কৃষক জীবন ও মানুষ; যার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও বৈচিত্র্যময়।

 আটটি পর্বে বিভক্ত বৃত্তান্তটি সম্পূর্ণভাবেই শোষিত মানুষদের নিয়ে রচিত। সকল পর্বেই তার প্রকাশ রয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের দারিদ্র্যতা ও শোষণের মাত্রার গভীরতা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু উক্ত উপন্যাসের চরিত্রগুলির জীবনযাপনের নিখুঁত চিত্র তুলে ধরে ঔপন্যাসিক সেই শোষণের মাত্রা আন্দাজ করতে চেয়েছেন আপামর পাঠক সমাজকে সঙ্গে নিয়ে। বৃত্তান্তের শুরুতে ভাগচাষি খেতখেতুর ভ্রাতুষ্পুত্র চ্যারকেটুর সঙ্গে গভীর প্রকৃতিকে দেবেশ মিলিয়েছেন আপন দক্ষতায় –

> "উঠোনে দাঁড়িয়ে চ্যারকেটুকে সামনে-পিছনে ধানখেত, দুই ভিটের দুই ঘর, নীল জ্বলজ্বলে প্রায় তারাহীন আকাশ, পশ্চিমের আকাশের চাঁদ এই সবের তদারকি করে দুই হাত উপরে তুলে একটা সশব্দ হাই তুলতে হয়। একটিমাত্র নেংটিতে চ্যারকেটুর প্রায় ন্যাংটো তরুণ শরীরের সেই হাই-তোলা ভঙ্গিমার ভেতর চাঁদ-চাঁদনী-আকাশ-ধানখেত ইত্যাদির সঙ্গে একটা পারিবারিকতা প্রকাশ পায়।"[২]

দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থানকারী চ্যারকেটুর জীবনযাত্রায় কোন কুটিলতা নেই, নেই রাজনীতি। জ্যোৎস্না ঘেরা ধানক্ষেতের সামনে দাঁড়িয়ে চ্যারকেটু পরিবারের ভাত খাওয়ার সুখ আর ভাগা জমি থেকে বছরের ধানের বা চালের অপারগ বন্দোবস্ত নিয়ে ভাবে। সমাজের নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি হলেও শোষিত, নির্যাতিত মনের চৈতন্য জগৎকে একেবারে লুপ্ত করে দেয়নি সে। মিথ্যা সে শেখেনি। সৎ পথে আত্মসম্মান নিয়ে পেটের খিদে নিবারণ করতে চায় চ্যারকেটু। তাইতো লোনের জন্য দস্তখত

চাওয়ার পূর্বে তাতে কি লেখা আছে তা জানতে চেয়েছে। দুদিনের পেটের খিদে এবং আগামী অনির্দিষ্ট দিনের খিদের যন্ত্রণা চ্যারকেটুর মনে প্রবেশ করলে মাঠ ভর্তি ধানখেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে ভাত এবং চাঁদকে একই জিনিস ভাবতে পারে। তখন প্রকৃতি হয়ে ওঠে একথাল ভাতের গদ্য কবিতা –

> "ধর কেনে এই মোট পনের-বিশ মন ধানত তিনখানা আধাপ্যাট কি তামাম বছর চলিবার পারে ? প্যাটত দুই দিন ভাত না পড়িলেই ভাতটার কথা মনত আইসে না। এই জোছনার আলোর নাখান ভাতখান এ্যানাং কিছু হবা পারে, যেইলা এ্যানাং মাঝরাতত পিথিমিলা আর আকাশলায় ভাসি বেড়ায়, জাগিবার পারে, ধানখ্যাতত খাড়িবার পারে। ভাত আর চাঁদ একো জিনিশ, আকাশত থাকে মাঝরাতত।"[৩]

একটা মানুষ গত পরশুদিন ভাত খাওয়ার পর গতদিন পর্যন্ত সেই ভাতের ফ্যান ছাড়া আর কিছু খায়নি। শুধু তাই নয়, আগামীতে আবার কবে খেতে পাবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। এহেন একজন গরিব কৃষক পরিবারের জীবন কতটা যন্ত্রণার হতে পারে তা অনুমান করা যায়। আবার শীতের শেষ রাতে মাচান থেকে নেমে প্রকৃতির প্রায় কাব্যিক পরিবেশে ক্ষুধার্ত চ্যারকেটুর মূত্রত্যাগের দীর্ঘস্থায়ী বর্ণনায় এক ধরনের আইরনীও প্রকাশ পায়। এই ব্যঙ্গ আরো প্রসারিত হয় চ্যারকেটুর পোস্টার সংগ্রহের ঘটনায়। স্বাধীন দেশের উন্নয়নের স্বার্থে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত বিভিন্ন আইন কানুন ও সরকারি প্রকল্প সম্পর্কিত রঙিন বিজ্ঞাপনগুলি সংগ্রহ করে চ্যারকেটু। কঠোর শ্রম, ধৈর্য্য ও চাতুরীতে অঞ্চল অফিস থেকে গ্রামোন্নয়ন বা ভোটের সময় চলে আসা রং-বেরঙের পোস্টার সংগ্রহ করে এবং তার জীর্ণ কুঁড়ে বেড়ায় কীভাবে সেগুলো পাটকাঠি বা গাবের আঠায় লাগানো যায় তা নিয়ে চিন্তা করে চ্যারকেটু। ঔপন্যাসিকের ভাষায় –

> "এই ঝুরঝুরে ঘরে নানা রঙের নানা রকমের পোস্টার। পরিবার পরিকল্পনা, বসন্তরোগ নির্মূলকরণ, সার, পাম্প, অধিক ফলনশীল ধান, জোড়া বলদ, কাঁচি দা ও ধানের শিষ, ইন্দিরা গান্ধি, হাতুড়ি-তারা, গায় বাছুর। নানা রং নানা ছবি। ... যেমন-যেমন ফাঁক তেমন-তেমন পোস্টার ত আর জোগাড় হয় না। তাই এই ঘরের ভামনি, বেড়া, বাতার মত পোস্টারগুলোতে ঝুরঝুরে হয়ে যায়। তখন বৃষ্টির ছাঁট বাছুরের গায়ে যাতে না-লাগে সেই উদ্দেশ্যে টাঙানো পোস্টারটা, বাছুরটা বিক্রি হয়ে যাওয়ার পরও খুলতে গেলে, ঝরঝর করে ঝরে যায়।"[৪]

কিন্তু চ্যারকেটুর মতো ব্যক্তিদের কাছে এইসব বিজ্ঞাপন নিরর্থক; বিজ্ঞাপনের বাহ্যিক রঙটাই তাঁর কাছে আনন্দদায়ক। কারণ বিজ্ঞাপনের রঙিন শক্ত কাগজগুলো তাদের প্রাণ রক্ষা করবে। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ ব্যক্তির কাছে এই বিজ্ঞাপন গুলো গৃহ রক্ষার জন্য মূল্যবান। একই বিজ্ঞাপন সমাজের একশ্রেণির মানুষের কাছে

প্রচারের মাধ্যম আবার আরেক শ্রেণির মানুষের কাছে তা প্রাণরক্ষার, গৃহরক্ষার উপকরণ। এই সূক্ষ্ম বিশেষণের মধ্যে দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি ঔপন্যাসিকের উপহাস আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার বাসনা চ্যারকেটুর নেই কিন্তু রাজনৈতিক চাপ তাকে সহ্য করতে হয়। অভাবের তাড়নায় চ্যারকেটুকে তার একমাত্র সঙ্গী পালিত গরুটিকে বিক্রি করার কথা ভাবতে হয়। কিন্তু গরু বিক্রি করার পূর্বে যে সমস্যার মুখে তাকে পড়তে হয় তা অনভিপ্রেত। হাটে যাওয়ার পথে গরুসহ চ্যারকেটুকে জোর করে তুলে নিয়ে যায় আন্দোলনকারীরা। রাজনৈতিক কচকচানি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ চ্যারকেটু কেবল জানে তার এবং পরিবারের পেটে ভোখ আছে। আর ভোখ তাড়াতাড়ি নিবারণ করতে না পারলে সে নিজেকে তো নয়ই, কাউকেই রক্ষা করতে পারবে না। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে চ্যারকেটুর দম বন্ধ হয়ে আসে। খোলা আকাশ এবং তিস্তার বাঁধকে তাঁর মুক্তির ঠিকানা মনে হয়। ভিতরে ভিতরে যেন বুকটা ফেটে যায় চ্যারকেটুর –

> "হে এ বাবু, মোক ছাড়ি দ্যান হে এ বাবু– হে এ বাবু ছাড়ি দ্যান, মোক গৌরীহাট থাকা নাগিবে।"[৫]

তবে চ্যারকেটুর এই আবেদন মালিক শ্রেণির কর্নগোচর হয় না। বরং এতগুলো মানুষের মাঝখানে একটা গরু জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকাটা সকলের কাছে বেমানান বলে মনে হয় –

> "আরে, গরু লাঙল নিয়ে এখানে ঢুকে কী করছ ? এখানে কি জমি চাষ করবে? বেরোত্ত, বেরোত্ত।"[৬]

আসলে ঔপন্যাসিকের এই ধরনের বাক্য চয়নের মধ্যে সমাজে গরু লাঙলের প্রয়োজনীয়তার দিকটি লুকিয়ে আছে; যা শুধুমাত্র জমি নয়, অনুর্বর সমাজকেও কর্ষণ করবে। ঠিক একইরকম ভাবে দেবেশ যখন প্রশ্ন তোলেন, দেশের জন্য যে আন্দোলন হচ্ছে সেই আন্দোলনে যোগ না দিয়ে চ্যারকেটু গৌরীহাট যাওয়াকে অধিক গুরুত্ব দেয় কী করে? তখন লেখকের এই কটাক্ষের অর্থ পাঠককে পরিপক্ক করে তোলে। কবি নজরুল আমাদের শুনিয়েছিলেন –

> "ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ
> চায় শুধু ভাত,একটু নুন।"[৭]

চ্যারকেটুর কাছেও একই রকম ভাবে মিছিলের বন্দেমাতরম ধ্বনির থেকে ঢের বেশি সত্যি হয়ে ধরা দেয় তার পেটের খিদে। তাই মিছিল, দলাদলি সবকিছুকে উপেক্ষা করে প্রাণাধিক প্রিয় গরুটাকে বিক্রির জন্য তাকে গৌরিহাটে যেতে হবে। আর আইন ভঙ্গ না করে তাকে যদি জেলে যেতে হয় তাহলে তার গরুটাকেও যেন সঙ্গে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়। কারণ তাতে গরুটাও দুবেলা খাবার খেতে পাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয় না। চ্যারকেটুকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এদিকে গরু বিক্রি হওয়ারও সময় চলে

গেছে। আসলে চ্যারকেটু বা তার মত অসংখ্য মানুষ এভাবেই গরু-লাঙল নিয়ে ঘুরতে থাকে। এদিকে তার লাগানো ধান গাছ কাটার সময় হয়ে ওঠে কিন্তু শরীরের অনন্ত ক্লান্তি ও ক্ষুদা নিয়ে তা আর কাটা হয়ে ওঠে না। ভুবন ভর্তি খিদে নিয়ে হাঁটতে থাকে, ছুটতে থাকে – যে ছুটে যাওয়া অন্তহীন।

□ 'মফস্বলি বৃত্তান্তে'র পঞ্চম পর্বে কৃষক শোষণের মাত্রা চূড়ান্ত মাত্রা লাভ করেছে। কারণ এই পর্বে ভাগচাষি খেতখেতুর জীবনের ভয়ংকর ও মর্মান্তিক ছবি ফুটে উঠেছে। খেতখেতু রায় বর্মন। যার নিজের এক ডেসিমল জমি নেই। তিন পুরুষের আধিয়ার আছে এবং প্রতি বছর তার জমির পরিমাণ কমে আসছে। এহেন খেতখেতু তিনদিনের উপবাস ও পেটের ভেতর আলসার নিয়ে ধান কর্জের আশায় অতি কষ্টে শরীরটাকে টেনে নিয়ে আলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে পঞ্চায়েতের দিকে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে বাঁচাতে –

> "গোহালি ঘরের পেছন থেকে আলিপথে নেমে আসার পর, কতক্ষণ হাঁটতে পারবে, কখনই বা টলে পড়বে আর কখনই বা পেটে আলসার ফেটে তার মুখ দিয়ে রক্ত বের হবে এসব অনিশ্চয়তায় খেতখেতু অত্যন্ত জরুরি প্রথম কটি পদক্ষেপে, নিজেকে নিয়ে হাঁটার প্রধান বাধা খেতখেতুর এই শরীরটা নিয়ে ব্যক্ত হয়ে পড়ে।"[৮]

ডাক্তার খেতখেতুকে বলেছেন, খাবারের অভাবেই তার পেটে আলসার হয়েছে। আর সেই অভাব দীর্ঘতর হলে আলসার ফেটে রক্তবমি হয়ে মারা যাবে। তাইতো খেতখেতুর চলনে সাবধানতা প্রকাশ পায় বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষায়। যাইহোক ধানের কর্জ পাওয়া খেতখেতুর পক্ষে সহজ হয় না। কারণ পঞ্চায়েতের কোন জমিতে সে বা চ্যারকেটু কেউ আধিয়ারি করে না। খেতখেতু ও পঞ্চায়েতের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে গ্রামীন অর্থ উৎপাদন কাঠামোর রূপ-রূপান্তর এবং তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ ও কাঠামোতে তার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চার পুরুষ ধরে আধিয়ারি করা জমি ছোট হয়ে আসে। ফলে জমি ভাগ হয়ে জমির গিরি (মালিক) বদল হয়। স্বাভাবিকভাবেই জমির পরিমাণ এক হালেরও কমে এসে দাঁড়ায়। বর্গা বা আধিয়ারি ব্যবস্থার একটা রূপান্তরের চিত্র এখানে পাওয়া যাচ্ছে। একদিকে ভূমি আইনের ফলে পরিবর্তিত উৎপাদন ব্যবস্থার বদলে যাওয়া শ্রেণি চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পট, অন্যদিকে চলমান রাজনীতি, শ্রেণি বিভাজন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকটিও মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে খেতখেতুর এই স্বগতোক্তিটি অত্যন্ত মূল্যবান মনে করছি –

> "পদ্মনাথ আছিল গিরি, হইছে অ্যালায় নিজচাষি। অমনিকান্ত (রমণীকান্ত) আছিল পঞ্চায়েত, হইছে অ্যালাই মেম্বার। নরেন সরকার আছিল জোতদার, হইছে অ্যালায় এফ-সি-আই এর এজেন্ট।"[৯]

□ চ্যারকেটুর মতো খেতখেতুর মধ্যেও আত্মসম্মানবোধ ও প্রতিবাদের ঝাঁঝ লক্ষ করা যায়। ফ্রি-রেশনের পুরচি (স্লিপ) আদায় করতে গিয়েও বিনা দ্বিধায়

পঞ্চায়েতকে বলার সুযোগ পায় না। কারণ যুক্তফ্রন্টের মানষি পঞ্চায়েত তখন রাত-দিন গ্রামসভা, অঞ্চল আর ব্লক অফিস নিয়ে ব্যস্ত। খেতখেতুকে নানা যুক্তি তর্কের মধ্যে ফাঁসিয়ে ফ্রি-রেশনের স্লিপ দিতে অস্বীকার করলেও খেতখেতুর যুক্তিগুলিকে পঞ্চায়েত অস্বীকার করতে পারেনা। এই পরিস্থিতিতে সে বুঝতে পারে সে ক্ষুধার্ত এবং বেশি দিন বাঁচবে না। তথাপি নিজের সম্মান বিসর্জন দেবে না। নিজের বাস্তব অবস্থানটুকু সকলের সামনে তুলে ধরতে আত্মবলিদানেও খেতখেতুর আপত্তি থাকে না। সে যেন নিজের আলসার ফেটে রক্তবমির রঙিন খেলারই অপেক্ষা করছিল। তাইতো পঞ্চায়েতের সামনে পেট থেকে বেরিয়ে আসা জল গুলোকে জিভ দিয়ে চেটে স্বাদ নেবার চেষ্টা করে। সমাজের মালিক শ্রেণির রক্ত শোষণের বাস্তব ছবিকে ঔপন্যাসিক এভাবেই তুলে ধরেন। এক কথায়, খেতখেতুর এই চেষ্টার মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রত্যাখ্যানের বাণী। পঞ্চায়েত বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তার বর্ণনায় আমরা পায় –

> "খেতখেতু যেন হঠাৎই থামটা থেকে হাত সরিয়ে নেয় ...তরতর করে রমণী পঞ্চায়েতের বানানো উঁচু রাস্তা দিয়ে বোর্ড রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়। যেন সেই মুহূর্তে তার পেটে আলসারের ব্যথা ছিল না। ...যেন রমণী পঞ্চায়েতের কাছে কাজ বা ফ্রি রেশনের জন্যেও আসেনি। ...তার খিদেও নেই, আলসারও নেই, বরং আসলে রমণী পঞ্চায়েতই তার কাছে প্রার্থী হয়ে যায় তখন...।"[১০]

অর্থাৎ নিজের অজান্তেই খেতখেতু নীরব লড়াই ঘোষণা করে দিল। রাজনৈতিক প্যাচকে অস্বীকার করে নিজেকে সাধারণ মানুষ হিসেবে ঘোষণা করে। আর নিজের সামাজিক পরিচয় নিয়ে গভীর অন্তর্দ্বন্ধে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে –

> "মুই আধিআর ত মোক কর্জ দাও। মুই অধবাবিধবা তো মোক ফ্রি-রেশন দাও।"[১১]

নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত খেতখেতু যখন এক সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাপন করছে, ঠিক সেই সময় গ্রামের প্রশাসনিক স্তরের শেষ কথা পঞ্চায়েত তাকে জানাচ্ছে –

> "খেতখেতু জমি ছাড়ি যাবার নাগিবে। আর জমি ছাড়িলে বাড়ি ছাড়িবার নাগিবেই নাগিবেই। আর বাড়ি ছাড়িলে ত টাড়ি ছাড়িবার নাগিবেই নাগিবে। আর টাড়ি ছাড়িলে ত গ্রাম ছাড়িবার নাগিবে নাগিবেই। আর গ্রাম ছাড়িলে ত অঞ্চল ছাড়িবার নাগিবেই নাগিবে। আর অঞ্চল ছাড়িলে ত এই ভুবনে ছাড়ি যাবার নাগে...।"[১২]

কিন্তু ক্ষেতখেতু ভালবাসে মানব জীবনকে, ভালোবাসে এই পৃথিবীকে। এ পৃথিবী তার কাছে 'সনাতন পৃথিবী'। শুধুমাত্র চাষের জমিতে ধান উৎপন্ন হয় বলে নয়, বাল্যকাল থেকেই জমির প্রতি খেতখেতু গভীর ভালোবাসায় আবৃত –

> "বাপা হে এ্যানাং বিশালিয়া – বিশালিয়া এঞ্জিন হামরালার বর্ষার ভিজা নরম জমিৎ নামিবার ধরিলে জমি ভাঙি যাবু না ?"[১৩]

বলা বাহুল্য, জমির প্রতি খেতখেতুর এই ভালোবাসা অপরিবর্তনীয় থেকে যায়। কানুন পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেছে জোতদার, পাল্টে গেছে পঞ্চায়েত, পাল্টে গেছে ভূমি আইন। কেবল পড়ে থাকে খেতখেতুর মতো চাষিরা। খেতখেতুর মতো অনাহারক্লিষ্ট ভারতবর্ষের জনগণ যখন খাদ্য দ্রব্যের অসীম ভান্ডারে ডুবে মৃত্যুকে গ্রহণ করে নেয় তখন উচ্চ শ্রেণির আসনে বিরাজমান সম্মানীয় ব্যক্তিদের গায়েই এসে স্পর্শ করে অনাহারী মৃতদের পচা দুর্গন্ধ। ঔপন্যাসিক খেতখেতু চরিত্র নির্মাণের মধ্যে দিয়ে দেশ ও সমাজের সেই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করার স্পর্ধা দেখিয়েছেন। খেতখেতুদের এই বয়ে চলা নিশ্বাসিত জীবনকেই অনিবার্য সত্যে তুলে ধরেন দেবেশ রায়। জমির মালিকানার সঙ্গে সঙ্গে বর্গাদারের জীবনের মালিকানা পরিবর্তনের অরেজিস্টিকৃত পদ্ধতি ও নানাবিধ বন্দোবস্তের ফলে প্রান্তিক চাষি এবং ভাগ চাষিরা ক্রমশ পরিণত হচ্ছিল ক্ষেতমজুর শ্রেণিতে। একদিকে ঘন ঘন জমির মালিক বদল হওয়ায় বর্গাদার কাকে ফসলের ভাগ দেবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা; অন্যদিকে যে কোন সময় জমি থেকে উৎখাত হওয়ার সম্ভাবনা গ্রামীণ জীবনে বিপর্যয়ের মুখোমুখি করে খেতখেতুদের।

 ভাগচাষী পরিবারের ছবি তুলে ধরতে গিয়ে ঔপন্যাসিক সেই পরিবারের শিশুসহ গৃহিণী চরিত্র গুলিকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। যার মধ্যে দিয়ে কৃষক পরিবারের বাস্তব ছবিটি আরো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আধিয়ার প্রজা খেতখেতুর বউ টুলটুলি পরিবারের সকলের খিদে ও নিজের খিদে নিয়ে জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মানসিক বল ও দেহের শেষ শক্তিটুকু নিয়ে মাঠের কচু, ডোবার মাছ খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। খাবার সংগ্রহ করতে যাওয়া টুলটুলির ভাবনায় একটি গরিব কৃষক পরিবারের কথা থেকে সর্বহারা গ্রামীন ক্ষেতমজুরের আভাস পাওয়া যায়। সে বলেছে সেই সব বাড়ির বউ মেয়েদের কথা যাদের স্বামীর পাঁচ-দশ বিঘে আধি জমি নেই। টুলটুলির এই শঙ্কার মধ্যে দরিদ্র কৃষক জীবনের বিচ্ছিন্নতা ও উপবাসী ক্ষুধা-যন্ত্রণা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে –

> "টুলটুলির স্বামী খেতখেতুর্ ত তাও পাঁচ - দশ বিঘে আধি জমি আছে ...গোয়াল ঘর আছে। কলাই করা থালা থাকে। এর কোনটাই যাদের নেই তাদের ত সারা বছরটাই খাওয়া খুঁজতে হয়।"[১৪]

শিশু চরিত্রগুলিও এই বৃত্তান্তে কতটা সংবেদনশীল তার পরিচয় বহন করে শিশু কেন্দ্রিক প্রত্যেকটি পঙক্তি। শিশুরা যেন এখানে তার শৈশবতা রক্ষা করতে পারে না। দুর্নিবার খিদে যেন তাদেরকে বৃদ্ধ করে তুলেছে সময়ের আগেই। টুলটুলির তিন সন্তান বেঙ্গু, ক্ষেতেরশ্বরী, বৈশাখীদের পারস্পরিক গল্প শোনানো, মায়ের পিছনে পিছনে যাওয়া, অবচেতনে প্রবেশ করা, ধানক্ষেতের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো এই সমস্ত কিছু ঘটতে থাকে পেটের খিদেকে কেন্দ্র করে। বেঙ্গু আর বৈশাখু পেটের খিদে ভুলে

থাকার জন্য ধান ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে থাকে। হাঁটা বন্ধ করলেই খিদের কথা মনে পড়বে তাইতো সে হাঁটা থামাতে চায়না। ক্লান্ত বেঙ্গু ধানক্ষেতের মাঝে বসে পড়লে বৈশাখু তাকে গল্প শোনায়। গল্প শুনতে শুনতে বেঙ্গু অবচেতনে প্রবেশ করে। সে চিরকালের মতো ঘুমোতে চায় । আর জাগতে চায় না কারণ ঘুমের মধ্যে আছে ভাতের স্বপ্ন আর জাগলেই খিদে।বেঙ্গু মনে করে খিদে নিয়ে বেঁচে না থেকে যখ হয়ে ভাত খাওয়াটা অনেক শান্তির। ক্ষুধাতুর বেঙ্গুর হাহাকার –

> "দাদা হামার বড় ভোক। হামাক মারি ফেলা। মুই আর বেঙ্গু থাকিম না।"[১৫]

একজন মা তার বাচ্চার মুখে ভাতের ফ্যানের গ্লাস দিয়ে প্রত্যেকে কয় ঢোক করে খাবে সেটাও যখন বলে দিতে বাধ্য থাকে তখন বোঝা যায় তৎকালীন কৃষক পরিবারের চিত্র কতটা মর্মান্তিক ও ভয়ঙ্কর ছিল।

 এভাবে প্রকৃতি ও মানুষের অন্বয়ে তৎকালীন উত্তরবঙ্গের ভাগচাষী পরিবারের দৈন্য দশাকে দেবেশ সাহিত্যরূপ দিয়েছেন। কৃষক তার চাষবাস, জমি-ফসল নিয়ে গড়ে ওঠা পরিবেশ এবং তার অতীতের উপবাস, বর্তমানের ক্ষুধা ও ভবিষ্যতের জন্য জেদি অপেক্ষা নিয়ে জড়িত মন – এই সবকিছু 'মফস্বলির বৃত্তান্ত'কে তৎকালীন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কৃষক সমাজের জীবন্ত দলিলে পরিণত করেছে। এ প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন –

> "গ্রাম জীবন নিয়ে, খেতমজুর নিয়ে কতই তো লেখা হয়েছে, কিন্তু দেবেশ রায়ের উপন্যাসের স্পষ্ট লক্ষণ ছিল। গ্রাম বা মফস্বলের বৃত্তান্তের একটা উলটো পিঠ..."[১৬]

কৃষক জীবন ও মানসের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, বিচিত্র ও আমুল – এই গভীর সত্যটিকে বাস্তবসম্মতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ঔপন্যাসিক দেবেশ; যেখানে উপবাসী, দুঃখময়, নিরুপায় হাঁটার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে বৃত্তান্তের অন্তহীন পরিসর।

উৎসের সন্ধানে:

১. স্বপন পান্ডা ও উৎপল সাহা সম্পাদিত, কঙ্ক, (দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা), চতুর্দশ সংখ্যা, আগস্ট ২০১৪, পৃষ্ঠা - ১৫০

২. দেবেশ রায়, মফস্বলি বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৮০, পৃষ্ঠা - ২২-২৩

৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৩

৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ২১

৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৮

৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৯

৭. নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, ডি. এম লাইব্রেরী, কলকাতা, এক পঞ্চাশত সংস্করণ : ফাল্গুন, ১৪০৫, পৃষ্ঠা - ৯৯

৮. দেবেশ রায়, মফস্বলি বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৮০, পৃষ্ঠা - ৪২

৯. তদেব, পৃষ্ঠা - ৮০

১০. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৬

১১. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪২

১২. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৫

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৩

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৭৭

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৭

১৬. স্বপন পান্ডা ও উৎপল সাহা সম্পাদিত, কঙ্ক, (দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা), চতুর্দশ সংখ্যা, আগস্ট ২০১৪, পৃষ্ঠা - ১৫৭

<u>তথ্যের সন্ধানে:</u>

<u>আকর গ্রন্থ:</u>

১. রায় দেবেশ, মফস্বলি বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৮০

২. রায় দেবেশ, জলের মিনার জাগাও (আত্মকথা) প্রাচী প্রতীচী, কলকাতা, ২০১৬

৩. ইসলাম নজরুল, সঞ্চিতা, ডি. এম লাইব্রেরী, কলকাতা, এক পঞ্চাশত সংস্করণ : ফাল্গুন, ১৪০৫

<u>সহায়ক গ্রন্থ :</u>

১. বন্দ্যোপাধ্যায় শিবাজী, বাংলা উপন্যাসে 'ওরা', প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৬

২. সামন্ত সুবল সম্পাদিত, বাংলা উপন্যাসে বীক্ষা ও অন্বীক্ষা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১১

৩. সেন রুশতি, সমকালের গল্প উপন্যাসে প্রত্যাক্ষানের ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৭

৪. সেন জহর মজুমদার, নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-জুলাই, ২০০৭

<u>পত্রিকা :</u>

১. পান্ডা স্বপন ও সাহা উৎপল সম্পাদিত 'কঙ্ক', (দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা), চতুর্দশ সংখ্যা, আগস্ট ২০১৪

২. সৌরভ অনিন্দ, শিল্পসাহিত্য, দেবেশ রায় সংখ্যা-২০১০

পশ্চিমবঙ্গে প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষা প্রসারে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

রাজেশ বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ (অটোনোমাস), নরেন্দ্রপুর

সারসংক্ষেপ: রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ১২৫ বছর উদযাপিত হচ্ছে সারা বিশ্বে। এই প্রতিষ্ঠান জন্মলগ্ন থেকেই সমানভাবে তার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। জনসেবায় এই প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সমাজের সব শ্রেণির মানুষ এই প্রতিষ্ঠানকে সমান ভাবে গ্রহণ করে এসেছে, বিশ্বাস করে এসেছে। কিন্তু কেন রামকৃষ্ণ মিশন এতদিন ধরে সমান প্রাসঙ্গিক? এই প্রতিষ্ঠান তার কাজের ধারাবাহিকতা কিভাবে বজায় রেখে চলেছে? ত্রাণকার্য দিয়ে যে প্রতিষ্ঠান সামাজিক কর্মকান্ডের সূচনা করেছিল, সেই প্রতিষ্ঠান কিভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রান্তিক মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে? ব্যক্তির শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টি তথা সমাজের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তার কি ভূমিকা আছে? - এই উপস্থাপনাটি মূলত এই সব বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে। চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়, শিক্ষার প্রসারে অনাথ আশ্রম, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। করোনাকালে এই প্রতিষ্ঠান সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে সচেতনতা শিবির গঠন এবং করোনা আক্রান্তদের সুস্থতাকল্পে সেফ হোম গঠন, টীকা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এভাবেই রামকৃষ্ণ মিশন তার কাজের ধারাবাহিকতা, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে।
মূল শব্দ- প্রান্তিক মানুষ, জনসেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসালয়, করোনা।

মূল আলোচনা

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ১২৫ বছর উদযাপিত হচ্ছে সারা বিশ্বে। এই প্রতিষ্ঠান জন্মলগ্ন থেকেই সমানভাবে তার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। জনসেবায় এই প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সমাজের সব শ্রেণির মানুষ এই প্রতিষ্ঠানকে সমান ভাবে গ্রহণ করে এসেছে, বিশ্বাস করে এসেছে। এই প্রতিষ্ঠান তার কাজের ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা সমানভাবে বজায় রেখে চলেছে। ত্রাণকার্য দিয়ে যে প্রতিষ্ঠান সামাজিক কর্মকান্ডের সূচনা করেছিল, সেই প্রতিষ্ঠান শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

কেবলমাত্র বাহ্যিক আড়ম্বর নয়, অন্তরের পবিত্রতার ওপর জোর দেয় এই প্রতিষ্ঠান। তাই সাধারণ মানুষের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে বরাবরই রাককৃষ্ণ মিশন সাহায্য করে থাকে। অর্থাৎ প্রান্তিক মানুষের সেবায় এই প্রতিষ্ঠান সর্বদা নিয়োজিত। নতুন বিশ্লেষণ ও নাবমূল্যায়ণে রামকৃষ্ণ মিশনের বৈচিত্র্যময় কর্ম ও বহুমুখী অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তির শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টি তথা সমাজের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। মূলত চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়, শিক্ষার প্রসারে অনাথ আশ্রম, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। করোনাকালে এই প্রতিষ্ঠান সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে সচেতনতা শিবির গঠন এবং করোনা আক্রান্তদের সুস্থতাকল্পে সেফ হোম গঠন, টীকা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এভাবেই রামকৃষ্ণ মিশন তার কাজের ধারাবাহিকতা, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা

রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র ভারত তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আছে। এই প্রতিষ্ঠান আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি সেবামূলক কার্য সম্পাদনও করে থাকে। দরিদ্র, অসুস্থ, অবহেলিতদের সেবা করা সন্ন্যাসীদের মূল লক্ষ্য।[১] আর এই লক্ষ্যপূরণের জন্যেই এই প্রতিষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। রামকৃষ্ণ মিশন বিশ্বাস করে যে, মানুষের সেবাই হলো ঈশ্বরের সেবা। সেবা করলেই মন পবিত্র হয়, আত্মার শুদ্ধি হয়।[২] তাই রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রথম দিককার সেবা অভিযানস্বরূপ স্বামীজির নির্দেশানুসারে স্বামী অখন্ডানন্দের মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষ মোকাবিলাকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলা যেতেই পারে।[৩]

রামকৃষ্ণ মিশনের দাতব্য চিকিৎসালয়, চিকিৎসালয়, ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় নিয়মিত হাজার হাজার মানুষের সেবা করে চলেছে। স্বামী অখন্ডানন্দের প্রতিষ্ঠিত সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয় দীর্ঘদিন যাবৎ 'দরিদ্র নারায়ণের' সেবা করে চলেছে, আবার রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয় পরিচালিত ভ্রাম্যমান হাসপাতাল নিয়মিত ভাবে নিরবচ্ছিন্নধারায় মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাকাপাকি এই চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করতেই ১৯৩২ সালে কলকাতার বুকে 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের' প্রতিষ্ঠা হয়েছিল যেটি বর্তমানে সাধারণ শল্যচিকিৎসা, স্ত্রীরোগচিকিৎসা, প্রসূতি চিকিৎসা, মূত্র রোগ চিকিৎসা, স্নায়ুরোগ চিকিৎসা, শিশুরোগ চিকিৎসা, অস্থিরোগ চিকিৎসা, চক্ষুরোগ চিকিৎসা, দন্তরোগ চিকিৎসা, নাক-কান-গলার রোগ চিকিৎসার পাশাপাশি রোগনির্ণয় ও ওষুধ প্রদানের হাসপাতাল হিসেবে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।[৪] বলা আবশ্যক যে, এর পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশনের নিজস্ব প্যাথোলজিকাল গবেষণাগার, ব্লাড ব্যাঙ্ক ও ফিজিওথেরাপি কেন্দ্রও রয়েছে।[৫] তাছাড়া এর পাশাপাশি

বেলুড়, নরেন্দ্রপুর, সারগাছি, মনসাদ্বীপ, মালদা, মেদিনীপুর, তমলুক, জয়রামবাটী ও কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন তো রোগীদের হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় নিয়মিত কাজ করেই চলেছে।[৬] রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিভিন্ন হাসপাতালে মেডিসিন, সার্জিক্যাল, পেডিয়াট্রিক, ডার্মাটোলজি, রেডিওলজি, গাইনিকলজি, চক্ষু, ই.এন.টি, অর্থপেডিক, ডেন্টাল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইত্যাদি বিভাগ আছে।[৭]

শিক্ষার প্রসার

রামকৃষ্ণ মিশন বিশ্বাস করে যে, সকল স্তরের বিশেষত প্রান্তিক মানুষের উন্নতি না হলে দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। মানুষের পার্থিব ও অপার্থিব উন্নতির জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। তাই রামকৃষ্ণ মিশন তার যাত্রার সূচনাপর্ব থেকেই যুব সমাজকে যথাযথ ভাবে শিক্ষিত করতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ স্বামী অখন্ডানন্দজী মহারাজ কর্তৃক, সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের স্থাপনার কথা বলা যেতে পারে;[৮] যেটি কিনা ছিল রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক স্থাপিত প্রথম বিদ্যালয়। উল্লেখ্য যে, এতদ্ পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে রামকৃষ্ণ মিশন পশ্চিমবঙ্গের বুকে প্রচুর স্কুল, কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা করেছে, যেগুলি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার একেবারে সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছে। বলাই বাহুল্য যে, পশ্চিমবঙ্গের নগর-গ্রাম কিংবা উপজাতীয় অঞ্চল নির্বিশেষে সর্বত্রই রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে। সর্বোপরি প্রথাগত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশন বর্তমানে কৃষি বিদ্যালয়, ভাষা বিদ্যালয়, কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্র, দৃষ্টিহীন ছেলেদের জন্য শিক্ষায়তন এমনকি শিক্ষক শিখন কেন্দ্র ও নার্সিং কলেজ স্থাপনেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।[৯] বস্তুত, আজ একথা বলতে একটুও দ্বিধা নেই যে, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নরেন্দ্রপুরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত), কিংবা উত্তর ২৪ পরগণা জেলার রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টেনারি মহাবিদ্যালয় কিংবা হাওড়া জেলার বেলুড় মধ্যস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলি বর্তমানে তাদের উন্নত পরিকাঠামো ও সাফল্যের খতিয়ানে ভারতবর্ষের বুকে বাস্তবিকভাবেই এক গৌরবোজ্জ্বল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।[১০] এগুলি ব্যতীত রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড়ের আওতায় রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষামন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পবিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির (পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয়), রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির (কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) রয়েছে;[১১] যেগুলি মানব সমাজকে প্রথাগত শিক্ষা দানের পাশাপাশি বৃত্তিশিক্ষাদানেও ব্রতী হয়েছে। তাছাড়া প্রায় প্রতিবছরই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে রহড়া, বরাহনগর, পুরুলিয়া, নরেন্দ্রপুর, রামহরিপুর, টাকি, মালদা, মেদিনীপুর, কামারপুকুর, জয়রামবাটী ও আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের সাফল্য তো সর্বজনবিদিত। এছাড়া বেলঘরিয়ায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন কলকাতা ছাত্রাবাসও

বহুদিন ধরে দূর দূরান্ত থেকে আগত বহু প্রান্তিক ছাত্রের বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে চলেছে। সুন্দরবনের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রদের অবস্থিতি সর্বাধিক - সেখানেও আজ মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চবিদ্যালয় একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।[১২] প্রসঙ্গবশত বলে রাখা আবশ্যক যে, রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বেশিরভাগ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিতেই আজ উন্নতমানের গ্রন্থাগারের অবস্থিতি রয়েছে । কলকাতার বুকে গোলপার্কে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সিটিউট অফ কালচার সুবৃহৎ গ্রন্থাগারটি আজ পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয়।শিক্ষা হল মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বর্তমান তারই প্রকাশ।[১৩] রামকৃষ্ণ মিশন প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি চরিত্র গঠন ও মানুষ তৈরির উপর গুরুত্ব দেয়। চরিত্রবলে মানুষ সর্বত্রই জয়ী হয়।[১৪] স্বামীজি বলেছেন যে, যাতে মানুষ গঠিত হয়, এমন সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন।[১৫] রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সব ধরনের শিক্ষা ছাত্রদের দিয়ে থাকে।

বর্তমান কর্মধারা

বস্তুত, যখনই মানব সমাজ জীবনের ওপর কোনো অশনি সংকেতের কালো ছায়া ঘনিয়ে এসেছে তখনই রামকৃষ্ণ মিশন তার প্রতিরক্ষাকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ কিংবা মহামারী পরিস্থিতিতে পীড়িত মানুষদের সেবা প্রদান কল্পে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগের কথা বলা যেতে পারে। বস্তুত বন্যা, দুর্ভিক্ষের সময় একদিকে যেমন সে ত্রাণশিবিরের বন্দোবস্ত করেছে আবার অন্যদিকে মহামারী পরিস্থিতিতে সে রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে সচেতনতা কেন্দ্র স্থাপন, টীকাকেন্দ্র স্থাপন এমনকি দুঃস্থ মানুষ যাতে নিখরচায় সুচিকিৎসা করাতে পারে তার জন্য চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনের বন্দোবস্তও করেছে। শুধু মহামারী পরিস্থিতিতেই নয়, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও পীড়িত, দরিদ্র মানুষ যাতে সুচিকিৎসা পেতে পারে – তার জন্যও মিশন প্রায়শই চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে থাকে। এখানে রোগীদের চক্ষুরোগ, দন্তরোগ, নাক-কান-গলার রোগ ও হৃদরোগের চিকিৎসার পাশাপাশি তড়িৎচিকিৎসা ও রোগনির্ণয়ের সুবন্দোবস্তও থাকে।

অতি সাম্প্রতিককালে, ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতির মোকাবিলাকার্যে রামকৃষ্ণ মিশন নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কঠিন সময়ে মিশন যেমন একদিকে সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেছে, স্থাপনা করেছে 'সেফ হোমের' তেমনি অন্যদিকে এই কালপর্বে মিশন লকডাউনের অভিঘাতে পীড়িত দুঃস্থ মানুষদের খাদ্য সংস্থানের লক্ষ্যে চাল, ডাল, মুড়ি, তেল, আলু, পেঁয়াজ, দুধ, চা, রুটিরও বন্দোবস্ত করেছে। তাছাড়া এই পর্বে মিশন মাস্ক, গ্লাভস, বিনামূল্যে ওষুধ ও স্যানিটাইজার প্রদানের মাধ্যমেও এই রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছে।[১৬] এই মহামারীর প্রারম্ভিক পর্যায়ে রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর আশ্রমের পক্ষ

থেকে স্যানিটাইজার বিলি করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে এই মহামারীর দূরীকরণে নরেন্দ্রপুর আশ্রমের কর্মকাণ্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন - মহামারী পর্বে করোনা রোগীদের জন্য নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয় অতঃপর 'সেফ হোমের' স্থাপনা করেছে।[১৭] লকডাউনের অভিঘাতে পীড়িত মানুষদের জন্য খাদ্য দ্রব্য প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। ওই সময় করোনার অভিঘাতে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন স্তব্ধ হয়ে গেলে এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আন্তর্জালিক মাধ্যমে ক্লাস নেবারও বন্দোবস্ত করেছে। এককথায়, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম তার সবটুকু দিয়েই এই অতিমারী মোকাবিলাকার্যে অংশ নিয়েছে। সাম্প্রতিককালে মানসিক সুস্বাস্থ্য একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ফলত স্বাভাবিকভাবেই রামকৃষ্ণ মিশন বর্তমানে এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই কুইজ প্রতিযোগিতা, বাণী পাঠ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, সংগীত প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছে। এগুলি যুব সমাজের মানসিক স্বাস্থ্যকে উন্নত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। তাছাড়া করোনা পরিস্থিতিতে যাবতীয় শিক্ষাকেন্দ্রের পঠন পাঠন যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন যুব সমাজকে তাদের স্বীয় কর্মপন্থার প্রকাশ ঘটাতেও রামকৃষ্ণ মিশন বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।[১৮] উল্লেখ্য যে, লকডাউন পরবর্তী পর্বে রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পক্ষ থেকে একটি একদিবসীয় কর্মসভার আয়োজন করা হয়েছে যার মূল বিষয় হিসেবে স্থিরীকৃত হয়েছে সেই সুমহান মানব সেবা দর্শনই।[১৯] বলা বাহুল্য যে, এই কর্মসভা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে বাস্তবিক বহুলাংশে উজ্জীবিত করেছে তথা তাদের মানসিক উন্নয়নকল্পেও অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছে। বস্তুত, এই অতিমারী পরিস্থিতিতে সুস্থ দেহ ও মনই সমাজের একান্তই প্রয়োজন। তাই সেদিক থেকে দেখলে রামকৃষ্ণ মিশনের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। স্বামী বিবেকানন্দ মানবসমাজের উন্নয়নকল্পে মানুষকে উজ্জীবিত ও উৎসাহিত করতে প্রথম থেকেই উঠেপড়ে লেগেছিলেন।[২০] আর তাঁর সেই মানবহিতৈষণার আদর্শকে সামনে রেখেই আজও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী- ব্রহ্মচারী মহারাজবৃন্দ তাদের কর্মপন্থাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশন যে জনসমাজে তার 'প্রভাব ও গরিমা' নিয়ে সর্বকালের ন্যায় আজও আলোকোজ্জ্বল রয়েছে তা বলাই বাহুল্য।[২১] আসলে রামকৃষ্ণ মিশন দেশে একটা সর্বজনীন শিক্ষার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছে।[২২] স্বাধীনতার পর জাতীয় আত্মগঠনের ওপর জোর দিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। স্বাধীনতার আগে মূলত নৈশ বিদ্যালয় থাকলেও স্বাধীনতার পর বহুসংখ্যক মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ

তৈরি হয়েছে। প্রান্তিক মানুষের সেবা এই প্রতিষ্ঠান গুলি করে থাকে।[২৩] স্বামীজী জনসাধারণের চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। [২৪] রামকৃষ্ণ মিশন ধারাবাহিকভাবে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' এবং 'মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশ' ঘটিয়ে চলেছে।

পর্যবেক্ষণ

পশ্চিমবঙ্গে প্রান্তিক মানুষের সেবায় রামকৃষ্ণ মিশন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সাময়িক ও স্থায়ী দুধরনের কাজই করে চলেছে। সমষ্টির কল্যাণ, সামাজিক বেদনা দূর করা, অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশ প্রতিটি ক্ষেত্রেই রামকৃষ্ণ মিশন নিরলস কর্মধারা বজায় রেখে নিজের প্রাসঙ্গিকতা, গ্রহনযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ধারাবাহিকভাবে বজায় রেখেছে। বৈশ্বিক জীবন ও আত্মত্যাগের মন্ত্রে বিশ্বাসী রামকৃষ্ণ মিশন কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার উন্নতিকল্পেই মনোনিবেশ করেনি বরং এর সাথে সাথে মানব সমাজের সর্বক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতিকল্পেই তার যোগদান চোখে পড়ার মতো। সর্বোপরি, সকল সদগুণসম্পন্ন প্রকৃত 'মানুষ' তৈরির কারখানা হিসেবে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা তো সর্বজনবিদিত। রামকৃষ্ণ মিশনের মূল লক্ষ্যই হল জগতের কল্যাণ সাধন। স্বামীজী বলেছেন ভারতের কল্যাণ, আমার কল্যাণ। সূচনালগ্ন থেকেই রামকৃষ্ণ মিশন তার কল্যাণকর কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। করোনা মহামারীর ভয়াবহতা অতিক্রম করার প্রয়াসে রামকৃষ্ণ মিশন যেমন ব্রতী হয়েছে; তেমনি আমফান কিংবা যশের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার প্রশ্নেও এই প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এককথায় ত্রাণ, সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষার প্রতিটি বিভাগেই রামকৃষ্ণ মিশন তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে চলেছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক উন্নতি, প্রথাগত শিক্ষা, কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর এই প্রতিষ্ঠান গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। রামকৃষ্ণ মিশন 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' - এই কর্মধারা অব্যাহত রেখেছে। তাই রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন সবসময়ই যুগোপযোগী ও সমান প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র

১. The General Secretary, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission; Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission their History.Ideals.Activities (Second Revised Edition) p 11
২. তদেব পৃঃ ১৫
৩. স্বামী অন্নদানন্দঃ স্বামী অখন্ডানন্দ (উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৬৭) পৃঃ ১৩৬ - ১৪৫

৪. http://www.rkmsevapratishthan.org/departments/index Dated 06.07.2022
৫. তাপস বসুঃ শতবর্ষের আলোকে রামকৃষ্ণ মিশন (পত্রপুট, কলকাতা, ১৯৯৮) পৃঃ ২০৪
৬. তদেব পৃঃ ২৪১
৭. Rajesh Biswas: Advancement of Service to the Mankind: A Case Study on Ramakrishna Mission in West Bengal, Rina Pal (ed): Anudhyan An International Journal of Social Sciences (Raja Narendralal Khan Women's College, Paschim Medinipur, 2022) p.136
৮. স্বামী অন্নদানন্দঃ স্বামী অখন্ডানন্দ (অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতা, ১৯৯৩) পৃ- পৃঃ ৮ - ৯
৯. তাপস বসুঃ শতবর্ষের আলোকে রামকৃষ্ণ মিশন (পত্রপুট, কলকাতা, ১৯৯৮) পৃ- পৃঃ ৩০৬ - ৩১৯
১০. এই তিনটি কলেজ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক দ্বারা সেরা গুণসম্পন্ন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
১১. https://belurmath.org/ramakrishna-mission-saradapitha-belur/ Dated 03.07.2022
১২. Rajesh Biswas: Advancement of Service to the Mankind: A Case Study on Ramakrishna Mission in West Bengal, Rina Pal (ed): Anudhyan An International Journal of Social Sciences (Raja Narendralal Khan Women's College, Paschim Medinipur, 2022) pp.136-137 ও তাপস বসুঃ শতবর্ষের আলোকে রামকৃষ্ণ মিশন (পত্রপুট, কলকাতা, ১৯৯৮) পৃ- পৃঃ ৩০৬ – ৩১৯
১৩. স্বামী বিবেকানন্দঃ বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৭১) পৃঃ ৬/৪০০
১৪. তদেব পৃঃ ৬/৫০৪
১৫. তদেব পৃঃ ৫/১১৫
১৬. https://media.belurmath.org/activities-2020-21-relief-and-rehabilitation-services-8323/ Dated – 04.07.2022
১৭. Interview with Principal of Ramakrishna Mission Residential College (Autonomous), Narendrapur, Kolkata – 700103

১৮. রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র দ্বারা আয়োজিত – যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী ভিত্তিক প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান , তারিখ আগস্ট – সেপ্টেম্বর ২০২১
১৯. স্বামী জ্ঞানলোকানন্দের চিঠি, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১০৫ বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা – ৭০০০০৬, তারিখ ২৬.০৪.২০২২
২০. Sukanya Ray, Anil Baran Ray: Approaches To Human Development as Shown by Swami Vivekananda (Advaita Ashrama, Kolkata,Development)
২১. Swami Prabhananda: The Early History of The Ramakrishna Movement (Sri Ramakrishna Math, Chennai, India, 2009) p.1
২২. স্বামী প্রেমেশানন্দঃ শিক্ষাঃ সামাজিক দায়বদ্ধতা (উদ্ধোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৩) পৃঃ ১৬
২৩. শংকরীপ্রসাদ বসুঃ রামকৃষ্ণ মিশনের নীতি ও কর্মরীতি (উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৭) পৃঃ ৫৯
২৪. স্বামী বিবেকানন্দঃ বাণী ও রচনা (উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৭১) পৃঃ ৭/৩৭১

সৈয়দ সুলতানের 'নবী বংশ' : বাঙালীর মুসলমান হয়ে ওঠার প্রথম প্রকল্প

যীশু দেবনাথ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: মুসলমান শাসকের আজ্ঞায় হিন্দু কবি যে 'ভারত কথা' রচনা করেছিলেন, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মধ্যযুগের বাঙালী তা ঘরে ঘরে পড়েছে, সন্ধ্যায় আসর জমিয়ে সেই গাথা গেয়েছে তারা। কিন্তু এক আল্লাহের 'তৌহিদ' বিতরণ করে বাংলাদেশের পীর ফকিররা যাদেরকে মুসলমান করেছিলেন, সেই নতুন বাঙালী মুসলমানেরা খোদা আর রসুলের কথা তেমন করে অনুধ্যান করল কই! এই আক্ষেপ নিয়ে পীর সৈয়দ সুলতান তার বিরাট কলেবর 'নবী বংশ' গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই কাজটিকে তিনি আলিমের কর্তব্য জ্ঞান করেছেন। তাই এ কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় হিন্দু শাস্ত্রের অনুবাদ থেকে প্রেরণা নিয়ে অনেকটা সেই আদলেই রচিত হয়েছে নতুন মুসলমানের প্রথম বাংলা ধর্ম শাস্ত্র 'নবী বংশ'।

১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দকে 'নবী বংশ' রচনার আরম্ভ ধরা হলে তা চৈতন্য জীবনী সমূহের সমকালীন বলা চলে। এই গ্রন্থটিও কাহিনির নিরিখে এক বিশেষ ধরণের চরিত গ্রন্থ। আবার একই সঙ্গে গ্রন্থটিকে নানান আরবি ও ফারশি উৎসের নিরিখে অনুবাদ শাখার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কবি অবশ্য নিজে সে কথা উল্লেখ করেন নি, তবে 'নবী বংশ' কাহিনির উৎস যে আরবি 'শিরাত সাহিত্য' সে বিষয়ে গবেষকরা সকলেই প্রায় নিঃসন্দিগ্ধ।

হিন্দু শাস্ত্র অনুবাদের নিদর্শন থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখা একাধারে চরিত এবং অনেকাংশে ভাবানুদিত কাব্য 'নবী বংশ' আসলে ধর্মান্তরিত বাঙালীর মুসলমান হতে চাওয়ার প্রথম উড়ান। আর এই আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা থেকেই একাধারে পীর ও কবি সৈয়দ সুলতান তাঁর কাব্য রচনায় মিশিয়ে দিয়েছেন এমন অনেক উপাদান যা তিনি গ্রহণ করেছেন আরবি ও ফারশি 'কাসাসুল আম্বিয়া' থেকে, জন্ম সূত্রে পাওয়া দেশজ সংস্কার আর ঐতিহ্য থেকে। তাই মরুদেশের চিত্রনাট্যটি বাংলাদেশের আলোছায়ায় এক অভিনব রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তথাকথিত মুসলমানী কিসসা কিংবা সুফি তত্ত্বকথার পরিপ্রেক্ষিতে যা একান্তই ভিন্ন ধর্মী, নিতান্তই বাঙালীর নিজস্ব নির্মিতি।

প্রস্তাবিত প্রবন্ধটিতে ষোড়শ শতকের বাঙালীকে আরো একটু মুসলমান করার এই প্রয়াসের স্বরূপ সন্ধানই প্রধান লক্ষ্য। এরই সঙ্গে 'নবী বংশ' কাব্যের কয়েকটি বিচিত্র উপাদানকে যাচাই করে দেখার মধ্য দিয়ে বাংলার প্রথম মুসলমানি কিতাবের

কবি মনস্তত্বের অনুসন্ধান করারও একটি চেষ্টা থাকবে এই গবেষণা নিবন্ধে। এই দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি আসলে প্রথম প্রসঙ্গটিরই পরিপূরক বিশেষ।

এক

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চায় যুগবিভাগের নামকরণ পদ্ধতি, সাহিত্য সমূহের বর্গীকরণ, তাদের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্যায়ন ইত্যাদি প্রসঙ্গে কিছু বিতর্কের অবকাশ আজও রয়ে গেছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সেইসব বিতর্কিত প্রসঙ্গের কথা আমাদের মনে করতেই হয়। দীনেশচন্দ্র সেন প্রস্তাবিত 'হিন্দু বৌদ্ধ যুগ'[১] এর প্রকল্প কিংবা স্যার যদুনাথ সরকার প্রস্তাবিত ১৭৫৭ সাল থেকে আরম্ভ হওয়া 'আধুনিক' যুগ[২] এসব যেমন ইতিহাস চর্চার ঔপনিবেশিক চিন্তাপদ্ধতির ফসল, তেমনই আবার মধ্যযুগের সাহিত্যের শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে কবিদের মুসলমান পরিচিতির ওপরে ভিত্তি করে তথাকথিত 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য' নামের সাহিত্য ধারার প্রস্তাবও তেমনই দেশ-কালের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে জন্ম নেওয়া নির্দিষ্ট মনোভঙ্গীরই চিহ্ন বহন করে চলেছে। আর এই প্রথাগত চিন্তার পথ ধরে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের চর্চা জাতি হিসেবে বাঙালীর গড়ে ওঠার স্বরূপ অনুসন্ধানের পথে একটা প্রধান বাধা।

সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে প্রায়ই 'বৈষ্ণব পদাবলী', 'মঙ্গল কাব্য', 'চরিত সাহিত্য', 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' ইত্যাদি বর্গের পাশে 'ইসলামী' সাহিত্য' নামের একটি বর্গের প্রস্তাব করেছেন। এই বর্গ বিন্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে নয়, বরং একই সঙ্গে সাহিত্য সংরূপ, কাহিনির কথাবস্তু আর কাহিনির ধর্ম সাংস্কৃতিক উৎস বিচার করে এই বর্গবিন্যাস নির্মিত হয়েছে। একদিকে যেমন সাহিত্য সংরূপের দিক থেকে সমস্ত পাঞ্চালী ঢঙের মঙ্গল কাব্যকে 'মঙ্গলকাব্য' বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কাহিনি নির্বিশেষে সমস্ত বৈষ্ণব কবিতাকে 'বৈষ্ণব পদাবলী' নামক একটি সাহিত্য সংরূপের অন্তর্গত করা হয়েছে। অন্যদিকে তেমনই আবার চৈতন্য ও বৈষ্ণব মহাজনদের জীবনী গ্রন্থ সমূহকে কাহিনির বিচারে 'চরিত সাহিত্য' নামে পৃথক বর্গে রাখা হয়েছে, নানান ভারতীয় ও বিদেশী উৎস থেকে আসা রূপকথা ও লোককথা নির্ভর প্রণয় গাথা সমূহকে 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' হিসেবে বর্গীকৃত করা হয়েছে। এর বাইরে বিস্ময়করভাবে কবিদের মুসলমান পরিচয় এবং কথাবস্তুর ইসলাম সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ বিচার করে 'ইসলামী সাহিত্য' নামে একটি পৃথক বর্গ প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বর্গে একই সঙ্গে নবী রসুল এবং প্রথম যুগের ইসলাম প্রবর্তকদের জীবনীকে কেন্দ্র করে রচিত চরিত কাব্য, কারবালার যুদ্ধ বিষয়ক 'জঙ্গনামা', সুফী ও শরিয়ত বিষয়ক নানান তত্ত্বগ্রন্থ, পীরদের মাহাত্ম্য ব্যাঞ্জক পাঁচালী, এমনকি মুসলমান কবিদের লেখা পদাবলীও নির্বিচারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গত শতাব্দীর দুজন প্রখ্যাত সাহিত্য গবেষক ড. মহম্মদ এনামুল হক এবং আচার্য ডঃ সুকুমার সেন তাঁদের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' এবং 'ইসলামি বাংলা

সাহিত্য' গ্রন্থের মাধ্যমে এই বর্গের প্রস্তাব করেন। সুকুমার সেন মুসলমান কবিদের লেখা 'রোমাণ্টিক প্রণয়োপাখ্যান' সমূহকেও 'ইসলামী সাহিত্য' বর্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় নবী জীবনী 'নবীবংশ' রচয়িতা, যোগগ্রন্থ 'জ্ঞান প্রদীপ' প্রণেতা এবং বৈষ্ণব পদাবলীকার সৈয়দ সুলতানকে এককথায় 'ইসলামী কাব্যের কবি' বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনও 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্য কর্মে বাঙালীর স্বাভাবিক অংশগ্রহণকে 'মুসলমান' পরিচিতি দিয়ে পৃথক করার প্রয়োজন হল কেন? তবে কি দীনেশবাবুও শরৎচন্দ্রের মতো 'বাঙালী' ও 'মুসলমান'কে দুটি সমগোত্রীয় ভিন্ন জাতি পরিচয় বলে মনে করেছিলেন?আসলে বাঙালী মুসলমানের পরিচিতি নির্মাণের পেছনে দীর্ঘদিনের যে অস্বীকৃতির যন্ত্রণা প্রেরণা জুগিয়েছে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস চর্চার এইসব প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সেইসব অস্বীকৃতিরই উপসর্গ মাত্র। তাই পূর্ব বঙ্গের সাহিত্য গবেষক ড. এনামুল হকও তাঁর মুসলমান কবিদের বাংলা সাহিত্য বিষয়ক ইতিহাস গ্রন্থটির শিরোনাম দিয়েছেন 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য'।

মধ্যযুগের বাঙালীদের ধর্মীয় পরিচয়কে বিশেষ পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা প্রয়োজন ঠিক এই কারণেই। পুরাণ ও লৌকিক ধর্ম প্রসঙ্গ নিয়ে গড়ে ওঠা সাহিত্য যখন হিন্দুর সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত হয়নি, যখন হিন্দু পুরাণ আর লৌকিক কাহিনিকে বাঙালী জনসাধারণেরই সংস্কৃতি হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়েছে, তখন মুসলমান কবিরা ঠিক কোন প্রেরণা থেকে ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্রিক সাহিত্য কর্মে হাত দিয়েছিলেন, সেই প্রশ্নটা আলাদা করে অনুসন্ধানের দাবি রাখে নিশ্চয়ই, আর সেই তাগিদ থেকেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বিশ শতকের তৃতীয় চতুর্থ দশক থেকে পূর্ববঙ্গের সাহিত্য গবেষকেরা, বিশেষত প্রখ্যাত পুথি সংগ্রাহক আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ডঃ এনামুল হক, মহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ডঃ আহমেদ শরীফের মতো অনুসন্ধানী গবেষকেরা মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডার আবিষ্কার করেন। এই সব আবিষ্কৃত পুথি সম্পাদনা করে, গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে বাঙালীকে তার মধ্যযুগের ইতিহাসের আরেক নতুন জগতের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেন পূর্ববঙ্গের সাহিত্য গবেষকেরা। এইসব সাহিত্য কর্মের প্রাচীনতা, প্রামাণিকতা, কবি পরিচয়, ইত্যাদি বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বহু বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। কিন্তু এই সময় থেকেই তথাকথিত 'ইসলামী সাহিত্য' কে কথাবস্তুর নিরিখে 'জঙ্গনামা', 'চরিত সাহিত্য', আরবি ফার্সির অনুবাদ', 'ইসলামী তত্ত্ব গ্রন্থ', 'সওয়াল সাহিত্য', ইত্যাদি বর্গে পুনর্বিন্যস্ত করেছেন শহীদুল্লাহ এবং আহমদ শরীফ। এর ফলে 'ইসলামী সাহিত্য' তকমার আড়ালে থাকা এমন কিছু মধ্যযুগের সাহিত্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি যা মধ্যযুগের বাঙালী মননের সম্পূর্ণ অনালোকিত অংশের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ইসলাম কেন্দ্রিক কিংবা আরব পারস্যের পরিমণ্ডলে জন্ম নেওয়া বিষয়কে ভিত্তি করে সাহিত্য সৃষ্টিকে আমরা বাঙালীর মুসলমান হয়ে ওঠার একটা অসচেতন প্রকল্প মনে করি। এক্ষেত্রে শাহ মহম্মদ সগিরের 'ইছুপ জোলেখা' প্রণয় কাব্যটিকেই অনেক গবেষক মুসলমান কবির লেখা এবং ইসলামী কথা বস্তু নির্ভর প্রথম কাব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ড. এনামুল হক ও সাহিত্য বিশারদের মতানুসারে এই কাব্য গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকাল ১৩৮৯ থেকে ১৪০৯ এর মধ্যে রচিত হয়। কিন্তু এই রচনাকালকে কেন্দ্র করে বিস্তর বিতর্ক এবং মত পার্থক্যের কথা মনে রেখে আমরা ষোড়শ শতাব্দীতে চট্টগ্রামে রচিত সৈয়দ সুলতানের বিরাট কলেবর গ্রন্থ 'নবী বংশ' কে মুসলমান কবির বিশুদ্ধ ইসলামী কথা নির্ভর প্রথম শাস্ত্র গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেছি। 'নবীবংশ' কাব্য তাই বাঙালীর মুসলমান হয়ে ওঠার প্রথম প্রকল্প হিসেবে এই প্রবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে।

দুই

মধ্যযুগের, ডঃ এনামুল হকের মতে যা তুর্কী যুগ, সুলতান যুগ এবং মোগলাই যুগ অথবা মুসলিম শাসন আমল,[৫] সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের নিবিড় যোগাযোগ একটা প্রশ্নাতীত সত্য। তার প্রেক্ষাপটে প্রণয়োপাখ্যান ব্যতিত বাংলাদেশে সৃষ্টি হওয়া সমস্ত সাহিত্য কর্মই জন্ম নিয়েছে ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধ থেকে। কিন্তু সাধারণ মানুষের সহজাত বিনোদন প্রিয় মন সততই শিল্প ও সাহিত্যের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক। সেইকারণেই কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'ভারত কথা' হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ঘরে ঘরে পড়ে,[৬] শেখ জালাল কাশিদাসী মহাভারতের পুথি নিজের ব্যবহারের জন্য নকল করেন,[৭] রাধাচরণ গোপ 'ইমামের জঙ' কাব্য লেখেন। এই অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি চর্চার প্রেক্ষাপটই সৈয়দ সুলতানকে 'নবী বংশ' রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

"এবে পুস্তকের কথা কহিতে জুয়ায়।
প্রকাশ্যে সকল কথা মনে নাহি লয়।।
লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারত কথা কহিল বিচারি।।
হিন্দু মুসলমানে তাহা ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে।।"[৮]

চট্টগ্রাম অঞ্চলে পরাগলী মহাভারতের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জনপ্রিয়তার তথ্যটির সঙ্গে সৈয়দ সুলতানের 'নবী বংশ' কাব্যটির প্রথম খণ্ডটিকে যদি মিলিয়ে পড়া যায়, তাহলে দেখা যাবে শুধু মুসলমানের হিন্দু-শাস্ত্র শোনার আগ্রহ দেখে খেদ নয়, মুসলমান শ্রোতার মনে বদ্ধমূল হিন্দু সংস্কারকেও সুকৌশলে উন্মূলিত করায় সচেষ্ট হয়েছেন কবি। হিন্দু পুরাণ অনুসারে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম ও রাম অবতারের উল্লেখ করেছেন সৈয়দ সুলতান।[৯] এঁদের মধ্যে পরশুরাম ও রামকে পথভ্রষ্ট

হিসেবে অঙ্কিত করে হিন্দু-আখ্যান প্রিয় মুসলমান শ্রোতাকে কি হিন্দুয়ানির প্রতি কিছুটা বিরূপ করে তুলতে চেষ্টা করেছেন তিনি? অসম্ভব কিছুই নয়। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাহিনির 'হাসান হোসেন' পালাতেও দেখা যায় মুসলমান ধর্মগুরু মৌলবী, আলিমরা কেউই আল্লা রসুলের নাম জপ করেও মনসার কোপ থেকে রক্ষা পাননি।[১০] ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রিত সমাজে এটাই প্রত্যাশিত। তাই মুসলমানের হিন্দুয়ানি দেখে আক্ষেপ থেকে,পথভ্রষ্ট মুসলমানকে ইসলামের পথে আনয়ন করার উদ্দেশ্যে এবং দেশী ভাষায় সুবোধ্য করে মুসলমানের ধর্মশাস্ত্র রচনার তাগিদ থেকে সৈয়দ সুলতান 'নবী বংশ' রচনা করেন। "গ্রহ শত রস যোগে অব্দ গোঁয়াইল। দেশি ভাষে এহি কথা কেহ না কহিল।।" এই কালজ্ঞাপক পঙক্তিটির ব্যাখ্যা আহমদ শরীফের মতানুসারে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ এদেশে ইসলাম প্রসারের প্রায় চার শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালীর বোধগম্য ভাষায় নবী ও রসুলের জীবনী গ্রন্থ ছিল না। সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থ সেদিক থেকে বাংলা ভাষায় মুসলমানের প্রথম শাস্ত্রগ্রন্থ এবং আরেকটু নির্দিষ্ট করে বললে বাঙালীকে ঠিক ঠিক মুসলমান করে গড়ে তোলার প্রথম প্রচেষ্টা 'নবী বংশ'।

তিন

বাংলাদেশের মুসলমান জনসাধারণ এক দীর্ঘ সামাজিক নির্যাতনের ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন। আর্য সম্প্রসারণের কালে তারা বর্ণাশ্রমের শিকার হয়ে শুদ্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মের আশ্রয়ে গিয়ে সেই নিপীড়নের কিছুটা প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করেও পুনরায় শঙ্করাচার্য অনুপ্রাণিত নব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। মুসলমান শাসনকালে ইসলাম ধর্মের ছত্র ছায়ায় সেই ধর্মান্তরিত বৌদ্ধরা আশ্রয় খুঁজলেও আরব দেশের সেমেটিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে ছিটেফোঁটা পরিচয়ও তাঁদের হয়নি। কিন্তু মজার কথা এই যে মুসলমান রাজশাসনের আমলে একটা অবান্তর আত্মগৌরব অনুভব করার ফলে বারবারই বাংলার মুসলমান সমাজের একটা অংশ নিজেদের দেশীয় ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করার প্রাণপণ চেষ্টায় ব্যাপৃত থেকেছেন এবং পরিণতিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিল। এর প্রধান কারণই হল যে মুসলমান শাসকদের আদর্শ করে বাঙালী মুসলমানের মনে পুরোদস্তুর মুসলমান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, সেই মুসলমান শাসকদের সঙ্গে তাদের একমাত্র ধর্মটুকু ছাড়া আর কোনো সাদৃশ্যই ছিল না। অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকের দোভাষী পুঁথি রচনার ব্যাপারটা এই আকাঙ্ক্ষারই একটা প্রকাশ বিশেষ। 'বাঙালী মুসলমানের মন' শীর্ষক প্রবন্ধে আহমদ সফা এই প্রসঙ্গটিকে উল্লেখ করে লিখছেন

"বাঙালি মুসলমানের চোখে ফার্সী এবং উর্দু ভাষা দুটো আরবীর মতোই পবিত্র ছিল। আর এ দুটো রাজভাষা এবং শাসক নেতৃশ্রেণীর ভাষা হওয়ায়, তাদের শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু এ দুটির একটিকেও পরিপূর্ণভাবে রপ্ত করার

জন্য একটি সমাজের পেছনে যে শক্ত আর্থিক ভিত্তি এবং সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ থাকা প্রয়োজন ছিল দুটির কোনোটিই তাদের ছিল না। ...বাঙালি মুসলমানেরা নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে আরবী, ফার্সী এবং উর্দু এই তিনটি ভাষায় তালিম গ্রহণ করার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। আরবী ফার্সী এবং উর্দু ভাষাটাও যখন তাদের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে রপ্ত করা অসম্ভব মনে হয়েছে তখন ঐ বর্ণমালাতে বাংলা লেখার চেষ্টা করেছেন। এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে নেয়ার আছে, কোনো ব্যক্তিবিশেষ একটা ভাষা রপ্ত করতে পারেন, কিন্তু সেটাকে সামাজিকভাবে রপ্ত করা বলা চলে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেও আরবি হরফে বাংলা পুঁথিপত্র যে লেখা হয়েছে সেটাকে কজন অবসরভোগী পুঁথিলেখকের নিছক খেয়াল মনে করলে ভুল করা হবে। আসলে তা ছিল বেহেশতের ভাষার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। যখন দেখা গেল আরবি হরফে বাংলা লিখেও সমাজে চালু করা যায় না তখন পুঁথিলেখকরা সবান্ধবে পরবর্তী পন্থাটা অনুসরণ করতে থাকলেন। বাংলাভাষার সঙ্গে এন্তার আরবি ফার্সি শব্দ মিশেল দিয়ে কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করলেন। জনগণ তাদের এই ভাষাটিকে গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু কোন্ জনগণ? এরা ছিলেন সেই জনগণ সংস্কৃত ভাষা যাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, আরবি অজানা, ফার্সির নাম শুনেছেন এবং উর্দু ভাষা কানে শুনেছেন মাত্র। ...সুযোগ পেলে তারা আরবিতে লিখতেন, নইলে ফার্সিতে, নিদেনপক্ষে উর্দুতে। কিন্তু যখন দেখা গেল এর একটাও সামাজিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয় তখন বাধ্য হয়েই বাংলা লিখতে এসেছেন। কেউ কেউ সন্দ্বীপের আবদুল হাকিমের সেই 'যেজন বঙ্গেতে জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী। সেজন কাহার জন্ম নির্ণএ ন জানি' পঙক্তিগুলো আউড়ে বলে থাকেন যে নিজেদের ভাষার প্রতি পুঁথিলেখকদের অপরিসীম দরদ ছিল। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। নিশ্চয়ই সে সময়ে এমন লোক ছিলেন যারা সত্যি সত্যি বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করতেন। আবদুল হাকিম নিজে সে শ্রেণীভুক্ত নন, তাই সে উঁচু ভাষাতে তার অধিকারও নেই। তাই তিনি তার একমাত্র আদি এবং অকৃত্রিম ভাষাতেই লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।"[১১]

বাংলা ভাষার প্রতি উচ্চবর্ণের হিন্দু কিংবা উচ্চ বর্গীয় মুসলমান, সকলেরই এই নেতিবাচক মনোভঙ্গীর সামনে দাঁড়িয়েই মধ্যযুগের কবিরা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং আরবি ফার্শি ধর্ম শাস্ত্রের সারানুবাদ বা ভাবানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কারণ বাংলা সাধারণের ভাষা, সেকালের কাব্যে আমরা পাঞ্চালী, পয়ার ইত্যাদি শব্দকেও বাংলা ভাষার সমার্থে ব্যবহৃত হতে দেখি। যেমন "ভাগবত অর্থযত পয়ারে বান্ধিয়া। লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া" বাংলাদেশের সমস্ত প্রান্তিক অঞ্চলগুলো যে ভৌগোলিকভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বাংলা ভাষী হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণও আছে সুদূর ত্রিপুরার 'রাজমালা' গ্রন্থের উল্লেখে। "পূর্বে রাজমালা ছিল ত্রিপুর ভাষাতে। পয়ারে গাঁথিল সব সকলে বুঝিতে।।"[১২] ত্রিপুরার রাজা ধর্ম মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৪৩১-১৪৬২) রাজমালা বাংলায় রচিত হতে থাকে।[১৩]

সেই সময়প্রেক্ষিতে সৈয়দ সুলতান নবী কাহিনি আরবি 'কাসাসুল আম্বিয়া' গ্রন্থ অনুসরণে 'নবী বংশ' রচনা করেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় রচনার জন্য দ্বিধা ও সংশয় তাঁরও কম ছিল না। তবে আলিমের দায়িত্ব আর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'এর মতো লোক নিস্তারের প্রেরণাই তাঁকে এই দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী করেছিল।

"কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উৎপন।
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন।।
...আপনা দিনের বোল এক না বুঝিলা।
প্রস্তাব পাইয়া সব ভুলিয়া রহিলা।।
...যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষা হয় তার অমূল্য রতন।।
...যেসবে আপনা বোল না পারে বুঝিতে।
পঞ্চালী রচিলুঁ করি আছয়ে দুষিতে।।
মুনাফিক বলে মরে কিতাবেত পড়ি।
কিতাবের কথা দিল হিন্দুয়ানি করি।।"[১৪]

পরবর্তী কালের অনেক কবির রচনাতেও এই একই কৈফিয়তের সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। অর্থাৎ মধ্যযুগের কবিদের বাংলা ভাষায় রচনার পেছনে ছিল লোকায়ত ধর্মমত প্রচারের একটি আত্যন্তিক প্রচেষ্টা। কিন্তু নিজস্ব কবি প্রতিভার বলে সৈয়দ সুলতানের কাব্য কি ধর্মকথার গণ্ডি পেরিয়ে জনপ্রিয় গাথার রূপ নেয়নি? ১৩২১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত 'বাঙালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' শীর্ষক রচনা থেকে সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থের নানান পর্বের বিপুল জনপ্রিয়তার খবর পাওয়া যাচ্ছে। কাহিনির নিরিখে হজরত মহম্মদ পূর্ববর্তী নবীদের জীবনকথার চেয়ে রসুল চরিতের কাহিনির জনপ্রিয়তার কথাও আমরা ১৩৪১ সনের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত ডঃ এনামুল হকের 'কবি সৈয়দ সুলতান' প্রবন্ধ থেকে জানতে পারছি।

চার

'ইসলামী বাংলা সাহিত্য' নামে চিহ্নিত সাহিত্য ধারার প্রথাগত চর্চার আড়ালে অনালোকিত রয়েছে কয়েকটি এমন তথ্য যা আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্য চর্চায় সংযোজন করতে পারে কিছু নতুনতর মাত্রা। অধ্যাপক আহমদ শরীফ, ডঃ এনামুল হক, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রভৃতি গবেষকদের নিরলস চর্চায় উঠে এসেছে সেইসব তথ্যের সংকেত। সেগুলোকে ক্রমান্বয়ে সাজালে অনেকটা এইরকম হয়... ষোড়শ শতকের কবি সৈয়দ সুলতানের নবী জীবনী মূলক কাহিনি কাব্য 'নবী বংশ' চট্টগ্রাম সহ দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গের বিরাট অঞ্চলের মানুষের যুগপৎ চিত্ত বিনোদন এবং ধর্ম চর্চার প্রধান উপাদান হয়েছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে কাহিনি এবং উৎসের

নিরিখে তা নিছক ইসলামী' কথাবস্তু নয়, একই সঙ্গে সংরূপের দিক থেকে তা চরিত সাহিত্য এবং একটি বিখ্যাত আরবি গ্রন্থের বাংলা ভাবানুবাদ গ্রন্থ। সর্বোপরি নবদীক্ষিত বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির পথ ধরে মুসলমান হয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টার প্রথমতম প্রকল্প সৈয়দ সুলতানের এই বিরাট কলেবর কাব্য 'নবী বংশ'।

প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস, সংস্কার আর সংস্কৃতি থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মধ্যযুগের যেসব মুসলমান কবি তাঁদের কাব্য ভাবনার উৎস খুঁজেছেন আরব পারস্যের ইসলামী কিসসাতে, ইসলামের মত ও পথ প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে যে কবিরা মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা কাব্য রচনা করেছিলেন, তাঁদের কবি পরিচয় কি শুধু 'মুসলিম কবি' কিংবা 'ইসলামী কাব্যের কবি' হতে পারে? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিতর্ক চলতেই পারে। কিন্তু কবিদের হাতে নতুন দেশ, কাল আর সংস্কৃতির আখ্যান মঞ্জরিত হওয়ার যে চিহ্ন আমরা মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে দেখেছি, তা আমাদের সামনে বাঙালীর ধর্মান্তরণের পরবর্তী পর্যায়, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ভাবে মুসলমান হয়ে ওঠার প্রচেষ্টাকেই স্পষ্ট করে তোলে। তাই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ভবিষ্যৎ চর্চা একক বাঙালীর রাঢ় বঙ্গ কেন্দ্রিক বৈচিত্রহীন সাহিত্য চর্চার প্রথা মাফিক পথ ছেড়ে বৃহৎ বঙ্গের নানান প্রান্তের বিচিত্র মানুষের রুচি ও সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে অগ্রসর হতে সক্ষম হলে মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির আরও অনেক নতুন দিগন্তের সন্ধান পাবে।

তথ্য সূত্র:

১. শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ,স্যান্যাল এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা পৃঃ ৪৮
২. Jadunath Sarkar, The History Of Bengal Muslim Period 1200 To 1757, The University of Dacca, 1948 Page 497
৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ভারতী বুক স্টলকলকাতা ২০১১ পৃঃ ১৩০
৪. আহমদ শরীফ,বাঙালী ও বাঙলাসাহিত্য (দ্বিতীয় খন্ড), নিউ এজ পাবলিশিং, ঢাকা, ২০০৫, পৃঃ ২৯৩
৫. মহম্মদ এনামুল হক, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, (মহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত), ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৩৭১, পৃঃ ৩৯
৬. সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবী বংশ, দ্বিতীয় খণ্ড (ডঃ আহমদ শরিফ সম্পাদিত), বাংলা অ্যাকাডেমি ঢাকা ১৯৭৮ পৃঃ ৪৭৭
৭. সুকুমার সেন, ইসলামী বাংলা সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ২০১৬ পৃঃ ৪৫

৮. সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবী বংশ, দ্বিতীয় খণ্ড (ডঃ আহমদ শরিফ সম্পাদিত), বাংলা অ্যাকাডেমি ঢাকা ১৯৭৮ পৃঃ ৪৭৭
৯. সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবী বংশ, প্রথম খণ্ড (ডঃ আহমদ শরিফ সম্পাদিত), বাংলা অ্যাকাডেমি ঢাকা ১৯৭৮ পৃঃ ২১
১০. Sukumar Sen (Edited) Bipradasa'sManasa Vijaya, The Asiatic Society, Calcutta, 1953, Page 82
১১. আহমদ সফা, বাঙালী মুসলমানের মন, খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানী, ঢাকা ১৯৮১ পৃঃ ২৪-২৫
১২. কৈলাসচন্দ্র সিংহ (সম্পাদিত) রাজমালা (প্রথম লহর), অক্ষর পাবলিশার্স, আগরতলা ২০১৮, পৃঃ ৩
১৩. কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), ত্রিপুরার ইতিহাস, (শৈলেশ চন্দ্র দে রচিত প্রবন্ধ ত্রিপুরা রাজ্য ও বাংলা ভাষা), দেজ পাবলিশিং ২০১৭, পৃঃ ১৬৩
১৪. আহমদ কবির (সম্পাদিত) আহমদ শরীফ রচনাবলী ২, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৬ পৃঃ viii

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে রামমোহন রায়ের কর্মজীবন এবং প্রসঙ্গ কোচবিহার ও ভুটান ভ্রমণ

অমিতেশ রায়
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়
মল্লারপুর, বীরভূম

সংক্ষিপ্তসার: ১৮০০ শতকের মধ্যভাগে ব্রিটিশদের ভারতবর্ষে আগমন ঘটে এবং তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে শুরু করে সাম্রাজ্য বিস্তারে ফলে শুধু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায় বৃদ্ধি ঘটেনি তাদের আগমনের ফলে ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতি জগতেও ধীরে ধীরে এক আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছিল। তার জন্য মূলত দায়ী ছিল ব্রিটিশদের দ্বারা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার। আর এই পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে ব্রিটিশরা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এই পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরেই ভারত তথা বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে আসে নবজাগরণ। এই নবজাগরণের তৎকালীন যে কয়েকজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন রামমোহন রায়। রামমোহন রায় তৎকালীন চিরাচরিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থা ধর্মীয় স্থবিরতা, নারীজাতির সামাজিক অবনমন ইত্যাদির বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিলেন।তার এই চিরাচরিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আজও ইতিহাসে আলোচিত বিষয় কিন্তু এই সকল বিষয় আলোচিত হলেও তার এই বজ্র-কঠিন মানসিক কাঠিন্য তিনি কোথা থেকে পেলেন? আর কোথা থেকে তিনি এতসব জ্ঞান আহরণ করলেন তা আজও কিন্তু অনেকটাই অনালোচিত থেকে গেছে আমাদের কাছে। তার প্রথম জীবনের ঘটনাবলী অনেকটাই আমাদের কাছে অপ্রতুল, যেমন-তার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কর্মরত ছিলেন প্রায় এক দশক তার এই কর্মজীবনকাল নিয়ে কোনো আলোচনা কিন্তু সেই অর্থে হয়নি। আবার তিনি রংপুরে কর্মরত অবস্থায় যে কোচবিহার ভ্রমণ করেছিলেন এবং পরে তিনি ইংরেজদের দূত হিসেবে ভুটান ভ্রমণ করেছিলেন সেই ইতিহাস কিন্তু আমাদের কাছে অনেকটাই অনালোচিত।এই প্রবন্ধে রামমোহন রায়ের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে তার কর্মজীবন এবং সাথে তার কোচবিহার ও ভুটান ভ্রমণ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সূচক শব্দ: রামমোহন রায়; রংপুরে; ভুটান; কোচবিহার; নবজাগরণ; ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

১৮০০ শতকের মধ্যভাগে ব্রিটিশদের ভারত বর্ষে আগমন ঘটে এবং তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে শুরু করে সাম্রাজ্য বিস্তারে ফলে শুধু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায় বৃদ্ধি ঘটেনি তাদের আগমনের ফলে ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতি জগতেও ধীরে ধীরে এক

আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছিল। তার জন্য মূলত দায়ী ছিল ব্রিটিশদের দ্বারা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার। আর এই পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে ব্রিটিশরা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, এই পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরেই ভারত তথা বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে আসে নবজাগরণ। এই নবজাগরণের তৎকালীন যে কয়েকজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন রামমোহন রায়। রামমোহন রায় তৎকালীন চিরাচরিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থা ধর্মীয় স্থবিরতা, নারীজাতির সামাজিক অবনমন ইত্যাদির বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিলেন।তার এই চিরাচরিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আজও ইতিহাসে আলোচিত বিষয় কিন্তু এই সকল বিষয় আলোচিত হলেও তার এই বজ্র কঠিন মানসিক কাঠিন্য তিনি কোথা থেকে পেলেন ? আর কোথা থেকে তিনি এতসব জ্ঞান আহরণ করলেন তা আজও কিন্তু অনেকটাই অনালোচিত থেকে গেছে আমাদের কাছে। তার প্রথম জীবনের ঘটনাবলী অনেকটাই আমাদের কাছে অপ্রতুল, যেমন-তার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কর্মরত ছিলেন প্রায় এক দশক তার এই কর্ম জীবনকাল নিয়ে কোনো আলোচনা কিন্তু সেই অর্থে হয়নি। আবার তিনি রংপুরে কর্মরত অবস্থায় যে কোচবিহার ভ্রমণ করেছিলেন এবং পরে তিনি ইংরেজদের দূত হিসেবে ভুটান ভ্রমণ করেছিলেন সেই ইতিহাস কিন্তু আমাদের কাছে অনেকটাই অনালোচিত। তিনি ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন এবং তারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পারি তার শেষজীবনের আত্মজীবনীমূলক পত্রে, "I proceeded on my travels, and passed through different countries, chiefly within, but some beyond, the bounds of Hindoostan, with a feeling of great aversion for the establishment of the British power in India."[১] এই প্রবন্ধে রামমোহন রায়ের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে তার চাকুরী জীবন এবং সাথে তার কোচবিহার ও ভুটান ভ্রমণ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

রামমোহন রায়ের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কর্মজীবন

1810 সালে মিঃ ডিগবির অধীনে "রংপুরের দেওয়ান" হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় এবং সেই বছরের আগে পর্যন্ত তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে আমরা তার প্রথম দিকের কর্মজীবন এবং মিঃ ডিগবি ছাড়া অন্য ইউরোপীয় অফিসারদের সাথে তার সম্পর্ক কেমন ছিল? সেই সম্পর্কে আমরা অনেকটাই অজ্ঞাত। তবুও, তার কর্মজীবনের প্রথম পর্যায়ে এবং তার যৌবনকালের অভিজ্ঞতা এবং ভ্রমণ, তার মানসিক শক্তি বিকাশে ও তার সম্পদ এবং অবস্থান অর্জনের সঠিক দিক নির্দেশনায় তাকে সহায়তা করেছিল। 1815 সালে আমরা সম্পূর্ণ রূপে পরিপূর্ণ ও বিকশিত রামমোহনকে দেখতে পারবো। তিনি কলকাতায় পাকাপাকি ভাবে বসবাস করতে শুরু করেন এবং সমাজে তার জ্ঞান ও যুক্তির আলোর দ্বারা

অন্ধকার ও কুসংস্কারের মুলে কুঠারাঘাত করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন। অবশেষে এটিই তার জীবনের ধ্যান ও জ্ঞানে পরিণত হয়ে ওঠে।

ঢাকায় কর্মজীবন

1803 সালের মার্চ মাসে মাত্র 29 বছর বয়সে তিনি দেওয়ান হিসেবে ঢাকার জেলালপুরের কালেক্টরের অধীনে কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন। অবাক করার বিষয় যে, সেই সময় প্রাচ্য ভাষা বিষয়ে তিনি এতটাই পারদর্শী ছিলেন যে ইংরেজদের দেওয়ান পদের মত এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের কার্যভার তার উপর ন্যস্ত হয়েছিল। রামমোহন রায় তার কোম্পানির অধীনে কর্মজীবনের প্রথম দিকের কিছুটা সময় ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। তিনি সেই সময় ঢাকার কালেক্টর উডফোর্ড সাহেবের অধীনে কর্মরত ছিলেন দেওয়ান হিসেবে। তৎকালীন সময়ের পুরনো সরকারি নথিপত্র থেকে এটা জানা যায় যে, তিনি উডফোর্ড সাহেবের অধীনে একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী ছিলেন। থমাস উডওয়ার্ড ঢাকার কালেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং রামমোহন রায় সেখানে কোন পদে কর্মরত ছিলেন সেটি আমরা জানতে পারি উডফোর্ড সাহেবের বোর্ড অফ রেভিনিউ কে 7ই মার্চ 1803 সালে লেখা একটি চিঠির মাধ্যমে-

> "Kishen Chund having this day voluntarily resigned the office of Dewan of this Collectorship l beg leave to inform your Board thereof and that I have appointed Rammohun Roy in his place, Rammohun Roy has given the security required by Regn. 3rd Section 15, 1794 and the name of his surety is Dul Singh a very respectable man."[২]

উড ফোর্ড সাহেব ঢাকার জেলালপুরের কালেক্টর রূপে 14ই মে 1803 সালের পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন । এরপর তিনি তার কর্মভার থেকে বিরতি নেন এবং জন ব্যাটি ঢাকার জেলালপুরের কালেক্টরের কর্মভার গ্রহণ করেন। জন্ ব্যাটির বোর্ড অফ রেভিনিউকে লেখা চিঠি থেকে আমরা আরো জানতে পারি যে, সেই দিনই রামমোহন রায় নিজের দেওয়ান পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। সেই চিঠিটি 16ই মে 1803 সালে লেখা এবং সেই চিঠির ভাষ্য অনুযায়ী-

> "In the Letter which I had the honor of addressing you on the 14th Instant, I omitted to state that Mr. Woodforde late Acting Collector of this place, informed me that Rammohun Roy had on that morning sent him his resignation of the office of Dewan of Dacca Jelalpore."[৩]

এরপর উডফোর্ড সাহেব মুর্শিদাবাদ কোর্টের রেজিস্ট্রার হিসেবে নিযুক্ত হন কিন্তু তার আগেই তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি কর্মবিরতি নিয়ে নেন নিজের স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য। ইত্যবসরে পিতার মৃত্যুশয্যায় থাকার খবর পেয়ে রামমোহন রায় তার পৈতৃক বাড়ি রাধানগরে ফিরে আসেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মুর্শিদাবাদে চলে যান কর্মভার গ্রহণের জন্য। ইতিমধ্যে উডফোর্ড সাহেব 1804 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুর্শিদাবাদে নিজের কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। মুর্শিদাবাদে রামমোহন কিছুকাল কার্য সম্পাদন করেন এর পর উডফোর্ড সাহেব মুর্শিদাবাদ থেকে চলে গেলে রামমোহন রায় নিজেও সেই কাজ থেকে পদত্যাগ করেন। 1805-1806 সাল পর্যন্ত তিনি কর্মহীন ছিলেন। এরপর তিনি রামগড়ে চলে যান কাজের উদ্দ্যেশে। 1803 অথবা 1804 সাল নাগাদ তার নিজের লেখা ‘তুহফাত-উল-মুয়াহহিদিন’ প্রকাশ পায়।

রামগড়ে কর্মজীবন

রামগড়ের কর্মজীবনকাল রামমোহন রায়ের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কিছুকাল কর্মহীন থাকার পর রামমোহন রায় রামগড়ে ফৌজদারি আদালতের সেরেস্তাদার হিসেবে কর্মভার গ্রহণ করেন।এই সময়েই তার পরিচয় ঘটে ইংরেজ আধিকারিক জন ডিগবি সাহেবের সাথে, যার অধীনে তিনি তার কর্মজীবনের বাকি সময়টা কাটিয়েছিলেন। এই সম্পর্কে Sophia Dobson Collette তার সম্পাদিত, “*The Life and Letters of Raja Ram Mohun Roy*” গ্রন্থে লিখেছেন, “Now it is at Rangpur that popular tradition Chiefly connects the name of Ram Mohun Roy with Mr Digby; but as Mr Digby was previously at Ramgurh (1805 to 1808) and Bhagalpur (1808 to 1809) and Ram Mohun mentions in his evidence in the Burdwan lawsuit having decided at Ramgurh, Bhagalpur and Rangpur, it is highly probable that he was working under Mr. Digby in the two formal localities before he went to Rangpur; although we have no details as to the successive posts which he then occupied.”[৪]

রামমোহন রায়ের সাথে ডিগবির পরিচয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডিগবি সাহেব বোর্ড অফ রেভিনিউকে লেখা চিঠিতে বলেছেন, “Rammohun Roy the man whom I have recommended to be appointed as Dewan of this office acted under me in the capacity of sheristadar of the Fowzdary Court for the space of three months while I officiated as magistrate of the Zillah of Ramgur and from what l saw of his knowledge of the Regulations accounts &ca., during that time and during the term of

my acting as Collector of jessore as well as from the opinion I have formed of his probity and General qualifications in a five years acquaintance, with him...."[৫] তৎকালীন সময়কালে সরকারি দপ্তরের চিঠিপত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী মিলার সাহেব ছুটিতে থাকায় ডিগবি সাহেব সাময়িক ভাবে ম্যাজিস্ট্রেট এর পদে অধিষ্ঠিত হন তিন মাসের জন্য । সুতরাং এই বিষয়ে আর কোনো দ্বিমত রইলো না যে তিনি সাময়িক ভাবে তিনমাস ফৌজদারি আদালতের সেরেস্তাদার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

যশোরে কর্মজীবন

সেই সময়ের সরকারি দপ্তরের নথিতে কিন্তু ডিগবি সাহেবের ব্যাক্তিগত কর্মচারী হিসেবে রামমোহন রায়ের কোনো নাম পাওয়া যায় না। রামমোহন রায় যশোরে কর্মরত ছিলেন সে সম্পর্কে জানতে পারা যায় ডিগবি সাহেবের বোর্ড অফ রেভিনিউকে 31শে জানুয়ারি 1810 সালে লেখা একটি চিঠির মাধ্যমে, "...the knowledge he evinced of the Regulations and of the general system to be adopted for the collection of the Revenue when with me in the capacity of a private Moonshee, during the term of my acting as Collector of the District of Jessore."[৬] তৎকালীন সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ থেকে জানতে পারা যায় যে, 1807 সালের 23শে ডিসেম্বর যশোরের কালেক্টর পার্কার সাহেবের পরিবর্তে ডিগবি সাহেব কালেক্টরের পদ গ্রহণ করেন। ডিগবি সাহেবের এই মর্মে বোর্ড অফ রেভিনিউকে লেখা রিপোর্ট থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

ভাগলপুরে কর্মজীবন

ডিগবি সাহেব যশোর থেকে বদলি হয়ে সোজা ভাগলপুরে চলে আসেন জেলা ফৌজদারি আদালতের নিবন্ধক হিসেবে এবং তার সাথে রামমোহন রায়ও চলে আসেন ভাগলপুরে। এখানে থাকাকালীন তার ভাগলপুরের কালেক্টর ফ্রেডরিক হ্যামিল্টনের সাথে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই বিবাদের জের প্রায় গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো অবধি চলে গিয়েছিল। তার ফ্রেডরিক হ্যামিল্টনের প্রতি আচরণে কোন ভুল ছিল না। কিন্তু ভবিষ্যতে তার কর্মজীবনে অনেক ক্ষেত্রে বাধার সন্মুখীনে পড়েছিলেন। তিনি সেই সময় যে ডিগবি সাহেবের ব্যাক্তিগত মুন্সী হিসেবে কাজ করছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফ্রেডরিক হ্যামিল্টনের বোর্ডকে লেখা একটি রিপোর্টের মাধ্যমে," I turned to a servant of mine and enquired who it was coming-along ; he replied, Mr. Digby's Dewan, Baboo Rammohun Roy."[৭] এর কিছুকাল পরে ডিগবি সাহেব ভাগলপুর থেকে বদলি হয়ে রংপুরে চলে আসেন এবং সাথে তার ব্যাক্তিগত কর্মচারী হিসেবে রামমোহন রায়ও চলে আসেন রংপুরে।

রংপুরে কর্মজীবন

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে তার কর্মজীবন শুরু হলেও তার অনেকটা সময় কেটেছে ডিগবি সাহেবের ব্যাক্তিগত মুন্সী হিসেবে। আর কর্মসূত্রে তিনি অনেক জায়গায় অবস্থান করলেও তিনি কিন্তু তার কর্মজীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছিলেন রংপুরে। আর তার ব্যক্তিজীবনের উন্নতির ক্ষেত্রে বা বলা যায় যে জন্য তিনি আজও আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় তার কর্মযজ্ঞ শুরুই হয়েছিল রংপুর থেকে। 1809 সালের 20শে অক্টোবর ডিগবি সাহেব কালেক্টর হিসেবে রংপুরে যোগদান করেন। এই সময় রংপুরের দেওয়ান পদটি ফাঁকা থাকায় সেই জায়গায় রামমোহন রায়কে নিয়োগ করার জন্য বোর্ড অফ রেভিনিউকে ডিগবি সাহেব চিঠি লেখেন,“ a man of very respectable family and excellent education, fully competent to discharge the duties of such an office.”[৮]

রামমোহন রায়ের নিয়োগ নিয়ে ডিগবি সাহেব ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ রেভিনিউ এর মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত ঘটে। উপরিউক্ত চিঠির প্রত্যুত্তরে বোর্ড অফ রেভিনিউ লিখে পাঠায়, “Ram Mohun Roy as Acting serishtadar of a Fouzdarry Court cannot be considered by them as rendering him in any degree competent to perform the more important duties of a Dewan, which are in their nature totally different.

The Board under the circumstances desire that you will nominate some person from whose general knowledge in the Revenue Department responsibility and other qualifications, the duties vested in him may be expected to be performed with accuracy.”[৯] বোর্ড অফ রেভিনিউ এর সদস্যরা চেয়েছিলেন যে দেওয়ানী কাজের সাথে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোন ব্যাক্তিকে যার আগেও দেওয়ানী কাজের অভিজ্ঞতা থাকবে সেইরকম কাউকে নিয়োগ করতে। কিন্তু ডিগবি সাহেব রামমোহন রায়ের নিয়োগের ক্ষেত্রে নাছোড়বান্দা ছিলেন এবং সেইজন্য তিনি বোর্ড অফ রেভিনিউ কে চিঠি লিখে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, “I imagined that such objection would have been sufficiently obviated by what I mentioned in my Letter of the 30th Ultimo, as to the knowledge he evinced of the Regulations and of the general system to be adopted for the collection of the Revenue when with me in the capacity of a private Moonshee, during the term of my acting as Collector of the District of Jessore. Moreover, I cannot refrain from observing that in many instances

Dewans of Collector's have been confirmed by the Board, who had never been employed in any public office.

I beg leave to refer the Board to the Cazy wul Cozzat in the the Sudder Dewany Adaw lut, to the head Persian Moonshee of the College of Fort William, and to the other principal officers of those Departments for the character and qualifications of the man I have proposed."[১০]

ডিগবি সাহেবের এই চিঠি বোর্ড অফ রেভিনিউ এর সদস্যদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল এবং তারা ডিগবি সাহেবকে চিঠির প্রত্যুত্তর দিলেন যে, "...to inform you that they greatly disapprove of the style in which you have addressed them upon the present occasion; and that although it would be with much reluctance the Board would certainly feel themselves compelled to take very serious notice of any repetition of similar disrespect towards them."[১১]

এরপরে আর ডিগবি সাহেব রামমোহন রায়ের দেওয়ান হিসেবে নিয়োগের বিষয়ে বোর্ড অফ রেভিনিউ এর সাথে বিবাদে জড়াননি। পরে তিনি সেই জায়গায় দেওয়ান হিসেবে হেমায়েত উল্লা কে নিয়োগ করেন।

রামমোহন রায়ের রংপুরের দেওয়ান হিসেবে নিযুক্তি না হলেও তিনি এরপরেও প্রায় চার বছরকাল রংপুরে অবস্থান করেছিলেন। আরো জানা যায় যে তিনি রংপুর জেলার উদাসী পরগনার স্বর্গীয় রাজকিশোর চৌধুরীর নাবালক পুত্রের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব ভার পালন করেছিলেন 1815 সালের 15ই মার্চ অব্দি। এই মর্মে বোর্ড অফ রেভিনিউকে জন ডিগবি সাহেব চিঠি লিখলেন," I beg leave to acquaint you for the information of the Court, that I have appointed Rammohun Sharma as guardian of Kishen kishor and Gourkishor chowdhries, minors proprietors of 8 annas share of Odasay, as I can expect to procure for a salary of Rs.8 per mensem, and trust that the court will be pleased to sanction the appointment."[১২] সুতরাং বলা যেতে পারে যে তৎকালীন বিভিন্ন নথি থেকে রামমোহন রায় যে 1815 সাল অব্দি রংপুরে অবস্থান করছিলেন এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কর্মরত ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী যে তিনি 1814 সালে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন সেটা অনেকাংশেই বিভ্রান্তিমূলক। তিনি 1815 সালে কলকাতায় গিয়েছিলেন এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কোচবিহার ভ্রমণ

কোচবিহার রাজ্য এবং তার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। কোচবিহার রাজ্য উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ন রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হয়ে এসেছে। এই রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনেক প্রাচীন। রাজ্য কোচবিহারে এক সময় আগমন ঘটেছিল যুগপুরুষ রামমোহন রায়ের । তার আগমনের উদ্দ্যেশ্য নিছক ভ্রমন ছিল না, তৎকালীন সময়ে কোচবিহার রাজ্যের সাথে ভুটানের সীমানা নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে। রামমোহন রায়ের কোচবিহার আগমনের তথ্য অনেকটাই অপ্রতুল। 1773 সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল কোচবিহার রাজ্য ফলে ভুটানের সাথে কোচবিহারের সীমানা নিয়ে বিবাদ দেখা দিলে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ ছিল অবশ্যম্ভাবী। সেই কারণেই ইংরেজ আধিকারিকের সাথে তার কোচবিহারে আগমন ঘটে। তিনি যখন কোচবিহারে এসেছিলেন সেই সময় কোচবিহারের তৎকালীন রাজা ছিলেন হরেন্দ্রনারায়ান ভূপ বাহাদুর। দীর্ঘদিন ধরেই ভুটানের সাথে কোচবিহারের সীমানা নিয়ে বিবাদ দেখা দিয়েছিল এবং সেই বিবাদের মীমাংসার জন্য কোচবিহারের মরাঘাটের সীমানায় জন ডিগবি, রামমোহন ও মুনশী হেমায়ত উল্লার উপস্থিতিতে এই সীমানা মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। সীমানা নির্ধারণ ভুটানের রাজা দেবরাজ পরবর্তীকালে মানতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনার পরিপ্রক্ষিতে ভুটান রাজা দেবরাজ কলকাতার গর্ভনর জেনারেলের কাছে এই মর্মে রামমোহন রায় ও মুনশী হেমায়েত উল্লার নামে অভিযোগ পত্র পেশ করেন যে, তারা উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণকে প্রভাবিত করেছেন। সেই চিঠির ভাষান্তর করলে দাড়ায়,-

"আমরা প্রতিনিধির মাধ্যমে আপনার উত্তর পেয়েছি। যেখানে এটি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কোন বছর এবং কোন ভদ্রলোকের সময়ে মরাঘাট সীমানা বন্দোবস্ত হয়েছিল, যার সাথে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছিলাম এবং তারিখ এবং ভদ্রলোকের নাম কী ছিল? স্যার, উত্তরটা এই, কোচবিহারের প্রাক্তন রাজা দেব রাজার সাথে ঝগড়া করে এবং মাননীয় কোম্পানীর সাথে জোট গঠন করে, আমাদের সরকারের কোচবিহারের পুরানো রাজা এবং বৈকুন্ঠপুরের রায়কতের সাথে মরাঘাট এবং জল্পেশকে নিয়ে বিরোধ হয়েছিল এবং বোরা সুবা চলে গিয়েছিল দেব রাজার পক্ষ থেকে কলকাতায়। তখন পরিষদ থেকে দু-তিনজন ভদ্রলোক এসে নির্দিষ্ট কিছু নদী ও জলের সীমানা নির্ধারণ করে জল্পেশ ও অন্যান্য জমির জন্য একটি ফরমান দেন, যার একটি অনুলিপি দেবরাজের কাছে পাঠানো হয় এবং অন্যটি তাদের অফিসে জমা দেওয়া হয়। দিন এবং বছর আমরা নির্দিষ্টভাবে বলতে পারি না, তবে এটি অবশ্যই প্রায় 1186 বাংলা সন ছিল। এর দু-তিন বছর আগে, মিঃ পার্লিং এবং মিঃ বোগলে বা অন্য কোন ভদ্রলোক ডিক্রি দিয়েছিলেন যেটিতে আমরা সন্তুষ্ট। তার পরে, প্রায় ছয়-সাত বছর আগে, কোচবিহারের রাজা মিঃ ডিগবি কালেক্টর, তার দেওয়ান রামমোহন রায় এবং মুনশী হেমায়েত উল্লাহ,

এবং তাদের যোগসাজশে এবং ঘুষ দিয়ে, আমাদের এবং আমাদের উকীলের অনুপস্থিতিতে , একটি মিথ্যা আদেশ পেয়েছিলাম যা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট নই। দেবরাজা সন্তুষ্ট হলে আপনার কাছে এবং মাননীয় গভর্নর জেনারেলের কাছে বারবার চিঠি লিখতে হবে এবং আমাদের এখানে ডেপুটি করতে হবে? আমরা মিঃ ডিগবির 1809 সালের ডিক্রিতে অসন্তুষ্ট এবং তাই আমরা এই প্রতিনিধিত্ব করেছি। তারিখ 8 আশ্বিন 1222”।[১৩]

এর পরবর্তীকালে আরো একবার রামমোহন রায় কোচবিহারের তৎকালীন রাজধানী ভেটাগুড়িতে এসেছিলেন জন ডিগবির সাথে। সেই সময় রাজা হরেন্দ্রনারায়ানের নামে বিভিন্ন অভিযোগ জমা পড়েছিল রংপুরের কালেক্টরের অফিসে আর সেই সব অভিযোগের তদন্ত করতে জন ডিগবি ও রামমোহন রায় ভেটাগুড়িতে এসেছিলেন। “ডিগবি সাহেব ও রামমোহন রায় রাজধানীর অপরপ্রান্তে অবস্থান করছিলেন”।[১৪] হরেন্দ্রনারায়ানের নামে যে অভিযোগ জমা পড়েছিল তার সত্যতা বিচার ও আলোচনার মাধ্যমে সেটি সমাধানের উদ্দ্যেশে তারা ভেটাগুড়িতে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু রাজার দেওয়ান গুরুপ্রসাদ রায় তাদের রাজার সাথে সাক্ষাত করতে বাধা প্রদান করেলন। রামমোহন রায়রা যাতে এখানে বেশিদিন থাকতে না পারেন তার জন্য খেয়াপারাপার বন্ধ করে দেন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে যাতে বাধার সম্মুখীন হতে হয় তার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। অবশেষে তারা 2-3 দিন সেখানে অবস্থান করে রংপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। এইভাবে তার কোচবিহার ভ্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

ভুটান ভ্রমণ

রামমোহন রায়ের ভ্রমণের নেশা ছিল খুবই তিনি যেমন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন তেমনি তিনি প্রথম জীবনে বালক অবস্থাতেই দেশের বাইরে তিব্বত ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন। আর তার প্রথম জীবনের তিব্বত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে, তার নিজস্ব প্রকাশিত ফার্সি গ্রন্থ ‘তুহফাৎ-উল–মুওহাহিদিন’ গ্রন্থে বলেছেন, “I travelled in the remotest place of the world, in plain as well as in hilly lands...”।[১৫] রামমোহন রায় ভুটান ভ্রমণ করেছিলেন এই বিষয়টি নিয়ে অনেক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৎকালীন সরকারি নথিপত্র কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখিত নেই সেখানে কিন্তু কৃষ্ণকান্ত বসুর নাম উল্লেখিত আছে এবং সেই কারণে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। কিন্তু তার ভুটান ভ্রমণ নিয়ে নিসংশয় হওয়া যায় তৎকালীন ভুটান রাজ দেববর্মা কর্তৃক লেখা দুটি চিঠি থেকে। তারমধ্যে একটি চিঠিতে ভুটানের রাজা দেববর্মা রংপুরের কলেক্টরকে লিখেছেন, “ রংপুরের শ্রীযুক্ত বড়সাহেবের নিকট এই মর্মে জানানো যাইতেছে যে, আপনার তরফ থেকে উকিল শ্রী রামমোহন রায় ও শ্রী কৃষ্ণকান্ত বসু মারফত উপহার পাঠানোয় আমি অত্যন্ত খুশি হইলাম”।[১৬] এই চিঠি

থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে কৃষ্ণকান্ত বসুর সাথে রামমোহন রায় গিয়েছিলেন। রামমোহন রায় যে ভুটানে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের ভুটান গমনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাইহোক না কেনো রামমোহন রায় যে ভুটান গিয়েছিলেন সেই বিষয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ রইল না। তিনি রংপুরে ফিরে এসেছিলেন এবং পুনরায় তাকে ভুটান পাঠানোর কথা বলা হয়েছিল মহারাজ দেববর্মার লেখা আরেকটি চিঠি থেকে জানা যায়। যেখানে তিনি লিখেছেন, "... আমার মাটির খোলসা করিয়া দিয়া শ্রী রামমোহন রায়কে পুনরায় এখানে পাঠাইবেন..."[১৭] সুতরাং এই কথা বলার অবকাশ রাখে না যে তিনি ভুটানে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক দূত হিসেবে। তার দৌত্য কতখানি সফল হয়েছিল বা সফলতার মুখ দেখতে সেটা নিয়ে বিতর্ক আছে। তিনি কবে নাগাদ ফিরে এসেছিলেন ভুটান থেকে সেই তথ্য আমাদের কাছে অপ্রতুল। তবে 1815 সাল নাগাদ তিনি রংপুর ত্যাগ করে কলকাতায় পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করে দেন।

তবে পরিশেষে একথা বলাযায় যে, তিনি প্রথম জীবনের একটা সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কর্মজীবন শুরু করলেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইংরেজ আধিকারিকদের সাথে তিনি তার কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। এবং তাদের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা তার পরিপূর্ণ বিকাশে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তাদের সহযোগিতা ছাড়া রামমোহন রায় এতখানি পথ অতিক্রান্ত করতে পারতেন না হয়তো। ইংরেজদের অধীনে কর্মজীবনে তাকে কোচবিহার ও ভুটান ভ্রমনের সুযোগ করে দিয়েছিল। আর এই নতুন জায়গা ভ্রমনের নেশা তাকে ভবিষ্যতে বিদেশ ভ্রমণের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ:

১। Moulavi Obaidullah el Obaide, Eng. Translation '*Tuhfatul Muwahhidin*' (Second Ed. Calcutta 1944), P. 17

২। Rai Bahadur Ramprasad Chanda and Jatindra Kumar Majumdar Edited, '*Selections from official letters and documents Relating to the Life of Raja Rammohun Roy* ', Vol- l, (1791— 1830) Calcutta Oriental Book Agency,9 Panchanan Ghosh Lane, 1938, P. 27

৩। Ibid pp. 29

৪। Sophia Dobson Collette, Edited by Hem Chandra Sarker. '*The Life and Letters of Raja Ram Mohun Roy*'. Calcutta: 1914, P.16

৫। Rai Bahadur Ramprasad Chanda and Jatindra Kumar Majumdar Edited, *'Selections from official letters and documents Relating to the Life of Raja Rammohun Roy* ', Vol- l, (1791— 1830) Calcutta Oriental Book Agency,9 Panchanan Ghosh Lane, 1938, P. 42

৬। Ibid pp. 43

৭। Brajendra Nath Banerji, 'Rammohun Roy and an English Official', '*Modern Review',* June, 1929, p. 682

৮। Rai Bahadur Ramprasad Chanda and Jatindra Kumar Majumdar Edited, *'Selections from official letters and documents Relating to the Life of Raja Rammohun Roy* ', Vol- l, (1791— 1830) Calcutta Oriental Book Agency,9 Panchanan Ghosh Lane, 1938, P. 41

৯। Jyotirmoy Das Gupta, 'Raja Rammohun Roy at Rangpur', '*Modern Review',* September, 1928, P. 276

১০। Ibid. P.277

১১। Ibid. P.277

১২। Board of Revenue, O.C. 28 February, I815, No, 33.

১৩। সুরেন্দ্রনাথ সেন, 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪২, পৃ. ১৬৬

১৪। বিশ্বনাথ দাস, 'সটীক রাজোপাখ্যান (কোচবিহারের প্রাচীন ইতিহাস)', দি সী বুক এজেন্সি,কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ:২০২১, পৃ:২২২

১৫। Moulavi Obaidullah el Obaide, Eng. Translation '*Tuhfatul Muwahhidin*' (Second Ed. Calcutta 1944), P. 8-9

১৬। সুরেন্দ্রনাথ সেন, 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪২, পৃ. ১৬৮

১৭। তদেব, পৃ. ১৬৯

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর শিশুসাহিত্য : শিশুর জগৎ ও সামাজিক ভাবনার নানা অনুষঙ্গ

অসীম আদক
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: যন্ত্র-প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে মানুষ ক্রমেই যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়েছে। ফলে প্রকৃতির সাথে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। প্রযুক্তি মানুষকে এতোটাই আত্মমগ্ন করে করে তুলেছে যে, তার সামাজিক জীবন আজ বিপর্যয়ের মুখে। শিশুমনেও এর প্রভাব পড়ছে। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির যুগে প্রতিযোগিতার ঘোড়দৌড়ে ক্লান্ত শিশুমন মুক্তি খুঁজছে টিভি বা ভিডিও গেম্‌স্-এ। ফলে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক টান তার কমছে। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী যে গল্পের বাতাবরণ তৈরি করেন তা নির্মল প্রকৃতির মধ্যে, সামাজিক জীবনযাপনের পটভূমিতে। গল্পের সহজ সরল উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে তিনি শিশুমনে সহজতা, সারল্য, উদারতা, কৌতূহল, সহমর্মিতা প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিগুলিকেই সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন তিনি। সহজ শব্দে, টানটান ঘটনার পরতে পরতে গল্প বুনে লেখক আসলে শিশুর মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন মানবিকতার বোধকে।

সূচক শব্দ: মানবিকতার গল্প, ভালোবাসার এক দুর্গ, জীবনের মহৎ দিক, ভ্রমণ, অ্যাডভেঞ্চার, জীবনদর্শন, রূপকথা, নিসর্গ প্রকৃতি, সদগুণ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসচর্চার পরিধিতে শিশুসাহিত্য আজও যথেষ্ট ব্রাত্য। যদিও রূপকথা বা ছড়ার ঐতিহ্য বাংলায় সুপ্রাচীন, তবে এগুলি ছিল মূলত মৌখিক রূপে বা Oral form-এ। 'ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এস' বা 'আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা' প্রভৃতি লোকায়ত ছড়ায় বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম গুঞ্জরণ শোনা যায়। সমস্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগ ছিল এই মৌখিক ছড়ার পটভূমি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত রূপকথার পাশাপাশি এই ছড়াগুলিও মৌখিক রূপেই প্রচলিত ছিল। ক্রমে মুদ্রণশিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিপটে লালিত মৌখিক সাহিত্য রূপ পায় লিখিত অবয়বে। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও বলা যেতে পারে বাংলায় শিশুপাঠ্য গ্রন্থের প্রথম মুদ্রিত প্রকাশ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের(১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ, ৪ মে) হাত ধরে। মূলত ছোটদের মনে নীতিবোধ ও আদর্শ জাগ্রত করতে সেই সময় রচিত হয়েছিল বিভিন্ন গ্রন্থ - 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) প্রভৃতি। সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, সুখলতা রাও, সুকুমার রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুনির্মল বসু থেকে এ যুগের অন্নদাশঙ্কর রায়, লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বলরাম বসাক, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখের হাতে শিশুসাহিত্য সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে।

শিশুসাহিত্য বলতে কী বোঝায় বা এর স্বরূপ কী, এ বিষয়ে নানা সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক এর স্বরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক সুখলতা রাও এর মতে –

> "শিশুসাহিত্যের ভিতর দিয়া শিশুর সরল মনে যে ছবি, যে শিক্ষা, যে আদর্শ পৌঁছায়, তাহা তাহার অজ্ঞাতসারে সেখানে নিজের ছাপ রাখিয়া যায় এবং ভবিষ্যতে তাহার শিক্ষা-দীক্ষা, এমন কী রুচির ওপর প্রভাব বিস্তার করে।"[১]

আবার প্রাবন্ধিক অজিত দত্ত শিশুসাহিত্যকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে –

> "... এ শিক্ষা মানে 'সদা সত্য কথা কহিবে' এবং 'চুরি করা বড় দোষ' মাত্র নয়। এ শিক্ষা মানে শিশুমনে যতগুলি সদবৃত্তি অপুষ্ট আছে, তাদের ফুটিয়ে তোলা।"[২]

ম্যাক্সিম গোর্কি শিশুসাহিত্যের মধ্যে মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দিতে চেয়েছেন - "Simply, interestingly and meaningfully।"[৩]

এসমস্ত বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে বলা যেতে পারে যে শিশুসাহিত্যের বিষয় হবে ভারহীন, কিন্তু বক্তব্য হবে অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। ছোটদের জন্য লেখা কাহিনি, চরিত্র ও ঘটনা পরম্পরায় একটি ইতিবাচক আবেদন প্রতিষ্ঠা করবে। তবে এই বক্তব্য অবশ্যই সহজ ও আকর্ষণীয় আঙ্গিকে ব্যক্ত হবে। মোটকথা শিশুদের মনে যেন তা সহজ আনন্দরস সঞ্চার করতে পারে।

লেখক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সাহিত্যচর্চার সূচনা ছেলেবেলাতেই। পনেরো বছর বয়সে স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে 'বন্ধু'(১৯৫৬) নামে একখানি ছোটদের পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। শিশুসাহিত্য জগতে উল্লেখযোগ্যভাবে তাঁর প্রথম প্রবেশ 'শাদা ঘোড়া' রচনার মধ্য দিয়ে। লেখালেখি ছাড়াও 'কবিতা পরিচয়', 'কালের কষ্ঠিপাথর', 'ছেলেবেলা', 'ভ্রমণ' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক রূপেও তিনি সাহিত্যজগতের একজন পরিচিত মুখ। মূলত শিশুসাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হলেও বড়োদের জন্যও রচনা করেছেন গল্প, কবিতা, উপন্যাস। তাঁর অসামান্য সৃষ্টি 'হীরু ডাকাত' এর জন্য পেয়েছেন শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার (১৯৯০)। এছাড়াও তাঁর 'গৌর যাযাবর' বর্ষসেরা শিশুসাহিত্য নির্বাচিত হওয়ায় বিশ্বভারতী থেকে পেয়েছেন 'আশালতা সেন স্মৃতি পুরস্কার' (১৯৯২), সাহিত্য অকাদেমী থেকে 'বাল সাহিত্য পুরস্কার' পেয়েছেন (২০১৬) 'গরিলার চোখ' রচনার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিশুসাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁকে 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার'-এ পুরস্কৃত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের 'জন্মকথা' কবিতায় বলতে চেয়েছেন যে, এ জগতে শিশুর আবির্ভাব অর্থহীন, তাৎপর্যহীন, কেবলমাত্র প্রকৃতির খেয়াল নয়। যে আনন্দ এই সৃষ্টির মূলে এবং যে আনন্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উল্লসিত, তারই একটি ক্ষুদ্র কণা শিশু। সে নিত্যকালের – অসীম ও অনন্ত। তাই শিশু হল আনন্দরাজ্যের বাসিন্দা। কৌতূহল আর কল্পনার ভূমি তাদের বিচরণ ক্ষেত্র। এই জরা পৃথিবীর ঘোর বাস্তবতা, কার্যকারণের সম্পর্ক বা ফলাফল কোনটাই তাকে বিচলিত করতে পারে না। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন বাস্তবতার মুখে বারবার আঘাত পেতে পেতে সে এগিয়ে চলে। কিন্তু তার মধ্যেকার শিশুমন গোচরে বা অগোচরে ক্রিয়াশীল থাকে। সমাজের চারপাশে চলতে থাকা অশান্তির বাতাবরণ থেকে সেই মন মাঝেমাঝে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় সমস্ত ভয়-ভাবনাহীন ছেলেবেলার জগতে, যেখানে কিছুক্ষণের জন্যও পাওয়া যায় শান্তির বাতাস। লেখক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর শিশুদের জন্য কলম ধরার তাগিদ আসলে তাঁর নিজের মধ্যে থাকা শিশু মনটার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার বাসনা থেকেই। সেখানে তিনি বাইরের পৃথিবীর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে শান্তির দু'দণ্ড বিশ্রাম পান। আর এর মধ্যে থেকেই শিশুদের তিনি এমন গল্প শোনান যে গল্পের পরিবেশে শিশু পায় তাদের কল্পনার পটভূমি, কৌতূহল উদ্রেক করার খোরাক। সর্বোপরি গল্পের আবহ তাদের জন্য নিয়ে আসে নির্মল আনন্দের ছোঁয়া। গল্পের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শিশুমনও বেরিয়ে পড়ে মানসভ্রমণে। আর এসবের অন্তরালে লেখক কুশলী হাতে গল্পদেহে বুনে দেন নিজের সাহিত্যিক জীবন দর্শনকে। এই দর্শন আসলে শুভ বোধের দর্শন, যে বোধ শিশুর মধ্যে গড়ে দেয় ভবিষ্যতের শক্ত ভূমি। অথচ সম্পূর্ণ এই চলন প্রক্রিয়াটি ঘটতে থাকে এমন নিটোল আনন্দ-অনুভূতি, রোমাঞ্চ-বিস্ময়ের মধ্যে দিয়ে যে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষার প্রক্রিয়াটি সহজাত হয়ে ওঠে। লেখক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সাহিত্যিক ভাবনার জগতে অন্য একটি উল্লেখ্য দিক হল তাঁর ছোটদের জন্য লেখা সাহিত্যের মধ্যে বড়দের সামাজিক ভাবনার অনুষঙ্গ। আসলে শিশুসাহিত্যের পাঠক তো শুধু শিশুরাই নয়, বড়রাও এই লেখার আগ্রহী পাঠক। লেখক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ছোটদের গল্পের যে জগৎ তৈরি করেন তাতে যেমন থাকে নিষ্পাপ রোমান্টিকতা, শৈশবের যাদুছবি, তেমনই থাকে সামাজিক নানা অনুষঙ্গ যা বড়দের ভাবনার মূলাধারে নাড়া দেয়। গল্পের আলোচনার সময় আমরা এই অনুষঙ্গগুলিকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করব।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর গল্পের পটভূমি বেশিরভাগ ক্ষত্রেই গ্রাম বাংলার নিসর্গ প্রকৃতি। তবে যেহেতু তিনি একজন চারণিক, তাই তাঁর ভ্রমণকেন্দ্রিক লেখাগুলির ক্ষেত্রে গল্পের পট পরিবর্তন হয়েছে সংগতভাবেই। গল্প বলার ক্ষেত্রে রূপকথার আদলকে বা কথকথার ঢঙকে ব্যবহার করে তৈরি করেছেন এক নস্টালজিক পটভূমি। আবার কথার ছলে, ছড়ার ছন্দে, গল্প বলার হালকা মেজাজে অনায়াস দক্ষতায় তিনি

গল্পের গভীরে বুনে দিয়েছেন জীবনের দর্শনকে। একালের খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকার তাঁর গল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন -

> "অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক কয়েকটি বই পড়ে মনে হল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অদৃশ্য হাত রেখেছেন এই লেখকের মাথায়, প্রতিবেশিনী লীলা মজুমদার যেন অসুস্থতা থেকে উঠে এসে তাঁর পিঠে রেখেছেন আরেকটি হাত। নইলে ছড়ায় রূপকথায় গল্পে অসামান্য মনোরম কল্পনায় এবং শিশুরঞ্জক এমন চমৎকার ভাষায় নিজেকে এমন মেলে ধরলেন কী করে অমরেন্দ্র?"[৪]

আলোচনার সুবিধার জন্য লেখক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করে গল্পের প্রবণতা অনুসারে বিভাজিত করে আলোচনা করা হল।

উল্লেখযোগ্য শিশুসাহিত্য গ্রন্থ শাদা ঘোড়া (১৯৭৯), ঋষিকুমার (১৯৭৯), হীরু ডাকাত (১৯৮৬), তালগাছের ডোঙা(১৯৯১), হরিণের সঙ্গে খেলা (১৯৯১), গৌর যাযাবর (১৯৯১), পাখির খাতা(১৯৯১), আমার বনবাস(১৯৯৩), আমাজনের জঙ্গলে (২০০১), ভূতের বাঁশি (২০০2), ছেঁড়াকাঁথার গল্প (২০১২), বরফের বাগান (২০১১), পরিবার চোখ (২০১৮)।

বেশ কিছু গল্প রচনার ক্ষেত্রে লেখক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী গল্প বলার মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন রূপকথা বা কথকতার আদলকে। তবে সেটা বাইরের আবরণ মাত্র। এর মধ্য দিয়ে তিনি তৈরি করেছেন গল্পের আবহ। কিন্তু যে গল্প তিনি বলেন সেটা আজকের দিনের রূপকথা।

শোষিতের প্রতি শাসকের অত্যাচার চিরকালীন। কালে কালে শোষকের রঙ বদলালেও শাসনের ধারা বয়ে চলেছে অপরিবর্তিত ভাবে। কিন্তু ক্ষমতাবানের সর্বগ্রাসী লোভ যখন মানুষের ব্যক্তিপরিসরকে গ্রাস করতে আসে, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষ তখন ঘুরে দাঁড়ায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে। 'শাদা ঘোড়া' গল্পের পরিসরেও এই সমস্যা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গল্পের বিজু রাখাল কোন রূপকথার রাজকুমার নয়, সে আমাদেরই অলক্ষের কোনো প্রতিবেশী। এ তারই গল্প। একক শক্তি হিসেবে বিজু পরাজিত হলেও সঙ্ঘবদ্ধ বৃহৎ ক্ষেত্র গড়ে রাজশক্তিকে সে পদানত করেছে। শিশু সাহিত্যের পরিসরে গড়ে উঠেছে অবদমিত মানুষের স্বাধিকার অর্জনের ইতিবৃত্ত। বিজুর অদম্য লড়াই এবং শেষে টুকটুক-কে লাভ – পাঠকমনে এনে দেয় রূপকথার আস্বাদ। ছোট্ট বিজুর সাহস আর শেষে লোভী রাজার পরাজয় লেখকের কুশলী হাতের টানে এমন হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে যে শিশু মন সহজেই আকৃষ্ট থাকে গল্পের পরিসরে। আর তাদের মনের অগোচরে তৈরি হয় ভালো-মন্দের বোধ।

পরবর্তীকালে লেখা এই ধরণের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'গৌর যাযাবর'। এখানেও আছে শাসকের অত্যাচারের চিহ্ন। তবে এ গল্পের মূল সুর অন্যদিকে।

জীবনধারণের ন্যূনতম প্রাপ্তিতেই গৌর সন্তুষ্ট। 'আরো চাই'-এর হতাশার থেকে দিনের শেষে প্রিয়জনের মুখকল্পনার স্নিগ্ধ অনুভব তার প্রাপ্তির ঝুলিকে সমৃদ্ধ করে। গৌরের এই ভাবনার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে তার জীবনের দর্শন -

> "সন্ধ্যের মুখে, নতুন জোছনায়, তকতকে দাওয়ায় বসে ধোঁয়া-উঠা ভাত খেয়ে নিজের কাঁথাটিতে শুয়ে বাপ-মায়ের মুখ ভাবতে না পারলে, বুধা তুই-ই বল মানুষ বাঁচে!"[৫]

জীবনের পথে বেরিয়ে যাদের সংস্পর্শেই সে এসেছে তাদের জীবনের চলনেও সঞ্চারিত করতে চেয়েছে এই বোধকে। 'জীবন কাটান সহজ আনন্দে' গৌরের এই সহজ উপলব্ধি তার জীবন অভিজ্ঞতালব্ধ। এই সহজ কথার সুরে ব্যঞ্জিত হয়েছে তার জীবনের দর্শন। আসলে এ দর্শন লেখকের নিজের। সুখের চাবি যে ঐশ্বর্যের মধ্যে নেই, আছে সহজ জীবনাচরণের প্রবহমানতায় - আত্মোপলব্ধিজাত এই কথাগুলিই সংসক্ত হয়ে আছে গৌরের গানের সুরে -

> "কীসের এত লোভ গো সবার
> কীসের এত লোভ?
> সোনা ফেলে সুখের মধ্যে ডোব্
> সুখ শান্তি আসল জিনিস, তাতেই পাবি সব"[৬]

মুক্তির আনন্দে গৌরের এই পথ চলার সঙ্গী হয় পাঠক মনও।

রূপকথার আদলে বোনা আর এক মনোগ্রাহী গল্প 'হরিণের সঙ্গে খেলা'। এক মানবশিশু আর এক হরিণশিশুর নিবিড় বন্ধুত্বের সাক্ষ্য এ গল্প। অত্যাচারী রাজার সৈন্যদের হাতে বেগার খাটার জন্য বন্দী বাবা-মাকে উদ্ধার করতে হরিণশিশু বুন্যাকে সঙ্গে নিয়ে শিশু কুশের লড়াই ও জয়লাভ এ গল্পের আখ্যানবস্তু। কিন্তু গল্পের মূল লক্ষ্য এই অত্যাচারী রাজার বিরূদ্ধে যুদ্ধ বা জয়লাভ নয়, এক মানবশিশু আর এক হরিণশিশুর গভীর বন্ধুত্ব, তাদের অভিন্ন হৃদয়ানুভবই রয়েছে গল্পের কেন্দ্রে। প্রচলিত গল্পের সোজা পথ ছেড়ে সাহিত্যিক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী শুনিয়েছেন মানুষের দয়া, মায়া, বেদনার অন্য আলেখ্য। ফলে গল্পটি আর শাসক এবং শোষিতের গল্প হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে মানবতার এক নতুন সংযোজন।

প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের জলজীবী পরিবারের দুই শিশুর কাহিনি 'ছেঁড়াকাঁথার গল্প'। জেলে জীবনের নিত্য দিনের সমস্যা মূর্ত হয়েছে গল্পের কথনে। প্রান্তীয় অঞ্চলের চোরাচালান, পুলিশ-প্রশাসনের অসাধু মনোবৃত্তির বিপ্রতীপে লেখক দাঁড় করিয়েছেন শিশুমনের সাহসিকতা, নির্লোভ সত্যবাদী মানসিকতাকে। রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্তের বাইরে এমন নিষ্কলুষ মনোবৃত্তি শিশুমন ছাড়া আর কোথায় সুলভ? তাই লোভের বিপরীতে সত্য বিশ্বাসের আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে জয়লাভ – হয়ে উঠেছে আধুনিক জীবনের রূপকথা বা রূপকথার পুনর্নির্মাণ।

'হীরু ডাকাত' আসলে ডাকাতির ছদ্মবেশে পরম মানবিকতার গল্প। গল্পের পর গল্প গেঁথে হীরু নামে যে মানুষটিকে এখানে নির্মাণ করা হয়েছে সে রক্তলোলুপ অর্থপিশাচ নয়, তার মধ্যে আছে এক মহৎ সহৃদয় মানুষ। কর্তব্যের মুখে হীরুর হৃদয় কঠিন-কঠোর হলেও, তারই মধ্যে বাস করে এক কুসুম-কোমল মন, যে মন বাঁশির সুরে 'দুখের পারাবার' হয়। এ যেন ছেলেবেলায় মা-ঠাকুরমার মুখে শোনা ভালো ডাকাতের গল্প। হীরুর মধ্যে ধরা আছে এক আদর্শ দেশনেতার ছবি যে অনর্থক রক্তপাতের বিরুদ্ধে সদা সতর্ক –

"ভীষণ দরকার ছাড়া কেউ
বহাবে না রক্তের ঢেউ।"[৭]

আবার দলের সবকিছুর প্রতি তার করুণাঘন নজর –

"ছি ছি! ঈশ্‌!
ঘোড়াকে জল খাইয়েছিস?
এখুনি দে জল"[৮]

বড়লোকের অন্যায় ভাবে সঞ্চিত করা ধন লুঠ করে সে বিলিয়ে দেয় দুঃখীর দুয়ারে। হীরু যে 'চাঁদের হাট' তৈরীর স্বপ্ন দেখে আজকের ভাষায় তাকে বলা যেতে পারে সমাজতন্ত্র - -

"আমাদের এই গ্রামে কোনো শেয়াল নেই,
দুইটি বাড়ির মধ্যে কোনো দেয়াল নেই।"[৯]

এমন এক ডাকাতের গল্প শুনে শিশুমনে ভয়ের উদ্রেক করে না, বরং তাদের হৃদয়ে করুণার সুর বেজে ওঠে হীরুর মৃত্যুতে। হীরু ডাকাতের এই কাহিনি আমাদের মনে করায় ইংল্যান্ডের গল্পকথার আর এক ডাকাত 'রবিন হুড'কে। নাটকে উল্লিখিত নানা স্থান ও কালের বিবরণে জীবন্ত হয়ে ওঠা কাহিনিকে ঐতিহাসিক বলে মনে হলেও এটি আসলে লেখকের স্বকপোলকল্পিত -

> "হীরু নামে কোনও ডাকাত বা আমার রচনায় তার যেসব ডাকাতির কথা আছে তেমন কোনো ডাকাতির ঘটনা পাওয়া যায় কিনা আমার জানা নেই। আসলে নিছক জানা জিনিস লিখতে আমার মন বসে না, আমার ঈপ্রা কল্পনার ডানা। তবে কল্পনার মজ্জায় থাকে বাস্তব, থাকে বাসনা, থাকে সমসাময়িকতা; তা সে - প্রস্ফুটিত বা ফুটনো যাই হোক না কেন।"[১০]

শিশু সাহিত্যিক ছাড়াও অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর বড়ো পরিচয় তিনি ভ্রামণিক। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তর সহ পৃথিবীর নানা দেশে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেকারণে তাঁর ভ্রমণ বিষয়ক রচনাগুলি জীবন্ত বর্ণনার মধ্যে দিয়ে প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে।

অরণ্য-অরণ্যবাসী, নদনদী, ভূ-প্রকৃতি এসবের প্রতি শিশুমনে গভীর ভালবাসার বীজ বুনে দিয়েছেন লেখক 'আমাজনের জঙ্গলে'র মধ্য দিয়ে। আমাজনের জঙ্গলের

অরণ্যবাসী মানুষের কথা, তাদের জীবনের রক্ষাকর্তা 'বোতো'র কাহিনি, তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উৎসব, বাঁচা-মরার কথাকে লেখক জীবন্ত করে তুলেছেন প্রত্যক্ষতার অনুভব দিয়ে। একই সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন জঙ্গলের কঠিন বাস্তবকে। আমাদের সভ্যজগৎ আদিবাসী জগত সম্পর্কে কিছু জানে না, বা জানতে চায়ও না। আর না জেনেই বিশ্বজোড়া আদিবাসী সমাজ-কৃষ্টি, সংস্কার- বিশ্বাসকে নির্বিচারে বিনষ্ট করছে। সভ্য সংস্কৃতিবান মানুষের লোভের কোপ কিভাবে এই জঙ্গলের ওপর পড়েছে তাকেও তুলে ধরেছেন লেখক। তাই কিশোর ছেলেটির কাকা বা কাকার বন্ধু গঞ্জালো, কিংবা হেলিকপ্টারের জরিপকারী দল সবারই লালসার শিকার হয়ে উঠেছে এই জঙ্গল, নদী। লেখকের গল্প বলার চালে জঙ্গলের মানুষদের জীবনবর্ণনা এমন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, যে তা শুধু কিশোর মনকে নয়, সমস্ত পাঠক মনকেই তা ছুঁয়ে যায়। একালের আর এক খ্যাতনামা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী 'আমাজনের জঙ্গলে'র সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন -

> "... এমন নিষ্পাপ রোমান্টিকতা, শৈশবের এমন জাদুছবি, সেই সঙ্গে অরণ্য ও অরণ্যবাসী মানুষজনের এমন পরিচয়, এ যেন মনে পড়ায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।"[১১]

সুদূর আলাস্কার বরফাবৃত প্রান্তর, তার বৈচিত্র্যময় জগৎ রূপ পেয়েছে 'আলাস্কার সোনা'তে। বরফের আবরণ সরিয়ে সরিয়ে লেখক আমাদের সামনে হাজির করেছেন সেখানকার গ্লেসিয়ার, বল্গা হরিণ, গোল্ডেন ঈগল, ফায়ার উইড বা ফরগেট মি নটের সঙ্গে। যাত্রাপথের বর্ণনা থেকে আলাস্কার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার মনোরম বর্ণনায় পাঠকের স্মৃতিতে সজীব হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে লেখকের গ্রিলড স্যামন বা স্মোকড সামনের রসাল বিবরণ পাঠকের জিহ্বায় এনে দেয় এক অনাস্বাদিতের রস। তবে এরই বিপরীতে লেখক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী দেখাতে ভোলেননি আকরিক সোনাকে কেন্দ্র করে দলে দলে মানুষের আলাস্কা যাত্রা বা আলাস্কা দখলের রাজনৈতিক কূটকৌশলকে।

আমাজনের জঙ্গলের মতোই গহন গভীর অজানা আফ্রিকার এক সজীব চিত্র 'গরিলার চোখ'। একদিকে আফ্রিকার রোয়াণ্ডা অঞ্চলের বাসিন্দা এই গরিলাদের জীবনযাপনের ছবি, অন্যদিক মানুষের অর্থকারী লালসার দৃষ্টিতে তাদের বিপর্যস্ত জীবন – সমান্তরালভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে পাঠকের সামনে। জাতি-হাঙ্গামায় প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে গরিলাদের বন্য জীবনের সঙ্গে মিশে যাওয়া তুৎসি যুবক দামাস্সিনের মুখে ব্যক্ত হয়েছে গরিলাদের সহজ সরল জীবন –

> "গরিলারা মানুষের মতো কাঁদতে পারে না, তাদেরও কান্না আছে, সে অন্যরকম, তবুও কখনও আমাকে কাঁদতে দেখে কোন মা-গরিলা এমন

ভাবে আমার সামনে পিঠ পেতে দেবে যাতে আমি গরিলা শিশুর মতো পিঠে চড়ে তাকে আঁকড়ে থাকি।”[১২]

এই কাহিনি শিশুকিশোর মনে পৌঁছে দেয় অ্যাডভেঞ্চারের শিহরণ থেকে বন্য গরিলাদের জীবনের প্রতি সহমর্মিতার করুণ উপলব্ধিতে। মৃত্যু যন্ত্রণাকাতর গরিলার চোখদুটি অনুপলের মতো পাঠকের মনে তীক্ষ্ণ খোঁচা দেয়- “মানুষ কেন এমন নিষ্ঠুর?”। এধরণের লেখাগুলিতে দুটি পৃথক মনোভঙ্গি ও চিন্তাজগত পরিস্ফুট। একটি, শিশুর মনোভঙ্গি, বাস্তব সংসার ও তার কার্যকারণ সম্পর্কে নির্লিপ্তি ও তার কল্পলোকের জগত। অপরটি, পূর্ণবয়স্কের জগত ও তার দৃষ্টিভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথের শিশু কাব্যগ্রন্থে সূচনা অংশের উল্লেখে এই দুই পৃথক মনোভঙ্গির স্বরূপ স্পষ্ট হবে –

“রতন ধন খোঁজে না তারা,
জানে না জাল ফেলা। জগত-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।[১৩]

শিশুর কল্পনাবিলাস বড়োদের কাছে নেহাত ছেলেমানুষি, তুচ্ছ, অকারণ। বাস্তবের সংঘাতে শিশু তার এই ক্ষুদ্রত্ব ও অসহায়ত্ব অনুভব করে, যদিও তার স্বভাবের মধ্যে একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই বর্তমান। তাই অসহায়তা, অপূর্ণতাকে সে পূর্ণ করে কল্পনার জগতে। শিশু মনস্তাত্ত্বিকেরা একে বলেছেন compensatory process বা শিশু মনের কল্পনার ক্ষতিপূরণ- প্রক্রিয়া।

'ঋষিকুমার' গল্পের পরিসরেও নির্মিত হয়েছে শিশুর নিজস্ব ভাবনার জগত। সে জগত ঋষির নিজস্ব বিচরণ ক্ষেত্র। মেঘ গুড়গুড় অবেলার ফাঁকা মাঠে ফড়িং ধরা, বাঁশি শেখার অদম্য ইচ্ছায় অচেনা বাঁশিওয়ালার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া কিংবা চম্বলের ডাকাতদলের সঙ্গে চলে যাওয়া, বাস্তবতার বিপদসঙ্কুলতাকে পিছু ফেলে উন্মুক্ততার উদ্দশে যাত্রা- এ কেবল শিশুমনেই সম্ভব। বাবা-মায়ের সব উৎকণ্ঠাকে পাস কাটিয়ে সে মশগুল আপন চিন্তাজগতে, যেখানে সে চায় কোন বাউল হতে অথবা কোন পাখি। এইভাবে ‘ঋষিকুমার' হয়ে উঠেছে শিশুর মনোজগতের চলন ক্ষেত্র।

রূপকথার রাজ্যে শিশুর বাস চিরদিনের। সম্ভব-অসম্ভবের গলিঘুঁজিতে না গিয়ে সে বিচরণ করে তার কল্পনার আবেষ্টনীর মধ্যে । এমনই এক কল্পজগতের বাসিন্দা পাঞ্জো। ‘ভূতের বাঁশি’ গল্প তাকে কেন্দ্র করেই। স্টেটস্‌ম্যান কাগজের সাহেবের রূঢ় বাস্তবতার চোখের বিপরীতে পাঞ্জোর মনোরাজ্যের পরীরা ভিড় জমায় গল্পের পরিসরে। তাই জোছনা রাতে, আকাশ কালো করা বৃষ্টির দুপুরে, শীতের কুয়াশায়, কিংবা তুস্ করে বরফ পড়বার সময় পাঞ্জোর চিরচেনা রাস্তা হয়ে ওঠে কোন রূপকথার অচিনভূমি। লেখক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী আসলে এখানে প্রশ্রয় দিয়েছেন শিশুর কল্পনাচারী মনকে। শিশুর নানা জিজ্ঞাসা আর কৌতূহল রূপ পেয়েছে কল্পনার রাজ্যে।

সাহিত্যের একটি প্রাচীনতম ও জনপ্রিয়তম শাখা হল ছড়াসাহিত্য। এই ছড়ার একটি চিরায়ত আবেদন আছে। একটা গভীর ও লোকজ উৎসও রয়েছে। লেখক

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ছড়াকে ব্যবহার করে গল্প বলেছেন পটু হাতের দক্ষতায়। তবে সে গল্পের দেশে কোনও কল্পনার পরীরা ডানা মেলে না, আবার ভূতের উপদ্রবও সেখানে নেই। সে দেশ আমাদের অতি পরিচিত। বাংলার সবুজ যে কোন গ্রাম । আসলে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বদ্ধ ঘেরাটোপে আবদ্ধ যন্ত্র ম-ম মনটাকে ছন্দের মুনশিয়ানায় লেখক ফেরাতে চান অকৃত্রিম প্রকৃতির দিকে।

গৃহবাসী থেকে বনবাসী হওয়ার গল্প আমরা দেখেছি রামায়ণে রামের জীবনে, কিংবা মহাভারতের পাণ্ডবদের জীবনে। তবে সেখানে ছিল বাধ্যবাধকতা। কিন্তু 'আমার বনবাস' স্বেচ্ছা বনবাস। মরু-কলকাতার বদ্ধ খাঁচা আর মানুষের মিথ্যা ঝুমঝুমি থেকে শিশুমন মুক্তি খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে –

“শহর আমায় বড্ড দুঃখ দেয়।
পথের ধুলো-ধোঁয়া এবং লোকেরও অন্যায়
ভাল্লাগে না ভাল্লাগে না মোটে”[১৪]

মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে শিশুমনে তৈরি হয় এক নির্মল আনন্দ, বিশুদ্ধ রোমান্টিকতা, মুক্তির আস্বাদ। যাত্রাপর্ব থেকে শুরু করে ক্রমে গ্রামপর্ব, নদীপর্ব পার হয়ে পাহাড়পর্বে পৌঁছে এর সমাপ্তি। নাগরিক জীবনের জটিলতাকে পাস কাটিয়ে পাঠক মনও বেরিয়ে পড়ে মানসভ্রমণে। শহরের ব্যস্ত জীবনে সমস্তদিন গৃহকর্মরতা যে মাকে একদিন শিশুটি ফেলে এসেছিল, প্রকৃতির কোলে সে নতুন করে ফিরে পায় তার মাকে। প্রকৃতির সন্তান শিশুকে মুক্ত প্রকৃতির বৃহৎ অঙ্গনে চোখ মেলবার পরিসর তৈরি করে দেয় এই কাহিনি। একদিকে বাংলা প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য অপরদিকে বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যকে মূর্ত করেছেন লেখক।

ছড়ার ছন্দে শিশুর আর এক জগৎ নির্মিত হয়েছে তাল গাছের ডোঙা'তে। এই মানস ডোঙায় চড়ে স্মৃতির সরণী বেয়ে বড়ো হওয়া মন ফিরে চলেছে শৈশবের সোনালি দিনগুলিতে। যেখানে ছিল পোষা দুষ্টু শুয়োর, সখের চিড়িয়াখানায় ছিল চামচিকি, আরশোলা, ইঁদুরছানা। এই নস্টালজিক অতীত চারণের মধ্যে দিয়েও লেখক বুনে দিয়েছেন জীবনের দর্শনকে –

“দুঃখ পেলে সইতে হয় –
সইতে পারলে সব দুঃখের ক্ষয়।
যতই তুমি দুঃখ করো জড়ো –
সে-যোগফলের চেয়েও জীবন বড়ো।”[১৫]

এইখানেই ছড়ার ছন্দে বলা গল্পের পরিসর আর স্মৃতিচারণে আটকে থাকে না, হয়ে ওঠে লেখকের জীবন দর্শনের চারণভূমি। তবে গল্প বলার কৌশলে তার কোন ভার অনুভব করে না পাঠক মন।

টিয়া নামের গ্রাম আর ফিঙে নামের নদী এবং সেখানের মানুষের জীবনচর্যার চিত্র সাজিয়ে গড়ে উঠেছে 'টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী'। এই প্রকৃতির কোলে বড়ো হওয়া মানুষ প্রকৃতির বিপদের দিনে বুক পেতে আগলে রাখে প্রকৃতি মাকে। তাই রাজার সখের কাঠের প্রাসাদ কিছুতেই তারা গড়তে দেবে না -

“গাছের গুঁড়ি ঘিরে বসলো প্রচণ্ড পাহারা
বুক দিয়ে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে বলল তারা
একটা গাছও কাটতে দেব না।
গাছ কাটতে হলে আগে কাটো আমার গা।”[১৬]

গাছ মানুষের পরম বন্ধু। মানুষের জীবনের বাঁচা-মরার প্রতিমুহূর্তে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। এই আবেদনকেই ছড়ার ছন্দে দোলা দিয়ে শিশুমনে গেঁথে দিতে চেয়েছেন লেখক।

‘পাখির খাতা” বাংলায় এক নতুন ধরণের বই। সংস্কৃতে বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থে আমরা এইভাবে পশুপাখিকে নিজের মুখে গল্প বলতে দেখি। এখানে পাখির জগতকে, তাদের আনন্দ- বেদনা, জীবন-মৃত্যুকে, তাদের মুখে ভাষা দিয়ে আমাদের অনুভবের অনেক কাছে এনে দিয়েছেন লেখক। আসলে এ গল্প শিশুদের নতুন করে আগ্রহী করে তোলে পাখিদের দিকে ফিরে তাকাতে, তাদের ব্যথায় সমব্যথী হতে। পাখিদের মুখে 'সাটুম' (স্বাগতম), 'ছার্চোপর'(স্বার্থপর) শুনে শিশুদের মনে তৈরি হয় নতুন কৌতূহল ।

বিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সমসাময়িক কালে যাঁরা বাংলা ভাষায় শিশুসাহিত্য রচনা করছিলেন এবং যাঁদের রচনার বিষয়ের সঙ্গে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর লেখার বিষয়গত মিল আছে তাঁদের মধ্যে বলরাম বসাক, কার্তিক ঘোষ, অজেয় রায়, বুদ্ধদেব গুহ, নির্মলেন্দু গৌতম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বলরাম বসাক মূলত ছোটদের প্রিয় জন্তু-জানোয়ারদের নিয়ে মজার মজার গল্প রচনা করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – 'হালুম' (১৯৭৭), পিঁপড়ে হাতি'(১৯৮৩), প্রভৃতি। আমরেন্দ্র চক্রবর্তী এই ধরণের পোষ্য বা জীবেদের নিয়ে গল্প রচনা করেছেন, যেমন – 'আল্লাদী কবে কথা বলবে', দুঃখী মাছ' ইত্যাদি। তবে নিছক আনন্দ দানের মধ্যেই তাঁর গল্প শেষ হয় না, জীবনের কোনো মহৎ দিককেও ছুঁইয়ে যায় তার গল্প। সমকালীন আর এক সাহিত্যিক কার্তিক ঘোষের 'নদীর কাছে', 'এক মুঠো রোদ', 'পাতার বাঁশি' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে প্রকৃতির প্রাণবন্ত উপস্থিতি বারবার চোখে পড়ে, যার সঙ্গে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর('আমার বনবাস', 'তালগাছের ডোঙা' ইত্যাদি) রচনার বিষয়গত ও ভাবনাগত অনেক সাযুজ্য রয়েছে। ভ্রমণ বা অ্যাডভেঞ্চারধর্মী রচনাও সেসময় খুব জনপ্রিয় ছিল। বুদ্ধদেব গুহ, অজেয় রায়, নির্মেলেন্দু গৌতম প্রমুখ তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধদেব গুহের ঋজু-দার বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারধর্মী রচনা, নির্মলেন্দু গৌতমের 'বনজঙ্গল' সেই সময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। তবে এঁদের সাথে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ বা অ্যাডভেঞ্চার

কাহিনীর ভাবনাগত তফাৎ ছিল। লেখক তাঁর এই ধরণের রচনাগুলিকে কেবল শিহরণ জাগানো রহস্যময়তায় শেষ করেননি, তাকে অতিক্রম করে লেখক সেখানে ফুটিয়ে তুলেছেন জঙ্গল জীবনের কঠিন বাস্তবকে, আজকের দিনের নির্মম সত্যকে। এখানেই তিনি স্বতন্ত্র। হালকা হাসির গল্প বলে বা চটকদারি কৌতুক রচনা করে তিনি শিশুদের মন ভোলাতে চাননি। হাসির মুহূর্ত তাঁর গল্পে এলেও তার উচ্ছ্বসিত প্রকাশ নেই, বরং হালকা হাসির মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর গল্পের পরিসরে বলে দিয়েছেন নিজের সাহিত্য জীবনের দর্শনকে।

প্রশ্ন হতে পারে আজকের দিনের মোবাইল, টিভি, ইন্টারনেট বা প্রযুক্তির যুগে নিখাদ প্রকৃতির বর্ণনা বা গ্রামীণ জীবনের গল্প বলা কতটা সময়োচিত বা শিশুমনকে তা কতোখানি আকৃষ্ট করবে? আসলে যন্ত্র-প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে মানুষ এতটাই যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়েছে যে প্রকৃতির সাথে তার যোগাযোগ ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছে। প্রযুক্তি এতোটাই তাকে আত্মমগ্ন করে করে তুলেছে যে তার সামাজিক জীবন আজ বিপর্যয়ের মুখে। শিশুমনেও এর প্রভাব পড়ছে। এছাড়া নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির সমাজে প্রতিযোগিতার ঘোড়দৌড়ে ক্লান্ত শিশুমন মুক্তি খুঁজছে টিভি বা ভিডিও গেম্‌স্-এ। ফলে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক টান তার কাটছে। যুদ্ধ বা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং গেম্‌স্-এর সাথে অভ্যস্ত হয়ে শিশুমনে তৈরি হচ্ছে প্রতিহিংসা পরায়ণতা, একরোখা জেদ প্রভৃতি মানসিক বিকারগুলি। আর তুচ্ছ কোন অপ্রাপ্তিতেই তাদের ঘিরে ধরছে বিষাদ বা হতাশা। তখন অবসাদগ্রস্ত একাকী শিশুমন বেছে নিচ্ছে ব্লু-হোয়েলের মতো মারণ- গেম বা আত্মহত্যার পথ।

শিশুমন স্বভাবতই চঞ্চল, কল্পনাপ্রবণ এবং জিজ্ঞাসু । অনন্ত প্রশ্নভরা চোখ নিয়েই তারা চারপাশকে পর্যবেক্ষণ করে। অনন্ত প্রকৃতির জগতের মধ্যে তারা খোঁজার চেষ্টা করে তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরকে। এই প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসেই শিশুর মনে তৈরি হয় সহজতা, নম্রতা, উদারতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি। তেমনভাবে পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে মিশে তার মধ্যে গড়ে ওঠে সহমর্মিতার বোধ। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী যে গল্পের বাতাবরণ তৈরি করেন তা এই নির্মল প্রকৃতির মধ্যে, সামাজিক জীবনযাপনের পটভূমিতে। গল্পের সহজ সরল উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে তিনি শিশুমনে সহজতা, সারল্য, উদারতা, কৌতূহল, সহমর্মিতা প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিগুলিকেই সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। সহজ শব্দে, টানটান ঘটনার পরতে পরতে গল্প বুনে লেখক আসলে শিশুর মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন মানবিকতার বোধকে। অধ্যাপক ডঃ পবিত্র সরকারের ভাষায়-

> "চারপাশের সিনেমা-টেলিভিশন খবরের কাগজের খুনজখম দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ঝগড়াঝাটির বাতাবরণে অমরেন্দ্রর এই বইগুলি আমাদের সন্তানদের চারিদিকে ভালবাসার এক দুর্গ তৈরি করবে, এ আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস।"[১৭]

সাধারণ সূত্র নির্দেশ:

১। শিশুসাহিত্যে সুরুচি। সুখলতা রাও। সম্পাদক : জয়িতা বাগচী, রচনা সংগ্রহ ১। কলকাতা : সীমা প্রকাশনী। ১৯৯৯। পৃষ্ঠা ১৯।

২। শিশুশিক্ষা ও শিশু-সাহিত্য। অজিত দত্ত। প্রবন্ধগুচ্ছ। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা লি। প্রথম আনন্দ সংস্করণঃ ২০০৩। পৃষ্ঠা ২২৫-২২৬।

৩। On Themes, On Literature. Maxim Gorky. Moscow: Progress Publishers, 1933, pp. 219-220.

৪। আজকাল, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৩। পবিত্র সরকার।

৫। গৌর যাযাবর। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। কলকাতা : স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রা. লি.। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৪। পৃষ্ঠা ৮।

৬। গৌর যাযাবর। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। কলকাতা : স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রা. লি.। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৪। পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭।

৭। হীরু ডাকাত। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। কলকাতা : স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রা. লি.। নবম মুদ্রণ, মে ২০১০। পৃষ্ঠা ৮।

৮। হীরু ডাকাত। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। কলকাতা : স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রা. লি.। নবম মুদ্রণ, মে ২০১০। পৃষ্ঠা ১০।

৯। হীরু ডাকাত। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। কলকাতা : স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রা. লি.। নবম মুদ্রণ, মে ২০১০। পৃষ্ঠা ২২।

১০। আজকাল ৮জুন, ১৯৮৯। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।

১১। আজকাল ২০ জুলাই, ২০০২। মহাশ্বেতা দেবী।

১২। গরিলার চোখ। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। কলকাতা : স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রা. লি.। জানুয়ারি ২০১৪। পৃষ্ঠা ৩৮।

১৩। আমার বনবাস। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। কলকাতা : স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রা. লি.। জানুয়ারি ১৯৯৩। পৃষ্ঠা ৩।

১৪। আমার বনবাস। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। কলকাতা : স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রা. লি.। জানুয়ারি ১৯৯৩। পৃষ্ঠা ৮।

১৫। তালগাছের ডোঙা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। কলকাতা : স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রা. লি.। তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৩। পৃষ্ঠা ১৩।

১৬। ছেলেবেলা। জানুয়ারি ২০১৫। সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। পৃষ্ঠা ৫৭।

১৭। আজকাল, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৩। পবিত্র সরকার।

স্বাধীনতা পরবর্তী নির্বাচিত ছোটোগল্প ও কবিতায় দেশভাগ প্রসঙ্গ

অর্পিতা বোস
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয় (হাবড়া)

সারসংক্ষেপ: দেশভাগের সঙ্গে আমাদের কত স্মৃতি জড়িত। এই বিষয়টি সবসময়ই আমাদের নাড়া দেয় আবেগের একটা বিষয় দেশভাগ। এ-পার বাংলার মানুষের ওপার বাংলায় যাওয়া আর কিছু মানুষের ছিন্নমূল হয়ে যাওয়ার, ভিটেমাটি ছাড়া হওয়ার কাহিনি–ই তো দেশভাগ। স্বাধীনতা পরবর্তী নির্বাচিত ছোটগল্পে ও কবিতায় লেখক-কবিরা দেশভাগের এই মর্মস্তুদ কাহিনি ফুটিয়ে তুলেছেন খুব সুন্দর পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে। প্রফুল্ল রায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে মনীন্দ্র রায়, শঙ্খ ঘোষের কবিতার পাতায় উঠে এসেছে দেশভাগ ও তার পরবর্তী মানুষের যাপনচিত্র। আমি আমার প্রকল্প "স্বাধীনতা পরবর্তী নির্বাচিত ছোটোগল্প ও কবিতায় দেশভাগ প্রসঙ্গ" তে উপরোক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

সূচক শব্দ: ছিন্নমূল্য, স্বপ্নহীনতা, মূল্যবোধ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সত্তা, সাম্প্রদায়িকতা।

'দেশভাগ' কথাটা বলা ভালো শব্দটার মাধ্যমে আমাদের কতকিছু জড়িত। ফেলে আসা স্মৃতি, হারিয়ে যাওয়া স্বজন, কোটি কোটি মানুষের আর্তনাদ, নতুন জায়গায় বসবাস- সেখানে মানিয়ে নেওয়া, উদ্বাস্তু মানুষ সবকিছু বাংলা সাহিত্যে সে কবিতা হোক, ছোটোগল্প হোক, উপন্যাস হোক- দেশভাগ এসেছে নিজস্ব বয়ানে। দেশভাগ শুধুমাত্র রাডক্লিফের তৈরী একটি সীমারেখা হয়ে থাকেনি। তা ছিন্নমূল হয়ে যাওয়া মানুষের আশ্রয়হীনতার দলিল হয়ে উঠেছে। **১৯৪৭** এর দেশভাগ এর বাস্তবতা অনেক আগেই তৈরী হয়ে গেছিল। এই পটভূমি কিন্তু একদিন দুদিনের নয়। সত্তরের দশকের বা **১৯৭১** এর মুক্তিযুদ্ধের পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ছিন্ন হয়ে যাওয়া ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নেওয়ার মাঝে আছে দাঙ্গা- অত্যাচার- মৃত্যুর ধ্বংসলীলা। এই প্রসঙ্গে নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্পে ও কবিতায় দেশভাগ প্রসঙ্গ আলোচনা করা যায়। বাংলা কথাসাহিত্যের আঙিনায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ী, সলিল চৌধুরী, প্রফুল্ল রায়, সমরেশ বসু প্রভৃতি লেখকদের লেখায় উঠে এসেছে দেশভাগের কথা ।

"হঠাৎ বুকের মধ্যে এক অসীম শূন্যতা বোধ করলেন রাজমোহন। তাঁর কেউ নেই, তাঁর কেউ নেই।" এই 'নেই' এ আছে অসীম একাকীত্ব, চরম নিসঙ্গতা। 'পালঙ্ক'

গল্পে রাজমোহনের অবস্থা এরকম। ভিটেমাটি সবকিছু হারিয়ে সে এসেছে। যারা বিশ্বপ্রকৃতির কোথায় কী ঘটে চলেছে তাতে তার বিন্দুবিসর্গ হেলদোল নেই। সে শুধু চায় তাঁর ক্লেদাক্ত ভিটেমাটিটুকু। এই ভিটেমাটির কোন লাভ- লোকসানের হিসাব নেই, আইনী জটিলতা নেই, এপার বাংলা- ওপার বাংলার বিভেদ নেই। গল্পের শুরু অসীমার তাঁর শশুর রাজমোহনকে লেখা একটি চিঠি দিয়ে। চিঠি পড়ামাত্র রাজমোহন তাঁর প্রতিবেশী দিনমজুর মকবুলকে মাত্র পঞ্চাশ টাকায় পালঙ্ক বিক্রি করে দেয়। কিন্তু বিক্রি করার পর থেকেই সে পালঙ্কটি ফেরৎ পেতে চায়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রর মধ্যবিত্ত জীবনদৃষ্টি ও মধ্যবিত্ত মানসিকতার অসাধারন মনস্তাত্বিক বিশ্লেষন হয়েছে এই 'পালঙ্ক' গল্পে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ একজন কথাকার প্রফুল্ল রায়। প্রফুল্ল রায় দেশভাগ পরবর্তী সময়ের বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন তার লেখায়। তাঁর লেখায় উঠে এসেছে এক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী। প্রফুল্ল রায়ের দেশভাগকেন্দ্রীক ছোটোগল্পগুলি হলো "মাঝি", "চর", "রাজা যায় রাজা আসে", "স্বপ্নের ট্রেন", "শেকড়", "কাছেই আছে", "বিদেশী" প্রভৃতি। ১৯৪৬-৪৭ সালের ভয়াবহ দাঙ্গার সন্ধিক্ষনে "মাঝি" গল্পের কাহিনী নির্মান। দেশভাগের মত স্পর্শকাতর বিষয়কে অবলম্বন করে প্রফুল্ল রায় দেশ ও জাতির কাছে এক গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন বটে। এই গল্পের মূল চরিত্র ফজল। সে নৌকা চালায়, সলিমাকে ঘিরে তার যাবতীয় স্বপ্ন। সে টাকা জমায় সলিমাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে বলে। চারিদিকে দেশত্যাগ করার ঘটনা তখন। হিন্দুরা এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলায় যাচ্ছে। কেয়ারা পাবার উদ্দেশ্যে। তারাপাশা স্টিমার ঘাটের দিকে নৌকা ভাসায় ফজল। মনের সুখে গান ধরে-

"কালো চোখের মদ খাইয়াছি
হইয়াছি উন্নান,
আর খাইয়াছি আমার বধূর
পেরথম যৈবণ।"

(রায় প্রফুল্ল প্রফুল্ল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প-
দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৬, কলিকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ২৫)

গল্পের শেষাংশে দেখা যায় প্রেমিক ফজল হত্যাকারী ফজলে পরিনত হয়। তার প্রেম আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক থাকে না- বিশ্বজনীন রূপ নেয়। গল্পে দেখা যায়- "ইয়াছিন আর সেই নারী মূর্তির কথোপকথন খ্যাপা তুফানের মত ধরাস করে আছড়ে পড়ল ফজলের হৃদপিন্ডে।"

তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৮

ফজল মাঝির আত্মত্যাগ, মানবতাবোধ গল্পটিকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। গল্পকার প্রফুল্ল রায় এই গল্পে দেখালেন ফজল মাঝিকে সৎ মানুষের প্রতিনিধি করে। বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও মানবতার প্রতীক হয়ে "মাঝি" গল্পে চিত্রিত।

প্রফুল্ল রায় তার সাহিত্যভাবনা সম্পর্কে বলেছেন-

> "দেশজোড়া বৈষম্য, নৈরাশ্য, নৈরাজ্য এবং গভীর তামাশার মধ্যে মানুষকে আমি তার স্বমহিমায় আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি। এত ক্ষয় ও ধ্বংসের মধ্যে যেখানে মানুষ্যত্বের এতটুকু স্ফলিঙ্গ চোখে পড়েছে আমার লেখায় তা ধরতে চেয়েছি। কেননা মানবিকতা এবং মূল্যবোধের বিকাশ ছাড়া কোন দেশ বাজতে পারে না।"

(রায় প্রফুল্ল সেরা ৫০টি গল্প-
দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ,কলিকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ৫)

প্রফুল্ল রায়ের দেশভাগকেন্দ্রিক আর একটি ছোটগল্প "রাজা যায় রাজা আসে"। দেশভাগ আমাদের দেখিয়েছে ধ্বংসের চিত্র, স্বপ্নহীনতার চিত্র। কেউ লাভবান হয়েছিল আবার কেউ- বা লোকসানের ভাগীদার। দেশভাগের ফলে অসংখ্য মানুষ এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলায় এবং ওপার বাংলা থেকে প্রচুর মানুষ এপার বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিল। কেউ নিজ ভিটে মাটি হারিয়ে অন্যের পরিত্যক্ত ভিটেমাটি পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে আবার কেউ দেশভাগ পরবর্তী সময়ে সমস্ত কিছু হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। "রাজা যায় রাজা আসে" গল্পটিও এরকম প্রেক্ষাপটেই লেখা। এই গল্পে দেখা যাই রাজেক বৈকুণ্ঠ সাহার বাড়ি, জমিজমা সবকিছু আগলাচ্ছে। রাজেকের জীবন সাদামাটাই ছিল। কিন্তু তার এত ভালো অবস্থা হওয়ার কারন- "দেশখানা যদি দুভাগ না হত, বৈকুন্ঠ সাহারা যদি এই ছিপতিপুর গ্রাম ছেড়ে চলে না যেত, এত সুখ কপালে ছিল না।"

(রায় প্রফুল্ল, প্রফুল্ল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প-
দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৬,কলিকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ১০)

ইতিমধ্যে তার কাছে এসে উপস্থিত হয় তোরাব আলি। যার বাড়িতে আট মাস আগেও রাজেক খেটেছে। তোরাব আলি রাজেকের কাছে আসায় সে অবাক হয়ে যায়।

রাজেকের কাছে তোরাবের জিঙ্গাসা- "বৈকুণ্ঠ সা'রা কি আর ফিরব।

কেমনে কমু?

রাজেকের উত্তর যেন শুনতে পায় না তোরাব আলী। নিজেই মনে মনে বলে- আমার মনে হয় অরা ফিরব না।"

আশ্বিনের এক সকালে রাজেক একটু পিছন ফিরে তাকায়। তার মনে পরে সে কখনও যেত মৃধাদের বাড়ি, কখনও সর্দারদের বাড়ি। তখন তার একটা অনুভূতিই ছিল আর সেটা হলো 'খিদে'। একটু বড় হবার পর রাজেক বুঝতে পেরেছিল যে অন্যের করুনায় সম্মান নিয়ে বাঁচা যায় না। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি মাছ তুলে সে বিক্রি করে ইনামগঞ্জের হাটে। সারাদিন জলে থেকে রাজেকের অনুভূতিগুলো অসাড় হয়ে গেছিল। দেশভাগ, স্বাধীনতা দিবসের জমকালো উৎসব বা গ্রামের ভাঙন সবকিছুই রাজেককে স্পর্শ করেছিল। এইসব নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামালেও সে ভেবেছে-

"ভাগ্যে; দেশখানা দু ভাগ হয়েছিল, ভাগ্যে বৈকুন্ঠ সাহারা চলে গিয়েছিল। না হলে তার কপাল কি খুলত! এত সুখের মুখ কি সে দেখতে পেত!"

(রায় প্রফুল্ল, প্রফুল্ল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প-
দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৬, কলিকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ১২)

তোরাব আলী সাদরে নিমন্ত্রণ করে যায় রাজেককে। সে যেতে যাবে এমন সময় হাজির হয় বৈকুন্ঠ সাহা। সঙ্গে করে নিয়ে আসে আমিন সাহেবকে। আমিন সাহেবের সাথে তার আগেই কথা হয়েছে সম্পত্তি বিনিময় নিয়ে। রাজেক আবার ছিন্নমূল হলো সবকিছু হারিয়ে। তোরাব আলীও এখন আর তেমন আগ্রহী নয় রাজেকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে। আর তারপর দিন যায়, দিন আসে। গল্পের শেষে মাছ আর শস্য খুঁজতে খুঁজতে নিজের মনেই রাজেককে বলতে শোনা যায়- "দেশখানা দুভাগ হয় সাহারা- ভুঁইমালীরা- যুগীরা গ্রাম ছাইড়া যায়, দ্যাশের এক রাজা যায় আরেক রাজা আসে, তাতে তোর কি রে, তর কি ?"

(রায় প্রফুল্ল, প্রফুল্ল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প-
দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৬,
কলিকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ২৪)

দেশভাগের মহাবিপর্যয় ও একদল মানুষ অভাবের মাঝেও নিজের সততা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি অটুট থেকেছে আবার তোরাব আলীর মতো মানুষ নিজের আখের গোছাতেই সবসময়ব্যস্ত থেকেছে। এই বৈপরীত্য চিত্রই আমরা এই গল্পে পাই। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় রাজেকের জীবনে যে রূপকথার গল্পের ছোঁয়া লেগেছিল তা হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে যায়। গল্পের শেষে রাজেকের উক্তি হাজার হাজার প্রান্তিক মানুষের উক্তির সমার্থক হয়ে যায়। যে সব মানুষরা দেশভাগের ফলে যে অন্ধকারে ছিল, সেই অন্ধকারেই থেকে যায়। দেশভাগ হয়- রাজনৈতিক মানচিত্রের বদল হয় কিন্তু এই মানুষগুলোর অবস্থান একই থেকে যায়। এরকম দৃষ্টিকোন থেকেই এই গল্পের অবয়ব নির্মান করেছে কথাকার।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি বাংলা ছোটোগল্পের আঙিনায় আসা এবং পরবর্তী প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্য সাধনায় উঠে আসে ছোটোগল্পকার জীবন সরকারের নাম। লেখক নিজে দেশভাগের অভিঙ্গতার শরীক।

তিনি বলেছেন- "দেশভাগের পর দাদাদের সঙ্গে এপার বাংলায় এসে দেশের কথা ভুলতে পারিনি। সবসময় চোখের মধ্যে ভাসে ওখানকার ধান জমি, খাল বিল, পুকুর, ধলেশ্বরী নদী, গাছগাছালি, পাখ– পাখানি, মাছ, বৃষ্টি জল। লিখতে বসে শুধু এদের কথা মনে আসে।"

(সরকার, জীবন, আমি ও আমার লেখা- চিকরাশি, জীবন সরকার
সংখ্যা- সম্পাদক- অমিত কুমার দে,পৃষ্ঠা- ৩০)

দেশভাগের ফলে স্বাধীনতা উত্তর বাঙালীদের চরম হতাশার দলিল 'কোষা' গল্পটি। উত্তমপুরুষে লেখা এই গল্পটিতে নায়কের ছেলেবেলায় বাবার সাংকেতিক কথা বোধগম্য হত না। দেশের প্রতি ভালবাসা, ছেড়ে আসা মাটির প্রতি গভীর আত্মিক টান বশত গল্প বারবার স্মৃতিচারনায় এসেছে- "বুইনের বাড়ি। গফর গাঁও থেকে ঘোড়ার গাড়ি। কাঁচা রাস্তা। গাড়ি একবার ডাইন কাইত হয়, একবার বাম কাইত। নৌকায় নদী পার অইয়া গেলেই.........।"

('কোষা', জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠ গল্প একুশ শতক,
১৫, শ্যামাচরন দে স্ট্রিট, কল- ০৭, প্রথম প্রকাশ, জুলাই- ২০১১, পৃ- ১৯৪)

এই গল্পে 'বাবা' চরিত্রটি ভূলতে পারছে না- তার ছেড়ে আসা ভিটেমাটিকে। লেখাপড়া শিখেও গল্পের নায়ককে মুদি দোকানে কাজ করতে হয়। চাকরির চেষ্টা করেছে সে; হয়নি। ভূমিপুত্র না হলে তার চাকরী পাওয়াটা মুশকিল। আবার এ দিকে কোন বাঙালী হত্যার ঘটনা ঘটলে, বাবা অস্থির হয়ে ওঠেন। উঠানে পায়চারি করেন। ছোটোবেলার সুখ, জীবন থেকে নিমেষে হারিয়ে যায় রাজনীতির দ্বন্দে। শতকোটি মানুষ ছিন্নমূল হয়ে গেছে, দেশভাগের যন্ত্রনা তাদের মর্মে মর্মে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙালীদের নিয়ে লেখা আর একটি গল্প 'জাগরন'। সারা আসাম জুড়ে তখন বাঙালী মেদাও আন্দোলন চলছে। চারদিকের পরিস্থিতি ভয়াবহ। কলেজে পরাকালীন অবস্থায় বাঙালীদের প্রতি বিভিন্ন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে থাকে গল্পের নায়ক। কলেজের গেট মিটিং- এ জোনালির ভাষন বাঙালী রক্ষক সমিতিকে বেশ আকৃষ্ট করত-

> "এই হঠকারী বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে গণজাগরন গঠন করিব লাগিব। জনগন যদি অনুয়াই আহে তেনেহলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই সোঁতক ঘুরাই দিয়া যাব। আমি এই আন্দোলন চালাই যাব। কোনে বড়ো, আমি নে মানো। আমি আসলে ভারতীয়, ভয় করিলে ন চলিবো।"

(জাগরন, জীবন সরকারের নির্বাচিত গল্প,
কুন্দসি, ২/১৭, শরৎপল্লী বেলঘড়িয়া, কল- ০৭, প্রথম প্রকাশ,
নভেম্বর- ২০০৬, পৃ- ১৮)

দেশভাগের ফলে ভিটেমাটি হারিয়ে কলকাতায় আশ্রয় নেওয়া বাঙালীদের প্রতিমুহূর্তে যে দহন সহ্য করতে হয়েছিল তার চিত্র আছে 'হারানো ঠিকানা' গল্পে। এই গল্পের কথক দেশভাগের ফলে ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে তিন চার বছর কলকাতায় আছে। নিজেদের রক্ষার জন্য উদ্বাস্ত কলোনীতে এরা তৈরী করে সংগ্রাম কমিটি, নাগরিক কমিটি, শান্তি রক্ষা কমিটি। গল্পের কথক ওপার বাংলায় ছেড়ে আসা আত্মীয়দের খোঁজ খবর নিতে চাইলেও ওরা ঠিক উৎসাহী হয় না। ওপার বাংলার হিন্দু বাঙালীরা এমন বাংলাদেশকে নিজের দেশ বলেই মনে করেন। ওটা তো ওদের জন্মভূমি। তাদের ঘরের সন্তানরা জানতে পারে না তাদের পরিচয়; এরকম ভাবে ভাগ হয়ে গেছে হাজার হাজার পরিবার

দেশভাগের দগদগে ঘা নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে ‘জাদুঘর’ গল্পটি। ওপার বাংলা থেকে চিরকালের মতো ছেড়ে আসার সময় নিজের নিজের প্রিয় জিনিসগুলো কী করে সযত্নে আঁকড়ে নিয়ে আসতে চেয়েছিল ছিন্নমূল বাঙালী, তার প্রমান এই গল্প- “ মা বলতেন, আমি যদি যাই, তাহলে এই সব জিনিসগুলিও যাবে। আমি ফেলে যাব না। বাবা ভালো করে জানতেন, একবার যখন মা বলেছেন। মা নিয়ে যাবেন রেখে যাবেন না। এমন একটা কাজ হয়েছে। সেই সব জিনিসগুলি বের করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কী সব ভাবেন। মনে হয়, স্মৃতিতে সব দেখতে পান।

(সরকার, জীবনঃ ‘জাদুঘর’, জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠ গল্প,
একুশ শতক, ১৫, শ্যামাচরন দে স্ট্রিট, কল- ০৭,
প্রথম প্রকাশ, জুলাই- ২০১১, পৃ- ২৭০)

স্মৃতি- সত্তা- বিষাদ আর নতুন অভিঙ্গতার পুর্নগঠনে দেশভাগের সাহিত্য গড়ে উঠেছে। কবিতায় ও তার প্রভাব এসেছে। দেশভাগজনিত স্মৃতিমেদুরতা, বাস্তুচ্যুত মানুষের শিকড়হীনতার বুকফাটা হাহাকার কবিতার ছত্রে ছত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত ‘উদ্বাস্ত’ কবিতায় একটি পরিবারের সমস্ত শিকড় ছিন্ন করে উদ্বাস্তু হবার জীবন্ত ছবি এঁকেছেন। কবিতার শেষে আমরা এক নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াই –

আমরা সবাই উদ্বাস্তু
কেউ উৎখাত ভিটে মাটি থেকে,
কেউ উৎখাত আদর্শ থেকে।

মঙ্গলাচরন চট্টোপাধ্যায় উদ্বাস্তুদের নিয়ে কবিতা লিখলেন ‘এস দেখে যাও’ কবিতার অবয়বে ফুটে উঠেছে আক্ষেপ-

এস দেখে যাও কুটিকুটি সংসার।
স্টেশনের প্লাটফর্ম ছড়ানো বে - আব্রু সংসারে
স্বামী নেই, গেল কোথায় তলিয়ে
ভেসে আজ ঠেকেছে কোথায় ও – যে
ছেঁড়া কানিটুকু,কোমরজড়ানো আদুরি, ঘরের বউ –
আমার বাংলা।

চিঠি কবিতায় কবি মনীন্দ্র রায় ফুটিয়ে তুলেছেন এক উদ্বাস্ত বৃদ্ধার ছেড়ে আসা বৃদ্ধার ছেড়ে আসা গ্রাম এবং সেখানকার মানুষজনের জন্য বৃদ্ধার দুশিন্তা -

সুশান্ত , তোমার মনে পড়ে
সরলার মাকে , যে এখানে
কাজ করত ? হঠাৎ সেদিন
শুনল যেই বন্যা পাকিস্তানে ,
বুড়ি গিয়ে বসল বারান্দায়।।
দেখি তার চোখে জল ঝরে ।......

শঙ্ক ঘোষের কবিতায় দেশভাগ, ছেড়ে আসা ভিটা, শিকড়হীনতা, অস্তিত্বহীনতার কথা বারবার ফুটে উঠেছে-

আমার মুখে অন্তহীন আত্মলঞ্চনার ক্ষত
আমার বুকে পালানোর পালোনোর আরো পালোনোর দেশজোড়া স্মৃতি।'

ভিটেমাটি ছাড়ার বেদনাকে তিনি উপলব্ধি করে বলেছেন-

তুমি মাটির কিংবা তুমি আমারই স্মৃতি ধূপে ধূপে
কেবল ছড়াও মৃদু গন্ধ আর কিছু নও ?
রেখায় রেখায় লুপ্ত মানচিত্র খন্ডে চুপি চুপি
তোমার সত্তাই শুধু অতীতের উদ্দাম উধাও
বাল্য সহচর, তুমি মাটি নও দেশ নও তুমি।

মানুষের অসহয়ত্বকে স্পষ্ট করে তুলেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার একটি কবিতায় সেখানে তিনি বলেছেন-

শিয়ালদার ফুটপাতে বসে আছেন আমার
ধাইমা
দুটো হাত সামনে পেতে রাখা,
ঠোট নড়ে উঠেছে মাঝে মাঝে।
যে কেউ ভাববে দিনকানা এক হেঁজিগেঁজি
বাহাওুরে রিফিউজি বুড়ি।
বুড়ি সর্বনাশিনী, আমাকে কেন বাঁচিয়ে
রেখেছিলি
এই অকল্পনীয় পৃথিবীতে
আমি আর কত কিছু হারাবো?

সব হারানো এই মানুষের দল আজও থামেনি। আজও নানা কারনে দেশকাঁপে। যন্ত্রনাকে বুকের নিভৃতে লালন করছে মরনও।

বুকের ভেতরে থাকা স্বদেশ, স্বদেশের মানুষের জন্য উৎকন্ঠা সবসময়ই মানুষের বুকের ভিতরে।

এই প্রসঙ্গে আর একজন মানুষের কথা বলতেই হয় তিনি হলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখায় দেশভাগের বেদনা এবং হারানো দেশ খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্কার কথা ধ্বনিত হয়েছে। লেখক নিজেও সর্বোপরি দেশভাগের শিকার। তাঁর বাল্য, কৈশরের স্মৃতিতে দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন এমনভাবে অভাব ফেলেছে যে, মনে হয় তাঁর মনের গহন গভীরে ছিন্নমূল মানুষের বেদনা .... দেশভাগের কারন হিসেবে তিনি মানুষের দীর্ঘকালীন অবহেলাও এর জন্য দায়ী। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে জীবনপিপাসার গল্প। সাম্প্রদায়িকতার প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প 'কালের' গঙ্গার

দিনেও কিছু মানুষ নিজেদের গ্লানি বিপন্ন করে ভিন্নধর্মী মানুষের প্রানভিক্ষা করেছে। বীভৎস দাঙ্গার দিনেও কিছু মানুষের এই মাহাত্বের জন্য বেঁচে থাকে মনুষ্যত্ব। 'ইহলোক' গল্পটি প্রথমিকভাবে একটি উদ্বাস্তু পরিবারের দ্বিতীয় প্রজন্মের কাহিনি। আবার মানুষ বংশ পরম্পরায় এক জায়গায় স্থায়ী হতে পারে না। তার ঠিকানা পাল্টে যায়। আর এটাই জীবনের সত্য। 'জীবন সত্য' গল্পে একথাই আছে। 'বাতাসী' গল্পটি ও উদ্বাস্তু মানুষের জীবন সংগ্রাম ও জীবন অন্বেষনই তাঁর রানার অন্তর্নিহিত সুর।

তথ্যসূত্র-

- রায় প্রফুল্ল, প্রফুল্ল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প- দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৬,কলিকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ২৫
- তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৮
- রায় প্রফুল্ল সেরা ৫০টি গল্প-দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ,কলিকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ৫
- রায় প্রফুল্ল, প্রফুল্ল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প- দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৬,কলিকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ১০
- তদেব, পৃষ্ঠা- ১২
- তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪
- সরকার, জীবন, আমি ও আমার লেখা- চিকরাশি, জীবন সরকার সংখ্যা- সম্পাদক- অমিত কুমার দে,পৃষ্ঠা- ৩০
- 'কোষা', জীবন সরকারের শ্রেষ্ট গল্প একুশ শতক, ১৫, শ্যামাচরন দে স্ট্রিট, কল- ০৭, প্রথম প্রকাশ, জুলাই- ২০১১, পৃ- ১৯৪
- জাগরন, জীবন সরকারের নির্বাচিত গল্প, কুন্দসি, ২/১৭, শরৎপল্লী বেলঘড়িয়া, কল- ০৭, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর- ২০০৬, পৃ- ১৮
- সরকার, জীবনঃ 'জাদুঘর', জীবন সরকারের শ্রেষ্ট গল্প, একুশ শতক, ১৫, শ্যামাচরন দে স্ট্রিট, কল- ০৭, প্রথম প্রকাশ, জুলাই- ২০১১, পৃ- ২৭০

নাট্যকার মনোজ বসু : প্লাবন

দেবজ্যোতি শীট
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মহারাজা নন্দকুমার মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর

কল্লোল কালের অন্যতম সাহিত্যিক মনোজ মোহন বসু। মনোজ বসু নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত, পিতার নাম রামলাল বসু। যশোরের ডোঙাঘাটার বসুপরিবারের মনোজ বসু মূলত ঔপন্যাসিক। ঔপন্যাসিক মনোজ বসুর খ্যাতির প্রাক্-পর্বে কবিতা,গল্প ও নাটক ছিল তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রধান স্তম্ভ। প্রথম উপন্যাস 'ভুলিনাই'র পূর্বে যে নাটকটির সাক্ষাৎ পাই তা হ'ল 'প্লাবন'। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য নাট্যকীর্তিগুলি হ'ল 'নতুন ---- প্রভাত'(১৯৪৩),'রাখীবন্ধন'(১৯৪৯),'শেষলয়','বিপর্যয়','বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং' ইত্যাদি। 'বৃষ্টি বৃষ্টি' উপন্যাসের নাট্যরূপও তিনি দিয়েছিলেন 'ডাকবাংলো' নামে। গ্রাম,পরিবার, জমিদার, শোষণ, প্রেম,প্রকৃতির মেদুর অনুভব বাংলা নাটকের আধুনিকতায়, বিশেষত কল্লোল কালে অবসিত হলেও মনোজ বসু পল্লির সরল-তরল-প্রাঞ্জল জীবনছবির প্রতি ভালবাসা প্রধান মূল হয়ে যেমন কাব্যভাবনায় জায়িত হয়েছে, সেভাবে নাট্যভাবনাও হয়েছে প্রভাবিত। বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক 'মন্ত্রমুগ্ধ'(১৯৩৮) এবং দিগিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক 'অন্তরাল'(১৯৪৯)এর মধ্যবর্তী সময়ে মনোজ বসুর প্রথম নাটক 'প্লাবন '(বাং ১৩৪৮,ইং (১৯৪১) প্রকাশিত হয়।

'প্লাবন' ২২শে শ্রাবণ ১৯৪৮ সালে ডি.এম.লাইব্রেরি ৯ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত হয়। ক্যালকাটা থিয়েটারের পূর্বস্বত্ত্বাধিকারী যশোদানারায়ণ ঘোষ এবং নলিনী কুমার বসুকে মনোজ বসু নাটকটি শুনিয়েছিলেন। যশোদানারায়ণ তৎকালীন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে শোনানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তীকালে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্তোষ সিংহের চেষ্টায় অধিকাংশ সময় ধরে 'নাট্যভারতী'তে নাটকটি অভিনীত হয়। এসময়ের নাট্যভারতীর প্রাণপুরুষ ছিলেন রঘুনাথ মল্লিক।

'প্লাবন'- নামের মধ্যেই ভয়ংকর বন্যার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। এখানে প্লাবন সৃষ্টির মূল কারনই ভৈরব নদী। নদীর কুলছাপিয়ে জলস্তরের সঞ্চারে ডিঙ্গি, জাহাজ, নৌকার প্রসঙ্গকে দর্শকদৃশ্যে উপস্থাপিত করতে মানুবাবুর ভূমিকাকে মনোজ বসু উল্লেখ করেছেন। সুর যোজনায় উমাপতিবাবু এবং নৃত্যের ক্ষেত্রে মহারাজাবসুর ভূমিকার কথাও স্বীকার করা হয়েছে। নাটকটির লেখার ক্ষেত্রেও তৎকালীন নট-নাট্যবিদ নরেশ চন্দ্র মিত্রের উৎসাহ কার্যকর ছিল। 'প্লাবন' নাটকের প্রধান চরিত্র নীলাম্বর রায়ের নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। তাঁরই করকমলে মনোজ বসু নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন। নাট্যকারের কথায়-

"আমার কল্পনালোকে নীলাম্বর এসে দাঁড়াল সেদিন সঙ্গেসঙ্গে মনে পড়েছিল তোমার কথা। সকলের অবহেলিত এই অভিশপ্ত চরিত্রকে রূপায়িত করবার মতো দরদী মন আর কার!"

নাটক রচনার বা উপস্থাপনার যে চিরাচরিত পদ্ধতি অর্থাৎ অঙ্ক বা দৃশ্যবিভাজন, নির্দিষ্ট সংখ্যার পূর্ণাঙ্গ নাটকের যে মর্যাদা সেই ধরাবাঁধা রীতির বাইরে মনোজ বসু 'প্লাবন' নাটকটি লিখেছেন। এখানে সংস্কৃত, পাশ্চাত্য তথা বাংলা নাটক রচনার অঙ্ক বা দৃশ্য নির্দিষ্ট বা ক্রমবিন্যাস ভেঙে মনোজ বসু ঘটনা পরিণতিকে সিঁড়ির ধাপের মতো দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে বিস্তৃত করেছেন। নাটকটিতে পূর্বকথা,অন্তর্দৃশ্যসহ মোট চৌদ্দটি দৃশ্য আছে। প্রতিটি দৃশ্যে স্থান, পরিবেশ, আবহ, নাট্যঘটনার গতিপ্রকৃতি মঞ্চায়ন ব্যবস্থায় উল্লেখিত হয়েছে। পূর্বকথা নামের দৃশ্যটি ৫ই আষাঢ় ১৩৩৩ সালের রাত্রির ঘটনায় সংঘটিত। এই নাটকে 'বিরামবাড়ি' বিশেষ কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়েছে।

ভৈরব নদীর অদূরবর্তী অন্যান্য বসতিগুলির চেয়ে কিছুটা দূরে অবস্থিত 'বিরামবাড়ি' ।এই বিরামবাড়ি জমিদার শেখর মজুমদারের বিশ্রাম ঘর। কলকাতা ফিরতি তিনি এখানেই অবস্থান করেন। সেদিন রাতের অন্ধকারে ঘরটি র নানান আসবাবপত্র টেবিলল্যাম্পের আলোয় দেখা যাচ্ছিল। তার সাথে বছর পঁচিশের এক তরুণীর ফুল আঁকা শাড়ির মধ্যথেকে সুঠামসৌন্দর্য কৌচে শায়িত পুস্তক পাঠরত মুহূর্তকে দৃশ্যায়িত করা হয়েছে, তার নাম নিশারানী। সূচনা দৃশ্য থেকে জানা যায় রাঘব ঘোষের স্ত্রী মনোরমা নকল টাকারব্যবসা করতে গিয়ে বর্ষণমুখর রাতে পুলিশের তাড়া খেয়ে স্বামীসহ ভৈরবের জলে পড়ে যায়, সে কোনোভাবে একাকী দিশাহীনা হয়ে শেখরের বিরামবাড়িতে আশ্রয়প্রার্থিনী হয়। স্ত্রীহীন শেখর মাতৃহীন কন্যার মা হিসেবে তাকে গ্রহণ করতে চায়। মনোরমা হয়ে ওঠে নিশারানী। শেখর মজুমদার স্ত্রী ললিতার বিয়োগে নিশারানীর শরীর ছুঁতে চাইলে মুখোশপরা এক আততায়ী জানলার ওপার থেকে বন্দুকের গুলিতে শরীর ঝাঁঝরা করে দেয়, শেখর মজুমদারের মৃত্যু ঘটে।

এই মৃত্যুকে flash back এ রেখে নাট্যকার মনোজ বসু ঘটনাকালকে 'পনের বৎসর পরে' নামাঙ্কিত করে পরবর্তী ঘটনাস্রোতকে বর্তমানের রূপরেখায় উপস্থাপিত করেছেন। এই দৃশ্যে ভৈরবের আগ্রাসী প্লাবন সাধারণ প্রজাদের ক্ষেত-খামার-ঘর-বাড়ি হারানোর করুন দৃশ্যে তাদের অসহায়তা ফুটে উঠেছে। প্লাবনের দুর্যোগ ঠেকানোর জন্য প্রজারা বাঁধ বাঁধা ও লগগেট বসানোর কাজে ব্যস্ত। এখানে নান্দীগীত হিসেবে 'সর্বহারার গান ' নাট্যকার গণসংগীত রূপে ব্যবহার করেছেন। সংগীতের কথাগুলো নাটকের মূলদ্বন্দ্ব স্ফূটনে নাট্যপ্রবাহকে ত্বরান্বিত করেছে।

অন্যদিকে শেখর মজুমদারের মৃত্যুর পনের বছর অতিক্রান্ত। মৃত্যুদিবস পালিত হবে তারজন্য লোকবল দরকার, অথচ বল্লভ-কমলেশদের নির্দেশে তারা বাঁধ মেরামতির কাজে ব্যস্ত। এই বাঁধ মেরামতির জন্য বড় অঙ্কের টাকা সাহায্য করেছেন উঠতি পয়সাওয়ালা নীলাম্বর রায়। আপাত কঠিন কঠোর মানুষটির রহস্যময় জীবনে

লুকিয়ে আছে অসীম বেদনা ও একাকীত্বের যন্ত্রণা। কমলেশ নীলাম্বরের করুণ এই অসাহয়তাকে আবিষ্কার করেছে। এই কমলেশই একসময় ছিল শেখর মজুমদারের আদরের পাত্র। তারপর দীর্ঘ নিরুদ্দেশের পর ফিরে এসেছে 'রূপগঞ্জ গ্রামের পথ' নামাঙ্কিত অঙ্কদৃশ্যে। এরপর টাকা সংগ্রহের জন্য নিশারানীর কাছে গেলে শেখরের সদ্য যৌবনে পদার্পণা সবিতার সাথে ঘটে পরিচয়। ব্রজলাল ও ত্রিলোচন জমিদার শেখর তথা নিশারানীর অধীনে পরামর্শ ও আদেশ পালনকারী, তারা চায় প্রজাদের কাছে খাজনা। আর কমলেশ, মাতব্বর মহেশ্বর মোড়ল, লাঠিয়াল বল্লভরা এই অর্থকে বাঁধ মেরামতির তহবিলে জমা করতে চায়। এই সংঘাতময় দৃশ্যে প্রাচীন জমিদারী প্রথার সাথে ও উঠতি অর্থবান নীলাম্বর রায়ের একটি দ্বান্দ্বিক টানাপোড়েনের সূচনা অন্যান্য দৃশ্যের চেয়ে পটভূমি হিসেবে বিস্তৃত হয়েছে। দৃশ্যটি দ্বিত্বদ্বন্দ্বের সূচক দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্যটির স্থান কলকাতাশহর। শেখর মজুমদারের মৃত্যুর পর সবিতাকে নিয়ে নিশারানী এখানেই চলে আসেন। বহুদিন পর বিরামবাড়ি এলাকায় শেখরের স্মরণমেলায় যাবার জন্য সবিতা উৎসুক। সেখানে তার শিশুকাল কেটেছে। সেই গ্রামের বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য কমলেশ কলকাতারবাড়িতে নিশারানীর কাছে অর্থ সংগ্রহের জন্য আসে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে স্থান কলকাতাশহর। শেখর মজুমদারের মৃত্যুরপর সবিতা ও নিশারানী গ্রাম ছেড়ে এখানেই পুরোপুরি থাকেন। কমলেশকে নিশারানী টাকা দিতে অস্বীকার করলেও ,সবিতা fancy fair বা আনন্দমেলার আয়োজন করে-যে পাঁচ হাজার টাকা উঠবে তা চাঁদা হিসাবে দিতে চায়। এই দৃশ্যে কমল ও সবিতার অস্পষ্ট এক মানসবন্ধন মনস্তাত্ত্বিকতায় ধরা পড়েছে।

তৃতীয় দৃশ্যে আনন্দমেলার বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজনে নৃত্য, গীত,বাদ্য,অভিনয় ইত্যাদির পরিবেশনে মঞ্চ জমজমাট। আশাপ্রদ অর্থ না সংগৃহীত হলেও কমলেশ যে ভালো বংশীববাদক তা সবিতার মনে ভালোবাসার ঘনত্ব সৃষ্টিতে উদ্দীপন সৃষ্টি করেছে। যে সবিতা কলকাতার বহুপুরুষকে অবহেলা করলেও কমলেশের সুর নাট্য মুহুর্ত সৃষ্টির নেপথ্য ভূমিকা নিয়েছে।

চতুর্থ দৃশ্য ব্রজলাল ও নিশারানীর সাথে কমলেশের বাদানুবাদ-নাট্যদ্বন্দ্বকে ত্বরান্বিত করেছে। শেখর খুনের রহস্য, কমলেশের গ্রামে ফিরে আসা , নীলাম্বর রায়ের চোরাই অর্থস্ফীতি ও আবির্ভাবের সংক্ষিপ্ত ঘটনা Suspense বহুধা উৎসে উপস্থিত হয়েছে। ঘটনার স্রোতধারায় কমলেশ-সবিতার সূক্ষ্ম সম্পর্ক একমুখি মাত্রা লাভ করেছে।এরপরই নাট্যবিরতি হিসেবে নাট্যকার 'বিরাম' ঘোষণা করেছেন, সিনেমাটিক কায়দায় পরবর্তী দৃশ্যের অবতারনা ঘটেছে।

পঞ্চম দৃশ্যে স্থান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে ভৈরব নদীর ধারের রাস্তা। একদিকে ভৈরব নদে বাঁধ বাঁধার কাজ চলছে, ব্রজলাল অনুনয়ের সুরে তাদের শেখর মজুমদারের

প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ ও শ্রদ্ধা জানাতে আহ্বান করলে নীলাম্বর নত হয়ে কথা বলতে বলেছে, কারন বিরামবাড়ির জমিদারি কিনে নিয়েছেন তিনি। জমিদারতন্ত্রের অস্তমিত বৈভব ও নবব্যবসায়িক ধনতন্ত্রের উত্থান নাটকের দ্বন্দ্বকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে।

ষষ্ঠ দৃশ্যের স্থান বিরামবাড়ির বসবার ঘর।নীলাম্বর রায় জোর করে সবিতাকে 'ভালোবাসি' উচ্চারণ করাতে চায়, বিরামবাড়ির মালিক এখন সে,তাই টাকার জোরে সবিতার অধিকারীও হতে চায়। নিশারানী ও সবিতার থাকার জন্য অনুমতি দিতেপারে। কিন্তু সবিতা গ্রীক উন্নত করে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।

সপ্তম দৃশ্যে বিরামবাড়ির লাগোয়া কুটির প্রাঙ্গণে জেলেদের এক ছোকরার জাল বোনার দৃশ্য আছে, আর একমনে কমলেশ বাজাচ্ছে বাঁশির সুর। সে সুর ভাটির টানে বেদনাতুর। এই দৃশ্যে নাটকের প্রায় সবচরিত্রকে মঞ্চে উপস্থিত হতে লক্ষ্য করা যায়। সবিতাকে কমলেশ নিষ্ঠুর-অনড়তার আড়ালে নীলাম্বরের প্রেমহীন, স্নেহহীন অন্তরাত্মাকে উপলব্ধি করতে বলে। নীলাম্বররের কটূক্তিকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে না বলে। ত্রিলোচন পাকড়াশি এতদিন ছিল শেখর মজুমদারের ম্যানেজার, এখন ম্যানেজারীর হস্তান্তরের সে নীলাম্বররের লোক। নীলাম্বর ত্রিলোচনকে আদেশ করে বমালসহ সবিতাদের ঘরথেকে বেরকরে দিতে।

অষ্টম দৃশ্যটির স্থান বিরামবাড়ির শয়ন কক্ষকে নাট্যকার উপস্থাপিত করেছেন। ষাট বছরের নীলাম্বর সে কক্ষে শুয়ে আছে, যা একসময় সবিতার বাদ্যচর্চার ঘর ছিল। নীলাম্বর সবিতাকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনানোর জন্য পীড়াপীড়ি করে আশ্রয়দাতা হিসেবে। শেষপর্যন্ত সবিতার গানে নরম গদির ওপর শুয়ে নীলাম্বর ঘুমিয়ে পড়ে।

নবম দৃশ্যে লক্ষ্য করা যায়,নিশারানী বিরামবাড়ি ছেড়ে কলকাতা চলেযেতে চাইলেও সবিতা থেকেযেতে চেয়েছে। সবিতার বিয়ের আয়োজন করে নীলাম্বর সবাইকে যাবার পথ আটকায়। সবিতা ঠাট্টার সুরে তার বিবাহ বয়স্ক নীলাম্বরের সাথে কিনা জানতে চেয়েছে।

দশম দৃশ্যটির স্থান রূপগঞ্জ গ্রামের পথ। পুলিশ ইন্সপেক্টর, কনস্টেবল, ত্রিলোচন, ব্রজলাল -সমবেত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা নীলাম্বরের জুলুম করে সবিতাকে বিয়ের হাত থেকে রেহাই করতে চেয়েছে। যদিও ঘটনার পরম্পরায় দেখতে পাই যে, লেঠেল দিয়ে এই বিয়ের প্রতিবাদী চরিত্র কমলেশকে আটকে রাখলেও নীলাম্বর সবিতার সাথেই তার বন্দোবস্ত করেছেন। ঘটনার পরিবর্তিত দৃশ্যটির মধ্যেই আলাদা Suspense মনোজ বসু সৃষ্টি করেছেন।

একাদশ দৃশ্যটির স্থানও বিরামবাড়ির সংলগ্ন কুটিরপ্রাঙ্গন। দৃশ্যটি নাটকের climax. ফুল,আলপনা,পুরোহিতসহ ত্রিলোচনের স্ত্রী সারদা,চাঁপা ও অন্যান্যরা বিয়ের জন্য উপস্থিত। আর একদিকে লেঠেল বল্লভ ভৈরবের তান্ডবে বাঁধের ভাঙন রোধ করতেগিয়ে আহত। তাকে ব্রজলাল ভাই সম্বোধনে বৈরিতা ভেঙে শেষবিদায় জানাচ্ছে। একসময় সে এই বাঁধের মেরামতিতে বিরোধিতা করেছিল, আজ সেই প্লাবনস্রোতে

তলিয়ে যাচ্ছে। আরদিকে কমলেশ-সবিতার বিয়ে সম্পন্ন করে নীলাম্বর নৌকোয় নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। প্লাবনের স্রোতে ভেসে চলেছে নীলাম্বর-নিশারানী ওরফে মনোরমা। এমন প্লাবনের দুর্যোগে দুজনেই অনেক আগে তলিয়ে গিয়েছিলেন। এই নীলাম্বর আসলে মনোরমার স্বামী।

দ্বাদশ দৃশ্য এই নাটকের অন্তিম দৃশ্য। প্লাবিত নীলাম্বর ও মনোরমা ইটেরপাঁজা ধরে বাঁচার চেষ্টা করছে। পরস্পরের অপরিচয়ের পর্বঘুচে বহুবছরের পর আজ দুর্যোগের দিনে চিনেছে। ক্লান্ত অন্বেষণ জীবন উপান্তে মিলনের বিরহকে গুণান্বিত করেছে। কতদিন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত আলাদা একাকীত্বে সময়কে যাপন করেছেন। আজ ক্ষণিকের মিলনের আনন্দ নিয়ে জলের গভীরে নিমজ্জিত হলেও তাদের দুঃখ নেই। যে অন্ধকার জগতে অর্থ উপার্জন করেছেন তাতে বাঁচলেও আইনের হাতে ফাঁসি বা দ্বীপান্তর হবেই। তাই দুজনেই নিমজ্জমান জীবনের স্বাদ নিতেনিতে তলিয়ে যান ভৈরবের গভীর গহ্বরে। আর জীবনের নতুন স্বাদে কমলেশ-সবিতার শিকারের স্টীমার তাদের নিয়ে চলে শামুকপোতায় নতুন ঘরকন্নার আনন্দে। বিচ্ছেদ-মিলনের যুগ্ম স্বাদে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দৃশ্যপরম্পার সাপেক্ষে ঘটনাস্রোত ও স্থানক্রম নাটকের কাহিনীও কায়া নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। মনোজ বসুর এই নাটকটিতে সাতটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছে জমিদার শেখর মজুমদারের 'বিরামবাড়ি'। এছাড়াও ঘটনাস্থান হিসেবে দুটি দৃশ্যে রয়েছে 'রূপগঞ্জের মাঠ-ঘাট ' ও ভৈরব নদীর প্রসঙ্গ। শহর কলকাতার প্রসঙ্গ এসেছে দুটি দৃশ্যে। নাটকের ঘটনা সাল-তারিখে নাট্যকার স্পষ্ট করেছেন, সময় ইংরেজ আমল।

'প্লাবন' নাটকের প্রধান চরিত্র-নীলাম্বর রায়(রাঘব ঘোষ), মনোরমা(নিশারানী), সবিতা এবং কমলেশ। এছাড়াও শেখর মজুমদার, গোমস্তা তথা জমিদারের লেঠেল ব্রজলাল, ম্যানেজার ত্রিলোচন, ত্রিলোচনের স্ত্রী সারদা,সবিতার চাকরানী ঝি নৃত্যকালী, সবিতার পাণিপ্রার্থী কবি-গোঁসাই, মি.এন গোসেন ইত্যাদি চরিত্রগুলো মূলঘটনাস্রোতে প্রবাহিত হলেও কাহিনীর নিয়ন্তা হতে পারেনি। নাটকটির ঘটনা সাল-তারিখ চিহ্নিত। সময়কাল ১৩৩৩ সালের ২৯শে আষাঢ়। 'পূর্বকথা' নামাঙ্কিত দৃশ্যটি ঐ সময়ের রাতের। তারপর 'অন্তর্দৃশ্যে' দুবছর আগের একটি ঘটনাকে flashback এ তুলে ধরাহয়েছে। এখানে মনোরমা শেখর নাথের নদীতে বাঁধা বজরায় সাহায্যপ্রার্থিণী হয়ে এসেছিল। সবিতার সেদিন মা ডাকে অনিচ্ছুক শেখর আশ্রয়ও দিয়েছেন। রাঘব ঘরনী মনোরমা শেখরের নিশারানীতে পরিণত হয়েছে-শেখরের কথায়-'বিরামবাড়ি আমার, তুমিও আমার -'মনদেহ-যাইহোক'। তারপর দৃঢ়মুষ্টিতে আকর্ষণ করে। রাঘব ঘোষের ফেরার অপেক্ষারত মনোরমা শেখরকে নিষ্ফল বাধা দেয়। অবশ্য চরিত্রটিকে নাট্যকার দ্বিধান্বিত চরিত্রে পরিণত করেছেন। conflict এর নিরসন জানলা দিয়ে ছুটে আসা গুলিতে শেখরের ঝাঁঝরা ও মৃত্যুর হবার জন্য। অবশ্য চরিত্র দ্বন্দ্ব স্ফূটনের সুযোগ নাট্যকার

ব্যবহার করেননি। নাট্যনির্দেশনায় জনৈক মুখোশপরা লোককে জানলার বাইরে ঘুরতে থাকার দৃশ্যকে মনোজ বসু তুলেধরেছেন সচেতন শিল্পি হিসেবে। সকাল, বিকেল, রাত মিলিয়ে সতেরো বছরের কাহিনীর প্রসঙ্গ বিবর্তিত হয়েছে।

'প্লাবন' নাটকের সংলাপগুলি নাট্যকার মনোজ বসু নিজস্ব শিল্পপ্যাটার্ণে নাট্যবিষয়ের সঙ্গে যুতসই হয়েছে। চলিত সংলাপগুলিতে আধুনিকতা, প্রবাদ-বাগধারা, গ্রামীন ঠাট্টা-তামাশা নাট্যরীতির স্বাতন্ত্র্যে প্রকাশ পেয়েছে। 'পূর্বকথা' দৃশ্যে ম্যানেজার ত্রিলোচন নিশারানীকে শেখরনাথের কলকাতা থেকে রাতে ফেরার খবর নির্দিষ্ট ভাষাভঙ্গীতে প্রকাশ করেছে-"মা, দেখে যাও। বাবা আর ব্রজদা দু'জনে আসছে জোছনায় কিরকম দেখাচ্ছে।"

ত্রিলোচন মজুমদারের সম্বোধনসূচক এই সংলাপে চরিত্রটির ম্যানেজ পারদর্শিতার দিকটি প্রতিফলিত। শেখর নাথের উদ্দেশ্যে যে স্মরণমেলা উদযাপন হবে এক্ষেত্রে বিরামবাড়ির জমি পরিচ্ছন্নতার জন্য লতা-গুল্মের মধ্যে প্রবেশ করলে দূরথেকে তার মেয়ে কাউকে না দেখতে পেয়ে লম্বালম্বা ঘাসের ডগাগুলো নড়ে দেখে বলে- "ওমা,মা- উলুবনে কুরুক্ষেত্তোর-।"

সাধের পটল বাগান মেলার কারনে নষ্ট করতে হবে বলে বক্রোক্তিমূলক সংলাপটি ত্রিলোচন স্ত্রীসারদাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে- "পটল তোলো পটল তোলো।" পরক্ষণেই সে রসিকতার ভঙ্গিতে বলে-"ওসব ভেবে বলিনি গিন্নি। তুমি পটল তুলবে কোন দুঃখে-কিন্তু আমি পাততাড়ি তুলব।ভাবছি এদের চাকরি ছাড়ব।"

আবার লাভালাভের হতাশায় বলেছে- ব্রজবেটার আটটা চোখ- সবদিকে নজর। লম্বালম্বা হুকুম, আর পাওনা- থোওনার বেলা তাইরে- নাইরে না।এদের ছেড়ে নীলাম্বর রায়ের চাকরি করব।"

নীলাম্বরের চাকরীকে সারদা ব্যঙ্গ সংলাপে নাটকের serious ভাবকে প্রশমিত করে নাট্যকার পাঠক-দর্শককে কিছু relief দিয়েছেন-"ও ম্যানেজার। তিনটাকার আবার ম্যানেজার। একটা ছাগলের দামও যে তিনটাকার বেশি।" এরপরই ত্রিলোচন স্ত্রীর রুদ্রমূর্ত্তিতে কিছুটা তোষামোদ ঢেলে ইয়ারকি করেছেন-"দাঁত পড়েনি,গাল দুটো যেন পাকা তরমুজ।" আরো বলেছেন -"ব্রজলালের হুকুম- হবেই। সে বিষম কড়া,তোমার চেয়েও।"

প্লাবন নাটকের সাধারণ প্রজা সনাতন, অর্থহীন জমিদারের বেগার খাটার ভয়ে মাথায় টোকা আড়াল দিয়ে ত্রিলোচনের চোখকে ফাঁকিদিতে গেলে -" ....টোকার আড়াল দিলে কি হবে? যম আর জমিদারের নজর এসব এড়ায় না।"

প্রজাদের উদ্দেশ্যে ত্রিলোচনের অবজ্ঞামূলক গালাগালের সংলাপগুলিতে লুকিয়ে রয়েছে বাংলার প্রবাদ-প্রবচনের সুর- "চাকরান খাও আর বগল বাজাও।" নীলাম্বরের বাঁধ বাঁধার জন্য সাহায্যকেও তাচ্ছিল্য করে-

"দেখেছি দেখেছি বাপু। মাতালের খেয়াল।বাঁধ নয় মাটির ঢিবি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।কোটাল আসুক, একদিন সকালে উঠে দেখে এসো, ভানুমতির খেলের মতো ফুঁয়ে উড়ে গেছে। তাজ্জব লেগে যাবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সনাতন, কেউ গতরে ঘাটবে না, টাকাকড়ি দেবেনা, সাপের পাঁচ পা দেখেছো নাকি?"

একদিকে গজিয়ে ওঠা ধনী নীলাম্বরের সাহায্যে প্রজাদের বানভাসি থেকে রক্ষার প্রয়াস ও শ্রমদান, অন্যদিকে ব্রজলাল,নিশারানী,সবিতাদের জমিদারিতে বসবাসের জন্য খাজনা বা শ্রমদানে-প্রজারা দ্বিধান্বিত। শাঁখের করাতে বাসকারী প্রজাদের মুখে নাট্যকার যথার্থ সংলাপ ব্যবহার করেছেন-

"আমাদের হ'ল বিষম জ্বালা। এঁরা বলেন এককথা, রায়মশায় বলেন আর এককথা।দুই সূর্যের উদয় হ'ল, এখন ধান শুকোই কার রোদে।"

মহেশের মত প্রজারা অনুনয়-বিনয় সংলাপগুলিতে দেখি-" আপনারা জমিদার-মা -বাপ। আপনারা দয়া না করলে আমরা বাঁচি কি করে? আমাদের মুখের দিকে একটু চাইবেন না?"

কথ্যভাষার গ্রামীন উচ্চারণে ছোটছোট বাক্যের এই সংলাপগুলো নাট্যকার মনোজ বসুর একান্ত নিজস্ব। নবোদ্ধত বণিকতন্ত্রের আস্ফালনে অস্তমিত জমিদারেরর বিরামবাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। নিশারানী, ব্রজলাল ও সবিতাকে তা সহ্য করতে হয়।নীলাম্বর সবিতাকে 'ডেঁপো মেয়ে', তার কথা বলাকেবলেছে - " ট্যাঙস ট্যাঙস করে কথা বলা...."। নিশারানীর ক্ষোভ, অহংকার ও ক্রোধ প্রকাশের সংলাপেও চলিত রূপ মিশেছে - "ডাকাত নীলাম্বর খুন করল বাপকে, জোচ্চোর কমলেশ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েকে।"

আগের জমিদারের অধীনে চাকরী করা ত্রিলোচনকে নীলাম্বর শাসিয়েছে- "এইবার কিন্তু চাকরিটা খসলো ম্যানেজার।" ত্রিলোচনও জবাবে বলে-" সেকি হুজুর, ঘোড়া কিনতে -- বাঁধলো না,চাবুকে আটকে যাবে?"

এছাড়াও সবিতার কলকাতার পুরুষ বন্ধুদের মুখে কাব্যময় ইংরেজি সংলাপগুলো নাট্যকার মনোজ বসু ব্যবহার করেছেন।

'প্লাবন' নাটকের climax পর্যায়ে সবিতাকে নিশারানী জোরকরে কলকাতা নিয়ে যেতে চেয়েছে। কমলেশের প্রেম থেকে সবিতা বিচ্যুত হতে চায়নি, তাই সে কমলেশের সাহায্য চাইলে কমলেশ বিশেষ ধরনের সংলাপে শ্লেষে জবাব দেয়-"এটা বিংশ শতাব্দী,ইংরেজের রাজ্য। সুভদ্রার যুগ বা উপন্যাসের দেশতো নয়!" নীলাম্বর রায় ত্রিলোচন ও বল্লভকে সবিতা ও কমলেশের বিয়ের বন্দোবস্ত সংগোপনে করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও এ বিবাহের আয়োজন কমলেশের ভ্রম উৎপাদন করেছিল নীলাম্বরের সাথে ভেবে। বিবাহের কাজ দেখে ত্রিলোচনকে নীলাম্বর বলেছেন-" তুমি আর বল্লভ একেবারে তালবেতালের মতো সমস্ত জোগাড় করে ফেলেছেন?"

নাটকের শেষ সংলাপেও নায়ক নীলাম্বরের আপাত প্রতাপের আড়ালে রয়েছে অসহায় শিশুর মত হারিয়ে ফেলার সমস্ত জমাট অন্ধকার। প্লাবনের তেড়ে মনোরমার সাথে পলকা ইটের প্রাচীর ধরে স্ত্রীকে চিনতে পারেন। দীর্ঘশ্বাসে কমলেশের নববিবাহিত জীবনের ঈঙ্গিতে নিজের বাঁচার অনীহা বিশেষ সংবেদনশীল সংলাপে যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে-" আমরা কোথায় যাবো মনোরমা? - ওদের সামনে আছে আলো- আছে জীবন। আর আমাদের দ্বীপান্তর নয় ফাঁসি। মানুষ আর ঈশ্বরের আক্রোশ। -তার চেয়ে এই ভালো তোমার কোলে মাথা রেখে শুই।আসুক প্লাবন আসুক মৃত্যু।এই আমাদের সুখ,এই আমাদের শান্তি।" সংলাপের হ্রস্বতা, যতিচিহ্নের ওঠানামা, চলিত ভাষার অভিনয়যোগ্য শব্দবোধে ঔপন্যাসিকের আড়ালে নাট্যকার মনোজ বসুর ব্যতিক্রম সৃষ্টি লক্ষ্য করাযায়।

চরিত্র আলোচনা করলে কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র নীলাম্বর রায়। রাঘব ঘোষ কালো টাকার ব্যবসা করে, পুলিশের চোখে ফাঁকি দিতে স্ত্রী মনোরমাসহ ভৈরব নদীতে পাড়ি দেয়। রাঘব প্লাবনে ভেসে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে, ফিরে আসে নীলাম্বর হয়ে। স্ত্রীমনোরমা অপেক্ষারত নিশারানী, শেখরকন্যা-মাতৃহীনা সবিতার মা হয়ে ওঠেন। নাটকের শেষে রহস্যময় নীলাম্বর রায় মনোরমাকে প্লাবিত ভৈরবের গভীরে ইটপাঁজা ধরে ক্ষণিক ভেসেথাকা সময়ে আবিষ্কার করেন যে, সে নিশারানী নয়। দীর্ঘদিনের নিঃসঙ্গতা আজ দুর্যোগের মুহুর্তের মাঝে মিলন রচনা করে প্লাবনের অতলে নিমজ্জিত হয়। এক প্লাবনে বিচ্ছেদ আর এক প্লাবনে ক্ষণিকের মিলন ও সলিল সমাধি ট্রাকের সৃষ্টি করেছে। নিজের সবিতাকে জোর করে বিয়ের কথা বললেও তাকে তার প্রেয়স্পদ কমলেশের হাতে তুলেদিয়ে নিরাপদে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। আপাত অর্থলোভী নিষ্ঠুর নীলাম্বর গ্রামকে ভৈরবের দাপট থেকে রক্ষার জন্য অর্থও সাহায্য করেছে।

আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য চরিত্র কমলেশ। মাতৃপিতৃহীন শৈশব শেখর মজুমদারের কাছে কাটলেও সে হঠাৎই উধাও হয়ে যায়। আবার তরুনবয়সে ফিরে আসে বিরামবাড়ির গ্রামে। ভালো বাঁশি বাজায়। পরোপকারী-কর্তব্যনিষ্ঠ এবং নীলাম্বরের আপাতকাঠিন্যের আড়ালে অসহায় অস্তিত্বের সন্ধান সে রাখে।কমলেশ স্পষ্টবাদি,দরিদ্রানুরাগী,শিল্পমনস্ক।কথার দৃপ্ততায় আকর্ষিত করে তরুনী সবিতাকে,যদিও এক নিস্পৃহ আকর্ষণ তারও ছিল। এই নাটকের নায়িকা চরিত্র হিসেবে সবিতাকে উল্লেখ করাযেতে পারে। সে নাটকের নিয়ন্তা চরিত্র ও চরিত্রটি দুটি স্তরে বিন্যস্ত। অসুস্থ মাতৃহীনা বালিকা নিশারানীর স্নেহে বড়হয়ে ওঠা,আবার শহর কলকাতার চপল-চটুল নবশিক্ষিতা 'নামিয়ে মেয়ে।' কমলেশের দৃঢ়, পাঁচ হাজার টাকার চাঁদাচাওয়ার ভঙ্গিমা তারমনে আলাদা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। একসময় কমলেশের সুললিত বাঁশি রূপগঞ্জের থেকে কলকাতা যাওয়ার অনড়তা সৃষ্টি করে। নীলাম্বর বিরূপ সবিতাই পিতৃ-আকর্ষণে ক্লান্ত, নিদ্রামগ্ন নীলাম্বরের গায়ে পরম আদরে চাদর টেনেদেয়। ভৈরবের প্লাবনেই উর্বরভূমিরূপ কমলেশ ও সবিতার মিলনকে সবুজ শষ্যময় করেতুলেছে।

'প্লাবন' নাটকের সঙ্গীতগুলি কাহিনীর পরিপুষ্টতায় সহযোগী। এখানে পাঁচটি গান যোজিত হয়েছে। 'পূর্বকথা' দৃশ্যে 'পনের বৎসর পর' শিরোনামে নান্দীগীতটি বিশেষ গণসংগীত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে 'সর্বহারারগান'টি। দ্বিতীয় দৃশ্যে দুটি সঙ্গীতের দু'কলি ব্যবহৃত হয়েছে-" অচিন গাঁয়ের সোনার পাখি ডাকে- আমায় ডাকে।" এবং " বড় ভালবাসি আমার চাঁদের মতন মাকে।"

তৃতীয় দৃশ্যে 'আনন্দমেলা'র উৎসবে উৎপল সরকার ও মঞ্জুলা ভৈরবের ভয়ংকর রূপকে সঙ্গীতে পরিবেশন করেছে-" কাল ভৈরব গভীর রাতে দিল হানা- দিল হানা-"। সপ্তম দৃশ্যে বিরামবাড়ির সংলগ্ন কুটিরপ্রাঙ্গনের খড়োঘরে জেলেদের এক ছোকরা ভাটিয়ালি সুরে গান ধরেছে, যার বাঁশিদার কমলেশ-

"ভালবাসি ওকন্যা তোমায় আমি ভালোবাসি -
গাঙের পারে গাঁয়ের ছেলে বাজায় বাঁশের বাঁশি।"

'প্লাবন' নাটকে ব্যবহৃত পাঁচটি গানের দুটি অসম্পূর্ণ। শেষ গানটি সবিতা চরিত্রের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত। অষ্টম দৃশ্যটির গান-" এত হাসি আর এত ভালোবাসা - ধরা এত সুন্দর-/ ও পথিক, তুমি নিঃশ্বাস ছেড়ে চলেছ তেপান্তর।"

সুতরাং নাটকের সার্থক শিরোনামের আড়ালে আছে ধ্বংস আর ভাসমানতার ছবি।অঙ্ক বিভাজনের বদলে দৃশ্য বিভাজনে নাটকটির গতিবিস্তার। নাটকের পূর্ব দুটি দৃশ্যের সংখ্যা তত্বে চিহ্নিত না করে শব্দ তত্বে প্রকাশ করেছেন। চরিত্র নির্মাণে,ভাষার প্রয়োগে, সঙ্গীত ব্যবহারে, গঠন তত্বে,এমনকি বিষয়ের নির্বাচনে মনোজ বসু শুধুমাত্র ঔপন্যাসিক পরিচয়ে ঋদ্ধ নন, নাট্যকার হিসেবেও সিদ্ধ। 'প্লাবন ' নানার্থে ভাবগত নামকরনেও বিশেষত্ব লাভ করেছে। কল্লোল কালীন শহরমগ্নতার বদলে গ্রামীন মনোজ বসুর পরিচয়ে নাটকটির বিশিষ্টতা।

ঊনবিংশ-বিংশ শতকে বাংলার আয়ুর্বেদ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ

অমৃতা চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শ্রীচৈতন্য কলেজ, হাবড়া

সারসংক্ষেপঃ ঊনবিংশ শতক আধুনিক ভারত তথা বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এইসময় মূলতঃ অবিভক্ত বাংলাকে কেন্দ্র করে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। উক্ত শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকায় আয়ুর্বেদের চর্চা গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। সাধারণতঃ আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থীরা কবিরাজদের টোলে শিক্ষা লাভ করত। বাংলায় আয়ুর্বেদের চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল কলিকাতা , নদীয়া , মুর্শিদাবাদ, যশোহর , চট্টগ্রাম প্রভৃতি। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্বেদ শিক্ষাদান শুরু হয়। কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে ব্রিটিশ সরকার পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পৃষ্ঠপোষণার নীতি নেওয়ায় এই সময় থেকে সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্বেদীয় ক্লাশগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে আয়ুর্বেদের চর্চা পুনরায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে হতে থাকে। বিংশ শতকেও এই ধারা প্রবহমান ছিল। এর পাশাপাশি কিছু আয়ুর্বেদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে । যেমন – ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠান , ১৯২২খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দ সুন্দরী আয়ুর্বেদ কলেজ প্রভৃতি। এইভাবে ঊনবিংশ-বিংশ শতকে পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থার আঘাত থেকে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতি আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল ।

সূচক শব্দঃ আয়ুর্বেদ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ, বাংলা , ঊনবিংশ-বিংশ শতক।

মূল আলোচনাঃ

ঊনবিংশ-বিংশ শতক আধুনিক ভারত তথা বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ঊনবিংশ শতকে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল মূলতঃ অবিভক্ত বাংলাকে কেন্দ্র করেই। আর্থ-সামাজিক , রাজনৈতিক , ধর্মীয় , সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের মত চিকিৎসাবিজ্ঞানেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকায় আয়ুর্বেদের চর্চা গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে ।স্থানীয় শাসক , অভিজাত শ্রেণী এইসব শিক্ষাকেন্দ্রগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সরকার পশ্চিমী চিকিৎসাকে পৃষ্ঠপোষকতা করলে উক্ত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে ঊনবিংশ-বিংশ শতকে বাংলার আয়ুর্বেদ শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করার প্রয়াস করা হয়েছে ।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থীদের কবিরাজদের টোলে শিক্ষা লাভ করতে হত। নামজাদা কবিরাজররা নিজেদের গৃহে কোনোরকম পারিশ্রমিক

ছাড়াই শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। সাধারণভাবে কবিরাজররা নিজেদের গৃহে ও নিজেদের খরচে ছাত্রদের আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিতেন , বিনিময়ে শিক্ষার্থীরা গুরুর গৃহস্থালীর কাজকর্মে সাহায্য করত। যেসব ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তি থাকত না , তাদের প্রথমে ব্যাকরণ ,সাহিত্য ও তর্কবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। প্রাথমিক বিদ্যা সম্পূর্ণ হওয়ার পর তাদের ধ্রুপদী আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পাঠ করানো হত।[১]

টোলের আয়ুর্বেদ শিক্ষা শুধুমাত্র তাত্ত্বিক ছিল না, সেখানে প্রায়োগিক বিদ্যা চর্চার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত। টোলের শিক্ষাক্রমের শেষ পর্যায় ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা শেষ হলে ছাত্রদের গুরুর সঙ্গে রোগীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে হত। এছাড়া গুরুর সাথে বনে জঙ্গলে ঘুরে বিভিন্ন প্রকার ভেষজের সঙ্গে পরিচিত হতে হত এবং এগুলি নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রিত করে ঔষধ প্রস্তুত করাও শিখতে হত। এইভাবে আয়ুর্বেদশিক্ষার সমস্ত পর্যায় সমাপ্ত হলে গুরুর অনুমতিক্রমে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা শুরু করা যেত।[২]

ঊনবিংশ শতকের বাংলায় আয়ুর্বেদ চর্চার কয়েকটি প্রধান কেন্দ্র ছিল নদীয়া , মুর্শিদাবাদ , হুগলী , বাঁকুড়া , মেদিনীপুর , কলিকাতা , শ্রীখন্ড , যশোহর , চট্টগ্রাম , চাঁদসী, বেলঘরিয়া, চব্বিশ পরগণা ,নাটোর প্রভৃতি।[৩] এই সময়ে বাংলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদ চর্চা কেন্দ্র ও সেগুলির শিক্ষণীয় বিষয় [৪] সারণীর আকারে উপস্থাপিত হল-

ঘরানা	শিক্ষণীয় বিষয়
১।পূর্ববঙ্গঃ	ক)ভেষজ ঔষধ প্রস্তুতকরণ
ক) সাভার	খ)রোগীপরীক্ষা প্রণালী , রোগনির্ণয় , অনুপান ও নির্দেশাবলী
খ) মাট্টা	
গ) গলিয়া	গ)কেমোথেরাপি অনুসারে ঔষধপ্রস্তুতকরণ
ঘ) চাঁদসী	ঘ)বিভিন্ন ধরণের নালীঘা ও অর্শ প্রভৃতির চিকিৎসা
ঙ) চট্টগ্রাম	ঙ)পাগলামীর চিকিৎসা
ঘরানা	শিক্ষণীয় বিষয়
চ) খন্ডপাড়া	চ)পাগলামীর শিক্ষা ও চিকিৎসা কেন্দ্র
২।পশ্চিমবঙ্গঃ	
ক) মুর্শিদাবাদ	ক)নাড়ীবিজ্ঞান ও রোগনির্ণয়
খ) কুমারটুলী	খ)ঔষধ প্রস্তুত কেন্দ্র
গ) শ্রীখন্ড	গ)সাধারণ কবিরাজী শিক্ষা ও আয়ুর্বেদ পুস্তক প্রকাশনা কেন্দ্র

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকেরা দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেননি। পরে ব্রিটিশরা হাসপাতালে অধীনস্ত কর্মচারী হিসাবে ভারতীয়দের নিয়োগ করতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে যারা দক্ষ হয়ে উঠত , তারা সৈন্যবাহিনীতে 'নেটিভ ডাক্তার' হিসাবে যোগ দিত। নেটিভ ডাক্তারদের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কোম্পানীর মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশ মত তাদের একটি বিদ্যালয় " স্কুল ফর নেটিভ ডক্টর্স " ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫] এদেশীয় চিকিৎসকদের শিক্ষার জন্য দেশীয় ভাষায় পুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে স্কুল ফর নেটিভ ডক্টর্স –এর দ্বিতীয় সুপারিন্টেডেন্ট ডাঃ পিটার ব্রেটন দেশীয় ভাষায় পনেরোটি বই রচনা করেন। এগুলির বিষয়বস্তু ছিল লন্ডনের ফার্মাকোপিয়ার অনুবাদ , কলেরা , সবিরাম জ্বর , চক্ষুর গঠন, নরদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাস ও আকৃতি প্রভৃতি। [৬] ১৮২৬খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী এই কলেজে চিকিৎসাবিদ্যার ক্লাশ পরিচালনার জন্য সরকারী নির্দেশনা বিষয়ক জেনারেল কমিটির কাছে আবেদন করেন। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী ডব্লু.প্রাইস লেখেন , কলেজের ছয় জন ছাত্র ও বৈদ্য গোত্রের বারো জন বহিরাগত ছাত্র কলেজে চিকিৎসাবিদ্যার ক্লাশ প্রবর্তনের আবেদন জানিয়েছেন ,যাতে তারা পরবর্তীকালে চিকিৎসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণের প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করতে পারেন। নেটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশনের সুপার জন টিটলার ক্লাশ পরিচালনার দায়িত্ব নেন। মাত্র সাত জন ছাত্রকে নিয়ে ক্ষুদিরাম বিশারদের অধীনে সংস্কৃত কলেজে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল বৈদ্যক বিভাগ। এখানে সমান্তরালভাবে আয়ুর্বেদ ও পশ্চিমী চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। পাঠ্যতালিকায় ছিল সুশ্রুত ও চরক সংহিতা।[৭] ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দানের জন্য আরো শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।[৮] ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের ১৮১ জন ছাত্রের মধ্যে বৈদ্যক বিভাগের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩ জন। ড.টিটলার , ড.জেমিসন প্রমুখ পন্ডিতগণ চরক , সুশ্রুত , বাগভটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। জটিল রোগ চিকিৎসায় বঙ্গীয় বৈদ্যগণের ক্ষুরধার বুদ্ধির তাঁরা প্রশংসা করতেন ।[৯]

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবনমন ঘটতে শুরু করে। কবিরাজদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁদের গৃহে গতানুগতিক আয়ুর্বেদীয় শিক্ষাদান চলতে থাকে। তবে এর পরিকাঠামো কখনোই সুসজ্জিত কলেজের মত ছিল না। তাই চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে আগ্রহীরা পশ্চিমী শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অনুসন্ধিৎসু হয়। প্রথমদিকে রক্ষণশীল কবিরাজরা তাদের পরিবারের পুত্রদের পশ্চিমী চিকিৎসা পদ্ধতি শিখতে দিতে সম্মত হতেন না। পরবর্তীকালে পশ্চিমী চিকিৎসা পদ্ধতির অর্থকরী দিক ও সামাজিক মর্যাদার কথা চিন্তা করে অনেকেই নিজেদের সন্তানদের মেডিক্যাল কলেজে পড়তে প্রেরণ করেন ।

সংস্কৃত কলেজে দেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে ব্রিটিশ সরকার পশ্চিমী চিকিৎসাবিদ্যাকে পৃষ্ঠপোষণার নীতি নেয়। লর্ড উইলিয়াম

বেণ্টিঙ্ক মেকলের সুপারিশ অনুসারে সংস্কৃত কলেজে মেডিকেল ক্লাশগুলি বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন ।[১০]

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্কের ঘোষণার ফলে আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবনে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার সম্ভবনা সম্পূর্ণভাবে বাতিল হয়ে গেলেও বাংলায় আয়ুর্বেদ চর্চা আদৌ বন্ধ হয়ে যায় নি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কয়েকজন কবিরাজ আয়ুর্বেদ চর্চার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবিরাজ গঙ্গাধর রায়। তিনি প্রথমে কলিকাতায় ও পরে মুর্শিদাবাদের সৈদাবাদে (বহরমপুর) আয়ুর্বেদ চর্চা শুরু করেন। তিনি জল্পকল্পতরু , পথ্যাপথ্য ,ভাস্করোদ্যয়(নিদান বিষয়ক গ্রন্থ), বৈদ্যতত্ত্ববিনিশ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি অগ্নিপুরাণের চিকিৎসা সংক্রান্ত অধ্যায় ও চরকসংহিতার ভাষ্য রচনা করেন।[১১] তিনি টোলে বহু শিষ্যকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন। এখানে তাঁর কয়েকজন বিখ্যাত শিষ্য- প্রশিষ্যের নাম[১২] উল্লেখ করা হল –

প্রথম প্রজন্ম	দ্বিতীয় প্রজন্ম	তৃতীয় প্রজন্ম
১। কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন	• কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন	
	• কবিরাজ উমাচরণ সেন/ ভট্টাচার্য	কবিরাজ হরিরঞ্জন মজুমদার
	• কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন	
	• কবিরাজ কুঞ্জলাল ভিষগরত্ন	কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ দাস
	• কবিরাজ গোবর্দ্ধন শর্ম্মা	
	• কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা	
	• কবিরাজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন	কবিরাজ জয়রাম দাসজী
২। কবিরাজ গয়ানাথ সেন	• কবিরাজ সীতানাথ সেন	
	• কবিরাজ রামনাথ সেন	
৩।কবিরাজ পরেশনাথ সেন	• কবিরাজ সত্যনারায়ণ সেন	
	• কবিরাজ ধর্মদাস গুপ্ত	
		সত্যনারায়ণ শাস্ত্রী ও রাজেশ্বর দত্তশাস্ত্রী
	• কবিরাজ ত্র্যম্বক শাস্ত্রী	
	• কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি	
		কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ

৪।কবিরাজ হারান চক্রবর্তী ৫। কবিরাজ ঈশ্বরচন্দ্র সেন ৬। কবিরাজ গোবিন্দচন্দ্র সেন ৭। কবিরাজ শ্রীধরচন্দ্র সেন	• কবিরাজজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী • কবিরাজ রমেশচন্দ্র সরস্বতী • কবিরাজ প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়	কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য কবিরাজ নলিনীরঞ্জন সেন কবিরাজ ধরণীধর ও জয়দেব বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ

গঙ্গাধর সেনের অন্যতম শিষ্য দ্বারকানাথ সেনের পুত্র যোগীন্দ্রনাথ সেন চরক সংহিতার ভাষ্য রচনা করেন। হারানচন্দ্র সেন বিখ্যাত কায় ও শল্যচিকিৎসক ছিলেন। তিনি সুশ্রুত সংহিতার ভাষ্য সুশ্রুতার্থসন্দীপণ রচনা করেন।[১৩] কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি কলিকাতায় একটি টোল স্থাপন করেন এবং পরে দেশবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন , অধুনা এটি শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ নামে সুপরিচিত।[১৪] ১৪কবিরাজ জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী সুশ্রুত সংহিতার ভাষ্য রচনা করেন।[১৫] গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের প্রধান গ্রন্থাগারিক উমেশচন্দ্র দত্ত আয়ুর্বেদ অভিধান – বৈদ্যশব্দসিন্ধু সংকলন করেন।[১৬]

ঊনবিংশ শতকের বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন আয়ুর্বেদের উন্নতিকল্পে 'আয়ুর্বেদ সঞ্জীবনী' নামক আয়ুর্বেদ বিষয়ক একটি বাংলা পত্রিকার প্রথম সম্পাদনা করেন। কলিকাতার কুমারটুলিতে তিনি আয়ুর্বেদ চর্চাকে পশ্চিমী চিকিৎসার সমপর্যায়ে উন্নীত করেন।[১৭] তাঁর কয়েকজন শিষ্য-প্রশিষ্য হলেন[১৮] -

প্রথম প্রজন্ম	দ্বিতীয় প্রজন্ম
১।কবিরাজ নিশিকান্ত সেন ২।কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন ৩।কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ	কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত কবিরাজ দুর্গাদাস ভট্ট

কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের শিষ্য বিজয়রত্ন সেন বাগভটের অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সংস্কার করেন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[১৯] বিজয়রত্ন সেন পশ্চিমী অ্যালোপাথি ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মধ্যে সহযোগিতার

ধারণা আনয়ন করেন।[২০] তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়কে দেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার জন্য একটি কলেজ স্থাপনের বিষয়ে উৎসাহিত করেছিলেন এবং এজন্য লক্ষাধিক মুদ্রা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কায্য সিদ্ধির আগেই বিজয়রত্ন সেন পরলোক গমন করে।[২১] কবিরাজ যামিনীভূষণ সিদ্ধান্তে আসেন যে ,অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা লাভ টোলে ব্যক্তিগত গুরুর নিকট থেকে হওয়া অসুবিধাজনক। এবিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে হলে আয়ুর্বেদের বিদ্যালয় , একাধিক অধ্যাপক এবং সাধন দ্রব্যাদির প্রয়োজন।[২২] তাই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ২৯ নং ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটে একটি ভাড়াবাড়িতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন করেন। যামিনীভূষণের প্রাচীন ও আধুনিকের মধ্যে সমন্বয়সাধনের এই প্রয়াস অচিরেই মহাত্মা গান্ধীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাই নয় বছর পরে ৬ই মে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে এই কলেজের নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বয়ং গান্ধীজী। এই প্রতিষ্ঠান 'যামিনীভূষণ রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল' নামে এখনও বর্তমান।[২৩] বিজয়রত্ন সেনের অপর শিষ্য কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত কুচবি্হারে একটি দাতব্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বনৌষধি দপণ ও রসৌষধি নামক আয়ুর্বেদ গ্রন্থ রচনা করেন।[২৪] উক্ত সময়কালে বাংলার স্বনামধন্য মহিলা কবিরাজ মৃন্ময়ী দেবী অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শান্তিপুরের দত্তপাড়ায় 'কামাখ্যা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয়' প্রতিষ্ঠা করে মহিলাদের আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিতেন। [২৫]

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আয়ুর্বেদ আন্দোলন রাজনৈতিক অবস্থান থেকে নিজের অধিকারের বিষয়গুলি তুলে ধরে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নিখিল ভারতীয় আয়ুর্বেদীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ফলে আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন বেগবান হয়। এই সংস্থার প্রধান দায়িত্ব ছিল আয়ুর্বেদের উন্নতির জন্য সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' এর সভায় কলিকাতায় একটি আয়ুর্বেদ কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং আলোচনার শেষে কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরীর দায়িত্ব দেওয়া হয়।[২৬] ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে গঠন করা হল 'আয়ুর্বেদ সভা' , এর সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে বিজয়রত্ন সেন ও নগেন্দ্রনাথ সেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন'। সেখানে বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ নামে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার একটি শাখা ছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক কাশিমবাজারের মহারাজা স্যার মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর অর্থানুকুল্যে গোবিন্দ সুন্দরী আয়ুর্বেদ কলেজ স্থাপন করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কবিরাজ গণনাথ সেন বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকে

সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি প্রত্যক্ষ শারীরম্, সিদ্ধান্ত নিদান ও আয়ুর্বেদ পরিচয় গ্রন্থ রচনা করেন।[২৭]

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ক্যালকাটা রিভিউ' থেকে জানা যায় যে , ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ছিল ১৯০টি , যেগুলিতে ১৫ জন করে ছাত্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা করত। এদের গড় বয়স ছিল ১৬.২ বছর এবং শিক্ষা সমাপ্তির গড় বয়স ছিল ২৪.২ বছর ।[২৮] আয়ুর্বেদের এই উন্নতির পিছনে কবিরাজদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়াও সেকালের জমিদার , প্রভাবশালী ব্যক্তি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। যেমন – পাথুরিয়াঘাটা , জোড়াসাঁকো ও চোরবাগানের জমিদার ; বড়বাজারের গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ , জৈন বেনোভলেন্ট সোসাইটি প্রভৃতি।[২৯]

উপসংহার: ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যা পুনরুজ্জীবনের যে আন্দোলন চলে তার তিনটি রূপ দেখা যায় – ক) প্রাচীন ও পরবর্তীকালীন আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রাদিতে প্রাপ্ত জ্ঞান সংকলন ও তার প্রচার , খ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং গ) আয়ুর্বেদ ঔষধ প্রস্তুত ও বিপণন।বাংলায় পশ্চিমী চিকিৎসা প্রচলিত হলে আশঙ্কা করা হয়েছিল যে , আয়ুর্বেদ চিকিৎসা হয়ত অবলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে , যে সব রোগ অ্যালোপাথিক ডাক্তারের চিকিৎসায় নিরাময় হয়নি ,তা বৈদ্যরা অনায়াসে সারিয়ে তুলেছেন। ফলে বৈদ্যদের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অশিক্ষিত হাতুড়ে বৈদ্যদের পরিবর্তে সুপন্ডিত বুদ্ধিমান কবিরাজরা চিকিৎসা করতে থাকেন। তাঁদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাও বৃদ্ধি পায় ।

তথ্যসূত্র :

১) ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত , ইন্ডিজিনাস মেডিসিন ইন নাইনটিন্থ অ্যান্ড টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী বেঙ্গল, চার্লস লেসলী (সম্পাদিত) , এশিয়ান মেডিক্যাল সিস্টেমসঃ এ কমপ্যারেটিভ স্টাডি, মোতিলাল বানারসী দাশ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , দিল্লী, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা –৩৬৮

২) তদেব, পৃষ্ঠা-৩৬৯

৩) মাধবেন্দ্র পাল , আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে আয়ুর্বেদ , কলিকাতা , ১৯৭৪ , পৃষ্ঠা-৮৫-৮৬

৪) ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত , পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-৩৬৯

৫) এইচ.শার্প , সিলেকশনস ফ্রম এডুকেশনাল রেকর্ডস ,১৭৮১-১৮৩৯,বিভাগ -১ , কলিকাতা , ১৯২০ , পৃষ্ঠা-২৪

৬) নারায়ণচন্দ্র চন্দ , চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস , লেখনী প্রকাশন , কলিকাতা , ১৯৯৪ , পৃষ্ঠা-১৮১

৭) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় , আয়ুর্বেদের ইতিহাস , তৃতীয় খন্ড , কলিকাতা , ১৩৭০ সন , পৃষ্ঠা-১৫৮

৮) পুনম বালা , স্টেট অ্যান্ড ইন্ডিজিনাস মেডিসিন ইন নাইনটিন্থ অ্যান্ড টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী বেঙ্গলঃ ১৮০০-১৯৪৭ ,এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল উপাধির জন্য উপস্থাপিত সন্দর্ভপত্র,১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৭৩
৯) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় , পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-১৫৮
১০) এইচ.শার্প , পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-৩০-৪০
১১) এন. গঙ্গাধরন , দ্য স্টেট অফ আয়ুর্বেদ ইন দ্য এইটিন্থ অ্যান্ড নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীজ, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ হিস্ট্রী অফ সায়েন্স , খন্ড – ১৭ , নং- ১ , ১৯৮২ , পৃষ্ঠা-১৫৭
১২) ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত, পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-৩৭৬
১৩) এন. গঙ্গাধরন , পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-১৫৮
১৪) ভারত(সাপ্তাহিক পত্রিকা),প্রথম বর্ষ ,ষষ্ঠ সংখ্যা, শনিবার , ৫ই শ্রাবণ , ১৩৪১
১৫) এন. গঙ্গাধরন , পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-১৫৭
১৬) মোমিন আলি , আয়ুর্বেদ ইন দ্য এইটিন্থ অ্যান্ড নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীজ ,ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হিস্ট্রী অফ মেডিসিন (বুলেটিন) , খন্ড – ২০ , পৃষ্ঠা-১৫৪
১৭) 'আয়ুর্বেদ' , ফাল্গুন ,১৩৬৯সন , পৃষ্ঠা-১৩৪-১৩৫
১৮) ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত , পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-৩৭৩
১৯) এন. গঙ্গাধরন , পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-১৫৭
২০)'আয়ুর্বেদ সমাচার' , ২০/০৯/১৯৯২ ,খ , ১৪ সংস্করণ , কলিকাতা , পৃষ্ঠা-৮
২১) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় , পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-১৬৭
২২) তদেব , পৃষ্ঠা-১৬৯
২৩) ডব্লিউ.ডব্লিউ.ডব্লিউ.গুগল.কম/উইকিপিডিয়া.ওর্গ /কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়
২৪) 'আয়ুর্বেদ' , বৈশাখ , অগ্রহায়ণ , মাঘ , ১৩২৮ সন , পৃষ্ঠা -৩০৭
২৫) মহিলা সংবাদ (সম্পাদকীয়), প্রবাসী(মাসিক পত্রিকা), প্রথম খন্ড , প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ , ১৩০৮ সন , পৃষ্ঠা -৪৪৩
২৬) মিনিটস বুক অফ ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন , ১৯০৬ , ২৪ , খন্ড – ১ , কলিকাতা পৃষ্ঠা-২৭
২৭) ডব্লিউ.ডব্লিউ.ডব্লিউ.গুগল.কম/বিএন বাংলাপিডিয়া ওর্গ /আয়ুর্বেদিক মেডিসিন
২৮) দ্য ক্যালকাটা রিভিউ , খন্ড -২ , অক্টোবর – ডিসেম্বর , ১৮৪৪ , কলিকাতা , পৃষ্ঠা-৩৪৬-৩৫৩
২৯) প্রাণকৃষ্ণ দত্ত , কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৭২-৭৬

ব্রাহ্মনিজম ও অস্পৃশ্যতা : উৎস, বিকাশ ও বিবর্তন– ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যের প্রেক্ষিতে

অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়
চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

।। এক ।।

"to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Castes (***) and to evaluate the Progress of their development Under the Union and any State."[১][The Constitution of India, Article 338, (5)C]

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে আম্বেদকরের আপসহীন সংগ্রামের ফল ভারতীয় সংবিধানে 'Article 338'- এর অন্তর্ভুক্তি। স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধানে এই ধারায় তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য 'National Commission' গঠিত হয়। আইনগতভাবে নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমানাধিকারের উৎসমুখ উন্মোচিত হয়েছিল এখানে। অস্পৃশ্যতা ও ঘৃণার বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম আজও বহমান। জানি না, এর শেষ কোথায়? হিন্দুধর্মে অস্পৃশ্যতা ঐতিহ্যগতভাবে শেকড় চারিয়ে রেখেছে সমাজের বহু গভীরে। অস্পৃশ্যতাকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী উত্তরাধিকার সূত্রে মান্যতা দিয়ে এসেছেন। নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য কারা? উচ্চবর্গীয়দের বিপরীত মেরুতে অবস্থান যাদের তারাই অস্পৃশ্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী যে অপাংক্তেয় – ব্রাত্য জনসমষ্টি প্রভুত্বকারী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ঘৃণার ভার বহন করে চলেছেন আজও, তারাই নিম্নবর্গীয় শূদ্র। আর উচ্চবর্গীয়রা হলেন, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিনিধি বা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র পুষ্ট বা পরাক্রমী প্রভুত্বশক্তির অধিকারী সমাজ রক্ষক। পরবর্তীকালে যারা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তারাই উচ্চবর্গীয়। বা যারা সচ্ছল অর্থনীতির অংশীদার, সমাজের নিয়ামক শক্তি তারাই উচ্চবর্গীয়। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে এই সংজ্ঞায়ন স্ট্যাটিক নয়। সামাজিক সূচকের পরিবর্তনের ফলে তার বদল ঘটে। 'সত্যযুগে' এমন স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদ ছিল না। মানুষ ছিলেন সহজ-সরল, সত্যভাষী। মানুষের মধ্যে উঁচু-নিচু ব্যবধানের কার্যকারিতা তখন ছিল না। সাম্যবাদকে অনেকেই, আর্যদের প্রাথমিক জীবনচর্যার রূপ বলে মনে করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' (রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ) – গ্রন্থে লিখেছেন – "সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় যখন মানবগণ সংখ্যায় অতি অল্প, যখন জীবিকার চিন্তা ছিল না, ... হিংসা, দ্বেষ, লোভ যখন মানবকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; যখন সত্যভাষী

সবল মানব কেবল স্বভাবজাত ফলমূলাহারে পরিতৃপ্ত হইত, মানবের সেই প্রকৃত সুখ শান্তির যুগে সমাজবন্ধনের কোন প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং তাহাদের মধ্যে উচ্চ নিচ ক্রমে শ্রেণি বা বর্ণবিভাগেরও আবশ্যকতা ছিল না। এই কারণে একদিন মহর্ষি ভরদ্বাজ এইভাবে ভৃগুকে বলিয়াছিলেন, 'বর্ণ সকলের ইতর বিশেষ নাই। পূর্বে যখন ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন, তখন সমস্তই ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন।' সৃষ্টির প্রথম যুগই পুরাণ ইতিহাসে সত্যযুগ নামে বর্ণিত হইয়াছে। সত্যযুগের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই আর্য-জাতির আদিম অবস্থার পরিচয়।"[২] অনুরূপভাবে মার্কস মনে করেন, আদিম সমাজ ছিল সাম্যবাদী। কিন্তু উদবৃত্ত সম্পদ আদিম সমাজের সেই সাম্যবাদী চরিত্রকে নষ্ট করে ফেলে। কার্ল মার্কস তাঁর 'Das Capital'- গ্রন্থে দেখিয়েছেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে পণ্যের উৎপাদনের মধ্য দিয়ে। এই সম্পর্ক শোষক-শোষিতের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক মূলধনী শ্রেণির সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির সম্পর্ক। শ্রমিকের দেহই শ্রমশক্তির উৎসস্থল। ধনতান্ত্রিক শোষণের ভিত্তি হল উদ্‌বৃত্ত মূল্য। যা মার্কসের কথায় 'Surplus value' । তাঁর মহান গ্রন্থের একটি মূল সূত্র 'উদ্‌বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' ('Theory of Surplus value') নামে চিহ্নিত। মার্কস তাঁর 'Das Capital' গ্রন্থে লিখেছেন – "...... and the labour-power, that he purchased with his good money in the open market. His aim is to Produce not only a use value, but a commodity also; not only use-value, but value; not only value, but at the same time surplus-value.[৩]" সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্ষমতা বৃত্তের কেন্দ্রস্থ শক্তিরও পরিবর্তন ঘটে যায়। নিম্নবর্গীয় শূদ্র সম্প্রদায় এক সময় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এবং রাজন্যবর্গের 'দাস' ছিল। সমাজ শক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে শূদ্র সম্প্রদায় সামন্ত প্রভুদের 'দাস' –এ পরিণত হয়। দুই কালের নিরন্তর দ্বন্দ্বে সমাজ পরিবর্তিত হতে থাকে। কৃষিভিত্তিক সামন্ত সভ্যতার সঙ্গে ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া-শিল্প সভ্যতার দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। সুতরাং কলের মালিকের কাছে সামন্ত প্রভুর পরাজয় ছিল ইতিহাসের ধারাক্রমে নির্দিষ্ট। স্বভাবতই নিম্নবর্গীয় শূদ্র সম্প্রদায় কল মালিকের 'দাস' –এ পরিণত হয়। V Gordon Childe তাঁর 'Social Evolution' গ্রন্থে লিখেছেন – "If stages of economic and social evolution are to be defined on technological bases, food-production should surely mark the beginning of major Stage."[৪] সামাজিক উপপ্লব রাষ্ট্রব্যবস্থায় শক্তির পরিবর্তন ঘটায় এবং সম্পদের হস্তান্তর নির্ণয় করে। নিম্নবর্গীয় মানুষের অনুগত্য পরিবর্তনের সূচক হয়ে ওঠে ক্ষমতার স্থানান্তর। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস তাঁদের 'The Communist Manifesto' গ্রন্থে লিখেছেন –

"All property relations in the past have continually been subject to historical change Consequent upon the change in

historical Conditions."[৫] আদিকাল থেকে ইতিহাসের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের মধ্য থেকেই নিম্নবর্গীয় শূদ্র শ্রেণির মূল্যায়ন অনিবার্য হয়ে ওঠে। উচ্চ-বর্গীয় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রভুত্বকামী বাবু বৃত্তির সপ্রসঙ্গ আলোচনা ছাড়া নিম্নবর্গীয় শূদ্রের মূল্যায়ন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। ড.আম্বেদকর প্রাচীন হিন্দু সমাজের গড়ন এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখেই বর্তমানকে উদ্ভাসিত করেছেন। ভারতীয় শূদ্র সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর আমৃত্যু অসম সংগ্রাম অনন্য হয়ে আছে। এ কারণে ইতিহাস তাঁর কাছে ঋণী। নিম্নবর্গীয় শূদ্র সম্প্রদায়ের সামাজিক ক্ষতের কেবল উপশম তিনি করতে চান নি, বরং ক্ষতকে উৎপাটিত করে তার নিরাময় করতে চেয়েছেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে স্পার্টাকাস (Spartacus, C III-71 BC, aged -39-40) রোমান সম্রাটদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য। তিনি নিজে ছিলেন 'দাস'। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoin, 1809-1865) আমেরিকা থেকে 'দাস' ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটিত করেছিলেন। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ছিল তাই অনিবার্য। সেদিন যদি লিঙ্কন পরাজিত হতেন, ইতিহাসের গতি অন্যভাবে প্রবাহিত হত। 'দাস' মুক্তির স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেত হয়তো। তখন দাস ব্যবস্থা উৎপাটিত করতে আরো কত কত বছর অপেক্ষা করতে হত কে জানে? আর সেই নেলসন মেণ্ডালা (Nelson Mandela 1918-2013), কালো মানুষের মুক্তির জন্য তাঁর জীবন ব্যাপী সংগ্রাম - মানব সভ্যতার শাশ্বত কালের কাছে অর্থবহ হয়ে থাকবে। ড. আম্বেদকর 'The Untouchables' – গ্রন্থের 'Preface' – অংশে সংগতভাবেই প্রশ্ন করেছেন – "Why do the Untouchables live outside the village? Why did beef –eating give rise to Untouchability? Did the Hindus never eat beef? Why did non – Brahmins give up beef – eating? What made the Brahmins become vegetarians, etc.?"[৬]

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ অস্পৃশ্যতার আতুড়ঘর। সেই অতীতকাল থেকেই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র প্রভুত্বকারী শক্তি হিসেবে সমাজের গভীরতম স্তর পর্যন্ত শেকড় বিস্তার করেছে। কি করেনি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র? সতীদাহ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ, গঙ্গা সাগরে সন্তান বিসর্জন, অযাত্রা, সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা, বর্ণপ্রথা, বাল্যবিবাহ - এসব কুপ্রথা ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দান। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের প্রতি ঘৃণা, যা আমাদের আলোচনার স্বতন্ত্র প্রদেশ।

।। দুই ।।

"যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহু কা উরু পাদা উচ্যেতে।।
ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।"[৭]

পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হল। কয় খণ্ড? মুখ, দু'টি হাত, দু'টি উরু, দু'টি চরণ। সেগুলির কি হল? মুখ হলেন ব্রাহ্মণ। দু' বাহু রাজন্য, উরু বৈশ্য এবং দু'টি চরণ হতে শূদ্রের জন্ম হল।

অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ হিন্দুধর্মের কলঙ্ক স্বরূপ। মানুষকে অবমাননার চূড়ান্ত পর্যায়। মানুষকে ঘৃণিত এবং অস্পৃশ্য করে রাখার মধ্যে মনুষ্যত্বের চিহ্ন থাকে না, থাকে না কোন ধর্মবোধ। বর্ণভেদ প্রখরতা কেবল হিন্দুধর্মেই রয়েছে। হিন্দুর সংকীর্ণ জাতীয়তা বর্ণভেদের একটি অংশ। জাগতিক এবং পারলৌকিক আচার বিশ্বাসকে হিন্দুরা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে মনে করেন। এগুলি হিন্দুর জাতিরক্ষার আবশ্যিক শর্ত বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু একই জাতির মধ্যে স্পৃশ্য – অস্পৃশ্যবোধ, নিম্নবর্গীয়-উচ্চবর্গীয় ধারণা হিন্দুধর্মকে অপাংক্তেয় ও অবজ্ঞার পাত্র করে তুলেছে।

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রই অস্পৃশ্যতার জন্মদাতা। পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্য 'ঋগ্বেদ' ভারতীয় ঋষিদের সৃষ্টি। ঋগ্বেদের উপরিউক্ত 'ঋক'-এ আর্যদের জাতিবিন্যাসের পরিচয় আছে। নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের জন্ম পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে এখানে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, 'ঋগ্বেদ' রচনার সময়কালে আর্যদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য ছিল না। উপরিউক্ত 'ঋক্'টিকে কেউ কেউ পরবর্তী কালের সংযোজন বলে মনে করেন। হতে পারে 'ঋক্'টি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের রচনা, কিন্তু ঋগ্বেদের সময়কালেই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অহংবোধক পৃথকত্বের বীজটি উন্মোচিত হয়েছিল। 'ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র' নিজেদের স্বতন্ত্র শ্রেণি - সংগঠক রূপে চিহ্নিত করেছিল 'ঋগ্বেদ' রচনার সময় পর্বেই। ভারত সংস্কৃতির সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের স্তরে স্তরে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এক দুর্লঙ্ঘ জলধি। ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির গভীরতর উত্তরাধিকার ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের শেকড় ধমনিতে ধমনিতে, শিরায়-উপশিরায় সমস্ত সমাজদেহকে মাকড়শার জালের মতো ঘিরে রেখেছে এই একালেও। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের যে স্বতন্ত্র আত্মপ্রতিষ্ঠা-অহংচেতনা জন্মলাভ করেছিল, তাই ভারতবর্ষের প্রশস্ত উর্বর জলহাওয়ায় পুষ্টিলাভ করেছিল প্রায় সুদীর্ঘ তিন হাজার বছরের লোকায়ত জীবনে। সমগ্র প্রাচীনযুগ- মধ্যযুগ ব্যাপী কালের পূতিগন্ধময় মৃত কঙ্কালটিকে উপহার দিয়েছে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। একই জাতির মধ্যে বর্ণগত এই বিভাজন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দান।স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বোধের ধারণা তো প্রকৃতপক্ষে নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ মানুষকে নমিত রাখার এক নির্মম অপপ্রয়াস। যুগগত এই অবনমন মানুষকে দিয়েছে অমর্যাদা। ভক্তির আত্মতুষ্টিকে হাতিয়ার করেছে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। দেবদেবীকে ব্যবহার করেছে শোষণ এবং ক্ষমতার উপায় রূপে। অস্পৃশ্যতা-বৈদিক যুগে যার সূচনা, তাইই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবত গ্রন্থ এবং স্মৃতি শাস্ত্রে, এককথায় নানা ডালপালায় প্রসারিত হয়ে টইটম্বুর করে ফেলেছিল। কিছু পরিশীলনের প্রয়াস ছিল, কিন্তু তা মূল কেন্দ্রস্থ শক্তির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে নি। বহু শতাব্দী পরে নিম্নবর্গের অধিকারের জায়গাটিকে চিহ্নিত করে দিলেন নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য সমাজের প্রতিনিধি ড. আম্বেদকর।

শূদ্রের উৎপত্তি বিষয়ে ‘ঋগ্বেদ’র প্রায় একই অনুসরণ রয়েছে কৃষ্ণযজুর্বেদ ‘তৈত্তিরীয়-আরণ্যক’ –এ।

“ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীৎ। বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ। পড্যাং শূদ্রো অজায়ত।।”(৮)

এখানে ঋগ্বেদের অনুরূপেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিরাট পুরুষের চরণ থেকেই শূদ্রের সৃষ্টি হয়েছিল। ‘তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ’ – এ উল্লিখিত আছে, দেবতাদের থেকে ‘ব্রাহ্মণ’ এবং অসুরদের থেকে ‘শূদ্র’ জাতির; সৃষ্টি হয়েছে –

“দৈব্যো, বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ আসুর্যো শূদ্রঃ।”(৯)

উক্ত ‘তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ’ – এর অপর একটি ‘ঋক্’ – এ বলা হয়েছে, অসৎ থেকেই শূদ্রের সৃষ্টি হয়েছে –

“অসতো বৈ এষ সম্ভুতো যৎ শূদ্রা।”(১০)

অপরপক্ষে ‘বাজসনেয় সংহিতা’য় উল্লিখিত আছে, প্রজাপতির স্তবের ফলেই বৈশ্য ও শূদ্র জাতির সৃষ্টি হয়েছিল –

“নবদশভিরস্তুবত শূদ্রার্যাবসৃজ্যেতামহোরাত্রে অধিপত্নী আস্তাম্।”(১১)

‘তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ’ – এ সামবেদকে ব্রাহ্মণের প্রসূতি স্বরূপ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর ঋগ্বেদ এবং যজুর্বেদকে যথাক্রমে বৈশ্য ও শূদ্রের জন্মস্থান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির মূলেই রয়েছেন, প্রজাপতি ব্রহ্মা –

“সর্বং হেদং ব্রাহ্মণা হৈব সৃষ্টং ঋগভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ
যজুর্বেদং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্যোনিং সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ।”(১২)

অথর্ববেদের একটি ‘ঋক্’ –এ নিম্নবর্গীয় কিন্তু বিদ্বান ব্রাত্যদের অতিথি স্বরূপ গণ্য করা হয়েছে। এইরূপ ব্রাত্য বিদ্বানদের সম্মান করার কথাও আছে বৈদিক সাহিত্যে। এই সম্মান প্রদানে রাজা বা রাজ্যের কারো মর্যাদাহানি হয় না বলে উল্লিখিত হয়েছে। অথর্ববেদের উক্ত ‘ঋক্’ টিতে উল্লিখিত আছে –

“তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো রাজ্ঞোহতিথিগৃহানাগচ্ছেৎ।
শ্রেয়াংসমেনমাত্মনো মানয়েৎ তথা ক্ষত্রায় না বৃশ্চতে তথা রাষ্ট্রায় না বৃশ্চতে।।
অতো বৈ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং .... তথা বা ইতি।”(১৩)

‘অথর্ব বেদ’ –এর অপর একটি ‘ঋক্’ (ঊনবিংশ কাণ্ড, ষষ্ঠ সূক্ত, ঋক্ - ৩)- এ অগ্নিদেবের কাছে প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে এভাবে - আমাকে দেবতা, রাজা, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রের প্রিয়পাত্র করো –

“প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উত্যর্যে।”(১৪)

এছাড়া ‘তৈত্তিরীয়-আরণ্যক’ –এর অন্য একটি ‘ঋক্’ –এ উচ্চবংশজাত কিন্তু অকর্মণ্য মানুষদের প্রস্থান করার কথা বলা হয়েছে। ঠিক তেমনি কুমারীর সন্তান , কুমারীর

কন্যার সন্তান এবং উপপতির দ্বারা জাত সন্তান – এদেরও প্রস্থান করার কথা উল্লিখিত আছে –

"নৃ মুণন্তু নৃ পাত্বর্যঃ। অকৃষ্টা যে চ কৃষ্টজাঃ।
কুমারীষু কনীনীষু জারিণীষু চ যে হিতাঃ।"[১৫]

'তৈত্তিরীয় – আরণ্যক' –এ শূদ্রদের থেকে দান গ্রহণকে পাপ চিহ্নিত করা হয়েছে। অপর একটি 'ঋক্' – এ শূদ্রদের থেকে ধর্মগ্রহণ এবং অন্নগ্রহণকেও পাপ চিহ্নিত করা হয়েছে। নিম্নোক্ত দুটি 'ঋক্' যথাক্রমে –

(ক) যদন্নমদ্ম্যনৃতেন দেবা দাস্যন্নদাস্যন্নুত বাহকরিষ্যন্ যদ্দেবানাং, চক্ষুষ্যাগো অস্তি যদেব কিংচ প্রতিজগ্রাহমগ্নির্মা তস্মাদনৃণং কৃনোতু।।

(খ) যদন্নমদ্মি বহুধা বিরূপং বাসো হিরণ্যমুত গামজামবিন্।
যদ্দেবানং চক্ষুষ্যাগো অস্তি যদেব কিংচ
প্রতিজগ্রাহমগ্নির্মা তস্মাদনৃণং কৃণোতু।"[১৬]

এছাড়া 'ঐতরেয় আরণ্যক'-এর একটি ঋক –এ ব্রাহ্মণদের তেজ ও যশকে সত্য এবং তপস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে –

"ব্রহ্মণা তেজসা সহ। ক্ষত্রেণ যশসা সহ। সত্যেন
তপসা সহ। তস্য দোহমশীমহি। তস্য সুন্নমশীমহি।"[১৭]

'রামায়ণ'- মহাকাব্য ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পদ। একটি সমগ্র জাতি প্রতিবিম্বিত হয়েছে এই মহাকাব্যের মধ্যে। রামায়ণে ক্ষত্রিয়দের থেকে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বকে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করেছেন মহাকবি। বাল্মীকি লিখেছেন, ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। মহর্ষি মনু ব্রাহ্মণদের সর্বগুণান্বিত মনে করে 'বর্ণাশ্রম' ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন-

"ক্ষত্রিয়া যত্র জায়ন্তে পূর্ব্বেণ তপসান্বিতাঃ।
বীর্য্যেণ তপসা চৈব তেহধিকাঃ পূর্ব্বজন্মনি।

....

অপশ্যন্তস্তু তে সর্ব্বে বিশেষমধিককং ততঃ
স্থাপনং চক্রিরে তত্র চাতুর্ব্বর্ণস্য সঙ্গতম।।"[১৮]

শূদ্রদের সম্পর্কে মহাকবি লিখেছেন, শূদ্ররা ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের সেবায় নিযুক্ত থাকবেন। এই সেবা করাই হল শূদ্রের পরম ধর্ম –

"ত্রেতাযুগে চ বর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ যে।
তপোহতপ্যন্ত তে সর্ব্বে শুশ্রূষামপরে জনাঃ।।
স্বধর্ম্মঃ পরম্পস্তেযাং বৈশ্যশূদ্রং তদাগমৎ।
পূজাঞ্চ সর্ব্ববর্ণানাং শূদ্রাশ্চক্রুর্ব্বিশেষতঃ।।"[১৯]

এমন কি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র শূদ্রদের তপস্যা করার অধিকার দেয় নি। উচ্চবর্গীয় জাতির শুশ্রূষা করা ছাড়া শূদ্ররা কোন কাজ করতে পারতেন না। সত্যযুগে ব্রাহ্মণ, ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়, দ্বাপর যুগে বৈশ্যরা তপস্যা করলেও শূদ্রদের তপস্যা করার কোন অধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কঠিন নিয়ম নীতি থেকে তারা মুক্তি পায় নি –

"ন শূদ্রো লভতে ধর্ম্মং যুগতস্তু নরর্বভ।"[২০]

রামায়ণে নিম্নবর্গীয় শম্বুক তপস্যা করেছিলেন। সেই অপরাধে রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্ররোচনায় তাকে হত্যা করেছিলেন। রামচন্দ্রের কাছে শম্বুক তাঁর জাতিগত পরিচয় গোপন করেন নি। সত্যনিষ্ঠ শম্বুক নিজেকে 'শূদ্র' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন –

"ন মিথ্যাহং বদে রাম দেবলোকজিগীষয়া।
শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শম্বুকং নাম নামতঃ।।
ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড়্গং সুরুচিরপ্রভম্।
নিষ্কষ্য কোশ দ্বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ।।"[২১]

শূদ্রের এমন নির্মম হত্যাকাণ্ডেও ব্রাহ্মণেরা রামচন্দ্রের প্রশংসা করেছেন, পুষ্পবৃষ্টি করেছেন। এমন কি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ব্রাহ্মণ বালকের অকাল অপমৃত্যুতে শূদ্র শম্বুকের তপস্যাকেই দায়ী করেছেন –

"অধর্ম্মঃ পরমো রাজন দ্বাপরে শূদ্রজন্মনঃ।
স বৈ বিষয়পর্য্যন্তে তব রাজন মহাতপা"।।
অদ্য তপতি দুর্ব্বুদ্ধিস্তেন বালবধো হ্যয়ম।"[২২]

এই কি ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম? এমনই কি ছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অনুশাসন? রামচন্দ্র শূদ্র-তপস্বী শম্বুকের অনুসন্ধান করেছেন। তপস্বীকে দেখেছেন, আর এমন নির্মমভাবে শম্বুককে হত্যা করেও প্রশংসা লাভ করেছেন। কৃতার্থ হয়েছেন তিনি।

মহাকবির 'মহাভারতম্' ভারত সংস্কৃতির তপোভূমি। মহাকবি বেদব্যাস মহাভারতের 'বনপর্ব্ব'-এ লিখেছেন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ, যিনি সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ এবং সৎ চরিত্র। আবার শূদ্রের মধ্যেও সত্য, দান, ক্ষমা, সততা, কোমলতা, তপস্যা এবং দয়া আছে। মহাভারতকার লিখেছেন –

"চাতুর্বর্ণ্যং প্রমাণঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্ম চৈব হি।
শূদ্রেষ্বপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ।
আনৃশংস্যমহিংসা চ ঘৃণা চৈব যুধিষ্ঠির।"[২৩]

যুধিষ্ঠিরের মুখ থেকে মহাভারতকার শুনিয়েছেন, শূদ্রের মধ্যে যদি সত্য, দান, ক্ষমা, তপস্যা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে, তবে শূদ্র হলেও তিনি শূদ্র নন। অপরপক্ষে ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি সে লক্ষণ না থাকে, তবে ব্রাহ্মণ হলেও তিনি ব্রাহ্মণ নন –

<u>যুধিষ্ঠির উবাচ</u>

"শূদ্রে চ তত্ত্ববেল্লক্ষ্ম দ্বিজে চেচ্চ ন বিদ্যতে
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ"[২৪]

কিন্তু শূদ্রের উৎপত্তি বিষয়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র একই রকম অভিমত পোষণ করেছেন। 'ঋগ্বেদ' তো বটেই, রামায়ণ মহাভারত, প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্রেও একই রকম অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। যুধিষ্ঠিরকে বায়ুদেবতা বলেছেন – ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ থেকে, ক্ষত্রিয় বাহুদ্বয় হতে আর বৈশ্য উরু হতে জন্মেছেন। অপরপক্ষে, চতুর্থবর্ণ শূদ্র ব্রাহ্মণসহ তিন বর্ণের পরিচর্যার জন্যই ব্রহ্মার পদদ্বয় হতে সৃষ্ট হয়েছে। মহাভারতকার লিখেছেন –

"ব্রহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রাহ্মণো রাজসত্তম!।
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট উরুভ্যাং বৈশ্য এব চ।।
বর্ণানাং পরিচর্য্যার্থং ত্রয়াণাং ভরতর্ষভ!।
বর্ণশ্চতুর্থঃ সম্ভুতঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রো বিনির্ম্মিতঃ।।[(২৫)]

মহাভারতকার ব্রাহ্মণ্য-বিধির বিপর্যাস করেন নি। লিখেছেন , শূদ্রের কাজ অন্য তিন বর্ণের শুশ্রূষা করা –

'শূদ্রো হ্যেতান্ পরিচরেদিতি ব্রহ্মানুশাসনম্।'[(২৬)]

শুধু তাই নয়, মহাভারতকার ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীর সমস্ত দ্রব্যই ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণ আপনার দ্রব্য ভোগ করেন। আপনার বস্ত্র পরিধান করেন এবং আপনার দ্রব্য দান করেন –

"বিপ্রস্য সর্ব্বমেবৈতদ্ যৎ কিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
জ্যেষ্ঠেনাভিজননেহ তদ্ধর্ম্মকুশলা বিদুঃ।।
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
গুরুর্হি সর্ব্ববর্ণানাং জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ বৈ দ্বিজঃ।।"[(২৭)]

মহাভারতে ঋষি ভরদ্বাজ ও ভৃগুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মহাভারতকার শুনিয়েছেন, কর্মের দ্বারাই জাতি নির্ণয় হয়। ব্রাহ্মণ সত্য, দান, দয়া, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম করেন। ক্ষত্রিয় যুদ্ধ ও প্রজাপালনে রত থাকেন, বৈশ্য সম্পদ লাভ, বিনিময় এবং শস্য গ্রহণ করেন। শূদ্র কারা? মহাভারতকার ভৃগুমুনির মুখ থেকে শুনিয়েছেন যে, যারা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্গীয় জাতির অন্ন ভক্ষণ করেন, ব্রাহ্মণ সহ সমস্ত জাতির কর্ম করেন, যারা পবিত্রভাবে থাকেন না, বেদ অধ্যয়ন করেন না, যারা সদাচারী নন, তাদেরই 'শূদ্র' বলা হয় –

"সর্বভক্ষরতির্নিত্যং সর্বকর্ম্মকরোহ শুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ।"[(২৮)]

মহাভারতে উল্লিখিত আছে, কোন ক্ষত্রিয় যথা শক, যবন ও কম্বোজ প্রভৃতি জাতি যদি ব্রাহ্মণকে দেখতে না পান, তাহলেও ঐ সমূহ জাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। মহাভারতকার তাঁর গ্রন্থের 'অনুশাসনপর্ব্ব' – এ লিখেছেন –

"শকা যবনকাম্বোজাস্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ।"[(২৯)]

মহাভারতে আরো বলা হয়েছে, কোন ব্রাহ্মণ যদি কোন শূদ্র রমণীকে গ্রহণ করেন, তবে সেই শূদ্রা অধোগতি প্রাপ্ত হন –

"শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাতধোগতিম্।"[(৩০)]

ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র-রমণীর মিলনে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, সেই সন্তানকে ব্রাহ্মণের ধন থেকে বঞ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। যদি দিতেই হয়, তবে অল্প-সামান্য একভাগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে –

"শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো নিত্যাদেয়ধনঃ স্মৃতঃ।
অল্পং চাপি প্রদাতব্যং শূদ্রাপুত্রায় ভারত!।।"[(৩১)]

এছাড়াও মহাভারতকার লিখেছেন, ব্রাহ্মণীর গর্ভে যদি শূদ্রের সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন, তবে সেই সন্তান চণ্ডাল হয় –

"যথা ব্রাহ্মণচাণ্ডালঃ পূর্ব্বদৃষ্টস্তথৈব সঃ"[(৩২)]

মহাভারতে আরো উল্লিখিত আছে, শূদ্রের পত্নী কেবল শূদ্রাই হয়ে থাকেন। তিনি কেবল শূদ্রপুত্রই প্রসব করেন- 'শূদ্রা শূদ্রস্য চাপ্যেকা শূদ্রমেব প্রজায়তে।'[(৩৩)] শূদ্র ব্রাহ্মণীর গর্ভে 'জল্লাদ' এবং 'চণ্ডাল' পুত্রের জন্ম দেন। যারা সমাজের অধম – "শূদ্রশ্চাণ্ডালমত্যুগ্রং বধ্যঘ্নং বাহ্যবাসিনম্"[(৩৪)] মহাভারতে এদেরই 'অস্পৃশ্য' বা 'অস্পৃশ্যতর' হীনবর্ণরূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে –

"হীনাদ্ধীনাঃ প্রসূয়ন্তে বর্ণাঃ পঞ্চদশৈব তু।"[(৩৫)]

পরগৃহস্থা অনাথা স্ত্রীর গর্ভে অস্পৃশ্যদের অনেক সন্তান সৃষ্টি হয় –

"অগম্যাগমনাচ্চৈব জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
বাহ্যানামনুজায়ন্তে সৈরন্ধ্র্যাং মাগধেষু চ।"[(৩৬)]

মহাভারতকার লিখেছেন, নিষাদ রমণী এবং চণ্ডাল পুরুষের মিলনে যে সন্তান সৃষ্টি হয়, সেই সন্তান শ্মশানে বাস করেন, সেই সন্তান নিকৃষ্ট, নিম্নবর্গীয় হীন জাতিও তাকে নিকৃষ্ট মনে করেন –

"নিষাদী চাপি চাণ্ডালাৎ পুত্রমন্তেবসায়িনম্
শ্মশানগোচরং সূতে বাহ্যৈরপি বহিস্কৃতম্।"[(৩৭)]

এছাড়া মহাভারতে উল্লিখিত আছে, রমণীরা পুরুষদের বিপথগামী করেন। পুরুষদের দোষ উৎপাদন করেন –

'নয়ন্তি হ্যপথং নার্য্যঃ কামক্রোধবশানুগম্'। [(৩৮)]

মহাভারতে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে 'অনার্য' বলা হয়েছে। অনার্য 'অস্পৃশ্য'রা অনেক সময় 'স্পৃশ্য' আর্যদের মতই আচরণ করেন। অনার্য অস্পৃশ্যদের উৎকৃষ্ট আর্যদের থেকে পৃথক করার কথা বলা হয়েছে, তাদের চিনে নেওয়ার উপায় মহাভারতকার নির্দেশ করেছেন। নিকৃষ্ট ব্যক্তির নিকৃষ্ট ভাব দেখেই তাদের চিহ্নিতকরণ করতে হবে। আর সৎ কর্ম দেখে তাদের জন্মগ্রহণের বৃত্তান্ত নিরূপণ করতে হবে –

"যোনিসঙ্কলুষে জাতং নানাভাবসমন্বিতম্

কর্ম্মভিঃ সজ্জনাচীর্ণৈর্ব্বিজ্ঞেয়া যোনিশুদ্ধতা।”[৩৯]

মহাভারতে শূদ্রের 'দাসত্ব'কে উৎপাটিতু করার কথা নেই। ব্রাহ্মণ শূদ্রের সমানাধিকারের কথাও বলেন নি মহাভারতকার। তবুও একস্থানে বেদব্যাস লিখেছেন, মানুষ বয়সে জ্যেষ্ঠ হলেও, তিনি যদি সৎ স্বভাব বর্জিত হন, তবে তাকে মর্যাদা দিতে নেই। অপরপক্ষে শূদ্রও যদি ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন ও সৎ স্বভাব বিশিষ্ট হন, তবে তাকে মর্যাদা দেওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে –

জেষ্ঠমধ্যাবরং সত্ত্বং তুল্যসত্ত্বং প্রমোদতে।
জ্যায়াংসমপি শীলেন বিহীনং নৈব পূজয়েৎ।”[৪০]

সর্বোপরি, মহাভারতে শূদ্রদের 'শুশ্রূষাজীবী' বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। বৈশ্যরা বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবেন, ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য শাসন করবেন এবং ব্রাহ্মণেরা বেদ অধ্যয়ন করে জীবিকা নির্বাহ করবেন। মহাভারতকার লিখেছেন –

“শুশ্রূষাজীবিনঃ শূদ্রা বৈশ্যা বিপণিজীবিনঃ।
অনিষ্টনিগ্রহাঃ ক্ষত্রা বিপ্রাঃ স্বাধ্যায়জীবিনঃ।।”[৪১]

মহাভারতে আরও বলা হয়েছে, শূদ্রদের কাজ 'দাসত্ব' করা। এবং দাসত্বের দ্বারাই তারা শোভিত হন – 'শূদ্রো দাস্যেন শোভতে।'[৪২] শূদ্র অস্থির চিত্ত হবেন না। সংযত চিত্ত হয়েই শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রূষায় রত থাকবেন –

যতাত্মনা তু শূদ্রেণ শুশ্রূষা নিত্যমেব চ।
কর্তব্যা ত্রিষু বর্ণেষু প্রায়েণাশ্রমবাসিষু।”[৪৩]

শূদ্র নিজে কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ হলেও ধর্ম, বুদ্ধি ও শিক্ষা অনুসারে 'সেবা' করবেন –

'অশক্তেন ত্রিবর্গস্য সেব্যা হ্যাশ্রমবাসিনঃ।
যথাশক্যং যথাপ্রজ্ঞং যথাধর্ম্মং যথাশ্রুতম্।”[৪৪]

এছাড়াও শূদ্র সন্ন্যাসীদের আশ্রমে থেকে সন্ন্যাসীদের সেবা করবেন –

“বিশেষেণৈব কর্ত্তব্যা শুশ্রূষা ভিক্ষুকাশ্রমে।
আশ্রমাণান্ত সর্বেষাং চতুর্ণাং ভিক্ষুকাশ্রমম্।
প্রধানমিতি বর্ণ্যন্তে শিষ্টাঃ শাস্ত্রবিনিশ্চয়ে।।”[৪৫]

আর শূদ্র নিজে বিপন্ন হলেও মিষ্টভাষী এবং প্রিয়বাক্য বলবেন। তিনি রাগ, দ্বেষ এবং আলস্য বর্জন করবেন। তিনি ক্ষমাযুক্ত, সৎ এবং সত্যধর্মপরায়ণ হয়ে সন্ন্যাসীদের পরিচর্যা করবেন। শূদ্র শুশ্রূষা করার সময় বিষণ্ণ হবেন না। মহাভারতকার লিখেছেন –

“অসূয়তা ত তস্যেহ ফলং দুঃখদবাপ্যতে।
প্রিয়বাদী জিতক্রোধো বীততন্দ্রীরমৎসরঃ।।
ক্ষমাবান্ শীলসম্পন্নঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
আপদ্ভাবেন কুর্য্যাদ্ধি শুশ্রূষাং ভিক্ষুকাশ্রমে।।

... ...

এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা শূদ্রো বুদ্ধিসমাধিনা।
কুর্য্যাদবিমনা নিত্যং শুশ্রূষা ধর্ম্মমুত্তমম্।”(৪৬)

এছাড়াও মহাভারতে বলা হয়েছে, শূদ্র ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীদের ছাড়া অন্য কাউকে প্রণাম করবেন না। আর শূদ্র ব্রাহ্মণের বেদপাঠে বিঘ্ন ঘটাবেন না। যদি তা করেন, তবে তিনি পাপী হবেন। শুদ্ধ চিত্তে সন্ন্যাসীদের সেবা করলে শূদ্রের মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। শূদ্র কখনো নিজে প্রসাধিত হবেন না। সর্বোপরি মহাভারতকার জানালেন, শূদ্র মৃত্যু পর্যন্ত 'শুশ্রূষাজীবী'রূপে উচ্চবর্গীয় তিন বর্ণের সেবা করবেন। শূদ্রের সেবা একান্তই দাসরূপে। আপন শরীর এবং শ্রমনির্ভর সেই সেবা। সেখানে নতজানু শ্রদ্ধাকেই দাবী করেছে সমকালীন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র।

'পুরাণ' ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নিজস্ব বিচরণ ক্ষেত্র। বৈদিক যুগের কিছুটা খোলা আবহাওয়াকে পুরাণ প্রণেতারা পুরাণ সৃষ্টির কালে রুদ্ধ করে ফেলেছিলেন। আচার-অনুশাসন অলৌকিকতা এবং দেববাদের বেড়ি পরিয়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র প্রভুত্ব-প্রবণ কায়েমি শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। মোটের উপর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র সমাজ বাস্তবতার থেকে অলৌকিকতাকে বেশি আশ্রয় করেছিল। যুগোপযোগী অনিশ্চয়তাকে হাতিয়ার করে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নিজেদের সুবিধাভোগী অবস্থানকে নিশ্চিত নিরাপত্তার ঠিকানা দিয়েছিল। মানুষে মানুষে বিভাজন, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ এবং বিবেক বর্জিত অন্তঃসারশূন্য সমাজ কাঠামোর জন্ম দিয়েছিলেন পুরাণ প্রণেতারা। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বিকাশ বিবৃদ্ধির সুবর্ণ যুগ হল এই পুরাণ সৃষ্টির যুগ। নিম্নবর্গীয় মানুষদের অধিকার হরণই শুধু নয়, মানুষকে 'অন্ত্যজ' 'অস্পৃশ্য' বলে দেগে দিয়েছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। শূদ্রদের উপর নেমে এসেছিল চলমান পৈশাচিকতা। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র যে অমানবিক-ঔদার্যহীন পঙ্কিল পূতিগন্ধময় জঞ্জাল-স্তূপ জমিয়ে তুলেছিল, তাইই সমগ্র সমাজদেহে ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে বহমান থেকেছে একাল পর্যন্ত।

'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ' – অন্যতম প্রধান মহাপুরাণ। মহর্ষি বেদব্যাস এই পুরাণ রচনা করেছেন। 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ'- এ জীবিকা অনুযায়ী বর্ণবিভাগের প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। ত্রেতাযুগে প্রকৃতি ফল, মূল, পুষ্পলতার সম্ভার মানুষকে থালা ভরে উপহার দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে প্রকৃতি দত্ত সেই প্রাচুর্য পর্যাপ্ত ছিল না। সামাজিক ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা সমাজ পরিচালনার প্রয়োজনে বৃত্তি অনুযায়ী মানুষের মর্যাদা স্থাপন করলেন। 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ' অনুযায়ী যারা সর্বভূতে ব্রহ্মের অনুধ্যান করতেন, তারা হলেন ব্রাহ্মণ, যারা প্রজাদের রক্ষা করতেন, তারা হলেন ক্ষত্রিয়, যারা কৃষিকাজের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন, তারা হলেন বৈশ্য, অপরপক্ষে যারা উক্ত তিন জাতির পরিচর্যায় রত থাকতেন, তারা হলেন শূদ্র। ব্রাহ্মণেরা অধ্যাপনা এবং যাজন করতেন। ক্ষত্রিয়ের ছিল বাহুবল, তারা যুদ্ধ করতেন। বৈশ্যরা করতেন বাণিজ্য। আর শূদ্ররা শিল্প ও দাসত্ব বৃত্তি করতেন। পুরাণকার লিখেছেন –

“শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ।

নিস্তেজসোহল্পবীর্য্যাশ্চ শূদ্রাস্তানব্রবীত্তু সঃ
তেষাং কর্ম্মাণি ধর্ম্মাংশ্চ ব্রহ্মা তু ব্যদধাৎ প্রভুঃ।
সংস্থিতৌ প্রাকৃতায়াস্তু চাতুর্ব্বর্ণস্য সর্বশঃ।।

....

যাজনাধ্যাপনঞ্চৈব তৃতীয়ঞ্চ প্রতিগৃহম্।
ব্রাহ্মণানাং বিভুস্তেষাং কর্ম্মাণ্যেতান্যথাদিশৎ।।
পাশুপাল্যং বাণিজ্যঞ্চ কৃষিঞ্চৈব বিশাং দদৌ
শিল্পাজীবং ভূতিঞ্চৈব শূদ্রাণাং ব্যদধাৎ প্রভুঃ।।[৪৭]

'পদ্মপুরাণম্' – অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম। আদি পুরাণের 'সৃষ্টিখণ্ড'-এ শূদ্রদের অস্পৃশ্য থেকে অস্পৃশ্যতর করে দেখানো হয়েছে। পুরাণকার লিখেছেন, হীন শূদ্রকে দান করলে কুল বিনষ্ট হয়। শূদ্রদের 'পাষণ্ড' বলে উল্লেখ করেছেন পুরাণকার। শূদ্র বা পাষণ্ড পরিবৃত্ত গ্রামে বসবাস করা ঠিক নয় –

"আশ্রোত্রিয়েষু বৈ দানং বৃষলেষু তথৈব চ।
বিহিতাচারহীনেষু ক্ষিপ্রং নশ্যতি বৈ কুলম্।।
অধার্ম্মিকৈর্বৃতে গ্রামে ন ব্যাধিবহুলে বসেৎ।
শূদ্ররাজ্যে চ ন বসেন্ন পাষণ্ডজনৈর্বৃতে।।[৪৮]

এছাড়াও পুরাণকার লিখেছেন, শূদ্রকে জ্ঞান দান করবেন না। পায়স, দধি, ঘৃত, মধু, প্রসাদ, কৃষ্ণজিন প্রভৃতি দেবেন না। এমন কি শূদ্রকে ব্রত বা ধর্ম উপদেশ দিতেও মানা করা হয়েছে -

"ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ কৃসরৎ পায়সং দধি।
নোচ্ছিষ্টং বা মধু ঘৃতং ন চ কৃষ্ণাজিনং হবিঃ।।
ন চৈবাস্মৈ ব্রতং ব্রয়ান্ন চ ধর্ম্মং বদেদ্‌বুধঃ।"[৪৯]

অধার্মিক শূদ্রদের সঙ্গে পথ চলতেও নিষেধ করেছেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রপুষ্ট পুরাণকার –

"নৈকোহধ্বানং প্রপদ্যেত নাধার্ম্মিকজনৈঃ সহ।
ন ব্যাধিদূষিতৈর্বাপিন ন শূদ্রৈঃ পতিতেন বা।"[৫০]

উক্ত পুরাণের ২৮ অধ্যায়ের সূচনায় পুরাণকার লিখেছেন, ব্রাহ্মণ কখনো শূদ্রের অন্ন ভক্ষণ করবেন না। শূদ্রের অন্ন ভোজন করলে ব্রাহ্মণ 'শূদ্রযোনি' প্রাপ্ত হন। ছয় মাস পর্যন্ত শূদ্রের অন্ন ভোজন করলে ব্রাহ্মণ শূদ্র হয়ে যান । এমন কি মৃত্যুর পরে উক্ত ব্রাহ্মণ কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন –

"নাদ্যাচ্ছুদস্য বিপ্রোহন্নং মোহাদ্বা যদি কামতঃ।
স শূদ্রযোনিং ব্রজতি যস্তু ভুঙক্তে ত্বনাপদি।।
ষন্মাযান যো দ্বিজো ভুঙক্তে শূদ্রস্যান্নং বিগর্হিতম।
জীবন্নেব ভবেচ্ছুদ্রো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে"।।[৫১]

বৃত্তিগ্রহণের বিষয়ে 'শ্রীমদ্ভাগবত' – গ্রন্থে ব্রাহ্মণকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। সমস্ত স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'শ্রীমদ্ভাগবত' – এর সপ্তম স্কন্ধের **১১** অধ্যায়ের **১৫** সংখ্যক শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, বৈশ্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্রাহ্মণদের আদেশ পালন করা। বৈশ্যরা কৃষিকাজ, বাণিজ্য প্রভৃতির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করবেন। অপরপক্ষে শূদ্রদের একমাত্র কর্তব্য হল, উচ্চ-বর্ণের সেবার মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করা –

"বৈশ্যস্তু বার্তাবৃত্তিঃ স্যান্ নিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ।
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা বৃত্তিশ্চ স্বামিনো ভবেৎ।"(৫২)

'শ্রীমদ্ভাগবত' –এ ব্রাহ্মণদের শূদ্রদের (অবিপ্রাৎ) থেকে দান গ্রহণে নিষেধ করা হয়েছে – 'রাজ্ঞো বৃত্তিঃ প্রজাগোপ্তুরবিপ্রাদ্ বা করাদিভিঃ'(৫৩) ব্রাহ্মণের বৃত্তিকে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণের বৃত্তি হল বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। শূদ্ররা সেই বৃত্তি অবলম্বন করতে পারেন না।

জঘন্যো নোত্তমাং বৃত্তিমনাপদি ভজেন্নরঃ।
ঋতে রাজন্যমাপৎসু সর্বেষামপি সর্বশঃ।।(৫৪)

'শ্রীমদ্ভাগবত'- এর ৭ম স্কন্ধের ২৪ সংখ্যক শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে, শূদ্র প্রভুর সেবা করবেন, কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণের কোন অধিকার নেই তার –

"শূদ্রস্য সন্নতি শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্।।"(৫৫)

গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, আমি গুণ এবং কর্মবিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি। যারা সত্ত্বপ্রধান তারা ব্রাহ্মণ, যারা রজোগুণ প্রধান তারা ক্ষত্রিয়, যারা গুণীভূত তারা বৈশ্য, আর যারা তমগুণপ্রধান তারা হলেন শূদ্র। শূদ্রদের জন্য 'শুশ্রূষা' কাজ নির্দিষ্ট হয়েছে –

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্।।(৫৬)

গীতায় ভগবান কৃষ্ণ শূদ্রদের হীন জাতি বলে চিহ্নিত করেছেন। গীতায় ভগবান কৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন, হীন যোনিজাত জীবগণ যদি আমার (ভগবান কৃষ্ণের) উপাসনা করেন, তবে তারাও পরম গতি প্রাপ্ত হন। হীন 'যোনিজাত' অর্থাৎ 'উৎপত্তি' দোষে দুষ্ট অন্ত্যজ শূদ্র সম্প্রদায়। জন্মকারণে এবং বেদ অধ্যয়ন না করায়, তারা দুরাচার ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন হন। এরাও কৃষ্ণসেবায় মুক্তিলাভ করতে পারেন –

"মং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্।।"(৫৭)

হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রত ব্যবস্থা, বিবাহ বিধি, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান, শৌচ-অশৌচ ব্যবস্থা, প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা, পুণ্যকর্ম, হিন্দুর পূজা-পার্বণ প্রভৃতি দৈনন্দিন হাজারো জীবন চর্যায় নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের পদে পদে বিবিধ নিয়ম নিগড়ের শৃঙ্খল পরানো হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র

অন্ত্যজ শূদ্রদের অস্পৃশ্য করে দূরে সরিয়ে রেখেছে। উদাহরণ স্বরূপ মৃত্যু ও অশৌচ পালনের নিয়মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। বিভিন্ন ঋষি বিভিন্ন রকম প্রতিকার-ব্যবস্থা জানালেও, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শূদ্রদের ক্ষেত্রে নেমে এসেছিল সামাজিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য তাঁর 'স্মৃতিচিন্তামণিঃ'- গ্রন্থের 'অশৌচপরিচ্ছেদঃ'- অধ্যায়ে 'শুদ্ধিতত্ত্ব বচন' উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত বচনে উল্লিখিত হয়েছে –

ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যু হলে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়, অপরপক্ষে ঐ একই বয়সে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বালকের মৃত্যু হলে যথাক্রমে ৬ দিন, ৯ দিন, এবং ১২ দিন অশৌচ হবে –

"ত্রিরাত্রং যত্রবিপ্রাণামশৌচং সম্প্রদৃশ্যতে।
তত্র শূদ্রে দ্বাদশাহঃ ষণ্ণব ক্ষত্রবৈশ্যয়োঃ।।"[৫৮]

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রম্' প্রাচীন ভারতীয় অর্থশাস্ত্র, সমাজবিদ্যা এবং রাজনৈতিক দর্শনের প্রামাণিক গ্রন্থ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিজয় বৈজয়ন্তীর মহত্তম রূপ কৌটিল্যের উক্ত গ্রন্থ। 'দাস' এবং 'শূদ্র'দের অবস্থান নির্ণয় করেছেন লেখক। সে যুগে 'শূদ্র' এবং 'দাস' প্রায় সমার্থক ছিল। শূদ্রদের বাধ্যতামূলক দাসত্ববৃত্তি করানো হত। যদিও কৌটিল্য স্বেচ্ছায় 'দাসত্ব' স্বীকারের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সংগঠিত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে কঠিন নিয়ম নিগড়ে নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের ইচ্ছা অনিচ্ছার যে কোন মূল্য থাকে না, তা তো খুব স্বাভাবিক। কৌটিল্য লিখেছেন, যে কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় একবার দাসত্ব স্বীকার করেন, পরে ঐ ব্যক্তি যদি একবার পলায়ন করেন – তবে তাকে চিরজীবনের জন্য দাসত্ব করতে হবে –

"সকৃদাত্মাধাতা নিষ্পতিতঃ সীদেত্। দ্বিরন্যেনাহিতকঃ সকৃদুভৌ পরবিষয়াভিমুখৌ।
বিত্তাপহারিণো বা দাসস্যার্যভাবমপহরতোহর্ধদণ্ডঃ। নিষ্পতিত
প্রেতব্যসনিনামাধাতা মূল্যং ভজেত।"[৫৯]

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে শূদ্রদের জীবিকারূপে উচ্চবর্গীয় তিন জাতির সেবা, কৃষিকাজ, পশুপালন এবং বিভিন্ন প্রকারের কারুশিল্পের কথা বলেছেন "শূদ্রস্য দ্বিজাতিশুশ্রূষা বার্তা কারুকুশীলবকর্ম চ"।[৬০] আর অন্ত্যজ শূদ্র ছাড়া নিম্নবর্গীয় চণ্ডাল, কিরাত প্রভৃতি জাতি বন্য জাতীয় এবং ম্লেচ্ছ জাতি বলে বিবেচিত হত। সাধারণত গ্রামের জনহীন প্রান্তসীমায় এরা বসবাস করতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে দাসত্ব প্রথার ইতিবৃত্ত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকেই বোঝা যায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন আচার্য মনুর 'মনুসংহিতা'। এমন কি, বাল্মীকির রামায়ণেও আচার্য মনুর অনুশাসনের উল্লেখ আছে। জাতি-বৃত্তি-সম্প্রদায় অনুসারী সমাজ বিন্যাস ব্যবস্থা- এক কথায় 'বর্ণাশ্রম' ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন যে মনুর অনুশাসনের ফলশ্রুতি তা

মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর 'রামায়ণম্' – গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৬১] 'ঋগ্বেদ' – এর ২ মণ্ডলের ৩৩ সূক্তের ১৩ সংখ্যক 'ঋক্'- এ উল্লিখিত আছে, আমাদের পিতা মনু আমাদের জন্য সুখপ্রদ ঔষধ মনোনীত করেছিলেন – 'যানি মনুরবৃণীতা পিতা নস্তা শঞ্চ যোশ্চ রুদ্রস্য রশ্মি।'[৬২] এছাড়া 'ঋগ্বেদ' – এর ৮ মণ্ডলের ৩০ সূক্তের ২ সংখ্যক ঋক ও ৩ সংখ্যক ঋক্, ১০ মণ্ডলের ৩৬ সূক্তের ১০ সংখ্যক ঋক্ এবং ৬৫ সূক্তের ১৪ সংখ্যক ঋক্ - প্রভৃতি মন্ত্রে আচার্য মনুর উল্লেখ রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পিতা মনুর আদর্শায়িত পথের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। স্বভাবতই একটি তর্ককণ্টকিত প্রশ্ন উঠে আসে যে 'ঋগ্বেদ' বা 'রামায়ণ' এ উল্লিখিত মনু যদি 'মনুসংহিতা'র স্রষ্টা হন, তাহলে ঋগ্বেদের কালেই জাতিভেদ প্রথার প্রচলন ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও শূদ্রের জীবনকেও এতখানি অভিশপ্ত হতে দেখা যায় নি। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় আচার্য মনু শূদ্রদের জন্য সহস্র শতাব্দী ব্যাপী গভীর অস্পৃশ্য –ঘৃণিত ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছেন। অমানব – বিবেকহীন-উপল ব্যথিত মনুর এমন অনুশাসন। মনু অন্ত্যজ শূদ্রদের জন্য যেভাবে গভীর ঘৃণার শেকল পরিয়েছেন, সেই জাতির গভীর কলঙ্ক সদৃশ লজ্জা প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক যুগ পেরিয়ে – নানারূপে, নানা ছদ্ম ছলনায় ভারতীয় জাতিকে কতদিন বহন করতে হবে কে জানে? মনু নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের মানুষের মর্যাদা দিতেই রাজি ছিলেন না। তাঁর অনুশাসনে অচ্ছুৎ শূদ্রদের প্রতি ঘৃণার পরিমাপ করা যাবে না। তাঁর শোষণ নির্দেশনার পরিমাপও অনির্ণেয়। তিনিই ছিলেন অস্পৃশ্যতার পুরোহিত। প্রাচীন ভারতবর্ষে সব ব্রাহ্মণ –ঋষিদের ছিল এক 'রা'। সমগ্র ভারতবর্ষের আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী প্রসারিত হয়েছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে তাদের ঘোষণা ছিল, শূদ্ররা অপর তিন জাতির সেবক। বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের। মনু বলেছেন - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির মানুষকে অসূয়াবর্জিত ভাবে (নিন্দাহীনভাবে) সেবা করাই শূদ্রের প্রধান কাজ। শূদ্র নিজেকে কৃতার্থ মনে করবেন ব্রাহ্মণের সেবার জন্য –

"একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া।"[৬৩]

মনু শূদ্রকে অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য এবং নীচ জাতি বলে উল্লেখ করেছেন। মূলত শূদ্রের কাজ হচ্ছে ব্রাহ্মণ সেবা।

"বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম কীর্ত্যতে।"[৬৪]

কোন শ্লোকে (২ অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা ৩১) শূদ্রকে 'দীন' 'শবরক', 'কৃপণক' বলে উল্লেখ করেছেন মহর্ষি মনু। কোন শ্লোকে আচার্য বলেছেন, শূদ্রের জন্যই ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধ কাজ নষ্ট হয়ে যায়। শূদ্রের কোন অধিকার নেই বেদ অধ্যয়ন করার। এমন কি, সাধারণ মানুষকেও শূদ্রের অন্ন খেতে নিষেধ করেছেন আচার্য মনু (অধ্যায় ৪, শ্লোক ২১১)। মহর্ষি তাঁর সংহিতায় শূদ্রকে 'দাস' রূপে চিহ্নিত করেছেন। বলেছেন, দ্বিজাতির দাসত্ব করাই শূদ্রের কাজ – 'দাস্যং শূদ্রং দ্বিজস্মনাম।'[৬৫] লিখেছেন, শূদ্রের সাধনা হল সেবা – 'তপঃ শূদ্রস্য সেবনম'[৬৬] অন্য কেউ নন, শূদ্রই হবেন 'দাস'। মহর্ষি তাঁর

সংহিতায় সাত প্রকার দাসের উল্লেখ করেছেন। এরা হলেন যথাক্রমে- ধ্বজাহৃত, (যুদ্ধে পরাজিত শত্রু), ভক্তদাস (ভাত খাওয়ার আশায় দাসবৃত্তি), গর্ভদাস (বাড়ীর দাসীর সন্তান), ক্রীতদাস (প্রভুর কাছ থেকে মূল্য দিয়ে কেনা দাস), দত্রিম দাস (প্রভু যখন পুণ্য অর্জনের জন্য নিজের দাসকে অন্য ব্যক্তিকে দান করেন), পৈত্রিক দাস (পারিবারিক বংশ পরম্পরায় দাসবৃত্তি), দণ্ডদাস (রাজদণ্ড দিতে অপারগ দাস)। মহর্ষি মনু লিখেছেন –

"ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ
পৈত্রিকো দণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাসযোনয়ঃ"(৬৭)

এমন কি মহর্ষি তাঁর সংহিতায় লিখেছেন, ব্রাহ্মণ মনিব তাঁর দাসদের সমস্ত সম্পদ গ্রহণ করবেন --

"বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যোপ্রদানমাচরেৎ
ন হি তস্যান্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্তৃহার্যধনো হি সঃ"(৬৮)

এইভাবে শূদ্রের সমস্ত ধনসম্পদ ব্রাহ্মণ ছলে বলে কৌশলে সহজ কথায় প্রতারিত করে নিয়ে নিতেন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নিম্নবর্গীয়দের 'দস্যু' নামে চিহ্নিত করেছে। শুধু ব্রাহ্মণ নন, রাজা (মহীপতিঃ) প্রয়োজন মতো মাসে মাসে শূদ্রকে বিভিন্ন কাজ করিয়ে নিতেন (অধ্যায়-৭, শ্লোক -১৩৮)। মহর্ষি মনু শূদ্রের উপরে যেন অগ্নিস্রাবী অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে, শূদ্র কোনদিনই দাসত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না। এমনকি শূদ্র – মনিব মুক্তি দিলেও নয়। কেননা, শূদ্র 'দাস' হয়েই জন্মগ্রহণ করে। দাসত্ব শূদ্রের জন্মবন্ধন-যুক্ত আবদ্ধ কর্ম। মহর্ষি মনু লিখেছেন –

"ন স্বামিনা নিসৃষ্টোহপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তত্তস্য কস্তস্মাত্তদপোহতি।।"(৬৯)

হিন্দুশাস্ত্রের ব্রাহ্মণ প্রতিনিধিদের মতই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পুরোধা নিয়ামক আচার্য – মহর্ষি মনু ঘোষণা করলেন শূদ্রের জন্ম বৃত্তান্ত। লিখলেন, প্রজাপতি ব্রহ্মা আপন মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পদদ্বয় থেকে শূদ্রকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং বৈশ্যের কাজ হল কেবল ভৃত্যরূপে সেবা –

"লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহুরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ।।"(৭০)

।। তিন ।।

শূদ্র – অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য এরা। হয়ে রইলেন 'অচ্ছুৎ' ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দাক্ষিণ্যে 'আর্যসমাজ' নাম চিহ্নিত হল। সেই সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের প্রবেশাধিকার থাকল। থাকল না শুধু শূদ্রদের। কুল-পরিচয়হীন, আভিজাত্যহীন, মর্যাদাহীন, শিক্ষা দীক্ষাহীন শূদ্রদের শেকল ছাড়া হারাবার কিছুই ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে দাসত্ব ভার, লজ্জা ও গ্লানি বহন করতে হয়েছে এদের। সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের

ধমনিতে ধমনিতে প্রশাখা বিস্তার করেছিল ‘ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র’। সহজ কথায়, ‘ব্রাহ্মণ্যবাদ’ নামে যা চিহ্নিত। মন্ত্র গুণীদের মত বেদোক্ত মন্ত্র ঋষিরাই হলেন ব্রাহ্মণ, যারা ব্রহ্মকে জানেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে এই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী ঋষিরা এত প্রতিশ্রুতমান ছিলেন যে, তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিয়ে কোন সংশয় ছিল না। সেই পরবর্তীকাল, ভারতবর্ষের উচ্চবর্গীয় হিন্দু সমাজের গড়ন হয়ে উঠল আর্য ঋষিকুলের গোত্র পরিচয় নির্ভর। যারা জন্ম দিয়েছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র হয়ে উঠল একটা সিস্টেম, একটা অনুশাসন। ঋষিদের পরিচয়েই ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠীর গোত্র পরিচয় বিনির্মিত হল। পরবর্তীকালে কোন ব্রাহ্মণের ব্যক্তি পরিচয় অনুসন্ধান করতে হলে, সেই ঋষির সমূহ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হয়ে ওঠে। আজকের ভারতীয় ব্রাহ্মণের আদি পুরুষ এঁরা। গবেষকদের মতে, বৌধায়ন সূত্রে উল্লিখিত সাত জন ঋষি হলেন আদি গোত্র নামাঙ্কিত, ব্রাহ্মণদের অগ্রজ জনক। এই ঋষিরা হলেন যথাক্রমে বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, অত্রি, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ। এই ঋষিরাই হলেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আদি পুরুষ। কুলজ্ঞাপক সামাজিক খ্যাতি প্রতিপত্তি তাঁদের ছিল। বিবাহের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির পোষক ঋষিগণ নিজেদের সুরক্ষার প্রয়োজনে বংশানুসারী গোত্র চিহ্নিত করে ভিন্ন গোত্রে বিবাহ স্থির করলেন। এক এক গোত্রের প্রধান প্রধান ঋষিদের নিয়ে গঠিত হল প্রবর। সুতরাং সমগোত্র এবং সমপ্রবরে বিবাহ নিষিদ্ধ। এর অন্যথা হলে ব্রাহ্মণ সমাজ পরিত্যক্ত হতেন। প্রাচীন ঋষি আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্র অনুযায়ী গোত্র প্রবরের তালিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন মূল ঋষি ভৃগু। ভৃগু ঋষির গোত্রে জমদগ্নি, বৎস প্রভৃতি ষোলজন ঋষির নাম উল্লিখিত আছে। আবার জমদগ্নি, বৎস এই দুই ঋষিকে অবলম্বন করে পাঁচটি প্রবর উল্লিখিত। ভার্গব, চ্যবন প্রভৃতি পাঁচটি প্রবরের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। উক্ত ঋষিগণ আবার শ্রৌতসূত্র অনুযায়ী ভৃগু, গোতম, ভরদ্বাজ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, কশ্যপ, বশিষ্ঠ(১), বশিষ্ঠ(২), অগস্ত – এই মূল ঋষিদের নামাঙ্কিত গোত্রে উল্লিখিত হচ্ছেন। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে এরকম প্রায় দু'শ গোত্রের সন্ধান মেলে। বাংলার ব্রাহ্মণ কুলে গোত্র প্রবর সেভাবে সংরক্ষিত নয়, তা মান্যতা প্রাপ্তও ওঠে নি। বরং বেদ আশ্রয়ী গোত্র প্রবরের শাখা-উপশাখাকে ভিত্তি করেই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিকাশ বিবর্তন। ব্রাহ্মণেরা প্রথম বঙ্গ গমন করেন বাংলাদেশে (গৌড়) বলে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন। বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে চার হাজার বা পাঁচ হাজার বছর ধরে ব্রাহ্মণেরা বসবাস করছেন বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় হল, নিজেদের মধ্যে সামান্য মতান্তর থাকলেও তা সামাজিক ক্ষেত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করে নি। এরা সকলেই এক হয়ে ওঠেন। অস্পৃশ্য শূদ্রদের থেকে দূরে থাকা এবং শূদ্র নিপীড়ন যেন এদের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু নিজেদের সুরক্ষা এবং স্বার্থরক্ষার বিষয়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র একেবারেই এককাট্টা। আর শূদ্রদের অবমাননা, ঘৃণা এবং অস্পৃশ্য করে রাখার বিষয়ে ব্রাহ্মণ্য প্রতিনিধিরা সকলেই ছিলেন অনুদার। সকলেই একই মতাবলম্বী। দেশের বৃহত্তম অংশকে নির্জিত লাঞ্ছিত এবং শোষিত করে কোন

জাতি কখনো বড় হতে পারে না। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র শূদ্র নিপীড়নের নিয়ন্তা হয়ে উঠেছিল। এদেশে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এক অভিশাপ।

'মৎস্যপুরাণম্'- গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, ভগবান বিষ্ণু মৎস্য রূপ ধারণ করেছিলেন। পৃথিবীকে প্রলয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই ভগবানের এমন রূপ পরিগ্রহণ। মৎস্যরূপ ধারণ করে ভগবান কৃষ্ণ পুরাণ কীর্তন করেছিলেন। প্রাচীন ঋষিগণ সেই পুরাণকেই বলেছেন 'মৎস্যপুরাণ'। অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে এই পুরাণে ঋষিদের বংশ, গোত্র, প্রবর, বংশানুচরিত সমন্বিত লতিকার পরিচয় দিয়েছেন ভগবান মধুসূদন। মৎস্যের মুখ থেকে তিনি (বিষ্ণু) শুনিয়েছেন, ব্রহ্মার অঙ্গ উপাঙ্গ থেকে বেদের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে পুরাণ ব্রহ্মার দ্বারা স্মৃত হয়েছে। ব্রহ্মা প্রজাকাম হয়ে প্রজা সৃষ্টি করেন। এরাই হলেন তাঁর 'মানস পুত্র'। এই মানসপুত্রদের মধ্যে প্রথমে মরীচি, তারপর অত্রি, ক্রমান্বয়ে পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং শেষে নারদ জন্মগ্রহণ করেন। আর ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ থেকে প্রজাপতি দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়া 'অঙ্গজা' নামে তাঁর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। 'মৎস্যপুরাণ' – এ উল্লিখিত রয়েছে –

"বেদাভ্যাসরতস্যাস্য প্রজাকামস্য মানসাঃ।
মনসঃ পূর্ব্বসৃষ্টা বৈ জাতা যৎ তেন মানসাঃ।।
মরীচিরভবৎ পূর্ব্বং ততোহত্রির্ভগবানৃষিঃ।
অঙ্গিরাশ্চাভবৎ পশ্চাৎ পুলস্ত্যস্তদনন্তরম্।।
ততঃ পুলহনামা বৈ ততঃ ক্রতুরজায়ত।
প্রচেতাশ্চ ততঃ পুত্রো বশিষ্ঠশ্চাভবৎ পুনঃ।।
পুত্রো ভৃগুরভুৎ তদ্বন্নারদোহপ্যচিরাদভূৎ।
দশেমান মানসান্ ব্রহ্মা মুনীন্ পুত্রানজীজনৎ।
শারীরানথ বক্ষ্যামি মাতৃহীনান্ প্রজাপতেঃ।
অঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষিণাদ্দক্ষঃ প্রজাপতিরজায়ত।।[৭১]

এছাড়া 'মৎস্যপুরাণ'-এ মৎস্যরূপী ভগবান বিষ্ণুর নিকট ঋষিগণের নাম, গোত্র, বংশ বিবরণ এবং প্রবর সমূহের সাম্য-অসাম্য প্রভৃতি শোনার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। ভগবান শুনিয়েছেন, অগ্নি থেকে ঋষিদের জন্ম হয়। প্রথমে ভৃগু, তারপর অঙ্গার থেকে অঙ্গিরা, অর্চ্চিঃ (শিখা) থেকে অত্রি, মরীচি (কিরণ) থেকে মহাতাপস মরীচি, কেশভাগ থেকে মহাতপাঃ পুলস্ত্য, কেশের লম্বিত অংশ থেকে পুলহ, আর অগ্নির সারভাগ (বসু) থেকে মহর্ষি বসিষ্ঠের সৃষ্টি হয়েছে। 'মৎস্যপুরাণ' –গ্রন্থে উল্লিখিত আছে

<u>মনুরুবাচ</u>

"ঋষীণাং নাম –গোত্রাণি বংশাবতরণং তথা।
প্রবরাণাং তথা সাম্যমসাম্যং বিস্তরাদ্বদ।।"

মৎস্য উবাচ

তজ্জুহাব ততো ব্রহ্মা ততো জাতা হুতাশনাৎ।
ততো জাতো মহাতেজা ভৃগুশ্চ তপসাং নিধিঃ।।
অঙ্গারের্ষ্বঙ্গরা জাতো হ্যর্চ্চির্ভ্যোহত্রিস্তথৈব চ।
মরীচিভ্যো মরীচিন্ত ততো জাতো মহাতপাঃ।।
কেশস্ত কপিশো জাতঃ পুলস্ত্যশ্চ মহাতপাঃ।
কেশৈঃ প্রলম্বৈঃ পুলহস্ততো জাতো মহাতপাঃ।
বসুমধ্যাৎ সমুৎপন্নো বসিষ্ঠস্ত তপোধনঃ।।”(৭২)

এরপরই মৎস্যরূপী ভগবান বিষ্ণু মৎস্যপুরাণের অনেক অধ্যায় জুড়ে ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি প্রভৃতি ঋষি বংশের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। আর্য ঋষিদের গোত্র, প্রবর প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার সঙ্গে নাম এবং বংশের মহিমা কীর্তন করেছেন। একথা ঠিক, ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণ সমকালে সমাজ খ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ধীরে ধীরে সমাজ পরিচালনার শক্তি অর্জন করেছিল। যুগগত অনিশ্চয়তা এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন সামাজিক পরিবেশকে তারা ব্যবহার করেছিল। নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সামাজিক অমানব-অনুশাসন মানতে বাধ্য করেছিলেন। দেববাদ এবং অলৌকিকতাকে হাতিয়ার করেছিলেন তাঁরা। ভক্তির পদতলে নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের বিবেক বাঁধা পড়ল। শূদ্রের সহস্র শতাব্দী ব্যাপী ক্রন্দন পুরাণ গ্রন্থের মহতী ব্রাহ্মণ্য প্রশস্তিতে ঢাকা পড়ল। ধর্মের নিশান উড়িয়ে নিম্নবর্গীয় শূদ্রদের অধিকারকে এভাবেই পিষে দেওয়া হল।

।। চার ।।

শূদ্ররা আজও সমাজের প্রান্তিক স্তরে থেকে গেছে। তারা সেখান থেকে উঠে এসে আর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সঙ্গে একই পংক্তি ভোজে সমাজে সমান মর্যাদা লাভ করতে পারেন নি। এই বাংলাদেশেও তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। যেহেতু বিদ্যাবলকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা একান্ত নিজস্ব বলে মনে করতেন, সেহেতু কোন শাস্ত্রগ্রন্থই তাদের প্রকৃত মানুষরূপে বিবেচনা করার মত কিছু খুঁজে পায়নি। সে অবকাশও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনকালে বিদেশী ইংরেজ পণ্ডিতেরাও দেখেছিলেন জাত-পাত অস্পৃশ্যতা দীর্ণ বাংলাদেশকে। তাদের গবেষণায় ধরা পড়েছিল অপাংক্তেয় শূদ্রদের নিষ্করুণ সামাজিক দুর্দশার ছবি। বাংলার নিম্নবর্গীয় শূদ্র সম্প্রদায়ের জাতিতত্ত্বের প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ করেছেন H.H.Risley তাঁর “The Tribes and Castes of Bengal গ্রন্থে। Risley সাহেব তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন –“The division of the people into four classes corresponding roughly to the chief professions or modes of life of the time is in itself plausible enough, and is supported by parallel cases in the history of encient societies.”(৭৩) Risley (1851-1911) সাহেব উক্ত গ্রন্থ লেখার সময়কালেই লক্ষ করেছিলেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ছিল ‘Kulin class.’ লেখক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে উচ্চবর্গীয় বলে চিহ্নিত করেছেন –“Three upper

classes – Brahmans, Kshatriyas and Vaisyas."[৭৪] তিনি লিখেছেন, ভারতীয় সমাজে শূদ্র ছাড়া অন্য তিন বর্ণ প্রতিপত্তি লাভ করেছে। আর শূদ্ররা থেকে গেছেন অবহেলিত। Risley সাহেব তাঁর গ্রন্থে আরো লিখেছেন – "The Sudras alone have no compact aggregate as their modern representative."[৭৫] এই শূদ্র সম্প্রদায় কারা? কেমন আছেন এরা? বাংলার হাঁড়ি, ডোম, মুচি, মেথর, কামার, কুমোর, তেলি – এই নিম্নবর্গীয় ব্রাত্য মানুষেরা হলেন শূদ্র। না – এরা ভাল নেই। শিক্ষা, চাকরী, বিচার- শাসন-রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনার সিংহভাগই থেকে গেছে মুষ্টিমেয় উচ্চবর্গীয় মানুষের দখলে। জনসংখ্যার কয়েক শতাংশ মাত্র এঁরা। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিনিধিদের হাতেই রাষ্ট্র ক্ষমতার মূল চাবিকাঠি। সমাজতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান এবং জাতিতত্ত্বের মাধ্যমে Risley সাহেব উঁচু এবং নিচু- এই দুই বর্গের মানুষদের অসমান জমিন ফারাক লক্ষ করেছিলেন। ভারতীয় সমাজক্ষেত্রে আজও মেহুল চোক্সি এবং নীরব মোদীদের স্বচ্ছন্দ পদচারণা। R.V.Russell তাঁর 'The Tribes and Castes of The Central Provinces of India, vol. 1' –গ্রন্থে লিখেছেন -"Let the Three first classes (Brahmans, Kshatriyas and Vaishyas) invariably dwell in the above-mentioned countries; but a Sudra distressed for subsistence may sojourn wherever he chooses. ..... Here it appears that the Sudra is identified with the sweeper or scavenger."[৭৬]

গান্ধি এবং আম্বেদকর এ প্রসঙ্গেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। একজন (গান্ধি) উত্তরাধিকার সূত্রে বিশেষত পরিবেশ – পরিপার্শ্ব এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যে জাতিভেদকে আশ্রয় করেই বড় হয়ে উঠেছিলেন। পরিশীলিত জীবন এবং সত্যব্রত তাঁকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। অপরজন (ড.আম্বেদকর) জন্ম সূত্রেই শূদ্র। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন অবজ্ঞা ও ঘৃণা। এমন কি শিক্ষিত সহকর্মীরাও তাকে স্পর্শ করতে চাইতেন না, তাঁর চেয়ারের পাশে বসতেন না। সেই ড. আম্বেদকর – অন্ত্যজ তিনি – অস্পৃশ্য তিনি। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিষ চক্ষু থেকে অচ্ছুৎ শূদ্রদের তিনি মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। পারলেন কই? শূদ্ররা আজও রয়েছে বহু শতাব্দী ব্যাপ্ত ঘনায়মান অন্ধকারাচ্ছন্ন কুজ্ঝটিকা আবৃত কারাপ্রদেশে। কি অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক সবক্ষেত্রেই।

আজও ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তরে নিয়ত ঘটে যায় শূদ্র হত্যা। উচ্চবর্গীয় 'ঠাকুর' যুথবদ্ধভাবে হত্যা করে নিম্নবর্গীয় শূদ্র সম্প্রদায়কে। শূদ্র রমণীও ছাড় পান না। বীর সৈনিক, নাকি রণবীর তা বোঝারই উপায় নেই। এ কোন ব্রাহ্মণ্য উত্তরাধিকার? 'বিষ্ণুপুরাণম্'- গ্রন্থে ভগবান কৃষ্ণ মহত্তম কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কালে কংস নিধনের জন্য মথুরায় যাত্রা করেছেন। গমনকালে পথে দেখা হয়েছিল এক রজকের সঙ্গে। কৃষ্ণ

রজকের কাছে প্রার্থনা করলেন সুন্দর বস্ত্র। রজক সেই বস্ত্র না দিয়ে কৃষ্ণকে গালাগাল করলেন। রজকের অপরাধ নিশ্চয়ই। কিন্তু এই অপরাধ হত্যাকাণ্ড ঘটানোর মত ছিল কি? কৃষ্ণ তাই করলেন। ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ করতল প্রহার করে শূদ্র রজকের মস্তক দুই খণ্ড করে মাটিতে ফেলে দিলেন। এমন হত্যার পরে শূদ্র রজকের নীল ও পীত বস্ত্র গ্রহণ করে উত্তম রূপে পরিধান করলেন। 'বিষ্ণুপুরাণম্' গ্রন্থের 'ঊনবিংশ অধ্যায়ঃ' – এ 'রজকবধ' অংশে উল্লিখিত আছে –

"ভ্রমমাণৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা রজকং রঙ্গাকারকম্।
অযাচেতাং সুরূপাণি বাসাংসি রুচিরাননৌ।।

....

ততস্তল প্রহারেণ কৃষ্ণস্তস্য দুরাত্মনঃ।
পাতয়ামাস কোপেন রজকস্য শিরো ভুবি।।
হত্বাদায় চ বস্ত্রাণি পীতনীলাম্বরৌ ততঃ।
কৃষ্ণ-রামৌ মুদা যুক্তৌ মালাকারগৃহং গতৌ।।[৭৭]

আজ কেমন আছেন অগণিত নিম্নবর্গীয় শূদ্র সম্প্রদায়? একালে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র তাদের কেমন রেখেছে, সে অনুসন্ধান অর্থবহ নিশ্চয়ই। তবুও মনে রাখতে হবে 'ব্রাহ্মণ' ও 'ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র' এক নয়। রামমোহন ,বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ সন্তান। এরা জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হলেও, এরা সারাটা জীবন সংগ্রাম করেছেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ব্রাত্য অপাংক্তেয় মানুষের প্রতি কেবল ঘৃণা পোষণ করেন। মানবতাবাদের প্রতি এরা অসহিষ্ণু। সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র মানব ইতিহাসের এক কুক্ষণে জন্মলাভ করেছিল। আজও ভারতীয় জাতি স্মৃতি – সত্তার সেই অভিশপ্ত কলঙ্কিত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিধি বিধানকে মান্যতা দিতে বাধ্য হয়েছে। কোন শূদ্র বা শূদ্ররমণী বা শূদ্র বালক হয়তো বা আজও প্রার্থনা করে কোন প্রত্যাশিত সবুজ সকালের।

তথ্যসূত্র :

১। The Constitution of India, Article 338, (5) C, [****] The words "and Scheduled Tribes" omitted by the Constitution (Eighty-ninth Amendment) Act, 2003, Sec.2 (w.e.f.19-2-2004), Universal Law Publishing Co.Pvt. Ltd., C-FF-IA, Dilkhush Industrial Estate, Karnal Road, Delhi – 110033, 2008, P.136

২। নগেন্দ্রনাথ বসু, 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' (রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১৮, পৃ. ৫৯-৬০

৩। Karl Marx, Das Capital, vol. 1, II and III, Fingerprint classics, Prakash Books India Pvt. Ltd., 113/A, Darya Ganj, New Delhi, 2020, P.119

৪। V Gordon Childe, Social Evolution, Aakar Books, 28 E Pocket IV, Mayur Vihar Phase 1, Delhi 110091, 2017, P.22

৫। Karl Marks and Friedrich Engels, The Communist Manifesto, Maple Press Private
Limited, Noida, U.P., India, 2019, P. 37

৬। Dr. B.R.Ambedkar, The Untouchables, Samyak Prakashan, Goutam Printers, New Delhi 2019, P. 11

৭। রমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), ঋগ্বেদ সংহিতা, দশম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৫৭০

৮। অধ্যাপক অয়ন ভট্টাচার্য্য (সম্পা.), বেদগ্রন্থমালা, সপ্তদশ খণ্ড, কৃষ্ণযজুর্বেদ, তৈত্তিরীয়-আরণ্যক (প্রথম ভাগ), রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জন্মাষ্টমী, ১৪২৬, ২৪ আগস্ট, ২০১৯, পৃ. ২০৭

৯। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, নগেন্দ্রনাথ বসু, 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' (রাঢীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১৮, পৃ. ৪৫ –গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিটি গৃহীত।

১০। তদেব

১১। তদেব, পৃ. ৪৪

১২। তদেব

১৩। শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী, অথর্ববেদ-সংহিতা, পঞ্চদশ কাণ্ড, দ্বিতীয় অনুবাক, তৃতীয় সূক্ত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৩৩০

১৪। পূর্বোক্ত, উনবিংশ কাণ্ড, ষষ্ঠ সূক্ত, ঋক -৩, পৃ. ৪১৭

১৫। অধ্যাপক অয়ন ভট্টাচার্য্য (সম্পা.),বেদগ্রন্থমালা, সপ্তদশ খণ্ড, কৃষ্ণযজুর্বেদ, তৈত্তিরীয়-আরণ্যক (প্রথম ভাগ), রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জন্মাষ্টমী, ১৪২৬, ২৪ আগস্ট, ২০১৯, পৃ. ১১৫

১৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

১৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭

১৮। মহর্ষি বাল্মীকি, রামায়ণম্, সম্পা. –শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৪১২ পৃ. ১৪১৭-১৪১৮

১৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১৮

২০। তদেব

২১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২০

২২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১৮
২৩। মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, 'মহাভারতম্', 'বনপর্ব্ব' (৯), সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ভট্টাচার্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৌষ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪৯৯
২৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০১
২৫। পূর্বোক্ত, 'মহাভারতম্', 'শান্তিপর্ব্ব' (৩৩), পৃ. ৬৯৩
২৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৪
২৭। তদেব
২৮। পূর্বোক্ত, 'শান্তিপর্ব্ব' (৩৪), পৃ. ১৭৬০
২৯। পূর্বোক্ত, 'অনুশাসনপর্ব্ব' (৩৮), পৃ. ৫৩৯
৩০। পূর্বোক্ত, 'অনুশাসনপর্ব্ব' (৩৯), পৃ. ৬৩২
৩১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৪
৩২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৯
৩৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪৭
৩৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪৮
৩৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫০
৩৬। তদেব
৩৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫৩
৩৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫৫
৩৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫৬
৪০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫৮
৪১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪০
৪২। তদেব
৪৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪০
৪৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪১
৪৫। তদেব
৪৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪২
৪৭। শ্রীমহর্ষি বেদব্যাস, 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণম্', সম্পা – পঞ্চানন তর্করত্ন, নবভারত পাবলিশার্স, কলাকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৪৬
৪৮। শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), 'পদ্মপুরাণম্', 'স্বর্গ খণ্ডম্, ২৭ অধ্যায়, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৬, পৃ. ১৭৭
৪৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯
৫০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২
৫১। পূর্বোক্ত, ২৮ অধ্যায়, পৃ. ১৮২

৫২। শ্রীল অভয়াচরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ (সম্পাদিত), শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্ধ ৭, অধ্যায় ১১, শ্লোক. ১৫, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ৫৫৮
৫৩। পূর্বোক্ত, স্কন্ধ ৭, অধ্যায় ১১, শ্লোক ১৪, পৃ. ৫৫৭
৫৪। পূর্বোক্ত, শ্লোক ২০, পৃ. ৫৬০
৫৫। পূর্বোক্ত, শ্লোক ২৪, পৃ. ৫৬৪
৫৬। শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী (অনূদিত) ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম (সম্পাদিত), শ্রীমদ্‌ভগবতগীতা, চতুর্থ অধ্যায়, শ্লোক -১৩, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৩৭৭
৫৭। পূর্বোক্ত, নবম অধ্যায়, শ্লোক ৩২, পৃ. ৭৬১
৫৮। শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, ‘স্মৃতিচিন্তামণিঃ’ ‘অশৌচপরিচ্ছেদঃ’, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা,
১৪২৫, পৃ. ২০৭
৫৯। আচার্য কৌটিল্য, অর্থশাস্ত্রম, (কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম্, প্রথম খণ্ড, সম্পা. – অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়), ১৩ অধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৬৮৪-৬৮৫
৬০। পূর্বোক্ত, প্রথম অধিকরণ, তৃতীয় অধ্যায়, বিদ্যাসমুদ্দেশঃ, পৃ.৭৬
৬১। মহর্ষি বাল্মীকি, রামায়ণম্, সম্পা. - শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৪১২, পৃ. ১৪১৮-১৪১৯
৬২। রমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), ঋগ্বেদ সংহিতা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় মণ্ডল, ৩৩ সূক্ত, ঋক্ সংখ্যা -১৩, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৭৭
৬৩। মহর্ষি মনু, মনুসংহিতা, সম্পা. - অধ্যাপক ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২৩৫
৬৪। পূর্বোক্ত, দশম অধ্যায় (১৩ শ্লোক) পৃ. ১০৫০
৬৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮৫
৬৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩১
৬৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮৭
৬৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮৭
৬৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮৬
৭০। পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪
৭১। আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা.), ‘মৎস্যপুরাণম্’ তৃতীয় অধ্যায়, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৬, পৃ. ৭
৭২। পূর্বোক্ত, ১৯৫ অধ্যায়, পৃ. ৭৩২-৭৩৩

৭৩। H.H. Risley, The Tribes and Castes of Bengal, vol.1, Calcutta, Printed at the Bengal Secretariat Press, 1892, P-XXXV

৭৪। ibid

৭৫। ibid

৭৬। R.V.Russell, The Tribes and Castes of the Central Provinces of India, vol.1,CPS 1 A Information Can be obtained at www in the USA, 530990BV00005B/41/P, PP. 9-10

৭৭। আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পা), 'বিষ্ণুপুরাণম্', 'ঊনবিংশঃ অধ্যায়ঃ', নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৩৯৭

সময়ের দাবী পূরণে নাটক, প্রসঙ্গ: নীলদর্পণ

মো. তানবীর হাসান
প্রভাষক, নাট্যকলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সার-সংক্ষেপ: মানুষের জীবনাচরণের ভেতর থেকেই উৎসারিত হয় শিল্প চর্চার প্রতিভাস ও নির্যাস এবং এই জীবনাচরণের অন্যতম ও শক্তিশালী উপাদান হলো প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদী চেতনা মানুষের জীবনকে সঙ্গম করে তোলে। যা জীবনকে করে চলমান, বেগবান ও সৃষ্টি ধর্মী।

সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলের বৈরী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে মানুষ, হৃদয়ের আন্ত: স্রোতে প্রবহমান সব প্রতিকূল শক্তিকে পদাঘাত করে বড় হয়ে উঠতে চায়। নাটক জীবনঘনিষ্ঠ এক যৌথ শিল্পমাধ্যম। নাট্যকার, কুশীলব ও দর্শক শ্রোতার সমন্বয়ে সাধারণভাবে নাট্যের সৃষ্টি হয় বলে মনে করা হয়। নাটক যেহেতু জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পমাধ্যমে, সেহেতু এ মাধ্যমে মানুষের সুখ-দুঃখ, আশারকথা স্বাভাবিকভাবেই আসবে। তবে সব নাটকেই প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবাদী চেতনার উপস্থিতি সে হতেই হবে তা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু বাস্তবতার রসায়ন নিয়ে রচিত নাট্যসাহিত্যকর্ম মানুষের মনে দাগ কেটে থাকে তার জলন্ত উদাহরণ দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ। নীল দর্পণ নাটকে উঠে এসেছে শোষিতের অব্যক্ত আর্তনাদের এক করুণ প্রতিধ্বনি। বর্তমানে নিবন্ধে দীনবন্ধু মিত্র রচিত “নীলদর্পণ” নাটকের মাধ্যমে উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে ভারতবর্ষের শোষিত ও অত্যাচারিত মানুষের যে সমাজবাস্তবতা ছিলো, সেই প্রেক্ষাপটকে দাঁড় করিয়ে সাহিত্যের যে সময়ের দাবী তা দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ” নাটকের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে তা আলোচনার চেষ্টা করা হলো।

ভূমিকা:

উনিশ শতকে ইউরোপে যখন বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনে নীলের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকলো তখন ইংরেজ সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় ব্যবসায়ী বাংলায় এসে এখানকার চাষীদের নীল চাষ করতে বাধ্য করে। এর ফলে চাষীদের জীবন নরক হয়ে ওঠে। অত্যাচারী নীলকর সাহেবরা দরিদ্র চাষীদের বাধ্য করলেন ধানের পরিবর্তে নীলচাষ করতে ফলে চাষীদের ঘরে দেখা দেয় খাদ্যভাব এবং নীল উৎপাদন করলেও তারা তাদের ন্যায্য মূল্য যা পাবার কথা তা থেকেও বঞ্চিত হতে লাগলো। এর ফলে আর্থিক দিক থেকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ চাষীর জীবনে যে ভয়ঙ্কর দুদর্শা নেমে আসে এবং নীলকর সাহেবদের সীমাহীন শোষণ ও অত্যাচার যা নীলদর্পণ নাটকের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং তীব্র শোষণ ও অত্যাচারীর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার দরিদ্র নীল চাষীরা **১৮৫৮**

খ্রিষ্টাব্দে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে যে নীল বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন সেই বিদ্রোহের চিত্র এই নাটকে ফুটে উঠেছে।

নীল দর্পণ:

নীল-দর্পণ নাটকটি ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৬১ সালে এই নাটকটি ইংরেজীতে অনুবাদ হলে সর্বব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং নীলকর ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠী ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। বাংলা নাটকের যে বিকাশপর্ব তাতে দীনবন্ধুর মতো সময়ের দাবী নিয়ে লেখা নাটক তখন অব্দি আর কেউ রচনা করতে সঙ্গম হননি। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে যেয়ে সমালোচক আশুতোষ ভাট্টাচার্য বলেন:

দীনবন্ধু প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন, দূরদ্রষ্টা কিংবা অন্তর্দ্রষ্টা ছিলেন না; কিন্তু নাট্যিক চরিত্রসৃষ্টিতে, প্রত্যক্ষদৃষ্টি অপেক্ষা দূরদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি কম প্রয়োজনীয় নহে, সেইজন্য তাঁহার সফল্যকে আংশিক বলিতে হইবে। কিন্তু এ কথা সত্য যে, দীনবন্ধু যতটুকু প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়াছেন, ততটুকু তাঁহার মত আর কোন নাট্যকারই করিতে পারেন নাই। এই পরিচয় তাঁহার শুধুই যে নিবিড় তাহা নহে, আন্তরিকও বটে। তাহারই ফলে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত নাট্যিক চরিত্রগুলি প্রাণরসে সজীব এই গুণ বাংলা সাহিত্যের আর কোন নাট্যকারই দেখাইতে পারেন নাই, এখানেই দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠত্ব (ভট্টাচার্য, ১৯৬১, পৃ. ২৫৯)।

নীল-দর্পণে উঠে এসেছে উনিশ শতকের কৃষকদের ওপর চেপে বসা নীলচাষের মর্মস্পর্শী বেদনার দুঃখগাথা। এই নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে আবহমান বাংলার গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের একটি শান্তিপ্রিয় পরিবারকে কেন্দ্র করে। স্বরপুর নিবাসী গোলাক বসু একটি সুখ-সমৃদ্ধ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিবারের কর্তাব্যক্তি। সাবিত্রী তার স্ত্রী। তাদের দুই সন্তান নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব। নবীনমাধবের চরিত্রে ঔপনিবেশিক বিত্তসচেতনতা ও ব্যবসাবুদ্ধি লক্ষ্য করা যায় আর অপরদিকে বিন্দুমাধবের চরিত্রে লক্ষ্য করা যায় পাশ্চাত্য শিক্ষার আদলে গড়া স্বদেশবোধ। নবীনমাধবের স্ত্রী সৈরিন্ধ্রী বাংলার যৌথ পরিবারের সনাতন আদর্শমন্ডিত আর বিন্দুমাধবের স্ত্রী সরলতা নব্যশিক্ষার স্পর্শে সঞ্জীবিত। এমন সংঘাত বিমুখ সুখী পরিবারের ওপরই নীলকর নির্যাতনের পটভূমি আরোপ করে দীনবন্ধু নির্মাণ করেছেন নাটকীয় সংঘাত। প্রতিবেশী রাইয়ত সাধুচরণ-রাইচরণের পরিবার এবং সাধুচরণের অন্তঃসত্ত্বা কন্যা ক্ষেত্রমণির করুণমৃত্যু, তোরাপ ও বেগুনবেড়ের কুঠিতে বন্দী রাইয়তদের সংগ্রাম এবং বসু পরিবারের একাধিক মৃত্যুর ট্র্যাজিক ঘটনাকে উপজীব্য করে দীনবন্ধু নীল নিপীড়ন বিরোধী কৃষক জীবনের একটি পূর্ণ নাট্যবঞ্জনা তৈরি করেন।

নীল-দর্পণ মানে নীলের আয়না। যে আয়নাতে নীল প্রতিবিশ্বিত হয় তাই নীল-দর্পণ। যে দর্পণে বা আয়নায় নীলকর ও নীলচাষের সমস্ত ছবি অবিকল প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাই নীল-দর্পণ।

"নীল দর্পণ" নাটকে নীলকরদের অত্যাচার নানা শব্দ সংকেতে প্রকাশিত হয়েছে নাটকের চরিত্রগুলোর মাধ্যমে।

সাবিত্রী বলছে নীল বানর, গোপীর জবানিতে পাই নীলযম, নবীনমাধব বলেছে নীলমঞ্জুক, তোরাপ সম্বোধন করেছে নীলসামদু এবং দ্বিতীয় রাইয়ত বলেছে নীলবাঁদর। যে নামেই সম্বোধন করা হোক না কেন সারকথা হলো নীলকর অত্যাচারী, সর্বগ্রামী। কৃষককুলের নিকট এদের পরিচয় উৎপীড়কের। নীলকরেরা নিজ কলঙ্ক মুছে নেবেন এই কামনায় দীনবন্ধু নীলকরদের হাতেই নীল-দর্পণ অর্পণ করেছিলেন।

নীলকরদের মাঝে যাতে শুভবোধ জাগ্রত হয়। নীলচাষ সম্পূর্ণ বন্ধ নয় বরং প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার বন্ধ করাই নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই নাটকে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর চরিত্রদের মুখ দিয়ে বার বার বলিয়েছেন গ্রাম ছেড়ে যদি প্রজারা চলে যায় তাহলে নীলচাষ করবে কারা। অতএব, ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থেই প্রজাপীড়ন বন্ধ করুক, এমনই বার্তা কৌশলে নাট্যকার দিয়েছেন।

উত্তর ঔপনিবেশিক সময়ে যখন ভারতবর্ষের এই জনপদে যে সমাজচিত্র আমাদের চোখে পড়ে তা সাহিত্যকর্মে তুলে এনে স্বাধিকার ও জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় বাংলার মানুষ বিশেষ করে যার কাছে ঋণি তিনি হলেন খ্যাতনামা নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। তাঁর নাটকেই সমাজবাস্তবতা উঠে এসেছে। পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে ইন্সপেক্টরের কাজ করার সুবাদে তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে হতো আর সাধারণ মানুষের সাথে সহজে মিশে যাবার অসাধারণ গুণ থাকায় তাঁর নাট্যভুবনে আমরা সাক্ষাৎ পাই তোরাপের মতো গ্রাম্য প্রজা। ক্ষেত্রমণির মতো কৃষককন্যা, নসীরাম ও রতার মতো বালক, রাজীবের মতো গ্রাম্য বৃদ্ধ, শিক্ষিত অথচ সমকাল-সৃষ্ট মাতাল নিমচাঁদ, ঘটিরামের মতো ডেপুটি, অটলের মতো শাহরবাসী বাবু, আদুরীর মতো সরলা নারী এবং নীল কুটির আমীন দেওয়ানকে।

দীনবন্ধু নিপীড়িত কৃষককুলের দুর্দশার কথা তাঁর নাট্য সৃজন ভাবনায় নিয়ে আসায় নিমগ্ন তখন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত হলো গণ-আন্দোলন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলচাষের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার জন্য তাঁরই পরিচালিত হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রত্রিকায় নীলকরদের নির্মম নিপীড়নের কথা তুলে ধরে প্রতিকার আশা করেন সরকারের কাছে। হিন্দু প্যাট্রিয়ট-এ প্রকাশিত ঘটনাবলি নীল দর্পণ রচনায় দীনবন্ধুকে প্রণোদনা যোগায়। প্রত্রিকাটি অর্চিবল্ড হিল নামে যে ইংরেজ হরমণি নামের এক কৃষক কন্যাকে পুকুর থেকে জল আনবার সময় তার লেঠেলেরা ধরে কুঠিতে নিয়ে আসে এবং মাঝরাত অব্দি তাকে আটকে রেখে বিরংসা চরিতার্থ করে নীল-দর্পণ নাটকে রোগ সাহেবকে আমরা অর্চিবল্ড এবং হরমণি হিসেবে ক্ষেত্রমণিকে ধরে নিতে পারি। অমর নগরের ম্যাজিস্ট্রেট মূলত হার্সেল সাহেব আর নবীনমাধব নদীয়া জেলার চৌগাছিয়া গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস।

নীল-দর্পণের ভাষা উপস্থাপন ও ঘটনা বিচার করলে দেখা যায় আলালের ঘরের দুলাল-এ বর্ণিত নীলকরদের অত্যাচার-অনাচারের প্রতিচ্ছায়া এখানে রয়েছে। পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী নীল-দর্পণ সম্বন্ধে লিখেছেন:

প্রজাদের দুঃখ স্মরণ করিয়া দেশহিতৈষী মাত্রেরই হৃদয়ে যে আগুন তখন জালিয়াছিল, তাহা তাঁহারও হৃদয়ে জ্বলিতেছিল। হৃদয়ের সেই অগ্নি লইয়াই তিনি "নীল দর্পণ" লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন (শ্রাস্ত্রী, ২০১৩, পৃ. ২৩১)।

ধনতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় উজ্জীবিত ইংরেজ নীলকর গোষ্ঠী অর্থের নেশায় বিষ ছোবলে নীল করে তুলেছিলো বাংলার কৃষক সমাজকে। নীল-দর্পণ নাটকের ঘটনা, চরিত্র সৃজন ও সংলাপের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে সেইসব শাসন-ত্রাসন দিনের সমাজের চিত্র। দেশী-বিদেশী নীলকর ও কৃষক উৎপীড়কদের অত্যাচারের ধরণ কেমন ছিলো তা আরো অনুমান করা যায়:

রাইয়তের খেজুর বন কাটিয়া উপড়াইয়া তাহাতে নীলের ক্ষেত করা হইত, পলায়িত প্রজার ঘর ভাঙ্গিয়া ভিটার উপর নীলের চাষ করা হইত। এমনকি ঘর জালাইয়া দিয়া উৎপাত করিয়া আবাধ্য রাইয়তকে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। অনেক সময়ে কুঠির লোকের বিদ্রোহী প্রজার ঘটিবাটি গরু বাছুর ধরিয়া আনিত, ...কুঠিতে কুঠিতে কয়েদঘর ছিল। চুক্তিভঙ্গ করিলে রাইয়তদিগের কুঠিতে ধরিয়া লইয়া নানা নবোদ্ভাবিত কৌশলে পীড়ন করিবার পর কয়েদ করিয়া রাখা হইত। ...কয়েদ করা লোকদিগের যাহাতে সন্ধান না মিলে, তজ্জনৎ তাহাদিগকে নানা কুঠিতে ঘুরাইয়া লইত। এজন্য নীলকরেরা ভয় দেখাইত। কোনো কোনো হতভাগ্য আবদ্ধের যে একেবারে সন্ধান হইতনা। ...মোল্লাহাটির 'লালমোহন' (R.T. Larmoor) সাহেবদের আরও এক নতুন কীর্তি ছিল। তাহার কুঠিতে রাইয়তদিগকে প্রহার করিবার জন্য আরও যে এক প্রকার নতুন লগুড় তৈয়ার করা হইয়াছিল। তাহার নাম 'রামকান্ত' বা শ্যামচাঁদ। এই শ্যামচাঁদের আঘাতে রাইয়েতেরা র্জ্জরিত হইতেন। নীল বুনিতে না চাহিলে ক্রোধান্ধ কুঠিয়ালেরা গুলি করিয়া খুন, করিত, গ্রামকে গ্রাম উজার উৎসন্ন করিয়া নিত। ...নীলকর সাহেবদিগের মধ্যে এমনও দুর্বত্ত ছিল, যাহার জোর করিয়া কৃষক কন্যাদিগকে ধরিয়া লইয়া কুঠিতে আনিয়া অপমান করিত (মিত্র ১৯৬৫, পৃ. ৭৮৩-৭৮৪)।

জীবনাভিজ্ঞ ও সমাজমনষ্ক দীনবন্ধু তাঁর জীবনদৃষ্টি দিয়ে সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই তাঁর লেখনিতে ধরা দেয় ঔপনিবেশিক সমাজ বাস্তবতা। তৎকালীন যে সমাজকে দীনবন্ধু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন সেই সমাজ আরো প্রতিভাত হয়ে উঠে বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্ররূপময় বর্ণনায়:

দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মাবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া

যাইতেছে, তাহার নিবারণের জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে; কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা যাইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেড়া মাদুরে, না হয় ভূমে, গোহালের একপাশে শয়ন করিবে উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে যাইবার সময় হয় জমিদার নয় মহাজন পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে কাজ হইবে না। নয়ত চষিবার সময় জমিদার জমিখানি বাড়িয়া লইবেন। তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস-সপরিবারে উপবাস (চট্টোপাধ্যায়, ১৩৮৭, পৃ. ২৮৮)।

নীল দর্পণ নাটকে কোনো মিথ বা কল্পকাহিনির অনুবাদ নেই আবার শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের নাট্যলীলাও এটি নয় বরং স্বদেশের জীবন জীবিকা, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত ও সমকালীন অভিঘাতকে ধারণ করা এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় এটিই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সমাজবাস্তবধর্মী প্রতিবাদী নাটক।

নীল-দর্পণ নাটকের মাধ্যমে যে সমাজবাস্তবতা দেখানো হয়েছে এবং এই নাটকের মাধ্যমে যেভাবে সময়ের দাবী পূরণ করে সমাজের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে তা এবার নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় ও চিত্রিত চরিত্রের আলোকে বিশ্লেষণ করা যাক।

নবীনমাধব নীল-দর্পণ নাটকের প্রাণ। ঔপনিবেশিক বঞ্চনা ও সংগ্রামের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে নবীনমাধব শুধুই যে ক্রিয়াশীল থেকেছে তা নয়, বরং নীলকরদের সীমাহীন নিষ্ঠুরতাকে মোকাবেলায় নবীনমাধব ছিল সক্রিয়। নীলকরদের তাচ্ছিল্য ও নির্যাতনের শিকার হবার পরেও শিক্ষিত নবীনমাধব স্বদেশবোধ, প্রতিবাদস্পৃহা ও মানবিক বিশিষ্ঠতাকে সঙ্গী করে পলায়ন নয় বরং শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল।
সাধুচরণ নবীনমাধবের সাহসিকতা সম্পর্কে বলেছে,

> "বড় বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সেদিন সাহেব বল্লে, 'যদি তুমি আমিন খালাসির কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রবতীর জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমাকে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।' তাহাতে বড় বাবু কহিলেন, 'আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়ে না দিলে এ বৎসর এক বিঘা ও নীল করিবনা, এতে প্রাণ পর্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার" (নীল-দর্পণ: প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)।

এই বলিষ্ঠ কণ্ঠে উঠে এসেছে উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কোনো ছাড় না দেওয়ার দুঃসাহসী আত্মপ্রত্যয়।নাটকের প্রথম অঙ্কে গোলক বসুর অসহায়ত্ব প্রকাশ পায় একই সঙ্গে সমস্ত পীড়ন নীরবে মেনে নেওয়া দেখে নবীনমাধব বলে,

"আপনি যেমন অনুমতি করিবেন আমি সেইরূপ করিব। কিন্তু আমার মানস একবার মোকদ্দমা করি"(নীল-দর্পণ: প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)।

নবীনের এমন ইচ্ছে সাহস সঞ্চারিত করে স্বরপুরবাসী তথা কৃষককুলে। নবীনমাধব সম্পর্কে দীনবন্ধু গবেষক একেএম খায়রুল আলম মন্তব্য করেন:

এভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের অনিবার্যতা এবং নবীনমাধব কর্তৃক নীলকর বিরোধী কিন্তু আইনসিদ্ধ সংগ্রামের প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে গোলোক বসু ও সাধুচরণের বাস্তভিটাসংলগ্নতার সঙ্গে নবীনমাধবের নীলকরবিরোধী সংকল্প, স্বদেশবোধ এবং জনজীবনসম্পৃক্তি একত্রে সংগ্রথিত করে দীনবন্ধু মিত্র কেন্দ্রীয় চরিত্রে বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্য আরোপ করেছেন (আলম, ১৯৭০, পৃ. ৬৯)।

সাধুচরণ ও রাইচরণের পরিবারের ওপর অমানবিক অত্যাচারের প্রতিটি পর্বে নবীনমাধব ছিল সহযোদ্ধা। কৃষকের প্রতি তার সমব্যথী মানসিকতা তাকে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ও আশা ভরসার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠা করেছিল কৃষক সমাজে। নবীনমাধব হয়ে উঠেছিল নীল বিদ্রোহ নির্যাতিত কৃষককুল, ক্ষেতমজুর ও রাইয়ত শ্রেণির শুদ্ধতম এক প্রতিনিধি। নীলকরদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরিত্রাণ নয়, প্রতিরোধ গড়ার সংগ্রাম ছিলো তার মাঝে। গোলোক বসুর বিপক্ষে মিথ্যে সাক্ষ্য দেবার জন্য তোরাপকে বন্দী করা হলেও তোরাপ তার বিবেক বিসর্জন দেয়নি কেননা নবীনমাধব ইতোমধ্যেই তাদের চিত্তজয় করেছিল ঔপনিবেশিক শক্তির বিপক্ষে সংগ্রাম করে। পারিবারিক বৃত্তের সঙ্গে নবীনমাধবের বহিসম্পৃক্ততাদৃশ্যমান করেছেন দীনবন্ধু বাল্যশিক্ষা বিস্তারে নবীনমাধবের আগ্রহ, অধ্যাপকবৃন্দের প্রশংসা এবং নবীনমাধব ও সৈরন্ত্রীর দাম্পত্য সুসম্পর্কের ঘটনাবলির বর্ণনার মাধ্যমে। ঔপনিবেশিক শক্তি তৎকালীন সমাজকে কতটা গ্রাস করেছিল তা রোগ সাহেবের হাতে লাঞ্ছিত ক্ষেত্রমণিকে দেখলে অনুমান করা যায়। নিরীহ কামিনীকে ইচ্ছে হওয়া মাত্রই কুটিতে হাজির করতো নীলকররা। গোলোক বসু যখন কারাগারে আত্মহত্যা করে তখন এই মর্মান্তিক আঘাত বুকে নিয়েও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দ্বিদাগ্রস্ত না হয়ে অবিচল ছিল নবীনমাধব। স্বদেশের মাথা উঁচু রাখার দাবি থেকেই লড়ে গেছে এই চরিত্র। পিতা গোলোক বসুর মৃত্যু নবীনের পরাজয় হিসেবে ধরা হলে তার বিপরীতে এ পরাজয়কে ঔপনিবেশিক নীলকরদের বিরুদ্ধে স্বদেশী সংগ্রামী কৃষক সমাজের ব্যর্থতা হিসেবে ধরা হয়।

সাধু কন্যা ক্ষেত্রমণির মৃত্যুর করুণ ঘটনা এবং সাবিত্রী ও সরলার মৃত্যু প্রকৃত বিচারে মৃত্যুজনিক দুঃখগাথা নয়, কৃষক সমাজের সামগ্রিক অসহায়ত্বের বহিপ্রকাশ। নবীনমাধবের মৃত্যু শেষ পর্যন্ত নীলকরের আঘাতেই হয়।

"নীলানলে হয় নাশ নবীনমাধব" (নীল-দর্পণ: প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)।

নবীনমাধবের মৃত্যু শোক নয় বরং শোকের মধ্য দিয়েও অবিনাশী শক্তির যে উদ্বোধন ঘটে এ মৃত্যুশোক সেই অক্ষয় শক্তির আধার। নবীনমাধবের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে দুশ

রাইয়ত ‘লাঠি হস্তে ধরিয়া মার মার এবং হা বড় বাবু!’ বলে ক্রন্দনের কোরাস তুলে সে ক্রন্দন কৃষক শ্রেণির সংহতি প্রকাশ শুধু নয় বরং ভবিষ্যৎ সম্মিলিত যাত্রার পথনির্দেশ বিবেচনা করা যায়।

মাটি আঁকড়ে ধরে রাখার দৃঢ় সংকল্প ও চেতনাবোধ উঠে আসে গোলোক বসুর উক্তিতে, “বাপু দেশ ছেড়ে যাওয়া কি সুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্তারা যে জমিজমা করে গিয়েছেন তাহাতে কখন পরের চাকরি স্বীকার করতে হয় নি। যে ধান জন্মায় তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথিসেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়, যে সরিষা পাই তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ৬০-৭০ টাকা বিক্রী হয়। বল কি বাপু। আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরি ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাচ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বির্দীণ হয়? আর কেইবা সহজে পারে”? (নীল-দর্পণ: প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)।

গোলোক বসুর এই আত্মসমর্পণের চিত্রটি ঔপনিবেশিক আধিপত্য এবং অর্থলালসার সংঘাতে গ্রামবাংলার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ভেঙ্গে দেবার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায়। সাহেবদের সাথে বিবাদ করে সম্ভব হবে না এই দর্শনকেই তিনি মেনে গেছেন সংশয়হীন দৃঢ়তা দেখিয়ে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রতি তার অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। গোলোক বসুর জীবননাশ এর মাধ্যমে মূলত সর্বনাশা নীলকরদের আগ্রাসনের চিত্র প্রকাশ পায়।

নীল-দর্পণে উঠে এসেছে ঔপনিবেশিক শাসনের মাধ্যমে অর্থলোভী আগ্রাসন এবং বিন্দুমাধবের মতো তরুণদের ইংরেজ জীবনপদ্ধতির দিকে আকৃষ্ট করার প্রবণতা। গোলোক বসুর মামলায় বিন্দুমাধবকে শিক্ষিত লোকের অলংকার শাসিত কৃত্রিম উচ্চারণ করতে দেখা যায় যেখানে পিতার জন্য সন্তানের বিপর্যস্ত সময়ের হাহাকার ফুটে উঠেনি। মাতা সাবিত্রী। স্ত্রী সরলতা ও পিতৃস্থানীয় অগ্রজ নবীনমাধবকে হারিয়ে যে বেদনাসিক্ত রোদন ও আত্মবিলাপে জর্জরিত হয়ে নাটকের ট্র্যাজেডিকে ধারণ করার কথা তাও পরিলক্ষিত হয়নি বিন্দুমাধব চরিত্রে। এ চরিত্রের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সমাজবাস্তবতার পাশ্চাত্যশিক্ষা সম্প্রীতির দিকটি নাট্যকার স্পষ্ট করেছেন।

তোরাপ দীনবন্ধু মিত্রের অন্যতম স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি। এই কৃষকের প্রাণশক্তির উচ্ছলতা, অবিচল কৃতজ্ঞতা, হিন্দু মণিবের প্রতি আনুগত্য বোধ, চারিত্রিক বলিষ্ঠতা এবং ধর্ম প্রাণতার পরিচয় চরিত্রটিকে অনন্য মহিমায় নিয়ে গেছে। শেষবার তাকে দেখা যায় উড সাহেবের লাঠির আঘাতে সংজ্ঞাহীন নবীনমাধবের গৃহাঙ্গনে। ‘শ্রাদ্ধের নিয়ম ভঙ্গের দিন পর্যন্ত বুনন’ বন্ধের অনুরোধ করেও যখন নবীন অপমানিত হয়ে সাহেবের বক্ষস্থলে পদাঘাত করলে উড সাহেবের লাঠির আঘাতে অচৈতন্য, তোরাপ তখন

"একগুয়ে মহিষের মত" সমস্ত বাধা অতিক্রম করে নবীনকে কোলে নিয়ে বড় সাহেবের নাক কামড়ে পালিয়ে ছিল।

তোরাপের নাট্য সংলাপে গ্রামবাংলার অশিক্ষিত ধর্ম বিশ্বাসী, সরল কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এক বলিষ্ঠ ব্যক্তির দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। তোরাপের মাধ্যমে নাট্যকার পল্লী বাংলার বিশ্বস্ত মানুষদের জয়গান গেয়েছেন। বাংলার ভূমিকেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আদর্শ গৃহবধু রূপে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তিনটি নারী চরিত্রকে নিয়ে এসেছেন সাবিত্রী সৈরন্ধ্রী সরলতার মাধ্যমে। ছোট সাহেবের নির্দেশে পদীময়বাণীর ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে বিচলিত সাবিত্রীর মনে করে

"ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে হবে"

কেননা সাবিত্রী মনে করে ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত এ সংসারে বিপদমুক্তির কোন পথ নেই। আবার ক্ষেত্রমণি অপহরণের সংবাদে কর্তব্যবোধের প্রেরণায় সাবিত্রী তার পুত্র নবীন মাধবকে বলেছেন, যদি নীল বানরের হাত থেকে 'পবিত্র মাণিক্য' অপবিত্র না হতেই আনতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে ধারণ করেছি জানব।

সৈরন্ধ্রীর মধ্যে শ্বশুরশাশুড়ীর প্রতি সেবা, গভীর ভালবাসা, দেবর ও জা-র প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ তাঁর চরিত্রকে বিশিষ্ট করেছে। নবীনমাধব গোলোক বসুর মামলা পরিচালনার জন্য সে সময় অর্থ চিন্তায় বিব্রত ঠিক তখন পতিব্রতা বধু সৈরন্ধ্রী তাঁর সমস্ত অলঙ্কার স্বামীর হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করেনি। তাঁর চরিত্রের মাধুর্য, কর্তব্য জ্ঞান ও যথার্থ সাংসারিক জ্ঞানের পরিচালক।

সরলতা বসু পরিবারের ছোট বৌ। রক্ত কমলের মত তার রং, পদ্মকুলের মতো সুখ সর্বদাই হাস্যবদন। পড়ালেখা জানা মেয়ে সরলতা প্রাণয়সে উচ্ছল। মুখে কথার খৈ ফোটে, হাসিতে বয় ঝর্ণা। নবীনের মৃত্যু ম্লানমুখী ও দুঃখিত করে দেয় সরলতাকে। সরলতার মর্মান্তিক মৃত্যু পাঠক দর্শককে বেদনাতুর করে তোলে।

'নীল-দর্পণ' নাটকে ক্ষেত্রমণি চরিত্রটির দ্বারা নাট্যকার তাঁর উদ্দেশ্য মূলক নাটকের কিছু উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিয়েছেন। কৃষক ঘরের যুবতী বৌ ঝিদের প্রতি সাহেবদের লোভ ও আচরণের দৃষ্টান্ত হিসেবে ক্ষেত্রমণির চরিত্র পরিকল্পনা। ধর্মবোধ ও সতীত্ব চেতনাবোধে জাগ্রত নারী ক্ষেত্রমণি প্রাণপণ লড়েছে সতীত্বরক্ষার জন্য। ক্ষেত্রমণির জীবনদানের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন কৃষক জীবন ও পরিবারের ট্র্যাজেডি বিস্তৃত হয়েছে, তেমনি নীল-দর্পণের মূল প্রতিপাদ্য নীলকরদের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন উন্মোচিত হয়েছে।

নিষ্ঠুর নীলকর রোগ তার রিরংসা চরিতার্থ করার জন্য ক্ষেত্রমণিকে টার্গেট করে। ঘৃণ্যজীব নীলরোগ রোগ ক্ষেত্রমণির হাত ধরে টানতে শুরু করলে ধর্ম ও মানবীয় সম্পর্কের দোহায় দেয় কিন্তু ছেড়ে দেবার মতো প্রাণ ধর্ম রোগ সাহেবের নেই, ক্ষেত্রমণি তার শক্তির সীমাবদ্ধতা স্মরণ করে তাকে মেরে ফেলার অনুরোধ করে তবুও তার সতীত্বনাশ না করতে বলে। নীলকর রোগ ক্ষেত্রমণির পেটে প্রবল মুষ্টি আঘাতে

তাকে কাবু করতে চায় কিন্তু রোগের আঘাতে ক্ষেত্রমণির গর্ভপাত ঘটে শেষ পর্যন্ত ক্ষেত্রমণি প্রাণত্যাগ করে। ক্ষেত্রমণির এই মৃত্যু নীলকর অত্যাচার তথা ঔপনিবেশিক শাসনের মাধ্যমে যে অত্যাচার চালানো হত তার ঘৃণ্যতম উদাহরণ। ইংরেজ নীলকরদের সামগ্রিক নিপীড়নের স্বরূপ উন্মোচনে এই মৃত্যু সমকালকে প্রতিভাত করে। নাটকে আদুরী চরিত্রটিও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। দাসী হলে বসুপরিবারের সুখদুঃখের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত। আদুরী বসুপরিবারের বিপর্যয়ে খুবই ব্যথিত হয়ে পড়ে। সাবিত্রীর উন্মাদ অবস্থায়, নবীনমাধবের মৃতদেহ দেখে একেবারে নির্বাক হয়ে শোকস্তব্ধ হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক যুগযন্ত্রণার শিকার বিপন্ন মানুষের দলে আদুরি নিজেকে জড়িয়ে নীলদর্পণের ট্র্যাজিক বাস্তবতাকে দেয় উচ্চতর মহিমা।

পদীময়রাণীর চরিত্রটি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ফলে সর্বহারা গ্রামীণ জীবনে ভাসমান মানুষ। পদী দুশ্চরিত্রা, পাপীয়সী, সে কেবল তার একার দোষে নয়। পদীর এই খলন তার স্বভাব ধর্মে নয় দারিদ্র্যের কারণে অর্থের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির শিকার। পদীর কর্মকাণ্ড নীলকরের ইচ্ছে বাস্তবায়ন হলেও এই হীন কর্মকান্ডের জন্য তার মনস্তাপ লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ শতাব্দির আর্থিক বিপর্যয় তাকে সমাজের থেকে ছিন্ন করে দুরাচারিণী, পাপিয়াসী, আর রফিতার মতো অভিধা দিয়েছে। রোগ সাহেবের ঘরে ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে যাবার পর, ক্ষেত্রমণি ধর্ম রক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে যখন পদীর সাহায্য চাইছে, অনুতপ্ত পদী বলছে-'আমার জাত ও গেছে ধর্মও গেছে।" এই উক্তির মধ্যে যেন পদীর দীর্ঘ নিশ্বাস শুনতে পাওয়া যায়। যে পাপীয়সী কিন্তু ঘৃণার পাত্রী নয়। তারও যেন সামান্য করুণা প্রাপ্য। একদিকে নীলকরের করাল গ্রাস অন্যদিকে বেঁচে থাকার অনিবার্যতা, এই সংকটের সমান্তরালে পদীময়রাণীর অন্তরে থাকা মানবিকতাবোধ তার দ্বৈতকসত্ত্বার প্রকাশ ঘটালেও শেষ পর্যন্ত মানবিকতার জাগরণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের ইতিহাসকে ধারণ করে দীনবন্ধু মিত্রের অনন্য সাহিত্যকীর্তি নীল-দর্পণ নাটক। ঔপনিবেশিক বাংলার গণমানুষের শোষিত ও লাঞ্ছিত হবার ইতিহাসকে ধারণ করে বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠির বাস্তব সমাজদর্পণ হয়ে উঠেছিল এ নাটক। এ সাহিত্যকর্মে দীনবন্ধু তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা থেকে ঔপনিবেশিক ভারত-বাংলার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও ব্রিটিশ শাসনের নিখুঁত চালচিত্র তোলে এনেছেন এবং সময়ের যে দাবী থাকে তা পূরণ করেছেন নিপুনভাবে। সমকালকে নাট্যরূপ দিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন ষোল আনা।

উপসংহার:

'নীল দর্পণ' নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজ বাস্তবতায় যে নির্যাতন ও শোষণ রয়েছে তার বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলা। নাটকের প্রধান প্রধান চরিত্র

গুলো কৃষক বা সাধারণ মানুষ, নীল চাষি 'নীল দর্পণে' বিদেশী শোষক শ্রেণির শোষণ ও নির্যাতনের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

'নীল দর্পণ' নাটকের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের ভিতকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিলেন দীনবন্ধু। নাটকের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ ও বি-উপনিবেশায়নে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সে সময়ের হীনম্মন্য প্রান্তের মানুষকে। দীনবন্ধুর ঔপনিবেশিক কালের নাট্যসাহিত্যে চিহ্নিত উপনিবেশায়নের উপাদানকে বর্তমানে এসে বর্জনের লড়াই হতে পারে প্রাচ্যের দর্পণে প্রাচ্যকে দেখার সব চাইতে উত্তম কৌশল। আর এখানেই দীনবন্ধুর প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাই আমরা।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র:

আলম, একেএম খায়রুল, ১৯৯০, দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৮৭, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খ-, ৭ম মুদ্রণ, কলিকাতা সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ১৯৬১, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খ-, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা।

মিত্র, সতীশচন্দ্র, ১৯৬৫, যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খ-, ২য় সংস্করণ, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

মিত্র, দীনবন্ধু, 'নীল দর্পণ' ১৮৬০।

বাংলার গাজন উৎসব ও লোকধর্ম: পূর্বমেদিনীপুরের চাঁদিবেণীয়া

উৎকলিকা সাহু
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বাংলার লোকউৎসব বাংলার নিজস্বতার বহিঃপ্রকাশ। কথাতে বলে বাঙালির বারোমাসে তেরো পার্বন। বিভিন্ন লোকউৎসবে বাংলা প্রায় সারাবছরই মুখরিত থাকে। গ্রাম্য পল্লীগুলিতে এই উৎসব যথেষ্ট জনপ্রিয়। তেমনই একটি হলো গাজন ও চড়ক উৎসব। গ্রামের সাধারণ মানুষের নিজস্ব উৎসব এটি। গাজন বিভিন্ন রকম হয়। কিন্তু শিবের গাজন সর্বজনবিদিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাগুলিতেই গাজন উৎসব হয়। শরীরে কষ্ট দিয়ে কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের এই প্রথা চমকপ্রদও বটে। পূর্বমেদিনীপুরের চাঁদিবেনীয়া গ্রামের শিবের গাজন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লৌকিক দর্শন হলো লৌকিক উৎসবগুলির সাথে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। এ এক অদ্ভুত জীবনদর্শন যার মধ্যে লোক দেখানো আড়ম্বরতা নেই কিন্তু জীবনকে দেখার আঙ্গিক যথেষ্ট মনোগ্রাহী।
শব্দসূচক: লৌকিক উৎসব - লোকধর্ম - চড়ক - গাজন - পূর্বমেদিনীপুর – চাঁদিবেনীয়া।

মূল আলোচনা :

বাংলা তথা ভারতের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে নিজস্ব লৌকিক দেবদেবীর পুজো করা হয়ে থাকে। এই পুজো একসময় উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করে। গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষজন তাদের লৌকিক দেবদেবীর পুজো উৎসবের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে নিজেদের একাত্ম করে থাকে। পুজো বা উৎসব নিছকই আনন্দদায়ক এটা বলা যায়না। কারণ এই উৎসবগুলির সাথে মানুষের লোকদর্শনও জড়িয়ে থাকে। আড়ম্বরবিহীন এই পুজো উৎসবের সাথে তাদের জীবনবোধ সম্প্রীক্ত। বাংলায় যে কয়টি লোকউৎসব বর্তমান তাদের মধ্যে চড়ক গাজনের উৎসব সর্বজন বিদিত। অবশ্য অঞ্চলভেদে চড়ক বা গাজন উৎসবের তারতম্য পার্থক্য আছে। মূলত চৈত্র মাসের শেষের দিকে শিবের উৎসব হিসেবে গাজন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম বাংলার লৌকিক পূজা অর্চনার মধ্যে যেমন শীতলা, মনসা, ওলাবিবি, বনদেবীর মতো বিভিন্ন পূজা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তেমনি গাজনও তার নিজস্বতায় উজ্জ্বল। এ এক মেলবন্ধনের অনুষ্ঠানও বলা যায়। দুই বাংলাতেও গাজনের এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সমুজ্জলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র ভারতেও গাজন চড়ক উৎসব হয়। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় গাজন একটি বিশেষ মাত্রা

পেয়েছে। এখানে বিভিন্ন প্রকারের গাজন সম্পর্কে জানা যায়। যেমন শিবের গাজন, ধর্মরাজের গাজন, বলরামের গাজন, ভগবতীর গাজন, মনসার গাজন, শীতলার গাজন এবং নানাবিধ। গাজন উপলক্ষে বিভিন্ন লোকগান ও লোকনৃত্যও হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কৃচ্ছ-সাধনার ক্রিয়াকলাপের মাধ্যম রূপে গাজনকে দেখা হয়।

চড়ক পূজাকেই ‘গাজন’ নামে অভিহিত করা হয়। শিবের বিবাহ উৎসবকে কেন্দ্র করেই এই অনুষ্ঠান। ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের কথায় গাজন আদিম সমাজের বর্ষাবোধন উৎসব। সংস্কৃত শব্দ ‘গর্জ্জতি’ থেকে ‘গর্জন’ এবং ‘গর্জন’ শব্দ থেকে ‘গাজন’ শব্দটি তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে গাজন বহুকাল ধরে হয়ে আসছে। “১৭৫৭ সালের ১৫ জুলাই বাংলার নবাব মীরজাফর কলকাতার দক্ষিনে কুলপি পর্যন্ত অঞ্চলের ১৪টি মহল বা পরগনার জমিদার স্বত্বভোগ করার অধিকার দেন ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানিকে।

এই ২৪টি পরগনা নিয়ে ২৪ পরগনা জেলা। ১৯৮৬ সালের ১ মার্চ জেলাটিকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়, নাম দেওয়া হয় উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এই দুই জেলা প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত দুই জেলাতে গাজন উৎসব এখনো পালিত হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা কাকদ্বীপ, সোনারপুর, ভাঙরের মতো জায়গাতে একসময় তেভাগা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল, তেমনি সুন্দরবন, বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জের মতো অঞ্চলগুলি পর্যটকদের আকর্ষনের কেন্দ্র। এসব অঞ্চলের লোকজন ছিল মূলত মৎস্যজীবী, তপশিলীজাতি গোষ্ঠীভুক্ত লোকসংখ্যা বেশি ছিল এখানে। বজবজ, বারুইপুর, বিষ্ণুপুর, ক্যানিং সহ মগরাহাট, মথুরাপুর এবং আরো অন্যান্য অঞ্চলে গাজন হয়ে থাকে। এগুলো মূলত: শিবের গাজন উপলক্ষেই হয়। অপরদিকে উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়া, নৈহাটি, হালিশহর একসময় সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। এসব অঞ্চলেও শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার মানুষজন মূলত: কৃষিজীবী হলেও এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ থাকে। বনগাঁ, বাঁকড়া, বারাসাতেও শিবের গাজন হয়ে থাকে। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এই গাজন উৎসব সম্পর্কে বলেছেন—“শারদীয়া পূজা যেমন বাংলার মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে ঘরে এক আনন্দের উচ্ছ্বাস আনয়ন করে, চড়ক বা গাজনও সেইরূপ বাংলার দরিদ্র অনতি পরিচিত সাধারন লোকের মধ্যে একটা অপূর্ব উৎসাহ ও মাদকতার সৃষ্টি করে। সমস্ত বৎসর ধরিয়া তাহারা এই উৎসবের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। সংসারের নানা আধিব্যাধি অভাব অভিযোগে প্রপীড়িত ও

জর্জরিত হইয়া তাহারা গাজন সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য দেহ বাণ ও বঁড়শীর দ্বারা বৃদ্ধ করিবার ও চড়কে ঘুরিবার জন্য মানত করে।" উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে আগে পূন্ড্রবর্ধন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এঁরা ছিলেন 'মহাপাত্র' উপাধিকারী। ১৯৯২ সালে দিনাজপুর ভেঙে বিভাজিত হয় উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। এখানে বেশিরভাগ রাজবংশী, কোচ, দেশীয়া জাতীর মানুষ থাকেন। এই দুটি জেলাতেও চড়ক উৎসব হয়। এছাড়া কলকাতার, চেতলা, পদ্মপুকুর, ছাতুবাবু লাটুবাবুর বাজারেও শিবের গাজন হয়। তৎসহ কোচবিহার, নদীয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান জেলাতেও গাজন উৎসব হয়। বাঁকুড়া জেলাতে বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন এক্তেশ্বর, খড়গেশ্বর, গন্ধেশ্বর গ্রামে শিবের পুজো হয়। বড়জোড়াতে ধর্মরাজের গাজন হয়। রাঢ়ের নিজস্ব দেবতা হলো ধর্মরাজ। তাই এই অঞ্চলে ধর্মরাজের গাজন খুব ধুমধাম করে পালিত হয়। এভাবেই বীরভূমেও ধর্মরাজের পূজো হয়। হাওড়ার পঞ্চানন ঠাকুরের গাজন, মুর্শিদাবাদের কান্দীতে শিবের গাজন, হুগলির চুঁচুড়াতে খন্ডেশ্বরের গাজন, খানাকুলে শীতলার গাজন উল্লেখযোগ্য, তবে শিবের গাজন সবথেকে বেশি হয়ে থাকে দুই মেদিনীপুরে। 'গাজন' শব্দের অন্য মানেও আছে বলে স্থানীয় মানুষ মনে করেন। 'গাঁ' বা গ্রাম ও 'জন' বা জনসাধারণকে কেন্দ্র করে এই উৎসব হয় বলেই একে গাজন বলা হয় বলে এই অঞ্চলের স্থানীয় মানুষরা মনে করেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের বহু মানুষ কৃষিকাজ, মৎস্য শিল্প ও তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। কেশপুর, শালবনি, পিংলা, জলচক, দাঁতন, চন্দ্রকোনাতে গাজন খুব ধুমধামের সাথে পালিত হয়। এইসব অঞ্চলে শিবের গাজন বেশি হয়ে থাকে। আবার পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি, এগরা, ময়না, তমলুক, নৈপুর, বিভীষণপুরে শিবের গাজন খুবই জনপ্রিয়। মূলত: চৈত্র ও বৈশাখ মাসেই উৎসব হয়ে থাকে।

"হাসি কহে মহাদেবে দেবী হৈমন্তী/
ওহে কান্ত কর শান্ত করি হে মিনতী/
লালায়িত আমি বর্ষফলের কারন/

বর্ষাধিপ চন্দ্রগ্রাস কহ বিবরণ/ মন্ত্রী
নাগেন্দ্র শস্যাধিপ আদি করি/
নির্ব্বিঘ্নেতে আশুতোষ বলহ বিচারি/
বাক্য শুনি শিব জ্ঞানী শঙ্কর কহিল/
শঙ্করী শুনিয়া মহা হরষিতা হৈল।”

অনেকের মতে গাজন উৎসব আগে শিবের উৎসব ছিল না। এটা বৌদ্ধদের অনুষ্ঠান ছিল বলে মনে করা হতো। মহাযাণী বৌদ্ধরা এটি পালন করতেন। তারিনীশংকর চক্রবর্তীর মতে- ‘পুরাকালে বৌদ্ধ হীনযান সম্প্রদায়, বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধের যে পূজা উৎসব করতেন, কালক্রমে সেই উৎসবই গম্ভীরা উৎসবের উপকরণ সৃষ্টির সহায়ক হয়’। আসলে গাজন বা গম্ভীরার সাথে দেবদেবীর সম্পর্ক জড়িত। আসলে মনে করা হয় যে বৌদ্ধ ধর্মের সাথে সমাজের অবহেলিত মানুষ যোগদান করেছিল। তাই এই অনুষ্ঠানে সেইসব মানুষ যোগদান করত। প্রথমে শিব ও পরে ধর্মরাজের গাজন হতে শুরু হয়। সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষরা গাজনের সন্ন্যাসী হতে পারতো।

লৌকিক দেবতাদের মধ্যে শিব সর্বপ্রাচীন। ধর্ম ঠাকুরের গাজনও প্রাচীন। পরে এই ধর্মগাজন পরিবর্তিত রূপ পায় শিবের গাজন হিসাবে। মূলত: চৈত্র মাসের শেষে চড়ক পূজা হয়। এটাই শিবের গাজন। গাজনে যে কেউ সন্ন্যাসী হতে পারে। কেউ তাদের অভিষ্ট মানত পূরণের জন্যেও গাজনের সন্ন্যাসী হয়। অন্ত্যজ পরিবারের লোকেরাও সন্ন্যাসী হয়। সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রধান একজন সন্ন্যাসী থাকেন। তিনি বাকি সন্নাসীদের পরিচালনা করেন। গাজনের সন্ন্যাসীদের ‘ভক্ত্যা’ বলা হয়। কঠোর নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে এই উৎসব হয়। বিভিন্নভাবে শরীরে বাণ ফুঁড়ে তারা ক্লিচ্ছ সাধন করত। “১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট আইন করিয়া বাণ ফোঁড়া বন্ধ করায় চড়ক অগ্যতা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তবুও দুই এক স্থানে বাণ না ফুঁড়িয়া যতদূর হইতে পারে, তাহা হয়। তন্মধ্যে ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া এবং কলিকাতায় ছাতুবাবুর মাঠে চড়কগাছে ঘোরানো হয় দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে যে যে সন্ন্যাসী চড়ক গাছে ঘুরিত, তাহাদের পৃষ্টে দুইটি মোটা মোটা বড়শি বিদ্ধ করিয়া রজ্জু যোগে তুলিয়া পাক দেওয়া হইত। সে

সময় তাহার কষ্টের কথা বর্ণনাতীত, কিন্তু সে ব্যক্তি কোন প্রকার কষ্ট প্রকাশ করা দূরে থাকুক, নানাপ্রকার অঙ্গ-ভঙ্গি ও ব্যঙ্গ পরিহাস করিয়া আনন্দ প্রকাশ করত"। এইরূপ কষ্ট সহ্য করেও সুখে প্রশান্তির হাসি থেকেই 'চড়কির হাসি' প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি। এখনো রাঢ় অঞ্চলগুলিতে ধর্মরাজের পুজো হয়। মূলত: বুদ্ধ পূর্ণিমাতে এই পূজা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে আর্য ও অনার্য চেতনার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। গাজনের সাথে মিশরের ফারাওদের অদ্ভুত সংযোগ নিয়েও নৃতাত্ত্বিক সুধাংশু রায় তাঁর – 'Pre historic India and Ancient Egypt' গ্রন্থে গাজনের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন "মিশরের ফারাও রাজাদের মধ্যে একজন বিতাড়িত হয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে রাঢ় অঞ্চলে আসেন। তাঁর মৃতদেহ (মমি করে) রাজমহলের কোনো এক জায়গায় লুকানো আছে এবং তার বার্ষিক মৃত্যু দিবস স্মরণের দিন হল গাজনের সন্ন্যাসীদের পালন এবং অনুষ্ঠান। তিনি আরও বলেছেন, মিশরের 'ডো-আহোম-রা' থেকে 'ধর্মরাজ' শব্দের উৎপত্তি।" এই চৈত্র সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে আবার বোলান গানের উৎপত্তি। এর অভিধানিক অর্থ বোল বা ডাক। বোলান মূলত: সমাজের অন্ত্যজদের অনুষ্ঠান। কারণ উচ্চশ্রেণীর থেকেও শিব নিম্নশ্রেণির কাছে অনেক কাঙ্খিত দেবতা। বোলান পাঁচভাগে বিভক্ত। যথাক্রমে -- শ্মশান বোলান, দাঁড়া বোলান, মাঁওতেলে বোলান, পালা বোলান, ছল বা রঙ পাঁচালি। কলকাতার বুকেও গাজন উৎসব ধুমধাম করে পালিত হতো। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় গাজন উৎসব সম্পর্কে বর্ণনায় লিখেছেন- 'চিৎপুরের বড় রাস্তায় মেঘ করলে কাদা হয় - ধুলোয় ধুলো, তার মধ্যে ঢাকের গটরার সঙ্গে গাজন বেরিয়েছে। প্রথমে দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশ বেঁধে কাঁধে করেছে - কতগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি বাজাতে-বাজাতে চলেছে তার পেছনে এলোমেলো নিশেনের শ্রেণী। মধ্যে হাড়ীরা দল বেঁধে ঢোলের সঙ্গতে "ভোলা বোম ভোলা বড় রঙ্গিলা, লেংটা ত্রিপুরারি শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা", ভজন গাইতে গাইতে চলেছে। তার পেছনে বাবুর অবস্থামত তক্‌মাওয়ালা দারোয়ান, হরকরা সেপাই। মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি মাখা টিনের সাপের ফণার টুপি মাথায় শিব ও পার্বতীর সাজা সং'। সুতরাং কলকাতা থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের শহরতলীসহ গ্রামাঞ্চলেও গাজনের বা চড়ক উৎসব সর্বজনবিদিত।

গাজন উৎসব পালনের পশ্চাতে একটি পৌরাণিক কথার উল্লেখ্য প্রয়োজন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশধর অনিরুদ্ধ প্রেমে পড়েছিলেন দৈত্যরাজ বাণের কন্যা ঊষার সাথে। কিন্তু ঊষার সাথে দেখা করতে গিয়ে অনিরুদ্ধকে বন্দী হতে হয় বাণের কারাগারে। শ্রীকৃষ্ণ তাই কুপিত হয়ে বাণ রাজার হাত-পা সুদর্শন চক্র দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেন। কিন্তু শিবভক্ত বাণরাজা ঐভাবে রক্তাক্ত অবস্থায় ছিন্নভিন্ন শরীরেও মহাদেবের উদ্দেশ্যে নিত্য করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। অবশেষে তিনি ভক্তকে অমরত্ব বরদান করেন। তাই এই রীতি অনুসারে মহাদেবের ভক্ত সন্ন্যাসীদের শুদ্ধচিত্তে উপবাস সহ বাণবিদ্ধ ও রক্তাক্ত অবস্থায় নৃত্য করে। তাদের বিশ্বাস এতে মহাদেব খুশি হয়ে তাদের ধন, মান ও পরমায়ু বৃদ্ধি করবেন। আপাতদৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর মনে হলেও এই লোকউৎসব এর সাথে জিভ, চোখের পাতা, হাত, পা, পিঠে বাণ ফোঁড়া হয়। এটা মানুষের এক বিশ্বাস যা পরম্পরাগতভাবে এই উৎসব চলে এসেছে। “গাজনে সংক্রান্তির দিন কোথাও কোথাও ‘চড়ক’ বা ‘ঘূর্ণন’ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় যা বর্ষশেষে সৌরচক্রের পরিসমাপ্তি দ্যোতক ও নববর্ষের সূচনা ঘোষণা করে। চড়কে নিম্নবর্গের এই সমস্ত অন্ত্যজ লোকেরা বহু কষ্টসাধ্য প্রতিমুহূর্তে অসাবধানতায় নানারকম দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নিয়েও ‘বাণফোঁড়া’, ‘বড়শি ফোঁড়া’, ‘চড়ক ঘোরা’, ‘কাঁটা ঝাঁপ’, ‘বঁটি ঝাঁপ’, ঐ আগুন, সন্ন্যাস প্রভৃতির দ্বারা একদিকে যেমন দর্শক জনগণের মনোরঞ্জন করে, তেমনি শিবের কাছে সমস্ত অপরাধ কবুল করে কৃচ্ছসাধন পৃথক শুদ্ধিকরণ করে। পুরানো বছরের সমস্ত দুঃখ কর্ম, জ্বালা-যন্ত্রণা, অসুখ-বিসুখ, অত্যাচার, লাঞ্ছনা, অপমান, ভুলত্রুটি ভুলে নতুন বছরকে সুন্দর সম্ভাবনাময় করে তুলতে বুক বাঁধে। এইভাবেই বছরের পর বছর কেটে যায়। জগতের যারা মঙ্গলকামনায় এক কৃচ্ছসাগ্নি কষ্ট স্বীকার করে তারা সমাজ ব্যবস্থার যে তিমিরে-- সেই তিমিরেই থেকে যায়।” বৃহদ্ধর্মপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণের চৈত্র মাসে নিত্য গীত সহযোগে শিবের আরাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এতে চড়ক পূজার আলাদা উল্লেখ করা নেই।

গ্রাম বাংলার নিজস্ব পূজা আচার, অনুষ্ঠান নিজস্ব সাংস্কৃতিক কৃষ্টি বর্তমান। তাই লৌকিক দেবদেবীর পূজা বা অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যেও এখানে দেখতে পাওয়া যায়। “উচ্চ ভাবাদর্শে অতীতকালের সংস্কৃতির মৌলিক রূপ বর্তমানে উন্নত বা ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে মিশ্রিত বা নষ্ট হয়ে গেছে,- পল্লী অঞ্চলেও যে উন্নততর বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার লাভ একেবারে করেনি, সে কথা বর্তমানে আর বলা যায়না, তবে তা হয়েছে ধর্মতর (Secular) দিকটার উপর। কিন্তু পল্লীসমাজ ধর্মাচরণ বিষয়ে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল রিক্থবাহী পরিবর্তন বা আপোষ বিরোধী। ধার্মিক ব্যাপারে পল্লীর জনসাধারণ লোকায়ত বিধান বা অনুশাসন মেনে চলেছে বর্তমানেও।” চড়ক পূজায় ব্রাহ্মণের কোন ভূমিকা নেই। নারী-পুরুষ সবাই সন্ন্যাস বা ভক্ত্যা হতে পারেন। পুরুষ ভক্তরা দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করে কামিয়ে উপবীত ধারণ করে। তারা মন্ত্র উচ্চারণ এর মাধ্যমে দেবগোত্র বা শিব গোত্রে গোত্রান্তরিত হয়। প্রত্যেকের হাতে বেতের ছড়ি দেওয়া হয়।

এরা সকালে কিছু গ্রহণ করেন না। সারাদিন গৃহে গৃহে ভিক্ষা চেয়ে যে চাল ও সবজি পায় সেটা দিয়েই রাত্রে স্বপাকে হবিষ্যি খায়। স্নানের পর দন্ডী কেটে পথ পরিক্রমা করে। চড়কের কাঠ হল মূলত ডোবা বৃক্ষের কান্ড। সেটি জলে নিমজ্জিত করে রাখা হয়। নির্দিষ্ট দিনে নিয়মবিধি অনুসারে সেই কাঠ জল থেকে তুলে নিয়ে এসে মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত করা হয়। সেটি পুজো করা হয়। শুধুমাত্র বাংলাতে নয়, সুদূর আসামেও চড়ক পূজা হয়। মূলত: নমঃশুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে লোকায়ত অনুষ্ঠান হিসাবে এখনো চরক পুজো হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ময়না থানার চাঁদিবেনীয়া গ্রামের চড়ক পুজো বিখ্যাত। ময়না একসময় বাহুবলেন্দ্র রাজার গড় ছিল। উড়িষ্যার রাজার এষ্টেট ছিল এই অঞ্চলটি। মূলত: লাউসেনের গড় হলেও এটি উৎকল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, একটু ইতিহাসের দিকে তাহলে তাকানো যাক। "গৌড়ের অধিপতি দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে যুদ্ধে পরাজিত কর্ণসেন তাঁর অধীনে সেনভূম ও গোপভূম অঞ্চল শাসন করতেন। গৌড়েশ্বর মন্ত্রীর নাম ছিল মহামদ যার চক্রান্তে সোম ঘোষ একজন অনুগত প্রজা কারাগারে বন্দী হন। পরে এই সোম ঘোষের সাথে গৌড়েশ্বরের গাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপন হলে রাজপাট্টা, একটি ঘোড়া এবং একশ দেহরক্ষী সৈন্যসহ সোম ঘোষ কর্ণসেনের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ কর্ণসেনকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তাঁর ছয় পুত্রকে বিনাশ করে রাজ্যের অধিকার নেন।" সন্তান শোকে কর্ণসেনের স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। তখন গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে দক্ষিণবঙ্গের ময়নামণ্ডলের রাজত্ব দেন। কংসাবতীর শাখানদী কালিন্দীর জলপথে কর্ণসেন এই অঞ্চলে আসেন। তাঁর রাজধানীর নাম হয় কর্ণগড় যা পরবর্তীকালে ময়নাগড় নামে পরিচিত। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে লাউসেনের জন্ম হয়। একদা এই লাউসেনের সাম্রাজ্য বীরভূম থেকে ময়না পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। রাঢ় বাংলার ধর্মমঙ্গলের নায়ক এই লাউসেনের সাথে ময়নাগড়ের যোগসুত্র অতি গভীর। এখানে রাসমেলা খুব বিখ্যাত। বিনয় ঘোষ এর মতে ময়না বা ময়নাগড়ের প্রাচীন ও মধ্যকালীন ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক আছে। লাউসেনের এটি জন্মস্থান কিনা সে নিয়েও বিতর্ক আছে, তেমন লাউসেন কেবলই কিংবদন্তি চরিত্র কিনা তা নিয়েও যথেষ্ট আলোচনা জায়গা আছে। এই ময়নার অন্তর্গত যে কটি গ্রাম আছে তার মধ্যে চাঁদিবেনীয়া গ্রাম অন্যতম, চন্ডিয়া নদীর গায়ে অবস্থিত এই গ্রাম। বাকচা হল এই গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েত। চাঁদিবেনীয়া গ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতিতে তার নদীমাতৃকতা এক অনন্য রূপ দান করেছে। আলোচ্য গ্রামটি চন্ডিয়া নদীর ধারে সবুজ শস্য-শ্যামলায় সমাহিত। যদিও বর্তমানে জমিগুলি পরিণত হয়েছে মৎস্য ভেড়ী হিসাবে। মেদিনীপুরের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে ময়না একটু উঁচু ভূস্তরে বিরাজমান তাই এখানে বন্যার প্রকোপ তেমন হয় না। হিন্দু-মুসলিম বহু জনজাতি ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর বসবাস এখানে। গ্রামে মনসা পুজা, মদনমোহন ঠাকুরের পূজা সহ ষাঁড়ের পুজা, লক্ষ্মীপুজার

মতো বিভিন্ন ধর্মীয় পূজা ও লোকাচার হয়ে থাকে। এছাড়া চব্বিশপ্রহর, দোলযাত্রার মত অনুষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে গ্রামের নির্দিষ্ট লোকসংস্কৃতির ধারা লক্ষ্য করা যায়। উচ্চ ও নিম্নবর্গের মানুষরা গ্রামে বসতি করেছে। শান্তি ও সৌহার্দ্যের বাতাবরণ এই গ্রামে পরিলক্ষিত হয়। ময়না থানা থেকে মাত্র এগারো কিলোমিটার দূরে এই গ্রাম। প্রাইমারি ও হাইস্কুল এবং কলেজও এই অঞ্চলে আছে। কিন্তু চাঁদিবেনীয়া গ্রামে অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে যে পূজার জন্য গ্রামের জনসাধারণ উন্মুখ হয়ে বসে থাকেন সেটি নিঃসন্দেহে চাঁদিবেনীয়ার শিবের গাজন উৎসব বা চড়ক অনুষ্ঠান। এই প্রসঙ্গে ভব রায় মহাশয়ের একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে "সুদূর অতীত থেকে আজও বাঙালির লোকায়ত ও ধর্মীয় জীবনে শিবই সর্ব প্রধান দেবতা। তাই বাঙালির শৈব সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রও ফুটে উঠেছে অঞ্চলভিত্তিক নানা বৈচিত্র্য। শুধু গাজন নয়, বাঙালির শৈব সংস্কৃতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের মধ্যেও মিশে রয়েছে এমন সব রীতি-নীতি, ঐতিহাসিক ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে যার পুঙ্খানুপুঙ্খ, সামগ্রিক ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি। শৈব সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানে সমীক্ষা ও গবেষণার কাজ বিস্তৃততর ও গভীরতর হলে অতীতের বাঙালি লোকজীবনের অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাদান আবিষ্কৃত হতে পারে— এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। উৎসবও সংস্কৃতির এক অঙ্গ। বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠান, পূজাবিধি এইগুলোও লোকসংস্কৃতির সাথে যুক্ত। প্রাবন্ধিক গোপাল হালদার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি- মানুষের প্রায় সমুদয় বাস্তব ও সামাজিক রূপ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া তার শিল্প সৃষ্টি সমগ্র চারুকলা ও কারুকলার এই হল সংস্কৃতির স্বরূপ।" বিভিন্ন পপুলার কালচার তৈরি হচ্ছে প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় মানুষদের নিয়ে তার মধ্যে গাজন বা চড়ক'ই একটি অঙ্গ বলা চলে। ফোকলোরের উপাদান লোকসংগীত, অভিনয়, লোকচিত্রকলা, লোকনৃত্য, লোকনাটক এর উৎস আদিম সমাজ বা প্রিমিটিভ সোসাইটি। প্রতিটি সংস্কৃতির মধ্যে নিজস্ব দর্শন আছে। "লোকায়ত সমাজ লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে কৃত্রিমভাবে আরোপিত কোন কোন দৃষ্টি আড়ম্বরকারি রোমান্টিকতা নয় বরং লোকসমাজে বেঁচে থাকা মানুষের সংকট, যুদ্ধ, বঞ্চনা, সংগ্রাম ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে যে কঠোর বাস্তবতা আমাদের সমাজে বর্তমানে, তাকে দেখতে শেখাটাও লোকসমাজের বিশ্বরূপ দর্শনের সমতুল। আজকের লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের চর্চায়, সেই বিশ্বরূপ দর্শনের সময় এসেছে।" ময়নার বিভিন্ন অঞ্চলের অন্যান্য গ্রাম যেমন আসনান, মির্জানগর সহ আরো অন্যান্য গ্রামের চড়ক উৎসব হয়। চাঁদিবেনীয়া গ্রামের শিব মন্দিরটি যদিও অনেক প্রাচীন। শ্বেত শিবলিঙ্গের মন্দির এটি। কথিত আছে যে স্থানীয় 'কান্ডার' বংশ এই শিব মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা। বহু বছর পূর্বে চাঁদিবেনীয়া গ্রামের বর্ধিষ্ণু অভিজাত পরিবার ছিল এই কান্ডার বংশ। শোনা যায় যে এই কান্ডার বংশের পূর্বপুরুষ শরৎচন্দ্র কান্ডার তাঁর পুত্র সন্তান না হওয়ার জন্য শিবের কাছে মানত করেন। যথারীতি তাঁর পুত্র মাখনলাল কান্ডার জন্মগ্রহণের পর

তিনি শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দির সংলগ্ন পদ্মদিঘীও স্থাপন করেন, কান্ডারদের এই পরিবার দীর্ঘদিন চাঁদিবেনীয়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁদের জমি রেজিস্ট্রি করার ক্ষমতা ছিল এবং দুটি দোনোলা বন্দুকও তাঁদের ছিল। মাখন কান্ডারের পুত্র সুবোধ চন্দ্র কান্ডার কলকাতায় বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্গবাসী কলেজে পড়তেন। তিনি চাঁদিবেনীয়ারই একটি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি নাটক ও গানেও সমান পারদর্শী ছিলেন। কান্ডার বংশের সাথে বৈবাহিক সূত্র ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা, যশোর, নাটোরের পরিবারের। পরবর্তীকালে দেশভাগের পর কান্ডার বংশের পুরুষরা মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতেন। নদীপথে বজরা করে সেই পূর্ববঙ্গ থেকে নতুন বৌ এই গ্রামে পদার্পণ করতেন। চাঁদিবেনীয়া ছাড়াও এই বংশের নামডাক সেই হেঁড়িয়া, বাজকুল পর্যন্তও সমাদৃত। একসময় এই 'কান্ডার'রা দাপটের সাথে গ্রাম পরিচালনা করতেন। জনশ্রুতি আছে যে, একদা ঢাকার এক অভিজাত পরিবারে কন্যা যার সাত দাদা ছিলেন অক্সফোর্ড থেকে পড়াশোনা করে আসা আইনজীবি, বিবাহ হয়ে চাঁদিবেনীয়াতে আসেন। গ্রামের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট ছিলেন কান্ডার পরিবারেরই। সুতরাং এহেন পরিবারের তৈরি শিব মন্দির এবং এখানে চড়ক অনুষ্ঠান আশেপাশের গ্রামেও যথেষ্ট সমাদৃত। সাধারণত গাজন ১৫ দিন থেকে এক মাস অবদিও হতো। কিন্তু চাষবাসের প্রয়োজনে এই অনুষ্ঠান হয় প্রায় সাতদিন পর্যন্ত।

মোট ১৬ জন সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যা হয়। প্রধান ভক্ত্যা একজন থাকেন। সন্ন্যাসী পুরুষ ও মহিলা দুজনেই হতে পারেন। সন্ন্যাস হওয়ার আগের দিন নিরামিষ ভোজন করতে হয়। তারপরের দিন ব্রাহ্মণের দ্বারা গলায় সাদা যজ্ঞবীত পড়তে হয়। সারাদিন উপোস থাকার পর সন্ন্যাসীরা রাত্রে হবিষ্যি ও ফলাহার করেন। তারা তখন উপবীত গলায় ধারনের ফলে শিবগোত্র রূপে পরিচিতি পায়। এখানে কোন জাতপাত মানা হয়না। প্রায় সাতদিন কঠোর নিয়ম পালন করা হয়। তারপর নীলের বার হয় যা সধবা মহিলারা পালন করেন, একে নীল ষষ্ঠীও বলা হয়। অতঃপর নীলের পরেরদিন পুকুর থেকে চড়কের কাঠ তুলে বিধিসম্মতভাবে পূজা করা হয়। মন্দিরের সামনে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় চড়কের কাঠ স্থাপন করা হয়। এরপর ওই কাঠের দুই পাশে আরো কিছু তক্তা লাগানো হয়। গাজনের দিন সন্ন্যাসীরা উক্ত তক্তার উপর বসে ঘুরতে ঘুরতে বাতাসা, কলা ও ফলাদি গ্রামের দর্শকবৃন্দদের

উদ্দেশ্যে ছুঁড়তে থাকে। উল্টো হয়ে আগুনের সেই লেলিহান শিখাতে মাথা ঝুলিয়ে

বুকের কাছে হাতজোড় করে দুলতে থাকে। আগুনে তারা হাঁটেও। শরীরে বাণ ফুঁটিয়ে রক্তপাতও করে। কিন্তু তাদের মুখে কোন কষ্টের লেশমাত্র থাকেনা। দেবতার উদ্দেশ্যে তাদের এই কৃচ্ছসাধন দেখলে স্তম্বিত হয়ে যেতে হয়। আবার অনেকে শিব-পার্বতী সেজে গ্রামের মধ্যে প্রতি বাড়ি বাড়ি যায়। যেহেতু গাজন হল শিব দুর্গার বিবাহ উপলক্ষে অনুষ্ঠান তাই গ্রামবাসী সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করে। অবশেষে চড়ক অনুষ্ঠানের শেষে ব্রাহ্মণ সন্নাসীদের গলার যজ্ঞবীত খুলে দেওয়ার পরের দিন সবাই মৎসমুখ করেন। সেদিন হইচই আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র গ্রাম। কিন্তু বর্তমানে চাষাবাদকে কেন্দ্র করে সমস্যাজনিত কারণে বৈশাখ মাসে গাজন উৎসব পালিত হয় চাঁদিবেনীয়াতে। যাইহোক বর্তমানে গ্রামে কঠিন নিয়মে বাণ বিদ্ধ করে চড়ক অনুষ্ঠান হয়না। কিন্তু পূজাবিধি অতি নিষ্ঠার সাথে পালিত হয়। চড়ক পূজাকে কেন্দ্র করে ওই কয়েকদিন মন্দিরের চারপাশে মেলা বসে। সন্ধ্যের পর মা তার শিশুকে কোলে করে, বাবা তার সন্তানকে নিয়ে বা নেহাতই বন্ধুরা মিলে গ্রামের প্রায় সময়ই মেলাতে উপস্থিত হয়। গাজনের মেলাকে কেন্দ্র করে গ্রাম এবং তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষজন যেভাবে সৌহার্দ্য ব্যক্ত করে এবং একসাথে গাজন অনুষ্ঠানে আসে তা দেখলে ধর্মের উর্দ্ধে এক সাবলীল 'বসুধৈব কুটুম্বকম' বলা ভুল হবে না।

ধর্মের সাথে এক দর্শনও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশেষ করে লোকউৎসব বা লোকধর্মের নিজস্ব দর্শন আছে যা শাশ্বত। চড়ক বা শিবের গাজনের অনুষ্ঠানেও স্বতন্ত্র্য দর্শন কাজ করে। এই জীবন দর্শন বড়ই অদ্ভুত। ব্রাহ্ম্যবাদের পুজোগুলির সমান্তরালভাবে নিম্নবর্গীয় লৌকিক দেবদেবীর পূজার মাধ্যমে স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য রচনা করেছে। একে একপ্রকার উত্তরণ বলা যায়। অন্ত্যজ বা নিম্নবর্গীয় হয়েও ব্রাহ্মণদের মতো গলায় উপবীত ধারণ করে শিবগোত্র বা দেবগোত্রে যাওয়ার এই যে উত্তরণ তা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। কারণ যাদের নিম্নবর্গীয় বলে অবহেলা করা হতো, তাদেরকেই শিবগোত্র বা দেবগোত্র হওয়ার পর বহু উচ্চবর্গীয়রাই তাদের সম্মানের সাথে প্রনামও প্রদর্শন করে। "গাজন উৎসব যেহেতু লোকগীতি, লোকনাট্য, লোকনৃত্যের ত্রিবেণী সঙ্গম- সেহেতু মানুষজন তাদের নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের একটা উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ পায়। ঈশ্বর বিশ্বাস ও শত বিপদের মধ্যেও সেই শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আস্থা থেকে না টলার ফলে মানুষজন হাজার বিপদের দুঃখ, দারিদ্র, লাচ্ছনার সম্মুখীন হয়েও জীবনে শান্তিলাভ করে।" চড়ক অনুষ্ঠানের মূলত তিনটি ভাগ থাকে। এগুলি হল যথাক্রমে চড়ক পূজা, নীল পূজা, গাজন। ১৮৩৩ সালে দেওয়ান রামকমল সেন যিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি ছিল তিনি লিখেছিলেন— "The word Charak is derived from chakra or charaka, which means a circle and is used to signify moving or swinging in a circular direction; charak Sanyasa implies leaving off wordly business, living abstemiously, observing austerities for the propitiation of Siva", গাজনের সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে ক্লিচ্ছসাধনের

প্রক্রিয়া দেখা যায় তা অভূতপূর্ব। ঈশ্বরের সাথে নিজেকে একাত্ম করার প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে দেয়া যায়। তাই শরীরে কষ্ট দিলেও তারা হাসি মুখে সেটা উপভোগ করে কারণ ঈশ্বরের প্রতি তাদের এই বিশ্বাস ও প্রেম অতি দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে, যেমন তারকেশ্বরে মহাদেবের মাথায় জল ঢালতে প্রতি চৈত্র ও শ্রাবণ মাসে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা খালি পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরে যায়। পথের ধুলোমাখা ক্লান্তিতে তারা দমে যায় না বরং পা ফুলে বা কেটে যন্ত্রণা হলে তারা কাঁধে বাঁক নিয়ে বাবার থানে যায়। কিন্তু তাদের মুখে যন্ত্রনার লেশমাত্র থাকে না অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য এই ব্যথা যন্ত্রণা সহ্য করা মধ্যেও তাদের চোখে-মুখে এক আত্মতৃপ্তি কাজ করে। এর মধ্যে তাদের কঠোর সংযম লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের অসীম শক্তির কাছে নিজেদের সমর্পন করার এই প্রবণতা থেকেই তাদের মনের জোর বুঝতে পারা যায়। লোকধর্মের মধ্যে এত গভীর দর্শন আছে যার জ্ঞান আস্বাদন করা এক দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া। সমাজ ক্রম বিবর্তনশীল। সুতরাং বিবর্তিত লোকধারার অঙ্গ হিসাবে গাজন বা চড়ক অনুষ্ঠান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। মানুষে মানুষে বিভেদ ভুলে ঈশ্বর সাধনার এই যে প্রয়াস এটাই বোধহয় গাজনের স্বার্থকতা।

তথ্যপঞ্জী :

১। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক সাহিত্য, ১ম খন্ড, ১৯৬২, পৃঃ ১৯৩, মনোজিৎ অধিকারী, 'গাজন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১৬, পৃঃ ১৭।

২। মনোজিৎ অধিকারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

৩। চিন্তাহরন চক্রবর্তী, 'হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান, ১৩৭৭, পৃ. ১৩৩, ডঃ রতন কুমার নন্দী, 'বাংলার গাজন', Thoughts and expressions, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ ফর উইমেন, ২০০৯ – ১১, পৃঃ ১৫।

৪। ভাস্করব্রত পতি, বাংলার 'চড়ক গাজন' আসলে শিবের বিয়ের উৎসব, http://www.midnapore.in

৫। তারিনী শঙ্কর চক্রবর্তী, 'বাংলার উৎসব', ১৩৬৯, পৃ। ৯৩, ডঃ রতন কুমার নন্দী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

৬। প্রানকৃষ্ণ দত্ত, 'চড়ক উৎসব', শ্রী অমরেন্দ্র নাথ রায় (সম্পা.), 'বাঙ্গালীর পূজা-পার্ব্বন', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৬, পৃঃ ৯০।

৭। অমলেন্দু মিত্র, 'রাঢ়ের সংস্কৃতি', ১৯৭২, পৃ. ৫১, ডঃ রতন কুমার নন্দী, 'বাংলার গাজন', প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

৮। গাজনের ইতিকথা – ২, www.vinnosomoy.in

৯। প্রদীপ্ত সামন্ত, 'লোকসংস্কৃতির প্রবহমান ধারায় গাজন আজও উজ্জ্বল', 'ভান্ডার', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন, ১৯১৮, পৃঃ ৯।

১০। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ‘বাংলার লৌকিক দেবতা’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ভূমিকা (খ)
১১। পূর্ব মেদিনীপুরের ইতিহাস, খেয়ালপাতা, ১৯শে নভেম্বর, ২০১৯, https://duttasubhankar.wordpress.com
১২। বিনয় ঘোষ, ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’, দ্বিতীয় খন্ড, প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬, কলকাতা, পৃঃ ১৪৬।
১৩। ভব রায়, ‘রাঢ় বাংলার মাটি মানুষ ও সংস্কৃতি’, মর্ডান কলাম, কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ ৭৭।
১৪। ভব রায়, ‘বাংলার লোককৃত্ত ও লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা’, জয়দূর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৪০৮, পৃঃ ৫।
১৫। শেখ মকবুল ইসলাম, ‘লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞানঃ তত্ত্ব পদ্ধতি ও প্রয়োগ’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ৪৭৫।
১৬। প্রদীপ্ত সামন্ত, ‘লোক সাংস্কৃতির প্রবহমান ধারায় গাজন আজও উজ্জ্বল’, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।
১৭। Amitabha Gupta, ‘The colourful festival of Charak Gajan in West Bengal thrills and dance’, Published 14.04.22, http://www.telegraphindia.com

গ্রন্থপঞ্জী:

১। মনোজিৎ অধিকারী, ‘গাজন’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১৬।
২। ডঃ রতন কুমার নন্দী, ‘বাংলার গাজন’, Thoughts and expressions, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ ফর উইমেন, ২০০৯ – ১১।
৩। ভাস্করব্রত পতি, বাংলার ‘চড়ক গাজন’ আসলে শিবের বিয়ের উৎসব, http://www.midnapore.in
৪। ভাস্করব্রত পতি, বাংলার ‘চড়ক গাজন’ আসলে শিবের বিয়ের উৎসব, http://www.midnapore.in
৫। প্রানকৃষ্ণ দত্ত, ‘চড়ক উৎসব’, শ্রী অমরেন্দ্র নাথ রায় (সম্পা.), ‘বাঙ্গালীর পূজা-পার্ব্বন’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৬।
৬। গাজনের ইতিকথা – ২, www.vinnosomoy.in
৭। প্রদীপ্ত সামন্ত, ‘লোকসংস্কৃতির প্রবহমান ধারায় গাজন আজও উজ্জ্বল’, ‘ভান্ডার’, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন, ১৯১৮।
৮। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ‘বাংলার লৌকিক দেবতা’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬৬।
৯। পূর্ব মেদিনীপুরের ইতিহাস, খেয়ালপাতা, ১৯শে নভেম্বর, ২০১৯, https://duttasubhankar.wordpress.com

১০। বিনয় ঘোষ, ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’, দ্বিতীয় খন্ড, প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬, কলকাতা।
১১। ভব রায়, ‘রাঢ় বাংলার মাটি মানুষ ও সংস্কৃতি’, মর্ডান কলাম, কলকাতা, ২০১৩।
১২। ভব রায়, ‘বাংলার লোককৃত্ত ও লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা’, জয়দূর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৪০৮।
১৩। শেখ মকবুল ইসলাম, ‘লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞানঃ তত্ত্ব পদ্ধতি ও প্রয়োগ’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১।
১৪। Amitabha Gupta, ‘The colourful festival of Charak Gajan in West Bengal thrills and dance’, Published 14.04.22, http://www.telegraphindia.com

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক

রূপা মণ্ডল
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের সম্পর্ক যতটা না ছিল ব্যক্তিগত তার চেয়েও অনেকটা বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল তাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক।তাদের এই রাজনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাস ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের এবং তার অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইতিহাসের সঙ্গে ওত প্রত জড়িত।

দেশের সাধারণ মানুষের মনে স্বাধীনতা-স্পৃহা ও সংগ্রামী মনোবল সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ সংগ্রাম এবং তার চরিত্র শক্তির প্রভাব অবদানকে কবি বার বার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর সমাজ-আর্থনীতিক ও রাজনীতিক দর্শন ইত্যাদির বিরুদ্ধে কবির যুক্তিবাদী মন বার বার প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। বিশেষ করে গান্ধীজীর 'হিন্দ স্বরাজ-তত্ত্ব' ও চরকার আর্থনীতিক ও রাজনীতিক দর্শনের বিরুদ্ধে। এসব প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে সাময়িক পত্রে দীর্ঘ বিতর্ক ও বাদানুবাদ হয়েছে। গান্ধীজীর অনুসৃত বা নির্দেশিত পথে যে দেশের 'স্বরাজ'বা 'মুক্তি' আসবেনা, একথা কবি বারবার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন।

কবির দুঃখ ক্ষোভের কারণ আরো এই যে, প্রধান কংগ্রেস নেতারাও অনেকেই সে কথাটা ভালো করেই জানতেন, তবু স্পষ্ট করে তা বলার কিংবা গান্ধীজীর প্রকাশ্য বিরোধিতার সাহস তারা করতেন না।

বছর পর, ১৯২৮ ও ২৯ সালে কলকাতা ও লাহোর কংগ্রেসের সময় তিনি যেন কিছুটা আশার আলো দেখতে পান। এই সময়ে বামপন্থী শক্তির দুই উদীয়মান নেতা জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পরবর্তীকালে 'আইন অমান্য' আন্দোলনের সময় থেকে এই দুই উদীয়মান বামপন্থী নেতার কার্যকলাপ ও ভূমিকার প্রতি কবি লক্ষ্য রেখে চলেন। কিন্তু তবুও জহরলাল অপেক্ষা সুভাষচন্দ্রের প্রতি তিনি ক্রমে যেন বেশি করেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গান্ধীজী সম্পর্কে জহরলাল এর দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও দুর্বলতার ভাবটা কবির দৃষ্টি আড়ায়নি।পক্ষান্তরে, সুভাষ চন্দ্রের মধ্যে কবি এই ধরনের কোন দুর্বলতার লক্ষণ দেখতে পাননি।

ইউরোপে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত The Indian Struggle গ্রন্থটি রচনা করেন। সুভাষচন্দ্র তার এই গ্রন্থে গান্ধীজীর ভূমিকা এবং তার রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। গ্রন্থ রচনা শেষ হওয়ার মুখে সুভাষচন্দ্র ভিয়েনা থেকে কবিকে ওই গ্রন্থের ভূমিকা লেখার জন্য বার্নার্ড বা এইচ. জি. ওয়েলস কে সুপারিশ করে পত্র লিখতে অনুরোধ জানান। এই চিঠিতে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন (3 আগস্ট, 1933):

“Bernard Shaw বা wells মহাশয় গান্ধীজী সম্বন্ধে উচ্চ ধারনা পোষণ করেন কিন্তু তাঁহারা অন্ধভক্ত নয় সুতরাং তাহারা হয়তো রাজি হইতে পারেন। আপনার কথাও আমার মনে হইয়াছিল, কিন্তু আমি জানিনা আপনি রাজনীতিক বিষয়ক পুস্তকের জন্য কিছু লিখতে ইচ্ছুক হইবেন কিনা, তদ্ব্যতিত, আপনি নিজে সম্প্রতি মহাত্মাজীর অন্ধভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন- অন্ততপক্ষে আপনার লেখা পাঠ করিলে সেরূপ ধারণা মানুষ স্বভাবত: পোষণ করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় মহত্মাজীর সমালোচনা আপনি বরদাস্ত করিতে পারিবেন কিনা আমি জানিনা।“

গান্ধীজী সম্পর্কে এমন অভিযোগে হয়তো তিনি কিছুটা ব্যথিতও হয়েছিলেন। তার কারণ গান্ধীজি যেখানে সত্যিই বড়, ---এবং ভারতের রাজনীতিতে তাঁর যেটা শ্রেষ্ঠ অবদান, তাকে অস্বীকার করাটাই অন্ধত্ব বলে তিনি মনে করতেন। সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে কবি সুভাষচন্দ্র কে তার জবাবই পত্রের এক জায়গায় লেখেন (17 আগস্ট, 1934):

“মহাত্মা গান্ধী অতি অল্প কালের মধ্যে, সমস্ত ভারতবর্ষের মনকে এক যুগ থেকে আর এক যুগে নিয়ে যেতে পেরেছেন। কেবল একদল রাষ্ট্রনৈতিকের নয়---সমস্ত জনসাধারণের মনকে তিনি বিচলিত করতে পেরেছেন ---আজ পর্যন্ত আর কেউ পারেনিI এর পূর্বে ভারতবর্ষের এখানে ওখানে ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে দুর্বল রকমের রাষ্ট্রনৈতিক সুড়সুড়ি লেগেছিল মাত্র। মহাত্মাজীর চরিত্রের মধ্যে এই একটা প্রবল নৈতিক শক্তিকে ভক্তি যদি না করতে পারি তবে সেটিকেই বলবো অন্ধতা। অথচ তার সঙ্গে আমার স্বভাবের, বুদ্ধি ও সংকল্পের বৈপরীত্য অত্যন্ত প্রবল। মনের দিকে, কল্পনার দিকে ,ব্যবহারের দিকে, তিনি আর আমি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর জীব। কোন কোন বিষয়ে তিনি দেশের ক্ষতি করেছেন--কিন্তু দেশের নির্জীব চিত্তে হঠাৎ যে বল এনে দিয়েছেন একদিন সেটা সমস্ত ক্ষতিকে উত্তীর্ণ হয়ে টিঁকে থাকবে। আমরা কেউই দেশকে এই প্রাণশক্তি দিইনি“।

সুভাষ চন্দ্রের স্পষ্টবাদীতা এবং নির্ভীক বলিষ্ঠ নেতৃত্বসুলভ গুণাবলীর পরিচয় পেয়ে কবি ক্রমেই তার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র অবশ্য বার্ণাড বা ওয়েলস কে তার গ্রন্থের ভূমিকা লেখার জন্য অনুরোধ করেননি। পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দেশে আসার পথে তার এই গ্রন্থের টাইপ কপি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে নিলে তার প্রতিবাদে বার্ণাড শ; এইচ. জি. ওয়েলস, প্রমুখর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিছুদিন পর গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলে ইংরেজ সরকার তা ভারতে নিষিদ্ধ করে দেয়।

এর বছর দেড়েক পর, ইংরেজ সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদানের জন্য দেশের পথে যাত্রা করেন। ১ ই এপ্রিল (১৯৩৬) ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। ঐদিন বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সুভাষচন্দ্রকে গ্রেফতার করে। এইসব ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের প্রতি কবির দৃষ্টি বেশি করে আকৃষ্ট হয়, ১০ই মে সুভাষ চন্দ্রের মুক্তি দাবিতে (সেই সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের) 'সুভাষ দিবস' পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই উপলক্ষে কবি এক বিবৃতিতে ইংরেজ সরকারের দমননীতির প্রতিবাদ করে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবি জানালেন। প্রবল জনমত ও আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার কিছুদিন পর সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়, কবি সে সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলেন I

জহরলাল ও সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি, লেবার পার্টি, এম.এন. রয় পন্থী প্রভৃতি বামপন্থী দল ও গোষ্ঠী কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী রাজনীতির প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে, অপরদিকে জাতীয় ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নে কিষান সভা, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি গণ সংগঠনের মাধ্যমে সেই গণ-আন্দোলনকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দিকে সম্প্রসারিত করতে তাঁরা প্রয়াসী হন। বলাবাহুল্য, এসব আন্দোলনে তারা রবীন্দ্রনাথকে পুরো ভাগে পেতে সমর্থ হন।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে প্রগতিশীল রাজনীতির সূচনা হয়েছিল বিভিন্ন দিক থেকেই তা কবিকে খুব আকৃষ্ট করেছিল বিশেষত জাতীয় আর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে।

ড: মেঘনাথ সাহার পরামর্শে ও সহযোগিতায় সুভাষচন্দ্র যে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন এর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, কবিকে তা খুবই আকৃষ্ট করেছিল।ড: সাহা শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবি এবং তার সেক্রেটারিকে বোঝান যে, প্ল্যানিং, কমিশনকে বাস্তবায়িত করে তুলতে হলে সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতি পদে পুনঃনির্বাচন দরকার। আর কবি। যদি এই ব্যাপারে গান্ধীজি ও জহরলাল কে অনুরোধ বা সুপারিশ করে লেখেন তাতে আর কোনো বাধা থাকবে না।

ড: মেঘনাদের এই প্রস্তাব কবির খুব মনে ধরে এবং এজন্য তিনি সুভাষ চন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতি পদে পুনঃনির্বাচনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে গান্ধীজি ও জহরলালকে পত্রও দেন। কিন্তু তাঁর সে অনুরোধ রক্ষিত হয়নি। এছাড়াও বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ নতুন করে পুনর্গঠিত করার সংকল্প ও ইচ্ছা শেষ বয়সে কবির মনে খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল, বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত দেখার পর। এই কাজে তিনি সুভাষ চন্দ্রের সহায়তা কামনা করে তাঁকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন। সুভাষচন্দ্র সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে শান্তিনিকেতন গেলে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। কবি তাঁর শেষ জীবনের ইচ্ছা ও কামনার কথাটা শোনাবার জন্য কলকাতায় প্রকাশ্য সম্বর্ধনা সভায় সুভাষচন্দ্রকে "দেশনায়ক" রূপে বরণ করে নেওয়ার সংকল্প করেছিলেন।

সভার স্থান তারিখ এমনকি "দেশনায়ক" শীর্ষক কবির অভিভাষণটি ছাপাও হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে অনুষ্ঠানটি স্থগিত রাখতে হয়।

ত্রিপুরীতে দক্ষিণপন্থী নেতারা যেসব কুটকৌশল অবলম্বন করেছিলেন এবং তাদের বক্তৃতায় ও আচরণে যে উদগ্র ক্ষমতা, লালসা ও আস্ফালন প্রকাশ পায় তাকে 'ফেসিস্টিক মুস্টিপেশন' বলে অভিহিত করে কবি তাঁর মনের ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।ত্রিপুরী কংগ্রেস এবং তার পরবর্তী ঘটনায় সারা বাংলাদেশে যে প্রচন্ড বিক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়, কবি তাতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য গান্ধীজিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষিত হয়নি। এরপর ওয়র্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিলে এ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপের জন্য তিনি গান্ধীজিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেটাও রক্ষিত হয়নি। ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্র যে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার প্রশংসা করে তিনি পত্রে সুভাষচন্দ্র কে সহানুভূতি ও মর্ম বেদনা জ্ঞাপন করেন। এমনকি ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারেও তিনি সুভাষচন্দ্রকে কিছু পরামর্শ দিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। সে মুহূর্তে তিনি কংগ্রেসের দলীয় রাজনৈতিক পক্ষভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

"কংগ্রেস" শীর্ষক ঐতিহাসিক পত্র প্রবন্ধে কবি গান্ধীজীর ভক্ত অনুগামীদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে লেখেন "আজকের দিনে কোন জননায়ক পলিটিক্সকে কোন পথে নিয়ে যাবেন তা নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে....।

নিশ্চিত বিচার করা আমার পক্ষে কঠিন। আমি পলিটিক্সে প্রবীণ নই। একথা মানি, যারা শক্তিশালী তারা নতুন পথে অসাধ্য সাধন করে থাকেন। মহাত্মাগান্ধী তার প্রমান। তবুও তারা স্বীকৃত সকল অধ্যবসায় চরমতা লাভ করবে এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয়। অন্য কোন কর্মবীরের মনে নতুন সাধনার প্রবণতা যদি জাগে তাহলে দায়িত্ব

পড়লেও সে বীর হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। সেজন্য হয়তো অভ্যস্ত পথে না চলে অনভ্যস্ত পথে তাকে দল বাঁধতে হবে, সে দলের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতেও তাকে আরো সময় লাগবে। কংগ্রেসের অভিমুখে যদি কোন কৃতী নতুন পথ খুলতে পারেন, আমি অনভিজ্ঞ, তার সিদ্ধি কামনা করব, দেখব তার কামনার অভিজ্ঞতা ----কিন্তু দূরের থেকে।“...

কিন্তু এরপর তিনি সরাসরি সুভাষচন্দ্র এবং তার পথ ও কর্মসংগঠনকে অভিনন্দন জানিয়ে তাকে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার আশ্বাস জানিয়ে দিলেন সবার কাছে। মনে হয়, ক্ষমতালোলুপ হাই কমান্ড নেতাদের নিরবিচ্ছিন্ন আক্রমণের জন্য সুভাষচন্দ্রের প্রতি তার আন্তরিক দরদ ও সহানুভূতি বেশি করে প্রকাশ পায়। কলকাতায় সুভাষচন্দ্র কে প্রকাশ্য অভিনন্দন জ্ঞাপনের সংকল্পটা কয়েক মাস আগে কবি স্বয়ং আগ্রহ প্রকাশ করে তাকে জানিয়েছিলেন। সুভাষ চন্দ্রের চরম লাঞ্ছনা ও অসম্মানের মধ্যে তাকে উৎসাহিত সম্মানিত করার জন্য এই প্রকাশ্য অভিনন্দন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই যেন কবি এই পত্র প্রবন্ধ খানি রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক অধিকারআদি ক্রমাগত খর্ব ও সংকুচিত করার প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বামপন্থীরা যখন বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন হাইকমান্ড তা অঙ্কুরেই বিন্যস্ত করার জন্য সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে সুভাষচন্দ্র তিন বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন। এর প্রায় এক পক্ষকাল পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় (1লা সেপ্টেম্বর 1939)।

সুভাষ চন্দ্রের বিরুদ্ধে ওয়ার্কিং কমিটির এই শাস্তি ব্যবস্থায় কবি মর্মান্তিক আঘাত পান। তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তকে কোন আমল না দিয়ে এর মাত্র এক সপ্তাহ পরে ঊনিশে আগস্ট কলকাতায় এসে সুভাষচন্দ্র আয়োজিত 'মহাজাতি সদন' ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করে তার ভিত্তি স্থাপন করেন। পূর্বে কবি স্বয়ং এই ভবনের 'মহাজাতি সদন'নামকরণ করে পাঠান। এই কাজের দ্বারা কবি বোঝাতে চান তার সহানুভূতি ও সমর্থন সুভাষের প্রতিই।

রামগড় কংগ্রেসের আগেই বামপন্থীদের প্রধান দুর্গ---বি পি সি সি-র বিরুদ্ধে হাইকমান্ড উপর্যুপরি আঘাত হেনে চলেন। কংগ্রেস থেকে সুভাষচন্দ্রের বহিষ্কার এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নির্বাচিত কার্যনির্বাহ কমিটি ও ইলেকশন ট্রাইব্যুনালকে অসিদ্ধ বলে নাকচ করে দেয়।

ওয়ার্কিং কমিটি বি .পি. সি. সি -র সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করেই গান্ধীবাদী নেতা সতীশ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট এক 'ইলেকশন ট্রাইব্যুনাল' গঠন করলেন। তাছাড়া কোন সঠিক কারণ না দেখিয়ে হাই কমান্ড ও বি.পি.সি.সি.এর

তহবিল ও হিসেব পরীক্ষার জন্য 'মেসার্স বাটলি বয় এন্ড্রোকোং' নামে বাইরের একটি সংস্থাকে অডিট করার জন্য নিযুক্ত করেন।

15 ডিসেম্বর (1939) কবি বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার জন্য মেদিনীপুর যাত্রা করেন। পথিমধ্যে হাওড়া স্টেশনে সুভাষচন্দ্র কবিকে সংক্ষেপে সবই খুলে বললেন। কবি সবই বুঝলেন।

শান্তিনিকেতন ফেরার পর, 20 ডিসেম্বর, কবি গান্ধীজি ও কংগ্রেস হাইকমান্ডকে সুভাষ চন্দ্রের বিরুদ্ধে শাস্তিব্যবস্থা প্রত্যাহার এবং জাতীয় ঐক্যের স্বার্থেই তার সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের অনুরোধ জানিয়ে এক জরুরী তারবার্তা পাঠান।

ওয়র্কিং কমিটির তখন গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন চলছে। বলাবাহুল্য, কবির এই অনুরোধ রক্ষিত হয়নি। সুভাষচন্দ্র ও বামপন্থী প্রভাবিত বি. পি. সি. সি. কে উদযাপন করার জন্য কৃত সংকল্প হয়েই তারা ওয়ার্কিং কমিটির এই অধিবেশন ডাকেন। 21 ডিসেম্বর, ওয়ার্কিং কমিটি বি.পি.সি. সি কে কার্যত খারিজ করে তার জায়গায় মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে আটজনের একটি 'এড হক'(Ad-hoc committee) কমিটি নিয়োগ করেন।

গান্ধীজী তার জবাবী তারবার্তায় কবিকে জানান যে, অনেক বিচার বিবেচনার পর ও কমিটি কবির অনুরোধ রক্ষা করতে পারছেন না। কবি যেন সুভাষচন্দ্র কে দলে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলার পরামর্শ দেন। কয়েকদিন পর অ্যান্ডরুজ কে এক পত্রে গান্ধীজী লিখলেন যে, সুবাস 'পরিবারের নষ্ট ছেলের' মত আচরণ করছে, আর ব্যাপারটা এমনই জটিল যে তার ফ্যয়শালা ; 'গুরুদেবের কর্ম নয়',I

এসব ঘটনায় এবং গান্ধীজীর জবাবী পত্রে কবি ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হন। কিন্তু তীব্র উত্তেজনাকর রাজনৈতিক বিতর্ক ও বিরোধ সংঘাতের মধ্যে, নিজেকে জড়িত করায় কবির অনেক বাস্তব বাধা ও অসুবিধা ছিল।

তবে কবি সুভাষচন্দ্র ও বামপন্থীদের সব কার্যকলাপ কেই সমর্থন বা অনুমোদন করেননি। কৌশলগত দিক হতে ও তাঁর কিছু কিছু ভুল হয়েছিল, যার জন্য কবি মনে মনে কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলেন। বিশেষ করে মালিকান্দা ও রামগড় কংগ্রেসের পরবর্তী ঘটনা ও আন্দোলনে। বিরুদ্ধ পক্ষের উপর্যুপরি আক্রমণ, অপপ্রচার, কুৎসা এবং প্রচন্ড প্ররোচনার ফাঁদে পা দিয়ে সুভাষচন্দ্রও যে তাদের জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন, একথা উপলব্ধি করতে কবির কোন অসুবিধা হয়নি। তবে সুভাষ চন্দ্রের কিছু ভুল ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম, প্রগতিশীল বামপন্থী চিন্তা ধারা ও বলিষ্ঠ সংগ্রাম প্রবণতা কবির মনকে কিছুটা আশা আস্থা ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিল। সুভাষ চন্দ্রের অন্তর্ধানের সংবাদে কবি যে কতখানি অধীর ও উদগ্রীব হয়েছিলেন, শরৎ

ঘোষের কাছে তারবার্তা ও অনিল চন্দ্রকে প্রেরণ, প্রভৃতি ঘটনায় তার কিছুটা আভাস মেলে

তথ্যসূত্র:

রবীন্দ্রনাথ: কয়েকটি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নেপাল মজুমদার।
দেজ প্রথম সংস্করণ: কলিকাতা পুস্তক মেলা জানুয়ারি **১৯৯৯**।

শ্রেনি চেতনা, শ্রেনি ঐক্য এবং বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯০৫-১৯১১)

দীপ শঙ্কর নাইয়া
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালি মুসলমি মানস যখন নানাবিধ সংশয় ও ক্ষমতায়নের জন্য তৎপর ছিল ঠিক সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা নিয়ে একটি প্রদেশ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে আর একটি প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় এবং ১৬ই অক্টোবর বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করে এক নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।[১] প্রশাসনিক কারণে এইবঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হলেও ব্রিটিশ শাসকদের বিভাজন ও শাসন নীতি ছিল এই ব্যবস্থার অন্যতম কারণ।'লর্ড কার্জন' (১৮৫৯-১৯২৫) যুক্তি দেখান যে বঙ্গদেশের মতো বৃহৎ প্রদেশ একজন লেফটেনান্ট গর্ভনরের পক্ষে শাসন করা সম্ভব নয়। বঙ্গভেদের পিছনে প্রশাসনিক সমস্যাগত যুক্তিকে উপস্থাপন করা হলেও ঔপনিবেশিক শাসকদের বাংলা বিদ্বেষ ছিল এর অন্তর্হিত কারণ।[২]

জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনার প্রধান শক্তি বাঙালি জাতিকে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভাজিত করা ছিল এই বঙ্গচ্ছেদের প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯০৫ সালের বঙ্গচ্ছেদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অনেক আগে থেকেই ঔপনিবেশিক শাসকদের মধ্যে বঙ্গচ্ছেদের বিষয়ে ভাবনাচিন্তার সূত্রপাত ঘটেছিল। বাংলার ভৌগোলিক পরিসীমাও ১৯০৫ সালের পূর্ববর্তী সময়ে নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছিল। বাংলা সুবা গঠনের সময় (১৮৫৪ খ্রি.) বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন ছিল খুবই বড়। পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ বাদে সমস্ত উত্তর ভারত এই সুবার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় শাসনতান্ত্রিক অসুবিধা গভীরভাবে অনুভূত হয়। ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম লোকগণনায় দেখা যায় বাংলার লোকসংখ্যা ৬ কোটি ৭৯ লক্ষের কাছাকাছি হয়। এই অবস্থায় ছোটলাট 'ক্যাম্পবেল' (১৮৩৫-৮০) মুসলমানের স্বার্থে ২ কোটি হিন্দিভাষী অধ্যুষিত এলাকাকে বাংলা থেকে পৃথক করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু বড়লাট 'নর্থব্রুক' (১৮২৬-১৯০৪) এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন এবং ১৮৭৪ এ ২০ লক্ষ মানুষ সমন্বিত আসামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।[৩]

অভিজ্ঞ ও উচ্চকাঙ্ক্ষী সিভিলিয়ানদেরকাছে এই অতি ক্ষুদ্রপ্রদেশে কাজকরার অনীহা প্রকটভাবে দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'উইলিয়াম ওয়ার্ড' চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে একটা স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব দেন।[৪] শেষপর্যন্ত এই প্রস্তাবটিও বাতিল হয়। 'লর্ড কার্জন' (১৮৫৯-

১৯২৫)ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে এই অঞ্চলের পুনগর্ঠনের দিকে বিশেষ নজর দেন।[৫] ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন আসাম সফরে গেলে সেখানকার চা-বাগিচা মালিকেরা আসাম-বাংলা রেলপথ ও কলকাতা বন্দর মারফত চা-রপ্তানির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং চট্টগ্রামের মতো নিকটবর্তী বন্দর মারফত চা-রপ্তানির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সময় কার্জন একযোগে বাংলা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের সীমানা পুনর্বিন্যাসের কর্মসূচী নেন। তাঁর নির্দেশক্রমে 'ফ্রেজার' খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং ভারত সচিব 'রিজলে' (১৮৫১-১৯১১) এই পরিকল্পনাটি অনুধাবন করে ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর 'রিজলে পত্র' নামে প্রকাশ করেন। এতে বলা হয় চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা ও ময়মনসিংহকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসামে' নামে একটি প্রদেশ গঠন করা হবে। বাংলার সাথে মাদ্রাজ ও সম্বলপুর যুক্ত করা হবে। কার্জন বঙ্গবিভাগ চূড়ান্ত প্রস্তাব তৈরি করে ইংল্যন্ডে পাঠান (ফেব্রুয়ারী ১৯০৫)।[৬] ভারত সচিব 'সেন্ট জন ব্রডরিক' (১৮৫৬-১৯৪২) এই প্রস্তাবের পক্ষপাতী না হলেও শেষপর্যন্ত কার্জনের দৃঢ়তার জন্য পিছিয়ে আসেন। ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই ভারত সরকার বঙ্গভঙ্গের সরকারি আদেশনামা জারি করেন এবং ১৬ই অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়। চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ আসামের সাথে যুক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামক নতুন প্রদেশের জন্ম হয়। এবং হিন্দিভাষী বিহার ও উড়িষ্যাকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।[৭]

উনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী সামাজ্যবাদের প্রসার ও ঔপনিবেশিকতার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো ভারতেও সামাজিক স্তরবিন্যাসের পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। বাংলার ক্ষেত্রে এই সামাজিক স্তরবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটেছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট একদল নতুন জমিদার ও জমিতে মধ্যস্বত্বভোগীকে উত্থানের মধ্য দিয়ে। ক্রমেই কলকাতাকেন্দ্রিক নাগরিক সভ্যতা ও ভদ্রলোক সংস্কৃতির উন্মেষ এই সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রক্রিয়াকে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় করে।[৭] ঔপনিবেশিক শাসনকে সুদৃঢ়করনের জন্য গৃহীত পশ্চিমী শিক্ষার প্রসারকে এই নব্য ভদ্রলোক শ্রেণি আত্মস্থ করে বৌদ্ধিক জাগরন তথা নবজাগরণের মাধ্যমে নিজেদের 'শ্রেণি' কাঠামোকে সুদৃঢ় করেছিল। মূলত 'বর্ণহিন্দু' ও 'কলকাতা কেন্দ্রিকতার' জন্য এই ভদ্রলোক শ্রেণির বৌদ্ধিক জাগরণ তথা জাগরণ গ্রামাঞ্চলের নিম্নবর্ণীয় হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে স্পর্শ করতে অসমর্থ হয়।[৮] উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ভদ্রলোক শ্রেণির মধ্যে উদ্ভুতরাজনৈতিক জাগরণেও নিম্নবর্ণীয় হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল ব্রাত্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার হিন্দু-মুসলমান এবং বর্ণহিন্দু-নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের এই আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অসম বিকাশের ফলে একদিকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং অন্যদিকে নিম্নবর্ণীয় ও মুসলমান সম্প্রদায়ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক সচেতনতার ভিত্তি সুপ্রিতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৮৫৮ সালে মহারাণির ঘোষণাপত্রের দ্বারা ভারতবর্ষ সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ কালপর্বে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে ইংরেজি শিক্ষার ও নবজাগরণের ফলে উদ্ভূত শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিভিন্ন সভা, সমিতির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিকশিত হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে এই রাজনৈতিক চেতনা রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের আকাঙ্ক্ষাতে পরিণত হয় যার ফলশ্রুতিতে ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেস। মূলত ইংরেজি শিক্ষিত বর্ণহিন্দু, বিত্তবান শ্রেণির মধ্যে বিরাজমান এহেন রাজনৈতিক প্রবনতার পাশাপাশি নিম্নবর্ণীয় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্বতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা প্রবহমান ছিল। ১৮৭১-৭২ সালের প্রথম আদমশুমারি এই প্রবণতাকে পরিপুষ্ট করেছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা নানাভাবে পরিশীলিত হয়ে 'জাতিচেতনা' 'ধর্মীয় চেতনা''শ্রেণিচেতনা'র আবহে আবর্তিত হতে থাকে যা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের থেকে বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনাকে স্বাতন্ত্রতা দান করেছিল।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করায় বাংলার বর্ণহিন্দু, মুসলমান ও নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গিয়েছিল। বাঙালি শিক্ষিত, পেশাজীবি হিন্দুদের কাছে এই বঙ্গভঙ্গ ছিল চরম বিপর্যয়মূলক সিদ্ধান্ত কারণ খণ্ডিত বাংলাপ্রদেশের জনসংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লক্ষের মধ্যে ৪ কোটি ২ লক্ষ হিন্দু হলেও বাঙালিরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের জনসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষের সঙ্গে ১ কোটি ৮০ লক্ষ ছিল মুসলমান এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ ছিল হিন্দু। বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থে পরিপন্থী হওয়ায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতা করেছিলেন।[৯]

বাঙালি ভদ্রলোক হিন্দুদেরমধ্যে নানান ভয় ও আশঙ্কা কাজ করেছিল। বিক্রমপুরের বাবুরা তাদের কেরানির চাকরী হারানোর ভয়ে শঙ্কিত ছিলেন। কলকাতার কাছেভাগ্যকুলের রায় পরিবারের ছিল চাল ও পাটের ব্যবসা,তাই তারা চট্টগ্রাম বন্দরের সম্ভাব্য উত্থানেআতঙ্কিত ও ইর্ষান্বিত হয়েছিলেন। কলকাতার উকিলেরা মনে করতেন নতুন প্রদেশে একটি উচ্চ আদালত তৈরি হলে তাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষিত হবার পরে পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন সংবাদপত্রে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করেছিল। এদের বক্তব্য ছিল পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বেশি হওয়ায় সমগ্র বাংলাদেশে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে ওপূর্ববঙ্গে পৃথক শাসনব্যবস্থা হলে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। পশ্চিমবঙ্গে এই মনোভাবাপন্ন সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল খুব অল্প। মারোয়ারিরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিলেন।[১০] কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি অংশও বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিষয়টি প্রাদেশিক ব্যাপার বলে জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি। 'মদনমোহন মালব্য' (১৮৬১-১৯৪৬)

প্রকাশ্যেই বলেছিলেন "বাংলাদেশ বিভক্ত করা হয়েছে। এতে ভারতের অন্য প্রদেশের ভাবনার কিছু নেই।"[১১] শেষপর্যন্ত কংগ্রেসের কাশী অধিবেশনের সভাপতি গোপাল কৃষ্ণ গোখলের(১৮৬৬-১৯১৫) চেষ্টায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময় মাড়োয়ারী সম্প্রদায় স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধীতা করেছিল।[১২]'কৃষ্ণ কুমার মিত্র' (১৮৫২-১৯৩৬)লেখেন "বোম্বাই ও আহমেদাবাদের মিলওয়ালারা বাঙ্গালা দেশকে শোষণ করিয়া লক্ষপতি হইয়াছিল। তাহাদের এই দৌরাত্ম দমনের জন্য বাঙ্গলা দেশে 'বঙ্গলক্ষী কটন মিল' স্থাপিত হয়।" ১৯০৫ সালের ২৬ই অক্টোবর যে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয় তাতে কলকাতার অনেক মাড়োয়ারীও মুসলমান দোকানদারেরাও দোকান বন্ধ রাখতে সম্মত হননি।[১৩]

ঔপনিবেশিক সরকারের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তে শিক্ষিত মুসলমানদের এক প্রভাবশালী অংশ মনে করতেন যে নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম'প্রদেশের শাসনতন্ত্র হিন্দু প্রভাব মুক্ত হলে মুসলমানদের উন্নতির সহায়ক হবে। তাই তারা স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করতেন। ইতিমধ্যে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকারনবাব সলিমুল্লাহের (১৮৭১-১৯১৫) নেতৃত্বে 'মুসলীম লীগের' গঠন মুসলিম মননকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরীখে ধাবিত করেছিল।[১৪] স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্বে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলমান জমিদার ও অন্যান্য অংশের মুসলমানেরা অংশগ্রহণ করলেও সমগ্র বাঙালি মুসলমান জনসংখ্যার তুলনায় তা ছিল খুবই নগণ্য। তাঁরা বৃহত্তর মুসলমান সমাজকে এই আন্দোলনের সমৃক্ত করতে পারেনি। ঢাকার নবাব 'সলিমুল্লাহ' (১৮৭১-১৯৭৫) ধনবাড়ির (ময়মনসিংহ) 'নবাব আলি চৌধুরী' (১৮৬৩-১৯২৯) ও কলকাতার 'নবাব সৈয়দ আলির হোসেন' সক্রিয়ভাবে স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১৫]

'ন্যাশনাল মহামেডান আসোসিয়েশন', 'ফরাজী', 'ওয়াহাবী', ইত্যাদি ধর্মীয় সংগঠনমূলক স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সময় ফরাজী নেতা 'মৌলবী কফিল আল দিন' ও 'খান বাহাদুর সৈয়দ আল দিন' বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে ও স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নবাব 'সলিমুল্লার' সঙ্গে হাত মেলান।[১৬] 'মৌলবী', 'মোল্লা', 'মুন্সি', 'ক্ষুদ্র সরকারি কর্মচারী', 'মোক্তার সম্পন্ন কৃষক' ইত্যাদি শ্রেণির সাথে গ্রামবাংলার সাধারণ মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তারাই দরিদ্র মুসলমানদের অর্থনৈতিক ক্ষোভকে ধর্মীয় ভাবনার সাহায্যে হিন্দু 'জমিদার', 'মহাজন', 'আইনজীবি' প্রভৃতি বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন। এই প্রক্রিয়ায় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলমানদের পক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দরিদ্র মুসলমানদের সমবেত করা অনেকটা সহজ হয়। স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। 'আহমদী' (১৮৮৫-৫৯ খ্রি. পাক্ষিক দেলদুয়ার ময়মনসিংহ), 'হিন্দু মুসলমান সম্মিলনী' (১৮৮৭ খ্রি. মাগুড়া, যশোর), 'বালক'(১৯০১খ্রি. সাপ্তাহিক, বরিশাল), 'ভারত সুহৃদ' (১৯০১ খ্রি. মাসিক, বরিশাল), 'প্রচারক' (১৮৯৯-১৯০২ খ্রি, মাসিক, কলকাতা), 'সুলতান' (১৯০২-১৯১০ খ্রি.

সাপ্তাহিক, কলকাতা) 'কোহিনুর' (১৮৯৮ খ্রি. মাসিক, কুমারখালি, সাপ্তাহিক, কলকাতা), ফরিদপুর, ১৯১১-১৬খ্রি. কলকাতা) ইত্যদি পত্রপত্রিকাগুলি হিন্দু বিদ্বেষ বা অন্ধসাম্প্রদায়িকতা প্রচার করেনি বরং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করে।[১৭]

ধর্মীয় স্বাতন্ত্রবোধ-রক্ষণশীলতা অথবা অসাম্প্রদায়িকতা অথবা উভয়ের মিশ্রন লক্ষ করা গিয়েছিল। 'বাসনা' (১৯০৮-০৯, মাসিক রংপুর), 'হিতকরী' (১৮৯০ খ্রি. পাক্ষিক কুষ্টিয়া), 'নবনূর' (১৯০৩-০৬ খ্রি. মাসিক, কলকাতা), 'সুধাকর' (১৮৮৯-৯১ খ্রি. সাপ্তাহিক, কলকাতা) ইত্যাদি পত্রপত্রিকায়। এই পত্রপত্রিকাগুলি ইসলামধর্মের সংহতি ও স্বার্থ রক্ষা করার বিষয়ে আলোচিত হলেও একইসঙ্গে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এবং বাংলাভাষায় সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তার দিকটি আলোকপাত করেছিল।[১৮]

অন্যদিকে 'আখবারে এসলামিয়া' (১৮৮৪-৯৫ খ্রি, ময়মনসিংহ), 'হাফেজ' (১৮৯৭ খ্রি, সায়েদ কলকাতা) 'হানিফি' (১৯০৩-০৫, মাসিক, ময়মনসিংহ), 'ইসলাম' (১৯০০-১৯০১, মাসিক কলকাতা),'ইসলাম প্রচারক' (১৮৯১-১৯১০, মাসিক কলকাতা), 'নূর-আল-ইমান' (১৯০০-১৯০১ খ্রি. মাসিক কলকাতা) 'মিহির' (১৮৯২-৯৩, খ্রি. কলকাতা), 'মিহির ও সুধাকর' (১৮৯৫-১৯১০ খ্রি., সাপ্তাহিক, কলকাতা), 'মোসলেম হিতৈষী' (১৯১১-২১, সাপ্তাহিক, কলকাতা) ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় ইসলাম ধর্মেরশ্রেষ্ঠত্ব, হিন্দু ও কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করেছিল।[১৯]'আখবারে এসলামিয়া', 'ইসলাম প্রচারক', 'হাফেজ', 'হানিফি' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা, ইসলাম ধর্মের প্রচার করে ও ইসলামের গৌরবান্বিত ইতিহাসের দ্বারা মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করে। 'ইসলাম প্রচারক' এবং 'মিহির-সুধাদের' স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী পত্রিকা ছিল।[২০]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে নিম্নবর্ণীয়দের একটা বৃহৎ অংশ বিশেষত পূর্ববঙ্গের 'নমঃশূদ্র' সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ নিজ সম্প্রদায়কে সরিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং 'গুরুচাদ ঠাকুর' (১৮৪৬-১৯৩৭) স্বদেশী আন্দোলনে বিপক্ষে গিয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে সহমত পোষণ করে একযোগে বঙ্গবিভাগের পক্ষে মত পোষণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন বঙ্গভঙ্গ রূপায়িত হলে হত দরিদ্র মুসলিম ও নিম্নবর্ণীয় অনগ্রসর কৃষকদের উচ্চবর্ণীয় হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবে।[২১] এজন্য ১৯০৫ সালে নমঃশূদ্র নেতৃবৃন্দ তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেফটেনান্ট গর্ভনরের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছিলেন।[২২]

১৯০৭ সালে দ্বিতীয়বার ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছিল 'ল্যাসমিলট হ্যারে সাহেবকে'। 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' পত্রিকায় এই ডেপুটেশনের বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ করা প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ভারতে ইংরেজ শাসনের দায়িত্ব চিরস্থায়ী হওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে এসেছিল। 'নবগোপাল মজুমদার' ও 'রঘুনাথ সরকার' ইংরেজ সরকারকে সমর্থনের বিনিময়ে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে শিক্ষার প্রসার ও

সরকারিচাকরিতে সুবিধাদানের বিষয়টি ডেপুটেশনে তুলে ধরেছিলেন। ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্যের দিকটি তুলে ধরার জন্য ১৯০৬ সালের ২রা অক্টোবর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার ওড়াকান্দিতে জমিদার ব্রজেন্দ্রলাল মণ্ডলের গৃহে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই আলোচনা সভায় তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।[২৩]

ক) নমঃশূদ্র সম্প্রদায় চায় বঙ্গবিভাগ অপরিবর্তিত থাকুক।

খ) পূর্ববঙ্গের বৃহৎ জনগোষ্ঠী হিসাবে ইংরেজরা নমঃশূদ্রদের মুসলমানদের মতো সমান সুযোগসুবিধা ও অধিকার প্রদান করুক।

গ) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের ঘৃণা ও অবহেলার জন্য নমঃশূদ্র সম্প্রদায় অনগ্রসর। তাই এদের প্রতি নমঃশূদ্রদের কোনরকম সহানুভূতি নেই এবং নমঃশূদ্ররা মুসলিমদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময় মুসলিমদের মতো নমঃশূদ্ররা বিদেশি পণ্য বর্জনের পরিবর্তে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে থাকে। বাখরগঞ্জ অঞ্চলে নমঃশূদ্ররা ব্যাপকভাবে বিদেশি পণ্যের ব্যবহার করেছিল।[২৪] ১৯০৯ সালে ফরিদপুর অঞ্চলের নমঃশূদ্রদের মধ্যে একইরকম প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিপরীত স্রোতে গিয়ে নমঃশূদ্র নেতৃবৃন্দ মুসলিমদের সঙ্গে শ্রেণি ঐক্যের নিরীখে সম্মিলিতভাবে ইংরেজদের সমর্থন করেছিল, যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে সেই চিত্রটি লক্ষ করা যায় নি। নানান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নমঃশূদ্র নেতৃবৃন্দের অর্থনৈতিক স্বার্থের নিরীখে 'শ্রেণি চেতনার' কাল্পনিক ঐক্যের সত্ত্বাকে অনেক্ষেত্রেই ধুলিসাৎ করেছিল।[২৫] এহেন 'শ্রেণিচেতনার পাশাপাশি' ধর্মীয় চেতনা ও জাতিচেতনা যে প্রবহমান ছিল তা দেখা গিয়েছিল ১৯১১ সালে যশোর খুলনা অঞ্চলে নমঃশূদ্র মুসলিমদের দাঙ্গায়।[২৬] নমঃশূদ্র নেতৃবৃন্দ অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য মুসলমানদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে বর্ণহিন্দুদের বিরোধীতার কথা বললেও বাস্তবে সেই ঐক্য সবসময় ছিল না।

পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ছিল মূলত নমঃশূদ্র অধ্যুষিত। ফরিদপুর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, ঢাকাসহ জেলাগুলিতে এই নমঃশূদ্র উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছিল।[২৭] ১৯১১ সালের জানুয়ারী মাসে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছিল খুলনা জেলার 'নালেরচর' গ্রামে একজন মুসলমান কৃষক তার জমির ফসল নষ্ট করার জন্য নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির মালিকানাধীন কিছু গরু বাজেয়াপ্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে। এই গরুগুলি পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ৪০০-৫০০ ব্যক্তি মুসলমানদের গ্রাম আক্রমণ করলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটেছিল। ১৯১১ সালের মার্চ মাসে মোল্লারহাট, মাগুরা, পাইকগাছা থানায় এই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দাঙ্গার জন্য ১২জন নমঃশূদ্র ব্যক্তিদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। সাক্ষীর অপ্রাচুর্যতা সত্ত্বেও দুইজন মুসলিম বিচারক বিচার কার্য সম্পন্ন করেছিল।[২৮]

যশোর-খুলনা অঞ্চলের সবচেয়ে বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাটি ঘটেছিল নড়াইলের কালিয়া থানার অন্তর্গত বনাল গ্রামের 'কুটিশ্বর মণ্ডলের'জমির মালিকানা বিরোধ নিয়ে।

'কুটিশ্বর মণ্ডল' বটবেড়িয়ার কায়স্থ জমিদারের কাছ থেকে ১৭০ বিঘা জমি নিয়ে চাষাবাদ করতেন। ১৯০৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে কায়স্থ জমিদাররা এই জমি একই গ্রামের আব্দুর সরদার ও কৃষ্ণমোহন ঠিকাদারের কাছে বিক্রি করে দেন। কুটিশ্বর আদালতের শরণাপন্ন হলেও ব্যর্থ হন। ইতিমধ্যে নালেরচর গ্রামের ঘটনায় নমঃশূদ্রদের দোষী সাব্যস্ত করা হলে সেই সংবাদ এই দাঙ্গাকে ত্বরান্বিত করেছিল। ১৯১১ সালের ১৬ই মে কুটিশ্বর কিছু ব্যক্তির সাহায্যে আব্দুর সরদারের পূর্বোক্ত জমির ধান কেটে নেয় এবং এই ধান পুনরুদ্ধারের জন্য আব্দুর সরদার মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করে কুটিশ্বরেরগৃহ আক্রমণ করে ও ফসল পুনরুদ্ধার করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নমঃশূদ্র এবং মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। মুসলিমরা নমঃশূদ্রদের ৩৪টি বাড়ি লুঠ করেছিল।

১৯শে মে ২০০০-৫০০ মুসলিম ঐক্যবদ্ধভাবে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের পোড়ামালি গ্রামে ১৭টি গৃহ, খামার গ্রামে ১৯টি গৃহ, ঘনশ্যামপুরে ৭টি গৃহ লুণ্ঠন করেছিল। শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র পুলিশবাহিনী আগমন ঘটলে এই দাঙ্গার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই দাঙ্গায় যশোরের ১৩টি গ্রাম ও খুলনার ৫টি গ্রাম আক্রান্ত হয়েছিল। ছয়জন নমঃশূদ্র ও সাতজন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ আহত হয় এবং একটি নমঃশূদ্র নারীর ধর্ষণের তথ্য পাওয়া গিয়েছিল।[২৯]

নালেরচর গ্রামের দাঙ্গায় যেমন 'ধর্মীয় চেতনা' কাজ করেছিল তেমনি এই বর্নাল গ্রামের দাঙ্গায় শুধুই 'জাতিচেতনা'র উপস্থিতি পাওয়া যায়। এই দাঙ্গাটি ছিল শুধুমাত্র নমঃশূদ্র মুসলমানদের দাঙ্গা। অন্য সাম্প্রদায়গুলি এই দাঙ্গায় সমৃক্ত হয়নি এবং কোনরকম ক্ষতিগ্রস্থও হয়নি। 'জালিয়া সম্প্রদায়' নিজেদেরকে নমঃশূদ্রদের থেকে পৃথকীকরণের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য গৃহের সামনে মাছ ধরার 'ছেঁড়া জাল' টাঙিয়ে রাখত। একই রকমভাবে নমঃশূদ্র-মুসলমানদের দাঙ্গা থেকে নিজেদের পৃথক রেখে বাঁচবার জন্য কাপালিয়া গৃহের সামনে- 'পাটের খণ্ড', কায়স্থ ও কৈর্বত্যরা 'সাদা কাপড়ের খণ্ড' বৈষ্ণবরা 'গেরুয়া কাপড়ের খণ্ড', মুচিরা 'চামড়ার খণ্ড' ঝুলিয়ে রাখত।[৩০]

তথ্যসুত্র:

১. Rup Kumar Barman: *Partition of India and Its Impact on Scheduled Castes of Bengal,* (New Delhi, Abhijeet Publication, 2012), পৃ. ১০০।

২. অমলেশ ত্রিপাঠী: *প্রাগুক্ত*, পৃ.পৃ. ৫৮-৫৯।

৩. SumitSarkar: *Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*, (New Delhi, People's Publication House, 1973), পৃ. ৯৮।

৪. *তদেব*, পৃ. ১২০।

৫. *তদেব,* পৃ. ১১২।
৬. অমলেশ ত্রিপাঠী: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৫৮-৬২।
৭. *তদেব,* পৃ. ৬৩।
৮. বিনয় ঘোষ : *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা* (কলকাতা, প্রকাশভবন, ২০০৯), পৃ.পৃ ২৪-২৮।
৯. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১০০-১০১।
১০. অমলেন্দু দে: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪৭।
১১. *তদেব,* পৃ.পৃ. ১৪৮-১৪৯।
১২. কৃষ্ণকুমার মিত্র : *আত্মচরিত,*(কলকাতা,সাধারন ব্রাহ্মসমাজ, দ্বিতীয় সংস্করন ১৯৭৪), পৃ.পৃ. ২৩৪-৩৬,& ২৫০-৫২।
১৩. *তদেব,* পৃ.পৃ. ২৫২-৫৫।
১৪. Sumit Sarkar: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১২৮।
১৫. Rafiuddin Ahmed: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১৭৯-৮১।
১৬. চণ্ডীপ্রসাদ সরকার: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৩৬-৩৭।
১৭. *তদেব,* পৃ ৩৮।
১৮. *তদেব,* পৃ.পৃ. ৪০-৪২।
১৯. অমলেন্দু দে: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১৪৪-১৪৫।
২০. ওয়াকিল আহমেদ: *প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড,* পৃ. ১৪২-১৪৫।
২১. Hiroyuki Kotani (Ed): *Caste System, Untouchability and the Depressed*, (New Delhi, Manohar Publication, 1997), পৃ. ২৩২।
২২. *তদেব,* পৃ. ২৩৩।
২৩. *তদেব,* পৃ.পৃ.২৩৩-২৩৪।
২৪. Sekhar Bandyopadhyay: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৯৫-৯৭।
২৫. *তদেব,* পৃ.পৃ.৯৮-১০০।
২৬. Sekhar Bandyopadhyay: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২৬৩।
২৭. *তদেব,*পৃ. ২২৬৩।
২৮. *তদেব,*পৃ. ২২৬৪।
২৯. *তদেব,* পৃ.পৃ. ২২৬৫-২২৬৬।
৩০. Hiroyuki Kotani: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২১।

নিমাই ও নারী

সমীর মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ময়না কলেজ

চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলিতে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করেই চৈতন্যজীবনীকারদের চিন্তাচেতনা আবর্তিত হওয়ার কারনে ঐ সমস্ত কাব্যগ্রন্থগুলিতে নারীচরিত্রগুলির উপর তেমনভাবে আলোকপাত করা হয়নি। তাছাড়া বৈষ্ণবধর্মে নারী সংসর্গ ছিল কঠোরভাবে পরিত্যক্ত। চর্যাপদ থেকে অন্নদামঙ্গল দীর্ঘ এই সাহিত্যযাত্রাপথে নারীচরিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবনচিত্রে নতুবা দৈবভাবনার আড়ালে। তথাপি শ্রীচৈতন্যের জীবনপঞ্জী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন নারীচরিত্র। শ্রীচৈতন্যের জীবনে সর্বাপ্রেক্ষা প্রভাব বিস্তারকারী নারী ছিলেন তার মাতা শচীদেবী। তবে কোন অজ্ঞাত কারণে গবেষক ঐতিহাসিকরা শচীদেবী সম্পর্কে নীরব তা বলা দূরহ। স্নেহময়ী শচীমাতা তার মাতৃস্নেহে ও চরিত্র মাধুর্যের দ্বারা গৌড়ীয় বিষ্ণব সমাজে অতি শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বোধহয় শচীদেবী ব্যাতিত শ্রীচৈতন্য অকল্পনীয়। শচীদেবী ছিলেন সৎ, নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ন ব্রাহ্মণ সন্তান জগন্নাথ মিশ্রের স্ত্রী। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল থেকে বলা যায় যে বাল্যকালে নিমাই ছিল বড় দুরন্ত, চঞ্চল ও প্রাণবন্ত, অত্যন্ত জেদী ও তেজস্বী মেধাবী। কোন জিনিসের জন্য যদি একবার বায়না ধরতেন তবে তা না পাওয়া পর্যন্ত কান্নাকাটি ও মাটিতে লুটোপুটি চলত। চলত ঘরের নানান জিনিসপত্রের ভাঙচুর। বাইরে পল্লীবাসী বন্ধুদের সঙ্গে চলত দিনরাত মারামারি, গঙ্গায় দাপাদাপি। যদিও তার সঙ্গী সমবয়সী বন্ধুরা তাকে যথেষ্ট মান্যিগন্যি করত কারন একটা নেতাসুলভ আচরণ তার চরিত্রতে ছিল। এ ধরণের মারকুটে, ডানপিটে নিমাইয়ের দাপটে মায়াপুরের পল্লীঅধিবাসীরা তো সবসময় ভয়ে তটস্থ থাকতেন। তার নামে নালিশের পর নালিশ জমা পড়ত মাতা শচীদেবীর কাছে যা সামলাতে শচীদেবীকে রীতিমত হিমসিম খেতে হত।

তবে নিমাই দুষ্টু হলেও স্বভাবে ছিলেন ভীষণ মিষ্টি। দুষ্টুমী করে মায়ের বকুনীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে মাথা হেঁট করে নিমাই যখন মায়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতেন তখন নিমাইয়ের করুন মুখচ্ছবি শচীমাতার বুকে যেন বাৎসল্যের ঢেউ তুলত। সমস্ত রাগ যেন নিঃমেষে উদাও হয়ে যেত। জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ আর কণিষ্ঠ পুত্র বিশ্বম্বর শচীমাতার সন্তান বলতে তো এই দুই জনই বেঁচেছিলেন। তাদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল আট। এই মধ্যবর্তী আট বছরে শচীমাতা হারিয়েছিলেন আরও আটটি সন্তান যা ছিল অতি বেদনাদায়ক। হয়ত এরকম ঘটনা অন্য কোন মহীয়সী মাতার জীবনে ঘটেনি। তথাপি তিনি ছিলেন পতিব্রতা মমতাময়ী। সতী-সাধ্বী নারীর ন্যায় তিনি সংসারধর্ম পালন করেছেন। শচীদেবী ছিলেন দৃঢ়চেতা, দয়াময়ী, অসীম ধৈর্য্য ও সহ্যশক্তি ছিল তাঁর। ছিলেন কোমল স্বভাবের। মায়ের এইসমস্ত মানবিক চারিত্রিক

বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী নিমাই অর্জন করেছিলেন জন্মসূত্রে। এ ধরনের মাতৃপরিচয়ই নিমাইকে অনেকবেশি মহিমান্বিত করেছে বলেই মনে হয়। তাই 'জগন্নাথনন্দন' নয় 'শচীনন্দন' হিসাবেই সমস্ত কাব্যগ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেব সম্বোধিত হয়েছেন। শচীদেবীকে বাদ দিয়ে বোধহয় শ্রীচৈতন্যকে কল্পনাই করা যায় না।

জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ কৃতীছাত্র, নম্র, বিনয়ী। বিশ্বরূপ যখন টোলে অধ্যায়নরত তখন মাত্র পাঁচ বছর বয়সে নিমাইয়ের হাতেখড়ি হয়। নিমাইও দারুণ মেধাবী ছিলেন। শচীদেবী বিশ্বরূপের বিবাহের উদ্যোগ নিতেই বিশ্বরূপের মনে বৈরাগ্যের ভাব নাকি বেড়ে গিয়েছিল। শাস্ত্রপাঠ তারমধ্যে সাংসারিক বৈরাগ্য তীব্রতর করেছিল। একদিন নিশীথরাতে বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করেন। কেঁদে আকুল হন শচীদেবী। কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন স্বয়ং জগন্নাথ। বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ জগন্নাথের মনে দারুণ প্রভাব ফেলেছিল। তাই সন্তান সান্নিধ্য ও সুখলাভের প্রত্যাশায় জগন্নাথ নিমাইয়ের পড়াশুনা বন্ধ করে দেন। কিন্তু শচীদেবীর অনুরোধে পুনরায় নিমাইয়ের বিদ্যাশিক্ষার অনুমতি দেন জগন্নাথ মিশ্র। পতিব্রতা নারী হয়েও শচীদেবী হয়ে উঠেছিলেন যুক্তিবাদী। দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছিলেন ছেলে মূর্খ হয়ে জীবন কাটাবে এটা কেমন কথা? এই মূর্খ ছেলেকে তো কেউ বিয়ের জন্য মেয়েও দিতে চাইবে না। এই অকাব্য যুক্তি জগন্নাথ মিশ্র এড়িয়ে যেতে পারেননি। তার থেকেও বড় কথা মধ্যযুগীয় সেই পরিবেশে যেখানে সমাজে নারীর স্থান ছিল নিতান্তই গৌণ, অকিঞ্চিৎকর, বিদ্যাজনের অধিকার থেকে প্রায় বঞ্চিত সেই সমাজের প্রতিভূ হয়ে বিদ্যাচর্চার অপরিসীম গুরুত্বের কথা তিনি কিন্তু হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলেন যার কোনও পুথিগত বিদ্যাশিক্ষা ছিলনা এমনই এক ন্যায়পরায়ন, আদর্শবাদী মা। বলা চলে তার এই দৃঢ় পদক্ষেপের কারনেই পরবর্তীকালে নদীয়াবাসী পণ্ডিত নিমাইকে পেয়েছিল।

শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে নয় বৈবাহিক ক্ষেত্রেও শচীদেবীকে দেখা যায় সর্পদংশনে যখন প্রথমা স্ত্রী লক্ষীদেবী প্রাণ হারিয়েছিলেন, নিমাই যখন বিচলিত তখন একজন কর্তব্যপরায়ণ মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আয়োজন করেছিলেন দ্বিতীয় বিবাহের, যদি বৈরাগীপুত্রের পুনরায় সংসারমুখী করা যায়। কিন্তু মাতৃআদেশে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহের পরপরই ঈশ্বরপুরীর নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই নিমাই ডুবেগিয়েছিলেন সাধন-ভজনে। কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গৃহ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলে শচীদেবী কেঁদে আকুল হয়েছিলেন। বুঝেছিলেন একে আর ঘর-সংসারের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা অসম্ভব। তাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য (নিমাইয়ের সন্ন্যাসনাম) যখন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শচীদেবীর চরণকমল জড়িয়ে ধরে বৃন্দাবন যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন তখন শচীদেবী তাঁকে নীলাচলে যাওয়ার পরামর্শ দিলে তাই শিরোধার্য করে শ্রীচৈতন্য নীলাচলেই থাকার সিদ্ধান্ত নেন। সন্তানের প্রতি শচীদেবীর মমতত্ববোধ ছিল অপরীসীম। পুত্রের সদিচ্ছায় বাধাদান না করে বরং সবসময় তিনি তার ইচ্ছার সহায়ক হয়ে উঠেছেন।

"নীলাচলে নবদ্বীপে যৈছে দুই ঘর।

লোক গতাগতি বার্তা পাব নিরন্তর।।
আপনার সুখ-দুঃখ তাহা নাহি গণি।
তার সেই সুখ, সেই নিজ সুখ মানি।।'' - শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা

নিজের শেষজীবন বা বিষ্ণুপ্রিয়ার ভবিষ্যৎ চিন্তা শচীদেবীকে বিন্দুমাত্র বিচলতি, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলতে পারেনি মনে হয় শচীদেবী ব্যাতিত শ্রীচৈতন্য অকল্পনীয়। শ্রীচৈতন্যের জীবনে পরম সম্পদ ছিল তার মাতৃপ্রেম। মাতৃআজ্ঞা ব্যতীত শ্রীচৈতন্য এক পাও এগোতেন না। ভাষাবিদ সুকুমার সেন মনে করেন ''জননী ও জাহ্নবী চৈতন্যের কাছে ছিল জননীর ও জন্মভূমির অখণ্ড প্রতীক'। শ্রীচৈতন্যের জন্ম, শিক্ষা, বিবাহ, নিমাই থেকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীতে উত্তরণ-প্রতিটি ক্ষেত্রে শচীদেবী একচ্ছত্র প্রশংসার দাবী রাখেন।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া ছিলেন নিমাইয়ের প্রথম স্ত্রী। চৈতন্যজীবনী- কাব্যগুলি থেকে জানা যায় লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে নিমাইয়ের পরিনয় একরকম প্রণয়েরই পরিনাম। লক্ষ্মীপ্রিয়া চরিত্রটি আসলে নিমাইয়ের কোমল হৃদয়বৃত্তিকে আন্দোলিত করে তাঁর প্রেমিকাসত্তাকে উন্মোচিত করেছিল। সমাজ ও ধর্মের সংস্কারক বলে যে কেবল বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্বই নিমাইয়ের মধ্যে বর্তমান- এই ভ্রান্ত ধারণাকে প্রমান করতেই লক্ষ্মীপ্রিয়া চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা। বিবাহের পর নিমাই মায়ের নির্দেশমত শ্রীহট্টে গিয়েছিলেন মৃত্যুপথযাত্রী ঠাকুরমা শোভাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে। নিমাই স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে মায়ের আশ্রয়ে রেখেগিয়েছিলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া সেসময় একজন কর্তব্যনিষ্ঠ পুত্রবধুর ন্যায় শচীমাতাকে দেখভাল ও যাবতীয় দায়দায়িত্ব পালন করেছেন। বেশ কয়েকমাস পর শ্রীহট্ট ও বাংলাদেশের নানান স্থান পরিভ্রমন করে নিমাই যখন নবদ্বীপে ফেরেন তখন তিনি সর্পদংশনে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শেষে বিহ্বল হয়েছিলেন। বলা চলে নিমাইয়ের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলেছিল এই লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু। এই পত্নীবিয়োগের কারনেই নিমাইয়ের মধ্যে সাংসারিক অনীহা দেখা দেয়। এই অনীহা বৈরাগ্য থেকেই জন্ম নেয় কৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তির প্রতি নিমাইয়ের প্রগাঢ়তা ও সন্ন্যাসধর্মের বীজ। তাই সেদিনের লক্ষ্মীপ্রিয়ার নিমাই পরে হয়ে ওঠেন বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূ।

নিমাই যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হয়ে উঠেছিলেন তার পশ্চাতে যার অপরিসীম অবদান ছিল তিনি হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। নিমাইয়ের দ্বিতীয় স্ত্রী। এই বিষ্ণুপ্রিয়াই নিমাইকে সর্বপ্রথম অবতার বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন বিষ্ণুপ্রিয়াই নিজ উদ্যোগে প্রথম চৈতন্যমূর্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন। আনুমানিক 1495 সালে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের গৃহে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে নবদ্বীপে এক অসামান্য রূপবর্তী কন্যার জন্ম হয়। মুখশ্রী ছিল যেন প্রতিমার মতো। অতি তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেই অসাধারণ রূপবতীর নাম রাখা হয়েছিল বিষ্ণুপ্রিয়া। নিমাইয়ের সঙ্গে বিবাহকালে (আনুমানিক 1505) বিষ্ণুপ্রিয়ার বয়স ছিল ১০ বছর।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যখন পঞ্চদশী তখন নিমাই (২৪ বছর) সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেন। অতঃপর তিনি নিজেকে গৃহবন্দি করে রেখেছিলেন আমৃত্যু। চৈতন্যঘনিষ্ঠ যদি কেউ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন পর্দার আড়াল থেকে। ভৃত্য ঈশান ও শচীদেবী ব্যাতীত আমৃত্যু বিষ্ণুপ্রিয়া অন্য কারুর মুখ দর্শন করেননি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ বিষ্ণুপ্রিয়াকে অমানুষিক কষ্ট দিয়েছিল। সংসারের প্রতি, শচীমায়ের প্রতি পুত্রবধু হিসাবে তার দায়-দায়িত্বগুলিও যেন অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। স্বামী বিহনের দুঃখ ও কৃচ্ছ্রসাধন বিষ্ণুপ্রিয়াকে বেশ স্বতন্ত্র করে তুলেছে। স্বামীপ্রদর্শিত পথে ভগবানের সেবায় বাকি জীবনটা উৎসর্গ করেছেন। শচীমায়ের প্রতি চৈতন্য যতটা কারুন্য দেখিয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়া তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করে সারাদিন তিনি কৃষ্ণনাম জপ করতেন। জপের শেষে প্রত্যেকবার তিনি একটি করে চাল পাত্রে রাখতেন। পাত্রে জড়ো হওয়া ঐ চাল দিয়ে দিনান্তে একবার সামান্য আহার করতেন।

“নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন
নামেতে সে অন্নমাত্র পরিগ্রহ করে।
ঈশ্বর-বিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে।।”[৪]

যে সহনশীলতার মন্ত্রে জগতবাসীকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন তা প্রথম থেকে আক্ষরিকঅর্থে পালন করে গেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। শেষজীবনে একবার বিষ্ণুপ্রিয়ার সুযোগ হয়েছিল স্বামীর সঙ্গে দেখা করার। মহাপ্রভু সন্ন্যাস নেবার পর যখন মা শচীদেবীকে দেখতে এসেছিলেন তখন মহাপ্রভুকে একটুখানি প্রদীপ দেখাবার সুযোগ পেয়েছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। নতজানু হয়ে স্বামীপ্রণাম সেরে চোখ তুলে তাকিয়ে তিনি আর স্বামীকে দেখতে পান নি সেখানে দেখেছিলেন শুধু তার খড়ম দুটি। মনে হয় তিনিই একমাত্র নারী যিনি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কেবলমাত্র স্বামীর খড়মপূজা করেই কাটিয়েছিলেন। স্বামীর প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়ার অপর শ্রদ্ধা, অগাধ ভালোবাসা তার প্রেমাশ্রুতা গৌড়ীয় বিষ্ণবধর্মে তাকে মহীয়সী করে তুলেছে। স্বামী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও স্বামীসঙ্গ সুখ থেকে বঞ্চিত যন্ত্রণা বিষ্ণুপ্রিয়াকে চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে চির ‘Tragic’ চরিত্র করে তুলেছে।

চৈতন্যজীবনীকাব্যগুলিতে সীতাদেবীকে অন্যতম প্রধান গৌণ চরিত্রগুলির মধ্যে রাখা হয়। সীতাদেবী ছিলেন নৃসিংহ ভাদুড়ীর কন্যা। অদ্বৈতাচার্যের স্ত্রী এবং নিমাইয়ের মাতৃসমা। নিমাইয়ের জন্মকালে সমস্ত রকমের স্ত্রীআচার, নামকরণ প্রভৃতিতে সীতাদেবীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। জগন্নাথ মিশ্রের দেহত্যাগ, নিমাইয়ের গৃহত্যাগের পর সীতাদেবী কিন্তু একজন সুপ্রতিবেশিনীর দায়িত্ব পালন করে গেছেন শচীদেবীর পাশে থেকে।

“দুর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে   কৈল বহু আশীষে
চিরজীবি হও দুই ভাই,

ডাকিনী শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে
ডরে নাম থুইল নিমাই।।"[৫]

শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অবর্তমানে তিনিই ঈশানকে আশ্রয়দান করেছিলেন। রক্তের সম্পর্কের বা পরিবারের সদস্য না হয়েও অনেক গুরুদায়িত্ব নিয়মে পালন করে গেছেন সীতাদেবী। তাই গৌণ হয়েও সীতাদেবী মুখ্য নারী চরিত্রের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন।

চৈতন্যমহাপ্রভু জাতিভেদ, বর্ণপ্রথা, প্রভৃতির বিরোধী ছিলেন। লোকশিক্ষার বাস্তবিক জ্ঞানকে মানুষের মজ্জাগত করে তুলতেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বোধহয় 'আপনি আচারি ধর্ম জীবেরে শিখায়' এই নীতিগ্রহণ করেছিলেন। এই লোকশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে পুরুষের পাশাপাশি নারী চরিত্রকেও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে দেখা মেলে দুখী, মালিনী মাতা, মাধবীদাসীদের ন্যায় নারীদের দুখীর সাংসারিক কাজকর্ম সম্পাদনের ধৈর্য ঐশ্বরিক একনিষ্ঠতারই শিক্ষা দেয়। শ্রীবাসপত্নী মালিনী মাতা প্রমান করেছিলেন যে বাহ্যিক রোগ শোক, জরা, দুঃখ কখনোই ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে না। তিনি নাম সংকীর্তনকে সন্তানের মৃত্যুশোক অপেক্ষা এগিয়ে রেখেছিলেন। আর মাধবী দাসীদের প্রসঙ্গ এনে এটা তুলে ধরার চেষ্টা হয় যে বৈষ্ণবধর্মে সামান্যতম মানসিক বিকৃতিরও কোনো স্থান নেই। বৈষ্ণবধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রসারতায় অদ্বৈত্যাচার্য বা শ্রীবাসের ন্যায় জাহ্নবাদেবী, হেমলতা ঠাকুরানীর মতো গোস্বামিনীদেরও বিরাট ভূমিকা ছিল।

শচীমাতা, লক্ষ্মীদেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া সীতাদেবী, দুখী, মালিনীমাতা, মাধবীদাসী, জাহ্নবাদেবী, হেমলতা ঠাকুরানী প্রমুখা বিভিন্ন মানের নারীরা চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন ও কর্মকে ঘিরে আছেন। এদের ব্যাতিরেকে চৈতন্যজীবন গণ্ডি সম্পূর্ণ হয়না। নিমাইয়ের চৈতন্যমহাপ্রভূতে উত্তরণে, তার দেবতুল্য ভাবকাঠামো গঠনের পশ্চাতে এইসমস্ত মহীয়সী নারীদের অবদান অসামান্য।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রীচৈতন্যদেব ও সমকালিন নবদ্বীপ-যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী
২. নবদ্বীপ দীপশিখা বিষ্ণুপ্রিয়া-সুরুচিবালা রায়, নিউ বেঙ্গল প্রেস 2014।
৩. নিমাইচরিত- নিমাইসাধন বসু
৪. শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবত-বৃন্দাবন দাস, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা পৃ. ৭৯
৫. শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত- শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, গৌড়ীয় মিশন, শ্রী গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার কলকাতা, পৃষ্ঠা নং ২৬৬-২৬৭
৬. শ্রীশ্রী চৈতন্যমঙ্গল-শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী কলকাতা
৭. সঙ্কলিত ভগবতী কথা (দ্বিতীয়খণ্ড) শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজী, শ্রীশ্রী পাঠবাড়ী আশ্রম, বরাহনগর, কলকাতা।

প্রয়োগভাবনায় বাংলা শ্রুতিনাটক

সঞ্চিতা মান্না
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সংক্ষিপ্তসার : রচনা বা স্ক্রিপ্ট নয়, প্রয়োগের মধ্যেই শ্রুতিনাটকের সার্বিক সফলতা। আর এই প্রয়োগ পরিকল্পনায় শিল্পীরা বিশেষ কতগুলি পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। নিয়মিত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে কণ্ঠস্বরকে সুউচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা এবং তার ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন শ্রুতিনাট্য উপস্থাপনার প্রথম ও প্রধান শর্ত। এর সঙ্গে স্বরক্ষেপণের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার শ্রুতিনাট্যকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলে। অন্যপ্রান্তে আবহ শ্রুতিনাট্যকে বিশেষত্ব দান করে। আবহ কখনো কণ্ঠস্বরনির্ভর কখনোবা প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে থাকে। আবার নাট্য উপস্থাপনাতে যেহেতু মাইক্রোফোনের ভূমিকা অতিগুরুত্বপূর্ণ, সেক্ষেত্রে বলা যায় প্রযুক্তির সাহায্য ব্যতীত শ্রুতিনাটকের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব হলেও প্রযুক্তির ব্যবহার নাট্য উপস্থাপনাকে উৎকর্ষতা দান করে। আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রুতিনাটকের উক্ত ব্যবহারিক দিকটি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।
সূচকশব্দ : শ্রুতিনাটক, স্বরক্ষেপণ, শ্রুতিনাট্য, কণ্ঠস্বর, পানিণিয় শিক্ষা আবহসঙ্গীত, শব্দ সংকেত, Tune, রেডিও নাট্য, মাইক্রোফোন।

নাটকমাত্রই প্রয়োগপ্রধান সাহিত্যমাধ্যম। বাংলা শ্রুতিনাটকের ইতিহাসে দেখা যায় প্রযোজনার মধ্য দিয়েই শ্রুতিনাটক সফল শিল্পমাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তবে এই নাটক প্রযোজনার জন্য বেশ কতগুলি শর্ত অত্যাবশ্যক। সম্পূর্ণরূপে কণ্ঠাভিনয় নির্ভর বাচনিক এই শিল্পমাধ্যমটির অভিনয় নৈপুণ্যের শর্তগুলি হল—

১) সুদক্ষ কণ্ঠস্বর
২) আবহ
৩) মাধ্যম

শ্রুতিনাটকের প্রাচ্যের সঙ্গে সঙ্গে বাচনিক অভিনয় নৈপুণ্যের এক পাশ্চাত্য ইতিহাসও রয়েছে। প্রাচীন গ্রিসে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বাচনিক অভিনয়ে ‘রেটরিক’-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানা যায়। ‘রেটরিক’ শব্দটির অর্থ—

“প্ররোচক ও মর্মস্পর্শী বাক্‌শৈলী
বা বাগ্‌বৈদগ্ধ্য।”[১]

প্রয়োগভিত্তিক শিল্প এটি। এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি হল সংলাপ ব্যক্ত করার সময় ভিন্ন ভিন্ন বা ভঙ্গি শ্রুতিগোচর হলে ব্যক্তিমানস বৌদ্ধিক, নান্দনিক ও ভাবগতভাবে কীভাবে প্রতিক্রিয়া করে রেটরিক তত্ত্ব তারই ব্যাখ্যা দেয়। এ প্রসঙ্গে জানা যায়—

> "গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) তাঁর 'পোয়েটিকস ও রেটরিক' গ্রন্থে লিখেছেন 'দর্শকের মনে বিষয়কে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে অভিনেতা 'রেটরিক' ব্যবহার করবেন। এই বিশ্বাস জন্মাবার জন্য তিনি আবেগকে ব্যবহার করতে বলেছেন। অভিনেতারা যাতে অতিরঞ্জিত ভঙ্গিতে সংলাপ উচ্চারণ না করেন, তার জন্য তিনি সঠিক শব্দ নির্বাচন, কণ্ঠস্বর ও ছন্দ নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। বিষয় ও চরিত্রানুযায়ী স্বরক্ষেপণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।"[২]

তৎকালে রেটরিকের পাঁচটি ধাপ ছিল:-

১) বক্তব্য বিশ্লেষণ শেষে যুক্তিকে সংহতরূপ দান যা ছিল Invento।
২) নির্দিষ্ট রীতি অনুসারে বক্তব্য বিন্যস্তকরণ অর্থাৎ Dispecitio।
৩) যোগ্য বাচনিক রূপ অন্বেষণ অর্থাৎ Elocutio।
৪) বক্তব্য স্মরণে রাখতে মুখস্থ করা অর্থাৎ Memoria।
৫) অন্তিমে দর্শকের সামনে এমনভাবে উপস্থিত করা যাতে দর্শকের মন সম্পূর্ণরূপ আচ্ছন্ন হয়ে দর্শকের ভাবান্তর ঘটে যায়— Actio বা Pronenciatio ।

প্রাচীন গ্রীসে বাচনিক অভিনয় এই 'রেটরিক'-এর উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠা পায়। এক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর, সংলাপ ও আবেগ— এই বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। কণ্ঠ সৌন্দর্য বজায় রাখতে গ্রিক অভিনেতারা পথ্য নিয়ন্ত্রণ এবং উপবাস— এ দুটিতে গুরুত্ব আরোপ করতেন। এথেন্সের বিখ্যাত বাগ্মী ও রাজনীতিবিদ ডেমসথিনিস ও পোলাক্স অভিনেতাদের বাচনিক প্রশিক্ষণ দিতেন বলে জানা যায়।

ঘটনার মানসচিত্র নির্মাণে কণ্ঠস্বরের চর্চা যে প্রাথমিক প্রয়োজন সে কথা অনস্বীকার্য। বাচিকাভিনয়ের প্রথম শর্তই হল, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর যা তিনগ্রামেই সমানভাবে বল রক্ষা করে সহজেই ওঠানামাতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় শর্ত হল, পরিষ্কার উচ্চারণ, শব্দনিহিত স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির স্পষ্ট উচ্চারণ। তৃতীয় শর্ত, বক্তব্যের অর্থ বোঝানোর জন্য দরকার সমর্থ শব্দের অক্ষরের উপরে পর্যাপ্ত শ্বাসাঘাত আরোপ। চতুর্থ শর্ত, সুশ্রব্য ও স্পষ্ট উচ্চারণের জন্য চাই বাক্যের উচ্চারণে ছন্দ, লয় ও যতি ঠিকঠাক বজায় রাখা। পঞ্চম শর্ত, প্রত্যেক শব্দ যাতে দর্শকের কানে সঠিকভাবে পৌঁছায় তার জন্য নিয়ন্ত্রিত স্বরক্ষেপণ। ষষ্ঠত, ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশের জন্য উপযুক্ত স্বরসৃষ্টি করা, সপ্তমত চাই, চরিত্র অনুসারে কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন সাধন।

শ্রুতিনাটকের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির জন্য প্রথমেই জরুরি হল কণ্ঠচর্চা। বাচনিক সুদক্ষ অভিনয়ের ক্ষেত্রে গ্রিসের রেটরিক তত্ত্বের পর খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রোমে বাচিক অভিনয়ের নৈপুণ্য নিয়ে বিস্তৃত চর্চা চলে। এখানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়। আঠারো শতকে ইংলন্ড ও ফ্রান্সে বাচিক অভিনয়ের জন্য ধ্রুপদী আদর্শ-

কাব্যগন্ধী সংলাপ, ছন্দের প্রতি আনুগত্য, সতর্ক, বিশুদ্ধ, স্পষ্ট, সুরেলা উচ্চারণে গুরুত্ব আরোপিত হয়। উনিশ শতকে ইউরোপ ও আমেরিকায় কণ্ঠাভিনয়ের প্রশিক্ষণে গুরুত্ব আরোপিত হয়। উনিশ ও বিশ শতকে বাচিক অভিনয়ের এক একটি নতুন তত্ত্ব আসতে থাকে। রিয়ালিজম-এর কথক হেনরিক ইবসেন বললেন মহড়াতেই স্পষ্ট হবে কোন বক্তব্যটি বাস্তবসম্মত ও কোনটি কৃত্রিম। ন্যাচারালিজম-এর প্রবক্তা এমিল জোলা বললেন বাস্তব চরিত্রের কথোপকথনের ন্যায় সংলাপ বাস্তবধর্মী স্বাভাবিক উচ্চারণের হবে।

তবে এতসব তত্ত্ব বা বক্তব্যের মূল উৎস হল কণ্ঠস্বর। সেক্ষেত্রে কণ্ঠস্বরের সঠিক চর্চাই নাটকে যথার্থ সফলতা এনে দেয়। কণ্ঠস্বরের সৃজনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্তানিস্লাভস্কি বলেছিলেন উচ্চকণ্ঠ বা চিৎকারের পরিবর্তে শব্দে দ্যোতনা সৃষ্টি করতে হবে। তাঁর মতে চিত্রকর যেভাবে অনেক রঙ-এর সমন্বয়ে চিত্র নির্মাণ করেন অভিনেতা সেরকমভাবে তাঁর কণ্ঠস্বরের স্বরতরঙ্গকে প্রয়োগ করবেন।

অর্থাৎ যথার্থ বাচিকাভিনয় করতে হলে কণ্ঠচর্চা অত্যাবশ্যক। স্বরতন্ত্রীর কম্পনের ফলে ধ্বনি সৃষ্টি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সাহায্যকারী অন্যান্য অঙ্গগুলি হল— ফুসফুস, ব্রংকাই, ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালী, ল্যারিংস, ভোকাল কর্ড, ফ্যারিংস, মধ্যচ্ছেদীয় স্নায়ু, মুখগহ্বর, জিহ্বা, মূর্ধা, আলজিহবা, তালু কঠিন/কোমল, চোয়ালের পেশি প্রভৃতি। এই সামগ্রিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে সৃষ্ট স্বর-ই হল আমাদের কণ্ঠস্বরের উৎস। স্বরক্ষেপণের মধ্য দিয়েই সমগ্র ঘটনাধারা শ্রোতার কল্পনা জগতে পৌঁছে দেন শ্রুতিনাট্যের শিল্পীরা। আর তাই কণ্ঠস্বরের চর্চা অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে কতগুলি পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন বাচিক শিল্পীরা—

ক) অকারণ চিৎকার না করা, বেশি কথা বলা বা অন্যের কণ্ঠস্বর নকল করার অভ্যাস ত্যাগ করা। অত্যধিক শারীরিক উত্তেজনা কণ্ঠস্বরকে কর্কশ ও অস্বাভাবিক করে দেয়।

খ) যাবতীয় মাদক সেবন নিষিদ্ধ।

গ) যেকোনো ঠান্ডা খাবার পরিত্যাজ্য।

ঘ) সমস্তরকমের ধুলোবালি ধোঁয়া, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এড়িয়ে চলা।

ঙ) স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া।

চ) নাক, কান, গলা, বুক বা দেহের কোথাও কোনো অসুস্থতা থাকলে তার চিকিৎসা করানো। দাঁত বা মুখবিবরের অসুস্থতা স্বরবিকৃতি ঘটায়।

ছ) সঠিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

স্বরক্ষেপণই যেহেতু শ্রুতিনাট্যের মূল উপায় তাই নাট্যশিল্পীরা এক্ষেত্রে প্রথমেই লক্ষ্য রাখেন কণ্ঠস্বর শুনেই যেন শ্রোতার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় চরিত্রের বয়স, স্বভাব, আকৃতি ও অঙ্গসঞ্চালন। শুধু তাই নয়, ঘটনাধারা শ্রোতার মানসনয়নে উদ্ভাসিত করে তুলতে কণ্ঠস্বরের দক্ষতা অপরিহার্য। প্রসঙ্গত দুটি বিষয় জরুরি হয়ে ওঠে,--

প্রথমত, স্বর
দ্বিতীয়ত, সুর
স্বর সম্পর্কে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জনের জন্য অভ্যাস বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। স্বর প্রসঙ্গে 'যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষার'
একটি শ্লোক মনে পড়বে-
"প্রকৃতির্যস্য কল্যাণী দন্তোষ্ঠৌ যস্য শোভনৌ।
অপ্রগল্ভশ্চ বিনীতশ্চ স বর্ণান্ বক্তুমর্হতি।।"[৩]

অর্থাৎ যাঁর প্রকৃতি শান্ত, দন্ত ও ওষ্ঠ সুগঠিত, উচ্চারণ সুস্পষ্ট এবং যিনি বিনীত ও সংযমী তিনিই বেদপাঠের অধিকারী। প্রাচীনকাল থেকেই বাক্‌শিল্পে বাগ্যন্ত্রের সুগঠনের প্রসঙ্গ মূল্য পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণের স্পষ্টতা রক্ষা করার কথাও মূল্য পায়। স্বরক্ষেপণের আলোচনায় বেশ কতগুলি বিষয়ে নজর রাখা আবশ্যকীয় কর্তব্য—

১) শব্দবোধ সম্বলিত উচ্চারণ— অতিরঞ্জিত না করে অনুভূতির গভীরতা, মাত্রা, তীব্রতা স্থায়িত্ব উপলব্ধি করে শব্দ উচ্চারণ করা। সঠিক অনুশীলনে উচ্চারণে তীক্ষ্ণতা আসে।

২) উচ্চারণে স্পষ্টতা— স্পষ্ট উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কণ্ঠস্বরের যাবতীয় দৌর্বল্যকে অতিক্রম করা যায়। প্রেক্ষাগৃহের শব্দধারণ ক্ষমতা ত্রুটিযুক্ত হলেও স্পষ্ট উচ্চারণ শ্রোতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণে সফল হয়। তাই দ্রুতগতির সঙ্গে সংলাপ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ আবশ্যক।

৩) উচ্চারণে সাবলীলতা— জিহ্বা ও ঠোঁটের অতিসচেতনতা কৃত্রিম উচ্চারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে নাট্যপ্রযোজনাটি ব্যর্থ হতে পারে। তাই উচ্চারণ কৃত্রিমতা বর্জিত স্বাভাবিক হওয়া জরুরি।

৪) নাটকের ভাষা অনুসরণ— পরিশীলিত ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা, মিশ্রিত ভাষা, অপরাধ জগতের ভাষা, প্রাদেশিক ভাষা, , বিদেশী- -ভাষা, কাব্যভাষা, সাঙ্কেতিক ভাষা— নাটক যে ভাষাতেই রচিত হোক না কেন সেই ভাষার বিশিষ্ট বাচনভঙ্গি আত্মস্থ করতে হবে।

৫) নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিকারী উচ্চারণ— শব্দ সমষ্টির উপর চাপ প্রয়োগ করে অনেক সময় উচ্চারণ হয়। যেমন একই শব্দ বা শব্দসমষ্টি দুবার উচ্চারিত হলে বা অতিদ্রুত বা টেনে টেনে বা অক্ষর ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করে নাট্যমুহূর্ত তৈরি করা হয়।

৬) উচ্চারণে সজীবতা— নির্বোধ উচ্চারণে শব্দের অর্থ পরিপূর্ণতা পায় না। গতানুগতিক চর্বিত চর্বণে শব্দের অর্থ প্রকাশ পায় না। বুদ্ধিদীপ্ত শব্দ উচ্চারণে দর্শকের ভাবনা আন্দোলিত হয়। সুনিয়ন্ত্রিত আবেগার্ত উচ্চারণে শ্রোতার সঙ্গে অভিনেতার মানসিক সংযোগ সাধিত হয়।

৭) দৃশ্যনাট্যের সঙ্গে তফাৎ— দৃশ্যনাট্যের অভিনেতার মতো বিভিন্ন ক্রিয়া প্রদর্শন এ মাধ্যমে সম্ভব নয়, সেহেতু শ্রুতিনাট্য শিল্পীকে কণ্ঠস্বরেই বুঝিয়ে দিতে হয় সার্বিক ব্যাপার। যেমন গাঢ় ঘুম থেকে ওঠা। মঞ্চে হলে হাই তোলার ভঙ্গিই যথেষ্ট। শ্রুতিনাট্যের ক্ষেত্রে হাই তোলার শব্দও প্রয়োগ করতে হয় শিল্পীকে। সেইরকমই জলে ডুবে যাওয়ার আওয়াজ, খুব জোরে দৌড়ে আসা চরিত্রের হাঁফানোর শব্দ ইত্যাদি বিশেষ স্বরক্ষেপণ প্রয়োগে স্পষ্ট হয়।

সুর সম্পর্কে 'পানিণিয় শিক্ষা'র একটি শ্লোক উল্লেখ্য—

"মাধুর্যমক্ষরব্যক্তি: পদচ্ছেদস্তু সুস্বর:।
ধৈর্যং লয়সমর্থঞ্চ ষড়েতে পাঠকা: গুনী:॥"[৪]

অর্থাৎ মধুর কণ্ঠে পাঠ প্রত্যেকটি অক্ষরের সুস্পষ্ট উচ্চারণ, পদচ্ছেদ করে পাঠ, সুস্বর, ধৈর্যের সঙ্গে পাঠ এবং তান-লয়যুক্ত পাঠ-- এই ছয়টি পাঠকের গুণ। আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য, গীতিকাব্য, কাব্যনাট্য বা গীতিনাট্য ইত্যাদি পাঠের ক্ষেত্রে তাল-লয়-ছন্দ-যতির জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। না হলে শ্রোতা পাঠের মর্মার্থ উপলব্ধিতে সক্ষম হবে না। সামগ্রিক পাঠটির উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

স্বরক্ষেপণে সুরের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সুরহীন সংলাপ কখনোই জনমনে আবেদন রাখতে পারে না। সুরের ভাষায় চরিত্রের শ্রদ্ধা, আনন্দ, গর্ব, কৌতূহল, বিষণ্ণতা, ক্লান্তি, প্রতিজ্ঞা ও মানবমনের শত সহস্র অনুভূতি প্রকাশ পেতে থাকে।

বাচিক অভিনয়ে সুরের ব্যবহার বহুবিধ—

১) এই পদ্ধতিতে খুব দ্রুত ও তীক্ষ্ণভাব প্রকাশ করা যেতে পারে-
যেমন:-- - তুমি আজ বাড়ি ফিরবে?

২) গানের মীড়ের ন্যায় ক্রমান্বয়ে ওপরে ওঠা নামা করে। বিশেষ নাট্যমুহূর্ত তৈরিতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ হয়। প্রাচীন এই সুর সূক্ষ্ম চিন্তার ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে।

যেমন:- আমি কি তাই বললাম?

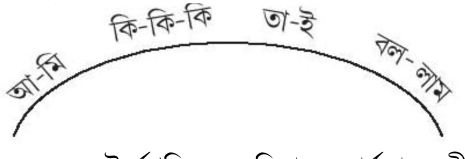

৩) সুরের উর্ধ্বগতি হয়। চিন্তার অপূর্ণতা, অস্বীকার, আতঙ্ক বা সন্ত্রাস, স্নায়ুদৌর্বল্য, রাগ, ঘৃণা, আনন্দ, উল্লাস এবং কোন প্রশ্ন করার কালে ক্রম উচ্চমান সুর

আরোপিত হয়। সংলাপে প্রশ্ন, দ্বিধা বা সন্দেহ থাকলে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা হলে তখন উর্ধ্বগতির সুর ভাব প্রকাশে সক্ষম হয়।

যেমন:-- এখনও যেতে হবে!

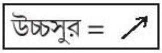

৪) সুরের নিম্নগতিও লক্ষিত হয়। চিন্তার পরিপূর্ণতা প্রকাশে, আশ্বস্ত হওয়া, দৃঢ় বিশ্বাস ও শান্ত প্রকৃতির গভীরতম আবেগের স্তরকে প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। এই সুর প্রতিশ্রুতি ও সিদ্ধান্তের স্থির প্রকাশক। প্রশ্নের উত্তর দেবার কালে এই সুর ব্যবহৃত হয়।

যেমন:-- তোমার খুশিতেই আমার খুশি

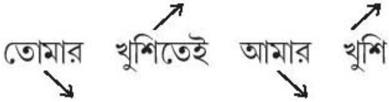

৫) দ্বৈত সুর শোনা যায়। যে সংলাপের মধ্যে দুটি ভাব একসঙ্গে লুকিয়ে থাকে, সেখানে এই সুর শ্রুত হয়। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, সূক্ষ্মচিন্তা ও কৌতুকরস নিবেদনে এই সুর ব্যবহৃত হয়।

যেমন:-- রাজনীতির মসৃণ পথে
কখনোই হাঁটতে যেও না।

৬) মধ্যগতির সুর শ্রুত হয়। অনেক সময় সংলাপ-এর মধ্যে ওঠা নামার মাত্রা কম হয়ে মাঝামাঝি তালে চলতে থাকে সুর।

যেমন:-- তুমি যাও আমি আসছি।

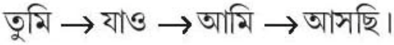

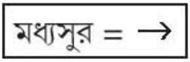

৭) সরু ও মোটা সুর-এর প্রয়োগ হয়। শ্রদ্ধা, বিষণ্ণতা, শারীরিক অক্ষমতা বোঝাতে এই ধরনের সুর সম্বলিত সংলাপ প্রয়োগ হয়।

যেমন:-- তোমাকে আমি ভগবান মানি মূর্তিতে বিশ্বাসী নই।

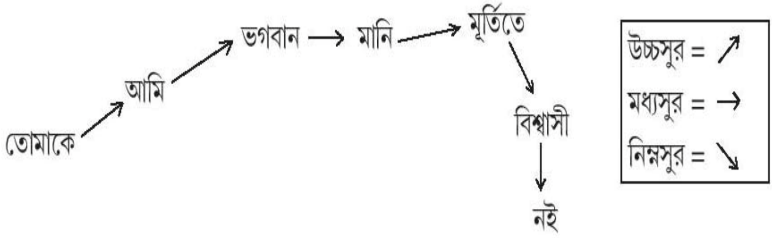

এছাড়া একটা নির্দিষ্ট শব্দকে আমরা নানা সুরে ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ করতে পারি। তার জন্য প্রয়োজন শব্দের অর্থ বুঝে তাকে চর্চার মাধ্যমে প্রয়োগ করা। লক্ষণীয় স্বরক্ষেপনের প্রসঙ্গে স্বর এবং সুর উভয়ের ব্যবহার যেমন নাট্য প্রযোজনায় বৈচিত্র্য আনে তেমনি স্বর এবং সুরের দ্যোতনায় নিয়মিত কণ্ঠচর্চা অত্যাবশ্যক। ইতিপূর্বে কণ্ঠচর্চার বেশ কতগুলি উদাহরণ আলোচ্য অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এরসঙ্গে আরো বেশ কতগুলি অভ্যাস অত্যাবশ্যক-

ক) শ্বাসবায়ু নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস করতে হলে প্রাণায়াম বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

খ) ধীর নিশ্বাস ত্যাগের মাধ্যমে উচ্চারণে স্পষ্টতা আনার চেষ্টা করা।

গ) নিয়মিত অভ্যাসের মধ্য দিয়ে নিজস্ব কণ্ঠস্বরের সীমানা নির্ধারণের চেষ্টা করা।

ঘ) গলায় অতিরিক্ত চাপ যাতে না পড়ে সে ব্যাপারে সজাগ থাকা।

ঙ) অভিনয়ে তীক্ষ্ণ বা কর্কশ স্বর প্রয়োজনীয় হলে স্বরযন্ত্রকে কৃত্রিমভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে অযথা কণ্ঠে চাপ পড়ে না যায়।

চ) নিজের কণ্ঠস্বরকে জলদগম্ভীর, উদাত্ত, চড়া না কি চড়া নয় বা খাদের মাঝামাঝি, তীক্ষ্ণ, প্রলুব্ধকারী হিহিসে— অর্থাৎ নিজ স্বর চিহ্নিতকরণ।

ছ) অতিদ্রুত ও স্পষ্ট উচ্চারণের জন্য নির্দিষ্ট রীতিতে নিয়মিতভাবে সাহিত্যপাঠ করতে হবে।

জ) জড়তাহীন স্পষ্ট করে কথা বলার জন্য কণ্ঠ বর্ণ, দন্ত্য বর্ণ, ওষ্ঠ্য বর্ণ, মহাপ্রাণ বর্ণ, অল্পপ্রাণ বর্ণ এগুলি জোরে জোরে পড়ার অভ্যাস বাঞ্ছনীয়।

ঝ) টাং টুইস্টার অভ্যাসে উচ্চারণের সমস্যা দূরীভূত হয়।

শ্রুতিনাটক প্রয়োজনায় স্বরক্ষেপণ যে প্রধানতম উপায় তা বিশেষ ভাবে বলবার কারণ এখানেই স্পষ্ট হয়ে যায়। আবহ এবং মাইক্রোফোন শ্রুতিনাটককে বিশেষায়িত করে কিন্তু এ দুটি ছাড়াও খালি গলায় শুধুমাত্র স্বরক্ষেপণকে ভিত্তি করেও নাটক উপস্থাপন করা সম্ভব। তবে স্বরক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে আবহ এবং মাইক্রোফোনের ব্যবহার

প্রযোজনাকে যে উৎকর্ষতা দেয় শ্রোতাকে নাট্যরস আস্বাদনে বিশেষভাবে আগ্রহী করে তোলে এবং নাট্য প্রযোজনাকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে সে কথাও সত্য।

শ্রুতিনাটকে আবহ তথা শব্দসংকেতের প্রয়োগ সবসময়ই শ্রোতার মনোজগতে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ জাগিয়ে তোলে। ফলতঃ আবহের গুরুত্ব স্বরক্ষেপণের পরেই প্রধান ভূমিকা নেয়। ঘনরাত্রি, দুর্যোগময় দিন ইত্যাদি পটভূমি যেমন আবহের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়, তেমনি চরিত্রের নানা বিষয়কে বিশেষ করে মনোজগতের যাবতীয় প্রবাহকে প্রকট করে তোলবার জন্য আবহের প্রয়োজন হয়। শ্রুতিনাট্যে মঞ্চনাটকের মতো আলোর বা পর্দার ব্যবহারে দৃশ্য পরিবর্তন (শ্রুতিনাট্যে দৃশ্যের কোন ব্যাপার থাকে না বলে 'দৃশ্য পরিবর্তন'-এর পরিবর্তে 'পরিস্থিতি পরিবর্তন' ব্যবহারই যথাযথ) সম্ভব হয় না। তাই শ্রুতিনাট্যে পরিস্থিতি পরিবর্তনের একমাত্র উপায় হিসেবে আবহ ব্যবহার অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে জগন্নাথ বসু বলেন—

> "দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার মধ্যে সংলাপ, ধ্বনি, অভিনয় সবই যখন স্তব্ধ তখন আবহসুর সেখানে ঢুকে পড়ে সমস্ত ঘটনাস্রোতকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রিত করে।"[৫]

বেতার শ্রুতিতে আবহের মাধ্যমে দৃশ্যপরিবর্তনকে বলা হয় Bridge Music বা Scene Change Music। ঘটনার গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে প্রয়োজনানুসারে যে আবহসঙ্গীত ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় Mood Music।

শ্রুতিনাটকে Sound effect-কে আবহ সঙ্গীত, ধ্বনি সংযোজন বা শব্দ-সংকেত প্রভৃতি শব্দে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। স্থান, কাল, পাত্র, পরিবেশ, ভাব, আবেগ— ইত্যাদি ব্যঞ্জনা মূর্ত করে তুলতে শব্দ ও ধ্বনি সংকেত একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যেমন—

১) স্থানসূচক	:	ব্যাঙের ঘ্যাঁঘু জলাশয়কে বোঝায়, স্রোতস্বিনী নদী বা সমুদ্রকে বোঝাতে।
২) কালসূচক	:	ঝিঁঝি পোকার ডাক সন্ধ্যার সময়কে বোঝায়, শেয়ালের ডাক রাত্রিকালীন সময়কে সূচিত করে, পাখির কলকাকলি ও আজান ভোরের সময়কে বোঝায়।
৩) পাত্রসূচক	:	গ্লাস থেকে পানীয় ঢালার শব্দ bar বা বেশ্যালয়কে নির্দেশ করে, উলুধ্বনি কুলবধূর উপস্থিতি নির্দেশ করে।
৪) পরিবেশসূচক	:	স্কুলের ঘণ্টা, অফিসের টাইপ রাইটার, হাট-বাজারের কোলাহল নির্দিষ্ট পরিবেশকে বোঝায়।
৫) ভাবসূচক	:	প্রণয়নিবেদনে দুই পাখির কিচিরমিচিরকে রোমান্টিক ভাষায় প্রকাশ, নাচের ছন্দে নুপূরের নিক্কণ অভিসারকে বোঝায়।

৬) আবেগসূচক : ধর্ষণের সংকেত আকস্মিক ঝড় বয়ে যাওয়া, হিংস্র খুনের মুহূর্ত বোঝাতে ছুরির আঘাতের শব্দ ব্যবহার হয়।

শব্দ-সংকেত ব্যবহারের নেপথ্যে রয়েছে বেশ কতগুলি উদ্দেশ্য—

১) ঘটনাস্থল ও সংস্থাপনা বোঝাতে
২) মনোযোগ আকর্ষণের কারণ
৩) সময় ও লগ্ন বোঝাতে
৪) মানসিক অবস্থা পরিস্ফুটনে
৫) চরিত্রের নাটকে আবির্ভাব ও প্রস্থান বোঝাতে
৬) ঘটনার পরিবর্তনকালীন শূন্যতাকে অর্থপূর্ণ করে প্রকাশ করতে
৭) অভিনবত্বকে ত্বরান্বিত করতে।

শব্দ-সংকেতের ব্যবহার প্রসঙ্গে র‍্যালফ্ মিলটন বলেন, -

> "The Sounds must tell a story, and every sound must help the story grow and alive."[৬]

শ্রুতিনাট্যে শব্দ-সংকেত বহু রকমের হতে পারে। নাটকে সংলাপ চলাকালীন এই শব্দ-সংকেত ব্যবহৃত হয়। তবে সার্বিকভাবে আবহসঙ্গীত ও কণ্ঠস্বরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সর্বাগ্রগণ্য। আবহসঙ্গীতের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে নাট্য উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজন সঠিক অনুশীলন। আবহ মাইক্রোফোনের মাধ্যমে বাজানো হলে তার ব্যাপ্তি স্বরক্ষেপণকে অতিক্রম করে যেতে পারে। এক্ষেত্রে আবহসঙ্গীত ও সংলাপের প্রয়োগে মিউজিশিয়ান ও শিল্পীর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বোঝাপড়া থাকাটা বাঞ্ছনীয়। মিউজিশিয়ানকে সুদক্ষ হাতে আবহকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নাহলে সমগ্র নাট্য প্রযোজনাটিই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সংলাপ বলার মাঝখানে আবহপ্রয়োগ সংলাপ বলার পরে আবহপ্রয়োগ এবং তারপরেই আবার সংলাপ বলার সূচনা প্রতিটি পদক্ষেপেই শিল্পী ও মিউজিশয়ান উভয়কেই সতর্ক থাকতে হয়। কারণ মনে রাখতে হবে আবহসঙ্গীত অর্থপূর্ণ হয় আবার সংলাপও শ্রোতা মনে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রাখে। ফলে সঙ্গীত বা সংলাপ উভয়ের অনুরণন শ্রোতাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই প্রকৃত অনুশীলনই একটি নাট্য প্রযোজনাকে শ্রোতার কাছে যথার্থ অর্থপূর্ণ ভাবে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়। আর শ্রুতিনাটকে শব্দ-সংকেত প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয়। সে দৈনন্দিন জীবনচর্যা থেকে বিশেষ কোন মুহূর্ত রচনা। সবক্ষেত্রেই শব্দ-সংকেত তো থাকেই। যেমন কাগজের খড়খড় শব্দ, টেবিলের ড্রয়ার খোলা বন্ধ করার শব্দ, যানবাহনের শব্দ, পশুপাখি ইত্যাদির ডাক, কোনো জিনিস মেঝেতে পতিত হবার শব্দ, অশ্বক্ষুরধ্বনি প্রভৃতি। তবে যেহেতু শব্দ-সংকেত সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিমভাবে শ্রুতিনাট্যে আরোপিত হয়ে থাকে তাই কৃত্রিমতা ও বাস্তব শ্রোতার মধ্যে নাট্য প্রযোজনাটির মেলবন্ধন নিমিত্ত শব্দ-সংকেতের আগে ও পরে পরিচয় জ্ঞাপক সংলাপ ব্যবহার করে Sound effectকে প্রমাণসিদ্ধ করে প্রয়োগ করতে হয়। ঘটনাবিন্যাস ও পরিবেশ

অনুযায়ী আবহের দাবিও উপলব্ধি আবশ্যক। সেক্ষেত্রে realistic music ও atmosphere music-কে আলাদা ভাবে প্রয়োগ করা হয়। আবহ নির্মাণের ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্র বা বিভিন্ন উপকরণ যেমন ব্যবহার হয়ে আসছে, তেমনি হরবোলার ব্যবহারে শ্রুতিনাট্যের আবহ প্রকট হয়ে ওঠে। তবে ইদানিং মিউজিক মিক্সিং করে আবহ রচনার প্রয়াস রয়েছে।

শ্রুতিনাট্য পরিবেশনের একমাত্র উপায় কণ্ঠস্বর, তা বেতার বা মঞ্চ যেখানেই হোক না কেন । তাই দেখা যায়, "শ্রোতার 'শ্রুতি' ছাড়া রেডিয়ো নাট্যকার অন্য ইন্দ্রিয় স্পর্শ করতে পারবেন না বলেই তাঁকে শ্রুতির সাহায্যেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে পরোক্ষভাবে স্পর্শ বা স্পন্দিত করতে হয়— অর্থাৎ বেশি করে ভাবানুষঙ্গের (association of ideas) দ্বারস্থ হতে হয়।"[৭] রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার মতো শ্রুতিনাট্যের শিল্পী কায়িক অভিনয়ের সুযোগ পান না ফলত বাচনভঙ্গিকে নির্ভর করে তাঁকে সাফল্য অর্জন করতে হয়।

শিল্পী তাঁর স্বরক্ষেপণকে সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে প্রথমেই লক্ষ্য রাখেন মাইক্রোফোন ব্যবহারের দিকে। আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরের কারণে মাইক্রোফোন সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়। তবে

শ্রুতিনাট্যশিল্পীদের প্রায়োগিক অভিজ্ঞতার বর্ণনায় একটি ব্যাপার স্পষ্ট, যেহেতু এখানে কণ্ঠ ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গসঞ্চালনের অবকাশ থাকে না, সেক্ষেত্রে শ্রুতিনাট্যের মঞ্চ উপস্থাপনায় বাহ্যিক সজ্জা অবশ্যই দর্শক তথা শ্রোতৃমনে প্রভাব বিস্তার করে, সেইসঙ্গে বাচিকাভিনয় বাকি নাট্য উপস্থাপনাকে পরিপূর্ণতা দান করে। একইসঙ্গে প্রয়োগ নিয়ে শ্রুতিনাট্যের মঞ্চ উপস্থাপনায় নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা একদিকে শ্রুতিনাট্যের পথচলা যেমন সুদূর প্রসারী করছে তেমনি প্রায়োগিক শিল্প মাধ্যমে শ্রুতিনাট্যের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে তুলছে।

তথ্যসূত্র:

১. অন্জন দাশগুপ্ত। অভিনয় শিল্প সংলাপ ও কণ্ঠস্বর, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, প্রকাশক: গোপা দাশগুপ্ত, ২০০৭, পৃ. ১৭৪

২. তদেব, পৃ. ১৭৪

৩. প্রদীপ ঘোষ অনীশ ঘোষ সম্পাদিত। আবৃত্তিচর্চা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৪১০, পৃ. ২৩

৪. তদেব: পৃ. ১৩

৫. জগন্নাথ বসু, বেতারের গ্রিনরুম, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২০০৯, পৃ. ৩৯

৬. Ralph Milton, Radio Programming, 1st Edition, Wood Lake Publishing, Geoffrey Bles, 1968, p. 62

৭. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, নাটক লেখার মূলসূত্র, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃ. ১১৯

গ্রন্থপঞ্জি:

১. অমিতাভ ভট্টাচার্য। একডজন শ্রুতিনাটক। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম সংস্করণ ১৯৯৩।

২. অমিতাভ ভট্টাচার্য। হাফ ডজন শ্রুতিনাটক। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭।

৩. অমিতাভ ভট্টাচার্য। আরও এক ডজন শ্রুতিনাটক। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম সংস্করণ। ২০০৪।

৪. অমিতাভ ভট্টাচার্য। শ্রুতিনাটক চিত্রনাটক। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম সংস্করণ ২০০১।

৫. অনুপম মুখোপাধ্যায়। শ্রুতিনাটক। কলকাতা। সাহিত্য সৃজনী। প্রথম সংস্করণ ২০০৯।

৬. অনির্বাণ মুখার্জি। ৭ কাহন। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ। ২০১৩।

৭. ইন্দ্রজিৎ পাল অন্তিকা চ্যাটার্জি সম্পাদিত। শ্রুতি নাটক সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড)। কলকাতা। ২৮৩ পূর্ব সিঁথি বাইলেন। প্রথম সংস্করণ ২০১০।

৮. ইন্দ্রজিৎ পাল অন্তিকা চ্যাটার্জি সম্পাদিত। শ্রুত সংলাপ। কলকাতা। ২৮৩ পূর্ব সিঁথি বাইলেন। প্রথম সংস্করণ ২০১১।

৯. কাজল সুর। শ্রুতিনন্দন। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০১১।

১০. কাজল সুর সম্পাদিত। একের পিঠে সাত। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০১৫।

১১. কাজল সুর। শ্রুতিকুসুম। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০১৩।

১২. গোরা চক্রবর্তী। ইতি রবিঠাকুর। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০১২।

১৩. চন্দন সেন। শ্রুতিচন্দন। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০১০।

১৪. জগন্নাথ বসু ও ঊর্মিমালা বসু সম্পাদিত। সেরা শ্রুতি সংগ্রহ। কলকাতা। পদ্মা-গঙ্গা পাবলিকেশন। প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭।

১৫. জগন্নাথ বসু সম্পাদিত। TALK থিয়েটার। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০১৩।

১৬. জগন্নাথ বসু সম্পাদিত। তেরো পার্বণ। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০০৯।

১৭. জগন্নাথ বসু ঊর্মিমালা বসু সম্পাদিত। রবীন্দ্র শ্রুতিনাটক। কলকাতা। লালমাটি। প্রথম সংস্করণ ২০১০।

১৮. তপতী সাহা। একান্তই রবিজীবনী। কলকাতা। লালমাটি। প্রথম সংস্করণ ২০১৪।

১৯. দিলীপ কুমার মিত্র স্বপন দাস সম্পাদিত। পাঁচটি ভালোবাসার শ্রুতিনাটক। কলকাতা। প্রয়াগ প্রকাশনী। প্রথম সংস্করণ ২০০৬।

২০. দিলীপ মিত্র সুনীল দত্ত সম্পাদিত। আন্তর্জাতিক শ্রুতিনাট্য সংগ্রহ। কলকাতা। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪।

২১. দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়। রবীন্দ্র কবিতার শ্রুতিনাট্যরূপ। কলকাতা। পদ্মা-গঙ্গা পাবলিকেশন। প্রথম সংস্করণ ২০০২।

২২. প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুভব হারিয়ে গেছে। কলকাতা। নিউপ্রিন্ট। প্রথম সংস্করণ ১৯৯১।

২৩. বনানী মুখোপাধ্যায়। শ্রুতিমধুর। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০০৯।

২৪. বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রুতি সতেরো। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০০৫।

২৫. বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ষোলোকলা। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০১০।

২৬. বনানী মুখোপাধ্যায়। আলাপন। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০১০।

২৭. বনানী মুখোপাধ্যায়। শ্রুতিষোড়শী। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০০৯।

২৮. বনানী মুখোপাধ্যায়। কথায় কথায়। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০১৩।

২৯. মিথিলা মুখোপাধ্যায়। শ্রুতি রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০১২।

৩০. মৌলী বসু। পাঁচমিশালি পনেরো। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০১৫।

৩১. সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। শ্রুতিনাটক সংকলন। কলকাতা। অপেরা। প্রথম সংস্করণ ১৯৯২।

৩২. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। অম্লমধুর শ্রুতিনাটক সংগ্রহ। লালমাটি। প্রথম সংস্করণ ২০১২।

৩৩. সমরেশ ঘোষ। ভালোবাসার রামধনু। কলকাতা। যোগমায়া প্রকাশনী। প্রথম সংস্করণ ২০১১।

৩৪. সমীর দাশগুপ্ত। শ্রুতিনাটক মঞ্জরি। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ১৯৯০।

৩৫. সমীর দাশগুপ্ত। একগুচ্ছ শ্রুতিনাটক। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭।

৩৬. সুখেন্দু রায়। শ্রুতিনাটক সংকলন। কলকাতা। যূথিকা বুকস্টল। প্রথম সংস্করণ ২০০৯।

৩৭. সিদ্ধার্থ সিংহ। নির্বাচিত শ্রুতিনাটক। কলকাতা। তেহাই প্রকাশনী। প্রথম সংস্করণ ২০১১।

৩৮. সুব্রত মুখোপাধ্যায়। একলা চলো রে। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০১২।
৩৯. সৌম্যেন্দু ঘোষ। শুধু দুজনে। কলকাতা। তূণ প্রকাশ। প্রথম সংস্করণ ২০১০।
৪০. সৌমিত্র বসু। মাইকের মুখোমুখি। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০১৩।
৪১. স্বপন দাস সম্পাদিত। একুশ শতকের শ্রুতিনাট্য সংগ্রহ। কলকাতা। প্রয়াগ প্রকাশনী। প্রথম সংস্করণ ২০০৮।
৪২. স্বপন গাঙ্গুলী। সরস শ্রুতি। কলকাতা। কলাভৃৎ। প্রথম সংস্করণ ২০১৫।
৪৩. স্বপ্না গুহ সম্পাদিত। সাতটি শ্রুতিনাটক। কলকাতা। নাট্যচিন্তা। প্রথম সংস্করণ ২০০৭।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. অনজন দাশগুপ্ত। অভিনয় শিল্প সংলাপ কণ্ঠস্বর। কলকাতা। প্রকাশক গোপা দাশগুপ্ত। চতুর্থ সংস্করণ ২০০৭।
২. জগন্নাথ বসু। বেতারের কথকতা এবং। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। দ্বিতীয় সংস্করণ। মে ২০১০।
৩. জগন্নাথ বসু। বাচনিক নান্দনিক। কলকাতা। শব্দ শিল্প প্রকাশনী। প্রথম সংস্করণ ২০০১।
৪. জগন্নাথ বসু। বেতারের গ্রিনরুম। কলকাতা। সাহিত্য সংসদ। প্রথম সংস্করণ ২০০৯।
৫. প্রদীপ ঘোষ অনীশ ঘোষ সম্পাদিত। আবৃত্তিচর্চা। কলকাতা । মডেল পাবলিশিং হাউস। প্রথম সংস্করণ ১৪১০।
৬. ভবেশ দাস প্রভাতকুমার দাস সম্পাদিত। কলকাতা বেতার। কলকাতা। পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র। প্রথম সংস্করণ ২০১১।
৭. ভবেশ দাস সম্পাদিত। কলকাতা বেতার ৩। কলকাতা। গাঙচিল। প্রথম সংস্করণ ২০১৪।
৮. সংসদ বাংলা অভিধান। কলকাতা। সাহিত্য সংসদ। একবিংশতিতম সংস্করণ ২০১৪।
৯. সনাতন গোস্বামী সম্পাদিত। প্রসঙ্গ শ্রুতিনাটক। কলকাতা। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। প্রথম সংস্করণ ১৩৯৭।
১০. সূর্য সরকার। বেতার নাটক রচনারীতি। কলকাতা। রবীন্দ্র ভারতী। প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭।
১১. সাধনকুমার ভট্টাচার্য। নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ। কলকাতা। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। প্রথম সংস্করণ ১৩৬৯।
১২. সাধনকুমার ভট্টাচার্য। নাটক লেখার মূলসূত্র। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। তৃতীয় সংস্করণ ২০০৬।

১৩. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভরত নাট্যশাস্ত্র। প্রথম খণ্ড। কলকাতা। নবপত্র প্রকাশন। ষষ্ঠ সংস্করণ ২০১৪।
১৪. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভরত নাট্যশাস্ত্র। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা। নবপত্র প্রকাশন। চতুর্থ সংস্করণ ২০১৫।
১৫. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভরত নাট্যশাস্ত্র। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা। নবপত্র প্রকাশন। পঞ্চম সংস্করণ ২০১৫।
১৬. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভরত নাট্যশাস্ত্র। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা। নবপত্র প্রকাশন। পঞ্চম সংস্করণ ২০১৪।
১৭. John Gielgud, Stage Directions, Heine mann, The University of Michigan, 1st Edition 1963.
১৮. John Gassner, Masters of the Drama, Dover Publications, The University of Michigan, 3rd Edition 1954.
১৯. Ralph Milton, Radio Pragramming, Wood Lake Publishing, Geoffrey bles, 1st Edition 1968.
২০. Robert L. Hilliard, Writting for Television and Radio, Wadsworth Publishing Company, Indiana University, 5th Edition 1991.
২১. Val Gielgud, The Right Way to Radio Playwritting, Kingswood [Eng]: A. G. Eliot., 1st Edition 1948.
২২. Walter Krulevitch, Kingson and Rome Cowgill, Radio Drama Acting and Acting and Production, Holt Rinehart and Winston, Pennsylvania State University, Revised Edition 1961.

পত্র পত্রিকা:

১. অণুনাটক সমাচার। মুখপত্র অণুনাটক বিকাশমঞ্চ। শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ চ্যাটার্জী সম্পাদিত। বার্ষিক। দ্বিতীয় সংখ্যা ২০১০।
২. অভিনয় পত্রিকা। অমল রায় সম্পাদিত। বর্ষ ২৭ শারদীয়া সংখ্যা। সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১০।
৩. অভিনয় পত্রিকা। অমল রায় সম্পাদিত। বর্ষ ২৩মে। ২০০৬।
৪. অভিনয় পত্রিকা। অমল রায় সম্পাদিত। বর্ষ ১৭ অক্টোবর। ২০০০।
৫. নাট্যসৃজনী। অন্তিকা চ্যাটার্জী সম্পাদিত। তৃতীয় শারদীয়া সংখ্যা। সেপ্টেম্বর ২০০৬।
৬. নাট্যসৃজনী। অন্তিকা চ্যাটার্জী সম্পাদিত। চতুর্দশ বর্ষ। শারদ সংখ্যা ২০১৭।
৭. বহুরূপী। গঙ্গাপদ বসু সম্পাদিত। সংখ্যা ২৭। সেপ্টেম্বর ১৯৬৭।
৮. বহুরূপী। কুমার রায় সম্পাদিত। সংখ্যা ১১২। সেপ্টেম্বর ২০০৯।

"প্রকৃতিপাহাড় এবং সমতলের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা যেন টেনে দিয়েছে": বর্ষাবন বক্সাবন-এর কবি সুদীপ্ত মাজি

শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা
স্টেট এডেড কলেজ টিচার,
বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

সুদীপ্ত মাজি কবিতার জগতে পরিচিত নাম। পাঠকের মনে তিনি একটা ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর একাধিক কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সাম্প্রতিক সংকলন 'বর্ষাবন বক্সাবন' (২০২২) আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। কবিতাগ্রন্থের নামকরণে প্রকাশ 'বক্সা' নামক স্থানটির এবং সন্নিহিত বিভিন্ন অঞ্চলের নিসর্গ-রূপ নিয়ে বিষয়বস্তু অনুভবে অবলম্বনে লেখা এই সংকলন।

সুদীপ্তর কবিতাগুলি আমাকে ভাবিয়েছে—প্রথমতঃ বহুপ্রাচীনকালথেকেই নিসর্গ হল কবিতার অবলম্বন। ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে কালীদাস থেকে মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষা ও বসন্ত বন্দনায় যে প্রকৃতির রূপ দেখি, কবিরা প্রেম-বিরহকে তুলে ধরতে চান সেখানে প্রকৃতির যেন সাজানো চেহারা, খানিকটা আরোপিত গীত গোবিন্দেও প্রকৃতি যেন মানুষের ভাবের আঁধার মাত্র।

দ্বিতিয়ত, ১৯ শতক থেকে পাশ্চাত্য রোমান্টিক যুগ শুরু হল সেখানে মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতিই প্রধান। প্রকৃতি সেখানে কবিদের প্রতিফলনে বর্ণিত। যেমন আমরা ওয়াডস্‌ওয়ার্থ, কীটস ও শেলীর কবিতায় পাই তেমনি রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও। দেখা যায়, কবিরা প্রকৃতি বর্ণনাতে শুরু করলেও কয়েক পংক্তি পরেই তা চলে যায় কবির মনের উপলব্ধিতে। উদাহরণ— স্কাইলার্ক (পি. বি. শেলী), নাইটইন্‌গেল (জনকীটস্‌), বর্ষামঙ্গল (রবীন্দ্রনাথ)।

এই পরম্পরার প্রথম পরিবর্তন ঘটে বাংলা কবিতায় জীবনানন্দে। প্রকৃতির জৈব সত্তার বাস্তবতা সম্পর্কে কবির মুগ্ধতা ও বিস্ময়ের বোধ মিশে যায়। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্যই কেবল অনুসন্ধানের নয়, সেখানে বাঘ হরিণ খায়, মানুষ হরিণ মারে, আহারের সন্ধানে এবং প্রজননের প্রয়োজনে পশুপাখীর যাবতীয় সন্ধান। বুনোহাঁস, ক্যাম্পে কবিতাগুলি তারই নিদর্শন।

এই ধারায় কবিতা সিংহ, জয় গোস্বামীকে, খুব প্রবল ব্যপ্তভাবে পেয়েছি কবি সুদীপ্ত মাজিকে। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীসূত্রে বক্সার প্রকৃতি গ্রস্ত করেছে কবিকে। আঞ্চলিক নামগুলিথেকেই বোঝা যায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রকৃতির চেহারাও আলাদা এবং জীবন্ত চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন কবি। নাগরিক মানুষ প্রকৃতি থেকে নিজেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। প্রকৃতিকে ধ্বংস করেই মানুষের উন্নতি, কিন্তু একদল গরীব শ্রেণীর মানুষ প্রকৃতির আশ্রিতা, ফলতঃ নাগরিক মানুষ

যখন প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে, তখন প্রকৃতির কোলের সন্তানদের ও ধ্বংস করছে। এই সমাজবোধ এবং তার সঙ্গে প্রকৃতিকে মিলিয়ে দেখার অবিচ্ছন্নতা কবি সূদীপ্ত মাজির চোখে। বক্সাবন, বর্ষাবন, গাড়োপাহাড়, রাজাভাতখাওয়া, ধরণীপুর চা বাগিচা, রাইনো ভ্যালিতে সন্ধে, চৈত্র, চিলাপাতা, জৈন্তি, টোটোপাড়া, ফাঁসখাওয়া, সামসিং, জিরোপয়েন্ট, গরুচিরা, অরণ্যমহল, রায়মাটাঙ, ছিপড়া ফরেস্ট রাত্রি, বৃষ্টিবিকেল, জলদাপাড়া, বক্সাদুয়ার, বক্সাফোর্ট, যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচ টাওয়ার, গোরুমারা, দমনপুর বনবাংলো, সাজলাবাড়ি, বিন্দু-ঝালং, ভুটানঘাট, মহাকাল গুহা, বাঘবনের ডায়েরি, প্রভৃতি এই সংকলনের সবকটি কবিতাই আজকের কবি সুদীপ্তর চোখে দেখা সামাজিক প্রকৃতি।

"বক্সাবন"—কবিতাটিতে কবি বলতে চেয়েছেন—একালের পৃথিবীতে পরিবেশ ধ্বংস করেই গড়ে উঠেছে মানুষের সভ্যতা। নদী, প্রান্তর, অরণ্য সবকিছু নষ্ট করছে একশ্রেণির মানুষ। সর্বাধিক আঘাত লাগে অরণ্য পরিবেশে। 'বক্সাবন' এখানে একটি অরণ্যভূমি সেখানে গ্রহণ লেগেছে। কবি বৃক্ষের মনের দিক থেকে কবিতাটি রচনা করছেন। মনের কম্পন, অন্ধকার, ভয়, এসবই গাছের। উর্ধ্ববাহু বৃক্ষশাখায় মৃত্যু হয়, কবি-তা অনুভব করে বৈদ্যুতিক কুঠারের মধ্যরাতে বৃক্ষ ছেদন করা হয়। গাছগুলি বিষন্ন হয়ে থাকে। সে বিষন্নতার পরিণাম—

"রাত্রিকে বিষন্ন আর, আরও একটু কালো করে তোলে
প্রতিবেশী নিঃসঙ্গ গাছের নিঝুম......।"

গাঢ়ো পাহাড়ের অরণ্যের কোলে 'রাজভাত খাওয়া' অঞ্চলটি যেন সবুজ আর সবুজ এর প্রলেপের চাদরে ঢাকা! সবুজের বুক চিরে জীবগাড়ী ছুটে চলেছে যাকে কবি রূপকার্থে ধাতব বাইসনের সঙ্গে কল্পনা করেছেন। প্রাকৃতিক হাওয়ার দাপটে উড়ে যাচ্ছে গাছ। দৃশ্যপটের সাথে সাথে ধীরে ধীরে উঠেছে নতুন সব নগ্ন ছায়া। যেন কত ছোট গল্প পাহাড়ের বুকে পাথরের খাঁজে খাঁজে লেখা হয় আছে যা আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে সভ্য মানুষের চোখে, এ যেন পথের ঠিকানা লেখা চিরকুট পথে পথে পড়ে রয়েছে, আর সে সব ফেলে রেখে—

"ছুটে যাওয়া চক্রযান চরিতার্থ হয়ে উঠছে চরিত্রের আলোছায়া মেখে।"

'রাজভাতখাওয়া' কবিতাটি ইঙ্গিতময়। পুরনো অঞ্চল 'রাজাভাতখাওয়া', প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে কিন্তু এখন সেখানে বানানো হয়েছে চক্রযান ছুটে খাওয়া পথ। সেই শক্তপোক্ত গাড়ী-গুলির কথা চোখে ভেসে ওঠে। পাহাড়ী রাস্তা বাঁক ঘুরে ঘুরে ওঠে। গাড়ীর হেডলাইনের আলো পড়ে আলোছায়ার খেলা চলে। পাথরের খাঁজে খাঁজে সে কবি অনুভব করেন, স্থানীয় মানুষদের জীবন কথা— "পাথরের খাঁজে খাঁজে ছোটগল্প লেখা।" ছুটে যাওয়া চক্রযান যেন মেখে নিচ্ছে মানব চরিত্রের সুখ দুঃখ, সমৃদ্ধ প্রকৃতি আর মানুষের সভ্যতার গতিতে। একসঙ্গে অনুভব করেছেন কবি। ফাঁসি খাওয়া, কবিতায় পার্বত্য আদিবাসী মানুষে দারিদ্র চিহ্নিত রয়েছে। উত্তরবঙ্গ এবং অসম রাভা-

জনজাতির এক নারী এই কবিতার কেন্দ্রে তাকে প্রথম দেখা, সে পেটের যন্ত্রনায় জঠরে জ্বালা মুছবে বলে ভাঙা কাঠ মাথায় তুলছে। সব সময় যে কাঠ পেলেই রান্না হবে তা নয় হয়তো ঘরে কোন খাদ্য বস্তুই নেই, কাঠ বিক্রির সামান্য টাকার কিছু তারপরে রান্না, কবি রাভা বসতির কথা বলেছেন। সেখানে 'ক্ষুদ্ধ বানান জাগে রাক্ষসী বেলায়'। তবু কষ্টের মানে সেই নারী-হাসে। এর পরে কবি কবিতাটির চরিত্র হয়ে ওঠেন নিজেই। 'সেই রাভানারী হাসি সম্পর্কে তিনি বলেছেন—" তোমার হাসি বসন্তের মতো নিষ্কলুষ/ আমাকে করে। আমাকে ফকির করে বেহাগে সাজায়" কিন্তু এখানে ক্ষুধার্ত জনজাতি গোষ্ঠীর যন্ত্রণায় স্বচ্ছল শ্রেনীর কবি একাত্মবোধ করেছেন কী! প্রশ্ন জাগে—যদি করতেন তা হলে সে হাসি রঙীন করত না; গানের সুরের কথাও তাঁর মনে হত "ফকির" শব্দটির উল্লেখে দারিদ্র্যের চেয়ে সৌখিন দার্শনিকতার ইঙ্গিতই যেন বেশি। হয়তো বা কবি পার্থক্যটাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'জৈন্তি' পাহাড়ের কোলে যেন এক পান্থশালা! চেয়ারে চায়ের পট নিয়ে অলস মাজাজে সময় কাটানোর জন্য এক আদর্শস্থান—

"ইথারে জেগেছে যত
কলধ্বনি, কুহু আর কেকা
রঙের প্যাকেট উল্টে ছবি আর ছবি আর ছবি
অন্ধকার তছনছ করে দেওয়া কান্ত বাহার

'সান্তালাবাড়ি'—অপার সবুজের এই স্থানকে কবির মনে হয়েছে যেন সৌরচালিত রান্নাঘর কত লক্ষ বছরের দীর্ঘ কারখানা যেখানে সালোকসংশ্লেষ তৈরী হয়ে চলেছে। কবি সুদীপ্ত বলেছেন কখনো সমবেতভাবে কখনো বা একা একা পাতার সঙ্গে মিশে গেছেন, প্রস্বেদনে, প্লাসটিডে, সৌরচালিত রান্নাঘরে 'গানে ও গগনে ভরা আলোবাতাসের সঙ্গী হয়ে ....../ " কতদিন পর এই আনন্দভুবন কবির চোখের সামনে পরিস্রুত হয়ে চোখের খনিজ হয়ে গেছে, যে শান্তি চাক্ষুষ করেন নি কবি ! এখানকার শান্তি দেখে কবির স্বগতোক্তি:

"আজ দূর থেকে দেখি
তোমাদের চোখ দিয়ে, মনোবাঞ্ছা দিয়ে : নিরস্ত্র
গাছের নীচে, সারি সারি বুদ্ধমূর্তি শুয়ে বসে আছে!

"বনলতা বনবাংলোয়" লেখা কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে যেন শরীরে শিহর্ণ জাগানো রোমঞ্চ খেলে যায়। দূরের লুকানোপ্রেম লিখে রাখি পাতায় পাতায়/ বর্শা রাতে, বক্সাবাঘবনে.../.../লং প্লেয়িং-এর বড়ো মায়াবী রেকর্ড বাজে মৃদু কলতানে।' কবি একা বিষন্ন, লুকানো জমানো অশ্রু যেন শিশিরের ছদ্মবেশে মরে পড়ছে আর মনে হচ্ছে কাঠের বারান্দা জুড়ে ইস্টম্যাস্কালারের চলচ্চিত্র জেগে উঠেছে। সঙ্গে সিপিয়েয়া টোনের মধ্যে বৃষ্টি নেমে গেছে, কবি মুখ চুন করে বসে আছেন।

"বিন্দু ঝালং"—কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতাই যেন ছবি আর গান আর সৌন্দর্যের বিমূর্ত মায়াবী ছবি। 'কবি সুদীপ্ত বোল্ডারে বসে শুনছেন কেবিটেন যেন তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলছে:-

"টিপ্ টিপে বৃষ্টি আর গরম মোমের গন্ধে/ পাহাড়ের পাদদেশে গান গাইছে ছড়া লিখছে/ বয়ে যাওয়া খরস্রোতে জলে।'

'সামসিং কবিতায় ফুটে উঠেছে পাইন গাছে আর পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে ফুল চাষের দৃশ্য। "বাঁকে বাঁকে জাগে ব্ল্যাক প্যান্থারের ছায়া আর/ হরিণের ছুট—/ সঘন দৃশ্যের মধ্যে অনেক অচেনা রং ঢেলে দিয়ে বিশ্ব চিত্রকর।"

'টোটোপাড়া' কবি ট্যুরিস্ট হয়ে যেন গেছেন দিন কয়েকের জন্য আর বিস্ফারিত চোখে হাউড়ি (জলা ভূমি) পেরিয়ে ধ্যানস্থ দীঘার মত অবাস্তব হয়ে থাকা তোমাদের অপরূপ গ্রাম!" অনশ্বর পাহাড়ের কোলে নদী বিভাজিকা টেনে দিয়েছে। কবির চোখে পড়েছে শান্ত এক দাওয়ায় শীতের ঝুড়িতে কমলা লেবু শীতের মুড়িতে উবু হয়ে শান্ত এক দাওয়ায় বসেছে। শহরের বাতাসের অভ্যস্ত মানুষেরা কখনো কখনো এখানে গন্ধ নিতে আসে।

কবির চোখ স্পষ্ট হয়—

"ক্ষেত্রসমীক্ষার খাতা ভরে ওঠে নানাবিধ হিসাবে, ছবিতে ইউ-র পেয়ালাজুড়ে ওংচু পুজোর খুশি নিয়ে আসে নিসর্গের খাম"...

"ডুক্পা-হাট" এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ পর্যটক কবির নিজেকে একদিনের রাজা মনে হয়েছে। যিনি ব্যালকনির নিরুচ্চার আরাম কেদারায় বসে পাহাড়ের কোলের শান্ত নির্জনতা দেখে মনে হয় যেন "মনশ্চোখে দেখা হয় জগৎ-জীবন।

'বক্সাদুয়ার' কবিতায় কবি সুদূর থেকে এতদূর পায়ে হেঁটে আসেন শুধু মাত্র এখানের নির্মল হাসি দেখবেন বলে।

'সুউচ্চ খাড়াই পথ নিকোটিনে ভরাট হৃদয়
খাঁটি হৃদয়ের ডাক উপেক্ষার কুয়াশায়
ঢাকা রাখতে পারেনি বলেই
লাঠি হাতে দুর্মর ট্রেকিং..
কেম্ ছো—ডাকের মধ্যে জেগে থাকা পবিত্রতা।'

লোকে সমুদ্রে যায় স্নান সারতে, আর কবির পথ উল্টো। স্নানের দুর্মর লোভে বার বার পাহাড়ে এসেছেন বরফের শুশ্রূসাজরে পান্থ পাদপের মতো ভিজতে।

কবির এই আসার কারণ ইন্দ্রবাহাদুর থাপা জানে। বক্সাদুয়ারের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের টান-হাতছানি আর এখানকার আদিবাসী মানুষের আন্তরিকতা কবিকে প্রলুব্ধ করে বার বার আসতে।

'বক্সাফোর্ট—কবি কণ্ঠে শুনে নেওয়া যায়—

'ইতিহাস কথা বলছে কিছুক্ষণ।/ চুপ করে বসি!/ মেলে দিয়ে বসে আছে প্রাচীন কয়েদ.../ একে একে ভেসে/ আসছে অগ্নিযুগ...কাঁপানো বীরের/ অন্তরাত্মা, বন্দে মাতরম ধ্বংসাবশেষের পরে জেগে ওঠা তৃণগুলি বলে--/অন্তরিন/ হয়ে থাকা মৃত প্রাণ থেকে/ বহু পরে অবিস্মরণীয় এক দৃপ্ত গান রচিত হয়েছে !' কবি সুদীপ্ত মাজির পাহাড়ী অঞ্চলের প্রকৃতির বর্ণনা বা বিবরণ দেওয়া আলাদা করে কোন ভাষা দরকার হয় না বা সামুয্যে মিলবেও না। কবির নিজের ভাষাতেই পাহাড়ী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলি আত্মিকরণ করা যাক—

'শান্ত বাতিদান ঘিরে, গোল হয়ে বসে/ তাকিয়ে দেখছ/ বুদ্ধপূর্ণিমার আলো বুকে মেঘে বুদ্ধ হয়ে/ তাকিয়ে রয়েছে গোল চাঁদ...।/ মনাস্ট্রির ঘন্টাধ্বনি বহু নীচে জেপে থাকা জনপদে/ তরঙ্গ পাঠায়—/ রাত্রিটিকে রাত্রি বলে চেনা যায় না আজ বুদ্ধের আলোয়।

'জিরো পয়েন্ট'—"অলীক বাড়ির কাছে আমাদের পথ থেমে গেছে।" এখানকার রত্নভাণ্ডারের সব ধনরত্ন যেন গভীর পাথর রঙে ঘেরা পা স্বয়ং কুবের দাড়িয়ে পাহাড়া দেন। 'চাপরামারির' তে ঝরাপাতা, আলো আর দুর্নিবার হাওয়ার ভেতরে জেগে থাকে অমরাবতী আর দূরে ছাতির বৃংহণ এসব নিয়ে প্রবালের বাড়ি ছেড়ে কবি ঘণ অন্ধকারে ফিরে যেতে চান।

অরণ্যমহল, রায়মাটাঙ—যেখানে "বোরালি মাছের ঝোলে শেষাবধি রাঙা হল আমাদের রাত্রিবনবাস।" বালা কবিতায় দেখি—"চুতুর্দিকে রূপের খাজানা/ নিজের বহতা নিয়ে নদী কতদূরে বয়ে গেছে/ ছোটো বড়ো নুড়ি জড়ো করে...।

ছিপড়া ফরেস্টে রাত্রি:- "এত গান হাওয়ায় হাওয়ায়/ সুরের বারান্দা থেকে খুব যত্নে উঁকি মেরে দেখি/ কত যে বিভঙ্গ জাগে আলাপের, অরণ্যের/ নির্বাচিত ঘরে ও দাওয়ায়.../

'রূপংভ্যালি'-র ঢালুপথে আলোবাতাসের অসীম শুনানিতে ক্লান্ত হয়ে উঠে এলে বিচারকের মত কবি যখন একা ধ্যানস্থ—

"সামনে চায়ের কাপ ঠাণ্ডা হয়,
পাগলের গান জাগে গোটা চরাচরে...
বিমূর্ত বানান জাগে অনন্তের আর
অমীমাংসিত এক রোদ আসে বারান্দার
কোণে...

....
জীবন প্রবাহব্যাপি বিচারের রায়..."।

'হলং বাংলোয় লেখা' লাবন্যভরা মরাই আর হলস্তের জলে/ শ্যাওলা ও জলঝাঁপি। অদূরে গাউর/ নেমে আসে নদীটি বাঁধানো চাতালে।/ অদূরে সামান্য জলবিভাজিকা

পেরিয়ে দাঁড়ানো/ বাঁকানো শিং—এর মধ্যে লিখে রাখা মৃত্যুর বানান—/ চিৎকার করে চৌকিদার.../ রোমাঞ্চ অমনিবাসে এই গল্প এর আগে কখনো শিখিনি !"

'বৃষ্টিবিকেল জলদাপাড়া'—

"নীরবে হাতির শুঁড় জঙ্গলে ভেঙেছে.../
জলের ভিখারি, সেও এসময় দৌড়ে যায় দূরে/
মাটির আশ্রয় চায়, একটু আধটু দানাপানি
চায়.../ মৃত মহিষের পাশে পাখা মেলতে ভুলে
যায় সঘন ময়ূর/ কানে শোনে দুস্কর সে গান!"

'এলিফ্যান্ট সাফারির বিকেল'—

"উঠেছি হাতির পিঠে, বেলা পড়ে এলো/
পেরিয়ে পেরিয়ে চলি যেখানে শ্যামল/ সভ্যতার শুরু
থেকে আমাদের অপেক্ষায় আছে / হঠাৎ মগোলি
এসে ডাক দেয়/ মনে মনে লাফ দেয় ডাল থেকে ডালে/
এর পরে মন্ত্রমুগ্ধ চোখ বুজে আসে/ জানা যায়
না কী আছে কপালে...।

'যাত্রাপ্রাসাদ ওয়াচ চাওয়ার, গোরুমারা'— পাহাড়ের কোলে এই অঞ্চলটিতে যেন গন্ডারের ছদ্মবেশে বনদেবতার অধিবাস বলে মনে প্রণাম করেছেন মনে মনে। খালের বনে তাঁকে দেগে আদিগন্ত প্রণাম করেছেন মনে মনে। কবিও তাঁর সহযাত্রীদের দূর থেকে দেখে খড়শোভিত ঘাসজীবনের আর কাদাজীবনের অধীশ্বর তাঁর খড়গ নাচান। কবি—"শেকড়ের টান টের পাই/ বনদুহিতার মতো মায়ামেঘ জাগে চারপাশে.../ সেই দৃশ্য দূর থেকে চুরি করে দেখে/ চোরাশিকারির মতো অপাংক্তেয় লাগে মনে মনে/ রাজাকে প্রণাম করে অতি দ্রুত ফিরে আসি রিসর্টের ঘরে, সংগোপনে...।"

'মহাকাল গুহা'—"জীবাশ্মের মধ্যে থেকে যদি জেগে ওঠে প্রাণ/ চোখের শুশ্রুষা পেতে শুধু আজ এখানে আসিনি.../ কত লক্ষ বছরের দীর্ঘ মোড়ক খুঁজতে বারবার আসা এই বনে।" আমাদের শহরে নাগরিক জীবনে হাজার স্কোয়ার ফিট শৌখিন মানিপ্ল্যান্টে ঢেকে রাখা সাজানো ড্রয়িং ঘরে বেঁধে তুলে আনা অর্কিডের বায়োস্ফিয়ারকে ক্রমাগত অট্টহাসি জাগায়, কে হাসে জানেন না কবি।

'বাঘবনের ডায়েরি দিয়ে' কবি সুদীপ্ত মাজির 'বর্ষাবন বন্যাবন' কাব্যগ্রন্থটি শেষ হয়েছে। সম্পূর্ণ গদ্য কবিতা সংকলনের এই শেষ কবিতাটি। কী নেই এই কবিতার মধ্যে? কবি সুদীপ্ত অসামান্য পর্যবেক্ষকের নিপুণতায় ফুটিয়ে তুলেছেন এই বনাঞ্চলের ডায়েরির মধ্যে। মনুষ্যসংস্রবহীন স্টেশনের ওয়েটিং, রুমে দু দন্ড বসে মনশ্চোখে কবি দেখেন মায়াবী পেখম তোলে— দিনান্তের রঙভরা আকাশ বিষাদমাখা রং দিয়ে মেঘে মেঘে গল্প লিখে যায়। পিছু পিছু চোরাশিকারীরা আসে। কাঠমাফিয়ার পাশে জেগে থাকে

রাজনীতিবিদ। বনদপ্তরের গুলি বিদ্ধ করে অসহায় রাখালের বুক। দূরের কাঞ্চন কন্যা কাছে এসে দূরে চলে যায়। একা মুসাফির আর কতদিন স্বপ্ন ফেরি করে। এবার ফিরতে হবে কবিকে নিজের যাত্রাপথে—কতদিন ডাকনাম ধরে তাকে ডাকে নি যে কেউ। সবুজ পতাকা নাড়ে সিগনালম্যান। গাড়ি, আরও নিসর্গের বিসর্গের অভিমুখে দৌড়ে যেতে থাকে...।

পরিশেষে—"প্রায় দুই দশকের অরণ্য শহর বনবাসের এক আশ্চর্য অভিপ্রাণ গ্রন্থ সুদীপ্ত মাজির-র বর্ষাবন বক্সাবন"। ব্যক্তিজীবনের আলো অন্ধকারের সমান্তরালে যেখানে অঙ্গীকৃত হয়ে উঠেছে ডুয়ার্সের প্রান্তিক জীবন ও জনজাতির জীবন প্রবাহের অন্তর্লীন আনন্দ-বেদনাও। সবুজের ভেতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সজীব ও সজীব কত উল্লাস ও প্রদাহের এক অনির্বায সাহিত্য সমবায়। নীলিমা ও নিসর্গের ছায়া ও মায়ায়, মোরার বহতা স্রোতে চিরবহমান কোনো জীবনের অনেক জিজ্ঞাসা নিভৃত উত্তর খুঁজছে মৌন এক অপেক্ষার ব্যালকানিতে দাঁড়িয়ে।' চিত্রল অনুষঙ্গ ও রেখাও লেখার অসামান্য যুগল সাম্মিলন ঘটেছে এই "বর্ষাবন বক্সাবন" কাব্যগ্রন্থে।

সাধারণ সূত্র নির্দেশ:

১) সূদীপ্ত মাজি, বর্ষাবন বক্সাবন, হাওয়াকল পাবলিশার্স এর পক্ষ ৭০ বি/৯ অমৃতপুরি, ইস্ট অফ কৈলাস, নিউ দিল্লী ৬৫, ৩৩/১/২ কে বি সরণী, দমদম, কলকাতা ৮০ থেকে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ মে ২০২২

Rabindranath Tagore's Concept of Nation State and Nationalism: An Analysis

Rudra Prasad Roy
Assistant Professor in Political Science,
Amdanga Jugal Kishore Mahavidyalaya,
24 Parganas (N), West Bengal, India.

Abstract : The present article trying to analyze Rabindranath Tagore's view on nation, state and nationalism in true sense. Rabindranath explained his position on the question of nationalism. Nationalism is a very modern and Western concept with a mechanical purpose, in which 'Instrumental Rationality' played a key role. According to him, the purpose of the nation is realized through the formation of the state. He called nationalism a 'geographical demon'. Rabindranath harshly criticized the nation. But he did not draw the picture of No-Nation so strictly. Rabindranath speaks of the concept of patriotism in his alternative model. The Partition of Bengal in 1905 had a significant impact on Rabindranath's life. At this time he became associated with the Swadeshi movement. It was in this movement that some new ideas took hold of Rabindranath. In Rabindranath set up an organization called 'Palli Punarnirman Sangstha' (Rural Reconstruction Agency) in Surul village near Santiniketan. He tried to establish an alternative system to the Swaraj movement led by Mahatma Gandhi. Rabindranath did not discriminate between people. He did not give precedence to race, religion, caste or any particular culture. Rabindranath did not give precedence to any particular ideology in nationalism.
Keywords: Nation, Nation-State, Nationalism, Internationalism, Patriotism, World Humanism, Swadeshi, Sriniketan.

Introduction

The world poet Rabindranath was one of the leading architects of modern India. Rabindranath adopted many ideas human freedom, equality, friendship, liberation. Like From the Europian Renaissance. He had immense respect and devotion to Western civilization. Rabindranath's thought is a combination of that European Renaissance and Indian tradition.

Prominent historian Ramchandra Guha has commented that we have the "four founders" of modern India. They are, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and B. R. Ambedkar. Their sense of nationalism and state consciousness has opened the horizon for the liberation of India. In this context, a young mathematician asked to Ramchandra Guha that, "Why Rabindranath in this list?" In reply, he said, "Of course, Rabindranath - because," Rabindranath has inspired Indians with a nationalist spirit. Encouraged by freedom. Awakened in the colours of his consciousness, in the combination of different colours. Floated in the fountain of light of the radiant flame of his being. The white radiance of Rabirashmi has spread all over the world including India. But Rabindranath's nationalism was in the overall sense; That is universal. At the same time objective and rational "(Guha, 2009). Dr. Guha added that Rabindranath was one of the architects of modern India. In this context, it can be mentioned that the former President of India. Sarvapalli Dr. Radhakrishnan has called Rabindranath Tagore the greatest personality of the Indian Renaissance.

Rabindranath's idea of nation

It may be mentioned that the famous British historian EP Thomson, in his book 'Tagore's Nationalism' published in 1991, commented that we should not forget that Rabindranath was a poet. And the poet is not just a believer in definition. An artist will always stand against the politics of determinism. Because, his main initiative is with possibility. He quoted Rabindranath as saying, 'no man should let himself be at the mercy of his similes', but Rabindranath explained his position on the question of nationalism. He wrote, 'A nation is understood in the sense of a political and economic union of a people and in that aspect a whole population assumes when organized for a mechanical purpose' (Thompson, 1991). Here the strategic use of Rabindranath's word is noticeable. To him the Nation is not ethnic, not even directly related to the language group or culture. According to him, these may act as elements in the formation of the nation, however, the nation is more powerful than its constituent elements. He thought that Nation and Nationalism was a very modern and Western concept with a mechanical purpose, in which 'Instrumental Rationality' played a key role. According to him, the purpose of the nation is realized through the formation of the state. And even though the state is declared to be benevolent, submission and repression go hand in hand. One of the objectives of the state is to subdue all the citizens and to

make some of their ideas normal by suppressing them from different angles.

He did not trust the nation alone. Due to the existence of various divisions in the society, nation building is not possible, this was the main reason for his distrust. He called nationalism a 'geographical demon'. At first he had the idea, ‘Nation is a mind substance’. But later he saw the Nation as an abnormal state, which unites the people in ‘mechanical need’. His explanation is that nationalism will not work in India. Because the difference between the rulers and the exploiters in Europe is not racial, but class. But in the name of religion and nation in India. According to him, trying to build a nation on a weak foundation will only exacerbate these discriminations.

In the recent past, the essay 'Rabindranath Nation Key' by eminent sociologist Partha Chatterjee has attracted the most attention in the analysis of Rabindranath's ethnography. Perth did not find any acceptable source in Rabindranath's Nation Thought and the poet's political thought in its source. Rabindranath's critique of the nation is essentially against the idea of a nineteenth-century nation, which he sees as irrelevant in the context of the expanded power system of the twentieth century. Apart from that, the idea of 'Swadeshi Samaj' that Rabindranath has created is equivalent to the formation of a nation, so in any argument Rabindranath can be called anti-nation, this question has also been raised by Perth Chatterjee (Chatterjee, 2017). So it would not be unreasonable to say That is, Rabindranath's critique of the Nation is in fact a critique of the Nation State. It is noteworthy that in the twentieth century, Rabindranath became more and more relevant in the debate over the nature of nation and nationalism. Researchers at India and abroad say that the time when the article on nationalism was written was far ahead of its time. Researchers of today's nationalism in different parts of the world call Rabindranath their predecessor during the post-colonial period.

Rabindranath's idea of nation-state

According to Rabindranath, the word Nation has been taken from the English unaltered. As a result, the idea came from English, so it is better to leave that language in english. Rabindranath was not in favor of calling the nation state a nation state. Suddenly when national culture, national fair etc. were launched all around; however, Rabindranath expressed his indignation over why this national issue have not been properly questioned. In this context, Rabindranath commented that, ‘Ten parts of

the country were overwhelmed by the national quagmire. In fact, those who have nothing to do with the occasional government crackdown are the ones who feel the urge to take the nation by storm.

However, many are reluctant to see the current concept of 'nation-state' in Rabindranath's eyes. In this context, it can be mentioned that many people again call Rabindranath's caste-thought as 'post-modern'. According to some sociologists, Rabindranath's anti-nation critique has anti-state ideology, but there is room for patriotism but not for nationalism. Rabindranath harshly criticized the nation. But he did not draw the picture of No-Nation so strictly. He has voted in favor of federal rule instead of single state rule in India in need of unity. He emphasized on the creative power of the people in the no-nation society and said that China, Japan, Iran and Turkey are such states. He also slammed the state bureaucracy. However, while praising the "new construction of communism" in post-revolutionary Russia, he did not want to accept the practice of forcing human character. He did not believe in a state that was dictatorial; his opposition to the dictatorial society was also clear. In the British era, the state was extremely authoritarian. So Rabindranath wanted people to separate society from the omnipotence and greed of the state. In this context, Rabindranath commented that nationalism will not work in India. Because the distinction between ruler and exploitation that took place in Europe was not racial; Class distinctions. But in India, divisions are in the name of religion and nation. According to him, the attempt to form a 'nation-state' on a weak foundation will further aggravate these differences.

According to Rabindranath, a review of the history of India shows that society is the main thing, not the state. He has repeatedly said this, with great emphasis. Rabindranath firmly believed that state power was not immortal, its defeat was inevitable. That is why the Taseras of his card country became 'humans', the stagnation broke down, the free flow continued to flow and even that great king of Raktakarbi fell. Rabindranath's belief in the inevitability of the end of the British rule in the 'Crisis of Civilization' is similar to his belief in the practice of culture. His mountains are clouds, rivers are constantly flowing, and people move forward for liberation - breaking all ties. According to him, losing faith in people is a sin. His confidence in human power is unwavering.

Rabindranath's concept of nationalism

Rabindranath Tagore has given a holistic form to his thinking about nationalism. He saw nationalism from the depths of feeling, as a call to

faith in the soul; which he wanted to coordinate in the light of the universal consciousness of the world. In this context, it can be said that he could have rejected the western nations, could have ignored their consumerist and life-oriented thoughts. But he did not. Rather, he has embraced western ideas and philosophy. Wanted to take the main disadvantage. He wanted to match it with the society and culture of India. In the same way, he wanted to sacrifice the heritage and eternal beauty of Indian civilization and culture to the joy of the world. Because Europe has created imperialism and militarism on the one hand; On the other hand, justice and freedom are also their contribution.

Rabindranath's family heritage, culture and his way of life, as well as his world travel experience, have helped him to become rich in liberal consciousness. His sense of life and study and personality have brought him to the world stage. So on the one hand, when he is talking about internationalism, at the same time he is demanding the independence of India. He also supported the country's independence movement led by Gandhi. In the 50's of the last century, nationalism developed in India based on the concept of universality. The keynote of this nationalism was freedom based on advanced values and a sense of knowledge and equality. This consciousness emanates from Rabindra Adarsh.

In this context, eminent sociologist Professor Ashish Nandi has remarked that Rabindranath used the words patriotism to express his love of country, but he never used these words as a synonym for 'Nationalism'. He has always used the English word 'Nationalism' to mean nationalism. Rabindranath was a patriot, but not a nationalist. By country he meant a territory and its own indigenous elements with which the concept of nation-state and the ideology of nationality differed. In the three novels mentioned, he has expressed different political views through which he has captured his own analogy about nationalism. In ‘Gora’ he gives a psychological explanation of Nationalism. He is saying that nationalist consciousness is in a sense a crime against non-Indian, anti-Indian and Indian civilization, its religious ideology and cultural pluralism. ‘Ghore-Baire’ novel of Rabindranath shows how nationalism shatters communal life structures and incites religious violence. Char Adhay shows that the seeds of industrialization are being sown. From there, the workers' revolt is followed by an organized revolt, which is a nationalist movement. (Nandy, 2006).

According to Professor Nandi, these three novels were written in the context of debates, arguments and discussions on nationalism with Rabindranath's friend Vedanta and Catholic theologian, India's first aggressive Hindu nationalist scholar Brahmabandhab Upadhyay. Here are some reflections of discussions on nationalism with Swami Vivekananda, Sister Nivedita and perhaps Rudyard Kipling. But the difference between Rabindranath's nationalism and patriotism was built on his perception of India's multicultural unity. Rabindranath believed that although the Vedas, Upanishads or Srimad-Bhagavat Gita were at the center of Indian classical culture, they were in no way capable of uniting the various nationalities of India. In this context, it can be commented that here Rammondan Roy, ; Those who thought Hindutva was the basis of the unity of the Indian people (Nandy, 2006).

Rabindranath did not confine himself to his nationalist ideas; he has inspired the whole of India with his nationalist thinking and continues to do so today. But as true as Rabindranath is as a nationalist, he is also an internationalist, who can be called a 'cosmopolitan' in the real sense of the word.

It is important to mention here that Rabindranath did not support extremist nationalism in any way; because he was surprisingly well aware of its horrors. His contemporary Hitler, Mussolini, was a fierce nationalist. Rabindranath has witnessed the consequences of their fierce nationalism. Rabindranath has noticed the multidimensional form of the existence of one nationality with another and has tried to establish a simple link from it.

Rabindranath's idea about patriotism

Rabindranath speaks of the concept of patriotism in his alternative model. According to him, patriotism is natural, not ideological and is completely different from nationalism. Patriotism and nationalism are two different issues. Along with patriotism lies the question of understanding the nature of the country and the diverse lifestyles of countless people in India. Professor Ashish Nandi in his essay 'Nationalism, Genuine and Spurious' has clearly shown that nationalism is no longer synonymous with patriotism. Nationalism, like other ideologies, is a sublime ideology created in the midst of human personality. As an adjunct to the concept of nation-state, it has traveled around Asia and Africa during the colonial period. Patriotism is a sensitive feeling that develops around a territory, culture, culture and its other characteristics (Nandy, 2006).

Rabindranath considered patriotism to be very valuable, but rejected the nationalist consciousness. In general, Rabindranath Tagore is the national poet of India who composed the national anthem of India. He is also the composer of the national anthem of Bangladesh. However, Muslim religious extremists have repeatedly demanded that the music be changed, a notion that is largely sectarian and extremist nationalist. But such an example is not one. Pakistani national poet Iqbal's 'Sare Jaha Se Achcha Hindusta Hamara ...' is the war song of the Indian Army. Singing this song, they went to war against the Pakistan army. As a result, there are some strange contradictions between the concept of land and the national cultural consciousness. He has always been against radical nationalism in colonial India. This flexible position of his has never been well received by the Indians. In these three novels, Gora, Ghore Baire and Char Adhay, he has attacked the extremist nationalist spirit. He did not accept this feeling as patriotism. Although his homeland love song was sung as an inspirational song in many struggles at that time. Even in prison, many revolutionaries sang his songs to keep their spirits burning.

Rabindranath's political thoughts

When the British government divided Greater Bengal into two parts and made Dhaka the capital of East Bengal and Assam as a province for administrative convenience, he jumped into the movement to abolish the partition of Bengal. He held various rallies in the anti-partition movement. He started writing in the editorials of various magazines. On the way, he tied rakhi between both the Hindu and Muslim communities and wrote many writings against partition.

The Partition of Bengal in 1905 had a significant impact on Rabindranath's life. At this time he became associated with the Swadeshi movement. It was in this movement that some new ideas took hold of Rabindranath. For a long time he envisioned an indigenous society. At this point he realizes that there are some real problems in the formation of that Indian society. At the forefront of the problems is the disunity among the various Indian communities. The main reason for this discord is religion. Rabindranath says, religion could not match us. So our main identity is Hindu or Muslim. At a meeting held in Kolkata on 6 August 1905 to prevent the partition of Bengal, it was decided to boycott British goods. Many see this day as the beginning of Indian nationalism. This movement takes on an intense shape. Rabindranath became involved in this movement from the very beginning. But ignoring this movement, the

partition of Bengal came into effect on 16 October 1905. As a result, the middle class society of Bengal flourished. The movement spread quickly. Rabindranath composed many patriotic songs on the occasion of this Swadeshi movement, which inspires the movement. On the day of partition of Bengal, Rabindranath and Ramendrasundar Trivedi gave a program of ‘Rakhibandhan’ and ‘Arandhan’. According to their plan, rakhi of various colors were exchanged as a symbol of brotherhood, and no fire was lit in the oven as a sign of sadness. At this time Rabindranath became fully involved in the Swadeshi movement. He jumped into the Swadeshi movement with the hope of realizing the dream of free India. However, he was also wary of the Hindu form of the Swadeshi movement. The main slogan of this movement, Bande Mataram, is a blow to the sensitivity of Muslims - which Rabindranath gradually realized.

Rabindranath did not just insist on awakening the self. He also did not support violence, extremism and assassinations. After Kennedy was assassinated in a covert attack by Khudiram and his comrades-in-arms on April 30, 1906, Rabindranath was shocked when there was a mixed reaction across the country. The image of society in Rabindranath's mind will not be established through murder or violence or assassination. According to Rabindranath, Swaraj will not come suddenly or on shortcuts. This requires long preparation. But at that time no one was willing to walk the path of waiting and long preparation of Rabindranath. Everyone has seen it as a poet's fantasy. But Rabindranath did not back down from his faith, did not abandon the imaginary idol of his ‘Indian society’. He has repeatedly revealed the one whom he knows to be true, ignoring all obstacles. As a result, Rabindranath withdrew from politics after 1906: severing ties with the nationalism he considered to be too narrow and revivalist, and promoting a universal humanism. However, it is not always the case that he has remained steadfast in this ideal.

Rabindranath's social thought

In 1921, Rabindranath, along with agronomist Leonard K. Elmhurst, set up an organization called 'Palli Punarnirman Sangstha' (Rural Reconstruction Agency) in Surul village near Santiniketan. Rabindranath later changed its name to 'Sriniketan'. Through this Sriniketan, Rabindranath tried to establish an alternative system to the Swaraj movement led by Mahatma Gandhi. He arranged for free education for the rural people in the institute with the help of scholars and pundits from different countries and tried to develop pure knowledge among them.

In the thirties, he began to propagate his views on the abnormal caste system in India and the prohibition of caste discrimination. He led his movement by speaking out against racism, composing poems, composing plays against racists, and calling for the abandonment of the practice at a temple in Kerala. His aim was to give the Dalits free access to the general society.

Rabindranath was in public for the entire last decade of his life. His popularity was at its peak at this time. Mahatma Gandhi commented on the catastrophic earthquake that struck the Indian state of Bihar on January 15, 1934, in retaliation for the subjugation of the Dalits. Rabindranath publicly reprimanded Gandhi for this remark. He also lamented the deteriorating socio-economic condition of Bengal and the impact of poverty in Kolkata. He expressed his anguish in a 100-line non-aligned poem.

Towards the end of his life, Rabindranath became very concerned about the future of the Indian state. He was particularly shocked to see India plagued by common problems such as hunger and poverty, and the communal riots between Hindus and Muslims, which were fueled by political parties. In December 1939, Rabindranath wrote to one of his English friends, the philanthropist and social worker Leonard Imphast, who had contributed to the rural development of India with Rabindranath, 'There is no need to express deep frustration like the losers in the pursuit of millions. The innate culture and peaceful heritage of these people are simultaneously subjugating their hunger, disease, domestic and foreign exploitation and agitated and dissatisfied communalism. 'Only six years after Rabindranath's death, in August 1947, India was divided. At that time there was a terrible Hindu-Muslim riot. It had provocation and fuel for politicians. Rabindranath did not see this brutal tragedy. I don't know what he used to do. However, in protest of the Jaliwanabagh massacre, he rejected the prestigious title of 'Knight' of the British Raj. In the words of Sirajul Islam Chowdhury, one of the most important works of Rabindranath is hatred and protest against the killers of Jallianwala Bagh. Those who needed this role did not do it that day. Gandhi was silent, Chittaranjan and others did not come forward. But Rabindranath could not remain silent - protested vigorously. He saved the people of India by standing alone against the dictatorial state power. That is why Rabindranath has twice honored the subjugated Indians. Once he won the

Nobel Prize in Europe, he gave up the knighthood given to him by the English.

Rabindranath did not discriminate between people. He did not give precedence to race, religion, caste or any particular culture. Rabindranath did not give precedence to any particular ideology in nationalism. His nationalism arose from human consciousness, from self-realization. Rabindranath was not a politician. He was a socially conscious and change-loving citizen. He wanted unity and a generous humanity to be reflected in the people. He has made efforts to change the society and welcome human entrepreneurship within the society. It was at that time that he realized the need for collective self-reliance to build resistance against anti-social forces. The individual creates society, and society creates the state. Honest participation in society pays for an honest state system. That was the essence of his action. His political philosophy is extremely complex. He opposed imperialism and supported Indian nationalists. Some of the poems in Mansi's Kavyagrantha, published in 1890, reveal the political and social thought of Rabindranath's early life. Rabindranath's "Chitta Yetha Bhaya shunya" and "Ekla Cholo Re" gained wide popularity as political essays.

Conclusion

In the light of the above discussion, it can be said that Rabindranath's idea of nation-state and nationalism was multidimensional; and so Rabindranath had to be criticized the most. On the one hand, Rabindranath went to the Europe in 1912 and in his discourse on 'Nationalism', he did not hesitate to publicly state that western nationalism or nationalism is going to become the worst enemy of the world or humanity. Although he was criticized, within a few weeks, World War I began with the massacre. In this case, he has become a new hero of the world or the sense of internationalism. He knew that deviating from religion and nation would create a fire within the state, which is totally against nationalism, a geographical boundary can never be the main source of nationalism, so Rabindranath Tagore gradually lost faith in the word nationalism. As long as a nation does not instill a sense of nationalism in the people of the country, the ruler will continue to exploit the nation or the country as a dictator, Rabindranath has single-handedly opposed such a sense of nationalism.

Rabindranath thought that India was not a nation-state or a nation, India was a country of many communities. There, patriotism is more important than nationalism. He also wrote to Anand Mohan Bose about

patriotism, “Patriotism is not our ultimate spiritual refuge. I will not buy glass with the price of diamonds. As long as I live, I will not allow patriotism to turn the stick on humanity. Nationalism is a huge threat. This is the root cause of India's problems year after year. Finally, following Rabindranath, it can be said that race, nation-state and nationalism; Patriotism will be above all of them. Above all, Rabindranath has placed the ideology of 'world humanity' above patriotism.

Notes and References:

1. Bose, Ashish Kumar (Eds.-2013), “Rabindranather Samaj O Rastro Bhabna”, Avenal Press Memari.
2. Chatterjee, Partha(Eds.)(2017),“Rabindrik Nation Ki?”; Praja O Tantra, Third Compilation, Anushtup, Kolkata.
3. Guha, Ansuya (Translated) (2006), Swadeshi Samaj - Rabindranath Tagore, Dey’s Publishing, Kolkata.
4. Guha, Ramachandra (2009), “Introduction,” Nationalism, Rabindranath Tagore, Penguin books, New Delhi.
5. Haldar, Gopal (Eds) (2010), “Rabindranather Swadeshikata”; Rabindranath: Centennial Essay-Compilation, National Book Agency, Kolkata.
6. Mukherjee, Ashok Kumar (2012), “Introduction”, Rabindranath Tagore, Nationalism, West Bengal State Book Board, Kolkata.
7. Nandy, Ashis (2006), ‘Nationalism, Genuine and Spurious: Morning Two Early Post-Nationalist Strains,’ Economic and Political Weekly, Vol. 41, No. 32, Aug. 12-18: 3500-3504.
8. Natani, Prakash Narayan (2006), Gandhi, Nehru and Tagore (Hindi version). Pointer Publishers, Jaipur.
9. Roy, Annadashankar (2011), “Rabindranath Presenge” Dey’s Publishing, Kolkata.
10. Sharif, Atiq-uz-Zaman (2020), “Deshprem O Jatiyatabad : Prpspngo Rabindranath”, Rising bd.com, August 26.
11. Sohanbish, Chinmohan (1997), Rabindranath O Biplobi Samaj”, Visva-Bharati, Santiniketan.
12. Special Report (2020), Rabindra Vabnai Jatiyatabad” (e-Newspaper), May 3.

13. Tagore, Rabindranath (1988), Lectures and Addresses- Madras etc. Macmillan India, New Delhi.
14. Tagore, Rabindranath (2009), Nationalism, Penguin Books, New Delhi.
15. Thompson, E.P. (1991), Rabinranath Tagore's Nationalism, Papermac, London, November 7.

Camus *Myth of Sisyphus*: Follow or Revolt in Syed Waliullah's *'Uzanne Mrityu'*

Fahmida Sultana Tanjee
Assitant Professor, Department of Dramatics
University of Chittagong

Summary : Playwright Syed **WaliUllah** (August 15, 1922-October 10, 1971) is a well-know *Uzanne Mrityu* n figure in Bengali drama literature. In this research is based on his play (1963). In the play, he has searched for the real truth of human life in the circumambulation of the non-existent uncertain destination of the human character. He presented this European style of drama to the Bengali audience/reader in a very simple way. The textual essay will highlight the reasons why his play *'Uzanne Mrityu'* can be called existentialist, where his boatmen, like *Camus's Sisyphus*, keep on running. Consequently, there will be an attempt to prove that he refrained from following Camus because he was a Bengali by race and cherished an existential consciousness in his heart.

Introduction

Syed Waliullah (August 15, 1922 - October 10, 1971) is a bright star of Bengali drama literature. He composed four plays in total. These are - *Bahipir* (1960), *Tarang Bhanga* (1965), *Suranga* (1964), Uzanne *Mrityu* (1963). In his seminal essay, an attempt will be made to deal with why the Uzan Mrityu drama is called existentialist consciousness, where the play's characteristics correspond to the absurd consciousness. Another part of the essay is the book *The Myth of Sisphus* (1942) by *Alber Camus* (November 7, 1913 – January 4, 1960). There Camus discussed the theory of the absurd. Due to the position of the absurd on the threshold of existentialism, the play Death in the Up... is called the absurd. The drama contains the realistic and imaginative work of the playwright Waliullah. Existentialist structure can be observed in the memory, the dramatist's selection and re-arrangement of the action that the reader receives. 'Existentialism suggests existence. [1] The play is about disappointment, not despair; Rather the conviction of awakening is conveyed, suggesting the opposite of *Camus' myth of Sisyphus*. Existentialism, as will be uncovered in the textual essay, is why he refrained from following Camus.

Existentialism

Existentialism is a philosophical movement that discusses existence. It ranged from the 1930s to the mid-20th century. Existentialism is about human existence. In a general sense the word existence can be used for anything mundane. Because the existence of the world is natural to everyone, it does not create any different meaning in the common mind, so it is relevant to discuss the meaning of this word existence in philosophy. 'Since according to their doctrine nothing else exists except man, in this philosophy "existence" means the existence of individuals'. [2] Existence becomes meaningful primarily through self-transcendence. Without it existence is impossible. In this, it is important to be aware of things outside of consciousness as well as self-awareness. When a man is faced with some kind of crisis or problem in the course of life, in a word when his life becomes endangered, he becomes more aware of his existence. During that time he consciously, self-determinedly tries to escape from the crisis. Thus the conscious effort to preserve life and to smoothen the pace of life can be regarded as the cardinal sign of existence. The word comes from the Latin 'ex-sistere[3]. Which means the development or expression of the individual's heart's various desires. The Danish philosopher Søren Kierkegaard (1813-1855) disregarded Hegel's materialist philosophy and emphasized the existential being of the individual. Philosopher J. Paul Sartre (1905–1980) first discussed this doctrine in his famous novel Nausea 'Jea Paul Sartre believed that human being live in constant anguish, not solely because life is miserable, but because we are condemned to be free.[4] .The Myth of Sisyphus - The Myth of Sisyphus based on *Albert Camus's* Le Myth the Sisyphus (1942) is philosophy. Absurd theory is the mainstay here. The book begins with the declaration that 'the only solution to philosophical problems is suicide'[5] Camus describes the intellectual disorder called suicide in the book. It is possible to experience this intellectual disorder by experiencing human yearnings and struggles with the unresolved inconsistencies in the world full of contradictions. People have to go through various anxieties. They choose suicide as a way to get rid of that anxiety. Suicide is the opposite journey of life, or it can be called life diversion. As a result, Camus did not support suicide.[6] But he elaborates on the complexity and intensity of suicide in explaining the absurd theory and making the meaning of life more significant. He was more interested in the horror of its consequences than the absurd. According to him, everything that can be touched in the world is knowledge, everything else is construction. Since nothing in the world is intelligible, man remains forever a stranger to himself. Absurdity is born from mutual conflict

between rationality and irrationality. People commit not only physical suicide but also philosophical suicide. In this regard, he criticized *Kierkegaard*. *Camus* called his philosophy philosophical suicide. According to Camus, Kierkegaard spoke of escaping from life. According to Camus, the unbearableness of life is not an escape from it, but rather an engagement with life. Camus is skeptical about whether everything in the world actually has a clear meaning. Camus is not interested in whether people are free or not. He believes only in his own freedom. Indeed, if the world were intelligible, art would not exist. Actors were banished by the Christian churches of the time for portraying a queer life. As the actor's reputation is on the rise, it is natural to raise questions about his portrayal. Where his character dies within hours of being born - it's natural to raise questions about the character. In fact an actor carries the thoughts of hundreds of years through his character. Actors create their characters through natural imitations of life. The actor is driven forward by discarding certain things. In fact, it is difficult to say how much the actor benefits from this. The actor portrays endless forms of reality through his performance. He loses himself in order to discover himself. Therefore, a fool who likes to think of a drama as imperishable can never be free. At least eternal vitality is more important than life itself. This statement is highly plausible, at least for drama.

If God exists, everything depends on God. Man cannot do anything against his will. If God does not exist, everything depends on man. Death is a form of liberation if it is in a godless state. So Dostoyevsky's theme of suicide supported by Camus is absurd. However, Camus does not support Dostoevsky's religion. But his absurd life is up for grabs. In the fourth chapter of the book, he says that Sisyphus pushing the stone is a symbol of human's endless failed attempts. Nothing is more terrifying than the fruitless and hopeless labour of Sisyphus. Sisyphus' fate is determined by the gods, but he chooses to try to win. He perseveres through the greatest obstacles. The reader's lesson from Sisyphus is obedience. Which defied the gods and pushed the rock forward. Its struggle at its peak is sufficient for the best education of human life. Through this, Camus talks about living a happy life like Sisyphus, not suicide. An attempt will be made to explore whether Camus's sense of the absurd has been applied in Waliullah's Ujana death drama.

Camur's Theory and *Ujane Mrityu*

The play *Uzane Mrityu* does not specifically tell a story. Basically, the dramatist has tried to highlight the basic truth of the boatman's life in the play. In the play, his existence is endangered and he gradually becomes

aware of his existence. He is not responsible for the small events that happen in his life, but he has to bear the full responsibility of maintaining his existence. He has to find the way out and solve all the problems. But the dilemma emerges only when he does not acknowledge his existence with the responsibility of protecting so much.

নৌকাবাহক ।।বললাম না বিশ্রাম করব। তবে বেশিক্ষণ নয়। [7]

Logical continuity conflicts with the boatman's deep emotional excesses. The fragmentary recollections of his life that are articulated in the play are beyond logical continuity. The freedom of the boatman to pull the boat is accepted by him as truth. The man in white obviously realized, he was not willingly pulling the boat. He therefore did not blame the boatman for this act. The freedom of will to pull the boat and the moral responsibility are all of the boatman. Basically, the white and black robed person is born based on the boatman's optional actions of judging good-bad, right-wrong. The existence and individuality of these two is based on the individuality of the boatman. The boatman can realize his nature within himself. That is his knowledge. As he became aware of his own authority, this white and black entity arose from within him. He is self-aware. So at the beginning of the play he sees the swan.

নৌকাবাহক।।বালিহাঁস! ঠিক দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু বালিহাঁসই হবে।সূর্যের দিকেই উড়ে যাচ্ছে ; একমুঠো সোনালী বালু যেন। [8]

Being self-aware, he can foresee what will happen next in his life. He sets his goals in life and consciously plays an active role in choosing the means to reach them. That's why he tries to control his actions, which no object or animal has. He tugged at the ropes of the boat to raise the gasping noise at his own convenience, oblivious to his surroundings. He transcends his own being to all other things beyond what he calls his subjective consciousness. At the same time he becomes aware of his own existence, then he tries to establish himself as a special existential master as an ordinary boatman. But in doing so, he sees that other people and the ground of his own existence are inextricably bound up with this world. The boatman, the white-clothed, the black-clothed-everyone is a 'worldly being' despite being different. 9 Everyone tries to establish himself as a master through various problems in a self-determined way according to his personal thoughts. And so once the one in white asks to listen to him, while the one in black expresses his own opinion. Above all, the boatman pulls the rope of the boat and continues. Because the play is with the boatman in white and black as the authority, his existence is very real and tangible. That he is connected with two entities cannot be proved by any

logic or epistemological theory. Again, just because the boatman has a body does not mean that he exists. Basically, the ability to understand something is an essential part of knowledge. The dramatist has been hinting that the boatman has this power from the beginning of the play. The fragmentary imagination of the boatman is also based on reality, not abstract knowledge. It should be noted that "Existentialists recognize the necessity of the power of imagination in the formation of real life"10 But it is true that no possibility can be projected without the aid of knowledge. In daily life, people imagine based on need, which has no relation to actual need. The boatman learned about life by connecting with others. As time passes, the boatman discovers that there is no order or logic to his existence. His existence has nothing to do with his children, his wife or the incident of the bamboo man. He started to think of himself as aimless, meaningless, shapeless. Like Sartre's Roquentin, he feels 'ambivalence'11. Boatman said:

না কোথাও- না- কোথাও যেতেই হয়।এমন এক সময় আসে যখন না গিয়ে আর উপায় থাকে না ।[12]

The boatman's sense of life and the world is basically *Nausea* or Vibamisha. Pulling the rope of the boat, the boatman realizes that he has to go somewhere, but he does not know where the destination is. There is no actual indication or description in the play of what he will get to the destination. The boatman's indication of the other side of the river bears no relation to reality. Because he has two companions. Nothing is visible.

কালো পোশাক পরিহিত ব্যাক্তি॥ আপনার চোখের কোন দোষ নেই। কথা হচ্ছে, দেখবার কিছুই নেই। [11]

Absurd, on the other hand, is a kind of separation. Since there is no human neutral absurdity, its end is drawn through death. Absurdity preserves those things which destroy the human mind, those which are more necessary are to be valued separately. In which there is no hope, there is constant rejection involved, where there is a hint of dissatisfaction, the absurd is to be found. But the absurd has nothing to do with subversiveness and ingenuity. Obviously, the boatman in the *Uzanne Mritye* drama was morally upright. And in his existing situation he is a victim of truth. He could not accept the facts. That is, the death of his sons, the loss of his wife, etc. worried him, he could not accept their death. He literally could not pay the price of truth with truth. He was not trapped in hopelessness or denial. He knew there was no future in hopelessness. He did not want to come out of God's world. He didn't want

to run away. As he passed through the ruins on his way, strange logic failed to hold him. Aware of the barrenness of his own life in the hope of some new existence on the opposite bank of the river to which he wished to go, he sought to find a satisfactory solution to the problem. His assumption was not fleeting, at least he apparently got a hint of the opposite arrow by the end of the play. So his journey cannot be dismissed in vain. The mystic thought of the boatman is as logical as the other five thoughts of the mind. Basically the non-embrace of the mind and the world creates a kind of tension, it happened to the boatman. But he still found the direction of the new path, which Vladimir and Estragon did not. Actually the boatman was searching for truth while searching for truth. His mind was able to push past despair without succumbing to lies. Although death had restrained him, he was mentally active even though physically restrained in an apparent sense. So his physical or mental hope did not die. Therefore, *Uzanne Mrityu* supports the existentialist though not the absurd theory of Camus' myth of Sisyphus.

Conclusion

On April 20, 1993, in an article titled 'এই শতকের নাটক' in the weekly newspaper, Sayeed Ahmad (January 1, 1931-January 21, 2010) said about Waliullah, 'Inspired by modern art consciousness, he started writing this kind of experimental drama in a completely new way'. Waliullah's *Uzanne Mrityu* in the drama's active speech, complexity of thoughts, incoherence of the sense of life makes the audience descend to another longitude. Basically, Waliullah Bailar worked with metaphors in the play of different forms, which is evident in the plot analysis of the play *Uzanne Mrityu*. How rich the European consciousness can be in a drama based on native material is evident from the reading of the play *Uzanne Mrityu*. The current world is dominated by hopelessness, gloom, and uncertainty, as it was in the past and will continue to be in the future. The theme of the play is still contemporary today. If we are alone in the great void, there is a glimmer of hope in the future. Even in the midst of hopelessness, Bengalis find a way to hopelessness - which Syed Waliullah has been able to prove in the play Death in the Uzan.

References

1. Micle Dufrenne. Existentialism and Existentialisms.Philosophy and Phenomenological Research 26. no 1 (1995); p. 52. http://doi.org/10.2307/2105468

2. নুরনবী। অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ: প্রাসঙ্গিক ভাবনা। (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোম্পানি, ডিসেম্বর,২০০৬), পৃ. ১৪ ।
3. ibid.p.15
4. Tarun Mittal. *To be is to be: Jea-Paul Sartre on existentialism and freedom*. NEWSLETTER, Published June 21, 2017, last modified September 5, 2019, https://lep.utm.edu Access on 17 June, 2022.
5. The Myth of Sisyphus. Albert Camus, Translation: Uday Shankar Varma. (Calcutta: And Mushayera, April 2018), p. 18.
6. ibid, p. 18
7. নাটক সমগ্র। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। (ঢাকা : প্রতীক,জানুয়ারি, ২০১২), পৃ. ৪০।
8. ibid p. 39
9. Tadic, p. 47.
10. ibid, p. 48.
11. সক্রেটিস থেকে সার্ত্রে দর্শন অন্বেষা, টি জেড লেভিন, অনু. শাফি বাশার খান। (ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী , ২০১৭),পৃ. ৩৯৯
12. Tadic, p. 41.
13. Tadic, p. 50
14. www.theatrewala.net.Access on May 11, 2022. At 9.a.m.

Health Practices In Jungle Mahal: Nayagram area

Uttam Das
Asst. Professor, Department of History,
Kharagpur College

Abstract: Health is wealth, health is a major issue in human life. One should maintain good habits and practices in order to have healthy life. But not always in the case of the people of jungle mahal. The health practices in jungle mahal are extremely venerable earlier, the health facilities in this area are very poor, and however more recently major improvements took place. For More than two years from 2013 to 2015, important data regarding the health of jungle mahal were collected by me. Side by side they were advised to take the facilities available in the recently developed health centres and various arrangements done by the local school of the area. This paper actually focuses on the health practices of the people of jungle mahal 30 to 40 years from now and also how they prevent and cure diseases without any medical supervision and facilities .it is interesting to know the secret healing powers of the plants, roots, twigs, flower, fruits etcetera which are naturally available in vicinity. Not only that, this survey with also beneficiary to know the changes brought in their life, With the coming of the recent health centre's facilities in the area and how they accept it in their daily life.

Key Words: Jungle Mahal, Health, Nayagram, Village, School, People, Facilities, Awareness.

Introduction:

Jungle Mahal area is situated in the south western part of present day West Bengal. Previously it was under Midnapore district, but in 2017 it was separated from West Midnapure and called 'Jhargrame'. In Jhargrame there is the place named Nayagrame. It is very curious to know about the health situation and treatment facilities of the common people of this area. From this urge, the different parts of this area are visited to understand their present as well as past situation related to their day to day life and health, and how much they had been conscious in

present time about their health and how much changes has been brought in their life with the coming of health centers and facilities.

Methodology:

With the help of historical survey this work has been done successfully an attempt to talk with different persons from different areas, schools, grampanchayat etc, and to connect with their everyday lifestyle to collect essential data. This survey has been organized on two to three hundred people through random sampling method.

Discussion:

Health awareness among the primary schools of Jungle Mahal:

Thuria Prathamik Vidyalaya is a primary school under Nayagram police station . Total number of students in the school is 80 to 90, distributed unequally in the class from 1 to 4. We had talk with the head master of the school regarding the health and hygiene of the students. A survey had been made to suggest that the health of the majority of the students is not up to the mark. Most of them skinny – not all, plump or chubby. But that does not necessarily suggest they are weak. They get proper food at the school, apart from what they eat at home. They have habits of washing hands with anti-bacterial soap before taking their food. The teachers of the school have helped a lot to spread the awareness of cleanliness among the children. Many of the students now practice this habit at home, too. The school has water filter for the purpose of water –purification. Purified filtered water is used by the students for drinking. With the view of making the children more eager towards sports and also maintain their good health, The school arranges several medical camps around the year. Blood testing is done on the students at regular intervals. To prevent anemia in the students, iron tablets are distributed on the Thursday of the last week of every month. Moreover archery classes have been arranged to increase the stamina of the students and also to keep them in good health.

Health awareness among the high schools of Jungle Mahal:

One of the high schools of Jungle Mahal is Barkhagri Janakalyan High school. Apart from imparting proper education, the school is also conscious about the health of its students. To maintain good health of the student, the school arranges various physical activities like P.T. sports,

yoga, football, cricket Hadudu, etc. Moreover football match for women is also organized. Archery competition is held. These archery competitions have recently gained much popularity in this area. Girls and boys of Jungle Mahal of this area participate in State and National level competitions.

Archery for good health:

The children of Jungle Mahal are taught archery in order to maintain their health – to make them strong – to increase their stamina and to maintain them to more hard working. This needs an elaborate warm up regimen. The children need to take 15 rounds of the football ground. Moreover they need to do high jumps, long jumps, running, stretching, free hand exercises and even Padmasan for 5 minutes. The most important thing for archery is the strong muscles of hands. To strengthen the hand muscles, thick rubber tires or tubes are used for compression – relaxation cycles. After this long warm-up session, the trainer gives lessons of archery. This requires a bow, few arrows and a target board. The arrows are of an arm length and the bow usually 6 feet long. It has an arm guard as well. After Placing the arrow the bow, a target board is placed at a distance of 50 to 100 meters from the archer. The board consists of several concentric circles drawn on it and at the very center remains a single point.

The Archer aims at this point both boys and girls are given this training. The children who go to school get proper training from trainers. However, those who don't go to school, lack proper training in archery. They train themselves most of the times or at least, they try their best. In the school the physical education teacher is generally appointed as the trainer in archery. There is no archery academy in the region. This sport really helps to increase the concentration and stamina, and maintains good health of the children as well.

Daily life:

Majority of the people of Jungle Mahal use the water of wells. People living near the river use hand-pumps for drinking purpose. They use the river water for bathing, washing and cleaning their domestic animals. The people of this region do not generally use latrines. Latrines are used only when relatives and guests arrive. They usually use the river or jungle for the purpose of passing stool. However, the major reason for that is most

of the houses doesn't have latrines to begin with. A survey says that in the Nayagram area, in every 100 house, only 2-5 have the facility of latrines. If not the problem with latrines, there is always problem with water. Moreover it is needed to be said that in the Jungle Mahal area, many educated family use the open field for latrine. This definitely leads to high chances of spreading diseases and pathogens. This fear is aggravated by the fact that the people of Jungle Mahal do not generally use sandals or slippers.

The people of Jungle Mahal suffer from inadequate food supply. Deep inside the forest, due to the rocky nature of the soil, it is impossible to grow crop all the year round. Due to the lack of proper nutrition, the average health of the people is not so well. Most of them are under weight. They appear lean. Moreover the sense of cleanliness and hygiene among the people is also very poor. They tend to use dirty clothes. There are several families in this area who can hardly manage three meals a day. As a result their health tends to deteriorate. Aged people suffer the most. However, due to the improved agriculture in the fertile soil of the river basin, people living around that area get proper food supply. They are hard working and healthy.

Treatment of fractured bones:

Jhareshwar Maity is an old man living in the Thuria village of Nayagram area. When Mr. Maity was around 12 or 13 years old, he fell down from a broken branch of tree. That's how he got fractured in his hand. It spends 70 or 75 years since that incident. At that time, there were no health centres in the area. So, people had to depend on ayurvedic treatment. To treat Mr. Maity , Someone was sent to the nearby forest to bring a very special type of leaves from a plant called " Haar Vanga". A paste made of these leaves was applied on the broken area. After that, thin slice of bamboo were tied around the broken area. It was kept like that for around 20 to 22 days. As long as he had this cast on, he had to move around very carefully. He had to make sure that the fractured hand was not moved even a slightest bit. After the allotted time was over, the cast was slowly removed. It is to be mentioned here that there are times when this treatment yields beneficial results. But sometimes it fails to do so. Like

the man I previously talked to was completely healed by this treatment. But, Mr. Jhareshwar Maity , still has a deformed hand.

Treatment for dog bites:

As there are no health centre's around the area, the people of jungle Mahal depend on the ayurvedic practitioner for their treatment. A man with a dog bite is immediately taken to the ayurvedic physician. He utters a spell for the injured man. Then he is advised to take a rest for 3 days. After the resting period of 3 to 5 days gets over, a plate is placed on the back of the patient. If the plate stays there, it is assumed that the person is still infected. Then, the real treatment starts. The patient is asked to take black pepper paste for 7 days, again a plate is placed on his back. If it still remains in its place, it is considered that the man is still poisoned. He is again given the previous medicine. The treatment is mostly beneficial. This method of treatment is used for both men and animal. As the health center is far, far away, primary treatment is usually done by the village physician.

Treatment for snake bites:

When someone gets bitten by a snake, the treatment starts with uttering few scarred hymn. This is a superstition. After this, the patient is made to drink the water enchanted with the scared mantas .The patient is pinched and if he doesn't feel the pain, it is assumed that the poison is still inside him.

He is tied firmly, After that, a waste made of the root and leaves of iswar plant (local name) is applied on the bite-spot . The patient is asked to take the juice of the leaves of the same plant. This line of treatment continues up to 2 to 4 hours. This method is known as khalghasa treatment (local name).

Moreover, the roots of iswar plants fed and applied to the patient. If this tastes sweet, then it suggests that the person is still poisoned. And if it tastes bitter, it better, it means the person has been cleaned of the poison . This line of treatment takes 10 to 15 minutes. If the ayurvedic physician fails to cure the patient, he usually refers him to take to some other places. But every time a man gets bitten by a snake, people of this

region stick to this method of treatment. This way of treatment is quite popular even now. But, in most of the cases, they fail to cure the patient.

Jaundice:

To treat this disease, the leaves of 'arhar plant' are pounded and 125 gms. of juice is extracted. This juice is mixed with cane –juice or molasses and it is taken in empty stomach. Sometimes, the forehead of the patient is cut open and the medicine is applied these for faster effect.

Others:

Diseases like pneumonia, typhoid, choleras, and small pox are quite common in the jungle Mahal area. However, there has been no report of choleras since 1949. Diarrhea and vomiting are the primary symptoms of cholera. It is treated by taking the roots of 'chita plant'.

Conclusion:

Now a days, the people of jungle mahal can avail various medical and health facilities to keep themselves fit and fine. They keep regular contact with the local health center. Here a brief account of the Nayagram Block health center has been given. They also have a small committee here, known as the parivaar samiti . Near around 700- 800 people come to this health center everyday to avail the treatment. This health center has 28 sub centers under it, namely- Upar-patin, Pukhuria , , Barakhari, Bardanga, Kalmapu-khuria, Chhatojharia, Morchi, Borisole, Kharikamathni, Ghoratonia, Morapada, Nayagram, Jorka, Jamirupal, Banspat, Jugisole, Asurhata, Baligeria, Negiria, Andharisol, Arrah, Nagripada, and Tulsibone etc. These sub center get around 22-25 patients daily 2 A.N.M. sisters are employed at each of these sub centers. Furthermore, there are 3 primary centers in the region. Regular numbers of patients vary from 250 to 500 in these primary health centers. These health centers are located at Chandavila , Jamripal and Baligeria. Moreover, R.S.B.Y. facility is also available in the area. Here the tribal people get special facilities of free treatment. This particular benefit is available for the maximum 5 members of a family. Online access to various medical facilities is also available. These health centers have special facilities of SNSU and PARAS for children suffering from malnutrition. These departments look after the proper nutrition of the mother and the child. To increase awareness regarding health and hygiene

on every health center arranges a meeting each month in presence of the panchayat Pradhan, member of panchayat samiti and the sisters. Various topics are discussed in these meetings such as rehabilitation of alcohol-addicts, pulse polio, malnutrition, malaria, dengue, AIDS and many more. Local people also take part in these meetings. The health centers take initiative to make the people aware of various health problems through the Local 'Jhumur songs'.

As a cumulative result of all these efforts, the average health of the people of Jungle Mahal have improved a lot, they are not much conscious of their health. They avail all the health facilities available in the area.

References:

Sanjoy Mukherjee : Jungle Mahal : Continuity and Change, Pragatshil Prokashak, Kolkata, 2013.

Amal Kumar Mondal: Tribal Jungle Mahal Tribal Resistence, Desh Prakashan, 2011.

W. W. Hunter: The Annals of Rural Bengal, Smith elder, and co, London, 1868.

---------Imperial Gazetteer of India, Vol. 2, Trubner & co, London, 1881.

L. S. S. O'Malley & Lewis Sydney Steward: Bengal District Gazetteers, Midnapore, The Bengal Secretariat Book Depot, 1911.

H. H. Risley: The Tribes and Caste of Bengal, Bengal Secretariat Press, 1892.

B. Ray: District Census Handbook, Midnapore(1961), Vol. 1, The Superintendent, Govt. Printing, Calcutta, 1966.

H.V.Bayley:Memoranda of Midnapore, MedinipurItihasRachanaSamity, 1988.

R. A. Gopalaswami: Census of India, vol-1, Surendra Printers Private LTD, Delhi, 1957.

W. K. Firminger (ed.): Bengal District Records 1763-1767, Midnapore, the Bengal Secretariat, Calcutta, 1911.

J. C. price: Notes on the History of Midnapore, Paperback, 1876.

A. Mitra: District Handbook, Midnapore, 1951.

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসুঃ মেদিনিপুরের ইতিহাস, সেনব্রাদারস এন্ড কোং, ১৪১৬।

বঙ্কিমচন্দ্র মাইতিঃ মেদিনিপুরের স্থান নাম এবং, ভোলানাথ প্রকাশনি, ১৪০৯

Ndeem Hasnain-Tribal India, Delhi, Palkca Prakasham, 2006.

Symbols and Images in *Sons and Lovers*

Arnab Mukherjee
Assistant Professor , Department of English
Panchthupi Haripada Gouribala College

Abstract : This article is trying to capture all important images and symbols used by D.H. Lawrence in one of his most influential works *Sons and Lovers* (1913). The symbols which are bearers of two folds of meaning are here employed by Lawrence as the vehicles of emotions and impulses of the characters in different situations. By analyzing all the symbols and unraveling their significance, this paper helps to achieve a better understanding of the psyche of different characters in different situations. The prime symbols used by Lawrence are sun, moon, flowers, weather and nature. Most of these symbols have a psychological bent providing enough scope to venture into the mind of the characters and their relations with each other.
Key words: image, symbol, colour, flower, Paul, Miriam, Clara.

Lawrence is less a novelist of incident than of intense personal relationship and the psychological exploration and subtle means he uses to achieve this is an appropriate use of images and symbols while Conrad’s chosen symbols are the colours white and black in his novels and Virginia Woolf's the light and shade, Lawrence uses a host of symbols and images though his anti industrial bias is evident in his privileging use of natural images over manmade ones. As David Daiches observes "even the use of physical description of house, rooms, fields, farms, landscape, physical object of all kinds is different from the use of description as background and setting in conventional novels of the time; things have an intensity which makes them vehicles for emotional comment or symbolic counterparts to characters and actions"(Daiches, 74). The flowers in particular are so often used as background as to almost make the novel appear a horticulture one and they invariably take on symbolic significance.

The novel is replete with images and symbols. First of all the coal mines where Walter Morel and other coal miners work are essential to the story of the novel to provide the book with a realistic and authentic setting. But coal mines have other significances as well. A miner's descending into the mine and ascending to the ground above may symbolise the sexual rhythm or the rhythm of sleep and waking. This rhythm may again be that of dying and living. Again it represents the rugged coarse natural life against the artificial life of sophisticated people.

Different colours not only produce different visional effect but also convey deep meanings. Lawrence gives various colours deep symbolic implications so as to shape the characterization. The colour of "red" and "black" are mentioned many times in this novel. Red symbolizes fervency, enthusiasm and energy. On the other hand, black symbolizes mystery, sorrow and even death. But black can also stand for health. When Mrs. Morel first met her husband, Lawrence showed the readers the appearance like this: "black hair", "black beard", "ruddy cheeks", and "red mouth". The two kinds of colour imply the features of this character. Mr. Morel was strong, healthy, energetic and simple. Although his work was very dangerous, he still felt happy and was not worried about it. But black also stands for death, so it symbolizes the fate of Walter Morel. He was excluded from the family. His wife and his children did not love him and even despised him. He was nothing in his family.

The egg cups that William wins at the fair and then gives to his mother are clearly a symbol of William's love and affection for his mother, and they show the very close bond that lies between these two characters. In the same way, when her husband returns from the bar late on that day, the gingerbread he has brought for the children is a symbol of his love for his family, although he struggles to express it through his actions and words so often.

Mrs. Morel is enamoured of flowers and they symbolise the flowering of her spirit amidst the dark and dismal colliery background of Bestwood. The flower most often associated with her is the white Lily. When driven out of home by her husband she goes to see flowers in her front garden at moonlight and instinctively buries her face in them so that

they are golden pollen covers are face. Intoxicated by flowers see loses consciousness of time and space so that in spite of being traditionally associated with death here they become symbols of temporal and spatial deliverance. She is glad that they were there for when back in her room she finds them still on her face. This interaction with lilies is later amplified when in the midst of her unbearable illness she can see the sunflowers symbolising her life. They too wither with seasons as she does. She loves the sun too and in fact the sunflower is an amalgam of sun and flower which implies that if the lilies indicate and escape from sordid life, the decay of sunflower symbolises her departure from moribund existence through death.

When she had an altercation with Mr. Morel about the visit of the minister Heaton, she contemplated the new baby Paul amidst fine sky and foliage, the haystacks and the corn which she fancies as bowing to her son and the natural beauty all round gives her hope. The baby looks at her and she feels as if "the naval string that had connected its frail little body with hers had not been broken"(Lawrence, 24). When the red sun cuts the horizon's rim she lifts the child to the vision and names him Paul. What is however significant is that although see initially thrusts the infant forward to the crimson sun she goes back on her impulse and keeps him back again whence he had come. This act of hers clearly points out that the baby is being denied his right to an independent connection with life giving power. He now almost becomes reserved for her.

Again when Mrs. Morel was interacting with the lilies Paul was in her womb. Thus her interaction symbolises Paul's artistic love of flowers which will be expressed later on in the novel.

Another important incident of fierce quarrel between Mr. and Mrs. Morel which finally leading to the bleeding of Mrs. Morel being hurt with a drawer at forehead first symbolises the disintegrating relationship between them. Secondly the blood that falls from Mrs. Morel's wound into baby Paul's head and ultimately soaked there suggests the blood tie between the mother and the son that is going to be a matter of vital importance in the novel.

Another trivial event that is young Paul's burning of his sister's doll - Arrabella has a grit symbolic significance. It reveals the sadistic attitude

of Paul and also foreshadows his mother's death brought about by an extra dose of morphine given to her by Paul himself. Paul's sadism also reveals itself in his attitude to Miriam. He sometimes feels hatred towards her and often takes pleasure behaving cruelly with her (he often scolds her while giving her algebraic or French lessons). Another incident very clearly shows Paul's sadistic attitude to Miriam when Paul decides to break his relationship with Miriam he comes to tell it to his mother with a pink flower in his hand. He says to his mother, "I want to break off with Miriam, mother "(Lawrence, 244) and splashes the petals of the flower with the teeth and then spits them. Now this imagery clearly renders Paul's exploitation of Miriam. As if she is an object which can first be eaten by him and then spat out.

The shifting of Morel family is another symbol with hints a passage from light to darkness. Again the ash tree in the new house symbolically indicates the proper mood and situation of the family. First it was almost monstrous to Paul and Anne hates it because the wind through its leaves makes an ominous moaning sound which was almost related to the frequent quarrel between the father and mother and thereby hinting to the family discord. But afterwards when Paul gates his job and happily adjusts to it the tree becomes a symbol of stability and security.

Still we have yet a handful of images and symbols based on natural objects mainly floral imagery and symbols which specially reflect the ups and downs, the attractions and repulsions in the relationship of Miriam Paul and Clara. There is a hen in the Willey farm which takes grain from the palm of the boys of Leivers family. Paul also shares this fun but Miriam was afraid that it might hurt her. Again she takes Paul to a swing in their farm which Paul rides with grit pleasure. But Miriam herself is afraid to ride it for its continuous upward and downward movements. When she gathered courage to ride it she was so afraid that she only moves to a shorter highs. Both these incidents suggest her sexual inhibition. The swing also represents the unstable nature of love relation between Paul and Miriam. They have constant love – hate situation between them like the constant ups and downs of the swing. Miriam's not achieving the height of Paul in the swing also suggests to the gap in their relation, especially Miriam's sexual incompatibility with Paul. Again the

white roses in a bush which she very elatedly shows to Paul are symbol of Paul's estimate of her character. He thinks she has "a cool scent", "a white virgin scent" which sometimes makes him uneasy to her. Her possessiveness is also very clearly suggested by her excessive fondness for her youngest brother and the daffodils. Paul's passion for Miriam is suggested through the red cherries of the Willey farm and the orange moon which arouses Paul's desires for Miriam. Ultimately the four dead birds found in a bush forecast the failure of their relationship. As the burned potatoes symbolize Miriam’s total absorption in Paul, on the other hand the charred bread symbolizes Paul’s total absorption in Miriam. At last Paul's presentation of a bunch of cut flowers to Miriam indicates their final separation.

Clara whose name suggests the clarity of her character has an attraction for 'big red stallion' which shows her spontaneous vitality. Clara gave Paul a new experience which he never had before. Clara lived with her mother in Bluebell Hill. Bluebell is a kind of flower, which is also called bell of fairy. Wherever they went, they would see bluebell. Clara was such a charming woman that Lawrence used the image of bluebell. Clara was not so restrained as Miriam. She was passionate and beautiful. Lawrence used the red flowers to symbolize her, which was the symbol of her fire-like passion. When Paul and Clara first met, “Nasturtiums were coming out crimson under the cool green shadow of their leaves. The girl stood, dark-haired, glad to see him.”(Lawrence,271) The crimson nasturtiums indicate the passion of Clara. Paul was completely attracted by her so that his long – time restrained desire broke out. So he even couldn’t control his action. The flow of the stream beside which Paul and Clara often meet symbolises Paul's attraction to Clara.

The cycles of day and night and of the seasons, and the winter, especially the reference of rain and snow, are all related, again in a symbolic texture. The rain comes after love with Miriam, before love with Clara and during the burial of Mrs. Morel. Snow covers the ground where Paul lies wounded after his encounter with Baxter Dawes, to serve as a contrast to the females’ association with rain.

Heavenly bodies, another part of nature also have symbolic significance. Paul loves the constellation of Orion and it is Miriam's

favourite too. But when it is hidden by the clouds it appears a symbol not only of a trouble in their relation but also of a trouble of Paul's heroism. Darkness prevails for a long time but he invariably finds out a source of light. At the end of the novel when his world is covered with the darkness of his mother's death, he again finds a motive for life. Instead of surrendering to death he turns quickly back to the gold phosphorescence of life to fight for future.

Works Cited

Bloom, Harold. *Novelists and Novels*. New York: The Readers' Subscription, 2005.

Bonds, Diane S. "Narrative Evasion in Sons and Lovers: A Metaphysical Unsettling." *Sons and Lovers*. Ed & Intro. Rick Rylance, New York: St. Martin's, 1996.

Daiches, David. *D.H.Lawrence*. United Kingdom, Privately printed, 1963.

Ghent, Dorothy Van. *The English Novel: Form and Function*. New York: Penguin, 1953.

Kermode, Frank. "The Writing of Sons and Lovers." *Sons and Lovers*. Ed & Intro Rick Rylance. New York: St. Martin's, 1996.

Lawrence, D. H.. *Sons and Lovers*. New York: Dover, 2002.

Violence and trauma in Toni Morrison's Beloved and Home

Madhulina Bauri
Assistant Professor, Department of English,
Surendranath College
Amzed Hossain
Professor, Department of English
Aliah University

Abstract: Toni Morrison's novels describe the lasting effects of slavery on African American culture with urgency and innovative revisions of traditional literary forms and devices. Her work has also addressed the way African American individual and collective identities are formed under the pressure of white mainstream culture and master narratives that have mostly silenced, ignored or misrepresented African Americans' past. My aim in this paper is to study the effect of slavery and violence on the mind of the main characters of these novels.
Key Words: Slavery, Trauma, Violence, Memory and Identity.

Violence in Toni Morrison's works serves a dual function: on the one hand it can lead to knowledge of self in a historical context, and on the other hand to self-annihilation. While those who escape violation and trespass celebrate integrity and dignity, those who commit violent acts, whether intentionally or not, often have internalized the lessons of racist hatred too well and have appropriated white ideals of beauty, community, worth, and love. Toni Morrison's *Beloved* is comprised of a number of themes, some of which include community, loss, entrapment and slavery as well as violence. I will place particular focus on the characters of Sethe and Beloved, exploring how their lives as well as their enigmatic and rather complex relationship often results in violent speech or acts of physical violence. Not forgetting the violent experiences of their oppressors, and what impact this had on their own actions, particularly those of Sethe.

Morrison presents the character of Sethe to us, in such a way that from the onset she can be perceived as an assertive and strong woman. I found this to stand out in the beginning of the book, when she first encountered Paul D after 18 long years. It was quite interesting how assertive and in control she seemed, in a situation that would typically evoke some sort of emotion in another person.

"Come on in."
"Porch is fine, Sethe. Cool out here." ….
Eighteen years," she said softly.
..."
"Well, long enough to see Baby Suggs, anyway. Where is she?"
"Dead." (Morrison, 1997)

To a certain extent this can be viewed as a presentation of her strength that she gathered over years fighting all odds singlehandedly and that is reflected when she tells Paul D that her mother-in-law is "dead."

Most of the novel is set around Sethe's life and how it continues to unfold years after her escape from slavery in Sweet Home and the death of her "crawling already? daughter" who we are re-introduced to as Beloved. Sethe's escape from Sweet Home (ironical)had her endure a vigorous journey, which was made even more gruelling by her pregnancy with Denver. From the swollen feet to meeting Amy, and crawling for miles, and eventually enduring labour in an already badly beaten up body, it goes without saying what levels of strength Sethe has, and what she would do for her children. While narrating the fate of Sethe and her family after she escapes, Morrison also gives us the life of the slaves in flashbacks, which help to explain the trauma of the women and the men who were slaves. As Paul D tells Sethe, "You said they stole your milk. It was that messed him up. That was it, I guess. All I knew was that something broke him. Not one of them years of Saturdays, Sundays, nighttime extra never touched him. But whatever he saw go on in that barn broke him like a twig" (Morrison, 1988, p.68). The distinction between the physical violence perpetrated upon a slave and the taking of Sethe's milk is crucial. As Paul D points out, it is the taking of the milk, rather than the brutal beating which breaks Halle. Intimately associated with the sexual assault is the idea of Sethe as animal, whose milk can be

taken at will. This act is, therefore, set apart form the more familiar physical or sexual violence of whipping and rape, both of which are forms of subjugation which recognize the humanity of the slave in the very attempt to suppress the rebellion. The taking of milk, however, is a qualitatively different form of othering whereby the polarization is not one of master-slave but the far more radical one of human – animal. In whipping her, Schoolmaster has merely asserted his authority over Sethe: in allowing his boys to take her milk, he has authored/ authorized her status as animal, and his own as human.

Paul D and Halle is also reduced to the status of an animal in so far as their inability to express what they feel. When Sethe asks Paul D why he did not speak with Halle and try to bring him along, Paul D reveals the degree to which his sanity and soul are implicated in Halle's. He does not speak with Halle because he is as incapable of speech as Halle is, although for a different reason. His announcement –"I had a bit in my mouth" is as terrifying in its dehumanized ferocity as his account of Halle. Like Halle, therefore, he is unable to speak, indicating a reduction to the animal state. But unlike Halle, his inability to speak is not a function of an entirely internalized animality; it is forced upon him by the bit in his mouth which both confers as well as signifies his status as animal.

I would like to believe that having served her whole life as a slave, the power that Sethe possess as a woman is strongly felt. This is not to say however, that violence does not play an important role in further reiterating the strength that we speak of. Although acknowledgement has been given to the struggles of Sethe's life before her acquired "freedom," it is obvious that at the very climax of her story, is the murder of her daughter, and it is from this particular incident that we can start to delve into the role of violence in shaping Sethe into the woman who lives in 124 Bluestone Road.

Some of the smaller acts of violence in which Sethe is the perpetrator stem from the death of Beloved, on that day after the entire community ate a little too much, and there was disapproval in the air. One of these incidents takes place right after the murder, where Baby Suggs and Sethe struggle over the now dead body of Sethe's child. I found it

quite capturing how from then on, Sethe seemed to have a newly acquired dominance not only in the household, but in her relationship with Baby Suggs, so much so that it was her mother-in-law who slipped into a dark place, and Sethe became the head of their household. In the scene into question, she carries on to feed her child from a bloodied nipple, and the entire scene demonstrates some sort of aggression that switches on and off in Sethe from time to time. This goes on to show itself in her relationships with other people, like the one between her and Paul D.

Sethe and Denver live in the haunted two story house on 124 Bluestone Road until Paul D comes, and shakes the spirit out of the house with a lot of rage and passion. I found it particularly fascinating how this was not perceived as shocking, or at the very least startling to both Denver and Sethe who look on and react not to the act itself but to Paul D's words afterwards. Although Paul D's exorcism held the purpose of bringing back peace and order in the house, for a moment it almost seems as though the presence of this rather violent spirit is missed, especially by Denver. This goes to show how desensitised from the negativity of violence both Sethe and her daughter Denver are.

The theme of violence is omnipresent all the way through *Beloved,* although in some cases it may be a little less overt than in others. When addressing the notion of whether violence, both the physical and the verbal form of it somehow ensues dominance in the characters in question, it can be brought to the forefront, how Sethe manages somehow to demand a deep level of respect in Paul D simply through the way she addresses him; in an assertive and sometimes rather violent manner. For example;

Over Denver's shoulder Sethe shot Paul D a look of snow. "What you care?"

"They won't let you leave?"

"No."

"Sethe."

"No moving. No leaving. It's all right the way it is." (Morrison, 1997)

In Sethe's case, it should be brought into consideration that perhaps violence is a learnt action and reaction to years of slavery, and being the victim to violent acts much more horrendous than those of her own. The

tree that Sethe has on her back from severe whipping, may have been one of the most traumatic experiences she had. With the use of very basic psychology, a rudimentary type of psycho analysis can be done on Sethe to reveal that perhaps her killing Beloved, fighting Baby Suggs to hold her dead body, or shouting at Paul D from time to time may have all been the result of a life-long encounter with some form of violence or the other. Some critics propose that violence does not only exist in the physical and verbal manner, but that "Broadly speaking, there are many forms of violence, but most prominent and widely accepted are: physical, sexual, verbal and psychological." (Treatment of Violence: A Study of Morrison's the Bluest Eye and Beloved, 2013).if this is the case then we can touch a little bit on how Sethe's discovery of Beloved's true identity, leads her to neglect her other child Denver, subjecting her to a level of psychological violence perhaps in her neglect or sometimes passive behaviour towards her.

Beloved further develops the idea that violence ensues when the past is denied or disallowed. In this novel, Morrison considers the legacy of slavery and its inheritance for both Blacks and whites. Again, oral tradition as well as fable and folklore work to counter violation and make a plea for integrity and dignity in a world that demeans Black culture. Set in Ohio in the antebellum period and the years that follow the Emancipation Proclamation, the novel traces the then-pregnant Sethe Suggs's escape from slavery. Sethe gives birth on the banks of the Ohio River before crossing to freedom, and it is Amy Denver, a young white woman who is herself an exile, who facilitates Sethe's passage and treats the whip marks that cover her back. White cruelty is countered here by the bonds between women and the difficult relationship between mother and child. When white bounty hunters come for Sethe and her children, Sethe kills her crying infant. This act, Morrison urges us to understand, is not so much one of unfelt infanticide as a rebuke against slavery. Sethe would rather her infant, Beloved*, be dead than sold into the hands of white slave masters who abuse Black women for sport and pleasure. Dream is invoked here to counter violence and give it context. Beloved returns to Sethe to make her confront her own past, and yet her preoccupation with doing so harms Sethe's relationship with her very real

daughter, Denver Suggs, who accuses her mother of loving the dead more than the living. What Sethe does not communicate well to Denver is that African American women must reconcile themselves to the violence of the past before they proceed with the business of living. Because slavery and its legacy infringe on current and past relationships, there is an insatiability for touch, intimacy, understanding, and closure that cannot be easily had. That is, fusion of African past with living presence is necessary in healing old and existing wounds. What is yearned for here, as is evidenced in Morrison's earlier works, is a sense of "rootedness" and identity that can occur only after historical los s has been reconciled with personal trespass and everyday struggle. In *Beloved,* the material reality of social and racial oppression argues for a relationship between kinfolk, living and dead, to heal past wounds and ensure family survival. The struggle between living and dead takes on murderous tones when the ghost of Beloved threatens to strangle Sethe, literally and figuratively. The stranglehold that the dead have over the living is further developed in Morrison's subsequent work *Jazz.*

In *Home,* Morrison writes about the physical and psychological consequences of the Korean War and the effect of racial violence on the identity construction of African American characters. The novel centers on a twenty-four-year-old African American war veteran by the name of Frank Money, who narrates most of the novel. He longs to leave his hometown of Lotus, Georgia so he joins the army with his childhood friends at the age of eighteen. Frank is deployed to Korea, where he has many traumatic experiences, including witnessing the deaths of his two best friends and his murdering a young local girl in order to stop himself from abusing her. Burdened by feelings of guilt resulting from outliving his friends and of shame at being aroused by and then killing a child, he does not return to Lotus after his army service. Instead, he lives in the state of Washington, struggling with PTSD and seeking release in alcohol and violence while suffering racial injustices and being treated as inferior despite his veteran status. His homeland, for which he risked his life, snubs him. The only hope and stability in his life come from his moving in with his girlfriend, Lily, but his odd trauma-induced habits weigh their relationship down. When Frank receives a postcard with the alarming

message that his sister Ycidra (Cee) is in trouble, he heads home, to Georgia, to help the person he loves most and who has been his only positive remembrance of home. Although set in the immediate aftermath of the Korean War, the novel incorporates retrospective glimpses of the 1930s and 1940s, together with haunting implications of the Middle Passage, which is why the novel is described “as a historical trauma narrative, [that] deals with the fragmented identities and collective hauntings of African Americans, which have to do with slavery and its legacy, but also with the Korean War”. In this novel Morrison also denounces the cruelty towards African Americans who were used as guinea pigs for medical research and points out the strong impact this decade had on race relations. Thus Morrison analyses the novel *Home*, set at the time Jim Crows laws were operative at both local and state levels that imposed discrimination and segregation on racial grounds in the southern US by exploring the impact of traumatic experiences during the Korean War. Specifically, the analysis focuses on how the memories of both the war and racial violence in the American South bear upon African American identity construction.

References:

Morrison, Toni (2012), Home, New York: Vintage

Roynon, Tessa (2013a), The Cambridge Introduction to Toni Morrison, Cambridge: Cambridge University Press.

Akhtar, Jaleel (2014), Dismemberment in the Fiction of Toni Morrison, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars.

Bouson, Brooks J. (2005), “’Speaking the Unspeakable’: Shame, Trauma and Morrison's Fiction”, Toni Morrison, Ed. Harold Bloom, Philadelphia: Chelsea House, 7-23.

Ksenija M. Kondali and Sandra V. Novkinić,Reassesing the Past: Memory and Identity in Toni Morrison’s *Home*, https://doi.org/”10.21618/fil2123487k

William L. Andrews and Nellie Y. McKay, Toni Morrison’s Beloved : A Casebook, Oxford, Oxford University Press, 1999.

Spread of Education in Poundra Society of Bengal (1911-2011)

Krishna Kumar Sarkar
Assistant Professor, Department of History
Raja Narendra Lal Khan Women's College (Autonomous)
Paschim Medinipur

Abstract: From the ancient times, the caste system is engaged with Indian social system. In colonial Bengal, there was no exception of this system. In Bengal scheduled caste is still important among the social structure. The Poundras are fourth largest scheduled castes of Bengal. They mainly live in the riverrine southern Bengal. In colonial records, the Poundras are recorded as low caste people. The Poundra people to get rid of this injustice started social justice movement among the society in the 1890s. In this social reform movement education was very important. In this article, the spread of education among the Poundras will be shown. This article will be based on the primary sources like census reports, various documents regarding education, magazines and different caste centric books written by the Poundra thinkers.
Keywords: Scheduled Caste, Poundra, Education, Bengal etc.

All human groups persisting on earth have traditional rituals. Each ethnic group survives by adopting specific and different survival patterns. The materials of civilization are to be found in the ideas of inheritance, food habit, pleasure and reformation. All ancient ethnic groups had their own languages, religious beliefs and other traditions. The overall life practices of the apparently neglected dalit, tribal human groups are considered as an essential part of the ancient civilization of any country. The Poundra people of Bengal were one such ethnic group.[1]

The Social condition of the Poundra community is found in Risley's description. He described the Pondras as of 'low status' in society. At the same time he stated that-

> "They will eat sweetmeats, drink and smoke with the fishing sub-castes of Bagdis; and these are ordinarily

> deemed to be nearly their equals in rank. Brahmans and members of the Nava Sakha group will not take water from them; and the Sutradhara and Kapali, while they will eat sweetmeats, drink and smoke in company with a Pod, will not use the same pipe or drink from the same *lota*"[2]

So it appears that, the Poundras did not have a respectable position in society. In such a context, Jogendranath Bhattacharya (M.A.D.L.) in his book 'Hindu Castes and Sects' (1896) mentioned Poundras as 'Professional thieves and gang of robbers'.[3] But it is difficult to find the logical base of this statement of Jogendranath Bhattacharya. A few people in a large crowd may commit theft and robbery, therefore, it is not reasonable to state the whole society as professional thieves and robbers. The Census Report of 1911 may also be mentioned here to understand the real scenario,

> "Of the indigenous castes, the most low abiding appear to be the Rajbansis of whom only 2 per 100000 (one lakh) were in prison when the census was held. The population is only 1 per 10000 (ten thousands) or less among the Jolas, Jogis, Chasi Kaibarttas, Pods (Poundro), Sadgops, Santals, Sahas and Sheikhs. The largest number of Hindu criminals are Kayasthas and Brahmin."[4]

It is clear from this report that Poundras are not 'professional thieves and dacoits'. Basically their occupation was agriculture. Due to their special skills in this regard, they are still devoted to that profession. Poundras still do have hereditary dominance in agriculture. However, many people have changed their professions by the process of read and write. This process among the Poundras started in the nineteenth century.

In the nineteenth century, Western education got introduced in Bengal by colonial administrators. As English education was opened to the masses, the doors of education also opened up among the lower caste communities. During this phase several Poundra social thinkers were able to complete their schooling. It is by getting this education that the response of renaissance spreaded among them. A group of pioneers

(Benimadhav Halder, Srimant Naskar, Raicharan Sardar, Mahendranath Karan etc.) emerged from the exploited Dalit society, who declared that modern education was the gateway to liberation. The expansion of education among the Poundra community in the latter half of the 19th century is mentioned in the report of the Indian Education Commission of 1882. In the nineteenth century, English and Western education was spread in Bengal.

The Census of 1911 mentions –

> "As regards other castes, it is noticeable that two of the ambitious castes that are endeavoring to raise their social status viz the Chasi Kaibartas and Pods have reached a very fair average of literacy. The Pods have made great strides, the proportion of literates having been nearly doubled. Considerable advance has also been made by the Namusudras and Rajbanshis, but inspite of this only one in every twenty can read and write, where as among the Chasi Kaibartas one in nine and among the Pods one in seven can do so."[5]

The evidence of the spread of education among the population of the Poundra community in the first half of the 20th century can be found in several reports, among them – Progress of Education –Bengal 1912-13 to 1916-17, Fifth Quinquennial Review by W. W. Hervell (Calcutta 1918, Chap-IX, Para- 610) and Calcutta University Commission Report 1917-18 (Vol.-1, Part- V, Chapter-VII) is noteworthy and should be mentioned.

In 1921 census, the number of educated people in Poundra community was 138 per 1000.

It is known from the census report of 1921 – The Pods have taken to education and are improving their position. They are 9.7 percent more numerous than in 1911 and 26.6 percent more than in 1901.[6]

Raicharan Sardar, the leader of the Poundra Kshatriya movement, also started genuine efforts to spread modern and liberal education among the Poundra society, which was plunged in the darkness of ignorance and blindfaiths. Not only in the form of teaching, but as a truly educated man, he understood that education is the backbone of the nation. So he never deviated from his studies even if he fell into obstacles. It is known from

'Diner Atmakahini ba Satya Pariksha' that he was active in the spread of education before the formation of the Bratya Kshatriya Samiti in 1909. Setting up a lower primary school in his own village in 1908 is a shining example of this. He built the school house at a cost of 100 rupees and paid 3 rupees per month for the teacher's salary himself.[7] He also set up a night school in his house for the education of not only boys and girls, but also for the education of the elderly and he also bore all its expenses.

During this period of 19th century, most of the schools and colleges were located in the city of Calcutta. Raicharan realized that there was a need for a hostel in the city of Calcutta for Pods to stay. Then students can study in Kolkata from that hostel. He even wrote several articles in the newspaper *'Bratya Kshatriya Bandhab'* to explain the purpose of spreading education and setting up hostels in Calcutta. He may have taken a vow to undertake such an auspicious initiative, thinking of his own troubled student life. For this, he started building a hostel in Calcutta in 1315 B.S.[8] For this purpose, he appealed for help from Kotalpur resident Jayakrishna Mandal, Beliaghata resident Arun Krishna Naskar, Sarashuna resident Dinanath Naskar and Radhanath and Purnachandra Naskar from Rasa village. Raicharan proposed that he wants to collect Rs. 1 lakh. Half of that money i.e. fifty thousand rupees will be collected from the public. But he was disappointed while collecting the money. He could not collect the specified amount of money.

With the continuous efforts of Raicharan Sardar, on March 23, 1919, a hostel named Arya Poundrak Brahmacharya Ashram was established at No. 144 Amherst Street in Calcutta.[9] Raicharan went to various Poundra Kshatriya villages and appealed for help for the necessary funds to establish the hostel. His main assistants in this regard were Adharchandra Mandal (Midya) of Nilagram, Diamond Harbour Police Station, South 24 Parganas District, Kshiradhar Mandal and his cousin Gandharbanath Mandal. Raicharan went on foot to various villages in Howrah and 24 Parganas districts to seek help from people to establish hostels. After walking about 250 miles in a long year and eight months, they were able to save only 236 taka 12 annas, 10 paisa.[10] But with this small amount, it was not possible for him to fulfill his dream.

Anukul Chandra Naskar (1894-1947) also contributed with Raicharan Sardar for the spread of education among society. Anukul Chandra was always engaged in spreading education, eradicating superstitions and trying to inspire the society in various progressive activities. In 1938, on his own initiative, he set up a charity clinic on a piece of land owned by his family. It was named after his father, 'Harishchandra Charitable Hospital'.[11] Later, the West Bengal government acquired it, built a three-storied house and renamed it 'Fartabad Subsidiary Health Centre'

One thing to be noted here is that the amount of money Raicharan Sardar received as alms from the Poundra public for setting up a hostel in Calcutta.Knowing that it was impossible to build a hostel with a small amount of money, he distributed it to the poor students according to their needs, and kept nothing for himself. It was possible to buy textbooks and arrange monthly expenses for poor students with that money. Besides, whenever he was invited to any social function, he used to make everyone aware of spread of education, restriction of child marriage, avoidance of dowry system and other social good deeds in the presence of large number of people. At the root of all this was his strong benevolence for the Poundra people. In fact, he was a true friend, mentor and guide of the backward Poundra Kshatriya society.

Raicharan Sardar took further initiatives to spread education among the Poundra community. On October 21, 1919, Raicharan Sardar organized a meeting at the house of Kalicharan Kayal at village Gobindapur under Diamond Harbour Police Station in South 24 Parganas. Kalicharan Kayal was the owner of huge property. Raicharan promised him to set up a high school in his village. Kalicharan Babu first set up a high school in Gobindapur village in 1931 AD almost a decade later to keep Raicharan's promise. The school is recognized by Calcutta University. In this way a dream of Raicharan Sardar comes true. Raicharan wrote in his memoirs about this incident –

> "It is my good fortune that this continuous effort of mine since 1919 has come to fruitfulness in my lifetime. Thanks to the God that through this poor fellow he

established a high school in the year 1919 and after 11 years it became successsful."[12]

Raicharan established schools not only to teach mother tongue but also to teach English language. One of the five high English schools established by his efforts is Sitikantha Institution adjacent to Howri *Hat* of Jagadishpur village under Mandirbazar police station of 24 Parganas district. In 1909, Raicharan Sardar met Sitikantha Naskar, a resident of Jagdishpur. He advised Sitikantha Naskar to set up an English school. Later on 11th January 1925, Raicharan Sardar attended a discussion and meeting at the house of Sitikantha Naskar and planned to establish the English School and subsequently Sitikantha Institution was established. The institution was affiliated to Calcutta University in 1927. The institute was established by collecting money through the combined efforts of Sitikantha Naskar and Raicharan Sardar. Their efforts played a major role in promoting education among the backward classes of South Bengal (especially Poundras).

Raicharan Sardar as President of *Sarbabanga Poundra Kshatriya Samiti* submitted a list of educated persons of this nation to the Reforms Department of the Government of Bengal Bahadur on 28-01-1933. A copy of that list is known from 'Din's Atmakahini'. Here he wrote:

> "There are two people who passed the exam of B.sc from the University of Glasgow in the Poundra community. Among them one was appointed by the English authorities as Engineer under Bahadur Government of India and another was Mineral Engineer. 80 Calcutta University M.A., B.A, B. Sc. and B. L. Among them 18 are advocates, one Hon'ble Calcutta High Court Advocate, one Sub deputy, 5 M.B doctors. One is a Benares University graduate engineer, about 30 L. M. F. Doctors, 12 *Muktars*, more than 50 B.A passed,up to four hundred Matrics passed, more than 50 normal examination passed and more than 100 teachers passed from Gurus and many other Bengali teachers educated in Bengali. Besides, many people of this caste have taken shelter in religious institutions like Ramakrishna

Mission, Hindu Mission, Gaudiya Math and Navadwip Math."[13]

Binod Bihari Gayen (1922-2011) was an eminent person in the spread of education among Poundras.He established more than 50 schools in Poundra areas at Sundarbans.At Sandeshkhali P.S. he established more than 18 schools,6 in Hansabad P.S.,6 in Gosabad P.S.,2 in Hingalganj P.S.,2 in Basanti P.S.,1 in Canning,1 in Basirhat and more than 14 primary schools under Sandeshkhali P.S.[14]

Prakash Chandra Roy (1961-2016) played one of the leading roles in the spread of Poundra movement in Indian subcontinent. He has given a list of educated Poundra classes in his *Punro Poddoraj Tatha Poundra Jatir Sankhipta Itihas*. From this we get an idea of the educated middle Poundra intellectual class.[15]

This education rate has gradually expanded among the Pundra population. In the last decade of the 20th century, the enrolment rate of this population was 65 percent. According to the 2001 census, the literature rate among Poundras is 72.1 percent. 59.87 percent among women and 83.47 percent among men.[16] From these statistics of literates, it seems that the number of people of Poundra race is increasing day by day in middle class livelihood like teachers, government employees, doctors, engineers etc. In the 2011 census, this number has increased subsequently. In other words, it can be said that the pioneers of the Kshatriya movement played a great role in the spread of education among the Poundras.This consistency is still maintained today.

Notes and References

1. Krishna Kumar Sarkar, *Jati Andolon Theke Rajnoitik Chetanar Bikas: Banglar Poundra Jatir Ekti Bishleshon (1911-2011*), Unpublished Ph.D Thesis, Kolkata: Jadavpur University, 2018, p. 43.
2. H.H. Risley, *Tribes and Castes of Bengal, Vol. II,* Calcutta: Firma K.L.M Private Limited, 1998, p. 3777.
3. Jogendra Nath Bhattacharya, *Hindu Castes and Sects: As Exposition of the Origin of the Hindu Caste system and the*

Bearing of the sects towards each other and towards other religious system, Calcutta: Thacker Spink and Co, 1896.

4. *Census Report for 1911*, p. 120.
5. *Census of India, 1911.*
6. *Census of India, 1921.*
7. Dilip Gayen (ed), *Mahatma Raicharan Sardar O Poundra Samaj*, Kolkata: Poundra Mahasangha, 2011, p. 32
8. Raicharan Sardar, *Diner Atmakahini Ba Satya Pariksha*, Canning Town: Radharani Press, 1366 B.S., Reprinted in Sanat Kumar Naskar (ed) , *Poundra Manisha*, Sonarpur: Poundra Mahasangha, 2012, p. 294.
9. *Ibid,* p. 305.
10. *Ibid,* p. 308.
11. *Samaj Darshan*, Kolkata: Poundrakshatriya Unnayan Parishad, 2001, p. 8.
12. Sanat Kumar Naskar, *Poundra Kshatriya Samajaer Nabajagaron O Mahatma Raicharan Sardar,* Kolkata: Poundra Mahasangha, 2011, p. 34.
13. Raicharan Saradar, *op.cit., p. 379.*
14. Aparesh Mandal, *Abaad*, Kolkata: Mita Press, 2015, pp. 56-62.
15. Prakash Chandra Roy, *Punro Poddoraj Tatha Poundra Jatir Sankhipta Itihas*, Uttarpradesh: Neelshikha Prakashan, 2002, pp. 56-57
16. *Census of India, 2001.*

Relevance of Yoga and its possible mechanism in human life

Swadhin Mondal
M.Ed., University of Calcutta

Abstract: The purpose of my study is to find out "Relevance of Yoga and it's possible mechanism in human life". Yoga is associated with a healthy and lively lifestyle with a balanced approach to life. Yoga means addition of energy, strength and beauty to body, mind and soul. Yoga is a physical, mental and spiritual practice that aims to create union between body, mind and spirit as well as between the individual cells and universal consciousness. Eight limbs of yoga are indicated to refine the body and mind. Daily yoga practice is most important for every human because it is a slow-gradual process of bringing the mind which keeping the mind and body pure and healthy for long time. Yoga, an effective art of healthy living can be a game-changer for a student. Specially adolescences learners who practice yoga regularly are bound to have a positive effect on both their health and academics. It will help students in self-realization. Yoga helps to improve the concentration level of a student. Yoga also supports physical health such as balanced blood pressure, reducing tardiness, boosting confidence level, sleep, relief from headache, and most importantly a sharper mind. Some kinds of Upanishads and Veda are also emphasis the relevance of Yoga in human life. Meditation is considered a higher form of concentration, and the regular practice of meditation can increase concentration in day-to-day life. The object of concentration can be a thought, idea, mantra, breath or a physical thing. It is highly recommended to practice concentration with a mantra as it can provide a powerful vibration to focus on the processes of attention, concentration, and memory are the main factor in learning. So, Yoga is a way of living towards a healthy mind in a healthy body.

Key words: Yoga, self-realization, Eight limbs, Meditation, Adolescences learners.

➢ INTRODUCTION OF YOGA

The word 'Yoga' is derived from Sanskrit root ***yuj*** which means ***'join' or 'unite' or 'yoke together'***. It brings the body and mind together to become a harmonious experience. Yoga is a method of learning that aims at balancing "Mind, Body and Spirit". According to the *Yoga Sutras of Patanjali*, Yoga is the "science of the mind" (Satchidananda, 1990, p. xi).The aim of Yoga is Self-Realization, to overcome all kinds of sufferings leading to **'the state of liberation'**.. As *Swami Vivekananda* put it *"It is a means of compressing one's evolution into a single life or a few month or even a few hours of one's bodily existence"*. So, Yoga is one of the most ancient branches of Indian philosophy and meditative techniques which considered as a pathway to achieve spiritual goal. Yoga is the best example of **complementary and alternative medicine (CAM)** therapies which refer to healthy way of life and also long-term physical benefits from improve flexibility to stronger muscles and bones. The ultimate goal of yoga is self realization.

There are basically two forms of yoga one is its practical aspect which is based on practice and philosophy while the second one is its spiritual aspect. In the present time, more and more people, especially the Westerners, are resorting to Yoga to find a cure for chronic health problems and attain a peace of mind. Through Yoga, one achieves the conditioning of even all the internal organs like - heart, brain, spleen, liver, lungs, intestines, etc. Apart from these vital organs, through Yoga all the glands, like - thyroid, pituitary and pineal gland of the brain, function better.

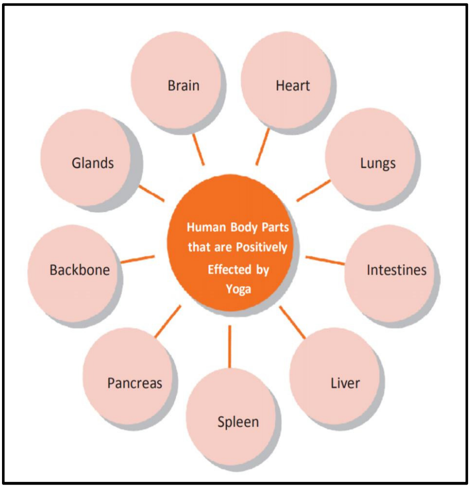

Fig1. Human Body Parts that are Positively Effected by Yoga

➢ **HISTORY AND EVOLUTION OF YOGA**

The science of yoga has its origin thousands of years ago, long before the first religions or belief systems were born. In the yogic lore, **Shiva** is seen as the first *yogi or Adiyogi*, and the first Guru or Adi Guru. Several thousand years ago, on the banks of the lake Kantisarovor in the Himalayas, Adiyogi poured his profound knowledge into the legendary Saptarishis or 'seven sages". Yoga is divided in to the following periods –

❖ **Pre-Patanjali Period (Before 500 BC)**
❖ **Patanjali Period (500 BC to 800 AD)**
❖ **Post-Patanjali Period (800 AD onwards)**

➢ **OBJECTIVE OF THE STUDY**

❖ To identify the effect of yoga on adolescences learners.
❖ To explore the physical benefits of yoga.
❖ To study the educational idea and educational importance of yoga.

➢ **METHODOLOGY OF THE STUDY**

The present study based on historical research design: Bibliographic Research. In Historical Research data collection is very tedious and time consuming process. These data are classified into primary and secondary source.

➢ ***Primary Source:*** **-** The original documents or remains come under the category of primary source such as- A study of Patanjali by S.N.Dasgupta, The Synthesis of Yoga by Sri Aurobindo, Patanjali Yoga sutras by Swami Vivekananda, Yoga student handbook (XI) by CBSE, Yoga: A Healthy Way of Living by NCERT books .

➢ ***Secondary Sources:*** **-** Secondary sources based on historical reviews, research journals, books of various authors related to the topic.

➢ **TO IDENTIFY THE EFFECT OF YOGA ON ADOLESCENCES LEARNERS**

Yoga is a mind-body practice that combines physical postures, breathing exercise and meditative practices with the goal of unifying the physical, mental and emotional selves. Practicing Yoga has been associated with numerous benefits in Adolescence period such as self-awareness, self-acceptance, mental health, cognitive study. The impact of Yoga practices such an excellent outcome according to many researcher as well as philosopher, educator it also reduce the level of anxiety, depression and

also mental stress. Yoga is become a popular alternative medicine therapies, anyone can practice it specially school going Adolescences learners. This also allows people to practice independently and take change of their different health related issue. Practicing Yoga may also help individuals manage their daily stress.

Adolescence is the period between childhood and adulthood and the most important stage of a human being and this stage of life consider as of stress and storm. Sometimes we see that learners are not able to adjust with their new-fangled role in life. They can have Emotional, Mental, Behavioral, and Adjustment problems known as ***"disorders".*** As a result they suffer from many psychological and physiological disorders such as ***depression, stress, anxiety, aggressive behavior, violence, and disobedience.***

Physically	High blood pressure Asthma Weakness Cerebral palsy
Physiologically	Cardiovascular system Lack of Nervous system balance Blood circulation Learning disability Insomnia
Psychologically	Depression Anxiety Stress Lack of concentration Mental ability (aggressive or violence) Hyperactivity disorders

Table1: different types of symptom suffering from Physically, Physiologically, Psychologically of Adolescence learners.

Recently not only India but also many western country (USA, UK, ASUTRALIA etc) there has been increasing present of Yoga and

meditation in school level curriculum for adolescences, including interventions designed to improve social-emotional intelligence. Meditation is one of the important parts of Yoga because its connecting movement with breath and engaging in other forms of focused awareness are integral to the practice of Yoga. Meditation also remove and prevent many kinds of Physically, Physiologically, Psychologically disorders which are mention above table.

The Yoga practice can reduce our stress and lead a healthy life. The science of Yoga is a powerful stream of knowledge, which enables the practitioners to achieve radiant physical health, serene mind, continues spiritual uplift, and creates the ability for harmonious social living. The Yoga practice among adolescent plays an important role to keeps him away from many disorders and build up good psychological well-being. So it is essential that in schools should provide facilities and encourage the adolescences learners to practice yoga regularly at school. Yoga would allow students to have a better academic performance compared to a more exciting, stimulating activity. So teachers, parents, students and school administration to understand the role of yoga practice among adolescence learners.

➢ **TO EXPLORE THE PHYSICAL BENEFITS OF YOGA**

Yoga is a philosophical system of exercise and meditation, The introduction of the system of Yoga by **Patanjali** is by way of an instruction that the mind has to be controlled- **"Yogahs-chitta-vritti-nirodha"**. He describes very simply that Yoga is control of mind, restraint of the mind-stuff. The most important benefit of Yoga is it balances our physical and mental conditions. It constitutes asana, regulated breathing (pranayama), and awareness of yoga sums (principles) that govern the mind. Regular practice of yoga enhances awareness of mind and body, which is needed in the self-management of diet and exercise plan in diabetes. The word yoga as interpreted by many, means **"union"** and can be broken down further into five specific elements all contributing to the union of mind, body and soul.

KIND OF YOGA	ULTIMATE GOAL
Jnana Yoga	Yoga of Knowledge
Bhakti Yoga	Yoga of Devotion
Raja Yoga	Yoga of Mind
Karma Yoga	Yoga of Action
Hatha Yoga	Yoga of Body

Table 2. Various types of Yoga and its Ultimate goal

All elements of yoga are equally important when creating a necessary balance for those individuals who practice it. Yoga helps us to take away the stress and frustration, improve physical and mental health to increase personal satisfaction and well-being Yoga is specifically mentioned as an example of a fitness activity in the new curriculum under the larger category of Movement Competence *(Health and Physical Education, 2010, pg.140).* Yoga Lifestyle is about **two actions**: "*cleaning the mirror*" and "*spreading the Light*". The mirror is the mind and body. They have to be clean and pure to catch the light in the first place. Yoga lifestyle is therefore about purifying the mind and keeping the body healthy. Yoga lifestyle includes certain principles and values, which called eight limbs of Yoga.

1	Yama	Ethical relationships, such as nonviolence
2	Niyama	Internal awareness and cleanliness
3	Asana	Physical postures
4	Pranayama	Breath
5	Prathyahara	Withdrawal of senses
6	Dharana	Concentration
7	Dhyana	Meditation
8	Samadhi	Transcending consciousness

Table 3. The eight limbs of Ashtanga Yoga

Yoga is not just practice and physical effort but it is more than this, it also linkage between the mind and body. Nowadays, it has now been proverb by scientific researches beyond doubt that yoga practices brings in better balance equilibrium in the autonomic function and metabolic

rate, so that the state of both physical and mental well-being is achieved. Yoga can decrease inflammation, increase immune system, improve chronic health and also reduce depression, stress and anxiety. The beauty of Yoga is that it can be practiced by anyone. Regular Yoga practice we can get physical benefit and it positively contributes to overall quality of life continue. We should make as an essential daily routine of our life to practicing Yoga continuously. Then we should identify the benefits of Yoga in holistic development for years to come.

➢ TO STUDY THE EDUCATIONAL IDEA AND EDUCATIONAL IMPORTANCE OF YOGA

Yoga has great importance in present education system. The modern education system emphasizes on science and technology in which the material progress is being achieved, but the inculcation of ethical, moral and spiritual values and promotion of healthy life-style are totally neglected. In this context, it is an urgent need to integrate Yoga in modern education system in order to make all-round development relating to body, mind and spirit. The integration of Yoga education in the present system of education can endorse human values to reform attitude and behavior, relieve from stress and strain, build up healthy life-style, shape high moral character and develop refined personality of the students so as to make them a complete well-being. Hence, we have to

understand the importance of Yoga in education and introduce it as a discipline and thereby focus on the process of integration in the curriculum. However, Yoga practices can lead students to the attainment of the highest goal of life-the self- realization of the potentialities inherent in them. In that context when the education is considered yoga have its various important effects. For that reason, various schools are practicing the yoga. The basic **advantages of yoga** are it helps in dealing with various difficulties, conflicts, distractions, problems, and dissipation faced by the children.

The Study of Meditation and its impact on human lifestyle have been studied for years, if students regularly practice meditating under proper guidance, they will be benefited in numerous ways. Some of the benefits of meditation for students are enlisted below:

1. Increase in IQ level
2. Lower stress
3. Get over depression
4. Helps to get over from bad addiction
5. Developing confidence
6. Personal transformation
7. Increase efficiency of brain functioning
8. Appreciate life
9. Keep away from diseases
10. Keeps students happy

So, Yoga offers new learning possibilities to a wider group of students than traditional sports or fitness curriculum, making it a valuable addition to any educational program. Additionally, adding yoga to a school's curriculum will help provide a quality physical education program as modification of traditional physical education yoga in sports as important as other think it helps us in different ways and different levels in a sports men life. It offers children and adults an opportunity to experience success in physical activity, which can help build a foundation of strong of life.

➢ CONCLUSION OF THE STUDY

Yoga is not just physical effort but it is more than this. Yoga is to create harmony in the physical, psychological and spiritual aspect of the human being. Recently India was celebrating Yoga day, the widespread acceptance of Yoga day is the acceptance of that "**Amrit Sprit**" of the country. Yoga need not be limited to a particular time and location. Yoga day will became a medium for us, not to do Yoga but to celebrate our health, happiness and peace.

According to the National **Institute of Health, 9.5% of Americans practice yoga** (*The benefits of yoga: A review by Jyoti Solanki and Vivek Solanki)*. Yoga is also commonly understood as a therapy or exercise system for health and fitness. While physical and mental health is natural consequences of yoga, the goal of yoga is more far-reaching. Yoga is about harmonizing oneself with the universe.

Since the ancient time, yoga has been physiological or psychosocial variable that has a key impact on health or quality of life. Present days, Yoga Education is being impacted by many eminent Yoga Institutions, Private trusts & societies, Yoga Research Centers etc. Recently Govt. of India launches several app such as **Y-Break, M-Yoga**. Meditation is one of the important ancient techniques to controlling our self and daily practicing mediation also impact on human mind. So meditation is a one of important part of Yoga. Now-a-days, millions and millions of people across the globe have benefitted by the practice of Yoga which has been preserved and promoted by the great eminent Yoga Masters from ancient time to this date. So if we practice Yoga or meditation daily it will give us spiritual power and also extra energy to think positive towards our future life.

➢ REFERENCES

A study of patanjali by S.N.dasgupta,
Concentration and meditation by swami bhajanananda
http://njppp.com/fulltext/28-1531306776.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Shandilya_Upanishad#:~:text=Yoga%20is%20best%20done%20in,should%20find%20a%20level%20place.

https://motherandsriaurobindo.in/_StaticContent/SriAurobindoAshram/-09%20E-Library/-03%20Disciples/Narad/-01%20English/OM%20and%20OM%20Choir/The%20Mother%20and%20Sri%20Aurobindo%20on%20OM/Sri%20Aurobindo%20on%20OM.htm
https://timesofindia.indiatimes.com/religion/mantras-chants/om-chanting-what-are-the-benefits-of-chanting-om-can-we-chant-om-silently/articleshow/76868162.cms
https://vivekavani.com/swami-vivekananda-quotes-om/
https://www.deccanchronicle.com/opinion/op-ed/071019/mystic-mantra-om-can-awaken-a-new-consciousness.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2952121/
https://www.theravada.gr/en/meditation-practices-at-our-centre/?gclid=Cj0KCQjwgYSTBhDKARIsAB8KuktQZmymHEZ1zLx2Vx2kSOaws4P8YDA3hWSeMxZiOhjeNf-PqRMo3PsaAi6eEALw_wcB
https://www.vrmvk.org/pranava-mantra-%E0%AB%90
https://www.yogapedia.com/definition/6607/concentration#:~:text=In%20yoga%2C%20concentration%20is%20the,limb%20of%20yoga%20is%20dharana.
https://www.yogiapproved.com/om-meaning-behind-sacred-chant-6-surprising-benefits/
Patanjali yoga sutras by swami vivekananda,
Patanjali‘s yoga asanas: a remedial measure to cope with stress : virender kaushal
The synthesis of yoga by sri aurobindo,
The benefits of yoga: A review by Jyoti Solanki and Vivek Solanki
Yoga student handbook (xi) by cbse,
Yoga: a healthy way of living for upper primary stage by ncert

Effects of specific Yogic practices on Selected Physical Fitness Components of college girls having different levels of Anxiety

Mamata Malik
Assistant Professor, Dept. of Physical Education,
Manbhum Mahavidyalaya, Purulia, West Bengal, India.
Kunal Sardar
Assistant Professor , Dept. of Physical Education,
Sitaram Mahato Memorial College, Kuruktopa, Purulia

Abstract : The purpose of this study was to find out the effects of specific yogic training on anxiety of selected different levels of college girls. To achieve the 120 college girls of 1st and 2nd year grade were selected as subjects and their age ranged between 18 to 20 years. Anxiety questionnaire test was applied to the entire 120 college girls. On the basis of test result, the entire subjects were ranked from highest to lowest. Thereafter as per merit, high (N=40) as well as low (N=40) anxiety groups under each category (N=20) control and experimental and control groups. The specific yogic training program of ten weeks, (five days Monday to Friday) was administered to experimental groups low and high anxiety. Anxiety measures by the Spielberger Questionnaire test was considered as anxiety scores of the individual and speed abilities was measured by a 50 Yard Dash, which was recorded of a second. The data collected pretest phase between low and high anxiety levels college girl's 't' test was conducted and after training investigate the experimental and control group subjects undertaken in this study belonging to the low as well as high anxiety level in pre, post and adjusted post test phases the ANCOVA statistical procedure was adopted. The result revealed that between experimental and control group of low as well as high anxiety group of college girls showed noticeable improvement in speed ability through yogic training which is showed in this study.

Keywords: Specific yogic training, Anxiety, speed ability.

INTRODUCTION:

Stress and anxiety is a common condition noticed in people of all age groups. It may be caused by a physical condition, mental condition, and effects of drugs or due to a combination of these. The common types of anxiety include: Panic disorder, Generalized Anxiety Disorder or GAD, Phobic disorders, obsessive compulsive disorder or OCD, separation anxiety and stress disorders.

Anxiety is a general term for several disorders that cause nervousness, fear, apprehension, and worrying. These disorders affect how we feel and behave, and they can manifest real physical symptoms. Mild anxiety is vague and unsettling, while severe anxiety can be extremely debilitating, having a serious impact on daily life.

People often experience a general state of worry or fear before confronting something challenging such as a test, examination, recital, or interview. These feelings are easily justified and considered normal. Anxiety is considered a problem when symptoms interfere with a person's ability to sleep or function. Generally speaking, anxiety occurs when a reaction is out of proportion with what might be normally expected in a situation. Today life style such as cigarette smoking, habitual hostility, suspiciousness towards others, diets high in fat and low in fibered and sedentary jobs lead to many psychological and psychosomatic problems. Stress and anxiety have become major killers in our developed world, particularly the youth, the college going students' health is reported the increase in student-stress nationwide. Good mental health is one of the greatest resources for vitality, creativity and wealth, while poor health is contrasted significantly drains of the aforementioned, when the stress is perceived negatively or becomes excessive.

Today life style such as cigarette smoking, habitual hostility, suspiciousness towards others, diets high in fat and low in fibered and sedentary jobs lead to many psychological and psychosomatic problems. Stress and anxiety have become major killers in our developed world, particularly the youth, the college going students' health is reported the increase in student-stress nationwide. Good mental health is one of the greatest resources for vitality, creativity and wealth, while poor health is contrasted significantly drains of the aforementioned, when the stress is perceived negatively or becomes excessive.

METHODOLOGY:-

One hundred and fifty college girls, belonging to the first and second year of M. U. C. Women's College, Dist- Burdwan, West Bengal were high-wise assembled and then 120 college girls were randomly selected as the subjects for this study. The average age group of the subjects was ranged between18 to 20 years of age.

Anxiety questionnaire test was applied to all the 120 college girls. On the basis of test result, the entire subject was ranked from highest to lowest. Thereafter as per merit, the first forty and last forty college girls were ranked and studied as high and low anxiety groups respectively.

Thereafter the high (N = 40) as well as low (N = 40) anxiety groups were further subdivided into two equal groups under each category (N = 20). One group from each category (high as well as low anxiety group) were randomly selected as experimental groups which were designated as high and low anxiety experimental groups, while remaining one group in each category were studied as high and low anxiety level control groups.

Ten weeks yogic practice was applied to the experimental groups (high as well as low anxiety) while the high as well as low anxiety control groups were left to their usual and normal daily routine program.

Anxiety: - Score obtained by the subjects on State & Trait (STAX 1) Anxiety Spielberger Questionnaire test was considered as anxiety scores of the individual.

Physical Fitness components- Speed Ability was measured by 50 Yard Dash, which score was recorded of a second.

Items of Yogic Training for Experimental Group

Suryanamaskar- (12 counts)

Kriya- Kapalbhati.

Asana- Padahastasana, Pascimatanasana, Pavanamuktasana, Ardhalasana, Naukasana, Viparitkarani, Sarvangasana, Mastsyasana, Halasana, Bhujangasana, Dhanurasana, Chakrasana.

Pranayama -Ujjayi, Anulom-Vilom, Bhramari

Meditation - Nadanusandhana (A-kara, U- kara, M-kara, A-U-M chanting)

In order to investigate the existence of significant difference in anxiety in pre- test phase between low anxiety level and high anxiety level groups of college girls, the student 't' test was conducted.

In order to investigate the existence of the significant difference

between experimental and control group subjects in physical fitness components and psychological variable undertaken in this study belonging to the low as well as high anxiety level in pre, post and adjusted post-test phases the ANCOVA statistical procedure was adopted. For testing the mean difference, the level significance was set at 0.05 level of confidence.

Results and Discussion: Initial data in anxiety as per Anxiety Questionnaire of 120 college girls of M. U. C. Women's College, Burdwan were collected. The data were arranged in descending order and then top 40 subjects of the list were classified as low anxiety group and bottom 40 subjects as high anxiety group. Each low as well as high anxiety group (N = 40 in each group) was further subdivided as experimental (N = 20) and control group (N = 20).

Then Yogic training for ten weeks duration was applied to low anxiety experimental (N = 20) and high anxiety experimental (N = 20) groups only. After ten weeks of training, the final data on psychological variables of low anxiety experimental and control group subjects as well as high anxiety experimental and control group subjects were collected.

In order to find out the existence of significant difference in anxiety between low and high anxiety groups (N = 40 in each category), the student's t-test was conducted which is presented in Table–1

Table – 1: Comparison of mean of anxiety between low and high anxiety group subjects in pre-test

Low Anxiety		High Anxiety		MD	SEM	t	Sig-2 tailed
Mean	SD	Mean	SD				
69.8000	5.3118	85.1250	2.2553	15.3250	0.9124	16.796**	0.000

*Sig. at t .05 for df 78 = 1.99, **Sig. at t .01 for df 78 =2.64

SPEED ABILITY

COMPARISON BETWEEN LOW ANXIETY EXPERIMENTAL AND CONTROL GROUPS-

The statistical analysis of data in speed ability as one of the components of physical fitness between experimental and control group subjects belonging to low anxiety group of college girl's students undertaken in this study was computed using analysis of co-variance statistic (ANCOVA). The data pertaining to this have been presented in Table-2. The same is also graphically represented in Fig.1

TABLE-2

ANALYSIS OF COVARIANCE OF THE MEANS BETWEEN LOW ANXIETY EXPERIMENTAL GROUP AND LOW ANXIETY CONTROL GROUP IN SPEED ABILITY OF COLLEGE GIRLS

Means	Low anxiety Experimental G)	Low anxiety Control (G)	Sum of Squares	df	Mean Sum of Squares	F Ration
Pre-Test Means	8.07	8.06	A 0.00 W 5.68	1 38	0.00 0.15	0.00
Post-Test Means	7.96	8.17	A 0.44 W 9.05	1 38	0.44 0.24	1.87
Adjusted Post-Test Means	7.95	8.17	A 0.47 W 3.87	1 37	0.47 0.11	4.47*

*Significant at .05 level of confidence, A= Among Means Variance. F .05 (1, 38) = 4.10 F .05 (1.37) =4.11 W=Within Group Variance.

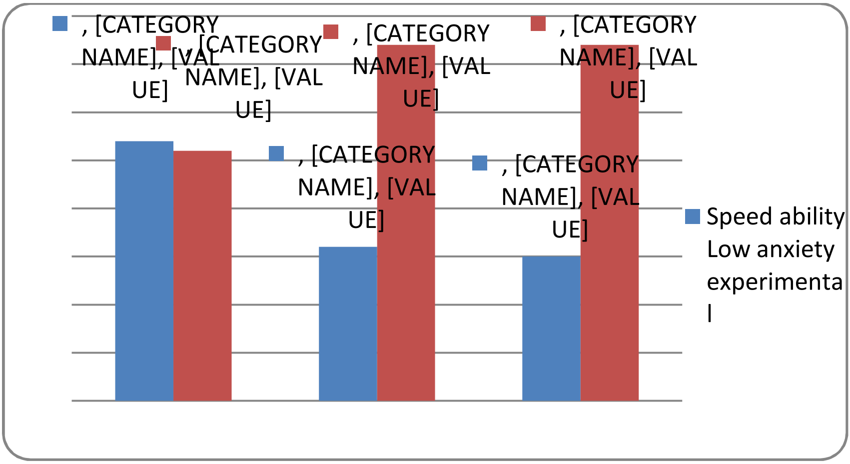

Fig.1 COMPARISON OF MEAN VALUES IN SPEED ABILITY BETWEEN LOW ANXIETY EXPERIMENTAL AND LOW ANXIETY

CONTROL GROUPS IN PRE, POST AND ADJUSTED POST TEST PHASES.

TABLE-3

PAIRED ADJUSTED FINAL MEANS AND DIFFERENCES IN SPEED ABILITY BETWEEN MEANS FOR HIGH ANXIETY EXPERIMENTAL GROUP AND HIGH ANXIETY CONTROL GROUP SUBJECTS OF COLLEGE GIRLS

Low Anxiety Experimental (G)	Low Anxiety Control (G)	Difference Between Means	Critical Differences
7.95	8.17	0.22*	0.207

*Significant at .05 level confidence.

COMPARISON BETWEEN HIGH ANXIETY EXPERIMENTAL AND CONTROL GROUPS-

The statistical analysis of data in speed ability as one of the components of physical fitness between high anxiety experimental and high anxiety control group subjects undertaken in this study was computed using analysis of co-variance statistic (ANCOVA). The data pertaining to this have been presented in Table-4. The same is also graphically represented in Fig.2

TABLE-4

ANALYSIS OF COVARIANCE OF THE MEANS BETWEEN HIGH ANXIETY EXPERIMENTAL GROUP AND HIGH ANXIETY CONTROL GROUP IN SPEED ABILITY OF COLLEGE GIRLS

*Significant at .05 level of confidence, A= Among Means Variance.

F .05 (1.38) =4.10, F .05 (1.37) =4.11 W=Within Group Variance.

Means	High anxiety Experimental (G)	High anxiety Control (G)	Sum of Squares	df	Mean Sum of Squares	F Ration
Pre-Test Means	9.11	9.03	A 0.05 W 19.22	1 38	0.05 0.51	0.11
Post-Test Means	8.98	9.01	A 0.01 W 17.54	1 38	0.01 0.46	0.02
Adjusted Post-Test Means	8.95	9.05	A 0.11 W 0.34	1 37	0.11 0.01	11.31*

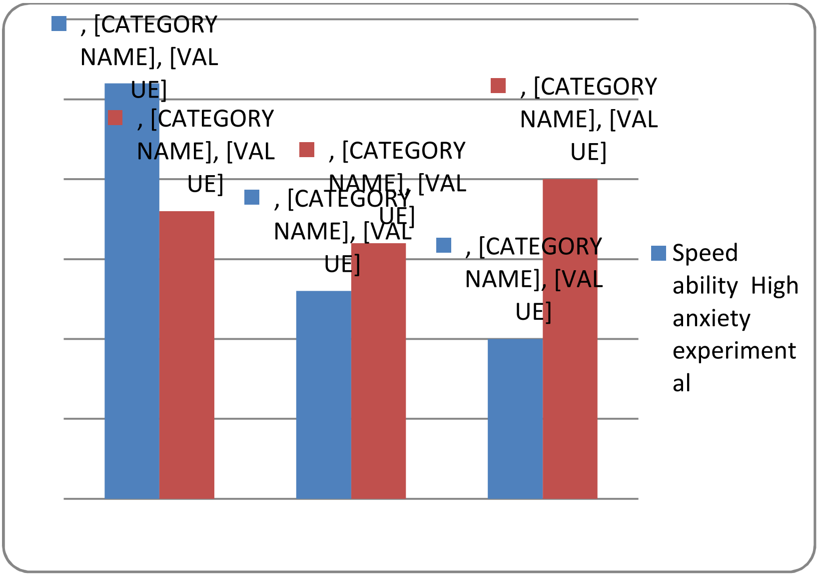

Fig.2 COMPARISON OF MEAN VALUES IN SPEED ABILITY BETWEEN HIGH ANXIETY EXPERIMENTAL AND HIGH ANXIETY CONTROL GROUPS IN PRE, POST AND ADJUSTED POST TEST PHASES.

TABLE-5

PAIRED ADJUSTED FINAL MEANS AND DIFFERENCES IN SPEED ABILITY BETWEEN MEANS FOR HIGH ANXIETY EXPERIMENTAL GROUP AND HIGH ANXIETY CONTROL GROUP IN SUBJECTS OF COLLEGE GIRLS

High Anxiety Experimental (G)	High Anxiety Control (G)	Difference Between Means	Critical Differences
8.95	9.05	0.11*	0.062

*Significant at .05 level confidence.

COMPARISON BETWEEN LOW AND HIGH ANXIETY EXPERIMENTAL GROUPS-

The statistical analysis of data in speed ability as one of the components of physical fitness between low anxiety experimental and high anxiety experimental group subjects of college girls undertaken in this study was computed using analysis of co-variance statistic (ANCOVA). The data pertaining to this have been presented in Table-6. The same is also graphically represented in Fig.3

TABLE-6

ANALYSIS OF COVARIANCE OF THE MEANS BETWEEN LOW ANXIETY EXPERIMENTAL GROUP AND HIGH ANXIETY EXPERIMENTAL GROUP IN SPEED ABILITY OF COLLEGE GIRLS

*Significant at .05 level of confidence, A= Among Means Variance.
F .05 (1, 38), = 4.10, F .05 (1, 37) = 4.11 W=Within Group Variance

Means	High anxiety Experimental G)	High anxiety Control (G)	Sum of Squares	df	Mean Sum of Squares	F Ration
Pre-Test Means	8.07	9.11	A 10.70 W 12.68	1 38	10.70 0.33	32.07*
Post-Test Means	7.96	8.98	A 10.13 W 11.04	1 38	10.13 0.29	33.94*
Adjusted Post-Test Means	8.44	8.49	A 0.02 W 0.44	1 37	0.02 0.01	1.04[NS]

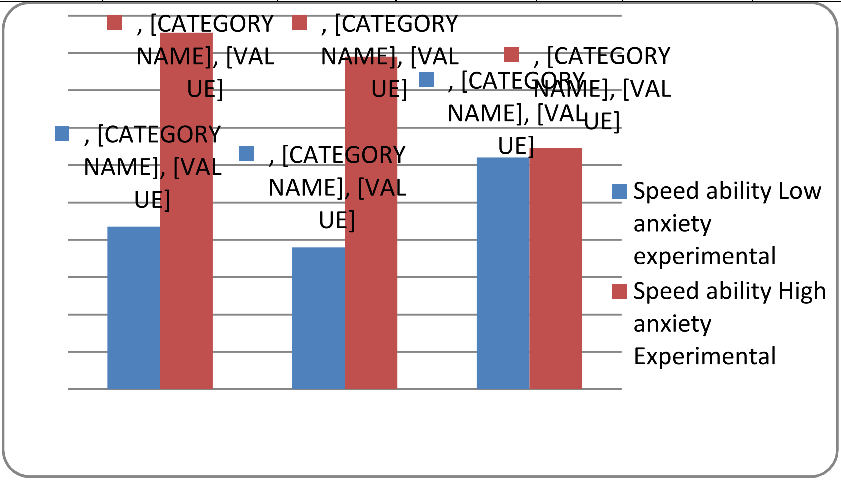

Fig.3 COMPARISON OF MEAN VALUES IN SPEED ABILITY BETWEEN LOW ANXIETY EXPERIMENTAL AND HIGH

ANXIETY EXPERIMENTAL GROUPS IN PRE, POST AND ADJUSTED POST TEST PHASES.

DISCUSSION

Table-2 and Fig-1 in respect to the analysis of the co-variance statistical result between low anxiety experimental and control group subject in anxiety of college girls revealed insignificant differences in pre- and post-test phases and significant difference in adjusted post-test phase.

Table-4 and Fig-2 in respect to the analysis of co-variance statistical result in anxiety between high anxiety experimental and high anxiety control group subject of college girls revealed insignificant difference in pre and post-test phases and significant difference in adjusted post-test phase.

Table-6 and Fig-3 in respect to the analysis of co-variance statistical result between low anxiety experimental and high anxiety experimental group subjects in speed ability revealed significant difference in pre- and post- test phase.

CONCLUSION

Specific Yogic practice of ten weeks duration showed noticeable effect in speed ability of low as well as high level anxiety group of experimental group college girls. On other hand, insignificant effect on the control group of low as well as high level anxiety group of college girls in speed ability is noticed.

REFERENCE

1) ***Ibid***.p-52

2) Malathi A and Parulkar VG. Effect of yogasanas on the visual and auditory reaction time. ***Indian J PhysiolPharmacol.*** 1989; 3: 110-2.

3) Bera, T.K., Rajapurkar, M.V., Body composition, cardiovascular endurance and anaerobio power of yogic practitioner. ***Indian J. of physical and pharmacol.*** 1993, 37, P- 225-228.

4) Barry L. Johnson and Jack K. Nelson, ***Practical Measurements for Evaluation in Physical Education 3rd*** Ed. (Delhi:Surject Publications, 1982), P. 124.

5) ***Ibid***. P. 202.

An Investigation into the Attitude of Students of a Secondary School towards the Study of Life Science and their Achievement in it

Nabanita Majhi
Assistant Professor, Department of Education,
Jogesh Chandra Chaudhuri College

Abstract: Achievement tests are one of the most important tools for measuring a student's cognitive development. Achievement tests can measure a student's growth and progress in a particular subject. Several factors affect student performance in achievement tests. Some of these are interests, attitudes, intelligence, socioeconomic conditions, class, parenting style, etc. Here, the researchers wanted to see if there was an association between achievement tests and attitudes. Attitudes are believed to influence student performance in specific subjects. People with positive attitudes about specific issues perform better than those with negative attitudes about specific issues. With this in mind, the researchers conducted this study to see if there was a correlation between performance and attitude. The main finding of these results is that there is a positive association between performance and attitudes. In other cases, there are large performance differences between urban and rural students.
Key words: Investigation, Achievement Test, Attitude Test, Secondary School, Life Science

Introduction

In West Bengal, Secondary Education Board conducted Madhyamik Examination (Grade-x) is the first board exam in student life. Preparation for this exam begins in class ix. The results of this trial are very important for future research. After studying the subject, you should have the following learning outcomes: B. Mastery of the subject, formation of concepts on the subject, development of skills, etc. A positive attitude towards this subject also develops. Life Science is one of the majors of the Madhyamik exam. After learning this subject, you should develop a positive attitude towards it. It is clear from many research findings that positive attitudes and positive interests are highly dependent on success in this field. Therefore, a positive attitude towards a subject should be one of the goals of learning outcomes, as success in a particular subject depends on the student's attitude towards the subject. The main purpose of this research is to clarify attitudes toward life sciences and clarify the

relationship between attitudes and achievements in life sciences. Therefore, it is with this aim in mind that researchers conducted their research work.

Objectives of the Study

The main objectives of this research are

- To find out whether or not there is difference in attitude towards life science between Urban and Rural students.
- To find out whether or not there is difference present between achievement and attitudes towards life science.

Review of related literature

Jain, D. K. (1979) conducted a study of significant correlates of high schools failures in mathematics & english with special reference to Jammu division. The major findings of this study are

The factors that play a vital role for learning english are intelligence, english vocabulary, knowledge of grammar, comprehension, spelling, pronunciation, speed & legibility of hand writing. Status of english in the family extra reading in english and the quality of the teacher.

Factors that play a vital role in learning mathematics are intelligence, abstract-resourcing, numerical ability, mathematical backgrounds, knowledge of mathematical concepts, rules & principles, attitude towards mathematics, degree of motivation, study hours and the status of mathematics in the family.

In 1979, A. Paul conducted his study for his dissertation paper under the title “A critical Estimate of the Achievement of the Students of Class VIII in Physical Science. The main Purpose of this study is to prepare a standardized and objective based reliable and valid achievement test in physical science & to find out sex-wise & Strata-wise differences if any. The major findings of this study are

(i) The urban students are higher achiever than rural students.
(ii) Rural boys are higher achiever then the rural girls
(iii) Urban girls are higher achiever than rural girls (dissertation submitted to the Department of Education, Kalyani University.

In 1968, Rup prakash, constructed & standardized of an achievement test in everyday science for class VIII in Punjab and also constructed a scale to assess the ATTITUDE of the students towards learning of science. The major findings of this project were (i) achievement in science & Pupils attitude towards learning of science was positively related (ii) the pupils of urban areas, scores more high in science then those in rural areas (iii) the girls scored higher than the boys in science.

Research Methodology Sample:
A sample of 200 students of Nadia districts are selected from of two different sexes & two different Strata of the society. Sample is taken through Purposive Sampling. Among the four schools two are from urban areas and other two from rural areas. Among 100 students in urban areas 50 are boys other 50 are girls, and in rural areas among 100 students 50 are boys and other 50 are girls, those who are studied in class-ix.
Tools: The Investigator constructed two **standardized tools** one is Achievement test other one is **Attitude test**.
Reliability: Out of four methods of finding out reliability coefficient, only **'test retest'** method used. In case of achievement test r = .95 (highly significant at .01 level).In case of attitude test r = .96 (highly significant at .01 level)
Validity: 'content validity' method used to determine the validity of the tests.
Statement of Hypotheses
H_{01}: There is no significant difference in achievement in life science between rural and urban students.
H_{02}: Achievement Test scores in life Science could not be significantly correlated with those in the attitude towards life science.
Analysis of Data
Among 200 students researcher take an Achievement Test. After finding the scores in life science, researcher measure Mean, Median, Standard deviation, and Skewness which are as follows Mean= 20.37, Median=20.81, Standard deviation=8.91, Skewness= -.148.
Researcher divided the result of Achievement test in to following sub groups. These are as follows.
- Urban areas total students (including boys and girls).
- Rural areas total students (including boys and girls).
- The results obtain from the Achievement test shown in following table.

Achievement Test
Table -1
Statistics of the achievement test scores of the selected samples (Students) under different categories.

	Total Sample	Total Rural	Total Urban
N	200	100	100
Mean	20.37	16.74	20.4

Median	20.81	8.5	19.8
SD	8.91	8.34	8.81
Skewness	-.148	2.96	0.20

The results of attitude towards life science are also done in same way. With the help of attitude test result, researcher finds out the Mean, Median, Standard deviation and Skewness are shown in the following table.

Attitude Test

Table -3

Statistics of the attitude scores of the selected samples (Students) under different categories.

	Total Sample	Total Rural	Total Urban
N	200	100	100
Mean	91.5	97.8	90.6
Median	94.5	100.4	89.9
SD	15.1	14.5	15.06
Skew ness	-.59	-0.17	.13

Table -4

Significance of the difference between the mean attitude score of different groups

Null hypothesis No	Between Group	Mean	t- test	Level of Significant	Result
Ho1	Rural /Urban	97.8 /90.6	3.49	0.05 level	Significant

Researcher is tested null hypothesis 2 (Ho_2) with the help of t-test. Result of t-test shown in the following table.

Table No: 5

Relation between Achievement Test scores & attitude scores

Variables		Mean	t test	Level of Significance	Result
Achievement	200	20.37	58.7	0.05	Significant
Attitude	200	91.5			

Findings:

From the above result the researcher could draw some conclusion about the Study.

(i) 'Strata' i.e. (rural & urban) was one of the factor that influenced the achievement tests as well as attitude towards life science also. In this respect, vast difference observes between urban & rural area both in case of attitude towards life science and also in achievement test. So the mainly rural people get less opportunity and help for their study and some socio economic condition may also affect their study.

(ii) Since the attitude related more strongly to the achievement test, so it may be said that, those who get higher attitude towards life science, get higher marks on it. Though there are some exceptions because other than attitude, achievement, was also dependent on socio-economic status interest, motivation etc. mainly the attitude co-relate with the achievement test.

Recommendations:

Students are very typical task on the part of any investigation. To measures the attitude properly it's very difficult. Time period is very limited. So, some suggestion we can take for future studies.

- The sample might be taken in large number to avoid error.
- Large number of schools of different grades should be taken to find out the accurate relationship between achievement and attitude.
- For the better research, researcher may be taken other board students. Here only students from Bengali medium from WBBSC take into consideration.
- Other methods should be used to check the validity and reliability of the test.
- There should be more dimensions for measuring attitude towards life science.

Conclusion:

From the above study, we can say that, there is present positive relationship between achievement and attitude .Student's those who have positive attitude towards a life science score better than those who don't have the positive attitude towards this particular subject. Here ,researcher also divided students according to strata wise .Where we can find that, rural students(97.8) have much more positive attitude towards the life science than the urban students(90. 6).This may be occur due to the rural students are stay more close to the nature, They can see what they study.

In their case study is more concrete. Whereas, in case to urban students they are not so much close to the nature as compare to rural student. Baring a few exceptions, urban students study in abstract manner mostly. So, it's may be difficult to build up the positive attitude towards the particular study.

But in case of Achievement, we can see that, rural students' achievement (16.74) is much less than the urban students (20.4).We can say in case of achievement besides attitudes several other factors influence the achievement like socio economic condition, intelligence, interest, teaching learning methods etc .which may effects the achievement in rural students. So, it affects the performance of the rural students.

References:

Best, G.W, Research in Education, New Delhi, Prentice hall of india, 1977

Bloom, B.S (Ed), Taxonomy of educational objectives, hand book-I cognitive domain, New delhi Longmans Green co, 1956

Garrett, H.E, and Wood worth, R.S, Statistical in Psychology and Education, Paragon International Publishers,5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi,2004

Green, H .A et al, Measurement and Evaluation in the Secondary School, Longmans Green and co, New York, 1954

Patel, R.N, Educational Evaluation Theory and Practice, Himalaya Publishing House, 2001

Tewari, A.D, Reasoning Abilities and Achievement in Mathematics, Commonwealth Publishers, New Delhi, 1990

India-Bangladesh Maritime Boundary and the Problem of Dwellers of the Indian Sundarbans

Arabindu Sardar
Assistant Professor, Department of History
Sarat Centenary College

Abstract: India and Bangladesh are closely attached in both historical and geographical contexts. History is the first and leading determinant of the foreign policy of Bangladesh towards India. Geologically, India and Bangladesh co-occupy approximately 180 k.m of maritime borderline. During the aftermath of the Bholo cyclone in 1971, a small island (New Moore/South Talpatti) unexpectedly emerged in the Ganges Delta region of the Bay of Bengal. The island emerged at the mouth of the Hariabhanga River, which is the border between Bangladesh and India; its geological location prompted both nations to claim the island under their jurisdiction, which is known as the Indo-Bangladesh maritime boundary dispute. Although Bangladesh went in for arbitration over the delimitation of maritime boundary under the United Nations Convention on Law of Sea (UNCLOS).The much-awaited verdict on the dispute regarding the delimitation of the maritime boundary between India and Bangladesh on 7th july,2014.It is possible, overcoming a 40 year-old maritime boundary dispute? Because The Government(Central & State), Border Security Forces(BSF), Coastal Security Guard as well as dwellers of the Sundarban faces a number of Threats and Challenges that originate from this dispute border line, which are mainly sub-conventional in nature. These threats and challenges can be categorized into various types-: maritime terrorism, piracy and armed robbery, smuggling and trafficking, infiltration, illegal migration and refugee. This paper focuses mainly an overview of the dwellers, which are frequently attacked by pirates. For this reason, the study emphasizes impact on the poor and marginalized people of the effected area. The pirates/gangs attack fishermen, hijack their boats, hold them hostage for months, demand ransoms, rob them of their catch and personal belongings and sometimes kill them.

Keywords: India, Bangladesh, Maritime boundary, Sundarban, Piracy, Dwellers, Migration.

India and Bangladesh not only share their border on land but also their coastline. India itself has a long coastline of 7,417 k.m among the eight

maritime states of India . Bangladesh shares more than ninety percent of its international border with India alone. India-Bangladesh shares a 4096 k.m long border with as many as five Indian states-West Bengal (2217 k.m), Assam(262k.m), Meghalaya(443k.m), Tripura(856k.m),Mizoram(318 k.m).History is the first and leading determinant of the foreign policy of Bangladesh towards India. "Foreign policy of a country is primarily a projection of its socio-economic and political compulsions in international politics. Thus, the domestic and international environment determines the foreign policies of nations. Bangladesh's foreign policy is also determined by certain basic factors such as the geographical realities of the region, its search for security, historical backgrounds, cultural affinities, etc."[1]

Geologically, India and Bangladesh co-occupy approximately 180 k.m of maritime borderline. However , due to constantly changing river courses from soil erosion and frequent floods of both nations have claimed overlapping maritime boundary. For this reason India applies the equidistance principle and Bangladesh claims one based on equity principle. India has already settled maritime borders with Sri Lanka, Myanmar and Thailand. Similarly, Bangladesh's maritime boundary issues are solved in the Hague-based Permanent Court of Attribution (PCA) has awarded Bangladesh an area of 19,467 sq. km, four-fifth of the total area of 25,602 sq. km disputed maritime boundary in the Bay of Bengal with India on July, 2014.[2]

The UN Tribunals Award has clearly delineated the course of maritime boundary line between India and Bangladesh in the territorial sea, exclusive economic zone and continental shelf within beyond 200 nautical miles (nm).The verdict has been broadly accepted by both the countries as positive development for further consolidation of friendly relations especially given the geo-strategic/political significance of greater Indian ocean region and south Asian sub region. India is also happy with the ruling and considers it as a diplomatic breakthrough for various reasons. Among others gain, the verdict has recognized India's sovereignty over New Moore island and received nearly 6000 sq.km of the contested zone where the island had once existed.

The verdict is also good news for millions of fishermen in both the countries. The amicable settlement has opened up vast sea areas which were not available to them in the last four decades. Clearly delineating the maritime boundary between the two nations, the verdict could help boosting coastal and maritime security in the region. The verdict has now cleared the hurdles of strengthening security in the maritime front.

Furthermore .precise demarcation of maritime boundary would assist in preventing the cases of transgression by fishermen of both countries.

Dwellers of the Sundarban face a number of threats and challenges from this blurred border. These threats and challenges can be categorized like maritime terrorism, piracy, armed robbery, smuggling and trafficking, infiltration, illegal migration and refugee influx. Piracy and armed robbery pose a major threat of the sea navigation. The shallow waters of the Sundarbans have been witnessing‘act of violence and detention’ by gangs of criminals that are akin to piracy. The pirates/gangs attack fishermen, hijack their boats, hold them hostage for months, demand ransoms, rob them of their catch and personal belongings and sometimes kill them.

Sundarbans is the largest mangrove forest in the World, located in the delta of the Ganges and Brahmaputra Rivers, in West Bengal, India. The Sundarbans is an intricate web of tidal waterways, seawater, rivers, creeks and alluvial silt, at the merger of the Ganges and Brahmaputra Rivers in the Bay of Bengal. There are 56 islands of various sizes and shapes in the Sundarbans and these are separated from each other by a network of tidal channels, inlets and creeks, some of which at as pathways for both freshwater discharged from upland and overflow of flood and ebb. Bay of Bengal in the south and invisible Dampier-Hodges line in the north are divided into two nations India and Bangladesh. According to Sir William Wilson Hunter- ‘The Sundarbans may therefore be described as a tangled region of estuaries, rivers, and watercourses, enclosing a vast number of islands of various shapes and sizes’.[3]

‘Territorial and border histories are incomplete without an ecological component. Environment and nature emerge from the background and play a leading role in the defining of borders. Mountains and seas have signified ‘natural borders’ for India historically. However, the seas surrounding India have been seen as a major point of vulnerability, producing unstable borders and leading to increasing uncertainties. Borders, which delimit state boundaries and are transformed into national identity, are particularly fuzzy in the seas, thus posing a potential threat to everything that is identified with the nation.’[4] Sundarban Biospheres are divided into Core zone, Manipulated zone and Restoration zone that conform to the Buffer zone and Transition areas. Fisher folk of the Sundarban are fishing mainly in the Buffer zone and Transition areas with appropriate permit and Boat Licence Certificate (BLC).

The main occupational groups in the sundarbans are fishers, the bowalis (wood cutter/golpatta collectors), honey collectors and the shell collectors. Fishing is one of the primary sources of livelihood of the local, forest dwelling population, alongside wage labour, agriculture, and crab and prawn seed collection. The main craft used in the sundarban region are the *naukas*, and popular fishing gears are dragnets, shore seines, gillnets and fixed bagnets. Fishing villages often have poor access to potable water, basic transportation, electricity, and education and health facilities. Fishing is a seasonal occupation for communities in this area. While most fishing is undertaken by men, crab fishing and prawn seed collection are practised by both men and women in the inter-tidal waters.

Piracy of such a nature has been a recurrent feature in the sundarbans for decades. Two type of pirates seen in the Sundarban of the maritime boundary region, one is local gangs another is foreign pirates mostly Bangladeshi. The pirate's main target is the non-mechanise boats. Four major gangs operate in the sundarban,[5] of them the most infamous one is the Canning-Dockghat gangs. The oldest gang is the Jharkhali kata Jungal gangs, which is now defunct. Another two are Merrygunj gang and Madhavpur gang. The pirate's original homes were in the Sundarban of the both nations, India and Bangladesh. They are moved with their families in the heavily forested New Moore region, locally known as purbasha, no man's land along the water boundary of the west Bengal and Bangladesh.

Piracy is concentrated at the mouth of The Matla, The Bidya and The Thakuran near the Bay of Bengal. Munda canal, Chamta Island, Hemnagar Island and kendodweep are also unsafe for fishing. Pirates operating in the Sundarbans usually belong to Bangladesh, hailing the districts of Jessor, Satkhira and Khulna. They take advantage of the poorly guarded border and frequently enter the Indian side of the Sundarban. These pirates are helped in their adventure by Indian criminal gangs operating in the area. Indian smugglers and their agents facilitate piracy by indicating to the pirates the Indian fishing trawlars, which could be potential targets as well as the escape routes that should be taken. In return, pirates provide the Indian gangs safe havens in Bangladesh when they are chased by the security forces and law enforcement agents of India. According to the Daily News & Analysis reporter ,Sumanta Ray Chaudhuri, said in his article titled *"Sundarbans piracy a threat to security"* has rightly pointed out that- "A nexus between Bangladeshi water-pirates and Indian cross-border smugglers in the Sundarbans area of South 24-Parganas helps Harut-ul-Jihaddi-Islam(Huji) activists

operating in Bengal`s border districts get hold of Bangladeshi SIMs. This is a major threat to internal security as these SIMs are active 10-12 km into the Indian side from Bangladesh border but cannot be traced." A senior Intelligence officer said that –"The Bangladeshi SIM card s are active 10-12 km into the Indian side from Bangladesh but cannot be traced by the towers" and he also said that –"We are unable to either locate or tap these phones. Hence, we are unable to have prior information of any insurgency conspiracy being planned through these phones."The nexus between the Bangladeshi pirates and Indian criminal groups does not bode well for the security of the country. It is suspected that this nexus provides logistical support to several Bangladeshi terror operatives operating inside Indian Territory.

India – Bangladesh maritime boundary are divided by invisible border like Damphere-Hodges line and there was no check post. Coastal fisher folk of India and Bangladesh are often arrested for crossing borders. Charu Gupta and Mukul Sharma in their article titled- *"Blurred Borders, coastal conflicts between India and Pakistan."* has rightly pointed out that - 'fishing boats could unwillingly and unknowingly cross into others territory because of tidal currents, wind force, cyclone, engine failures and lack of navigational aids'. The armed pirates also target the bowalis (wood cutter/golpatta collectors), honey collectors and the crabs and shell collectors, loot all their collection, usurp their boats and torture them and demands heavy ransoms. Pirates have no fixed time of their operation; most of these operations take place within the Indian Territory. The fishermen claims that neither Border Security Force (BSF), nor Coastal Guard comes to them rescue.

West Bengal and as well as dwellers of the Sundarban faces many threats and challenges from its maritime domain. Whereas some of these threats and challenges are manifest, others are potential in nature. The scope and intensity of the threats and challenges also varies. While threats - such as maritime terrorism - have the enormous ability to destroy national security, challenges like smuggling and the straying of fishermen, wood cutter, honey and crabs collectors can also jeopardise the safety of the nation. Fishing in Sundarban is becoming more dangerous in recent times. The National Fishworkers Forum (NFF) Secretary Pradip Chatterjee said-'The Movement of the Bangladeshi pirates is a threat to National Security. Surveillance on the Indo-Bangladesh border is poor. Coast Guard and Navy don't take any action. Inadequate patrolling in the Bay of Bengal encourages the pirates'. According to a senior Government official- 'The riverine border shared

by India and Bangladesh in this region has practically no checkpoint or Border Security Force (BSF) outpost. This makes trans-border piracy all the more easy'.

Ecological threats may be more diffuse than clearly identified military threats, but they can be as pervasive. Further, security is being shaped on an anvil of environmental edifice, where it is asserted that large-scale human induced environmental pressure may seriously affect Nation and International Security. Sundarban region also Bay of Bengal are famous for smuggling .Gold, electronic goods, narcotics and arms have been smuggled through the sea for a long time. Factors such as ban on the import or export of items likes gold combined with high import duties especially on electronic goods, high domestic demand for such items, traditional smuggling routes, the availability of a wide range of sea-going vessels, and lax coastal Surveillance have created a favourable atmosphere for the smugglers to clandestinely transfer these items in and out of the country. In the initial years after Independence, the smuggling of gold was rampant but, in subsequent years, smugglers diversified into the trafficking of narcotics and drugs, and in more recent years, they have turned to the trafficking of arms and explosives as well as people. Geographical location, strange terrain, and close trans-border ethnic ties have made these stretches conducive for smuggling and trafficking.

Hard terrain, porous borders, strong linkages between people residing of both side of the border, and poor surveillance has made the Sunderbans a smuggler's paradise. Essential items such as rice, diesel, and saris, together with timber, antiques, etc. are smuggled in and out of the region rampantly. In furthermore, wildlife—such as tigers, turtles, and protected species of fish such as shark and stingray—are also regularly poached. The main motivation for smuggling has always been financial. Criminal groups engaged in smuggling have been exploiting price differentials on luxury and consumable items between countries to amass enormous wealth. Till the time they confined themselves to smuggling petty items, they posed a challenge only for the law enforcement agencies. But once they started networking with terrorist groups and engaging in the business end of terrorism, they have become a threat to national security.

India's land boundaries have always been porous to infiltration by terrorists/militants and large scale illegal migration. These large scale influxes over the decades have resulted in widespread political turmoil in the Border States like West Bengal. To prevent infiltration and large scale illegal migration, the Indian government implemented widespread

security measures, including Bay of Bengal, but not sufficient for the thorough checking of immigrants. "The elaborate security arrangements on land forced the terrorists and illegal migrants to look towards the sea where security measures are comparatively loose, enabling them to 'move, hide and strike' with relative ease." [5]

Illegal migration from Bangladesh into India has been taking place since Independence. There are a variety of contributory factors like partition of India and Pakistan (1947), War of Independence of Bangladesh (1971), and other factors such as the deadly famine of Bangladesh (1974-75) and the death of Sheikh Mujibur Rahman (1975) that led to the emergence and resilience of trans border migration from Bangladesh to India. 'Cultural affinities, historical linkages, geographical similarities and the presence of social networks induced people from Bangladesh to cross the border into India. The dire economic conditions of Bangladesh along with environmental and political turbulence, population pressure and unemployment combined to sustain the influx of Bangladeshi immigrants into India.'[6] While in the earlier decades, the inflow of Bangladeshis was mostly confined to the bordering North-eastern states, the fencing of the border has forced the migrants to turn towards the sea, and clandestinely land their refugee boats along the West Bengal and Odisha coasts. The coastal districts South 24 Parganas and East Medinipur in West Bengal, and Kendrapara, Jagatsinghpur, Bhadrak, and Balasore in Odisha reportedly have huge concentrations of Bangladeshi population.

The increasing employment of Bangladeshi migrants in the fishing industry in the coastal States has also raised security concerns. In the case of the India-Bangladesh borders, the straying of Indian fishermen in Bangladesh's territorial waters invariably not only draws the attention of that country's maritime law enforcement and security agencies, but also invite attacks from pirates. The straying of Indian fishermen into Bangladeshi waters happens mainly in the Sunderbans area. The difficult terrain and the absence of the Global Positioning System (GPS) in the fishing trawlers make it difficult for the fishermen to ascertain maritime boundaries and, more often than not, they unknowingly enter into Bangladeshi waters. Once they enter into Bangladeshi waters, besides facing the Bangladeshi law enforcement agency Indian fishermen also encounter by the pirates.

Over the years, Indian policy makers and security establishments have been engaged in devising policies and measures to put in place an effective response mechanism to deal with these threats and challenges.

We are also hope that recently solved maritime boundary between India and Bangladesh is saved the dwellers of the Sandarban regions, which are livelihood both side of the border. Government, Border security Force and Coastal Guard are also takes active role to destroy networks of the criminal groups and the pirates in the Sundarban.

Reference:

1. Bhardwaj, Sanjoy.'Bangladesh Foreign policy vis-à-vis India,'Strategic Analysis,vol-27,No-2,April-June-2013,Page-265.
2. Bhattacharjee, Rupak. 'Delimitation of Indo-Bangladesh maritime boundary. ' Institute for defence studies and Analyses, August.19, 2014.
3. Hunter, William Wilson. ICS, 'A Statistical Account of Bengal, 'vol-1, part-11, 'Sundarban, 'West Bengal Govt. Reprint, January-1998, Page-2.
4. Gupta, Charu. Sharma, Mukul. 'Blurred Borders, Coastal Conflicts between India and Pakistan.' Economic and Political Weekly, July-3, 2004. Page No -3008.
5. Chattopadhyay, Suhrid Shankar. Terror in the Sundarban, Frontline, Vol-18,Issue-15,July-20 to August 03,2001.
6. Das, Pushpita. Coastal Security, The Indian Experience, IDSA, Monograph series.No-22, September, 2013, Page-34
7. Joseph, Jolin. Narendran, Vishnu. 'Neither Here nor There: An Overview of South-South Migration from both sides of the Bangladesh-India Migration Corridor,' Centre for Development Studies, Trivandrum, India, May, 2013, Page No-9.

Locating Contours of the Post-Partition Resettlement and Identity Formation: Food Movement of Coochbehar and Jalpaiguri

Prajna Paromita Podder
Assistant Professor, Department of History,
B H K Mahavidyalaya, North 24 Pgs

Abstract: Scholarly writings dealing with the history of the afterlife of the Partition of India have delved into the ways in which community was formed institutionally and discursively by the post-Partition immigrants, on one hand, and their host society, on the other, and ways in which these processes were intimately informed by each other. This essay would focus on the locales of Jalpaiguri and Coochbehar to shed light on these inter-constitutive processes and the ways in which identities were produced by these processes. More specifically, by exploring the contours of the Food Movement in Coochbehar and Jalpaiguri districts the present essay would try to register how the attempted neatness of dominant discourses of identities of the hosts and that of the immigrants were made unstable by class, caste and gender.
Key Words: Community, identity, post-Partition, Food movement

In the afterlife of the Partition of India (1947), the displacement of people and their emplacement as a set of 'new' people -not in a socio-demographic vacuum but amidst long-settled people with their narratives of ageless 'nativity' in the area of such emplacement, created a complex vortex of identities. In this essay we have focussed on Jalpaiguri and Coochbehar in West Bengal to enable a micro-level examination of Partition's long afterlife, to bring out the local specifics that historically diversify that long afterlife. In the two districts under review, the host society, predominantly the Rajbansis, came to construct a fundamental difference between themselves as '*deshi*' (the native inhabitants of Jalpaiguri and Coochbehar) and the post-Partition immigrants as *'bhatia'* (literally meaning people who came from tidal belt or *'bhatir desh'*, but here in North Bengal it refers to 'outsiders'). Exasperated with the nowhereness of the official label of 'refugee', the post-Partition immigrants into the two districts came to generate the warmth of a community around the imagining of *'desher lok'*; this imagining also folded into itself an assertion of their cultural difference.

The strain of 'otherness' that this resettlement of displaced people generated in either community's perception of the other became an organizing template in their respective identities - a template that survived historical transformation of the respective identities over time. But even this reconstitution of the two identities has not happened independently of one another. The two identities, of course, became historically mediated in their own ways by class, caste and gender; indeed class sometimes even created linkages between a section of the immigrants and a section of the host society. Different historical moments and conjunctures like, for example, the Food Movement brings out the ways in which the essential 'otherness' constructed by the dominant identitarian discourses in host society as well as the immigrants came to be destabilized in a shared space of subaltern mobilization. In this essay we would try to locate how the Food Movement championed this welding of the poor immigrated people and their middle-class leaders on one hand and the hosts on the other.

Pre-Partition History of Food Movement in Coochbehar and Jalpaiguri:

In West Bengal, the Researches show, that the condition after the Partition has served as the stage which in due course became the bastion of Leftist politics.[1] However, it was in the pre-Partition times itself- with the movements beginning with post 1943 famine, then with the Tebhaga Movement - that the CPI had already become popular in the rural areas of Bengal. Thus the post-Partition movements with Left leadership can be seen in a continuum, having their pre-history in the years before the independence. With the Partition of this subcontinent Rangpur, Dinajpur districts and Pachagarh, Debiganj, Boda, etc. areas of Jalpaiguri district- regions with the rich history of peasant struggle - were included into East Pakistan. With the Partition induced displacement, many peasants moved to Coochbehar and Jalpaiguri districts from these areas[2]. With a palpable rich tradition of class struggle in their minds, these peasants had participated in various mobilizations after the Partition. Thus post Partition mobilization in this region had its pre-history in the peasant unrest of the pre-Partition times. In the pre-independence period, the epicentres of this movement were mostly the northern part of undivided

---

[1] Joya Chatterjee, *Spoils of Partiiton: Bengal and India: 1947-1967*, (New York: Cambridge University Press, 2007), p.260.

[2] See, for example, Prajna Paromita Podder, *Communities and Identities in the Afterlife of Partition of India: The Interface between Immigrants and Host Society in North Bengal (1947-1971),* (Unpublished PhD thesis, Department of History, Jadavpur University, Kolkata, 2021), Chapter I.

Bengal, and after the Partition these centres shifted to the southern part of Bengal. The Communist Party and the Kishan Sabhas were primarily responsible for organizing this movement. The Communist leaders in rural Bengal, most of who were urban youth, had provided the leadership for such movements. The struggle of peasants of the adjacent districts like Rangpur – Dinajpur, in all probability, must have influenced the peasants of Coochbehar and Jalpaiguri too. Particularly some areas of the undivided Jalpaiguri district-Debiganj, Pachagarh and Boda had responded valiantly to the BPKS call and Tebhaga movement. [3] Coochbehar, being the princely state, political parties had limited scope to organize movements there. Still the struggle of the peasantry for their rights was bound to leave impressions on the awareness of peasants. After the Partition this wave of popular protests continued.

Post-Partition Scenario Leading to Mass Mobilization:

For the hosts, the religious persecution and subsequent flee of the Partition-displaced people to this region was bound to kindle sympathy and compassion for them. At least in the initial years after the Partition when the increased pressure on the economy and social structure was not perceived to be threatening, the pre-existing people of this area had helped the immigrants to be resettled. On the other hand, the Partition-displaced too considered citizenship as their right,[4] though such claims were not unhesitant, their resettlement in West Bengal also implied obtaining rights on the resources- rights on land, food, and other sectors of the economy, society, and polity. It led to their participation in movements for food, for redistribution of land, for resettlement etc.

In different districts of West Bengal and Kolkata, different micro-level committees-particularly colony committees, played the crucial role in organizing the Partition-displaced people.[5] In these districts too, such committees were formed and became active.[6] But there are some essential

---

[3] For a history of the Tebhaga Movement in Jalpaiguri district, see, for example, Ranajit Dasgupta, 'Peasants Workers and Freedom Struggle: Jalpaiguri 1945- 1947', *Economic and Political Weekly*, vol.20, no. 30. (July 27, 1985), pp. 42-52; 'Popular Movements in Jalpaiguri District', *Economic and Political Weekly* , vol.21, no. 47, (November 22, 1986), pp. 264-266; Sarit Kumar Bhowmik, 'Tebhaga Movement in Doors: Some Issues Regarding Ethnicity and Class Formation', *Economic and Political Weekly* ,Vol. 21, No. 22, (May 31, 1986), pp. 977-980;

[4] For similar findings, See, Sucharita Sengupta and Paula Banerjee, 'Refugee Movement : Another Aspect of Popular Movements in West Bengal 1950s and 1960s', in Sucharita Sengupta and Paula Banerjee and Anwesha Sengupta (ed.), *People, Politics and Protests I : Calcutta and West Bengal 1950s and 1960s*, (Kolkata: Mahanirban Calcutta Research Group, 2016) pp. 1-24.

[5] Sengupta and Banerjee, *ibid*, p.12.

[6] Mahananda Saha, Secretary of the Coochbehar Committee of the UCRC, 'Amar Rajniti Jibone Udvastu Andilaner Provab', (The Effects of Refugee Movements in My Political Career), (Bengali), in *Memorandum of the Eighteenth State Conference, 10-11th June, 2017, Coochbehar*, (2017).

differences in the character of the Refugee Movement of Kolkata and other parts of West Bengal and that of North Bengal. The fundamental difference lies in the very nature of the experience of resettlement of the Partition-displaced here. Plenty of fallow lands could accommodate thousands of immigrants in North Bengal. They could also take part in the dynamic sector of the economy. So unlike the southern part of Bengal and Calcutta, these movements became less necessary for many, if not all, of the uprooted persons. This does not, however, imply that they did not sympathize with the ongoing refugee movements in different parts of the state, or they should not be counted as the support base of the political parties which clamoured for the demands and claims of the refugees.

The majority of the Rajbansis being downtrodden they joined the Partition-displaced in their claims for basic sustenance. So when these movements for food, for land, for resettlement, etc. crystallized, these served as moments where the hosts and the immigrants came together in their struggle. The local Left leaders, like those of other parts of Bengal, always emphasized class solidarity and discouraged *'deshi- bhatia'* schisms. Many of these leaders were Partition-displaced persons. Amar Roy Pradhan[7], a Rajbansi immigrant from Dinajpore, East Pakistan, later joined All India Forward Block and became an MP from Coochbehar. Kamal Guha, another Left politician of this area, has also come from a Partition-displaced family. Nibaran Pandit, a non- Rajbansi Immigrant from Mymensingh, also played the crucial role in mass mobilization. There were many other little known leaders too, who came forward to mobilize the masses during various movements of this region. The Congress leaders too, did not encourage any chasm. But they could not weld the people, as the Left could. The Left leaders welded the poor hosts, as well as that section of the Partition-displaced together in their struggle. They emphasized the class identity above all other identities.

Even those left leaders, who came from the host society,[8]they too never encouraged any kind of sectarian identity which could divide the populace into Rajbansi (hosts) - non Rajbansi (immigrants) dichotomy.

---

[7] See, Roy Pradhan, Amar *'Jiban nadir Banke Banke'*, (Bengali), ed. Anandagopal Ghosh, (Malda, Sanbedan, 2012).

[8] For Example Dinesh Dakua was one of such leaders. For his views on sectarian identity politics, see, for example, Dinesh Chandra Dakua, *Kamtapuri O Greater Coochbehar: Ekti Bichchinnatabadi Janabirodhi Andolan* (Kamtapuri and Greater Coochbehar: A Separatist Movement against the Interests of People), (Bengali), (Kolkata: National Book Agency Private Limited, 2003); *Hitasadhani Theke greater Coochbehar* (From Hitasadhani to Greater Coochbehar), (Bengali), (Kolkata: Deep Prakashan, 2006), Second edition; *Ja Dekhechi Ja Bujhechi* (As Noticed, As Comprehended), (Bengali), (Kolkata: Ekush Shatak, 2010).

Thus the saga of the movements championing this welding of the poor immigrated people and their middle-class leaders on one hand and the hosts on the other became the elementary feature of the history of this region right after the Partition. Food movement was one of such movement which witnessed the solidarity of the immigrants and the hosts.

Food Movement:

In Calcutta and southern part of West Bengal campaigns against corrupt and inadequate Public Distribution System in 1956-58 eventually led to the Food Movement of the first half of the 1960s.[9] It reached its zenith in 1966. However, in Coochbehar and Jalpaiguri Food Movement had crystallized much before. From 1951 demonstration against the corrupt Public Distribution system and claim for food for all inhabitants had become the rallying cry of the Food Movement - which could accommodate the immigrants and the hosts together.

With increased pressure on the economy and society due to the Partition induced displacement, it led to a shortage of food grains in these two districts, like other parts of West Bengal. In 1948 the state government could reach only 50% of its target of procurement and distribution of food grains, in the following years the situation only deteriorated further.[10] In the district of Jalpaiguri, in addition to the immigration, other factors too had aggravated the state of affairs. After the Partition, almost one lack hector cultivable land remained uncultivated there, as the Muslim cultivators of that area have left by the year 1950. The people who came from East Pakistan were given rehabilitation in that area, but that could not compensate the yield.[11] The flood in the river Tista had further complicated the situation. All these had led to famine in the Jalpaiguri. Even in the district town of Jalpaiguri the middle-class and lower middle-class dwellers had started to feel the crunch.[12]

---

[9] For a detailed history of this movement, see, for example, Suranjan Das, *'Food Movement of 1959: Documenting A Turning Point in History of West bengal'*, (Kolkata, K.P. Bagchi and Co., 2004); Sibaji Pratim Basu, '*West Bengal: The Food Movements of 1959 and 1966'*, Research Paper published at the official website of MCRC; http://www.mcrg.ac.in/RLS_PML/RLS_PM/RLS_PM_Abstracts/Sibaji.pdf Last accessed on 26.07.2020.

[10] As referred by Sibaji Pratim Basu, *West Bengal: The Food*, *ibid*, p.2.

[11] Swadhinata Patrika, a local news paper, 22.03.1951, Jalpaiguri.

[12] To provide some relief to the inhabitants, in a letter to the Food Minister the Jalpaiguri Consumers' Samity had pleaded for full rationing system in Jalpaiguri. Several reports of the Swadhinota Patrika, a local new paper reported such depression- Swadhinata patrika 20.04.1951. Jalpaiguri.

Later in the month of September '*Khadya Sangram Samity'* was established in Jalpaiguri to mobilize common people. [13] On 10th September nine hundred persons started a hunger strike in Jalpaiguri in front of the Deputy Commissioner's Office.[14] They had demanded that the government must supply increased quantity of rice through the PDS. Later nine persons continued the strike and to support their cause the Samity organized a rally. It has been reported that in this rally three thousand people had participated.[15] They also organized a strike on 21.09.1951, at the Jalpaiguri town. As the unrest spread, the hungry people started organizing rally in other parts of the district as well. In Maynaguri a rally was organized by the peasants on 18.10.1951.[16] These mobilizations of the poor peasants could overcome the '*deshi- bhatia'* branding. These rallies brought the toiling masses - the peasants, labourers, lower middle class workers - to the streets. In this specific historical juncture, the interest of one pre-existing Rajbansi share-cropper and that of a poor immigrated refugee was similar- they claimed for their basic sustenance.

Before the inclusion of the state of Coochbehar into the Indian Union the state was known to be self-sufficient.[17] But after the Partition, as a major section of the Muslim peasants had moved to Pakistan- it led to decreased production of food grains. In fact two elected members from Coochbehar, now a district of the state of West Bengal, asked the government for increased supply of grains to this district,[18] immediately after the inclusion of Coochbehar into the state of West Bengal. But the state government did not pay attention to such demands and the situation only worsened later.

On 19th April, 1951, at Bhabaniganj Bazar of Coochbehar people gathered to decide their course of action. Spontaneous in nature, this gathering had attracted common masses. UCRC had also played a vital role to mobilize the people.[19] However, in this gathering leaders of different political parties had come together to address the masses. Shri Chunilaal Mukherjee and Jadav Acharjee of Hindu Mahasabha; Baijnath

---

[13] Swadhinata patrika 15.09.1951. Jalpaiguri.
[14] Swadhinata patrika 10.09.1951. Jalpaiguri.
[15] Swadhinata patrika 20.09.1951. Jalpaiguri.
[16] Swadhinata patrika 24.10.1951. Jalpaiguri.
[17]Mahendra Debnath, *'Coochbeharer Khadya Andolan Unishsho Ekanna'* (Food Movement of Coochbehar 1951), (Bengali), in *Uttarer Ganachetanar Goti-Prokriti*, ed. Debabrata Chaki, (Coochbehar: 2010), p.126.
[18] Debabrata Chaki, *'Asthiratar Utsa Sandhane'* (In search of Source of the Turmoil), (Bengali), *Titir*, Year VII, First edition , (June ,2008), p-123.
[19] Mahananda Saha, note 06 above.

Biswakarma, Shibnath Banerjee of the Socialist Party; Naresh Chandra Basu and Durgesh Niyogi of the Forward Block addressed the people. On that day and the next day people organized rallies and moved to the District Magistrate's office. As a protest to the government policy, a group of five people started a hunger strike from 19th April.[20] However the leaders could not come up with any solution with the authority and they planned for continuing the strike on 21st April.

On 21st April, as the rally moved near the District Magistrate's office police lathi- charged; as a reaction people from the rally started hurling stones. As retaliation, police opened fire on the rally, and five people were shot dead.[21] This had infuriated the masses. An All Party Samgram Samity was established under the leadership of Shri Chunilaal Mukherjee, Jadav Acharjee, Baijnath Biswakarma, Naresh Chandra Bose, Durgesh Niyogi, Suren Lahiri, Ramesh Cahndra Roy etc. Thus this Samity had represented leaders of different major political parties of that time.[22] They demanded a higher level enquiry of the firing, compensation for the families of the affected people, etc. Immediately after this incident the government increased the supply of food grains in this district.

This episode of police firing, though unfortunate, served as the cementing agent for class solidarity in this region for years to come. In the adjacent areas, this had inspired the poor. In support of the people of Coochbehar rallies were organized at Alipore town, in Jalpaiguri district.[23]A Martyrs' Column was established near Sagar Dighi at Coochbehar. Shortly after this episode the Left political Parties- RSP, Forward Block and Communist Party came together to organize Front for the first time in this area.[24]This kind of popular protest continued. Particularly the left leaders, also active in the State Assembly with the issue of food scarcity and thereby attracting public and media attention, incessantly emphasized the need for class solidarity. However in the memories of people of this region, the events of 1951 are referred as the

---

[20] Ramchandra Saha, 'Itihaser Aloke Khadya Andolan 1951' (Food Movement of 1951 Through the Lights of History), (Bengali),*Uttar Prasanga*, Coochbehar Jila Samkhya, ed. Debabrata Chaki, (Coochbehar: 2016), p.71.

[21] These persons were Kabita Bose, Bandana Talukdar,, Bakul Talukdar,, Badal Biswas, Satish Debnath; some people who were severely injured were Mahadeb Kanjilal, Sailen Kumar Sarkar, Jagadish Chowdhury and Induprobha Sarkar.- Debnath, *Coochbeharer Khadya Andolan,* note 17 above, p.134.

[22] Dakua, *Ja Dekhachi* , note 08 above, p.83.

[23] Swadhinata patrika 24.04.1951. Jalpaiguri.

[24] Swadhinata patrika 27.04.1951. Jalpaiguri.

'Food Movement'. Every year on 21st April at the Martyr's Column people continue to pay their homage to the martyrs.

Conclusion:

This Food Movement was not the only episode in post-Partition history of this region, which had brought the hosts and the immigrants together. On the contrary, this was the beginning of a partnership that shaped the future history of this area. On the basis of its empirical study, this essay also seeks to contribute to a critique of the discourses of identity. The present author argues against the neatness of dominant identitarian discourses as propounded by the host society and the immigrants in Jalpaiguri and Coochbehar and attempts to establish that identity(ies) were actually ethnically diverse as well as variegated along lines of class and caste.

Sibaji Pratim Basu, in his essay, discusses the nature of the food movement as being 'rhyzomatic'- a philosophical concept developed by Gilles Deleuze and Félix Guattari[25]- and emphasized the capability such movements to create connections, structures, and norms of their own. He also emphasized how this 'rhyzome' could come up to the surface time and again. Intermittent upsurge, particularly under the leadership of the Left continued even after the Left Front government came to power in 1967. Expanding Basu's argument, the present author would further argue that not only Food Movement but the Refugee Movement of this period was also 'Rhyzomatic,- it "ceaselessly established connections between semiotic chains, organizations of power, and circumstances relative to the arts, sciences, and social struggles.' for 'rhizome has no beginning or end; it is always in the middle, between things, interbeing".[26] This movement has "catapulted them (the refugee leaders) into multiple other movements that in turn reinforced heir claims to citizenship".[27] Another contemporary movement, for example, the movement for land acquisition, was also produced by the partnership of the immigrants and the hosts. However, in this essay we restrain ourselves here only.

References:

Basu, Sibaji Pratim, '*West Bengal: The Food Movements of 1959 and 1966'*, Research Paper published at the official website of MCRC;

---

[25] Gilles Deluge and Felix Guatteri, *'Anti Oedipus: Capitalism and Schizophrenia*', Translated by Robert Hurley, (Minnesota: Penguin Publishers, 1977).

[26] Sibaji Pratim Basu, '*West Bengal: The Food',* note 09 above, pp.1-4.

[27] Sengupta and Banerjee, 'Refugee Movement', note 04 above, p.3.

http://www.mcrg.ac.in/RLS_PML/RLS_PM/RLS_PM_Abstracts/Sibaji.pdf Last accessed on 26.07.2020.

Bhowmik, Sarit Kumar, 'Tebhaga Movement in Doors: Some Issues Regarding Ethnicity and Class Formation', *Economic and Political Weekly* Vol. 21, No. 22, (May 31, 1986).

Chaki, Debabrata, '*Asthiratar Utsa Sandhane'* (In search of Source of the Turmoil), (Bengali), *Titir*, Year VII, First edition , (June ,2008)

- 'Itihaser Aloke Khadya Andolan 1951' (Food Movement of 1951 Through the Lights of History), (Bengali),*Uttar Prasanga*, Coochbehar Jila Samkhya, ed. Debabrata Chaki, (Coochbehar: 2016)

Chatterjee, Joya, *Spoils of Partiiton: Bengal and India: 1947-1967*, (New York: Cambridge University Press, 2007).

Dakua, Dinesh Chandra, *Kamtapuri O Greater Coochbehar: Ekti Bichchinnatabadi Janabirodhi Andolan* (Kamtapuri and Greater Coochbehar: A Separatist Movement against the Interests of People), (Bengali), (Kolkata: National Book Agency Private Limited, 2003)

- *Hitasadhani Theke greater Coochbehar* (From Hitasadhani to Greater Coochbehar), (Bengali), (Kolkata: Deep Prakashan, 2006), Second edition

Ja Dekhechi Ja Bujhechi (As Noticed, As Comprehended), (Bengali), (Kolkata: Ekush Shatak, 2010).

Das, Suranjan *'Food Movement of 1959: Documenting A Turning Point in History of West bengal',* (Kolkata, K.P. Bagchi and Co., 2004);

Dasgupta, Ranajit, 'Peasants Workers and Freedom Struggle: Jalpaiguri 1945- 1947', *Economic and Political Weekly*, vol.20, no. 30. (July 27, 1985)

- Popular Movements in Jalpaiguri District', *Economic and Political Weekly*, vol.21, no. 47, (November 22, 1986).

Debnath, Mahendra, *'Coochbeharer Khadya Andolan Unishsho Ekanna'* (Food Movement of Coochbehar 1951), (Bengali), in *Uttarer Ganachetanar Goti-Prokriti*, ed. Debabrata Chaki, (Coochbehar: 2010)

Deluge, Gilles and Guatteri,Felix *'Anti Oedipus: Capitalism and Schizophrenia*', Translated by Robert Hurley, (Minnesota: Penguin Publishers, 1977).

Podder, Prajna Paromita, *Communities and Identities in the Afterlife of Partition of India: The Interface between Immigrants and Host Society in North Bengal (1947-1971),* (Unpublished PhD thesis, Department of History, Jadavpur University, Kolkata, 2021)

Roy Pradhan, Amar, '*Jiban nadir Banke Banke'*, (Bengali), ed. Anandagopal Ghosh, (Malda, Sanbedan, 2012).

Saha, Mahananda, Secretary of the Coochbehar Committee of the UCRC, 'Amar Rajniti Jibone Udvastu Andilaner Provab', (The Effects of Refugee Movements in My Political Career), (Bengali), in *Memorandum of the Eighteenth State Conference, 10-11th June, 2017, Coochbehar*, (2017).

Sengupta, Sucharita and Banerjee, Paula, 'Refugee Movement : Another Aspect of Popular Movements in West Bengal 1950s and 1960s', in Sucharita Sengupta and Paula Banerjee and Anwesha Sengupta (ed.), *People, Politics and Protests I : Calcutta and West Bengal 1950s and 1960s*, (Kolkata: Mahanirban Calcutta Research Group, 2016) .

The Indian Self against the Colonial Mercantile Establishment: A Study of the Truant Boys Represented in Khagendranath Mitra's *Bhombol Sardar* and Rabindranath Tagore's "Atithi"

Ashis Biswas
Research Scholar,
Department of English Language & Literature,
University of Calcutta

Abstract : The paper has focused on the study of the Truant Boys represented in Khagendranath Mitra's *Bhombol Sardar* and Rabindranath Tagore's "Atithi". These narratives are set against the backdrop of the colonial hegemonic discourse of building the identity of the mass population of India based on mercantile ideology. The truant boys who are already misfits into the norms and practices of the society escape the space dictated by the imperial codes of success and prosperity in terms of material gains, and embarked upon a journey that led to the search of theirauthentic selves. Therefore, the truant boy narratives against the colonial hegemonic discourse created a scope for the alternative narrative that redefined the Indian identity by going back to the roots of Indian metaphysics, philosophy and culture that focused on the journey of life to reach the identity of self rather than any material goals.
Key words: Adolescent literature, truant boy narrative, Bengali fiction, colonialism, imperialism.

The truant boy literature of Bengal in the early 20th Century often focused on the adolescent escaping from home. Novels like Khagendranath Mitra's *Bhombol Sardar [Leader Bhombol]* and stories such as Rabindranath Tagore's 'Atithi'[The Guest] showcase the adolescent's struggle with the social codes of conduct governed by the imported colonial ideology of the imperial masters. Those who submitted to the social norms and practices enjoyed uplift in their lives and became the good boys of society by serving the cause of the empire as its agents. The upbringing of the so-called good boys followed the directive of the colonial ideology of creating ideal subjects for the British empire. Now, in the Bengali adolescent literature of the colonial period we have examples of such boys who won over fate with their single-minded devotion to the study of the prescribed curriculum of the foreign origin.

In the Bengali texts like *Dukhyojayir Jayjatra* [*Grand Procession of the Winner over Poverty*] by Dinesh Mukhopadhyay and *Bijoyer Aviyan* [*Quest for Triumph*] by Nripendrakrishna Chattopadhyay we get to see the stories of good boys who strive to uplift in the station of life to perfectly fit into the scheme of things of the colonial structure pre-described for their subjects. In *Dukhyojayir Jayjatra*, the protagonist Mintu, a colonial subject struggles greatly against poverty and social cruelty for promoting himself in social hierarchy. But what is significant is the way he achieves success. He very like an obedient boy learns his lessons from the text books and follows the rules laid down to him by the colonial setup. At the end Mintu gets his reward as expected and becomes a deputy magistrate. He returns to his village as a victorious hero to be applauded by all. In *Bijoyer Aviyan*, Binoy wants to be a civilian indicative of his desire to get promoted in life through education. In many fictional and non-fictional writings of the great Bengali writers of the time like Sarat Chandra Chattopadhyay, Rabindranath Tagore, Bankim Chandra Chattopadhyay we often come across scattered evidences of powerful Bengali men who are some ways or the other have connections with this setup. For instance, in Sarat Chandra Chattopadhyay's *Datta* [*Betrothed*], the male protagonist Naren is a civil doctor; in Rabindranath Tagore's *Gora*, a Bengali woman like Barodasundari has already planned to marry off her daughters to Bengali men who are in the high rank civil services. Bankim Chandra Chattopadhyay himself was one of the recipients of such privileges from the British masters. So, the entire socio-economic and cultural setup of Bengal under the colonial rule was modified very tactfully by the British through the changes made in educational policies. And in this present setup there remained no other alternative for the colonised subjects but to imitate the white race's codes of conduct for material uplift, and accept it for their supposed wellbeing.

The impact of such acceptance of the colonial propaganda was the mass creation of 'babu culture' in Bengal—people foppish in nature who were much more engrossed with their own comfort and gains without being concerned about the larger interest of the country. They are the people who are all about the empty talk on politics and social sciences and how everything is backward and superstitious with the Bengali race. The reference can be found in Rabindranath Tagore's *Gora*. In the debate between Haranchandra Nag and Gourmohan, in chapter ten, we see that Haranchandra Nag or Panubabu, a school teacher accuses the Bengalees for their inability in taking part as one of the pillars of imperial agency unlike their white masters, and the race is condemned to be immersed in

superstition. Gora very aptly counters the argument by saying it is all Panubabu's bookish knowledge of the Bengali culture that he has memorised in school text books prescribed to him by the British. However unfortunately such babus existed among Bengali's who so blindly imitated the outer lustre of British Sahibs without worrying about the essential difference between the two races. Bankim Chandra Chattopadhyay was very critical of this section of Bengali society: in his Bengali essay 'Babu' he talks of them as fragile in character, expert in imitation, engrossed in materiality and ready to boast of self-erudition, skill, and learning. They lack the manliness and are given to luxury and daintiness. In the colonial period like the myth surrounding the black Orient who were all uncivilized and barbaric in the eyes of the White Occident, there was also the myth that gave way for the creation of effete Bengalee boys who are devoid of courage and action as opposed to the British identity.

Therefore, imperial ideology created a myth surrounding the Bengali culture through the oblique narrative of good boys who work hard to learn the codes of the masters for their promotion in social hierarchy; however, the narrative of the truant boys fought back breaking such myth to retain the essence of the culture. In Khagendranath Mitra's *Bhombol Sardar* and in Rabindranath Tagore's "Atithi"we witness such representation of an alternative narrative against the colonial discourse of Bengali self. *Bhombol Sardar*(1936-1978) is a four-volumefictionabout an absconded adolescent boy of Bengal, Bhupendranath Chaki, popularly known as Bhombol who is the leader of the local group of boys. He runs away from home to escape punishment for sinking a boat in the river while playing pirates with his friends. The novel from the very beginning sets Bhombol as an adolescent who has problems dealing with elders. He often gets beaten by his uncle for his truant nature. On his travel away from home to Tatanagar to get work in a factory, he meets sets of people representing a large spectrum of Bengali society mostly in rural areas giving a unique flavour of Bengal life not so under the influence of the master. But still there are evidences of colonial values making its roots in the native lives. Bhombol's uncle Haran Chaki, the nayeb of Charmadaripur wants his nephew to complete his studies and get a government job to have a good material life. Bhombol rebels against it; he does not want to be a babu but to involve in a creative field; he wants to build something of worth which for him can be possible in Tatanagar. In the colonial background the novel represents a great socio-cultural and economic background of Bengal with which Bhombol a colonial subject

and a truant boy interacts to affect a change or to be cast out. Rabindranath Tagore's "Athiti" is a long short story where the protagonist Tarapada is an epitome of virtue. His characteristics are marked by brilliance, adaptability, skill and learning but he does not desire for materialistic prosperity. He cannot settle himself for a normal domestic life. There is always a quest for something unattainable in him which takes him away from home and all worldly pleasure.

In the society represented in *Bhombol Sardar*or and "Atithi", the panopticon of the colonial surveillance existed for the promotion of the standardized good boy culture; and a scope of an alternative narrative to fight back against such onslaught of colonial ideology was created through these adolescent fictions of the truant boys. But whether the resistance finally won out or the hybrid culture was the result of this encounter. What authenticity do these texts retain in such case that gives voice to an alternative socio-cultural history? In this narrative we see a movement away from home. But the destiny of that movement is 'always already' (Spivak 143) uncertain. If we look at the foreign adolescent adventure literature like *Oliver Twist, David Copperfield,* and others, taken to be the literary classics read across colonial Indian English learning population for acquiring the language and cultural knowledge of the masters, we find that there existed a basic difference between the two cultures. The aspects of materiality and spirituality are put together in different dimension in both the cultures. In the era of colonialism, the western culture developed a mercantile attitude to life and everything. Even in their literary representations we find that prevalence of materialistic gains as the ultimate objective of life. But in the literary representation of the Bengali culture the inward journey for spiritualistic insight is given certain importance. Rabindranath Tagore's 'Guptodhon' [Hidden Treasure] is probably a good example where the journey starts with materialistic aim but ends with spiritual knowledge about life and existence. Bibhutibhusan Bandyapadhay's *Chander Pahar [Moon Mountain]* throws light on the Bengali character Shankar who aspires for adventure but that aspiration is not governed by Diego Alvarez's desire for wealth. He is more drawn towards wild nature and the experience of it more than anything else. But this adventure beyond the materialistic gain is never ending. In Rabindranath Tagore's "Atithi", Tarapada's search for knowledge and truth never ends. He is discovered by zamindar of Kathalia, Matilal Babu on his way back to home on a boat. He is found to be a vagrant Brahmin boy who has run away from home, but it is not the result of his conflict with home or the social institution as such. In fact,

he is an amiable boy who is loved by all. However, as Tagore puts it, amidst his peaceful domestic life his mind would become restless for the "freedom of detachment of the unknown outside world" (My Trnas; Tagore 217). He is a lover of the nature and wanted to have all the experience that life can offer him; and it is the hunger for knowledge and experience that makes way for him to interact with many groups of people of different professions and social status. And this makes him a perfect man in the making. When Tarapada reaches Matilal Babu he has already changed many groups; but as he seems to get settled down in the zamindar's house, and to have found interest in the books of English language and literature, a great fortune is waiting to become of his own. The zamindar seeing the talent and all the other necessary ingredients in the boy proposes a marriage with his daughter, Charushashi. But it is not to be. Tarapada aspires for the experience of life but not the material wellbeing and attachment. Therefore, when an opportunity of another exotic experience comes to his way, he breaking the entanglement of love and prosperity leaves the village to join the concert band from Kolkata and embarks upon a new life of experience. So, Tarapada is an *atithi* or a guest in his own right for he does not commit to the life of apparent happiness and prosperity that the society can provide him. His never-ending quest to find happiness continues from one place to another. In Indian philosophical outlook search for happiness is not the search for material success won over through competition. In his essay "Tapaban" [Sylvian Forest], Rabindranath Tagore talks of the basic fabric of Indian civilization, for him its "…energy which was begotten from the inner chanting of sylvan forest dwellers, did not arise out of the competition to fulfil different needs, that is why this energy never ran outwards" (my trans; quoted in Bandyopadhay 142).

However, the mercantile ideology coupled with the imperial agenda strived to install the material culture based on the fact based 'useful knowledge' incorporating the pedagogic goals of the Western industrialisation and mercantile economy for the profit and gain of the colonial empire by making the subjects the imitators of Western instructions. So, the so-called truant boys often withdrew themselves from actions that engaged them with this colonial discourse of materiality; the western masters recognisedthis as one of the bad aspects of the native culture. Now was this withdrawal from their engagement with colonial mercantile discourse of power because they were colonial subjects and their achievements were not their own but fed the imperial establishments? Or was this a way to distinguish their own existence from

the over generalised myth that woven around Bengali culture by the narrative of the West? So, when the so-called truant adolescents like Bhupendranath Chaki or Tarapada refuse to participate in such imperial ideological discourse and escape from the institutionalized social and domestic space in search for their true selves which are still undefined and unknown, it only gives us the notion of the journey of human being in search of his true self against the foreboding of the material world, and it only leaves behind a mark of Indian traditional living for the very concept of detaching the self from the material object as the goal of karma and focusing on the journey of life toward the self as the part of the Brahman is connected to the Indian metaphysical discourse. This path of Indian metaphysics is also sought after by many of the Western thinkers and literary artists; T. S. Eliot, who is called the father of English modern poetry, in his search to overcome the misery of the modern world ultimately submits to the notion of this detachment with material objects in his engagement with the worldly life; in one of his later poems, :Ash-Wednesday" (1930) he prays to the supreme being: "Teach us to care and not to care/ Teach us to seat still." (Jain 76). Therefore, this Indian philosophic discourse represented through the narrative of the truant boys such as Bhupendranath Chaki and Tarapada would become the way out to encounter the onslaught of the imperial culture and they provide an alternative narrative against the colonial hegemonic discourse to bring out the authentic Indian identity.

Works Cited:

Bandyopadhyay, Sibaji. *Gopal Rakhal Dvandasamas: Upanibeshbad o Bangla Shishu Sahitya [The Gopal-Rakhal Dialectic: Colonialism and Children's Literature in Bengal]*. Karigar, 2015.

Jain, Manju. *Selected Poems and A Critical Reading of the Selected Poems of T.S. Eliot*. Oxford University Press, 2002.

Spivak, G. C., translator. *Of Grammatology*. By Jacques Derrida. The Johns Hopkins University Press, 1997.

Tagore, Rabindranath.*Rabindra Galposamagra[Collection of All Stories of Rabindranath Tagore]*. edited by Bulbul Basu, Reflect P ublication, 2002.

PERCEPTION OF LEAENERS TOWARDS ROLE OF SOCIAL NETWORKING SITES IN PANDEMIC SITUATION

Ankur Nandi
Research Scholar, Department of Education,
University of Kalyani
Tapash Das
Assistant Professor, Department of Education,
Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal, India
Tarini Halder
Professor, Department of Education,
Kalyani University, Nadia, West Bengal, India

ABSTRACT : *Due to epidemic COVID-19 human civilization came to stand still. All of human civilization, including the entire education system, was shut down. The closed education system was renormalized through a unique creation of technology through social networking sites. To know the term Social networking sites means a wide range of internet based mobile services collection of application (Face book, what's app, Twitter, YouTube, Linked In etc.) user usually access social networking sites services via web-based technologies on desktop and laptops, smart phones, tablets in other word Social media means a society-based media which people use to collect information and exchange information, connect with people, sharing idea, photos, video, marketing, shopping through all online interaction. Social media play a vital role in our life. Technology developed rapidly from day to day and year to year. People of different age groups use social media mainly young generation in their academic life, social life, and personal life and also for entertainment. The primary focus of the study to examine the uses of social networking sites for Unmasking the face of Educational Purpose, Social Life & Leisure Time among Higher Education Level Students during Lockdown Period. In this study the researcher usesdescriptive survey method through and questionnaire use for data collection. The result of the study shows that the social networking sites during the lockdown period has been used by higher education students for educational purpose, social life and leisure.*

Keywords: Perception, Learners,Social Networking Sites,Pandemic.

INTRODUCTION

"Social media is not a media. The key is to listen, engage and build relationship"

DavidAlston, author

With time, human civilization has been plowed by various disasters, like- natural disasters, wars, catastrophes, and epidemics. As a result, human civilization has been destroyed and human civilization faced various problems. The epidemic COVID-19 has had a divesting effect on human civilization, which has damaged human civilization in many ways. The pandemic Covid-19 was first reported in China's Wuhan province, and then gradually spread around the world. In India, this epidemic was first reported in Kerela in India. Corona virus is a contagious virus that infect people to people and when there is no cure for the virus, doctors say the only way to get rid of this virus is to maintain social distance. As a result, the whole world chooses the path of lockdown. As result of lockdown, the entire education system, including the transport, mill and factories, was shutdown. So, it can be said that the people are locked in the cage like bird for lockdown. As a result, people's social life, educational life and leisure journey are disrupted. Unique contribution of technology to higher education students from this closed state social networking site. People's lives are changing day by day due to the rapid advancement of technology. With this technology, people have achieved the impossible and people communication system is improving very first with the help of technology. A unique creation of information technology is the social networking site, which has given new value to the standard of living of people. By using various social networking sites, higher education students have maintained their various educational activities, social activities and leisure activities. In this lockdown situation, higher education students have been given a new life from this problem.

REVIEW OF RELATED LITERATURE

There are quite a few studies regarding social media and its role on life during covid-19 pandemic. Researchers have reviewed on this topic from variety of primary & secondary sources like- books, e-books, journal, article, websites, report of various organization, internet, blogs, and written documents. Various researches work on social media and its role on life during covid-19 done by various researchers in the past give us actual picture about relevance of social networking and its role on life during covid-19 pandemic. For example, Kumar & Kumar(2013). Conducted a study on the title "Use of Social Networking Sites (SNS_s): A

Study of Maharishi Dayanand University, Rohtak, Indida”.Aydin & Arslan (2016).Conducted a study on the title “The Role of Social Media on Leisure Preferences: A Research on the Participants of Outdoor Recreation Activities.”Elmier, Mepham&Stadtfeld (2020). Conducted a study on the title “Students under lockdown: Comparisons of student’s social networks and mental health before and during the covid-19 crisis in Switzerland”.but all these studies clearly depict that social media play an important role during covid-19. But any single study doesn’t focus properly role of social networking on life of higher studies students during lockdown period which is verry necessary because higher studies students are most powerful human resource of any country and the economic development of a country mostly depends on the higher studies students and also overall development of a country depends on the higher education level. So, researchers choose this topic which depict the role of social “Role of Social Networking Sites for Unmasking the Face of Life Style of Higher Studies Students During Lockdown Period”.

STATEMENT OF THE PROBLEM

Therefore, the present problem can be stated as-“Perception of Leaners towards Role of Social Networking Sites (SNS)” in Pandemic Situation.”

OBJECTIVES OF THE STUDY

1. To investigate whether the higher education level students are using social networking sites as a new platform in their life or not in a pandemic situation.
2. To investigate the purposes of using social networking site in pandemic situation.
3. To measure how much time using social networking sitein pandemic situation.
4. To disclose which type of social networking site is used by the higher education level studentin pandemic situation.
5. To investigate different uses of social networking sites for educational purposes by the higher education level studentin pandemic situations.
6. To investigate different uses of social networking sites for the purpose of social life by the higher education level studentsin pandemic situation.
7. To investigate the different uses of social networking sites for leisure time by the higher education level students during the lockdown period.

RESEARCH QUESTIONS

1. Do you use social networking sites as a new platform in our life during lockdown period?
2. What is your main purpose of using social networking sites during lockdown period?
3. How much time you spending on social networking sites in a day during lockdown period?
4. How many social networking sites are you using during lockdown period?
5. What are the different uses of social networking sites on educational purpose during lockdown period?
6. What are the different uses of social networking sites on the purpose of social relation during lockdown period?
7. What are the different uses of social networking sites on spending leisure time during lockdown period?

DELIMITATION OF THE STUDY

The study has the following delimitations:

◊ **Sample size-**The researchers has selected only few higher education students for this study.

◊ **Area-**The study area has been limited to only few districts in West Bengal.

◊ **Dimension-** Researcher has taken some of dimensions related to higher education student's life.

◊ **Analysis of data-** Out of the several methods of analysis the data, the researcher uses only frequency, percentage calculation and graphical presentation of data.

SIGNIFICANCE OF THE STUDY

So, this study has a following significance according to the researchers-

- The present study helps to know the higher education level students to understand the contribution of social networking sites in the lockdown period.
- The present study helps to know the higher education level students to know the wide and extensive use of social networking sites.
- The present study helps to know the higher education level students that social networking sites are the significant platform that has helps student in learning during lockdown period.
- The present study helps to know the higher education level students how important social networking sites played a role in leisure during lockdown period.

- The present study helps to know the higher education level students how important social networking sites played a role to maintain social relation during lockdown period.
- The present study helps to know the higher education level students that the social networking Sites can be an alternative system of traditional education system, leisure time and way of maintaining social relation during lockdown period.

OPERATIONAL DEFINITION OF THE TERMS

◊ **Social Networking:**A social networking service is an online platform which people use to build social networks or social relationships with other people who share similar personal or career interest, activities, backgrounds or real, life connections. Social networking services vary in format and the number of features.

◊ **Learner:** A learner is someone who is learning about a particular subject or how to do something.

◊ **Pandemic Situation:** A pandemic is a kind of epidemic: one which has spread across a wider geographic range than an epidemic, and which has affected a significant portion of the population.

METHODOLOGY OF THE STUDY

- ***Method of the study:***Present study is Descriptive type survey in nature. The researcher has used descriptive type survey method for conducting this present study.
- ***Population of the study:***All the higher education students of the West Bengal state were the population in this study.
- ***Data source of the study:***Researchers use both primary and secondary data for conducting this research paper. Primary data was collated by the researcher using Google Form via social media. The secondary data available in print form and various online databases are also used.
- ***Sample of the study:*** Researchers takes 100 samples for conducting this research paper.
- ***Sampling technique of the study:*** Samples are the drawn from the different colleges and university of West Bengal using random sampling method.
- ***Tool used in the study:*** Researchers have used self-made questionnaire as a tool for data collection in this present research.

- ***Statistical technique of data analysis:***For data analysis and presentation of data researcher used frequency, percentage and graphical presentation as a data analysis technique.
- ***Data collection procedure:***Researchers have collected data for current research using social networking sites (What App, Facebook, G-mail) with the help of Google from self-made close ended questionnaire through online survey across the different colleges and university of West Bengal during current epidemic situation keeping in mind hygiene and social distance.

DATA ANALYSIS AND INTERPREATTION

1. Social Networking Sites as an Important Part of Our Lives during Lockdown Period?

Table 01: *Shows the percentage & frequency of student's responses towards Social Networking sites as an important part of our lives during lockdown period.*

Research Question	Percentage (%) & Frequency			
	Frequency		Percentage (%)	
	Yes	No	Yes	No
Social Networking sites as an important part of our lives during lockdown period?	125	5	96%	4%

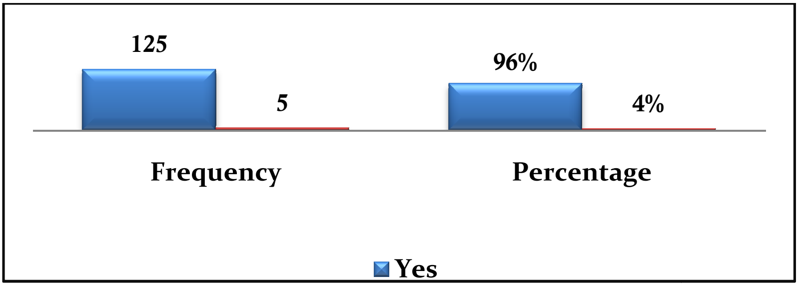

Figure 01:*Shows the graphical presentation of percentage & frequency of Social Networking sites as an important part of our lives during lockdown period.*

Interpretation: From the above table and figure no 01 it is observed that the out of 130 higher education level students, 125 (96%) higher education level students use social networking sites as an important part of our lives during lockdown period and rest 4 (4%) higher education level students are not use social networking sites as an important part of our lives during lockdown period. Therefore, it can be said that the most of the higher education level students use social networking sites as an important part of our lives during lockdown period and which is supporting this view very rightly the response above table no.01 and graphical presentation of figure no.01.

2. For What Purposes Do You Use Social Networking Sites During Lockdown Period?

Table 02: *Shows the Percentage and Frequency of Different Purposes for Social Networking Sites during Lockdown Period.*

Research Question	**Percentage (%) & Frequency**	
Purposes of Using Social Networking Sites during Lockdown Period	**Frequency**	**Percentage (%)**
For Education	45	34.61%
For Spending Leisure Time	18	13.84%
For Contact with Friends and Relatives	20	15.38%
For News	12	9.23%
Others	5	3.84%

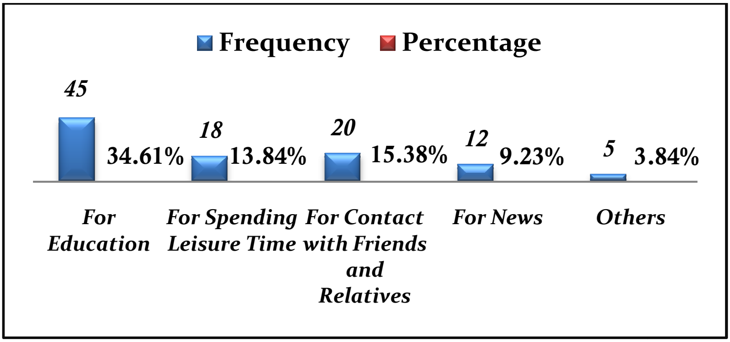

Figure 02: *Shows the Percentage and Frequency of Different Purposes*

for Social Networking Sites during Lockdown Period.

Interpretation: From the above table and figure no 02 it is observed that the out of 130 higher education level students, 45 (34.61%) %) higher education level students use social networking sites used for educational purpose during lockdown period, 18 (13.48%) higher education level students use social networking sites used for spending leisure time purpose during lockdown period, 20 (15.38%) higher education level students use social networking sites used for Contact with Friends and Relatives during lockdown period, 12 (9.23%) higher education level students use social networking sites used for news purpose during lockdown period, and 5 (3.48%) higher education level students use social networking sites used for others purpose during lockdown period which is supporting this view very rightly the response above table no.02 and graphical presentation of figure no.02.

3. How Much Time You Spending on Social Networking Sites in a Day during Lockdown Period?

Table 03: *Shows the Percentage and Frequency ofspending time on social Networking sites in a day during lockdown period.*

Research Question	**Percentage (%) & Frequency**	
Spending time on social networking sites in a day during lockdown period	**Frequency**	**Percentage (%)**
½ an hour	8	6.15%
More than 1 hour	15	11.53%
2-3 hours	34	26.15%
4-5 hours	45	34.62%
More than 5 hours	28	21.54%

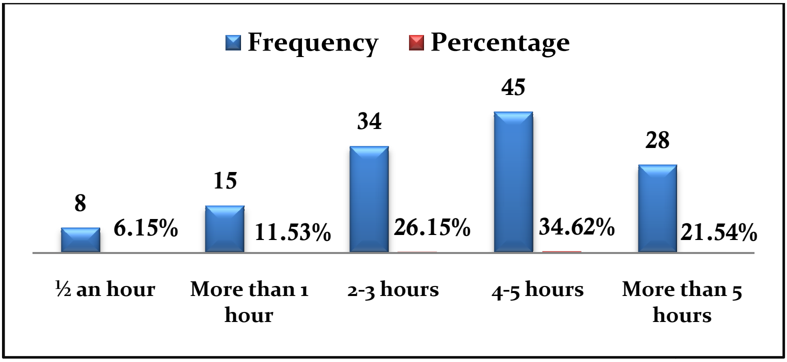

Figure 03: *Shows the Percentage and Frequency ofSpending Time on Social Networking Sites in a Day during Lockdown Period.*

Interpretation: From the above table and figure no 03 it is observed that the out of 130 higher education level students, 8 (6.15%) higher education level students use social networking sites ½ hour in a day during lockdown period, 15(11.53%) higher education level students use social networking sites more than 1 hour in a day during lockdown period, 34 (26.15%) higher education level students use social networking sites 2-3 hours in a day during lockdown period,45 (34. 62%) higher education level students use social networking sites 4-5 hours in a day during lockdown period, 28 (21.54%) higher education level students use social networking sites more than hour in a day during lockdown period, which is supporting this view very rightly the response above table no.03 and graphical presentation of figure no.03.

4.Which Type of Social Networking Sites you are Use during Lockdown Period?

Table 04: *Shows the Percentage and Frequency ofUsing Different Types of Social Networking Sites.*

Research Question	**Percentage (%) & Frequency**	
Different types of social networking sites	**Frequency**	**Percentage (%)**
Facebook	34	26.16%
What's App	27	20.77%
YouTube	28	21.54%
Instragram	6	4.62%
Email	10	7.68%
Different video calling app	12	9.23%
Pinterest	7	5.38%
Others	6	4.61%

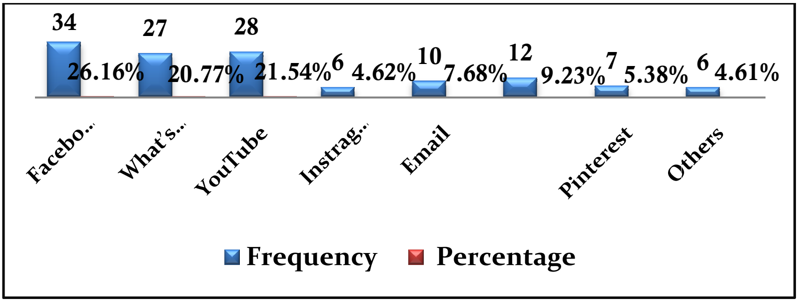

Figure 04: *Shows the Percentage and Frequency ofUsing Different Types of Social Networking Sites.*

Interpretation: From the above table and figure no 03 it is observed that the out of 130 higher education level students, 34 (26.16%) higher education level students are saying that they are use Facebook, 27 (20.77%) higher education level students are saying that they are useWhat's App, 28 (21.54%) higher education level students are saying that they are useYouTube, 6 (4.62%) higher education level students are saying that they are useInstragram, 10 (7.68%) higher education level students are saying that they are useEmail, 12(9.23%) higher education level students are saying that they are usedifferent video calling app, 7(5.38%) higher education level students are saying that they are usePinterest, 6 (4.61%) higher education level students are saying that they are useothers social networking sites, which is supporting this view very rightly the response above table no.04 and graphical presentation of figure no.04.

5. Do You Use Social Networking Sites as an Educational Platform during Lockdown Period?

Table 05: Show the Percentage and Frequency of *Social Networking Sites as an Educational Platform during Lockdown Period*

Research Question	Percentage (%) & Frequency			
	Frequency		Percentage (%)	
	Yes	No	Yes	No
Do you use social networking sites as an educational platform during lockdown period?	121	9	93.78%	6.92%

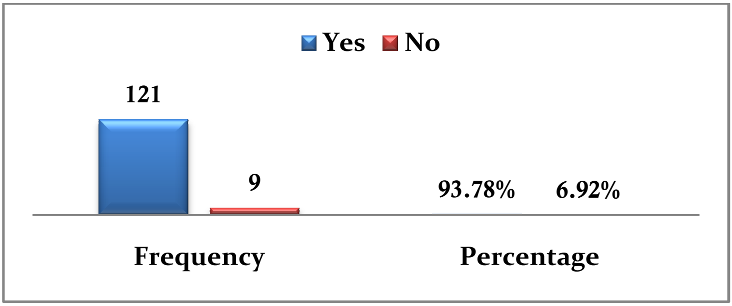

Figure 06: Show the Percentage and Frequency of *Social Networking Sites as an Educational Platform during Lockdown Period.*

Interpretation: From the above table and figure no 05 it is observed that the out of 130 higher education level students, 121 (93.78%) higher education level students are saying that they are usedsocial networking sites as an educational platform during lockdown period and 9 (6.92%) higher education level students are saying that they are do not usedsocial networking sites as an educational platform during lockdown period, which is supporting this view very rightly the response above table no.05 and graphical presentation of figure no.05.

6. What Kind of Educational Facilities Did You Use Through Social Networking Sites during Lockdown Period?

Table 06:*Show the Percentage and Frequency Educational Facilities Did You Use on Social Networking Sites during Lockdown Period.*

Research Question	**Percentage (%) & Frequency**	
Educational Facilities did you use on Social Networking Sites during Lockdown Period	**Frequency**	**Percentage (%)**
Syllabus Oriented Education	80	60.54%
Attaining Various Educational Program	10	6.69%
Group Discussion with Friends	7	5.38%
For Educational Content Sharing	13	10%
Health & Lifestyle Education	15	11.54%
Others	10	6.69%

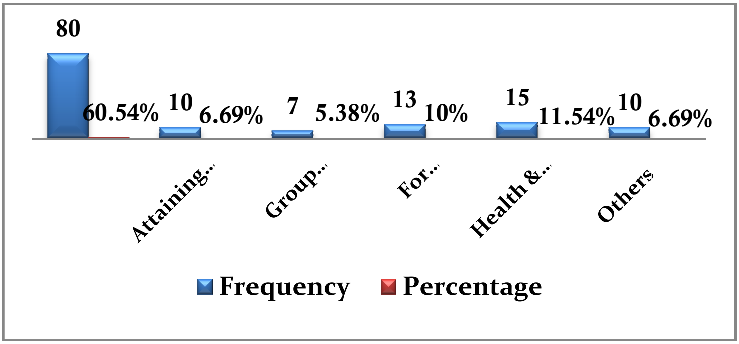

Figure 06:*Show the Percentage and Frequency Educational Facilities Did You Use on Social Networking Sites during Lockdown Period.*

Interpretation: From the above table and figure no 06 it is observed that the out of 130 higher education level students, 80 (60.54%)higher education level students use social networking sites for receive syllabus oriented education during lockdown period, 10 (6.69%) higher education level students student said that they attain various educational program by the social networking sites, 7 (5.38%) higher education level students said that they are using social networking sites for group discussion during pandemic situation, 13 (10%) higher education level students using social networking sites during lockdown period for content sharing, 15(11.54%) higher education level students student said that they are using social networking sites for receive health & lifestyle education during lockdown period, 10 (6.69%) higher education level students student said that they are using social networking sites during lockdown period for others purpose, which is supporting this view very rightly the response above table no.06 and graphical presentation of figure no.06.

7. Do You Use Social Networking Sites as Only Platform to Maintain Social Life and Social Relation during Lockdown Period?

Table 07:*Show the Percentage and Frequency of Use Social Networking Sites as Only Platform to Maintain Social Life and Social Relation during Lockdown Period.*

Research Question	Percentage (%)& Frequency			
Use Social Networking Sites as Only Platform to Maintain Social Life and Social Relation during Lockdown Period	Frequency		Percentage (%)	
	Yes	No	Yes	No
	118	12	90.77%	9.23%

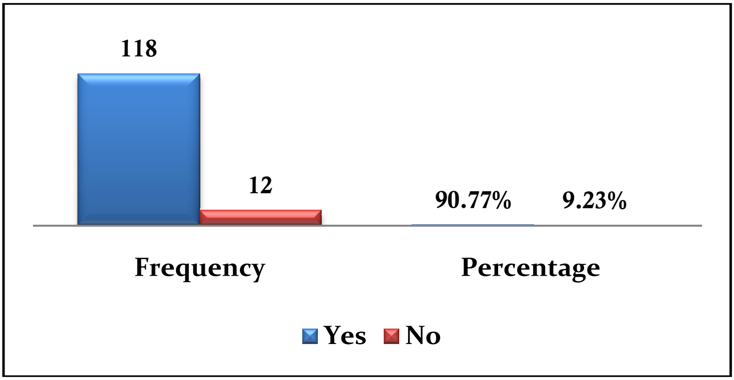

Figure 07:*Show the Percentage and Frequency of Use Social Networking Sites as Only Platform to Maintain Social Life and Social Relation during Lockdown Period.*

Interpretation: From the above table and figure no 07 it is observed that the out of 130 higher education level students, 118(90.77%) higher education level students use social networking sitesto maintain social life and social relation during lockdown period. 12(9.23%) higher education level students say that they are not use social networking sitesto maintain social life and social relation during lockdown period, which is supporting this view very rightly the response above table no.07 and graphical presentation of figure no.07.

8. How to Maintain Social Relationships during Lockdown Periods Using Social Networking Sites?

Table 08:*Show the Percentage and FrequencyHow to Maintain Social Relationships during Lockdown Periods Using Social Networking Sites.*

Research Question	**Percentage (%) & Frequency**	
Maintain Social Relationships during Lockdown Periods Using Social Networking Sites	**Frequency**	**Percentage (%)**
Chatting With Relatives	35	26.80%
Video Call	30	23.50%
Voice Call	10	7.70%
Both above	55	42.20%

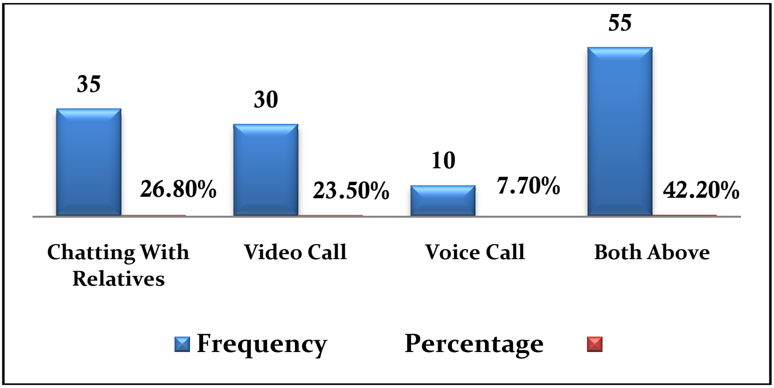

Figure 08:*Show the Percentage and FrequencyHow to Maintain Social Relationships during Lockdown Periods Using Social Networking Sites.*

Interpretation: From the above table and figure no 08 it is observed that the out of 130 higher education level students, 35 (26.80%) higher education level students said that they are chatting with relatives than normal situation during lockdown period, 30 (26.80%) higher education level students said that they are connecting face to face with the help of video calls during lockdown period, 10 (7.70%) higher education level students said that they are connecting with relatives during lockdown period via voice call, 55 (42.20%) higher education level students said that they are connecting with relatives during lockdown by both of above, which is supporting this view very rightly the response above table no.08 and graphical presentation of figure no.08.

9. Do You Use Social Networking Sites as a Platform for Spending Leisure Time During Lockdown Period?

Table 09: *Show the Percentage and FrequencySocial networking Sites as a Platform for Spending Leisure Time during Lockdown Period.*

Research Question	Percentage (%)& Frequency			
	Frequency		Percentage (%)	
	Yes	No	Yes	No
Social Networking Sites as a Platform for Spending Leisure Time During Lockdown Period	114	16	87.70%	12.30%

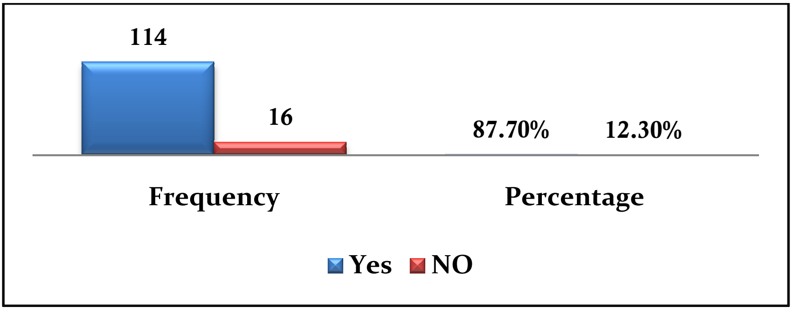

Figure 09: *Show the Percentage and FrequencySocial networking Sites as a Platform for Spending Leisure Time during Lockdown Period.*

Interpretation: From the above table and figure no 09 it is observed that the out of 130 higher education level students, 114 (87.70%) higher education level students said that they are using social networking sites as a platform for spending leisure time during lockdown period, 16 (12.30%) higher education level students said that they are not using social networking sites as a platform for spending leisure time during lockdown, which is supporting this view very rightly the response above table no.09 and graphical presentation of figure no.09.

10. How to Spent Leisure Time by Using Social Networking Sites during Lockdown Period?

Table 10:*Show the Percentage and Frequency How to Spent Leisure Time by Using Social Networking Sites during Lockdown Period*

Research Question	**Percentage (%)& Frequency**	
How to Spent Leisure Time by Using Social Networking Sites during Lockdown Period	**Frequency**	**Percentage (%)**
Listening to music	30	23.07%
For watching videos and cinemas	45	34.61%
For watching daily news	50	38.46%
Others	15	11.53%

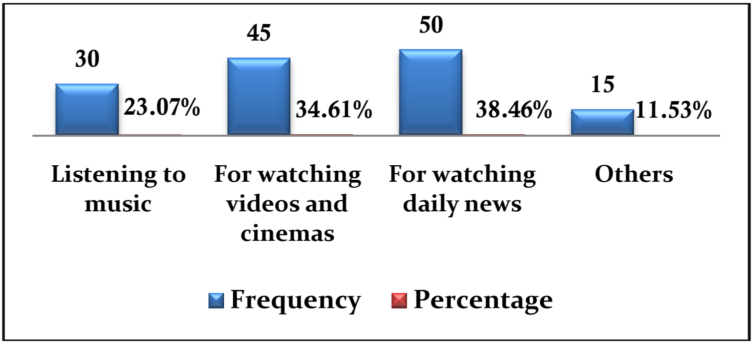

Figure 10:*Show the Percentage and Frequency How to Spent Leisure Time by Using Social Networking Sites during Lockdown Period*

Interpretation: From the above table and figure no 09 it is observed that the out of 130 higher education level students, 30 (23.07%) higher education level students said that they are using social networking sites as a platform for spending leisure by listening to music, 45 (34.61%) higher education level students said that they are using social networking sites as a platform for spending leisure during lockdown period by watching videos and cinemas, 50 (38.46%) higher education level students said that they are using social networking sites as a platform for spending leisure during lockdown period by daily news,15 (11.53%) higher education level students said that they are using social networking sites as a platform for spending leisure during lockdown period by others activity in social networking sites , which is supporting this view very rightly the response above table no.10 and graphical presentation of figure no 10.

DISCUSSION AND CONCLUSION

The analysis and interpretation of data revealed the following discussion and conclusion:

1. Educational Purpose: Researchers find out from the statement related to educational purpose that the higher education level students are using social networking sites as new platform of learning during lockdown period. Due to Covid -19 the entire education system was shut down in order to maintain social distance and the education system was introduced through online platforms where social networking sites played an important role in enabling students to perform various educational activities like Syllabus Oriented Education, Attaining Various Educational Program, Group Discussion With Friends, For Educational Content Sharing, Health & Lifestyle Education and Others.(Mukhaini, E.,

Al- Qayoudhi, W.S., Al- Badi, A., 2014), (Lavuri, R., Navulla, D., Yamini, P., 2019).

2. Social Life: Researchers find out from the statement related to social life that the higher education level students are using social networking sites as only platform of to maintain during lockdown period. Because the corona virus epidemic is a contagious disease that is transmitted from the person to person. So, people to stay indoor to maintain social distance. Social networking sites was only one of the platforms to maintain social relationships by recognizing social distances where they maintain social relationship in different ways like Chatting with Relatives, Video Call, Voice Call. (Asiedu,N.K., 2017), (Ismail, M.I.B., Arshah, A.A., 2016).

3. Leisure Time: Researchers find out from the statement related to leisure time that the higher education level students are using social networking sites as platform of spending leisure time during lockdown period. Because due to corona virus various places of leisure like cinema, clubs were closed people were locked in their homes, and they spend a lot of leisure time on social networking sites like Listening to music, for watching videos and cinemas, for watching daily news and others. (Aydin, B., & Arslan, E., 2016), (Nyambuga, C., &Ogweno, J., 2014).

After analyzing and interpreting the data, the researchers conclude that higher education level students such as colleges and universities students are using social networking sites for their educational purpose during lockdown period, they were done various educational activities such as Syllabus Oriented Education, Attaining Various Educational Program, and Group Discussion with Friends, For Educational Content Sharing, Health & Lifestyle Education and Others and they are used social networking for maintaining social relation like Chatting With Relatives, Video Call, Voice Call by social networking sites and also they are used social networking sites as a platform of spending leisure time like Listening to music, For watching videos and cinemas, For watching daily news and Others. Because technology has an important role to play in every aspect of our lives and that's changedthe way of our completely, which has been proven again through the role of social networking sites in lockdown situations.

References

1. Nyambuga, C., &Ogweno, J. (2014). The Influence of social media on Youth Leisure in Rongo University. *Journal of Mass Communication & Journalism,* 4 (9).2-7.

2. Lavuri, R., Navulla, D., & Yamini, P. (2019). Effect of Social Media Networks on Academic Performance of Indian, *Journal of Critical Reviews,* 6 (4).71-78.
3. Ismail, M.I.B &Arshah, R.B.A. (2016). The Impact of Social Networking Sites in Higher Learning, *International Journal of Software Engineering & Computer Systems,* 2.114-119.
4. Asiedu, N.K. (2017). Influence of Social Networking Sites on Students Academic and Social Lives, *Library Philosophy and Practice,* 1535.1-22.
5. Aydin, B., & Arslan, E. (2016). The Role of social media on Leisure Preferences: A Research on the Participants, *Tourism Academic Journal,* 3 (1).1-10.
6. Kumar, A. (2013). Use of Social Networking Sites (SNS_s): A Study of Maharishi Dayanand University, Rohtak, India, *Library Philosophy and Practice*1000.1-13.
7. Johnson, B. & Christensen, L. (2008). *Educational Research Quantitative, Qualitative And Mixed Approaches (*10thed.). New Delhi: Sage Publications.
8. Koul, L. (2004). *Methodology of Educational Research* (4thed.). New Delhi: Vikash Publishing House Pvt Ltd.
9. Mangal, S.K., & Mangal, S. (2012). *Research Methodology in Behavioural Science*. New Delhi: PHI Learning Private Limited.
10. Mertler, A.C., &Charles,C.M. (2012). *Introduction to Educational Research* (7thed.). New Delhi: Pearson Education.
11. Shastri, V.K. (2008). *Research Methodology in Education.*Delhi: Authors Press.
12. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research Methodology in Education (*6thed.). London and New York: Routledge.

Weblink

1. https://www.emertxe.com/emertxe/top-5-benefits-of-social-media-for-students/Retrieved on December 25, 2020.
2. https://www.timeshighereducation.com/a-z-social-mediaRetrieved on December 29, 2020.
3. https://www.images.app.goo.gl/ntnKsmZfGkzGoAws7Retrieved on December 29, 2020.

4. https://www.images.app.goo.gl/QXeD4jsh6h13UbgaARetrieved on January 19, 2021.
5. https://www.dianedemarcomarketing.com/social-media-the-coronavirus/Retrieved on January 19, 2021.
6. https://www.convinceandconvert.com/social-media-research/social-media-usage-statistics/amp/Retrieved on January 25, 2021.

Translation & the Nation-formation

Sougata Goswami
Assistant Professor of English
Department of Humanities
College of Engineering & Management,Kolaghat.

Abstract : This paper proposes that there is a clear link between the different kinds of nationalism and types of literary translation that we tend to find in political regimes which follow a certain kind of nationalistic orientation. The role of translation in modern era also needs to be evaluated with a balanced attitude where the surge of feelings of 'globalization' does not undermine the individuality and distinctiveness of national identities and on the reserve side of the picture, extreme nationalism does not pose a barrier on the pathway of world citizenship. This world is beautiful because its members are various distinctive nations- India, China,USA ,UK, Canada,Iran,Iraq,South Africa and countless many more-each with its own cultural, ethnic, social and historical fragrances, weaving into a colourful wreath. Preserving and disseminating the unique aspects of national attributes has been and will continue to be a major role of translation and if our translators forget this responsibility,they can never cater to the growing need of a rapid evolutionary world. The role of translation in national integration and nation-formation,particularly in the context of India, is evident from ancient times. It outlines the significant role played by the translation of the two great epics of India-the Ramayana and the Mahabharata-in promoting a national identity of a greater country India, then known by the name of "Aryavarta" or the "Abode of the Aryans". Even in medieval times, Indian literature was widely disseminated by the means of systematic translation of these great epics and other important books. The entire British period in India is a blatant example of how translation served the imperial interests and at the same time awakened the Indian masses into a new era of modern knowledge through translation of English classics. This credit goes to translators of great Indian classics that India could preserve its cultural and national identity even in the midst of a series of foreign invasions.

Keywords: Globalization, Regime, Disseminate, Blatant, Invasion.

INTRODUCTION:

Translators have always played a pivotal role in social and cultural change in society and how they continue to play a major role in dissemination of the ever expanding knowledge and information available today. In this globalised world, the demand for translation & language related services has increased many times. Translation is not only needed for the creation of national identity but has also become an essential tool for keeping pace with the process of globalization & localization. Many times, we take the translator's crucial role at the national level for granted and are less aware of their equally pivotal place as mediators at the international level. Translation has played crucial role in shaping up nations not only in Indian or Asian context but also in the context of Europe, Canada, Africa, Australia, and Arab world.

MAIN TEXT:

"Nation Formation" has always been linked to national integration and the creation of national identity. For a country like India, it is a very delicate and challenging matter to deal with the national identity that derives its strength from multiple layers of social, political , religious, economic, cultural, ethnic and linguistic diversity. However, the communication gap which inevitably arises out of such a diversity of boundaries is constantly being bridged by the people themselves, whose day to day reality is, for the majority, living in a multi- cultural society and interacting in a multilingual manner. We should not forget that the concept of the nation-state is not an ancient or indigenous one but a notion imported relatively from Europe in the 18 th & 19 th centuries. The United Kingdom only became " united" through the Act of Union in 1702 when England & Wales and Scotland merged politically. We should acknowledge that when America famously declared independence from Britain in 1776, this fledgling state initially contained only a tiny fraction of the area it has today.

In India, the impact of this colonial myth has been that many educated people accept that the idea of India as a nation is a British creation. However, a detailed study of linguistic history reveals that Bhartiyata (Indianness) is not by any means a recent phenomenon; it is deeply rooted in its citizens across the country since ancient times. It was, we might argue, the existence and subsequent translation of the great Indian classics that acted as a catalyst in creating a pan- Indian ethos.

Epics – especially the Ramayana & the Mahabharata – have ben translated into almost all regional languages. Cutting across religious beliefs, the legends of Rama and Krishna have stirred the minds of Indians living in almost all corners of India. These myths, whose nature is patently nationalistic, were made available to the Indian population through translation, without which it is inconceivable that the deeply entrenched cultural & linguistic boundaries within India could have been bridged.

Translators have always played a pivotal role in social & cultural change in society and they continue to play a major role in dissemination of the ever expanding knowledge and information available today. The role of translation becomes more important in the Indian context as this new knowledge spreads to all corners of Indian society with their mosaic of sub-cultures and sub identities spread across different linguistic regions, their literature & their lifestyles. Translations are marginal than being exact. They are not reflective ; they present only one side of the message. They may be incomplete or partial yet they have their value. One distinguishing characteristic of translations is that they carry the message to another language in simple terms. Ferdinand De Saussure heavily dwelt on his theory of structuralism. Word-image relationship is discussed as signifier & the signified. Understanding or the meaning arises from conversions. Conversions are arbitrary and thus a shared social phenomenon. When he talks of arbitrariness of meaning , he appears to be a post structuralist. So words and their meanings may change from society to society, place to place. The word ‘ Kaka’ in Bengali refers to uncle but in the Punjabi it refers to a boy-child. This arbitariness also changes connotation. Knowledge of context and its implication is important to clearly understand the meaning. Otherwise a word may simply mislead. Language reflects identity of the users. Common use of language generates a language community. Larger communities are called nations which may comprise more than one linguistic group. A single local language may be a source of unification of a nation. Bengali in West Bengal is a unifying language in which most people can have a dialogue. In the absence of Bengali, there would have been really serious problem for the entire nation. Translations enrich culture. Understanding of other cultures can be achieved through frequent use of translation works. Instead of cultural migration or

immigration through learning a foreign language people can better make use of translation work. This can bridge distances and differences. One important function and benefit of sticking to one's language is unification & nation-building. Linguistic identity at regional level does involve regional ioyalty to a specific linguistic community. But one common language in the form of a lingua franca can be a source of nation building. Paul St.Pierre says " The importance of translation can be located in the fact that translation brings the readers, writers, and critics of one nation into contact with those of others, not only in the field of literature, but in all areas of human development.

Nation-Formation refers to the process of constructing or structuring a national identity using the power of the state. It is thus narrower than what Paul James calls 'nation formation', the broad process through which nations come into being. Nation-building aims at the unification of the people within the state so that it remains politically stable and viable in the long run. Nation-building can involve the use of propaganda or major infrastructure development to foster social harmony and economic growth. Through translation nations define themselves and in doing so they define others. Translation in this way plays an essential role in determining and forming identity of a nation in terms of others, be this through assimilation, "naturalization" of the foreign or opposition to foreign influences , and thus differences are eliminated to a great degree, or through imitation of another dominant culture. There is, thus, a particularly strong interconnection between translation & the building national identity, and the study of translation can be useful in determining the nature of national identity, and the nature of the relations one nation institutes with others. Translation is a social practice with a definite role to play within a given society. It serves as form of selection process restricting, conditioning, and modulating cultural immigration. If the translation of a story is meant for kids of elementary classes, the translator may simplify the story, minimize the details, reduce the length, make it a little entertaining and eliminate many of the crucial features of the original text.

It is a commonly admitted fact that Translation works help a country sharing store of knowledge found in another language. It becomes thus a source of sharing concepts and information of other nations & countries of the source language. It helps the nation making

benefit of translation works but along with it may infuse the culture of the source language. Basically translation is defined as ‘ the replacement of textual material in one language (SL) by equivalent material in another language’. Here the SL is the source language and the other language is the Target Language(TL).

The multiplicity of languages imposes on us the need for translation. Translation, written or oral is a universal human activity that is as old as language itself. We consider the translator as someone who reproduces the message to create the same effect as the original message in the target language reader/ listener. Language is known as an instrument of communication. Man uses language to reach others to transmit a message. In doing that , man must have access to signs and other elements of speech that will help him to be understood. The need for translation comes directly from the need for communication. Translation plays a unifying role in our societies. It is through translation that ideas of different societies are sent across to other societies. Translation is therefore indispensable in life because it helps to solve the problem of misunderstanding by causing linguistic barriers and their effects to disappear.

In fact to summarize the great importance of translation Ajunwa describes the importance of translation saying:” translation performs a wide range of useful functions. To start with, it cuts across cultural & linguistic barriers, thereby bringing about mutual understanding & international co-operation among people of the world.” Translation has become a significant instrument for the spreading of materials, linguistic ,political, economic, religious and other forms of culture. In a multilingual nation, translation has come to acquire another role functioning as an instrument of political consciousness & national unity. It is the instrument for the transmission of great thinking as it was through translation that ideological, philosophical, economic & political thinking of great minds such as Plato, Aristotle, Voltaire, and Montesquieu were made accessible to the different people of the world today. It is the instrument for the dissemination of scientific and technological information. Pedagogicallly speaking, translation plays a vital role especially in the teaching of foreign languages. From the above, one can see that translation has a very vital role to play in our world and as B.J.Chutte says:

" ----- bridge between cultures....without translation our world would narrow mercilessly. Like air and sunlight and good growing earth in the natural world, translation is our necessity in the creative world." Certain languages are considered as languages of international communication which help to transfer scientific & technical knowledge. These languages are English, French, Spanish, and Portuguese languages. In the scientific angle, English language is recognized as the first because of the position of leaders of the United States in the domain of scientific and technological inventions. In these conditions, translation is very important to allow for the diffusion of technological inventions. If language is not correct, then what is said is not what is meant; if what is said is not what is meant, then what ought to be done remains undone; if this remains undone, morals & arts deteriorate; if moral &arts deteriorate ,justice will go astray; if justice goes astray, the people will go about in hopeless confusion. Hence there must be no arbitrariness in what is said.

Also, in a country of many languages, the federal government has an obligation to help the people to get the information if wants to get across to the people through translation. Certain official texts are equally published in the different acceptable languages to maintain peace and equity among the population. Translation only can help us to achieve this goal because translation helps to provide valuable insight into the custom, beliefs, art, way of life, value, attitudes and capabilities of a people. Translation is an important vehicle for expressing what a people stand for. When properly used, translation not only reminds the people what they stand for but also encourages them to live up to such expectations. In such context, translation serves as a catalyst or motivating factor for performance because when more people are aware of the policies and the happenings around them, their potentials are better harnesses for national integration. In the process of nation-formation translation sets an example for inter cultural relations in this century which is characterized by economic, social & political movements. Translation is not merely a technical skill, but also an art form, not subservient to the original. The translator thus has to be equipped with adequate preparation and creativity along with linguistic skills to be able to transcreate a text. The process of translation then brings one into a very intimate relationship with at least two languages. The role of translation for language learning , language conservation, & linguistic proficiency is immense. Translation

is not a matter of words only: it is a matter of making intelligible a whole culture.

In knowing and understanding the world around us translation plays a major role. Since its inception, translation has played the indispensable role of transferring messages across languages & cultural barriers. By doing so it continuously weakens the fences between languages, brings out their similarities and finds points of convergence amongst differences. We would not have been able to read the wirks of great writers & thinkers such as Plato, Aristotle, Darwin, Einstein, Varahmir, Kalidasa, Anton Chekov, Premchand, Rabindranath Tagore, Subramania Bharti, Saadat Hassan Manto etc if their works had not been translated. The aesthetic sensibility or world literature can be enjoyed through translations. For example, Rabindranath Tagore's Geetanjali for which he won the Nobel Prize, was originally written in Bangla. His works received worldwide recognition because it was translated into English and most languages of the world. A translation is accepted as good when it gives you in different languages a true image of the thoughts, realities and poetic intention of an original and at the same time reveals itself as an equally integral, genuine piece of work. According to J.B.Phlip " The test of a real translation is that it should not read translations at all….a translation into English should avoid translator's English…..". Until the eighties, scholars and translators were more focused on the translation of literature and administrative texts which were mainly aimed at national & regional contexts. However, the demand for translation & language related services has increased many times over. Translation is not only needed for the creation of national identity but has also become an essential tool for keeping pace with the processes of globalization & localization.

Moreover, it has become almost mandatory for content producers to translate their text into different languages in order to both globalize & localize their reach. Whether it is a matter of bilateral relations or multilateral relations between countries or a matter related to international conferences. Translation is always a necessity without which such communication would fail. The six decades since the end of the Second World War have seen an explosion of national development, as nation after nation gained independence or restructured their societies and defined their identities. Paralleling this has been equally dramatic

development at the international level with the growth of super national identities: the European Union immediately after the war and later, trade blocks such as NAFTA,SAFTA, ANDEAN.PACT,ASEAN,BRICS. Most observers take for granted the translator's crucial role at the national level but are less aware of their equally pivotal place as mediators at the international and potentially in the creation of the even larger and comprehensive global supra national identities which seem destined to follow in the future.

CONCLUSION

In a multilingual context like ours, it is natural that we use and understand many languages and in consequence be able to express ourselves in the reference language to be able to make any meaningful development. Since we live now in a world where the market, the monetary system, the media etc are international and multicultural, translation is necessary for a better understanding in life. Having in mind that good understanding brings peace and peace means more development, the importance of translation in our everyday life is vast and multidimensional. We have come to a point where the biggest word in our everyday situation is " TRANSLATE" because it is evident that we need to use the translated language. In the fields of education, science & technology, mass communication. Commerce, tourism etc. the need for translation has increased greatly. And translation allows us to tap the rich knowledge base that exists in different languages and cultures of the world. India's multilingualism and multicultural ethos can be celebrated in the real sense of the word by understanding & appreciating its diverse literatures and this is being done through translation. Thus cultural dialoging through translation will faciliatate nation building and preservation of cultural diversity. That's why we can say that without the help of translation nation-formation can not be done perfectly.

REFERENCES:

1. Nida,E. and Charles R Taber, 1974. The Theory and Practices of Translation. Leiden: E.J.Brill.
2. Donald C.Kiraly,1995. Pathways to Translation: Pedagogy and Proceess. Kent: Kent State University Press.
3. Burgess,Anthony,1984.'Is translation possible?' from The Journal of Literary Translation-12.France.

4. UNDP Report on Human Development,1995.
5. Catford,John C.,1965.A Linguistic Theory of Translation. London: Oxford University Press.
6. Newmark, Peter., 1981. Approaches to Translation. Oxford : Pergamon.
7. Bassnent-Mcguire,1980. Susan. Translation Studies. Londoon: Methuen.
8. Venuti,L.(1995) The Translator's Invisibility : A History of Translation. London and New York: Routledge.
9. Venuti,L.(2000) The Translation Studies Reader, 2^{nd} edn. Oxon and New York: Routledge.
10. Smith,A.D.(1971) Theories of Nationalism. London: Gerald Duckworth and Company Limited.
11. Smith,A.D.(1986) The Ethnic Origins of Nations. Reprint, Oxford UK and Cambridge USA: Blackwell,1993.
12. Snell-Hornby,M.(2006) The Turns of Translation Studies. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

“Jal, Jungle, Zameen”: Birsa Munda’s *Ulgulan* and Its Relevance in Contemporary India

Amrita Mondal
Assistant Professor, Department of History,
University of North Bengal

Abstract: Birsa Munda’s struggle against the backdrop of the socio-economic crisis highlighted the subaltern voice against the extortion of the Mundas in Chotonagpur by the colonial government, Christian missionaries and Indian upper caste and upper class. Multifaceted historical interpretation of the Birsa Munda’s ‘*Ulgulan*’channelised contemporary politics to define the movement as anti-Christian and anti-colonial and celebrated Birsa’s birthday as *Janajatiya Gaurav Diwas*. However, the Adivasi community are deprived of several rights. While understanding the historiographical interpretation of Birsa Munda’s life and legacy, this article highlights the contemporary relevance of Birsa Munda’s movement.
Keywords: Birsa Munda, Tribal, *Ulgulan*, Colonialism, Contemporary India

In the recent academic discourse, Birsa Munda’s contribution could be viewed from three perspectives.These perspectives, according to Joseph Behra, mainly fostered certain misconceptions around Birsa, and therefore, his contribution has been comprehended in part and is often misinterpreted.[i] In “Flaming Fields and Forest Fires: Agrarian Transformations and the Making of Birsa Munda’s Rebellion,” Uday Chandra argues that Birsa was an extortionist who fought for the rights of the Adivasi peasants.[ii] However, he was neither an anti-colonialist nor a nationalist. In “Religion and the Secular Left: Subaltern Studies, Birsa Munda and Maoists,” Alpa Shah argues in the same line and highlights that Birsa’s rebellion was “not an anti-colonial rebellion of the tribal freedom fighter per se”.[iii] The writing of the Christian missionaries identified Birsa as an immature fanatic whose floating ideas misled Adivasi awareness and forced them to stand against the colonial government and the Christian missionaries. Recently the followers of Hindutva ideology made Birsa an icon because he and his followers

attacked the missionaries and the Churches while overlooking the actual nature of the *Ulgulan*. In this context, the paper tries to understand the nature of Birsa Munda's movement and its politicisation in recent times. The young freedom fighter and tribal leader Birsa Munda, born on 15th November 1875 in Munda tribal family, marked his imprint on history by consoling the tribal voice against the colonial oppression of the tribal people. He received early education at Salga under Jaipal Nag, and on the recommendation of Jaipal Nag, Birsa was converted to Christianity and joined German Mission School for further study. However, he did not continue his missionary education further and left the school. After a short association with the Roman Catholic mission, he again returned to the fold of Munda animism. Meanwhile, he was profoundly influenced by the Kabir Panth, prevalent in the area, and Anand Panre, a lower-caste local guru. Gradually, he formed his religion, called 'Birsait'. The faith was drawn upon Hinduism, Christianity and Munda belief but distinct from all three. Birsa became the religious guru and was identified as "Bhagwan" or "Dharti Aba" by his follower. Tribal legend was formulated, which said that Birsa attended divine power and was able to perform supernatural acts. In this way, Birsa started social reform among the Adivasi. Soon his religious movement turned into a revolution by discarding the "passive resistance"[iv], i.e., migrating to different areas and long-drawn constitutional methods.[v] This turning point in Birsa's life made him the tribal nationalist leader and led the Hindutva politics to misinterpret historical facts.

Birsa's Munda rebellion was a spontaneous reaction to the colonial exploitative land revenue system, particularly of the Permanent Settlement. The critical analysis of the tribal and peasant movements of the nineteenth century highlighted that all of these movements were organised on the background of socio-cultural and economic crises, more specifically because of the agricultural crisis. Thus, most of the leaders of these movements revoked the religion to mobilise the masses, identified as a prophet by their followers and tried to bring back the older order by denying the colonial law and revenue system.

Between 1886 and 1890, Birsa's stay at Chaibasa brought him closer to Sardar's agitation and realised the oppression of colonialism. Soon he became a part of the anti-missionary and anti-government agitation. Birsa injected new radicalism into the existing struggle of the

Mundas in three ways; first, he identified all foreigners, zamindars, Christian missionaries, businessmen, colonial officers and the colonial rulers in the Chotonagpur area as *dikus* or enemies of Adivasi; second, he gave the call for arm resistance by discarding the idea of passive resistance of Sadar movement; third, he replaced the 'Sadari Larai's vague notion about "Munda Raj" and gave the call for 'Munda disum'. He aimed to remove all *dikus* and the colonial rule from Chotonagpur to restore their claims on the land. He started agitation, consolidated the tribal community and asked his followers not to pay rent and other taxes. He and his followers revolted against all *dikus* and gave the slogan of '*topi topi ek topi'*.[vi]By uttering these words, Birsa clarified the nature of his movement while identifying all the dikus, Christian missionaries, British officials, and money lenders as enemies of the Adivasis. Birsa felt that the missionaries converted Adivasis to Christianity but never considered them as their own. Thus, the missionaries never stood for the Adivasi justice, despite their proximity to the official.

Further, the missionaries provided information to British officials about Birsa's activity in the village. Despite having traditional weapons, the Adivasis stood firmly against the modern armaments of the British army. The initial attack of Birsa forced the colonial government to initiate a permanent measure to abolish the practice of forced labour by passing the communication Act of 1897. Meanwhile, Birsa was arrested and released in 1899. On 24th December 1899, Birsa mobilised almost 7000 Birsaites, including men and women and attacked the Christianised Mundas, missionaries, the Church, shopkeepers and the local police station. The revolt was known as *Ulgulan* or Munda Rebellion. On 3rd March 1900, Birsa Munda was arrested by the British police while sleeping with his tribal guerrilla army at Jamkopai forest in Chakradharpur.[vii] He died in Ranchi jail on 9th June 1900 at the young age of 25. Birsa's death ended the revolution; however, the spread and intensity of the revolt forced the colonial government to change the land settlement of the Chtonagpur region by passing Chotonagpur Tenancy Act in 1908.[viii]

The Ulgulan of Birsa had shown the path of consolidating the tribal voices and fighting for their right on the land issue. Besides, his fight for the Adivasi rights on the forest land also showed their love for the environment. In independent India, Birsa's fight also inspired in

formulating of the demand for the Jharkhand state, fighting for tribal rights and raising consciousness on environmental issues. As a result, the Jharkhand state came into existence on his birth anniversary, 15th November 2000. In 2019, NCP leader Sarad Pawar demanded that Birsa's birthday need to be observed as a national holiday.[ix] States like Bengal, Jharkhand and Madhya Pradesh have brought out gazetteer notifications while declaring the 15th of November as a holiday. In 2021, Central Government identified 15th Nov as Janajatiya Gaurav Diwas to pay tribute to Birsa Munda's contribution. Besides, the Government of India started Sahid Gram Bikas Yojana, and under this scheme, Birsa Munda's village Ullihatu came under the developmental project in 2017. However, the villagers are still deprived of development. *Prabhat Khabar* reported on 9th June 2022 that the villagers of Ullihatu were deprived of electricity, water, house and education. The new forest law, lousy planning on the part of the government and NGOs and corruption increased and intensified the suffering of the tribal community. In 2006, the Forest Right Act was introduced, and this law provided immense legal support to the indigenous people to retain their rights to reside within and around forest areas.[x] However, the amendment of the IFA 1927 and the government's proposal of opening the forest land for business raised questions on the Adivasi rights in the forest.

The Hindutva narrative has recently portrayed Birsa Munda as a protector of Hindus and Hindu culture from Christian missionaries. Birsa Munda is revered by the Hindutva movement because he and his supporters attacked the church and missionaries. But this is not only a purposeful misinterpretation of history, but Hindutva politics are also deliberately misleading the public to strip tribal people of their unique identities and undermine the freedom to practise their religion.[xi]

In light of his opposition to the triumvirate of the colonial state, missionaries, and landlords, Birsa Munda should be remembered not only as a social reformer but also as a revolutionary. As such, he is an inspiration for the present-day struggle of tribal communities against the new triumvirate of the neoliberal state, Hindutva, and multinational corporations. In this scenario, people must imbibe the ideas of Birsa Munda's struggle in the true sense, consolidate their voices, fight for their rights, and protect the environment.

References:

i Joseph Bara, "Setting the Record Straight on Birsa Munda and His Political Legacy", *EPW engage*, Vol. 55, issue no. 30, July 25, 2020, https://www.epw.in.ezproxy.jnu.ac.in/engage/article/setting-record-straight-birsa-munda-and-his-political-legacy

ii Uday Chandra, "Flaming Fields and Forest fires: Agrarian Transformations and the Making of Birsa Munda's Rebellion", *The Indian Economic & Social History Review*, vol. *53*(1), pp. 69–98, January 18, 2016, https://doi.org/10.1177/0019464615619540

iii Alpa Shah, "Religion and the Secular Left: Subaltern Studies, Birsa Munda and Maoists", *Anthropology of this Century*, Issue 9, January 2014, London, http://aotcpress.com/articles/religion-secular-left-subaltern-studies-birsa-munda-maoists/

iv Joseph Bara, *Op.cit.*

v *Ibid.*

vi *Ibid.*

vii *Ibid.*

viii *Ibid.*

ix "Declare Nov 15, Birsa Munda's Birthday, as National Holiday", *Business Standard,* November 15, 2019 https://www.business-standard.com/article/pti-stories/declare-nov-15-birsa-munda-s-birthday-as-national-holiday-119111501672_1.html

x Tauqueer Ali Sabri, "Why I Believe Birsa Munda Remains Relevant For Indigenous Identity Around The World", *Youth ki Awaaz,* November 17, 2019,https://www.youthkiawaaz.com/2019/11/birsa-munda-and-his-struggle-for-rights-and-dignity-of-indigenous-people/

xi Prabal Saran Agarwal and Harsh Vardhan Tripathy, "Remembering Birsa Munda, the Social Reformer and Revolutionary Leader", *The Wire,*9/6/2021, https://thewire.in/history/birsa-munda-social-reformer-revolutionary-leader

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice aYear

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Ebong Prantik

2582 3841

Ebong Prantik

2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102
Ph : 9804923182, 8250595647
Email : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

₹ 800/-